তাফসীর
ইব্‌নে
কাসীর
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড
মূলঃ
হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

# তাফসীর ইবনে কাসীর

## প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড

## সূরাঃ ফাতিহা ও বাকারা

মূলঃ
হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদঃ
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.drmujib.com



প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

অষ্টম সংস্করণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪২৯ হিজরী
মে ২০০৮ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮,
গুলশান, ঢাকা-১২১২।
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা,
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মোঃ ওবাইদুর রহমান
বিনোদপুর বাজার,
রাজশাহী

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

# উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

# প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবূল করুন। –আমীন!

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুদিত ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর খণ্ড প্রকাশ করার পর অসংখ্য গুণগ্রাহী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভক্ত অনুরাগী ভাই-বোনের অনুরোধে ও বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পকাশ নিঃশেষ হওয়ায় আমরা পুনঃ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিই। মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় কম্পিউটার কম্পোজ করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ডের একত্রে এক খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

এই সংস্করণে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকে, ক্ষমার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সাহায্য করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন রিজেন্ট প্রিন্টার্স এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

# অনুবাদকের আরয

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পূতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

এর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রামাণিকতা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মূল্যের কথা ইতিপূর্বেই আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীতে। এই বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা ও অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দূ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দূ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত

বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

এই উর্দু এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা" শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা', 'কুরআন কণিকা', "ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তরকরণ। দুঃখের বিষয় 'ইবনে কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে দেশের বিদগ্ধ সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে এসেছেন কি? না ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর

দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের বেনুবনেই তা গুমরে গুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই অনমনীয় অদম্য স্পৃহাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় কি?

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন।

আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ। আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদান ও উৎস এবং রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

প্রায় দেড় যুগ আগে এই অনুবাদের কাজ শুরু করে এই সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে এই পর্যন্ত মাত্র ১৪টি খণ্ড এবং শেষের আমপারা খণ্ডও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। বাকী খণ্ডগুলোর নিখুঁত ও নির্ভুল প্রকাশনা এবং তা সহৃদয় পাঠকবর্গের হাতে তুলে দেয়া যে আরো কষ্টসাধ্য সময় সাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য। তাই জীবনের এই গোধূলী লগ্নে তথা প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে তাফসীর ইবনে কাসীরের সম্পূর্ণ ত্রিশটি পারার অনুবাদ এবং বিভিন্ন খণ্ডে তা প্রকাশনার সুষ্ঠ ও নিখুঁত পরিসমাপ্তি যে কবে ও কোন শুভ মুহূর্তে ঘটবে তা' অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানে না। যদিও আল্লাহর অপার করুণায় সম্পূর্ণ মূল আরবী তাফসীরের বাংলা তরজমা আমি প্রায়ই একটা আশু পরিসমাপ্তির দিকে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছি। এক্ষণে যেহেতু আমার পক্ষ থেকে নিরলস প্রচেষ্টা প্রযত্নের কোন ত্রুটি নেই, তাই পূর্ণমাত্রায় এ প্রত্যাশা ও প্রত্যয় পোষণ করছি যে, ইনশাআল্লাহ্ এই পড়ন্ত জীবন দীর্ঘায়িত হয়ে পরবর্তী খণ্ডসমূহ যথা সময়ে

বিদগ্ধ পাঠক সমাজের হাতে অভ্রান্ত ও পরিমার্জিত আকারে তুলে দিতে পারবো। এই স্বপ্ন সাধকে কল্পনা করতে গিয়েও আজ আমি যেন আনন্দে অধীর এবং আত্মহারা হয়ে উঠছি। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বিআযীয।' এ সম্পর্কে তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সমীপে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং আমার শুভানুধ্যায়ী পাঠকবৃন্দের কাছ থেকেও এই আরব্ধ কাজের সফল পরিসমাপ্তির ব্যাপারে ঐকান্তিক দোয়ার আবেদন জানিয়ে সেই অনাগত ভবিষ্যতের পানেই নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার এই অনূদিত ও প্রকাশিত খণ্ডগুলোর জনপ্রিয়তা ও উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এর সর্বতোমুখী অপরিসীম গুরুত্বের কথা সম্যক অনুধাবন করে হুবহু আমারই অনুকরণে দেশে আজ আরো একটি তরজমা বাজারজাত হয়েছে। তাই আমি মনে করি, যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে মহান আল্লাহ যেমন তাঁর সুমহান পাক কালামের খিদমত কল্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একদল নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দার মেহনত কবূল করেছেন, তেমনি আমার মতো একজন দীনহীন আকিঞ্চনকেও তিনি তাঁর পবিত্র গ্রন্থের খিদমতে নিয়োজিত করেছেন। এই দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য সৌভাগ্যের শুকরিয়া আমি কোন ভাষায় ব্যক্ত করবো? উপরোক্ত ভাষা এবং শব্দমালা খুঁজতে গিয়েও আমি বারবার আজ খেই হারিয়ে ফেলছি এবং হোঁচট খাচ্ছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত গুনাহগার ব্যক্তির পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযেগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক মাওলানা আব্দুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহাস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই আমি প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং সম্ভাব্য প্রযত্ন সত্ত্বেও একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে এতে কিছু মুদ্রণ বিভ্রাট এবং অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রম প্রমাদ রয়ে গেছে। পরবর্তীতে এগুলো সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে পরিবেশিত হবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যাশা পোষণ করছি। এছাড়া এই অনূদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে এই দীনহীন অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তবে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমি বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদাপ্রস্তুত। কারণ, আমার মতো অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতোটুকু সম্ভব হয়েছে, ততোটুকুই আমি আপাতত সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি। সুতরাং এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের

ন্যায়সঙ্গতঃ চুল-চেরা রিচার বিশ্লেষণ এবং এর ভাল-মন্দ দোষগুণের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম মূল্যায়ন তাঁরাই করবেন। তাঁদের হাতেই তো রয়েছে মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর।

এক্ষণে এই তরজমা যদি চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার মনের কোণে রূহানী আনন্দ দিয়ে কুরআনের মহাশিক্ষাকে তাঁদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ রূপলাভের সংকল্প জাগিয়ে তোলে আর এই আলোকেই তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন তাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনধারা, তাহলেই এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনাকে আমি সফল ও সার্থক মনে করবো। পবিত্র কুরআনের এক এক হরফে যখন দশ দশ করে নেকী, তখন ইবনে কাসীর শীর্ষক কুরআনের এই সহীহ হাদীস ভিত্তিক বিশুদ্ধতম বিশদ ব্যাখ্যা তাঁদের অন্তরকোণে যে বিপুলভাবে স্পন্দন ও সাড়া জাগাবে এতে আর বিচিত্র কি?

তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচাইতে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। আল্লাহ পাকের লাখো শুকর যে, এর সুষ্ঠ সমাধান কল্পে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ (আংশিক) খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রকাশনা প্রসঙ্গে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং উপর্যুপরী আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। তাফসীর ইবনে কাসীরের একাদশ খণ্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিংশতিতম তথা আমপারা খণ্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে তিনি একান্ত আকস্মিকভাবে গভীর রাতে আশার আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে দূরালাপনীর মাধ্যমে আমার সাথে এই প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করেন। শুধু তাই নয়, তাফসীর ইবনে কাসীরের সুষ্ঠু প্রকাশনার যাবতীয় গুরুদায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। প্রথম দিকে তিনি নাকি ঢাকার বাজার থেকে এর সমস্ত খণ্ডগুলো এক এক করে সংগ্রহ করে সার্বিকভাবে আত্মস্থ করার প্রয়াস চালাতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশিত গ্রন্থের আকারে না দেখতে পেয়ে তিনি মনে মনেই বেদনার্ত হন। অবশেষে তিনি আমার রাজশাহীর বাসায় ৫৮০৭ নং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। একথা আমি আগেই ব্যক্ত করেছি।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন জনাব নূরুল আলম ও মুহাম্মদ মকবুল হোসেন সাহেব। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তাঁরই। কুরআন প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের এই তৎপরতা, উদ্যোগ, কর্মোন্মাদনা এবং অনুপ্রেরণা সর্বক্ষণ অনন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং চির অম্লান হয়ে থাকবে। এই কমিটি কিছু

**সংখ্যক সুহৃদ** ব্যাক্তির আর্থিক অনুদানে ১২, ১৩ ও ১৪ নং খণ্ড **প্রকাশ** করে। অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে আজ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ (আংশিক) খণ্ডগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রকাশনার বেলায় আমি আল্লাহর দরবারে তার জন্যে এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দের, তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নসীব করেন। সুম্মা আমীন!

এই খণ্ডগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। ইতিপূর্বে সব খণ্ডগুলো হয়েছে পারা ভিত্তিক কিন্তু এবার হলো সূরা ভিত্তিক। কারণ প্রতি পারায় সমাপ্তির সাথে সাথে খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলে সূরার একটা চলমান বিষয়বস্তু হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে করে পাঠকের মনের কোণে একটা অস্ফুট অতৃপ্তি ও অব্যক্ত অস্বস্তি বিরাজ করে। এই অতৃপ্তির নিরসন কল্পেই সূরা ভিত্তিক প্রকাশনার অবতারণা। তাই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ (আংশিক) খণ্ডগুলিকে পুনঃর্বিন্যাস করে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারা এক খণ্ডে প্রকাশ করা হল।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং সোল প্রিন্টিং প্রেসের মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয়

দিয়েছেন তা সকল যুগেই দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্তুতি আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

একথা সুস্পষ্ট দিবালোকের মতোই সত্য যে, এই ক্ষণস্থায়ী জগতে কেউ কোনদিন চিরতরে বেঁচে থাকতে আসেনি। একদিন এই মাটির পৃথিবীর সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে আখেরাতের সেই অনন্তলোকে পাড়ি জমাতেই হবে। তখন আমার এই সুঠাম দেহ ও অস্থি পিঞ্জর কবরের মাটিতে মিশে গেলেও তাফসীরুল কুরআনের হরফগুলো কাগজের পাতার উপর চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আরব কবি এই মহাসত্যের প্রতিই ইঙ্গিত জানিয়ে বলেনঃ

يَلُوحُ الخَطُّ فِي القِرْطَاسِ دَهْرًا * وَكَاتِبُهُ رَمِيمٌ فِي التُّرَابِ

অনুরূপভাবে পারস্য কবির সুরে সুর মিলিয়ে একথা বলতে হয়ঃ

روز قیامت هر کسے دردست گیردنامه * من نیز حاضرمی شوم تصویر کتب دربغل

অর্থাৎ রোয হাশরে সবাই তখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে তখন আমার মতো এই দীনহীন আকিঞ্চনের নেক আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমি সেদিন মহান আল্লাহর সম্মুখীন হবো আমার বাহুর নিচে এই সব সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

**বর্তমানে ঃ**
পরিচালক, ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র
৪৭৭, ইষ্ট মিডো এ্যাভ্‌নিউ
ইষ্ট মিডো, নিউইয়র্ক–১১৫৫৪
যুক্তরাষ্ট্র

**বিনয়াবনত**
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

## সূচীপত্রঃ

# ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ)

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফ্সীর শাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, মুয়াররিখ, ফকীহ, ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল পারদর্শিতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই মর-জগতের বুকে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং যেসব মনীষী পবিত্র কুরআন। হাদীস তথা শাশ্বত সুন্নাহ্র বিজয় নিকেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তন্মধ্যে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

## নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর প্রকৃত নাম ইসামঈল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম এবং ইমাদুদ্দীন (ধর্মের স্তম্ভ) তাঁর উপাধি। সুতরাং তাঁর 'শাজরা-ই-নাসাব' বা কুলজীনামাসহ পুরো নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে নিম্নরূপঃ

আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু উমার ইবনু কাসীর ইবনু যাউ ইবনু কাসীর ইবনু যারা,[১] আল-কারশী,[২] আল-বাসারী, আদ্ দিমাশকী।

কিন্তু সাধারণ্যে তিনি ইবনু কাসীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ 'আল-বাসরী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে জন্মস্থান বাচক উপাধি এবং 'আদ্ দিমাশকী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তা'লীম ও তারবি'য়াত বাচক উপাধি।

---

১. এই 'যারা' নামের আরবী অক্ষর বা বানানে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। হাফিয আবুল মাহাসিন তাঁর 'ذَيْل' বা পাদটীকায় ذار দিয়ে এবং আল্লামা ইবনুল ইমাদ তাঁর 'শাযারাতুয যাহাব' গ্রন্থে زار দিয়ে লিখেছেন।

২. আলোচ্য শব্দটি নিয়েও কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর 'দুরারে কামিনাহ' গ্রন্থে এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'যাইলে তাবাকাতিল হুফফায' গ্রন্থে 'আল কাইসী' লিখেছেন। কিন্তু হাফিয তাকী উদ্দিন ইবনু ফাহ্দ তাঁর 'লাহাযুল আলহায' গ্রন্থে, নওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী তাঁর 'আবজাদুল উলূম' গ্রন্থে এবং মুহাম্মদ ইবনু আবদুর রহমান হামযাহ তাঁর 'মুকাদ্দামা'য় 'আলকারশী' উল্লেখ করেছেন। এই শেষোক্ত শব্দটিই শুদ্ধ ও অভ্রান্ত বলে মনে হয়। কারণ 'যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা' মুহাম্মদ নামক ইবনু কাসীরের (রহঃ) দুই পুত্ররত্নের নামের সঙ্গেও এই 'কারশী' শব্দটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সুতরাং পিতা ও পুত্রের 'নিসবাত' যে একই ধরনের হবে এতে আর এমন কী সন্দেহ থাকতে পারে?

ইমাম ইবনু কাসীর ছিলেন এক সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও বিদ্বান পরিবারের সুসন্তান। তাঁর সুযোগ্য পিতা শাইখ আবু হাফ্স শিহাবুদ্দীন উমার (রহঃ) সে অঞ্চলের খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বড় ভাই শাইখ আবদুল ওয়াহাব (রহঃ) ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা আলেম, হাদীস বেত্তা ও তাফসীরবিদ। এমনকি যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন নামক তাঁর পুত্রদ্বয়ও ছিলেন সেকালের বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন হাদীস বেত্তা।

## জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষাঃ

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) সিরীয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বসরার অন্তর্গত মাজদল নামক মহল্লায় ৭০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের সন-তারিখ সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য নেই বটে; কিন্তু তাঁর জন্মের তারিখ-সন নিয়ে তাঁর জীবনীকারদের মাঝে বেশ একটা মতদ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায়। আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ-১৫০৫ খ্রীঃ) তাঁর 'যায়লু তাযকিরাতিল হুফ্ফায' গ্রন্থে, আল্লামা ইবনুল ইমাম হাম্বালী (মৃঃ ১০৮৯ হিঃ-১৬৭৮ খ্রীঃ) স্বীয় 'শাযারাতুয যাহাব' গ্রন্থে [১] ইমাম ইবনু কাসীরের জন্ম সন ৭০০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফিয আবূ মাহাসিন হুসাইনী দিমাশ্কী (মৃঃ ৭৬৫ হিঃ -১৩৬৩ খ্রীঃ) তাঁর 'যাইলু তায্কিরাতিল হুফ্ফায' গ্রন্থে, [২] আল্লামা কাযী শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ-১৮৩৪ খ্রীঃ) 'আল বাদরুত্ তালি' [৩] গ্রন্থে, হাফিয শাইখ শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ-১৩৪৭ খ্রীঃ) স্বীয় 'তায্কিরাতুল হুফ্ফায' [৪] গ্রন্থের উপক্রমণিকায়, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ-১৮৮৯ খ্রীঃ) তাঁর 'আবজাদুল উলূম' [৫] গ্রন্থে ৭০১ হিজরী কিংবা তদুর্ধে বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। [৬] যাই হোক, ইবনু কাসীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন,

---

১. গ্রন্থটি মিসর থেকে ১৩৫১ হিঃ মুদ্রিত। এর পুরো নাম 'শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব'।

২. এটি সমসাময়িককালে দিমাশক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩. এটি মিসর থেকে ১৩৪৮ হিঃ-১৯২৯ খ্রীঃ মুদ্রিত। এর পুরো নাম 'আল বাদরুত তালি বিমাহাসিনে মান বা'দাল কারসিন সাবি'।

৪. এটি দায়িরাতুল মা'আরিফ, হায়দরাবাদ, ডেকান থেকে মুদ্রিত।

৫. এটি ভূপালের সিদ্দীকী প্রেস থেকে ১২৯৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬. হাফিয ইবনু হাজার আল আসকলানী স্বীয় 'দুরারুল কামিনাহ্' গ্রন্থে ৭০০ হিজরী কিম্বা তার কিছু পরের সময় বলে বর্ণনা করেছেন।

একথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিন কিংবা চার বছর বয়সের সময়ে শিশু ইবনু কাসীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৩ হিঃ মুতাবিক ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আবদুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃ বিয়োগের তিন বছর পর ৭০৬ হিজরীতে ভাইয়ের সংগে তিনি তৎকালীন ধন-ঐশ্বর্যের স্বপ্নপুরী বাগদাদ নগরীতে উপণীত হন। এই নগরী তখন শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-গরিমা, সংস্কৃতি-কৃষ্টির মর্মকেন্দ্র হিসেবে সারা বিশ্ব জাহানে শীর্ষস্থানীয়। এই কেন্দ্রবিন্দুতে হাযির হয়ে এখানেই বালক ইবনু কাসীরের জীবনের যাত্রাপথ শুরু হয়। তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম বিন আবদুর রহমান ফাযারী (মৃঃ ৭২৯ হিঃ-১৩২৮ খ্রীঃ)[১] এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌নু কাযী শহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন।[২] তখনকার দিনে একটা চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, কোন শিক্ষার্থী এক নির্দিষ্ট শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করতে চাইলে তাকে সেই শাস্ত্রের কোন এক খানি সংক্ষিপ্ত পুস্তক বাধ্যতামূলকভাবে কণ্ঠস্থ করতে হতো। এ কারণে তিনি শাইখ আবু ইসহাক শীরাযী (মৃঃ ৪৭৬ হিঃ–১০৮৩ খ্রীঃ) কৃত 'আত্‌তামবীহ ফী ফুরুইস শাফীইয়াহ' নামক গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করে ৭১৮ হিজরীতে তা শুনিয়ে দেন। উসূলুল ফিকহের গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনি আল্লামা ইবনু হাজিব মালেকী (মৃঃ ৬৪৬ হিঃ–১২৪৮ খ্রীঃ) কৃত 'মুখতাসার' নামক পুস্তকটি মুখস্থ করেন। এই মুখতাসার গ্রন্থের 'শারাহ' বা ভাষ্য লিখেন আল্লামা শামসুদ্দীন মাহমুদ ইবনু আবদুর রহমান ইসপাহানী (মৃঃ ৭৪৯হিঃ -১৩৪৮ খ্রীঃ)। তাঁর কাছে গিয়েও বালক ইবনু কাসীর (রহঃ) উসূলুল ফিকহের (Principles of Jurisprudence) গ্রন্থমালা অনন্য মনে অধ্যয়ন করেন।[৩] অনুরূপভাবে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি সমকালীন মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে অনন্য মনে হাদীস শ্রবণ করেন। আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় 'যায়লু তায্‌কিরাতিল হুফ্‌ফায' গ্রন্থে বলেন سَمِعَ الْحَجَّارَ وَالطَّبَقَةَ অর্থাৎ 'হাজ্জার এবং তাঁর সমশ্রেণীর মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে তিনি (ইবনু কাসীর) হাদীস শ্রবণ করেন।

১. ইনি 'তাম্‌বীহ' গ্রন্থে ভাষ্যকার এবং জনসাধারণ্যে 'ইবনু ফারকাহ্' নামে প্রসিদ্ধ।

২. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁঃ 'আবজাদুল উলূম' ৩য় খণ্ড (সিদ্দীকী প্রেস ভূপাল, ১২৯৫ হিঃ-১৮৭৮ খ্রীঃ) পৃঃ ৭৮০।

৩. আল্লামা হাজী খলীফাঃ 'কাশফুয যুনূন'।

মুহাদ্দিস হাজ্জার[১] ছাড়া তাঁর সমসাময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইবনু কাসীর একাগ্রচিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ

(১) বাহাউদ্দীন বিন কাসিম বিন মুযাফ্‌ফর বিন আসাকির (মৃঃ ৭২৩ হিঃ-১৩২৩ খ্রীঃ)

(২) শাইখুয যাহিরিয়া আফীফুদ্দীন ইসহাক বিন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃঃ ৭২৫-১৩২৪খ্রীঃ)

(৩) ঈসা ইব্‌নুল মুত্‌ইম।

(৪) মুহাম্মদ বিন যরাদ।

(৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু সুয়াইদী (মৃঃ ৭১১ হিঃ-১৩১১ খ্রীঃ)

(৬) ইবনুর রাযী।

---

১২. হাজ্জার ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস। সমসাময়িক বিশ্ব মুসলিম জাহানে তাঁর শিক্ষাগারের জুড়ি মেলা ভার ছিল। দূর দূরান্ত ও দেশ দেশান্তর থেকে তাঁর পাঠাগারে অসংখ্য অগণিত শিক্ষার্থী এসে অনবরত ভিড় জমিয়ে রাখতো এবং হাদীসের সনদ গ্রহণ পূর্বক স্বীয় জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করে আবার তারা নিজ নিজ দেশাভিমুখে ফিরে যেতো। সর্বসাধারণ্যে তিনি 'ইবনু শাহ্‌না' ও 'হাজ্জার' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গুণবাচক উপাধি ছিল 'মুসনিদুদ দুনিয়া' বা বিশ্ব জাহানের সনদ বর্ণনাকারী ব্যক্তি এবং 'রুহলাতুল আফাক' অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাঁর দিকে মানুষ দিক-দিগন্ত থেকে যাত্রা শুরু করে। তাঁর আসল নাম ছিল আহমাদ, কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবুল আব্বাস, আর লকব ছিল শিহাবুদ্দীন। তাহলে কুলজী বা নসবনামা ছিল নিম্নরূপঃ আহমদ বিন আবি তালিব বিন আবি নয়াম নু'মা বিন হাসান বিন আলী বিন বায়ান মুকরিনী আসসালিহী। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর 'আদ্-দুরারুল- কামিনাহ' গ্রন্থে এবং হাফিয শামসুদ্দীন ইবনু তুলুন اَلْغُرَفُ الْعَلِيَّةُ فِيْ ذَيْلِ الْجَوَاهِرِ الْمُضِيَّةِ গ্রন্থে হাজ্জার সম্পর্কে ব্যাপক ও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর ফিরিস্তি যেমন দীর্ঘ, তেমনি তাঁর হাদীস বর্ণনার সূচীও বেশ লম্বা। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি এত দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, দাদা এবং পৌত্রদেরকে স্বীয় ছাত্র হিসেবে এবং সঙ্গে পড়াবার তিনি সুযোগ লাভ করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দিমাশক নগরী এবং অন্যান্য স্থানে শুধুমাত্র সহীহ বুখারীই তিনি ৭০ (সত্তর) বারের বেশী পড়িয়েছিলেন। হাদীসের হাফিযগণ তাঁর কাছ থেকে নির্বাচিত হাদীসগুলোর সবক নিতেন এবং দূর-দূরান্তর ও দেশ-দেশান্তর থেকে হাদীস শিক্ষার্থে তাঁর কাছে ছুটে আসতেন এবং তাঁদের হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করতেন। অবধারিত মৃত্যুর মাত্র এক দিন আগে মুহিব উদ্দিন ইবনুল মুহিব তাঁর কাছে বুখারী শরীফ শুরু করেন। পরের দিন যুহরের নামায পর্যন্ত বুখারী শরীফের সবক দান চলছিল, এমন সময় আকস্মিকভাবে যুহরের নামাযের অব্যবহিতপূর্বে ৭৩০ হিজরীর ২৫শে সফরে এ প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা হাজ্জার পরলোক গমন করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

(৭) হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মযযী শাফিঈ (মৃঃ ৭৪২ হিঃ -১৩৪১ খ্রীঃ)।[১]

(৮) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমদ ইবনু তাইমীয়া আল হাররানী (মৃঃ ৭২৮ হিঃ - ১৩২৭ খ্রীঃ)।[২]

(৯) আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহবী (মৃঃ৭৪৮ হিঃ - ১৩২৭ খ্রীঃ।[৩]

(১০) আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আস-শীরাযী (মৃঃ ৭৪৯ হিঃ-১৩৪৮ খ্রীঃ)।

হাফিয ইবনু কাসীর (রঃ) উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনু আবদুর রহমান মযযী শাফিঈ (মৃঃ ৭৪২ হিঃ-১৩৪১ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর প্রিয়তমা কন্যার সঙ্গে হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই শুভ বন্ধনের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে এই ওস্তাদ-শাগরিদের পবিত্র সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ-নিবিড় এবং সুদৃঢ় হয়।[৪] সুতরাং এই শ্রদ্ধাস্পদ মহান শিক্ষকের অন্তহীন স্নেহ মমতার ছত্রছায়ায় বহুদিন পর্যন্ত অবস্থান করে তিনি পূর্ণমাত্রায় উপকৃত হয়েছিলেন এবং এই সুবর্ণ সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। বেশ কিছুকাল ধরে তিনি এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তথা স্নেহময় শ্বশুরের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী তাঁর কাছ থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন। এভাবেই তিনি পবিত্র হাদীসের পঠন পাঠন ও অধ্যয়নে সম্পূর্ণতা অর্জন করতে সমর্থ হন।এ প্রসঙ্গে আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ-১৫০৫ খ্রীঃ) বলেনঃ تَخَرَّجَ بِالْمِزِّيِّ وَ لَازَمَهُ وَ بَرَعَ

অর্থাৎ 'হাফিয জামালুদ্দীন মযযীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তিনি বিপুল ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করেন।'[৫]

---

১. এঁর রচিত 'তাহযীবুল কামাল' নামক অনবদ্য গ্রন্থটি হায়দরাবাদ ডেকানের 'দায়িরাতুল মা'আরিফ' প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এর সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

২. এঁর জীবন কথা ও সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্রঃ শিহাবুদ্দীন ফজল উমরীকৃত 'মাসালিকুল আবসার', ইবনু রজব হাম্বালী কৃত 'তাবাকাত', ইবনু শাকির কৃত 'ফওয়াতুল অফিয়াত', শাইখ মারঈ কৃত 'কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ্', নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী কৃত 'আত্তাজুল মুকাল্লাল' (সিদ্দীকী প্রেস ভূপাল, ১২৯৯ হিঃ) পৃঃ ২৮৮।

৩. এঁর 'তাযকিরাতুল হুফফায' নামক অমর গ্রন্থটি হায়দারাবাদ ডেকানের, দায়িরাতুল মা'আরিফ' থেকে মুদ্রিত।

৪. 'আল-বাঈসুল হাসীস' শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীসঃ সম্পাদনাঃ আহমদ শাকিরঃ মুকাদ্দিমাঃ আবদুর রহমান হামযাহ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বাইরুত) পৃঃ ১।

৫. 'যায়লু তাবাকাতিল হুফফায' (দিমাশক প্রেস) পৃঃ ১৯৪।

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনু তাইমীয়ার (মৃঃ ৭২৮ হিঃ-১৩২৭ খ্রীঃ) সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাঁর কাছ থেকেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ-১৪৪৮ খ্রীঃ) বলেনঃ মিসর থেকে ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী[১] এবং ইউসুফ খুতনী[২] প্রমুখ সমসাময়িক মুহাদ্দিসরা তাঁকে হাদীস অধ্যাপনার স্পষ্ট অনুমতি দান করেন। এভাবে মহামতি ইমাম ইবনু কাসীর মুসলিম জগতের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বিভিন্ন উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর ও তারিখের প্রায় সকল শাখায় এমন অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানার্জন করেন যে, সারা মুসলিম জাহানের আহলে সুন্নাহ এবং অন্যান্যদের কাছেও অপ্রতিদ্বন্ধী ইমাম হওয়ার গৌরবময় আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হন। তাঁর অপরিতৃপ্ত ও অনন্য সাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান-পিপাসা, অসাধারণ ধীশক্তি, অপরিসীম বিদ্যাবত্তা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে শৈশব এবং কৈশোর থেকেই। হাদীস ও তাফসীর ছাড়া ফিকাহ, অসূলে ফিকাহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, তারীখে ইসলাম প্রভৃতিতেও তিনি সমান দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আল্লামা হাফিয ইবনুল ইমাদ হাম্বালী (মৃঃ ১০৮৯ হিঃ-১৬৭৪ খ্রীৎ) ইবনু হাবীব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

اِنْتَهَتْ اِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْعِلْمِ فِى التَّارِيْخِ وَ الْحَدِيْثِ وَ التَّفْسِيْرِ

১. সম্ভবতঃ এঁর পুরো নাম হাফেজ আমিনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম ওয়ানী (মৃঃ ৭৩৫ হিঃ- ১৩৩৪ খ্রীঃ)। আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় 'যায়লু তাযকিরাতিল হুফফায' গ্রন্থে এঁর জীবন কথা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং তাঁকে হাদীসের হাফিয রূপে আখ্যায়িত করেন। আল্লামা হাফিয আবদুল কাদের কারশী (মৃঃ ৭৭৫ হিঃ-১৩৭৩ খ্রীঃ) তাঁর কাছে হাদীস শরীফের সবক গ্রহণ করেন এবং স্বীয় 'জওয়াহিরুল মজিয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়া' গ্রন্থে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁকে اَلْاِمَامُ الْمُحَدِّثُ নামক অনুপম উপাধিতেও ভূষিত করেন।

২. ইনি মিসরের তদানীন্তন প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা বদরুদ্দীন ইউসুফ ইবনু উমার খুতনী। স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে তিনি 'মুসনাদুল বিলাদিল মিসরিয়াহ' উপাধিতে ভূষিত হন। 'আলী ইসনাদে' (যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনা সূত্রে মাধ্যম অতি অল্প) সত্যিই তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। তিনি ৭৩১ হিঃ মুতাবিক ১৩৩০ খ্রীঃ ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকী, আহমদ দিম্ইয়াতী এবং হাফিয আবদুল কাদির কারশীর তিনি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন। এই শেষোক্ত মুহাদ্দিস অর্থাৎ হাফিয কারশী স্বীয় 'জওয়াহিরুল মজিয়াহ' গ্রন্থে অতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ করেন।

'ইসলামের ইতিহাস, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল রাজত্ব তাঁর কাছে গিয়েই শেষ সীমান্তে উপনীত হয়েছে।'[১]

প্রথিতযশা ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল মাহাসিন জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন সাইফুদ্দীন বিনু তাগরীবিরদী (মৃঃ ৮৭৪ হিঃ -১৪৬৯ খ্রীঃ) اَلْمَنْهَلُ الصَّافِىْ الْمُسْتَوْفِىْ بَعْدَ الْوَا নামক গ্রন্থে বলেনঃ

وَكَانَ لَهُ اِطِّلَاعٌ عَظِيْمٌ فِى الْحَدِيْثِ وَ التَّفْسِيْرِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَرَبِيَّةِ

অর্থাৎ হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।[২] অনুরূপভাবে হাফিয আবুল মাহাসিন হুসাইনি দিমাশ্‌কী (মৃঃ ৭৬৫ হিঃ-১৩৬৩ খ্রীঃ) তাঁর 'যাইলু তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায নামক গ্রন্থে বলেনঃ

وَبَرَعَ فِى الْفِقْهِ وَ التَّفْسِيْرِ وَ النَّحْوِ وَ اَمْعَنَ النَّظَرَ فِى الرِّجَالِ وَ الْعِلَلِ

অর্থাৎ ফিকাহ শাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীসের 'রিজাল' (রাবী বা বর্ণনাকারীগণ) ও হাদীসের 'ইলাল' (রাবীদের বর্ণনা সূত্রের প্রছন্ন দোষ-ত্রুটি নির্ণয়) প্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ম ও গভীর।

হাদীস শাস্ত্রে এই অগাধ জ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টির কারণেই তিনি পরবর্তীকালে 'হুফ্‌ফাযুল হাদীস' নামক উঁচু দরের হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের পর্যায়ভুক্ত হতে পেরেছিলেন। শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামযাহ বলেনঃ

"وَلَقَدْ كَانَ لِلْاِمَامِ ابْنِ كَثِيْرٍ حَيَاةٌ عِلْمِيَّةٌ حَافِلَةٌ بِالْجُهْدِ فِى التَّحْصِيْلِ وَ التَّصْنِيْفِ فِىْ عَصْرٍ مَمْلُوْءٍ بِالْاَكَابِرِ مِنْ عُلَمَاءِ النَّقْلِ وَ الْعَقْلِ كَمَا سَتَقِفُ عَلٰى ذَالِكَ (اَلْبَاعِثُ الْحَثِيْثُ)"

'নিঃসন্দেহে ইমাম ইবনু কাসীর সারা জীবন ধরে জ্ঞান চর্চা করেছেনঃ এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি পরিশ্রম কম করেননি। অথচ এমন যুগে তিনি

১. হাফিয ইবনুল ইমাদঃ 'জওয়াহিরুল মজিয়াহ্' ফী তাবাকাতিল হানাফীয়া'ঃ হায়দরাবাদ ডেকান, দায়িরাতুল মা'আরিফ প্রেস, ১৩৩২ হিঃ পৃঃ ১৩৯।

২. আবুল মাহাসিন জামালুদ্দীন তাগরীবিরদীঃ 'আল মানহালুস সাফী'ঃ পৃঃ ৩৪৫; হাজী খলীফাঃ 'কাশফুয যুনূন'ঃ Edited by Gustav Flugel; Leipzig: (1835) p.42-49; Also see: ``Wafayat-al Ayan' by ibn Khallikan No. 28 Gottingen, 1835; হাফিয শামসুদ্দীন যাহবী 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খণ্ডঃ Edited by sayid Mustafa Ali: Hyderabad, India, 1330: `The Encyclopaedia of Islam': Edited by A.G. Wensink, Vol, 11 Part 1 Sup pl l (Luzac & Co. London, 1934) p.393,

জন্ম নিয়েছিলেন যখন হাদীস, তাফসীর ও অন্যান্য শাস্ত্রের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের কোনই অভাব ছিল না।[১]

হাফিয শামসুদ্দীন যাহবী স্বীয় 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' নামক অনবদ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশিষ্ট হাদীস, অধ্যাপকমণ্ডলীর পরিচয় প্রদানকালে ইমাম ইবনু কাসীরের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। অতঃপর হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ-১৫০৫ খ্রীঃ) স্বীয় 'যাইলু তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে ইবনু কাসীরের বিস্তৃত জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং আল্লামা আবুল মাহাসীন হুসাইনীও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।[২]

## কাব্য চর্চায় ইবনু কাসীর (রহঃ)ঃ

ইমাম ইবনু কাসীর কাব্য রচনায় ছিলেন পারঙ্গম ও সিদ্ধহস্ত। তাঁর স্বরচিত কবিতামালা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠায় বিচ্ছিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে আমরা তাঁর কবিতা থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছিঃ

تَمُرُّ بِنَا الْاَيَّامُ تَتْرٰى وَ اِنَّمَا * نُسَاقُ اِلَى الْاٰجَالِ وَ الْعَيْنُ تَنْظُرُ

দিনের পর দিন অতীতের অন্তহীন পথে বিলীন হতে চলেছে, আর আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

فَلَا عَائِدٌ ذَاكَ الشَّبَابُ الَّذِىْ مَضٰى * وَ لَا زَائِلٌ هٰذَا الْمَشِيْبُ الْمُكَدَّرُ

অতিক্রান্ত জীবন যৌবন কোন দিনই ফিরে পাবার নয়, আর এই ক্লেদযুক্ত বার্ধক্যও আদৌ দূরে সরার নয়।[৩]

শেষের চরণটিতে ذَاكَ الشَّبَابُ স্থলে صَفْوُ الشَّبَابِ হলে খুব ভাল হতো।

---

১. শাইখ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক হামযাহঃ 'আল-বাইসুল হাদীস' গ্রন্থের উপক্রমণিকাঃ পৃঃ ১৩।

২. হাফিয আবুল মাহাসিন হুসাইনী দিমাশকীঃ 'যাইলু তাযকিরাতুল হুফ্ফায'ঃ (দিমাশক থেকে মুদ্রিত) পৃঃ ১৮৪; হাজী খলীফাঃ 'কাশ্ফুয যুনূন'ঃ পৃঃ ২৩৪, মুহাম্মদ শফী এম, এ, ডি, ও, এল, (পাঞ্জাব) সম্পাদিত 'দায়িরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া'ঃ '১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৬৫৪; ডঃ মুহাম্মাদ হুসাইন আয্যাহবীঃ 'আত্তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন' ঃ ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ (১৯৭৬ খ্রীঃ) পৃঃ ২৪২-৪৩, আল্লামা শাইখ দাউদীঃ 'তাবাকাতুল মুফাস্সিরূন'ঃ পৃঃ ৩২৭।

৩. নওয়াব সিদ্দিকী হাসান খাঁ ভূপালীঃ 'আবজাদুল উলূম'ঃ ৩য় খণ্ড (সিদ্দীক প্রেস ভূপাল) পৃঃ ৭৮০; 'তাফসীর ইবনু কাসীর' উর্দু অনুবাদের শুরুতে মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানীর ভূমিকাঃ পৃঃ ৪; মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী কৃত 'ইবনু কাসীর' শীর্ষক প্রবন্ধঃ মাসিক 'তরজমানুল হাদীস' ১ম সংখ্যাঃ পৃঃ ৩১।

## ইমাম ইবনু কাসীরের প্রতি সমসাময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

একবার হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকীকে (মৃঃ ৮০৬ হিঃ- ১৪০৩ খ্রীঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ 'ইমাম মুগলতাঈ (৭৬২ হিঃ-১৩৬০ খ্রীঃ), ইমাম ইবনু কাসীর, ইবনু রাফে, হাফিয হুসাইনী এই চারজন সমসাময়িক মনীষীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? আল্লামা হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ এঁদের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় জ্ঞানে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী হলেন আল্লামা মুগলতাঈ, হাদীসের মূল অংশ ও ইতিহাস সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হচ্ছেন ইমাম ইবনু কাসীর, আর হাদীস শাস্ত্রের অনুসন্ধান বিশারদ এবং বিভিন্ন প্রকারের হাদীস সম্পর্কে অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হচ্ছেন ইবনু রাফে এবং স্বীয় উস্তায, সমসাময়িক মুহাদ্দিস ও হাদীসের বর্ণনা সূত্র সম্পর্কে অধিক অবহিত হলেন হাফিয হুসাইনী দিমাশকী (মৃঃ ৭৬৫ হিঃ-১৩৬৩ খ্রীঃ)।

হাফিয শামসুদ্দীন যাহবী (মৃঃ৭৪৮ হিঃ-১৩৪৭ খ্রীঃ) তাঁর 'আল-মুজামুল মুখতাস' এবং 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে বলেনঃ

'ইবনু কাসীর একজন খ্যাতনামা মুফ্তী (ফতওয়া প্রদানে বিশেষজ্ঞ), বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরকার এবং রিজাল শাস্ত্রে[১] বিশেষ পারদর্শী। হাদীসের মতন (মূল অংশ) সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদীসের তাখ্রিজ (অজ্ঞাত, অখ্যাত সনদকে খুঁজে

১. অর্থাৎ হাদীস সংগ্রহ বিজ্ঞান। বিভিন্ন কালে স্বার্থান্ধ ও মিথ্যা ভাষীরা রাসূলের বাণী বলে যেসব স্বরচিত মতামত প্রচারের প্রয়াস পেয়েছে, মুহাদ্দিসগণ অতি কষ্টে সৃষ্টে সেগুলো সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই মনগড়া হাদীসের প্রাচুর্য দেখে প্রত্যেক হাদীস সংকলয়িতার এটাই প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, যেসব রাবী (বর্ণনাকারী) আঁ- হযরতের মুখ-নিঃসৃত বাণী সূত্র পরম্পরায় তাঁর কান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁরা কি প্রত্যেকেই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিশস্ত ও সন্দেহ বিমুক্ত বলে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন? অনুরূপভাবে তাঁদের মধ্যে কে বিশ্বাসপরায়ণ, কে অবিশ্বস্ত, কে সন্দেহ বিমুক্ত এবং সন্দেহযুক্ত এটাও বিচার্য বিষয়। এরূপে হাদীসের সত্যাসত্যতা বিচারকল্পে রাবীগণের জীবন রচিত সম্বলিত যে একটি বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠে, সেটাই রিজাল শাস্ত্র। বস্তুতঃ এই হাদীস সংগ্রহ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণকে যে শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, রাবীগণের জীবন চরিত সংগ্রহের ব্যাপারে আরও অধিক কষ্ট অকাতরে স্বীকার করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের বিচার বিশ্লেষণমান ছিল অত্যন্ত কঠোর ও নিখুঁত। এ কারণেই লক্ষ লক্ষ হাদীস মুহাদ্দিসগণের সংকলন গ্রন্থ থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই লক্ষাধিক হাদীসকে যাচাই-বাছাই করে শুধুমাত্র নির্ভুল ও অকাট্য প্রমাণিত হাদীসগুলোকে সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা বেশ একটা দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। রাবী বা বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে এই যুক্তি ভিত্তিক আলোচনা 'রিজাল শাস্ত্র' নামে আবহমানকাল বিশ্ব মুসলিমের কাছে অতীত ঐতিহ্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে রয়েছে।

বের করেছেন, আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন, গ্রন্থরাজি রচনা করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন।[১]

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইবনু কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ 'তিনি হাদীসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম, বক্তৃতায় সুনিপুণ এবং বহু গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী।'

আল্লামা শাইখ ইবনুল ইমাদ হাম্বালী (মৃঃ ১০৮৯ হিঃ- ১৬৭৮ খ্রীঃ) ইমাম ইবনু কাসীর (রঃ) কে 'আল হাফিযুল কাবীর' বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর বলে আখ্যায়িত করেন।[২]

অনুরূপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইবনুল হজ্জি (মৃঃ ৮১৬ হিঃ-১৪১৩ খ্রীঃ) স্বীয় শ্রদ্ধাষ্পদ উস্তাদ (ইবনু কাসীর) সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেনঃ

أَحْفَظُ مَنْ أَدْرَكْنَاهُ لِمُتُوْنِ الْأَحَادِيْثِ وَ أَعْرَفُهُمْ بِجَرْحِهَا وَ رِجَالِهَا وَ صَحِيْحِهَا وَ سَقِيْمِهَا وَ كَانَ أَقْرَانُهُ وَ شُيُوْخُهُ يَعْتَرِفُوْنَ لَهُ بِذٰلِكَ وَ مَا أَعْرِفُ أَنِّيْ اجْتَمَعْتُ بِهِ عَلٰى كَثْرَةِ تَرَدُّدِيْ إِلَيْهِ إِلَّا وَ اسْتَفَدْتُّ مِنْهُ ـ

'আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি (ইবনু কাসীর) হাদীসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে, হাদীস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ-দুর্বল হাদীস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সমসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমতে গিয়ে

১. হাফিয যাহবীঃ 'আল মুজামুল মুখতাস' এবং তাযকিরাতুল হুফ্ফায' (দারিয়াতুল মা'আরিফ প্রেস, হায়দরাবাদ ডেকান); আল্লামা ইবনুল ইমাদঃ 'শাযারাতুয-যাহাব'ঃ ষষ্ঠ খণ্ডঃ পৃঃ ২৩১-২৩৩; আল্লামা দাউদীঃ 'তাবাকাতুল মুফাস্সিরীনঃ পৃঃ ৩২৭।

২. আবদুল হাই ইবনুল ইমাদঃ 'শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারে মান্ যাহাব' ঃ ষষ্ট খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ২৩৮; ইবনু কাসীরঃ 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' (মাজেদীয়া প্রেস, মক্কা মুকাররামাঃ ১৩৫৩ হিঃ)-এর শুরুতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রায্যাক হামযাহ কৃত 'হায়াতুল ইমাম ইবনু কাসীর' শীর্ষক উপক্রমণিকাঃ পৃঃ ১৪, ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন আয্যাহবীঃ আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন'ঃ ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ (দারুল কুতুবিল হাদীসাহ ( ১৯৭৬ সাল) পৃঃ ২৪৩; হাফিয ইবনু হাজারঃ 'আদ্দুরারুল কামিনা'ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৪।

উপনীত হয়েছি, কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি।[১] আল্লামা হাফিয উবনু নাসিরুদ্দীন আদ্-দিমাশকী (মৃঃ ৮৪২হিঃ-১৪৩৮ খ্রীঃ) তাঁর (ইবনু কাসীরের) প্রসঙ্গে বলেনঃ

اَلشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّيْنِ ثِقَةُ الْمُحَدِّثِيْنَ عُمْدَةُ الْمُؤَرِّخِيْنَ عَلَمُ الْمُفَسِّرِيْنَ -

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের নির্ভর, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা'।[২] হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হিঃ)[৩] তাঁর 'আদ্দুরারুল কামীনা' গ্রন্থে বলেনঃ

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরীঃ 'ইমাম ইবনু কাসীর' শীর্ষক প্রবন্ধঃ মাসিক 'তরজমানুল হাদীস'ঃ ১১শ বর্ষঃ ১ম সংখ্যাঃ পৃঃ ৩২; ইমাম ইবনু কাসীর কৃত 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস'-এর ব্যাখ্যা 'আল বাইসুল হাসীস'-এর শুরুতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রায্যাক হামযাহকৃত 'হায়াতুল ইমাম ইবনু কাসীর' শীর্ষক উপক্রমণিকা (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বাইরুত, ১৯৫১) পৃঃ ১৬; আল্লামা কিনানীঃ 'আর্‌রিসালাতুল মুসতাতরাফা' পৃঃ ১৪৬।

২. আল্লামা ইবনু নাসীরুদ্দীন দিমাশ্‌কীঃ 'আর-রাদ্দুল ওয়াফিরঃ পৃঃ ২৬৯; ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন আয্‌যাহাবীঃ 'আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরূন' ১ম খণ্ডঃ ২য় সংস্করণ (পুর্বোক্ত) পৃঃ ২৪২-৪৩।

৩. হাজার তার পিতৃপুরুষের নাম। ৭৭৩ হিঃ মিসরের মাটিতে তাঁর জন্ম। ৪ বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগের পর কুরআন হিফ্য ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। ১১ বছর বয়সে হজ্জ পালনার্থে মক্কা শরীফ গিয়ে সেখানে বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থাদি পাঠ করেন। ৮০২ হিজরীতে গিয়ে কাসেম, হাজ্জার এবং তাকিউদ্দীন সুলাইমান প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করে তা বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। অতি শৈশব থেকেই তাঁর অনন্য মেধাশক্তির বিকাশ ঘটে। ৮২৭ হিজরী থেকে নিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর্যন্ত তিনি কায়রো ও তৎপার্শ্বস্থ দেশসমূহের কাযী পদে নিয়োজিত থাকেন। এছাড়া জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্মীয় বিদ্যা-বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের প্রচার, প্রসার, অধ্যাপনা, গ্রন্থ সংকলন ও ফতওয়া প্রদান কার্যে অতিবাহিত করেন। প্রসিদ্ধ মাহমূদিয়া গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান, জামে' আযহার প্রভৃতির খতীব এবং কায়রোর বড় বড় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা নিকেতনে বহুকাল ধরে তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা দেড়শতেরও অধিক। অধিকাংশ গ্রন্থ হাদীস, রিজাল শাস্ত্র ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় হলেও তন্মধ্যে এমন বহু সংকলন রয়েছে, যাতে আরবী সাহিত্য, ফিকাহ শাস্ত্র, উসূল, কালাম প্রভৃতি নানারকম বিদ্যার রয়েছে অপূর্ব সমাবেশ। তাঁর এই দেড় শতাধিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ বুখারীর ভাষ্য 'ফাতহুল-বারী'ই হচ্ছে অনবদ্য অবদান। (অপঃপৃঃ বাকী অংশ)

وَ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيْثِ مُطَالَعَةً فِى مُتُونِه وَ رِجَالِه وَ كَانَ كَثِيْرُ الْاِسْتِحْضَارِ حُسْنُ الْمُفَاكِهَةِ صَارَتْ تَصَانِيْفُهُ فِى حَيَاتِه وَ انْتَفَعَ النَّاسُ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِه وَ لَمْ يَكُنْ عَلٰى طَرِيْقِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِى تَحْصِيْلِ الْعَوَالِىْ وَ تَمْيِيْزِ الْعَالِىْ مِنَ النَّازِلِ وَ نَحْوِ ذَالِكَ مِنْ فُنُوْنِهِمْ وَ اِنَّمَا هُوَ مِنْ مُحَدِّثِى الْفُقَهَاءِ وَ اَجَابَ السُّيُوْطِى عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ "اَلْعُمْدَةُ فِى عِلْمِ الْحَدِيْثِ عَلٰى مَعْرِفَةِ صَحِيْحِ الْحَدِيْثِ وَ سَقِيْمِه وَ عِلَلِه وَ اخْتِلَافِ طُرُقِه وَ رِجَالِه جَرْحًا وَ تَعْدِيْلًا وَ اَمَّا الْعَالِىْ وَ النَّازِلُ وَ نَحْوُ ذَالِكَ: فَهُوَ الْفَضْلَاتُ لَامِنْ اُصُوْلِ الْمُهِمَّةِ اه"

অর্থাৎ 'হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর আর তিনি রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজি চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে'।

এ পর্যন্ত হাফিয ইবনু হাজার তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি কিছুটা সমালোচকের ভূমিকাও পালন করেছেন। এ করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

---

এই বিশ্ব বিশ্রুত মহাগ্রন্থখানি হাফিয আসকালানী (৮১৭ হিঃ) লিখতে শুরু করেন। দীর্ঘ ২৫ বছরের একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তার অমৃত ফল হিসেবে এই মহামূল্য গ্রন্থটি সমাপ্ত করে তিনি তদানীন্তন মুসলিম জাহানকে উপহার দিতে সমর্থ হন। এই অবিস্মরণীয় অনবদ্য রচনার পরিসমাপ্তি উপলক্ষে হাফিয ইবনু হাজার স্বয়ং পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে দেশস্থ আপামর জনসাধারণকে ওলিমার দাওয়াত দেন। আমন্ত্রিত হাজিরান মজলিসে বড় বড় উলামায়ে কিরামের খিদমতে তিনি এই শ্রেষ্ঠ কীর্তি পেশ করেন। উপস্থিত রাজা-বাদশাহগণ সুবর্ণ মুদ্রায় ওজন করে তাঁর এই মহামূল্য গ্রন্থটি খরিদ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনার কিছুকাল পরই স্বনামধন্য গ্রন্থকার উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে আখেরাতের অবিনশ্বরলোকে যাত্রা করেন।

'হাদিউস সারী' বা 'মুকাদ্দামাতুল ফাতহ' নামক 'ফাতহুল বারীর' একখানি তথ্যসমৃদ্ধ ও গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা তিনি ইতিপূর্বেই রচনা করেছিলেন। (দ্রঃ মৎপ্রণীত 'ইমাম বুখারীঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১৯৭৯)।

ইবনু কাসীর সনদ বা বর্ণনাসূত্রে পরম্পরের মধ্যে আলী ও নাযিলের[১] মাঝে তেমন কোন পার্থক্য প্রদর্শন করেন না। অনুরূপভাবে মুহাদ্দিস সুলভ এ ধরনের অন্যান্য শিল্প, শাস্ত্র ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিও তিনি এতটা উৎসাহী ছিলেন না। সুতরাং তাঁকে ফকীহগণের মুহাদ্দিস বলা যেতে পারে।'

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন নিম্নরূপঃ 'আমি বলি, হাদীস শাস্ত্রের মুখ্য বস্তু হচ্ছে বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস, বর্ণনাসূত্রের সূক্ষ্মতম দোষ-ত্রুটি, বিভিন্ন রকমের বর্ণনাসূত্র সম্পর্কে অবগতি এবং রিজাল বা চরিত অভিধান-শাস্ত্র অর্থাৎ রাবীদের ভাল মন্দ হওয়ার ব্যাপারে সম্যক পরিচিতি ইত্যাদি। এছাড়া সনদের 'আলী' কিংবা 'নাযিল' হওয়া-এগুলো হচ্ছে একটা অতিরিক্ত ব্যাপার, মুখ্য বস্তু নয়।'

প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা আল্লামা যাহিদ বিন হাসান[২] আল-কাওসারী (মৃঃ ১৩৭১ হিঃ-১৯৫১ খ্রীঃ) ছিলেন কায়রোর একজন খ্যাতিমান আলেম ও মুহাদ্দিস এবং উসমানী শাসনামলের একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। তিনিও এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

'হাফিয ইবনু কাসীর যদিও হাদীসের 'মতন' মুখস্থ করার ব্যাপারে ছিলেন বেশী অভ্যস্ত, তবুও তাঁর কাছ থেকে এটা কোন দিনই প্রত্যাশা করা যায় না যে, তিনি রাবীদের স্তরসমূহে ভেদ-নীতির কোন ধার ধারতেন না। অবশ্য তিনি এ কাজটি ভালভাবেই করতেন। রাবী বা বর্ণনাকারীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'আলী' ও 'নাযিল'-এর মাঝে পার্থক্য তিনি অবশ্যই করতেন। এই ভেদ-নীতি ও পার্থক্যের ব্যাপারটা তো ঐ সব মুহাদ্দিসের কাছেও গোপন থাকে না যাঁরা ইবনু কাসীর অপেক্ষা অনেক নিম্ন স্তরের। আর বিশেষ করে শাইখ জামাল

---

১. হাদীসের যে সনদ বা বর্ণনারসূত্র পরম্পরায় রাবীদের সংখ্যা অল্প হয় তাকে 'আলী সনদ' বলা হয়। আর যেসূত্র পরম্পরায় রাবীদের সংখ্যা বেশী হয় তাকে 'নাযিল' বলে। ফকীহগণ মাসয়ালা নিরূপণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র হাদীসের 'মতন' বা মূল অংশের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকেন। সনদ বা সূত্র পরম্পরার প্রতি তাঁরা ততটা ভ্রূক্ষেপ করেন না। সনদকে তাঁরা শুধু এতটুকুই মূল্য দিয়ে থাকেন যেন তার প্রতিটি রাবীই বিশ্বাসভাজন ও গ্রহণযোগ্য হন। পক্ষান্তরে, মুহাদ্দিসগণের কাছে এর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বেশী। সনদের মধ্য থেকে একটি মাত্র রাবীর সংখ্যা যদি কম করা সম্ভব হয় তবে এজন্যে দীর্ঘ পথের পরিক্রমা তাঁদের কাছে আরও প্রশংসনীয়। মুহাদ্দিসগণের জীবনে এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ভুরি ভুরি নজীর আমরা পেয়ে থাকি। (মৎ প্রণীত 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)

২. মৎ প্রণীত 'ইমাম মুসলিম' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৭৯ পৃঃ ৪৮)।

ইউসুফ ইবনুয্ যাকী আল মিয্যী (মৃঃ ৭৪২হিঃ- ১৩১৪ খ্রীঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যখন বহুদিন ধরে তিনি তাঁর কাছে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর 'তাহযীবুল কামাল' নামক গ্রন্থটি নিষ্ঠা ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্দ্ধনসহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করে ছিলেন'।[১]

ঐতিহাসিকগণও ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ)-এর সর্বতোমুখী প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল ইমাদ (মৃঃ ১০৯৮ হিঃ- ১৬৭৮ খ্রীঃ) বলেনঃ

يُشَارِكُ فِي الْعَرَبِيَّةِ يَنظِمُ نَظْمًا وَ سَطًا اهـ كَانَ كَثِيرُ الْاِسْتِحْضَارِ قَلِيلُ النِّسْيَانِ جَيِّدُ الْفَهْمِ-

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বস্তুকে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হতো। আর তিনি মেধাবীও কম ছিলেন না।[২] আরবী সাহিত্যও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতাও তিনি রচনা করতেন'।

## শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদান, আল্লাহর গুণগান ও রসিকতাঃ

ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন গ্রন্থ রচনা, ফতওয়া প্রদান এবং অধ্যাপনার মহান পেশায়। তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তেকালের (৪৭৮ হিঃ-১৩৪৭ খ্রীঃ) পর তিনি দিমাশকের সুপ্রসিদ্ধ 'উম্মু সাহিল' ও 'তান্‌কযিয়াহ' নামক শিক্ষায়তনে হাদীস অধ্যাপনার মহান পদে অভিষিক্ত হন। এ সময়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আল্লাহর গুণগান ও যিক্‌র আয্‌কারে মাশগুল থাকতেন।[৩] জীবনে তিনি এত ফতওয়া প্রদান করেছেন যে, সেগুলো পৃথক গ্রন্থকারে সংকলিত হতে পারে।

---

১. আল্লামা মুহাদ্দিস যাহিদ আল-কাউসারীঃ 'যুয়ূল তাযকিরাতিল হুফ্ফাযে'র তা'লিকাত'।

২. আল্লামা ইবনুল ইমাদ হাম্বালীঃ 'শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান্ যাহাব' (১৩৫১ হিঃ মিসর থেকে মুদ্রিত) পৃঃ ১৯৭।

৩. 'ইবনু কাসীর উর্দু তাফসীর'ঃ '১ম খণ্ডের শুরুতে মাওলানা আবদুর রশীদ নোমানী কৃত 'হায়াতু ইবনু কাসীর' (নুর মুহাম্মদ, তিজারাতু কুতুব করাচী, আরামবাগ) পৃঃ ৬; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানঃ 'আবজাদুল উলূম'ঃ ৩য় খণ্ড (পূর্বোক্ত) পৃষ্ঠা ৭৮০; হাজী খলীফাঃ 'কাশফুয্ যুনূন' (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২৩৪, মুহাঃ শফী এম, এ, ডি,ও,এল, সম্পাদিতঃ 'দায়িরায়ে মাআ'রিফে ইসলামীয়া'ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৪৫৪।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু হাবিব বলেনঃ إِمَامُ ذِى التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ তিনি সদা প্রফুল্ল চিত্ত, খোশ মেজাজ ও খোশ্ আখলাক ব্যক্তি ছিলেন। কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার সময়ে তিনি সরস ও মূল্যবান উপমা ও দৃষ্টান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আস্‌কালানী তাঁর কিছুটা সমালোচনা[১] করলেও বারবারই তাঁর ভূয়সী প্রশংসায় মুখর হয়েছেন এবং তাঁকে 'হুসনুল মুফাকাহা' বা 'উত্তম রসিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ-১৪০৩ খ্রীঃ)[২] ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে আল্লামা শাইখ আলাউদ্দীন ইবনু তুর্কমানীর[৩] বিশিষ্ট শাগরিদ এবং তাঁরই লালিত পালিত মন্ত্রশিষ্য। তিনি শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকীউদ্দীন সুবকীর[৪] শিক্ষাকেন্দ্রে যখন উপস্থিত হন, তখন শাইখুল ইসলাম তাঁকে সমাদরে সসম্মানে বসিয়ে এবং উপস্থিত সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাঁর বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তখন ইমাম ইবনু কাসীর বলেনঃ আমার তো মনে হয় যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রৌদ্রতপ্ত (মাউন মুশাম্মাস) পানি দ্বারা অজু করার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, ইনি সেই হাদীসটিই হয়তো খুঁজে বের করতে পারবেন না।

---

১. 'কাশফুয্যুনূন' লেখক মোল্লা কাতিব চাল্‌পী, ইবনু হাজার সম্পর্কে মন্তব্য করেনঃ

كان قلم ابن حجر سنيا فى مَثَالِب الناس و لسانه حسنا و ليته عكس ليبقى الحسن

(كشف الظنون و ضمن الجواهر و الدرر)

২. ইনি 'তাকরীবুল আসানীদ' এবং 'যাইলু জামেউত তাহসীল' নামক কিতাবদ্বয়ের লেখক। প্রথমোক্ত গ্রন্থটির ৮ খণ্ডে শারাহ লিখে প্রকাশ করেন তারই পুত্র আবূ যুরআ' ইরাকী। আর শেষোক্তটির ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর অপর পুত্র ওয়ালী উদ্দীন ইরাকী। তিনি 'যাইনুল মীযান' নামেও ইমাম যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের দুই খণ্ডে পরিশিষ্ট লিখেছেন। এছাড়া তিনি আহমদ বিন আইবাক দিময়াতী কৃত রাবীদের জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধীয় কিতাবের আরও একটি পরিশিষ্ট লিখেছেন। 'আলফিয়া', 'তাখরীজে আহাদিসে ইয়াহিয়াউল উলূম, প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি লেখক। তাঁর পুরো নাম আবদুর রহীম বিন সুলাইমান শাফিঈ। (নূর মুহাম্মদ আজমীঃ 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস'ঃ পৃঃ ১৩৪)।

৩. ইনি 'আল-জওহারুন নাকী ফীরাদ্দি আলাল বায়হাকী' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ৭৬৩ হিঃ- ১৩৬১ খৃঃ মৃত্যু।

৪. ইনি বহু দিন ধরে মিশরের প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'শিফাউস সাকাম' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের তিনি লেখক। ৭৫৬ হিঃ-১৩৫৫ খৃঃ মৃত্যু।

## আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কঃ

ইবনু কাসীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইবনু তাইমিয়ার[১] সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিড় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্তাদের প্রভাববিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ় ভাবে। ইবনু কাসীর অধিকাংশ মাস্য়ালায় হাফিয ইবনু তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইবনু কাযী শাহাবা স্বীয় 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেনঃ

১. এই স্বনাম ধন্য মনীষীর নাম আহমদ বিন আবদুল হালীম, উপনাম আবুল আব্বাস, তাকীউদ্দীন তাঁর জনপ্রিয় উপাধি এবং ইবনু তাইমিয়া নামে তিনি সবার কাছে সুপরিচিত। তাইমিয়া ছিল আসলে তাঁর পিতামহের মায়ের নাম। তিনি অতি শিক্ষিতা ও বিদুষী মহিলা ছিলেন। এঁর নামের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে তিনি ইবনে তাইমিয়া নাম ধারণ করেন। যয়নাব নামেও আরও একজন উচ্চ শিক্ষিতা বিদুষী মহিলার কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১২৬৩ খ্রীঃ দিমাশ্কের নিকট হার্রান নামক স্থানে তাঁর জন্ম। তিনি শৈশব থেকেই ছিলেন অনন্য প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী। অল্প বয়সেই তাফসীর, হাদীস, আদব, দর্শন ফিকাহ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। শৈশব ও কৈশোর থেকেই তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী এই অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তি দেখে বিমুগ্ধ হতেন। বিজ্ঞ পিতার ইন্তিকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত শিক্ষায়তনে উত্তরাধিকার সূত্রে অধ্যাপনার দায়িত্বভার অর্পিত হয় সুযোগ্য সন্তান ইবনে তাইমিয়ার উপর। তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তবে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি পদ অলংকৃত করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি শুধু সাধারণ বিদ্যাবত্তা এবং সকল শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারীই ছিলেন না বরং মসির সঙ্গে অসি চালনার ক্ষেত্রেও তিনি সুদক্ষ সৈনিক ছিলেন। এভাবে শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থাতেই তিনি জাতির মূল্যবান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিদানে জাতি তাঁর প্রতি চালিয়েছে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। তিনি একাধিকবার কারারুদ্ধ হন। এমন কি বন্দীশালায় তাঁর দুই ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বহুদিন পর্যন্ত বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। বন্দী যুগে তাইমিয়া কুরআন মজীদের বিশিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর লিখতে এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী প্রনয়ণ ও সংকলন করতে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু এতেও নিষেধাজ্ঞা হলে তিনি কয়লা দ্বারা লেখা সমাপ্ত করেন। এভাবে তাঁর প্রায় ত্রিশাধিক গ্রন্থাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। জনৈক ইয়াহূদীর প্রশ্নোত্তরে উপস্থিত ক্ষেত্রেই তিনি ১৮৪টি কবিতা লিখে সমাপ্ত করেন। এভাবে প্রতিটি গ্রন্থই তিনি রচনা করেন সম্মুখে কোন সহায়ক গ্রন্থ না রেখে। তাঁর রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো খানা।

كَانَتْ لَهُ خُصُوصِيَّةٌ بِابْنِ تَيْمِيَّةَ وَ مُنَاضَلَةٌ عَنْهُ وَ اِتِّبَاعٌ لَهُ فِى كَثِيْرٍ مِّنْ آرَائِهِ وَ كَانَ يُفْتِى بِرَأيِهِ فِى مَسْئَلَةِ الطَّلَاقِ وَ امْتُحِنَ بِسَبَبِ ذَالِكَ وَاُوذِيَ -

আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইবনে তাইমিয়ার মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরণ করতেন। তিন তালাকের মাস্য়ালাতেও তিনি ইবনে তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন।[১] এ কারণে তাঁকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষভাগে হাফিয ইবনু কাসীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরীর ২৬শে শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার এই মহামনীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে আখেরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দিমাশকের সুপ্রসিদ্ধ কবর স্থান 'সুফীয়া'তে স্বীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর মহা প্রয়াণে তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত শিষ্য শাগরিদরা বেদনাবিধুর প্রাণে যে হৃদয় বিদারক 'মর্সিয়া বা শোক গাঁথা আবৃত্তি করেন, তন্মধ্যে নিম্নের পংক্তি দুটি উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

لِفَقْدِكَ طُلَّابُ الْعُلُوْمِ تَأَسَّفُوْا * وَ جَادُوْا بِدَمْعٍ لَا يَبِيْدُ غَزِيْرُ

وَلَوْ مَزَجُوْا مَاءَ الدَّمْعِ بِالدِّمَاءِ * لَكَانَ قَلِيْلًا فِيْكَ يَا ابْنَ كَثِيْرُ

'চিরদিনের মতো তোমাকে হারিয়ে তোমার প্রিয় শিক্ষার্থীগণ আজ হা-হুতাশ করে ফিরছে, আর এ অজস্র ও অকৃপণ ধারায় অশ্রু বিসর্জন করছে যে, কোন

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে একই মজলিসে তিন তালাক দেওয়া হলে তা একই তালাক রেজয়ী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এটাই ছিল তাঁর অপরাধের মূল কারণ। এই কারণে সমসাময়িক কূপমণ্ডুক আলেমগণ ফতওয়া কার্য থেকে বিরত থাকার জন্যে তাঁর প্রতি রাজ নিষেধাজ্ঞা জারী করায়। এই অন্যায় ও অবৈধ আদেশকে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সত্য গোপন মহাপাপ মনে করে এই আদেশ প্রতিপালন করতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে রাজাদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁকে পুনরায় বন্দী করা হয়।

ক্রমেই তা' রুদ্ধ হবার নয়। যদি তারা সেই অশ্রুধারার সঙ্গে তাজা শোনিত সংমিশ্রিত করে দিত, তবুও 'হে ইবনু কাসীর। এটা তোমার ব্যাপারে যৎসামান্য বলেই গণ্য হতো'।

হাফীয ইবনু কাসীরের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দুই পুত্ররত্ন ইসলাম জগতে বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এঁদের একজন হচ্ছেন যাইনুদ্দীন আবদুর রহমান আল-কারশী। (মৃঃ৭২৯হিঃ - ১৩২৮ খ্রীঃ) এবং অপরজন বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ আল-কারশী।[১]

## ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) রচিত গ্রন্থমালাঃ

আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত তাফসীরুল কুরআন, হাদীসে রাসূল (সঃ), সীরাতুন্নবী (সঃ), ইতিহাস, ফিকাহ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দলমত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারগণ তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন। স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ-১৩৪৭ খ্রীঃ) বলেনঃ 'লাহু তাসানীফু মুফীদাহ' অর্থাৎ তাঁর রচিত গ্রন্থমালা বেশ উপকারী।[২] আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আস্‌কালানীর মতে 'তাঁর (ইবনু কাসীরের) জীবদ্দশাতেই তাঁর মহামূল্য গ্রন্থাবলী বিভিন্ন নগর বন্দরে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং তাঁর

---

১. ফিলিস্তিনের অন্তর্গত 'রামলা' নামক স্থানে এঁর মৃত্যু হয় (৮০৩ হিঃ-১৪০০ খ্রীঃ)। এঁরা দুই ভাই অর্থাৎ যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানদ্বয় পিতার মতোই 'কারশী' হিসেবে 'মানসুব' হয়ে সে যুগের খ্যাতিমান হাদীসবেত্তা ও তাফসীরকাররূপে সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্রঃ মৎ প্রণীত 'ইমাম নাসাঈঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৭৯) পৃঃ ৩৭,৩৮।

২. আল্লামা হাফিয যাহাবীঃ তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফার (দায়িরাতুল মা'আরিফ হায়দরাবাদ ডেকান) পৃঃ ৭১।

মৃত্যুর পর দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকল লোকই তদ্বারা বেশ লাভবান ও উপকৃত হয়'।[১] আল্লামা কাযী শওকানী[২] (মৃঃ ১২৫০ হিঃ-১৮৩৮ খ্রীঃ) এ প্রসঙ্গে বলেনঃ وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِتَصَانِيْفِهِ لَا سِيَّمَا بِالتَّفْسِيْرِ 'তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী দ্বারা বিশেষতঃ তাফসীর দ্বারা জনগণ লাভবান ও উপকৃত হয়।

১. ইবনু হাজার আসকালানীঃ 'আদ্‌দুরারুল কামীনাহ'ঃ পৃঃ ২৮৬।

২. এই প্রখ্যাত মনীষীর আসল নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম আবূ আলী। ইনি ১১৭৩ হিজরীতে সান্‌আ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সানআর অনতিদূরে পর্বত সংলগ্ন এই শওকান' নামক ক্ষুদ্র শহরটি অবস্থিত। তিনি স্বীয় পিতা এবং আল্লামা কাওকাবানী প্রমুখের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করে ছাত্রাবস্থাতেই অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের কাজ আঞ্জাম দিতে শুরু করেন। ১৩১০ হিঃ তিনি স্বীয় শিক্ষকবৃন্দের ইঙ্গিতে ও পরামর্শক্রমে 'মুন্‌তাকাল আখবার' নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানির এক সুচিন্তিত ও অনুপম ভাষ্য লিখে ৮ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এর নাম 'নায়নুল আওতার'। সর্বপ্রথম এটি ২০ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পরে সংক্ষেপিত হয়। এছাড়া আরও ১১৬খানি গ্রন্থের তিনি লেখক ও সংকলক। ইয়ামেনের প্রধান বিচারপতি ইয়াহ্‌ইয়া বিন সালেহর মৃত্যুর পর খলিফা মানুসর বিল্লাহ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১২০৯ হিঃ তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বেশ সুচারুরূপে তিনি এই মহান দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে ফিরকায়ে যয়দিয়া এবং গোঁড়া শিয়া সম্প্রদায় তাঁর বিরোধিতায় বেশ তৎপর হয়ে উঠে। তাঁর প্রতি তারা নানারূপ কটূক্তি, অকথ্য অশ্রাব্য গালি এবং মিথ্যা দোষারোপ করে ভীষণ আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু রাজ দরবারের আনুকূল্য ও হস্তক্ষেপ হেতু বিরোধিদের কেউ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে সাহস করেনি। পরিণামে সত্য জয়যুক্ত এবং মিথ্যা পর্যুদস্ত হতে বাধ্য হয়। আল্লামা শওকানী কৃত 'আল বাদ্‌রুত্‌তালে' 'দালীলুত্ তালিব', 'দুরারুল বাহিয়াহ', 'ইরশাদুল গাবী ইলা মাযহাবি আহলিল বাইত ফী সাহাবিন্নাবী', 'হাশিয়া তালাবুল আদাব', 'কাওয়াইদুল মাজমুয়া' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তাঁর জীবন-কথা ও দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর দুইজন ছাত্র আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁর যুগে ইয়ামেন থেকে পাক-বাংলা ভারতের ভূপাল নগরে আগমন করেন। এঁদের একজন হচ্ছেন যয়নুল আবেদীন বিন মুহসিন আনসারী এবং অপরজন শাইখ হুসাইন বিন মুহসিন আনসারী। এঁরা উভয়েই ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির। এঁদের এবং ভূপালের নওয়াব সিদ্দীক হাসান মরহুমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাক-বাংলা ভারতে কাযী শওকানী সংকলিত গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে তিনজন মনীষীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন আলী বিন মুহাম্মদ, আহমদ বিন মুহাম্মদ এবং ইয়াহিয়া বিন মুহাম্মদ শওকানী। ২য় পুত্র পিতার সমস্ত ফতোয়াগুলোকে ১২৬২ সনে 'আল-ফাতহুর রাব্বানী' নাম দিয়ে সংগৃহীত করেন।

এছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছেঃ

كَانَ مُقْرِئًا مُتقِنًا وَرَاوِيًا لِلْحَدِيْثِ مُوثُوقًا كَمَا كَانَ مُفَسِّرًا وَمُؤَرِّخًا مَعْرُوفًا

অর্থাৎ 'তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদানকারী, হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে ছিলেন নির্ভরযোগ্য, যেমন তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরকার এবং ঐতিহাসিক'।

তাঁর রচিত সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থাবলী ও পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে যে গুলোর আমরা হদিস খুঁজে পেয়েছি, নিম্নে তার মোটামুটি একটা তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

(১) اَلتَّكْمِيْلُ فِىْ مَعْرِفَةِ الثِّقَاتِ وَ الضُّعَفَاءِ وَ الْمَجَاهِيْلِ 'আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী মা'রিফাতিস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফায়ে ওয়াল্‌মুজাহিল'। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্‌পী তাঁর অমর গ্রন্থ 'কাশফুয যুনূনে' এই গ্রন্থখানির 'আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী আসমাইস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং 'ইখতেসারু উলূমিল হাদীস' নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের (চরিত-অভিধান শাস্ত্র বা রাবীদের জীবনী সংগ্রহ বিজ্ঞান) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা 'হুসাইনী' দিমাশকীর আলোচনা মতে এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।[১] লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ বিন আবদুর রহমান মিয্‌যীর 'তাহযীবুল কামাল' এবং হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেনঃ

هُوَ اَنْفَعُ شَيْئًا لِلْفَقِيْهِ الْبَارِعِ وَ كَذَالِكَ لِلْمُحَدِّثِ

'আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষেও উপকারী।

---

১. আবুল মাহাসিন হুসাইনী দিমাশ্‌কীঃ 'যাইলু তাযকিরাতিল হুফ্‌ফায (দিমাশক থেকে মুদ্রিত) পৃঃ ১৫৪; নওয়াব সিদ্দকী হাসান খাঁঃ আবজাদুল উলূম'ঃ ৩য় খণ্ড (ভূপালের সিদ্দীক প্রেস থেকে মুদ্রিত) পৃঃ ৭৮০; আহমদ শাকির সম্পাদিত 'শারাহ ইখতিসার উলূমিল হাদীসের' শুরুতে আবদুর রহমান হামযার মুকাদ্দিমাঃ পৃঃ ১৭।

(২) اَلْهُدَى وَ السُّنَنُ فِى اَحَادِيْثِ الْمَسَانِيْدِ وَ السُّنَنِ 'আল-হাদয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান'। এই গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসানিদ' নামেও প্রসিদ্ধ। এতে 'মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বাল', 'মুসনাদ বায্যার' 'মুসনাদ আবূ ইয়ালা', 'মুসনাদ ইবনু আবি শায়বা', এবং সিহাহ-সিত্তার রিওয়ায়িতগুলোকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কাওসারী[১] (মৃঃ ১৩৭১ হিঃ-১৯৫১ খ্রীঃ) বলেনঃ 'হুয়া মিন আনফায়ি কুতুবিহি' অর্থাৎ এই আলোচ্য পুস্তকটি গ্রন্থকারের অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থাবলীর অন্যতম'। এর হস্তলিখিত একটি কপি মিসরের 'দারুল কুতুবিল মিসরিয়া'য় সংরক্ষিত রয়েছে।

(৩) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ 'তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ। এই গ্রন্থে শাফি'ঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এর হস্তলিখিত একটি কপি শাইখ আবদুর রায্যাক হামযাহ (ইমাম ইবনু কাসীরের জীবনীকার) শাইখ হুসাইন বাসালামার কাছে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন।

(৪) مَنَاقِبُ الشَّافِعِى 'মানাকিবুশ শাফিঈ' এই পুস্তকে ইমাম[২] শাফিঈর (মৃঃ ২০৪ হিঃ- ৮২০ খ্রীঃ) অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। লেখক তাঁর অনবদ্য অবদান 'আল-বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ'-এর মধ্যে ইমাম শাফিঈর বিবরণ দিতে গিয়ে এই আলোচ্য পুস্তকেরও উল্লেখ করেছেন। এর হস্তলিখিত কপিটি 'তাবাকাতুশ শাফিঈয়ার' সঙ্গে সংযুক্ত ও একত্রিত। হাজী খলীফা তাঁর 'কাশফুয্যুনূন' গ্রন্থে এই পুস্তকটির নাম اَلْوَاضِحُ النَّفِيْسُ فِىْ مَنَاقِبِ الْاِمَامِ ابْنِ اِدْرِيْس 'আল ওয়াযিহুন নাফীস ফী মানাকিবিল ইমাম ইবনি ইদ্রীস বলে উল্লেখ করেছেন।

(৫) تَخْرِيْجُ اَحَادِيْثِ اَدِلَّةِ التَّنْبِيْةِ 'তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাতিৎ তামবীহ'।

---

১. পুরো নাম যাহিদ বিন হাসান আল-কাওসারী (মৃঃ ১৩৭৪ হিঃ-১৯৫১ খ্রীঃ) তিনি এ যুগের একজন প্রখ্যাতনামা মনীষী। প্রথমে ইস্তাম্বুল ও পরে মিসরের কাইরোর অধিবাসী হয়েছিলেন। মুসতাফা কামাল কর্তৃক ইস্তাম্বুল থেকে নির্বাসিত হয়ে মিসরের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হাদীস বিষয়ক গ্রন্থমালার লেখক ও পত্রিকার সম্পাদক।

২. 'আসকালান' কিংবা মক্কার মিনায় তাঁর জন্ম (১৫০ হিঃ-৭৬৭ খৃঃ) ৭ বছর বয়সে কুরআন হেফ্য করে মক্কার মুফতীয়ে আজমের কাছে ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। অতঃপর মদীনা গিয়ে ইমাম মালেকের ছাত্র হন। কিন্তু তিনি ইমাম আহমাদের (রহঃ) আবার শিক্ষকও ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সমসাময়িক উলামা তাঁকে ফতওয়া দানের অনুমতি দেন। শেষ জীবন তিনি মিসরে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন (২০৪ হিঃ-৮২০ খ্রীঃ)। ফিকাহ শাস্ত্রে সে যুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। উপরন্তু তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাঁর মোট গ্রন্থের সংখ্যা ১১৪টি। তন্মধ্যে 'কিতাবুল উম্ম' তাঁর অবিস্মরণীয় অনবদ্য অবদান। এতে বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। 'মুসনাদ' তাঁর একটি স্বতন্ত্র হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে কোন ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন।

(৬) تَخْرِيْجُ اَحَادِيْثُ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ 'তাখরীজু আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব' গ্রন্থকার তাঁর ছাত্র জীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে ইবনুল হাজিবের[১] 'তামবীহ' ও মুখতাসার' নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তকদ্বয় কণ্ঠস্থ করেছিলেন—সে যুগের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী।

(৭) شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ 'শারহু সাহীহিল বুখারী'। গ্রন্থকার ইবনু কাসীর বুখারী শরীফের এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ কিছুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' সম্পূর্ণ করতে পারেননি। হাজী খলীফা তাঁর 'কাশফুয্যুনূন' গ্রন্থে বলেন যে, এটি শুধুমাত্র প্রাথমিক অংশেরই ভাষ্য। গ্রন্থকার তাঁর 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এই ভাষ্যটির উল্লেখ করেছেন।

(৮) الاحكَامُ الْكَبِيْرُ 'আল-আহ্কামুল কাবীর'। এ গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহ্কাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু 'কিতাবুল হজ্জ' পর্যন্ত পৌঁছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ইবনু কাসীর তাঁর 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। মাওলানা নুর মুহাম্মদ 'আজমী সাহেব 'আহ্কামে সুগরা' নামে তাঁর আরও একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য হাদীসবেত্তাদের অনুকরণে হাফিয ইবনু কাসীর 'আহ্কামে উসতা' নামকরণে এ জাতীয় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি।[২]

(৯) اِخْتِصَارُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর 'মিনহাযুল উসূল ফী ইসতিলাহি আহাদীসির রাসূল' গ্রন্থে এর নাম اَلْبَاعِثُ الْحَدِيْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ 'আল বা'ইসুল হাদীস 'আলা মা'রিফাতে উলূমিল হাদীস' বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইবনুস সালাহ (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ) লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসূলুল হাদীসের কিতাব 'উলূমিল হাদীস' ওরফে 'মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ' مُقَدِّمَةُ ابْنِ الصَّلاَحِ গ্রন্থের

১. ইবনু হাজিবের উপরিউক্ত গ্রন্থ দু'টির ভাষ্য বা শরাহ লিখেছেন আল্লামা শামসুদ্দীন মাহমুদ বিন আবদুর রহমান ইস্পাহানী। এই ভাষ্যকারের কাছ থেকেই ইবনু কাসীর আলোচ্য গ্রন্থদ্বয় পড়েছিলেন এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের আলোকে তিনি উভয় গ্রন্থেরই বর্ণনাসূত্র বিস্তারিতভাবে প্রদান করেছেন।
২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমীঃ 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' ২য় মুদ্রণঃ ঢাকা, ১৯৭৫ঃ পৃঃ ১২৯ ; আবুল কাসেম মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরীঃ হাফিয ইবনে কাসীরঃ মাসিক তরজমানুল হাদীস, একাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃঃ ৭৪; মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানীর 'হায়াতু ইবনু কাসীর' (উর্দু প্রবন্ধ)ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী অনূদিত উর্দু তাফসীরে ইবনু কাসীরের শুরুতে প্রকাশিত পৃঃ ৯।

সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ইবনু কাসীর এর স্থানে স্থানে বহু সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে সংযোজন করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার 'আসকালানী এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেনঃ لَهُ فِيهِ فَوَائِدُ অর্থাৎ বহু উপকারী বিষয়বস্তুর সমাবেশ এতে রয়েছে। এই উপকারী বিষয়গুলো সবই ইবনু কাসীরের সংযোজনকৃত। এটি কতবার কত দেশের কত প্রেস থেকে যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে সত্যিই তার ইয়ত্তা নেই। আমার কাছে সংরক্ষিত যে নতুন সংস্করণটি রয়েছে তা' নিখুঁতভাবে মুদ্রিত হয়েছে 'দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়া' বৈরুত থেকে। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১৫২। আসলে এটি ইখতিসারু উলূমিল হাদীসের শারাহ বা ভাষ্য। এটি সুন্দরভাবে এডিট করেছেন আহমদ মুহাম্মদ শাকির। এর শুরুতে রয়েছে শাইখ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক হামযাহ কৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং হাফিয ইবনু কাসীরের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা।

(১০) مُسْنَدُ الشَّيْخَيْنِ 'মুসনাদুস শাইখাইন'। এতে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইবনু কাসীর (রহঃ) তাঁর 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে আর একখানি 'মুসনাদে উমর' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

(১১) اَلسِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ 'আসসীরাতুন নবভীয়াহ'। এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ।

(১২) اَلْفُصُولُ فِي اِخْتِصَارِ سِيرَةِ الرَّسُولِ 'আল-ফুসূল ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল'। এটি হযরত রসূলে আকরাম (সঃ)-এর একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। হাফিয ইবনু কাসীর স্বয়ং তাঁর তাফসীরে সূরা 'আল আহযাবে' খন্দক বা পরিখা যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। এর একখানি হস্তলিখিত কপি মদীনা মুনাওয়ারার 'শাইখুল ইসলাম' গ্রন্থাগারে আজও সংরক্ষিত রয়েছে।

(১৩) كِتَابُ الْمُقَدِّمَاتِ 'কিতাবুল মুকাদ্দিমাত'। গ্রন্থকার স্বীয় 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'মুখাতাসারু মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ্' গ্রন্থেও তিনি এর বরাত দিয়েছেন।

(১৪) مُخْتَصَرُ كِتَابِ الْمَدْخَلِ لِلْإِمَامِ بَيْهَقِي 'মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লিল ইমাম বাইহাকী'। এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস'-এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমদ বিন হুসাইন আল বাইহাকী (৪৫৮ হিঃ) কৃত 'কিতাবুল মাদখালের' সংক্ষিপ্ত সার।

(১৫) رِسَالَةُ الْإِجْتِهَادِ فِى طَلَبِ الْجِهَادِ 'রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ'। খ্রীষ্টানরা যখন 'আয়াস' দূর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকাখানি আমীর মনজাকের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

(১৬) رِسَالَةٌ فِي فَضَائِلِ الْقُرآنِ 'রিসালাতুন ফী ফাযায়িলিল কুরআন।এটি মিসরের 'আল-মানার' এবং অন্যান্য প্রেস থেকে তাফসীর ইবনু কাসীরের সাথে এর পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। বুলাক প্রেস থেকে মুদ্রিত কপিতে এই পুস্তিকাটি নেই। গ্রন্থকারের যে কপির সঙ্গে মক্কা শরীফের কপিটি মিলানো হয়েছে তাতে এটি পাওয়া যায়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮। এটি হাদীস ও কুরআনের আলোকে লিপিবদ্ধ অত্যন্ত প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক।

(১৭) مُسْنَدُ إِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ 'মুসনাদ ইমাম আহমদ ইবনু হামবাল' মহামতি ইমাম আহমদ ইবনু হামবালের (রহঃ) বিরাট বিশাল মুসনাদ গ্রন্থখানিকে বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে সুবিন্যস্ত করে এবং তার সঙ্গে ইমাম তাবরানীর মু'জাম ও আবূ য়া'লার মুসনাদ থেকে অতিরিক্ত হাদীসগুলো তার মধ্যে সন্নিবেশিত করে এই গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছে।

(১৮) اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ 'আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া। ইবনু কাসীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির প্রাথমিককাল থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। প্রথমে নবী ও রাসূলগণ ও পরে প্রাচীন জাতির তথা বিগত উম্মতদের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষে সীরাতে নবভী (সঃ)-এর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর খিলাফতে রাশেদা থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে এই পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি তথা রোয কিয়ামতের আলামতসমূহ এবং আখিরাত বা পরজগতের অবস্থার কথাও ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাশফুয্যুনূন' গ্রন্থে বলেনঃ

اِعْتَمَدَ فِى نَقْلِهِ عَلَى النَّصِّ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فِى وَقَائِعِ الْاُلُوفِ السَّالِفَةِ وَمَيَّزَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَ السَّقِيمِ وَالْخَبَرِ الْاِسْرَائِيلِي وَغَيْرِهِ (كشف الظنون)

অর্থাৎ 'পূর্বকালের শত সহস্র বছরের ঘটনাসমূহের বিবরণ পবিত্র কুরআন ও শাশ্বত সুন্নাহর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে পেশ করা হয়েছে এবং সহীহ ও দুর্বল এবং ইস্রাঈলীয় রেওয়ায়েতগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে'।

মোটকথা ইমাম ইবনু কাসীর এই অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থের 'ইস্রাঈলিয়াত' বা অলীক ও আজগুবি ঘটনাসমূহকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাগরী বিরদী আলোচন্য গ্রন্থ সম্পর্কে বলেনঃ

هُوَ فِي غَايَةِ الْجَوْدَةِ অর্থাৎ 'গ্রন্থখানি অতীব চমৎকার।

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা হাফিয বদরুদ্দীন মাহমুদ 'আইনী রচিত ইতিহাস গ্রন্থটির অধিকাংশই এ গ্রন্থকে অবলম্বন ও ভিত্তি করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উত্তরসূরীরাও একে সামনে রেখে তাঁদের নিজ নিজ ইতিহাসকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর করে প্রণয়ন করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী আলোচ্য গ্রন্থের একখানি সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেন।

আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর অবধারিত মৃত্যুর দুই বছর আগ পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সীরাতুন্নবী অংশকে বেশ চমৎকার ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(১৯) تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ 'তাফসীরুল কুরআনিল্ কারীম' বা 'তাফসীর ইবনু কাসীর'। পবিত্র কুরআনের এই সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন لَمْ يُؤَلَّفْ عَلٰى نَمَطِهِ مِثْلُهٗ অর্থাৎ এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধই হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ বিন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন هُوَ مِنْ اَفْيَدِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ بِالرِّوَايَةِ 'রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী'।[১]

সত্য কথা বলতে কি, হাফিয ইবনু কাসীর সর্বমোট যে বিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মধ্যে এই তাফসীরুল কুরআনিল কারীমই তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, অবিস্মরণীয় ও অমর অবদান। এর প্রতি খণ্ডের পাতায় পাতায় পরিস্ফুট রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর পরিশ্রম, গবেষণা সুলভ অনুসন্ধিৎসা, অধ্যয়ন ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের ছাপ।

১. শাইখ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক বিন হামযাহঃ তরজমাতুল ইমাম ইবনু কাসীরঃ ২য় সংস্করণ, দারুল কুতুব, বৈরুতঃ পৃঃ ১৬, ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন যাহবীর 'আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূনঃ ১ম খঃ, ২য় সংস্করণঃ ১৯৭৬, দারুল কুতুবঃ পৃঃ ২৪৪; মাওলানা আলীমুদ্দীনঃ 'আরবী ভাষায় কুরআনের তাফসীরঃ সাপ্তাহিক আরাফাতঃ ১১শ বর্ষ, কুরআন সংখ্যা।

এমনিতেই প্রাচীন যুগে রচিত তাফসীর গ্রন্থের বহুলাংশই আজ অনন্ত কাল সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। আজ তাদের অস্তিত্ব এই পৃথিবীর কোন অংশেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার এমন কতগুলো তাফসীর গ্রন্থও রয়েছে যেগুলো এখনও হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির আকারে আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে দিনের আলো দেখতে সক্ষম হয়েছে তন্মধ্যে এই আলোচ্য 'তাফসীর ইবনু কাসীর' বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। 'তাফসীরে মান্‌কূল' বা রিওয়ায়িতমূলক তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সময়ের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের তাফসীর হলো তাফসীর ইবনু জারীর তাবারী। তাফসীর ইবনু কাসীরের মধ্যে অন্যান্য তাফসীরসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলোর সংযোগ ও সমন্বয় সাধিত হয়েছে। অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা মাসয়ালাসমূহকে প্রতিপন্ন করার দিক থেকে এক দিকে যেমন এতে তাফসীর ইবনু জারীর তাবারীর বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে, তেমনি অপূর্ব ভাষা শৈলী ও বর্ণনা পদ্ধতির লালিত্যের দিক দিয়ে 'তাফসীর কুরতুবী ও মা'আলিমুত্ তানযীলের সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আরবী শব্দমালার পার্থক্যসহ প্রতিটি হাদীসের 'সিলসিলায়ে সনদ' বা বর্ণনাক্রম দ্বারা নির্ভরযোগ্য করে এর গুরুত্ব ও মূল্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের দুর্বোধ্য ও জটিল অংশগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ছাড়াও এতে দ্ব্যর্থবোধক শব্দমালার রয়েছে আভিধানিক তাৎপর্য ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ। আরও রয়েছে এতে শানিত যুক্তির সূক্ষ্ম মানদণ্ডে এবং কষ্টি পাথরে যাচাই করে অকাট্য দলীল প্রমাণের আলোকে কতগুলো ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন। মোটকথা, এটি বিদআত থেকে মুক্ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য গ্রন্থের কোথাও দুরূহতা বা জটিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। প্রায় সর্বত্রই বর্ণনা রীতির পারিপাট্য, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা এবং প্রাঞ্জলতার জন্যে আলোচনা হয়েছে প্রাণবন্ত। বিতর্কমূলক বিষয়ে হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্তি ও ঐতিহাসিকের নির্লিপ্ততা রক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। হাদীস ভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্যই এসব ক্ষেত্রে তাঁকে আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়েছে। কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তথ্য বিচার -বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁর অভিমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু কোথাও ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছেন বলে মনে হয় না।

এ কথা সত্য যে, হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর আলোচ্য তাফসীরে তাঁর পূর্বসূরী ইবনু জারীর তাবারীর রচনা রীতি, ঐতিহাসিক ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাবারীর তাফসীরে 'ইস্রাঈলিয়াত' নামক যেসব অপ্রামাণ্য ও জাল হাদীস ভিত্তিক উপাখ্যান ও বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে,

সেগুলোকে যাচাই বাছাই করে ইবনু কাসীর বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে একে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ তাফসীরে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এসব ন্যায়সঙ্গত কারণেই একে 'তাফসীরে সালাফী' নামে অভিহিত করা হয়।[১]

এই সর্বজনপ্রিয় বিরাট তাফসীর গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম মিসরের বোলাক প্রেস থেকে ১৩০১ হিঃ মুতাবেক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ -১৮৮৯খৃঃ) কৃত তাফসীর 'ফাতহুল বায়ানে'র হাশিয়ায় মোট ১০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। অতঃপর এটি আল্লামা হুসাইন বিন মাসঊদ আল-ফাররা আল-বাগাভী (মৃঃ ৫১৬ হিঃ -১১২২খৃঃ) কৃত তাফসীর 'মাআলীমুত্ তানযীলে'র সঙ্গে মিসরের কোন এক প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তারপর ১৩৫৬ হিজরী মুতাবেক ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এটি আলাদাভাবে মিসরের আল-হালাবী প্রেস থেকে বড় বড় চার খণ্ডে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরও কয়েকবার একাধিক স্থান থেকে এটি প্রকাশিত হয়। সর্বশেষে মরহুম শাইখ আহমদ শাকির এই তাফসীরের মধ্যে উল্লিখিত হাদীসসমূহের সনদ বা বর্ণনাসূত্রকে বাদ দিয়ে মিসর থেকে প্রকাশ করেন। তাফসীর ইবনু কাসীরের অপূর্ব জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বের কথা অনুধাবন করে মহাগুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াওয়াড় এলাকার মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী[২] একে উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। এই উর্দু অনুবাদ প্রথমে 'আখবারে মুহাম্মদী' নামক দিল্লী থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত এক পাক্ষিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর গ্রন্থকারের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৩৫০ হিঃ মুতাবিক ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে। এখন এটি একই সঙ্গে পাক-ভারতের বহু প্রেস থেকে হাজার হাজার কপি করে মুদ্রিত হচ্ছে। আর কাটতিও হচ্ছে প্রচুর।

---

১. আঃ কাঃ মুহাম্মদ আদমুদ্দীনঃ 'ইলমে তাফসীর'ঃ 'আজাদ ঈদ সংখ্যাঃ ১৩৫৩/১৯৪৬ খ্রীঃ পৃঃ ৭৩; শাইখ আবদুর রায্যাক হাম্যাহঃ মুকাদ্দিমা ইখতিসারু উলূমিল হাদীস ওয়া তরজমাতুল মুয়াল্লিফ'ঃ দারুল কুতুব, বৈরুতঃ পৃঃ ১৬-১৭, ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবীঃ 'আত্তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন'ঃ ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণঃ দারুল কুতুবিল হাদীসিয়াহঃ ১৯৭৬ সালঃ পৃঃ ২৪৪; মাওলানা আলীমুদ্দীনঃ আরবী ভাষায় কুরআনের তাফসীরঃ সাঃ 'আরাফাত' পৃঃ ৭০-১১ শ বর্ষঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারীঃ ১৯৬৮ঃ

২. বোম্বাই প্রদেশের (বর্তমান মহাগুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াওয়াড় এলাকার জুনাগড় শহরে সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ মাইমান বংশে তাঁর জন্ম। পিতা ইব্রাহীম সাহেব ও মাতা হাওয়া বিবি ছিলেন উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। ২২ বছর বয়সে জুনাগড়ের বুক থেকে দিল্লীর মাটিতে আগমন করে তিনি লেখা পড়া শুরু করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করে এখানেই তিনি 'মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া' নামে একটি নির্ভেজাল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ পত্তন করেন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষায়তন দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞান পিপাসুকে জ্ঞানালোক দান করেছে। (অপঃ পৃঃ বাকী অংশ)

আলোচ্য তাফসীর ইবনু কাসীর সম্পর্কে আল্লামা হাফিয আবূ আলী মুহাম্মদ শওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ-১৮৩৪ হিঃ) বলেনঃ

وَقَدْ جَمَعَ فِيْهِ فَاَوْعٰى وَ نَقَلَ الْمَذَاهِبَ وَ الْاَخْبَارَ وَ الْاٰثَارَ وَ تَكَلَّمَ بِاَحْسَنِ كَلَامٍ وَ اَنْفَسِه -

অর্থাৎ 'আলোচ্য গ্রন্থে তিনি হাদীসের রেওয়ায়তগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন পূর্ণাঙ্গভাবে তা আহরণ করেছেন যে, তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির লেশমাত্রও নেই। অনুরূপভাবে তিনি এতে বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদ, হাদীস এবং সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবি-ঈনের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করেছেন এবং প্রতিটি আলোচনা অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন'।

---

১৯২১ সালে দিল্লী থেকে তিনি 'আখবারে মুহাম্মদীয়া' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা নিজস্ব সম্পাদনায় বের করেন। তাঁর অনুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় দেড় শতেরও অধিক। এগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে এ থেকেই কিছুটা আঁচ করা সম্ভব যে, লেখকের জীবদ্দশায় কোন কোন বইয়ের নয় দশটি সংস্করণও বের হয়। এছাড়া তাঁর বেশ কিছু বই বাংলা, ইংরেজী, গুজরাটি এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মৌলিক গ্রন্থাবলী ছাড়া অনুবাদ সাহিত্যে মওলানা মুহাম্মদ সাহেব শুধু যে আড়াই হাজার পৃষ্ঠব্যাপী তাফসীর ইবনু কাসীরের তরজমা লিখেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, বরং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মদ হায়াতকৃত 'ফাতহুল গফূর ফী অজ্‌ইল আয়দী', আল্লামা শাইখ তাকীউদ্দীন সুবকী কৃত 'রিসালা জুয্‌ই রাফ্‌ইল ইয়াদাইন' এবং শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের (রহঃ) ই'লামুল মুয়াক্বি'য়ীন' প্রভৃতি গ্রন্থমালাকেও উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থটি পূর্ণ সাত খণ্ডে সমাপ্ত। এটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই ইমামুল হিন্দ হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আনন্দে গদগদ চিত্তে অনুবাদককে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে কলকাতা থেকে একাধিকপত্র প্রেরণ করেন। এই ঐতিহাসিক পত্রগুলো আজও উক্ত গ্রন্থের শুরুতে সন্নিবেশিত দেখতে পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ পাক মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী সাহেবকে অনলবর্ষী ভাষণের এমন এক সম্মোহনী শক্তিদান করেছিলেন যে, তাঁর বিষয়বস্তুর গুরুত্বে-ভাষার ওজস্বিতায় বর্ণনা মাধুর্যে, পারিপাট্য ও কৌশলে সমবেত জনতা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ও মন্ত্রমুগ্ধ না হয়ে পারতো না। কুরআন ও হাদীসের অমিয় বাণী, সীরাতে নবী, ইসলামের ইতিহাস এবং সাল্‌ফে সালেহীনের ত্যাগপূতঃ আদর্শ জীবনের ঘটনাবলীই ছিল তাঁর আগুনঝরা, বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণে প্রধান উপজীব্য।

আরব ভূমিতে আবদুল আযীয ইবনে সউদের শাসনভার হাতে নেওয়ার পর মু'তামারে আলামে ইসলামীর এক অধিবেশন সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে তিনিও যোগদান করেন।

অবশেষে ইসলামী শরীয়ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই প্রদীপ্ত মশাল মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী ১৯৪১ খ্রীঃ মুতাবিক ১৩৬০ হিঃ ১৩ই সফর জুমআর রাত্রে আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে স্বীয় জন্মভূমি জুনাগড় শহরে ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

আলোচ্য তাফসীরের বিশেষত্ব এই যে, এতে কুরআন ভাষ্যের মূলনীতির অনুসরণে সর্বপ্রথমে অপরাপর আয়াতের আলোকে তাফসীর করা হয়েছে। তারপর হাদীসবেত্তাদের সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থমালায় উক্ত বিষয়ে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সনদসহ উদ্ধৃত করে প্রয়োজনবোধে সে হাদীসের 'সিলসিলায়ে সনদ' বা বর্ণনাসূত্র ও রিজাল বা হাদীসের রাভীগণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাফিয ইবনু কাসীরের এই তাফসীর অধ্যয়ন করে ভাষ্য সম্পর্কিত তাঁর অনুসৃত এই মূলনীতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পেরেছি। বাস্তবিকই এরূপ দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটির সূচারুরূপে সমাধার জন্যে তাঁর মতো সুযোগ্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কালজয়ী মুহাদ্দিসেরই প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ পাকের অশেষ ধন্যবাদ যে, আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহঃ) তাঁর জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃতফল হিসেবে এই দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করে দিয়ে তিনি সুধী সজ্জন তথা শিক্ষিত জগতের প্রভূত কল্যাণসাধন করে গেছেন। আগেই বলেছি আলোচ্য তাফসীরে তিনি অন্যান্য তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে 'ইসরাঈলী রিওয়ায়িত' গুলোকে সূক্ষ্ম সমালোচনার মানদন্ড ও কষ্ঠিপাথরে যাচাই বাছাই করে তা সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি একজন সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এবং তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখানেই তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। একথা সত্য যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে ইবনু জারীর, ইবনু আবি হাতিম ও ইবনু আতীয়া গারনাতী প্রমুখ পূর্বসূরীদের ভাষ্যের তিনি মাঝে মাঝে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আবার কোন এক বিশেষ উক্তিকে অন্য উক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোকে বর্ণনা করতে গিয়ে কোন্‌টি অপ্রামাণ্য সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর এভাবে রাবী বা বর্ণনাকারীদের সূক্ষ্ম সমালোচনা করতে তিনি আদৌ পশ্চাদপদ হননি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'সূরাতুল বাকারার' ১৮৫ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি আবূ নুজাইহ বিন আবদুর রহমান আলমাদানী এবং আবূ হাতিম প্রমুখ বর্ণনাকারীদেরকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেন।[১] অনুরূপভাবে উক্ত সূরাতুল বাকারার ৬৭ আয়াত اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ-এর তাফসীর করতে গিয়ে প্রথমে গাভী সম্পর্কিত প্রচলিত চিত্তাকর্ষক কাহিনী আগাগোড়া তিনি বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সালফে সালেহীনের উক্তি এবং 'উবাইদাহ' আবুল আলীয়াহ ও সুদ্দী প্রমুখের বর্ণনা সম্পর্কেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারপর সমগ্র কাহিনীটিকে তিনি অনির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।[২] উক্ত 'সুরাতুল বাকারার' ২৫১ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি ইয়াহিয়া বিন সাঈদ প্রমুখ রাবীদেরও দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩]

১. 'তাফসীর ইবনু কাসীর'ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ২১৬।
২. 'আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরূন'১ম খণ্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২৪৫-২৪৬।
৩. 'তাফসীর ইবনু কাসীর' ১ম খণ্ডঃ (পূর্বোক্ত) পৃঃ ৩০৩, ১০৮-১১০,

পবিত্র কুরআনের ২৬ পারায় 'সূরায়ে কাফ' এর সূচনায় ق নামক যে আদ্য অক্ষরটি রয়েছে সে সম্পর্কে অন্যান্য মুফাসসির বা ভাষ্যকার বলেন যে, এটি সারা বিশ্বজাহানকে পরিবেষ্টনকারী এক পাহাড়ের (কোকাফ) নাম। হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর এ প্রসঙ্গে বলেন যে, এ ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়িত কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।[১]

কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত ও হাদীস শরীফ ছাড়া তিনি স্বীয় তাফসীরের কোন কোন স্থানে ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিতর্কের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করার শ্রম স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আহকাম সম্বন্ধীয় আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের আলিমদের উক্তি ও দলীলসমূহের উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'সূরাতুল বাকারার' ১৮৫ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট চারটি মাসয়ালার কথা উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের উক্তি, দলীল প্রমাণ এবং অভিমতও পেশ করেন।[২] অনুরূপভাবে সূরাতুল বাকারার তালাক সম্বন্ধীয় ২৩০ আয়াতের[৩] তাফসীর করতে গিয়েও পুনর্বিবাহের শর্তসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অনুকূল প্রতিকূল সমস্ত দলীল প্রমাণের কথা উল্লেখ করেন।[৪] এভাবে আহকাম সম্বন্ধীয় আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হাফিয ইবনু কাসীর ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের তুমুল বিতর্ক ও বাদানুবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তাঁদের বিভিন্ন মাযহাব ও দলীলসমূহকে নিয়ে আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোথাও সীমালংঘন করেননি—যেভাবে অন্যান্য ফেকাহশাস্ত্রজ্ঞ তাফসীরকারগণ সীমা-পরিসীমার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর এই আলোচ্য তাফসীরের শুরুতে প্রায় ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ 'মুকাদ্দিমা' বা ভূমিকার অবতারণা করেছেন। এতে তাফসীর সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। এই তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান ভূমিকার ফলে তাঁর তাফসীরের

---

১. 'তাফসীর ইবনু কাসীর, ৪র্থ খণ্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২২১,

২. তাফসীর ইবনু কাসীরঃ ১ম খণ্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২১৬-২১৭।

৩. আলোচ্য আয়াতটি নিম্নরূপঃ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ - اِلَى الْاٰخِرِ (২: ২৩০)

৪. তাফসীর ইবনু কাসীরঃ ১ম খঃ (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২৭৭-২৭৯।

গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেকখানি বর্দ্ধিত হয়েছে। অবশ্য এই দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ারও কিছু কিছু অনুসরণ করেছেন।[১]

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর ইবনু কাসীরের নির্ভরযোগ্যতা ও অপূর্ব জনপ্রিয়তাকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন ভাষাভাষী পণ্ডিতবর্গ শুধু যে নানা ভাষায় এর অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন তাই নয়, বরং অনেকেই এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করে প্রকাশ করতেও সচেষ্ট হয়েছেন।[২] এই সংক্ষেপকারীদের মধ্যে

১. মুকাদ্দিমা-ই-তাফসীর ইবনু কাসীর'ঃ (পূর্বোক্ত) পৃঃ ১-৯; ডঃ মুহাঃ হুসাইন যাহাবীঃ আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাসিরূন'১ম খন্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২৪৪; মওলানা আবদুস সামাদ সারিস আযহারীঃ তারীখুল কুরআন ওয়াত তাফসীরঃ লাহোর ২য় সংস্করণ।

২. 'সাফওয়াতুত্তাফাসীর' ও 'মুখতাসার ইবনু কাসীর' নামক গ্রন্থদ্বয়ের সংকলয়িতা শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্‌সাবুনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপঃ

তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার অন্তর্গত আলেপ্পো শহরে আশ্‌শাহবা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলেপ্পোর আশ্‌শারয়িয়া মহাবিদ্যালয় হতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আলেপ্‌পোর বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আট বছরকাল শিক্ষকতা করেন। তারপর মক্কা মুকাররমায় ইসলাম ধর্ম ও প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বেশ কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। এমনিভাবে তিনি সৌদী আরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পঁচিশটি বছর অতিবাহিত করেন।

**তাঁর রচনাবলীঃ** কুরআন সুন্নাহর উপর তিনি যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলোর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১। রাওয়াইউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকামিল কুরআন (২ খণ্ড)।

২। মিন কুনুযিস সুন্নাহ; দিরাসাতুন আদাবিয়াতুল লুগাভিতুন লিল আহাদিসি।

৩। আল-মাওয়ারিস ফিস্ শারিয়াতিল ইসলামিয়া ফী যাউয়িল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ।

৪। আন্ নুবূওয়াত ওয়াল আম্বিয়া ওয়া দিরাসাতুন তাহলীলিয়াতুন লি হায়াতির রুসুলিল কিরাম।

৫। মুখতাসারু তাফসীর ইবনু কাসীর (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)

৬। আত্‌তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন।

৭। সুফুওয়াতুত তাফাসীর (তিন খণ্ডে সমাপ্ত) (বাকী–৩২ পৃঃ)

শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্‌সাবুনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বইরুতের দারুল কুরআনিল কারীম নামক প্রকাশনী থেকে বেশ সুন্দর আকর্ষণীয়ভাবে তিন খণ্ডে ছাপানো হয়েছে। নীচে টীকা-প্রটীকা বিশিষ্ট এই সংস্করণটি সর্বত্রই এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন যে, এ পর্যন্ত প্রায় ৮/৯টি সংস্করণ বেরিয়ে গেছে।

---

৮। মুখতাসারু তাফসীরিত তাবারী।

৯। তাহকীকু কিতাবি ফাতহির রাহমান ফিমা ইয়ালতাবিসু মিনহু আয়াতুল কুরআন।

১০। তাহকীকু তাফসীরিদ দাওয়াত আল-মুবারাকাত।

১১। রিসারাতুল মাহদী ওয়া আশরাতুস সায়াত।

১২। রিসারাতু শুবহাত ওয়া আবাতিল হাওলা তা'আদ্দুদি যাওজাতির রুসুল (সঃ)।

১৩। আল হাদিউন নবভী আস সাহীহ ফী সালাতিত্ তারাবীহ।

১৪। আল মুনতাখাবুল মুখতার মিন কিতাবিল আযকার লিল ইমাম নবভী (রহ)।

এগুলো ছাড়াও তাঁর বহু রচনাবলী পাণ্ডুলিপির আকারে আবদ্ধ ও প্রকাশনার পথে রয়েছে।

তিনি মক্কা মুকাররমার 'উম্মুল কুরা' বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত স্থায়ী শিক্ষক। কিন্তু এতবড় আলেম, লেখক, সংকলক এবং বিদগ্ধ মনীষী হওয়া সত্ত্বেও অতি দুঃখের সাথে জানাতে হয় যে, তাঁর আকীদা ও ঈমানগত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং আপত্তিজনক কার্যকলাপের জন্য আজ তিনি পবিত্র মক্কা শরীফ এবং আরব দেশের অন্যত্রও অতি ব্যাপকভাবে নিন্দিত, বিতর্কিত এবং অতি বিরূপভাবে সমালোচিত। সউদী আরবের অন্ধ অথচ শ্রেষ্ঠতম আলেম শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায স্বয়ং তাঁর বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। অনাগত দিনে আমরা এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করি।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# সূচনা

ইসলামের খ্যাতনামা চিন্তাবিদ, বিদগ্ধ মনীষী, খোদা ভক্ত আলেম আশ্‌শাইখ আল-ইমাম, আল হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন খাতীব আবূ হাফ্‌স উমার বিন কাসীর (রহঃ) বলেনঃ

সর্বপ্রকার প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্যে যিনি স্বীয় কিতাব কুরআন মাজীদকে اَلْحَمْدُ এর সঙ্গে শুরু করেছেন এবং বলেছেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ *

অন্য স্থানে বলেছেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا * قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا * مَّا كِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا * وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا* مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا لِاٰبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا*

অর্থাৎ 'একমাত্র সেই আল্লাহই সর্বপ্রকার প্রশংসার অধিকারী যিনি স্বীয় বান্দার উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন, যে কুরআনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বক্রতার লেশমাত্র নেই, যে মহাগ্রন্থ সদা-সর্বদা দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে, যেন আল্লাহ তা'আলার কঠিন শাস্তি হতে তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ (সঃ) জনগণকে সতর্ক করতে পারেন, আর যেসব লোক ঈমান এনে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে, তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম ও অশেষ পুণ্যের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন। আবার যেসব লোক তাদের বাপ দাদার কথার উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহর জন্যে সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করে, তাদেরকেও সতর্ক করে দেন যে, ওটা সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা যা তারা শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে।' (১৮ঃ ১-৫)

সেই মহান প্রভু যেমন স্বীয় কুরআন মাজীদকে 'حَمْد' দ্বারা আরম্ভ করেছেন, তদ্রূপ স্বীয় সৃজন কথাও তিনি 'حَمْد' দ্বারা শুরু করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ *

অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার এবং আলোক, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাফিরেরা তাদের প্রভুর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করে থাকে।' (৬ঃ ১) এরূপভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের সমাপ্তিও স্বীয় প্রশংসার মাধ্যমে করেছেন। জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীর পরিণাম বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করেনঃ

وَ تَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থাৎ 'এবং তুমি ফেরেশ্‌তাদেরকে আরশের চার পাশে পরিবেষ্টিত অবস্থায় চক্রাকারে অবস্থানরত দেখবে, তাঁরা স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করতে থাকবে, আর তাদের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে ফায়সালা করে দেয়া হবে। এবং বলা হবে সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বজাহানের প্রভু একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্যে।' (৩৯ঃ ৭৫)

এজন্যেই আল্লাহ তা'আলার ফরমান রয়েছেঃ

وَ هُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ *

অর্থাৎ 'তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্যে, চূড়ান্ত হুকুম তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।' (২৮ঃ ৭০) অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তাঁরই, পরজগতেও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।' (৩৪ঃ ১) অর্থাৎ যা কিছু তিনি

সৃষ্টি করেছেন ও করবেন সব কিছুর মধ্যেই সকল প্রশংসা তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য। যেমন নামাযী ব্যক্তি 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ' বলার পরে বলে থাকেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَ مِلْأَ الْاَرْضِ وَ مِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ۔

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! হে আমাদের মহান প্রভু! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ভরা আপনারই প্রশংসা এবং তার পরেও যে সকল বস্তু আপনি ভরে দিতে চান।'

এজন্যেই জান্নাতবাসীদেরকেও অনুরূপ প্রশংসার ইলহাম করা হবে এবং তাদের নিঃশ্বাসের সাথেই অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষিত হতে থাকবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বিরাট দান, তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা, দূর দিগন্ত প্রসারী সদা প্রবহমান দয়া দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহ তাদের চোখের সামনেই সকল সময়ে বিরাজমান। একথাই পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে বজ্রকণ্ঠেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ * دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ وَ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থাৎ 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, তাদের প্রভু তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে এমন সুখময় উদ্যানসমূহের পথ দেখিয়ে দেবেন যাদের তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বীনীসমূহ কুলুকুলু নাদে বইতে থাকবে। তথায় তাদের কথা হবে سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান হবে সালাম বা অনাবিল শান্তির অভিনন্দন বাণী আর এটাই হবে তাদের কথাবার্তার শেষ অংশ-সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি সারা বিশ্বজগতের পালনকর্তা।' (১০ঃ ৯-১০)

ইবনে কাসীর (রহঃ) আরও বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর জন্যে যিনি স্বীয় রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন এবং তদপ্রসংগে বলেছেনঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط

অর্থাৎ 'রাসূলগণকে শুভ সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে পাঠিয়েছেন, যেন রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহ তা'আলার উপর মানব জাতির কোন দলীল প্রমাণ বা অভিযোগ অনুযোগের অবকাশ না থাকে।' (৪ঃ ১৬৫)

ঐ সকল রাসূলের ক্রম পরম্পরা এমন নিরক্ষর আরবী নবী দ্বারা শেষ করেছেন যিনি সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত দানব ও মানবের কাছে তিনি নবী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছেঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ *

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও যে, হে মানবকুল! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের কাছে আল্লাহর নবী রূপে প্রেরিত হয়েছি, সেই আল্লাহ যাঁর হাতে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব রয়েছে, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, যিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যুদান করেন। সুতরাং হে মানবমণ্ডলী! তোমরা সকলে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের (সঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যিনি নবী, নিরক্ষর, যিনি আল্লাহর উপর এবং তাঁর বাণীসমূহের উপর বিশ্বাস করে থাকেন। তাঁর অনুসরণ করলেই তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে।' (৭ঃ ১৫৮) আরও এক জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ

অর্থাৎ 'যেন আমি তোমাদেরকেও ভয় প্রদর্শন করি এবং তাদেরকেও ভয় দেখাই যাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে গেছে।' (৬ঃ ১৯) সুতরাং আরব, অনারব, কালো ও সাদা যে কোন মানুষের নিকট এই কুরআনের উদাত্ত বাণী পৌঁছেছে, আল্লাহর নবী (সঃ) তাদের সকলের জন্যই ভয় প্রদর্শক। এই জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

অর্থাৎ 'দলসমূহের মধ্যে যে কেউ কুরআনকে অস্বীকার করবে, জাহান্নামই হবে তার স্থান।' (১১ঃ ১৭) অন্য জায়গায় পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছেঃ

فَذَرْنِيْ وَ مَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ *

অর্থাৎ 'তুমি আমাকে এবং এই মহাগ্রন্থের প্রতি অবিশ্বাসীকে ছেড়ে দাও, আমি ধীরে ধীরে তাদেরকে এমন মজবুতভাবে ধরব যে, তারা জানতেই পারবে না। (৬৮ঃ ৪৪)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার পয়গাম্বরী এত ব্যাপক যে, আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।' হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'অর্থাৎ প্রত্যেক দানব এবং মানবের প্রতি।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর বার্তাবাহক, সকলের নিকট তিনি মহিমান্বিত আল্লাহর বাণী ও মর্যাদাপূর্ণ কুরআন ঠিকভাবেই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ*

অর্থাৎ 'মিথ্যা এই পবিত্র গ্রন্থের কাছেই আসতে পারে না বরং এর ত্রিসীমানায় পদার্পণ করতে পারে না, এতো মহা বিজ্ঞ ও প্রশংসার অধিকারী আল্লাহর নিকট হ'তে অবতীর্ণ হয়েছে।' (৪১ঃ ৪২)

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তাঁর এই পবিত্র বাণী অনুধাবন করার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا*

অর্থাৎ 'তারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে না কেন? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে অবতীর্ণ হতো তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক মতভেদ লক্ষ্য করতো।' (৪ঃ ৮২) আর এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ *

অর্থাৎ 'এই কল্যাণময় কিতাবখানা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষ তাতে চিন্তা ও গবেষণা করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ লাভ করে।' (৩৮ঃ ২৯) আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলেছেনঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

'লোকেরা পবিত্র কুরআনকে চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে অনুধাবন করার চেষ্টা করে না কেন? তাদের অন্তরে কি তালা লাগান রয়েছে?' (৪৭ঃ ২৪)

সুতরাং আলেম সমাজের প্রধান কর্তব্য হলো সবার কাছে আল্লাহর এই পবিত্র বাণীর ভাব ও মর্ম প্রকাশ করে দেয়া, এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা, যথা নিয়মে এর পঠন পাঠন তথা নিজের শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেনঃ

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ *

অর্থাৎ 'আল্লাহ পাক যখন কিতাবধারীদের নিকট থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা যেন তা লোকদের নিকট বর্ণনা করে, গোপন যেন না করে, কিন্তু তারা ওকে স্বীয় পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করেছে এবং তার বিনিময়ে দুনিয়ার ধনসম্পদ সন্ধান করেছে, তাদের এই ধন-সম্পদ ক্রয় অতি জঘন্য।' (৩ঃ ১৮৭) এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

অর্থাৎ 'যেসব লোক আল্লাহর অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করে থাকে, তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা পর্যন্ত বলবেন না, তাদেরকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখবেন না, তাদেরকে পাক পবিত্রও করবেন না, বরং তাদের জন্য চরম বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' (৩ঃ ৭৭)

সুতরাং আমাদের পূর্বে যেসব উম্মতকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়া লাভের কাজে মগ্ন হয়েছিল ও আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ জিনিসের পিছনে পড়ে মহান আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের জঘন্য কার্যের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমাদের মুসলমান সমাজের উচিত যে, আমরা যেন এমন কাজ না করি যা নিন্দার কারণ হয়; বরং আল্লাহর নির্দেশাবলীকে মনোপ্রাণ দিয়ে অবনত মস্তকে পালন করা এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকাই হবে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ * اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ *

অর্থাৎ 'এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য তাদের নিকট এসেছে, তাতে মুসলমানদের অন্তর কেঁপে উঠবে এবং তারা ঐ সব লোকের মত হবে না যাদেরকে তাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল? কিন্তু কিছু কাল অতিবাহিত হতেই তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং অধিকাংশ লোক অবাধ্য হয়ে পড়েছিল। জেনে রেখো যে, মৃত ভূমিকে জীবিত করা আল্লাহরই কাজ। আমি তো তোমাদের বোধগম্যের জন্যে স্বীয় নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে দিয়েছি।' (৫৭ঃ ১৬-১৭)

এই দুই আয়াতের প্রতি চিন্তা করলে দেখা যায় যে, কি সুন্দরভাবে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে! যেমনভাবে বৃষ্টির সাহায্যে শুষ্ক ভূমি সতেজ হয়ে উঠে, ঠিক তেমনিভাবে যে অন্তর অবাধ্যতা ও পাপের কারণে শক্ত হয়ে গেছে, ঈমান ও হিদায়েতের ফলে তা নরম ও দ্রবীভূত হয়ে থাকে। পরম দাতা ও দয়ালু বিশ্ব প্রভুর কবূলের প্রতি আশা-ভরসা রেখে আমরাও আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরকেও নরম করে দেন। আমীন!

## তাফসীর সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

তাফসীরের ব্যাপারে উত্তম ও সঠিক নিয়ম এই যে, কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারাই হবে। কারণ কুরআন মাজিদের বর্ণনা এক স্থানে সংক্ষিপ্ত হলেও অন্য স্থানে তার বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যাও রয়েছে। তারপর কোন অসুবিধের ক্ষেত্রে কুরআনের তাফসীর সাধারণতঃ হাদীস দ্বারাই হয়ে থাকে। কারণ হাদীস কুরআন কারীমেরই ব্যাখ্যা ও তাফসীর। বরং হযরত ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইদরীস শাফিঈ (রঃ) বলেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সমস্ত নির্দেশ প্রদান করেন কুরআন মাজীদ থেকেই অনুধাবন করার পর। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا *

অর্থাৎ 'আমি তোমার উপর এই মহাগ্রন্থ সত্যের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি লোকদের মধ্যে খোদার প্রদর্শিত ও নির্ধারিত নির্দেশ অনুসারে মীমাংসা করতে পার। সাবধান! তুমি বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবে না।' (৪ঃ ১০৫) আরও এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ *

অর্থাৎ 'আমি এই কিতাব তোমার উপর এজন্যেই অবতীর্ণ করেছি যে, তুমি মানুষের মতভেদের মীমাংসা করে দেবে, এই কিতাব ঈমানদারগণের জন্যে হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ।' (১৬ঃ ৬৪) অন্য একস্থানে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ *

অর্থাৎ 'আমি এই কুরআন কারীম তোমার উপর এজন্যেই অবতীর্ণ করেছি যে, তুমি তা মানুষের নিকট খোলাখুলিভাবে পৌছিয়ে দেবে, যেন তারা চিন্তা গবেষণা করতে পারে।' (১৬ঃ ৪৪)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাকে কুরআন কারীম দেয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে তারই মতো আরও একটি জিনিস দেয়া হয়েছে।'

এর ভাবার্থ হচ্ছে সুন্নাত। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, হাদীসসমূহও আল্লাহরই প্রত্যাদেশ। কুরআন মাজীদ যেমন ওয়াহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে তেমনই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসও আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী। কিন্তু কুরআন ওয়াহী মাতলু [১] এবং হাদীসসমূহ ওয়াহী গায়ের মাতলু'। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ও অন্যান্য বড় বড় ইমামরা দলীল প্রমাণ দ্বারা একথাকে উত্তম রূপে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে তা বর্ণনা করার তেমন সুযোগ ও অবকাশ নেই। একথা সত্য যে, পবিত্র কুরআনের তাফসীর প্রথমতঃ স্বয়ং কুরআন দ্বারা, অতঃপর হাদীস দ্বারা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)কে ইয়ামনে পাঠাবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ 'তুমি কিভাবে মানুষকে নির্দেশ দেবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ 'আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে।' পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ 'যদি তার মধ্যে না পাও?' বললেনঃ রাসূলুল্লাহর (সঃ) সুন্নাহর সাহায্যে'। আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ 'যদি তার মধ্যেও না পাওয়া যায়?' তিনি বললেনঃ 'আমি তখন নিজে থেকে ইজতিহাদ করবো।' 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই উত্তর শুনে তাঁর বুকে হাত রেখে বললেনঃ 'আমি আল্লাহর কাছে চির কৃতজ্ঞ যে, তিনি তাঁর নবীর (সঃ) দূতকে এমন বিষয়ের তাওফীক দান করেছেন যা তাঁর নবী (সঃ) মনে প্রাণে পছন্দ করেন।' এই হাদীসটি মুসনাদেও রয়েছে এবং

১. ওয়াহী মাতলু' -কুরআন হাকীম যা নামাযে পাঠ করলে নামায আদায় হয়ে থাকে। আর ওয়াহী গায়ের মাতুল' হাদীসসমূহ যা নামাযে পাঠ করলে নামায আদায় হয় না।

সুনানেও রয়েছে। সুতরাং এরই উপর ভিত্তি করে যখন কোন আয়াতের তাফসীর কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পাওয়া না যাবে তখন সাহাবীগণের (রাঃ) কথার দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। তাঁরা কুরআনের তাফসীর খুব ভাল জানতেন, কারণ যে ইঙ্গিত ও অবস্থা তখন ছিল তার সম্যক জ্ঞান তাঁদের থাকতে পারে যাঁরা সেই সময়ে সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া পূর্ণ বিবেক, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎ আমল তাঁরাই লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে ঐ সব মহামানব যাঁরা তাঁদের মধ্যেও বড় মর্যাদাসম্পন্ন এবং বিদগ্ধ আলেম ও চিন্তাবিদ ছিলেন, যেমন চারজন খলীফা যাঁরা অত্যন্ত সৎ ও হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলেন, অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমর ফারূক (রাঃ), হযরত উসমান যিন্নূরাইন (রাঃ), হযরত আলী মুরতাযা শের-ই-খোদা (রাঃ) এবং যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'সেই খোদার শপথ, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহর কিতাবের এমন কোন আয়াত নেই যার সম্পর্কে আমার বিলক্ষণ জানা নেই যে, তা কি ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যদি আমি জানতাম যে, আল্লাহর এই পবিত্র কিতাবের জ্ঞান আমার চাইতে আর কারও বেশী আছে এবং কোনও প্রকারে সেখানে পৌঁছতে পারতাম, তবে অবশ্যই তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর অনুগত বাধ্য ছাত্র হিসেবে আমি নিজেকে পেশ করতাম।' তিনি একথাও বলতেনঃ 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে পর্যন্ত না দশটা আয়াতের পূর্ণ ভাবার্থ জানতেন এবং তার উপর পূর্ণ আমল করতেন সে পর্যন্ত একাদশ আয়াতটি পড়তেন না। তাবেঈ হযরত আবদুর রহমান সালমা (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ 'যে পর্যন্ত আমরা দশটি আয়াতের ইল্ম ও আমল রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শিক্ষা না করতাম সেই পর্যন্ত আমরা সম্মুখে এক পাও অগ্রসর হতাম না।' মোট কথা কুরআনের জ্ঞান এবং তার উপর আমল দু'টাই তাঁরা বেশ অভিনিবেশ সহকারে সমভাবেই শিখতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁদেরই মধ্যে কুরআনের একজন বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং কুরআন মাজীদের একজন প্রথিতযশা ব্যাখ্যাতা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং তাঁর জ্ঞানের প্রাচুর্যের জন্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَ عَلِّمْهُ التَّاْوِيْلَ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ধর্মের প্রকৃত প্রজ্ঞা দান করুন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীরেরও জ্ঞান দান করুন।' হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ

(রাঃ) বলতেনঃ 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।' হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) এই কথাকে সামনে রেখে চিন্তা করুন যে, তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল হিজরী ৩২ সনে, আর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁর পরেও সুদীর্ঘ ৩৬ বছর জীবিত ছিলেন, তা হলে সেই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে কতো না উন্নতি লাভ করে থাকবেন! হযরত আবূ অয়েল (রঃ) বলেনঃ 'হযরত আলীর যুগে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হজ্জের দলপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ভাষণে সূরা বাকারা পাঠ করেন এবং এমন সুন্দরভাবে তাফসীর করেন যে, যদি তুরস্ক, রোম ও দহিলামের কাফিরগণ তা শুনতো তবে তারাও তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে মুসলমান হয়ে যেতো।' কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি উক্ত ভাষণে সূরা নূরের তাফসীর করেছিলেন। এই কারণেই ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান সুদ্দী কাবীর স্বীয় তাফসীরে ঐ দুই মহান ব্যক্তির অধিকাংশ তাফসীর নকল করে থাকেন। কিন্তু আহলে কিতাব থেকে এই সম্মানিত ব্যক্তি মাঝে মাঝে যে বর্ণনা নিয়ে থাকেন তাতেও তিনি ব্যক্ত করেন যে, বানী ইসরাঈল থেকে রেওয়ায়িত গ্রহণ করা বৈধ। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'একটি আয়াত হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দেবে। বানী ইসরাঈল হতে বর্ণনা নেওয়াতেও কোন দোষ নেই। ইচ্ছাপূর্বক আমার পক্ষ হতে মিথ্যে কথা প্রচারকারী সরাসরি জাহান্নামী।' ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত উবাইদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) ইয়াহূদ খৃষ্টানদের কিতাব দ্বয়ের দু'টি পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। এই হাদীসটিকে লক্ষ্যবস্তু করে ঐ পুস্তকদ্বয়ের কথাগুলোকেও তিনি নকল করতেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, বানী ইসরাঈলের বর্ণনাগুলো শুধু মাত্র ধর্মীয় নীতির পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করা যায়, তা থেকে ধর্মীয় নীতি সাব্যস্ত হতে পারে না। বানী ইসরাঈলের বর্ণনাগুলি তিন ভাগে বিভক্তঃ

(১) যেগুলোর সত্যতা স্বয়ং আমাদের এখানেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীসের অনুরূপ কোন বর্ণনা বানী ইসরাঈলের কিতাবেও পাওয়া। তার সত্যতায় কোন মতবিরোধ নেই।

(২) যেগুলো মিথ্যে হওয়ার প্রমাণ আমাদের নিকটেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ ওটা কোন আয়াত বা হাদীসের উল্টো। ওটা অসত্য হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

(৩) যেগুলোকে আমরা না পারি মিথ্যে বলতে না পারি সত্য বলতে। যেহেতু আমাদের নিকট এমন কোন বর্ণনা নেই যা অনুরূপ হওয়ার কারণে আমরা তাকে সঠিক বলতে পারি বা এমন কোন বর্ণনা নেই যা ওর উল্টো এবং যার উপর ভিত্তি করে আমরা ওকে মিথ্যে বা ভুল বলতে পারি। সুতরাং এই তৃতীয় প্রকারের বর্ণনাগুলো সম্পর্কে আমরা নীরব রয়েছি। আমরা ওগুলোকে ভুলও বলি না, সঠিকও বলি না। তবে ঐগুলো বর্ণনা করা বৈধ। এই বর্ণনাগুলোও এরূপ যে, ওতে আমাদের ধর্মের কোন উপকার নেই। তাছাড়া এরূপ কথার বর্ণনায় স্বয়ং আহলে কিতাবের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ বিদ্যমান রয়েছে এবং এই একই কারণে ঐ বর্ণনাগুলো গ্রহণকারী মুফাসসিরগণের মধ্যে এইরূপই মতভেদ পাওয়া যায়। যেমন গুহাবাসীগণের নাম, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে পাখীগুলিকে খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, অতঃপর খোদার আদেশে ওরা জীবিত হয়েছিল ঐ পাখীগুলির নাম কি ছিল, যে নিহত ব্যক্তিকে হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে গাভী যবহ্ করে ও একটি গোশত খণ্ড দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এবং যার ফলে আল্লাহর আদেশে সে পুনর্জীবিত হয়েছিল, ওটা কোন্ খণ্ড ছিল এবং কোন্ জায়গায় ছিল, আর সেটি কোন্ বৃক্ষ ছিল যার উপর হযরত মূসা (আঃ) আলো দেখেছিলেন এবং যেখান থেকে আল্লাহর কথা শুনেছিলেন ইত্যাদি। সুতরাং ওগুলি এমনই জিনিস যার উপর আল্লাহ তা'আলা যবনিকা নিক্ষেপ করেছেন, আর ঐগুলো জানায় বা না জানায় কোন লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত রয়েছি এবং তাতে নিয়োজিত থাকলে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন উপকারই নেই। তবে হাঁ ঐ মতভেদগুলোকে নকল করা জায়েয। যেমন স্বয়ং পবিত্র কুরআনে গুহাবাসীদের সংখ্যার মতানৈক্য বর্ণিত হয়েছে। বলা হচ্ছেঃ

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَّ لَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا *

অর্থাৎ 'তারা বলে থাকে যে, গুহাবাসীগণ তিনজন ছিল এবং চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর এবং বলে যে, তারা পাঁচজন ছিল এবং ষষ্ঠটি ছিল কুকুর, এসব হচ্ছে ধারণামূলক কথা এবং তারা এটাও বলে যে, তারা ছিল সাতজন এবং

অষ্টম ছিল কুকুরটি; হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও যে, তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমার প্রভুই ভাল জ্ঞান রাখেন; তোমরা এই ব্যাপারে শুধুমাত্র প্রকাশ্যভাবে আলোচনা কর এবং তাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।' (১৮ঃ ২২)

উক্ত আয়াতে বলে দেয়া হলো যে, এরূপ স্থলে আমাদের কি করা উচিত। মহান আল্লাহ এখানে তিনটি কথা বললেন। দু'টিকে তো দুর্বল বলে মীমাংসা করলেন আর তৃতীয়টির উপর দুর্বলতার ফয়সালা দিলেন না। এর দ্বারা জানা গেল যে, এটা সঠিক। কেননা, এটাও যদি অসত্য হতো তা হ'লে ঐদুটোর মতো এটাকেও অগ্রাহ্য করা হতো। আবার সাথে সাথে এটাও ঘোষণা করা হলো যে, তাদের সংখ্যা জেনে কোন লাভ নেই। সুতরাং ওর পিছনে লেগে থাকা উচিত নয়। বরং মানুষের উচিত একথা বলা যে, তাদের সংখ্যার প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। এমন খুব কম লোকই রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এভাবে এই আয়াতসমূহ দ্বারা আমরা অবগত হলাম যে, কোন মতভেদকে নকল করার উত্তম পন্থা হলো সমস্ত মতভেদপূর্ণ কথা বর্ণনা করে সঠিক ও বেঠিক কথা জানিয়ে দেয়া এবং মতভেদের উপকারিতাও বর্ণনা করে দেয়া। যে ব্যক্তি মতভেদ বর্ণনা করার সময় সমস্ত কথা বর্ণনা করে না সে ভুল করে। কারণ হতে পারে যে, যা সে ছেড়ে দিল ওটাই সঠিক ছিল। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মতভেদ নকল করতঃ ওর ফয়সালা না দিয়েই ছেড়ে দিল সেও ভুল করলো। যদি বেঠিককে জেনে শুনে সঠিক বলে দেয় তবে সে মিথ্যাবাদী। আর যদি অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ করে তবেও সে ত্রুটিকারী। এভাবে যে ব্যক্তি কোন একটি সূক্ষ্ম কথার মধ্যে যাতে কোন বড় উপকার নেই, সমস্ত মতভেদপূর্ণ কথা নকল করে ফেললো কিংবা এমন মতভেদসমূহ নকল করার কাজে বসে পড়লো যার শব্দগুলি বিভিন্ন প্রকারের কিন্তু পরিণাম হিসেবে হয়তো বা মতভেদ সম্পূর্ণরূপে উঠে গেল বা সাধারণ মতভেদ থেকে গেল, সেও নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিলো এবং কোন উপকারী কাজ করলো না। তার উপমা এমনই যেমন কেউ দুখানা ছোট কাপড় পরিধান করলো। মোটকথা ভাল এবং সরল-সঠিক কথার সামর্থ প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহরই হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

# পরিচ্ছেদ

কোন আয়াতের তাফসীর কুরআন, হাদীস এবং সাহাবীবৃন্দের কথার মধ্যে পাওয়া না গেলে ধর্মীয় ইমামগণের অধিকাংশের অভিমত এই যে, এরূপ স্থলে তাবেঈগণের তাফসীর নেয়া হবে। যেমন মুজাহিদ বিন জবর (রঃ) যিনি তাফসীরের ব্যাপারে আল্লাহর একটি নিদর্শন ছিলেন। তিনি স্বয়ং বলেনঃ 'আমি তিনবার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) নিকট শিখেছি ও বুঝেছি। একটি আয়াতকে জিজ্ঞেস করে করে এবং বুঝে বুঝে পড়েছি।.

ইবনে আবি মুলায়কাহ্ (রঃ) বলেনঃ 'আমি স্বয়ং হযরত মুজাহিদকে (রঃ) দেখেছি যে, তিনি কিতাব, কলম, দোয়াত নিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট যেতেন এবং কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস করে করে তাতে নিরন্তর লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি এভাবেই সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর নকল করেন।' হযরত সুফইয়ান সাওরীর (রঃ) তো কথাই ছিল যে, হযরত মুজাহিদ (রঃ) কোন আয়াতের তাফসীর করে দিলে তার সত্যাসত্য যাচাই করা বাহুল্য মাত্র। তার তাফসীরই যথেষ্ট।

হযরত মুজাহিদের (রঃ) মত হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) ক্রীতদাস হযরত ইকরামা (রাঃ), হযরত আতা' বিন আবি রাবাহ্ (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত মসরূক বিন আজদা' (রঃ), হযরত সাঈদ বিন মুসআব (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ) প্রভৃতি তাবেঈ ও তাবে'তাবেঈগণের এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের তাফসীর বিশ্বাসযোগ্যরূপে গণ্য করা হবে। কখনও এরূপও হয়ে থাকে যে, কোন আয়াতের তাফসীরের মধ্যে যখন ঐ সব গুরুজনের কথা বর্ণনা করা হয় এবং তাঁদের শব্দের মধ্যে বাহ্যত মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তখন বিদ্যাহীন ব্যক্তিরা সেটিকে মৌলিক মতভেদ মনে করে বলে থাকে যে, এই আয়াতের তাফসীরে মতভেদ রয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয় না। বরং একটি জিনিসের ব্যাখ্যা কেউ হয়তো তার 'লাযিম' দ্বারা করেছেন, কেউ হয়তো করেছেন ওর দৃষ্টান্তের দ্বারা, আবার কেউ হয়তো স্বয়ং ঐ জিনিসকেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এসব অবস্থায় শব্দের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলেও অর্থ একই থাকে। এসব স্থলে জ্ঞানীদের সন্দেহে পতিত না হওয়াই উচিত। আল্লাহই সবার জন্যে সঠিক পথের পরিচালক।

শুবাহ বিন হাজ্জাজ (রঃ) বলেন যে, ফুরূ' বা শাখা বিশিষ্ট মাসয়ালায় যখন তাবেঈগণের কথা দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হয় না, তখন কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে তা কিভাবে দলীলরূপে গৃহীত হতে পারে? শুবাহের এ কথা সঠিক যে, তাঁদের মতভেদকারীগণের উপর তাঁদের কথা দলীল হতে পারে না, কিন্তু তারা সম্মিলিতভাবে যে কথা বলবেন সেটা দলীল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে মতানৈক্যের সময় তাঁদের একের কথা অপরের উপর দলীল হতে পারে না এবং অন্যান্যদের উপরেও না। এমতাবস্থায় কুরআন ও হাদীসের ভাষা, আরবদের সাধারণ ভাষা এবং সাহাবা-ই-কিরামের (রাঃ) কথার দিকে ফিরে যেতে হবে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র স্বীয় অভিমত দ্বারা তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কুরআনের মধ্যে স্বীয় মত ঢুকিয়ে দিল কিংবা না জেনে -শুনে কিছু বলে দিল, সে জাহান্নামের মধ্যে স্বীয় স্থান একেবারে নির্দিষ্ট করে নিল।' তাফসীর-ই-ইবনে জারীর, জামি'উত্ তিরমিযী এবং সুনান-ই-আবি দাঊদের মধ্যে এই হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই শব্দগুলোই হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত জুনদব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের মধ্যে স্বীয় মতানুযায়ী কিছু বললো সে ভুল করলো (ইবনে জারীর)। সুনান-ই-আবি দাঊদ, জামি'উত্ তিরমিযী এবং সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও এই হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে গারীব বলেছেন এবং এর বর্ণনাকারী সাহীল সম্পর্কে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি সমালোচনাও করেছেন। এই হাদীসে এই শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অভিমত দ্বারা কুরআনের মধ্যে কোন সঠিক কথাও বলে দিল সেও ভুল করলো। কেননা সে এমন জিনিসের অবতারণা করলো যে সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল না এবং এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করলো যা গ্রহণ করা কোনক্রমেই উচিত ছিল না। সুতরাং যদিও তার মুখ দিয়ে সঠিক কথা বেরিয়ে গেল তথাপি সে দোষী ও অপরাধী। এই ব্যক্তির সঠিক কথার উপর জবাবদিহি কম হবে তা অন্য কথা। কিন্তু দোষী তো বটে। আল্লাহ তা'আলাই সব কিছু ভাল জানেন। যেমন অপবাদ দেওয়ার পর সাক্ষী উপস্থিতি করত অসমর্থ হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, যদিও সে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদীই হয় এবং যাকে সে জ্বেনা বা ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে সে যদিও প্রকৃতই ব্যভিচারী হয়। কিন্তু যেহেতু বিনা সাক্ষ্যে উক্ত সংবাদ ছড়ানো উচিত ছিল না অথচ সে ছড়িয়েই দিল, সুতরাং সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলো। আল্লাহই এসব ব্যাপারে ভাল জানেন। এই কারণেই পূর্ব যুগের একটি বড় দল না জেনে-শুনে তাফসীর করতে খুব ভয় করতেন বরং তাঁদের সর্ব অবয়ব কেঁপে

উঠতো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রাঃ) উক্তি আছেঃ 'যদি কুরআনের মধ্যে এমন কথা বলি যা আমার জানা নেই তবে কোন মাটি আমাকে উঠাবে ও কোন আকাশ আমাকে ছায়া দেবে? একদা তাঁকে وَ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا -এর তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ 'যখন আমি কুরআনের মধ্যে এমন কথা বলবো যা আমি জানি না, তখন কোন আকাশ আমাকে ছায়া দেবে এবং কোন ভূমি আমাকে উঠাবে?' এই বর্ণনাটি লুপ্ত। একবার হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) ঐ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ فَاكِهَةً কে তো আমি জানি কিন্তু এই اَبًّا কি জিনিস?' তারপর তিনি নিজে নিজেই বলেনঃ 'তুমি এই কষ্টে কেন পড়ছো?' হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ 'আমি হযরত উমার বিন খাত্তাবের (রাঃ) পার্শ্বে ছিলাম। তার জামার পিছনে চারটি তালি ছিল। তিনি وَفَاكِهَةً وَّ اَبًّا এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ اَبًّ কি জিনিস? আবার বলেনঃ 'এই কষ্টের তোমার প্রয়োজন কি?' ভাবার্থ এই যে, اَبًّ-এর অর্থ তো জানা আছে অর্থাৎ ভূমি হতে উৎপাদিত শস্য। কিন্তু ওর অবস্থা ও গুণ সম্পর্কে জানা নেই। স্বয়ং এই আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে, فَاَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ـ وَّ عِنَبًا অর্থাৎ 'আমি জমীনের মধ্য হতে ফসল এবং আঙ্গুর উৎপাদন করেছি।' (৮০ঃ ২৭-২৮) তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইবনে আবি মুলাইকাহ্ (রঃ) বলেনঃ 'হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে কোন এক ব্যক্তি একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুই বর্ণনা করলেন না। অথচ যদি ওর তাফসীর আপনাদের মধ্যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করা হতো তবে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে দিতেন।' অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো-'কুরআন কারীমের মধ্যে এক হাজার বছরের সমান একটি দিন উল্লেখ আছে, ওটা কি?' তিনি বললেনঃ 'পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান একটি দিনের উল্লেখ আছে, তবে এটা কি?' সে বললো 'আমি শুধু জানতে চাচ্ছি।' তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে দুটি দিন যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ওর প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।' তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, এত বড় মুফাস্‌সির হয়েও তিনি তাফসীরের ব্যাপারে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, যা তার জানা নেই তা বর্ণনা করতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে রয়েছে যে, একদা তালাক বিন হাবীব (রাঃ) হযরত জুনদব বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) কে একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেনঃ 'যদি তুমি মুসলমান হও তবে তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি এখান হতে চলে যাও।' হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রঃ)কে কুরআনের আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে বলতেনঃ 'আমি কুরআনের মধ্যে কিছুই বলি না।' তাঁর অভ্যাস এই ছিল যে, যা কিছু জানা

থাকতো তাই তিনি কুরআনের তাফসীরের বর্ণনা করতেন। একবার এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ 'আমাকে কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস না করে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর যিনি বলেন যে, তাঁর নিকট কুরআনের কোন আয়াত গুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইকরামা।' হযরত ইয়াযীদ বিন আবূ ইয়াযীদ (রঃ) বলেনঃ 'আমরা হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রঃ)কে হালাল ও হারাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম। তিনি একজন মস্ত বড় বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে এমন নীরব হয়ে যেতেন যে, যেন তিনি শুনতেই পাননি।' হযরত উবাইদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি মদীনার বড় বড় ধর্মশাস্ত্রবিদগণকে দেখেছি যে, তাঁরা কুরআনের তাফসীর করতে বেশ সংকোচবোধ করতেন। যেমন হযরত সালিম বিন আবদুল্লাহ (রঃ), কাসেম বিন মুহাম্মদ (রঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রঃ), নাফে' (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ।' হযরত হিশাম (রঃ) বলেনঃ আমি আমার আব্বা উরওয়াহ (রঃ) কে কখনও কোন আয়াতের তাফসীর করতে শুনিনি।' হযরত উবাইদুল্লাহ সালমানীকে (রঃ) কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে বলতেনঃ কুরআনের আয়াতগুলি যে সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান যাঁদের ছিল তাঁরা তো দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন।' হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার (রঃ) বলতেনঃ 'কুরআনের তাফসীর করার সময় তোমরা আগে পিছে দেখে নিও। কারণ এতে খোদা তা'আলার প্রতি পূর্ণ সম্বন্ধ রেখে কথা বলা হচ্ছে।' হযরত ইবরাহীম (রঃ) বলেনঃ 'আমার সকল সহচর কুরআনের তাফসীরকে বড় জিনিস মনে করতেন এবং তাঁরা এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত শা'বী (রঃ) বলেনঃ 'যদিও কুরআন মাজীদের এক একটি আয়াতের বিদ্যা অর্জন করেছি, তথাপি এ ব্যাপারে কিছু বলতে আমি বিশেষভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ি। কারণ বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ হতে করা হচ্ছে।' হযরত মাসরূক (রঃ) উক্তি করেনঃ 'তাফসীরের ব্যাপারে তোমরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করো কেননা এতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হতে বর্ণনা করা হয়। এই সমুদয় উক্তি যা অতীতের মহান ব্যক্তিগণ হতে করা হয়েছে তাতে একথাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে যে, ঐ সমস্ত আলেম কখনও না জেনে কুরআনের ভাবার্থের ব্যাপারে মুখ খুলতেন না। হাঁ, তবে অভিধানের উৎস থেকে ও শরীয়তের উৎস থেকে যে তাফসীর জানা থাকে তা বর্ণনা করায় কোন দোষ নাই। এজন্যেই কুরআনের তাফসীরে বহু বর্ণনা ঐ সকল গুরুজন হতে বর্ণিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, ঐসব সম্মানিত পণ্ডিতব্যক্তি যখন কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা অলম্বন করতঃ তা হতে বিরত থাকতেন, তা হলে তাঁদের হতে তাফসীর কেন নকল করা হয়েছে? এর উত্তরে বলা যাবে যে, যা তাঁরা জানতেন না শুধু সেখানেই

নীরব থাকতেন এবং যা জানতেন তা বর্ণনা করতেন। সুতরাং না জানা অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করা এবং জ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করাই সকলের উচিত। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছেঃ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ অর্থাৎ 'তোমরা অবশ্য ওটা জনগণের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।' (৩ঃ ১৮৭) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ 'যাকে ধর্মনীতি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা জানা সত্ত্বেও গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরান হবে।' তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সব আয়াতেরই তাফসীর করতেন যেগুলোর তাফসীর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বুঝিয়ে যেতেন। কিন্তু এ হাদীসটি 'মুনকার' ও 'গারীব' এবং এর বর্ণনাকারী যাফর মুহাম্মদ বিন খালিদ বিন যুবাইর বিন আওয়াম কুরাঈশীর পুত্র। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, তার হাদীসের অনুসারী হওয়া চলে না। হাফিয আবুল ফাত্হ আজভী বলেন যে, এই হাদীসটি 'মুনকার'। এটা সঠিক হলেও তার প্রকৃত ভাবার্থ এই হতে পারে যে, ওটা হতে ঐ আয়াতগুলিই উদ্দেশ্য যেগুলির অর্থ আল্লাহ তা'আলার বলে দেয়া ছাড়া জানা যায় না। এই আয়াতগুলির ভাবার্থ হযরত জিব্রাঈলের (আঃ) মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে জানিয়ে দেওয়া হতো। ইমাম আবূ যাফর এই বর্ণনার যে অর্থ বলেছেন ওর সারাংশও এটাই এবং এই অর্থই সঠিক হতে পারে। কেননা কুরআন কারীমের মধ্যে এমন আয়াতসমূহও রয়েছে যার জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে এবং সেগুলোও আছে যার জ্ঞান আলেমদের আছে এবং ওগুলোও রয়েছে যা আরবের লোক তাদের ভাষার মাধ্যমে বুঝতে পারে। তাছাড়া এমন আয়াতও রয়েছে যার ভাবার্থ এত প্রকাশমান যে, কারও কোন আপত্তি অবশিষ্ট থাকে না। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাফসীর চার প্রকারঃ

(১) যা আরবের ভাষা দ্বারা জানা যায়।
(২) যার অব্যক্ততায় কোন মতবিরোধ নেই।
(৩) যা শুধুমাত্র আলেমগণই জানেন।
(৪) যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না।

একটি মারফূ' হাদীস এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে। কিন্তু ওর সনদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন চার পন্থায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছেঃ (১) হারাম ও হালালের আয়াতগুলো, জনগণ এগুলো না জানলে কিয়ামতের দিন তাদের কোন আপত্তি চলবে না। (২) ঐ তাফসীর যা আরব বর্ণনা করে। (৩) সেই তাফসীর যা আলেমেরা জানতে পারে। (৪) ঐ অস্পষ্ট আয়াতসমূহ যার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ লাভ করতে

পারেননি। যারা ওগুলো জানার দাবী করে তারা মিথ্যাবাদী।' এ হাদীসের সনদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন সাইব ফালবী রয়েছে, যার হাদীস বর্জনীয়। হতে পারে যে, তিনি 'মাওকুফ' বর্ণনাকে অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) কথাকে মারফূ' হাদীস মনে করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

## সূরা-ই আল ফাতিহার তাফসীর এবং এ সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট ভূমিকাঃ

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেনঃ 'সূরা-ই বাকারাহ, সূরা-ই আলে ইমরান, সূরা-ই নিসা, মায়েদাহ, বারাআত, রা'দ, নাহল, হাজ্জ, নূর, আহযাব, মুহাম্মদ, ফাতহ্, হুযুরাত, রাহমান, হাদীদ, মুজাদালাহ্, হাশর, মুমতাহিনাহ্, সাফ, জুমুআ, মুনাফিকূন, তাগাবুন, তালাক, তাহরীম, যিলযাল এবং নাসর—এসব সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবিশিষ্ট সমুদয় সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন কারীমের মোট আয়াত ৬ (ছয়) হাজার। এর চেয়ে বেশী আছে কিনা সে বিষয়ে কুরআন বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে এর চেয়ে বেশী নেই। কেউ কেউ বলেন যে, ছয় হাজারের চাইতে আরও দু'শ চারটি আয়াত বেশী রয়েছে। কেউ কেউ মোট ছয় হাজার দু'শ চৌদ্দটির কথা উল্লেখ করেন। আবার কেউ দু'শ উনিশটি, কেউ দু'শ পঁচিশটি এবং কেউ দু'শ ছাব্বিশটির বেশীর কথা উল্লেখ করেন। আবূ আমর দানী 'কিতাবুল বায়ানের' মধ্যে এসব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। কুরআন মাজীদের শব্দ সম্পর্কে হযরত আতা বিন ইয়াসার (রঃ) বলেন যে, সাতাত্তর হাজার চারশো উনচল্লিশটি শব্দ রয়েছে। অক্ষরের সংখ্যা সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সম্পূর্ণ কুরআন কারীমের মোট অক্ষর হলো তিন লক্ষ একুশ হাজার একশ আশিটি। ফযল বিন আতা বিন ইয়াসার বলেন যে, মোট অক্ষর হলো তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনরটি। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বীয় শাসনামলে ক্বারী, হাফিয ও লেখকদের একত্রিত করে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন কুরআন কারীমের অক্ষরগুলি গণনা করে তাঁকে অবহিত করেন। ফলে, হিসাব করে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা বলেন যে, কুরআনে মোট তিন লক্ষ সাত শ' চল্লিশটি অক্ষর রয়েছে। অতঃপর হাজ্জাজ বলেনঃ 'আচ্ছা বলুনতো অক্ষর হিসেবে কুরআনের অর্ধাংশ কোথায় হবে?' গণনা করে জানা গেল যে, সূরা-ই-কাহাফ'-এর وَلْيَتَلَطَّفْ -এর ف পর্যন্ত কুরআনের ঠিক অর্ধাংশ হবে। আর সূরা-ই-বারাআতের একশ আয়াত পর্যন্ত কুরআনের কারীমের এক তৃতীয়াংশ হবে। সূরা-ই-শু'রা-এর একশ আয়াতের সূচনার উপর বা একশ এক আয়াতের সূচনার উপর কুরআন মাজীদের দুইতৃতীয়াংশ হয় এবং সেখান হতে শেষ পর্যন্ত শেষ তৃতীয়াংশ। আর

যদি কুরআন মাজীদের মানযিল গণনা করা যায়, অর্থাৎ যদি কুরআন কারীমকে সাত ভাগ করা হয়, তবে প্রথম মানযিল صَدَّ এর د -এর উপর শেষ হবে যা নিম্নের আয়াতের মধ্যে রয়েছেঃ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ দ্বিতীয় মানযিল শেষ হবে حَبِطَتْ-এর ت -এর উপর যা সূরা-ই-আ'রাফের اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ এই আয়াতের মধ্যে রয়েছে। তৃতীয় মানযিল اُكُلُهَا নামক বাক্যাংশের শেষ 'ا'-এর উপর গিয়ে সমাপ্ত হয়, যা সূরা-ই-রাদের মধ্যে বিদ্যমান। চতুর্থ মানযিল শেষ হয় جَعَلْنَا-এর 'ا' (আলিফ)-এর উপর যা সূরা-ই-হাজ্জের আয়াত جَعَلْنَا مَنْسَكًا-এর মধ্যে রয়েছে। পঞ্চম মানযিল مُؤْمِنَةٍ -এর ة -এরউপর শেষ হয় যা সূরা-ই-আহযাবের আয়াত وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ -এর মধ্যে রয়েছে। ষষ্ঠ মানযিল اَلسَّوْءِ -এর 'و' -এর উপর শেষ হয় যা সূরা-ই-ফাতাহ্-এর আয়াত اَلظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ-এর মধ্যে রয়েছে এবং সপ্তম মানযিল হলো কুরআন পাকের শেষাংশ।

আবূ মুহাম্মদ সালাম হামানী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উপর্যুপরি চার মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো জানতে পারেন এবং তা সমসাময়িক শাসনকর্তা হাজ্জাজের কাছে বর্ণনা করেন। হাজ্জাজ প্রতি রাতে নিয়মতিভাবে এক চতুর্থাংশ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এই হিসেবে সূরা-ই কাহাফের وَ لْيَتَلَطَّفْ শব্দের উপর হয় সমগ্র কুরআনের অর্ধাংশ। তিনচতুর্থাংশ হয় সূরা-ই-যুমারের শেষের উপর এবং সম্পূর্ণ হয় সুরা-ই-নাসের উপর।

শাইখ আবূ আমর দানীও স্বীয় পুস্তক 'কিতাবুল বায়ানে' এসব কথার মধ্যে যে ইখ্‌তিলাফ বা মতবিরোধ রয়েছে তা হুবহু নকল করেছেন। এখন বাকী থাকলো পাঠের দিক দিয়ে কুরআন মাজীদের খণ্ড ও অংশসমূহের কথা। খণ্ড বা অংশসমূহ হচ্ছে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিশটি পারা। সাহাবাই-কিরাম যে কুরআন মাজীদকে সাত মানযিলে বিভক্ত করে পড়তেন, এরূপ একটি বর্ণনাও হাদীসে রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমদ, সুনান-ই-আবি দাউদ এবং সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ 'আপনারা কুরআনের ওযীফা কিভাবে করেন'? উত্তরে তাঁরা বলেছিলেনঃ '১ম তিন সূরায় এক মানযিল, পরবর্তী পাঁচটি সূরায় ২য় মানযিল, এর পরবর্তী ৭টি সূরায় ৩য় মানযিল, পরবর্তী ৯টি সূরায় ৪র্থ মানযিল, এর পরবর্তী ১১টি সূরায় পঞ্চম মানযিল, পরবর্তী ১৩টি সূরায় ৬ষ্ঠ মানযিল, এবং মুফাস্‌সালের অর্থাৎ সুরা-ই-ক্বাফ হতে সূরা-ই-নাস অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সপ্তম মানযিল। এভাবেই নবী করীম (সঃ) ও তাঁর সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) সাত মানযিলে বিভক্ত করে কুরআন কারীম তেলাওয়াত করতেন।

## "سُوْرَةٌ" শব্দের তাহকীক বা বিশ্লেষণ

سُوْرَةٌ শব্দের শাব্দিক আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ পৃথকীকরণ ও উচ্চতা। প্রখ্যাত জাহেলী কবি নাবিগার নিম্নের কবিতার মধ্যে سُوْرَةٌ শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছেঃ

الم تر ان الله اعطاك سورة * ترى كل ملك دونها يتذبذب

অর্থাৎ 'তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ পাক তোমাকে এমন মহান মর্যাদা দান করেছেন যা নিম্ন স্তর দিয়ে প্রতিটি রাজা-বাদশাহ ইতস্ততঃ আনাগোনা করে।' তা হলে কুরআনের সূরাসমূহের সঙ্গে এই অর্থের সম্পর্ক এইভাবে হবে যে, যেন কুরআনের পাঠক এক সূরা বা উচ্চ মর্যাদা হতে আরও উচ্চতম মর্যাদার দিকে পৃথক পৃথকভাবে যেতে পারে বা আরোহণ করতে পারে। একথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো সৌজন্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। এজন্যেই দূর্গ বা নগর প্রাকারকে আরবী ভাষায় 'سُوْرٌ' বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, লোটা বা বর্তনের মধ্যে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে আরবী ভাষায় 'سَارَةٌ' বলা হয়। যেহেতু সূরাও পবিত্র কুরআনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই একে সূরা নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর 'হামযাহ'- টিকে হালকা করে দিয়ে তাকে 'وَاوْ'-এর সঙ্গে পরিবর্তন করা হয়েছে। একটি মত এটাও আছে যে, সূরার অর্থ হলো সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা। পূর্ণ উষ্ট্রীকে আরবী ভাষায় 'سُوْرَةٌ' বলে। সম্ভবতঃ দূর্গকে 'سُوْرٌ' বলার কারণ এই যে, ওটা যেমন প্রাসাদকে ঘিরে থাকে ও একত্রিত করে থাকে ঠিক তেমনই সূরাও আয়াতসমূহকে জমা করে থাকে। কাজেই ওকে সূরা বলা হয়েছে। 'سُوْرَةٌ' শব্দের বহুবচন 'سُوَرٌ' হয়, আবার কখনো কখনো سُوْرَاتٌ এবং سُوَارَاتٌও হয়ে থাকে।

اٰيت কে اٰيت বলার কারণ এই যে, اٰيت -এর শাব্দিক অর্থ হলো চিহ্ন বা নিদর্শন। যেহেতু আয়াতের উপর বাক্য শেষ হয় এবং পূর্ববর্তী বাক্যটি পরবর্তী বাক্য হতে পৃথক হয় সেজন্য তাকে 'اٰيت' বলা হয়। কুরআন কারীমের মধ্যে اٰيت শব্দটি চিহ্ন বা নিদর্শনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ অর্থাৎ তাঁর (হযরত তালূত আঃ এর) বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন বা চিহ্ন। (২ঃ ২৪৮) এভাবে প্রখ্যাত প্রাক ইসলামী কবি নাবিগার নিম্নের কবিতার মধ্যেও 'اٰيت' শব্দটি উল্লিখিত অর্থেই ব্যবহার হয়েছেঃ

توهمت ايات لها فعرفتها * لستة اعوام و ذا العام سابع

اٰيت শব্দের অর্থ দলও হয়ে থাকে। আরবদের কবিতায় এই শব্দটি এই অর্থেই এসেছে। যেহেতু اٰيت শব্দটিও অক্ষরসমূহের সমষ্টি ও দল, এ দিকে লক্ষ্য রেখে তাকেও আয়াত বলা হয়। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়ঃ

خَرَجَ الْقَوْمُ بِاٰيَاتِهِمْ অর্থাৎ "জাতি তার সমস্ত দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেনঃ

خَرَجْنَا مِنَ النَّقِبَيْنِ لَاحَيَّ مِثْلَنَا * بِاٰيَاتِنَا نُزْجِي اللِّقَاحَ الْمَطَافِلَا

اٰيَتٌ এর অর্থ বিস্ময়করও হয়ে থাকে। যেহেতু এটা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর জিনিস এবং অলৌকিক বস্তু, কোন মানুষই এ ধরনের কথা বলতে পারে না, এজন্যে একেও আয়াত বলা হয়। সিবওয়াই বলেন যে, এটা মূলে ছিল 'اَيَيَةٌ' যেমন 'اَكَمَةٌ' এবং 'شَجَرَةٌ' । প্রথম يَا টি আরবী ব্যাকরণ অনুসারে اَلِفْ হয়েছে। কাসাই বলেন যে, اٰيَتٌ মূলে ছিল اٰيِيَةٌ যেমন اٰمِنَةٌ , يَا টি اَلِفْ হয়েছে এবং জটিলতার কারণে লোপ পেয়েছে। ফাররা বলেনঃ 'এটা মূলে ছিল اَيِّيَةٌ, অতঃপর তাশদীদের কারণে اَلِفْ এ পরিবর্তিত হয়ে اٰيَةٌ হয়েছে। اٰيَةٌ শব্দের বহুবচন اٰيٍ, اٰيَايٍ এবং اٰيَاتٌ হয়ে থাকে। আরবীতে একটি শব্দকে كَلِمَةٌ বলা হয়। কখনো কখনো ওতে দু'টি মাত্র অক্ষর থাকে। যেমন مَا, لَا, لَهُ ইত্যাদি। আবার কখনও বেশীও আসে। খুব বেশী আসলে كَلِمَةٌ-এর মধ্যে দশটি অক্ষর আসে। যেমন لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, اَنُلْزِمُكُمُوْهَا এবং اَفَاسْقَيْنَاكُمُوْهُ- আবার কখনো একটি كَلِمَةٌ দ্বারাই একটি اٰيَتٌ হয়। যেমন- وَالْفَجْرِ, وَالضُّحٰى এবং وَالْعَصْرِ আর অনুরূপভাবে কুফাবাসীদের নিকট الٓمٓ, طٰهٰ, يٰسٓ এবং حٰمٓ প্রমুখ সূরাসমূহের প্রাথমিক শব্দগুলিও এক একটি আয়াত এবং حٰمٓ عٓسٓقٓ তাদের মতে দু'টি كَلِمَةٌ এবং তারা ছাড়া অন্যেরা বলে যে, এইগুলি اٰيَتٌ নয়, বরং سُوْرَةٌ সমূহেরই প্রারম্ভিক শব্দ। আবূ আমর দানী বলেন যে, 'সূরা-ই-রাহমানের অন্তর্গত مُدْهَامَّتَانِ ব্যতীত কুরআনের মধ্যে একটি كَلِمَةٌ-এর আয়াত আর নেই।

কুরতবী বলেন, 'জমহূর উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের মধ্যে আরবী ভাষা ছাড়া আজমী বা অনারব ভাষার গঠন প্রণালী ও আঙ্গিক আদৌ নেই, তবে মাঝে মাঝে অনারব নাম রয়েছে মাত্র; যেমন, ইবরাহীম, নূহ, লূত। এই ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ রয়েছে যে, এগুলো। ছাড়া কুরআনের মধ্যে অনারবদের অন্য কিছু আছে কি না। ইমাম বাকিল্লানী এবং তাবারী তো পরিষ্কারভাবে একথা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, আজমিয়াত বা অনারবের সঙ্গে যেটুকু সাদৃশ্য রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আরবীই বটে, শুধুমাত্র কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

## সূরাঃ ফাতিহা মাক্কী

(আয়াতঃ ৭, রুকূ'ঃ ১)

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا: ٧، رُكُوْعُهَا: ١)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এই সূরাটির নাম 'সূরা-ই-আল্ ফাতিহাহ্। কোন কিছু আরম্ভ করার নাম 'ফাতিহাহ্' বা উদ্ঘাটিকা। কুরআন কারীমের মধ্যে প্রথম এই সূরাটি লিখিত হয়েছে বলে একে 'সূরা-ই-আল্ ফাতিহাহ্ বলা হয়। তাছাড়া নামাযের মধ্যে এর দ্বারাই কিরাআত আরম্ভ করা হয় বলেও একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'উম্মুল কিতাব'ও এর অপর একটি নাম। জমহূর বা অধিকাংশ ইমামগণ এ মতই পোষণ করে থাকেন। কিন্তু হাসান বসরী (রঃ) এবং ইবনে সীরীন (রঃ) একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, 'লাও-হি মাহফূয' বা সুরক্ষিত ফলকের নামও উম্মুল কিতাব। হাসানের উক্তি এই যে, প্রকাশ্য আয়াতগুলোকে উম্মুল কিতাব বলা হয়। জামে'উত তিরমিযীর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এই সূরাটি হলো উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবআ' মাসানী এবং কুরআন আযীম'। এই সূরাটির নাম 'সূরাতুল হামদ' এবং 'সূরাতুস্ সালাত'ও বটে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমি সালাতকে (অর্থাৎ সূরা-ই-ফাতিহাকে) আমার মধ্যে এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি। যখন বান্দা বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।' এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরা-ই-ফাতিহার নাম সূরা- ই-সালাতও বটে। কেননা এই সূরাটি নামাযের মধ্যে পাঠ করা শর্ত রয়েছে। এই সূরার আর একটি নাম সূরাতুশ্ শিফা। দারিমীর মধ্যে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, সূরা-ই-ফাতিহা প্রত্যেক বিষ ক্রিয়ায় আরোগ্যদানকারী। এর আর একটি নাম 'সূরাতুর রকিয়্যাহ'। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) সাপে কাটা রুগীর উপর ফুঁ দিলে সে ভাল হয়ে যায়। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ এটা যে রকিয়্যাহ (অর্থাৎ পড়ে ফুঁ দেয়ার সূরা) তা তুমি কেমন করে জানলে?'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ সূরাকে 'আসাসুল কুরআন' বলতেন। অর্থাৎ কুরআনের মূল বা ভিত্তি। আর এই সূরার ভিত্তি হলো بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ (রঃ) বলেন যে, এই সূরার নাম অ'ফিয়াহ্। ইয়াহ্ইয়া বিন কাসীর (রাঃ) বলেন যে, এর নাম কাফিয়াও বটে। কেননা, এটা অন্যান্য সূরাকে বাদ দিয়েও একাই যথেষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য কোন সূরা একে বাদ

দিয়ে যথেষ্ট হয় না। কোন কোন মুরসাল [১] হাদীসের মধ্যেও একথা এসেছে যে, উম্মুল কুরআন সবারই স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সূরাগুলো উম্মুল কুরআনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। [২]

একে সূরাতুস্ সালাত এবং সূরাতুল কানজও বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রঃ) এবং আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, এই সূরাটি মাক্কী। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), আতা' বিন ইয়াসার (রঃ) এবং ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে, এই সূরাটি মাদানী। এটাও একটি অভিমত যে, এই সূরাটি দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে। একবার মক্কায় এবং অন্যবার মদীনায়। কিন্তু প্রথমটিই বেশী সঠিক ও অভ্রান্ত। কেননা অন্য আয়াতে আছে وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ অর্থাৎ 'আমি তোমাকে সাবআ' মাসানী (বারবার আবৃত্ত সাতটি আয়াত) প্রদান করেছি'।' (১৫ঃ ৮৭) আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন।

আবূ লাইস সমরকন্দীর (রঃ) একটি অভিমত কুরতুবী (রঃ) এও নকল করেছেন যে, এই সূরাটির প্রথম অর্ধাংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং শেষ অর্ধাংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু হাদীসের পরিভাষায় এই কথাটিও সম্পূর্ণ গারীব বা দুর্বল। এ সূরার আয়াত সম্পর্কে সবাই একমত যে ওগুলি ৭টা। কিন্তু আমর বিন উবায়েদ ৮টা এবং হুসাইন য'ফী ৬টাও বলেছেন। এ দুটো মতই সাধারণ মতের বহির্ভূত ও পরিপন্থী। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এই সূরাটির পৃথক আয়াত কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। সমস্ত ক্বারী, সাহাবী (রাঃ) এবং তাবেঈর (রঃ) একটি বিরাট দল এবং পরবর্তী যুগের অনেক বয়োবৃদ্ধ মুরব্বী একে সূরা -ই-ফাতিহার প্রথম, পূর্ণ একটি পৃথক আয়াত বলে থাকেন। কেউ কেউ একে সূরা-ই-ফাতিহারই অংশ বিশেষ বলে মনে করেন। আর কেউ কেউ একে এর প্রথমে মানতে বা স্বীকার করতেই চান না। যেমন মদীনা শরীফের ক্বারী ও ফকীহগণের এই তিনটিই অভিমত। ইনশাআল্লাহ পূর্ণ বিবরণ সামনে প্রদত্ত হবে। এই সূরাটির শব্দ হলো পঁচিশটি এবং অক্ষর হলো একশো তেরটি। ইমাম বুখারী (রঃ) সহীহ বুখারীর 'কিতাবুত্ তাফসীরের' মধ্যে লিখেছেনঃ 'এই সূরাটির নাম উম্মুল কিতাব' রাখার কারণ এই যে, কুরআন মাজীদের লিখন এ সূরা হতেই আরম্ভ হয়ে থাকে এবং নামাযের কিরআতও এ থেকেই শুরু হয়।

১. যে হাদীসের সনদের ইনকিতা' শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে এবং তাবেঈ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে 'হাদীসে' মুরসাল বলে।

২. আল্লামা যামাখ্শারীর তাফসীর-ই-কাশ্শাফ দ্রষ্টব্য।

একটি অভিমত এও আছে যে, যেহেতু পূর্ণ কুরআন কারীমের বিষয়াবলী সংক্ষিপ্তভাবে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেহেতু এর নাম উম্মুল কিতাব হয়েছে। কারণ, আরব দেশের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে যে, তারা একটি ব্যাপক কাজ বা কাজের মূলকে ওর অধীনস্থ শাখাগুলির 'উম্ম' বা 'মা' বলে থাকে। যেমন أُمُّ الرَّأْسِ। তারা ঐ চামড়াকে বলে যা সম্পূর্ণ মাথাকে ঘিরে রয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর পতাকাকেও তারা أُمٌّ বলে থাকে যার নীচে জনগণ একত্রিত হয়। কবিদের কবিতার মধ্যেও একথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মক্কা শরীফকেও উম্মুল কুরা বলার কারণ এই যে, ওটাই সারা বিশ্ব জাহানের প্রথম ঘর। পৃথিবী সেখান হতেই ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করেছে। নামাযের কিরআত ওটা হতেই শুরু হয় এবং সাহাবীগণ কুরআন কারীম লিখার সময় একেই প্রথমে লিখেছিলেন বলে একে ফাতিহাও বলা হয়। এর আর একটি সঠিক নাম 'সাবআ মাসানী'ও রয়েছে, কেননা এটা নামাযের মধ্যে বারবার পঠিত হয়। একে প্রতি রাকাতেই পাঠ করা হয়। মাসানীর অর্থ আরও আছে যা ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে বর্ণিত হবে। মুসনাদে-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'উম্মুল কুরা' সম্পর্কে বলেছেনঃ 'এটাই 'উম্মুল কুরআন' এটাই 'সাবআ' মাসানী' এবং এটাই কুরআনে আযীম।' অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এটাই 'উম্মুল কুরআন,' এটাই 'ফাতিহাতুল কিতাব' এবং এটাই 'সাবআ' মাসানী।'

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াইতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর সাতটি আয়াত। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ও ওগুলোর মধ্যে একটি আয়াত। এরই নাম 'সাবআ' মাসানী', এটাই, 'কুরআনে আযীম'. এটাই 'উম্মুল কিতাব', এটাই 'ফাতিহাতুল কিতাব' এবং এটাই কুরআনে আযীম।'

ইমাম দারকুতনীও (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এরূপ একটি হাদীস এনেছেন এবং তিনি তার সমস্ত বর্ণনাকারীদেরই নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বায়হাকীতে রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) 'সাবআ' মাসানী'র ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ 'এটা সূরা-ই-ফাতিহা এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর সপ্তম আয়াত। بِسْمِ اللّٰهِ -এর আলোচনায় এর বর্ণনা পূর্ণভাবে দেওয়া হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ 'আপনার লিখিত কুরআন কারীমের প্রারম্ভে আপনি সূরা-ই-ফাতিহা লিখেননি কেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ 'যদি আমি লিখতাম তবে প্রত্যেক সূরারই প্রথমে ওটাকে

লিখতাম।' আবূ বকর বিন আবি দাঊদ (রঃ) বলেনঃ একথার ভাবার্থ এই যে, নামাযের মধ্যে তা পাঠ করা হয় এবং সমস্ত মুসলমানের এটা মুখস্থ আছে বলে তা' লিখার আর প্রয়োজন হয় না। দালাইলুন নবুওয়াত' এ ইমাম বায়হাকী (রঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, এই সূরাটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। বাকিল্লানীর (রঃ) তিনটি উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ (১) সূরা-ই-ফাতিহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। (২) يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। (৩) সর্বপ্রথম اِقْرَاْ بِاسْمِ অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ উক্তিটিই সঠিক। এর পূর্ণ বিবরণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে আসবে।

## সূরা-ই-ফাতিহার ফযীলত ও মাহাত্ম্যঃ

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমি নামায পড়ছিলাম, এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাক দিলেন, আমি কোন উত্তর দিলাম না। নামায শেষ করে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ এতক্ষণ তুমি কি কাজ করছিলে?' আমি বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি নামাযে ছিলাম।' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ কি তুমি শুননি?

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সঃ) ডাকে সাড়া দাও যখন তাঁরা তোমাদেরকে আহ্বান করেন।' (৮ঃ ২৪) জেনে রেখো, মসজিদ হতে যাবার পূর্বেই আমি তোমাদেরকেই বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরা কোন্‌টি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মসজিদ হতে চলে যাবার ইচ্ছে করলে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেনঃ 'ঐ সূরাটি হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এটাই সাবআ' মাসানী এবং এটাই কুরআন আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।' এভাবেই এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারী শরীফ, সুনান-ই আবি দাউদ এবং সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকেদী (রঃ) এই ঘটনাটি হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রাঃ) বলে বর্ণনা করেছেন। মুআত্তা-ই-ইমাম মালিকে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) কে ডাক দিলেন। তিনি নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেনঃ তিনি (নবী সঃ) স্বীয় হাতখানা আমার হাতের উপর রাখলেন। মসজিদ হতে বের হতে হতেই বললেনঃ 'আমি চাচ্ছি যে, মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে এমন একটি সূরার কথা বলবো যার মত সূরা

তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে নেই'। এখন আমি এই আশায় আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম-'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেই সূরাটি কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ নামাযের প্রারম্ভে তোমরা কি পাঠ কর?' আমি বললাম- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তিনি বললেনঃ 'এই সূরা সেটি। সাবআ' মাসানী এবং কুরআনে আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে তাও এই সূরাই বটে।' এই হাদীসটির শেষ বর্ণনাকারী হলেন আবূ সাঈদ (রঃ)। এর উপর ভিত্তি করে ইবনে আসীর এবং তাঁর সঙ্গীগণ প্রতারিত হয়েছেন এবং তাঁকে আবূ সাঈদ বিন মুআল্লা মনে করেছেন। এ আবূ সাঈদ অন্য লোক, ইনি খাসাইর কৃতদাস এবং তাবেঈগণের অন্তর্ভুক্ত। আর উক্ত আবূ সাঈদ আনসারী (রাঃ) একজন সাহাবী। তাঁর হাদীস মুত্তাসিল [১] এবং বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে এই হাদীসটি বাহ্যতঃ পরিত্যাজ্য যদি আবূ সাঈদ তাবেঈর হযরত উবাই (রাঃ) হতে শুনা সাব্যস্ত না হয়। আর যদি শুনা সাব্যস্ত হয় তবে হাদীসটি যথার্থতার শর্তের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। এই হাদীসটির আরও অনেক সূত্র রয়েছে। মুসনাদ-ই- আহমাদে রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উবাই বিন কা'বের (রাঃ) নিকট যান যখন তিনি নামায পড়ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'হে উবাই (রাঃ)! এতে তিনি (তাঁর ডাকের প্রতি) মনোযোগ দেন কিন্তু কোন উত্তর দেন নি। আবার তিনি বলেনঃ 'হে উবাই (রাঃ)!' তিনি বলেনঃ 'আস্সালামু আলাইকা।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ওয়াআলাইকাস সালাম।' তারপর বলেনঃ 'হে উবাই (রাঃ)! আমি তোমাকে ডাক দিলে উত্তর দাওনি কেন?' তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি নামাযে ছিলাম।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করে বলেনঃ 'তুমি কি এই আয়াতটি শুননি?' তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাঁ (আমি শুনেছি) এরূপ কাজ আর আমার দ্বারা হবে না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'তুমি কি চাও যে, তোমাকে আমি এমন একটি সূরার কথা বলে দেই যার মত কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনের মধ্যেই নেই?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ অবশ্যই বলুন।' তিনি বলেনঃ এখান থেকে যাবার পূর্বেই আমি তোমাকে তা বলে দেবো।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে চলতে চলতে অন্য কথা বলতে থাকেন, আর আমি ধীর গতিতে চলতে থাকি। এই ভয়ে যে না জানি কথা থেকে যায় আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাড়ীতে পৌঁছে যান। অবশেষে দরজার নিকট পৌঁছে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেই।' তিনি বলেনঃ 'নামাযে কি পড়' আমি উম্মুল কুরা' পড়ে শুনিয়ে

১. যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ না পড়ে অর্থাৎ সকল রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ থাকে তাকে হাদীসে মুত্তাসিল বলে।

দেই।' তিনি বলেনঃ 'সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এরূপ কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, জবুর এবং কুরআনের মধ্যে নেই। এটাই হলো 'সাবআ' মাসানী'। জামে'উত তিরমিযীর মধ্যে আরও একটু বেশী আছে। তা হলো এই যে, এটাই বড় কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে। এই হাদীসটি সংজ্ঞা ও পরিভাষা অনুযায়ী হাসান ও সহীহ। হযরত আনাস (রাঃ) হতেও এ অধ্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মুসনাদ-ই-আহমাদেও এইভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে পরিভাষার প্রেক্ষিতে হাসান গারীব বলে থাকেন। মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করি। সে সময় সবেমাত্র তিনি সৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করেছেন। আমি তিনবার সালাম দেই কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। তিনি তো বাড়ীর মধ্যেই চলে গেলেন, আমি দুঃখিত, ও মর্মাহত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করি। অল্পক্ষণ পরেই পবিত্র হয়ে তিনি আগমন করেন এবং তিনবার সালামের জওয়াব দেন। অতঃপর বলেন, 'হে আবদুল্লাহ বিন জাবির (রাঃ)! জেনে রেখো, সম্পূর্ণ কুরআনের মধ্যে সর্বোত্তম সূরা হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এই সূরাটি। এর ইসনাদ খুব চমৎকার। এর বর্ণনাকারী ইবনে আকীলের হাদীস বড় বড় ইমামগণ বর্ণনা করে থাকেন। এই আবদুল্লাহ বিন জাবির বলতে আবদী সাহাবীকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। ইবনুল জাওযীর কথা এটাই। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। হাফিয ইবনে আসাকীরের (রঃ) অভিমত এই যে, ইনি হলেন আবদুল্লাহ বিন জাবির আনসারী বিয়াযী (রাঃ)।

## কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ এবং ওগুলোর পারস্পরিক মর্যাদা

এই হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ বের করে ইবনে রাহ্ইয়াহ, আবু বকর বিন আরবী, ইবনুল হাযার (রঃ) প্রমুখ অধিকাংশ আলেমগণ বলেছেন যে, কোন আয়াত এবং কোন সূরা অপর কোন আয়াত ও সূরার চেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী। আবার অন্য একদলের ধারণা এই যে, আল্লাহর কালাম সবই সমান। একের উপর অন্যের প্রাধান্য দিলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হবে তা হলো অন্য আয়াত ও সূরাগুলি কম মর্যাদা সম্পন্ন রূপে পরিগণিত ও প্রতিপন্ন হবে। অথচ আল্লাহপাকের সমস্ত কালামই সমমর্যাদাপূর্ণ। কুরতুবী এটাই নকল করেছেন আশআরী, আবূ বকর বাকিল্লানী, আবূ হাতিম ইবনে হাব্বান বূসতী, আবূ হাব্বান এবং ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া হতে। ইমাম মালিক (রঃ) হতেও এই মর্মের অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সূরা-ই-ফাতিহার মর্যাদার ব্যাপারে উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ছাড়াও আরও হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফের 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'একবার আমরা সফরে ছিলাম। এক স্থানে আমরা অবতরণ করি। হঠাৎ একটি দাসী এসে বললোঃ 'এ জায়গার গোত্রের নেতাকে সাপে কেটেছে। আমাদের লোকেরা এখন সবাই অনুপস্থিত। ঝাড় ফুঁক দিতে পারে এমন কেউ আপনাদের মধ্যে আছে কি? আমাদের মধ্য হতে একটি লোক তার সাথে গেল। সে যে ঝাড় ফুঁকও জানতো তা আমরা জানতাম না। তথায় গিয়ে সে কিছু ঝাড় ফুঁক করলো। আল্লাহর অপার মহিমায় তৎক্ষণাৎ সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করলো। অনন্তর সে ৩০টি ছাগী দিল এবং আমাদের আতিথেয়তায় অনেক দুধও পাঠিয়ে দিল। সে ফিরে আসলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ 'তোমার কি এ বিদ্যা জানা ছিল?' সে বললোঃ 'আমিতো শুধু সূরা-ই-ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছি।' আমরা বললামঃ 'তাহলে এ প্রাপ্ত মাল এখনও স্পর্শ করো না। প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করো।' মদীনায় এসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলাম। তিনি বললেনঃ 'এটা যে ফুঁক দেয়ার সূরা তা সে কি করে জানলো? এ মাল ভাগ করো। আমার জন্যেও একভাগ রেখো।' সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই আবি দাউদেও এ হাদীসটি রয়েছে। সহীহ মুসলিমের কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ফুঁক দাতা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ছিলেন।

সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই নাসাঈর মধ্যে হাদীস আছে যে, একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে বসেছিলেন, এমন সময়ে উপর হতে এক বিকট শব্দ আসলো। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতিপূর্বে কখনও খুলেনি। অতঃপর সেখান হতে একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'আপনি খুশি হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হলো যা ইতিপূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। তা হলো সূরা-ই-ফাতিহা ও সূরা-ই- বাকারার শেষ আয়াতগুলো। ওর এক একটি অক্ষরের উপর নূর রয়েছে।" এটা সুনান-ই-নাসাঈর শব্দ। সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নামাযে উম্মুল কুরআন পড়লো না তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ পূর্ণ নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ 'আমরা যদি ইমামের পিছনে থাকি তা হলে? তিনি বললেনঃ 'তাহলেও চুপে চুপে পড়ে নিও। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি,

তিনি বলতেন যে, আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ 'আমি নামাযকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধ অর্ধ করে ভাগ করেছি এবং আমার বান্দা আমার কাছে যা চায় তা আমি তাকে দিয়ে থাকি। যখন বান্দা বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ বলেনঃ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ অর্থাৎ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো' বান্দা যখন বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ বলেনঃ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ অর্থাৎ 'বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করলো।' বান্দা যখন বলে, مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ অর্থাৎ 'আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করলো।' কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন فَوَّضَ اِلَىَّ عَبْدِىْ অর্থাৎ 'বান্দা আমার উপর (সবকিছু) সমর্পণ করলো।' যখন বান্দা বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যেকার কথা এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা চাইবে আমি তাকে তাই দেবো' অতঃপর বান্দা শেষ পর্যন্ত পড়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এসব আমার বান্দার জন্যে এবং সে যা কিছু চাইলো তা সবই তার জন্য।' সুনান-ই নাসাঈর মধ্যে এই বর্ণনাটি আছে। কোন কোন বর্ণনার শব্দগুলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এই হাদীসটিকে পরিভাষা অনুযায়ী হাসান বলেছেন। আবূ জারাআ' একে সঠিক বলেছেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যেও এ হাদীসটি লম্বা ও চওড়াভাবে রয়েছে। ওর বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ)। ইবনে জারীরের একটি বর্ণনায় এ হাদীসটির মধ্যে এই শব্দগুলিও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এটা আমার জন্য যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমার বান্দার জন্য।' অবশ্য এ হাদীসটি এর উসূল বা মূলনীতির পরিভাষা অনুসারে গারীব বা দুর্বল।

## আলোচ্য হাদীসের উপকার সমূহ, তৎসম্পর্কিত আলোচনা ও ফাতিহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

এখন এই হাদীসের উপকারিতা ও লাভালাভ লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রথমতঃ এই হাদীসের মধ্যে صَلٰوةٌ অর্থাৎ নামাযের সংযোজন রয়েছে এবং তার তাৎপর্যও ভাবার্থ হচ্ছে কিরআত। যেমন কুরআনের মধ্যে অন্যান্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

অর্থাৎ 'স্বীয় নামায (কিরআত) কে খুব উচ্চৈঃস্বরে পড়ো না আর খুব নিম্ন স্বরেও না, বরং মধ্যম স্বরে পড়।' (১৭ঃ ১১০) এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত আছে যে, এখানে صَلٰوةٌ এর অর্থ হলো

কিরাআত বা কুরআন পঠন। এভাবে উপরোক্ত হাদীসে কিরাআতকে 'সালাত' বলা হয়েছে। এতে নামাযের মধ্যে কিরাআতের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বিলক্ষণ জানা যাচ্ছে। আরও প্রকাশ থাকে যে, কিরআত নামাযের একটি মস্তবড় স্তম্ভ।এ জন্যেই এককভাবে ইবাদতের নাম নিয়ে ওর একটি অংশ অর্থাৎ কিরা'আতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অপরপক্ষে এমনও হয়েছে যে, এককভাবে কিরা'আতের নাম নিয়ে তার অর্থ নামায নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার কথাঃ

وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

অর্থাৎ 'ফজরের কুরআনের সময় ফেরেশতাকে উপস্থিত করা হয়।' (১৭ঃ ৭৮) এখানে কুরআনের ভাবার্থ হলো নামায। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, ফজরের নামাযের সময় রাত্রি ও দিনের ফেরেশতাগণ একত্রিত হন। এই আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা বিলক্ষণ জানা গেল যে, নামাযে কিরা'আত পাঠ খুবই জরুরী এবং আলেমগণও এ বিষয়ে একমত। দ্বিতীয়তঃ নামাযে সূরা-ই ফাতিহা পড়াই জরুরী কি না এবং কুরআনের মধ্য হতে যা কিছু পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরগণ বলেন যে, নির্ধারিতভাবে যে সূরা ফাতিহাই পড়তে হবে এটা জরুরী নয়। বরং কুরআনের মধ্য হতে যা কিছু পড়ে নেবে তাই যথেষ্ট। তাঁর দলীল হলো فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (৭৩ঃ ২০) এই আয়াতটি। অর্থাৎ 'কুরআনের মধ্য হতে যা কিছু সহজ হয় তাই পড়ে নাও।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যে হাদীস আছে তাতে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাড়াতাড়ি নামায আদায়কারী এক ব্যক্তিকে বললেনঃ 'যখন তুমি নামাযের জন্যে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে এবং কুরআনের মধ্য হতে যা তোমার নিকট সহজ বোধ হবে তাই পড়বে।' তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা নির্দিষ্টভাবে বলেন না এবং যে কোন কিছু পড়াকেই যথেষ্ট বলে মনে করলেন। দ্বিতীয় মত এই যে, সূরা ফাতিহা পড়াই জরুরী এবং অপরিহার্য এবং তা পড়া ছাড়া নামায হয় না। অন্যান্য সমস্ত ইমামের এটাই মত। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) এবং তাঁদের ছাত্র ও জমহূর উলামা সবারই এটাই অভিমত। এই হাদীসটি তাঁদের দলীল যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি যে কোন নামায পড়লো এবং তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করলো না, ঐ নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ-পূর্ণ নয়'। এরকমই ঐসব বুযুর্গ ব্যক্তিদের এটাও দলীল যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি সূরা-ই ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না।' সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্ ও সহীহ ইবনে

হিব্বানের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ নামায হয় না যার মধ্যে উম্মুল কুরআন পড়া না হয়।" এ ছাড়া আরও বহু হাদীস রয়েছে। এখানে আমাদের বিতর্কমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার তেমন প্রয়োজন নেই। কারণ এ আলোচনা অতি ব্যাপক ও দীর্ঘ। আমরা তো সংক্ষিপ্তভাবে শুধু উপরোক্ত মনীষীর দলীলসমূহ এখানে বর্ণনা করে দিলাম। এখন এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, ইমাম শাফিঈ (রঃ) প্রভৃতি মহান আলেমদের একটি দলের মাযহাব এটাই যে, প্রতি রাকা'আতে সূরা-ই-ফাতিহা পড়া ওয়াজিব এবং অন্যান্য লোকের মতে অধিকাংশ রাকআতে পড়া ওয়াজিব। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং বসরার অধিকাংশ লোকই বলেন যে, নামাযসমূহের মধ্যে কোন এক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পড়ে নেয়া ওয়াজিব। কেননা হাদীসের মধ্যে সাধারণভাবে নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর অনুসারী সুফিয়ান সাওরী (রঃ) ও আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, ফাতিহাকেই নির্দিষ্টভাবে পড়ার কোন কথা নেই বরং অন্য কিছু পড়লেই যথেষ্ট হবে। কারণ পবিত্র কুরআনের মধ্যে مَا تَيَسَّرَ শব্দটি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছেঃ 'যে ব্যক্তি ফরয ইত্যাদি নামাযে সূরা-ই-ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়লো না তার নামায হলো না।' তবে অবশ্যই এ হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এসব কথার বিস্তারিত আলোচনার জন্যে শরীয়তের আহকামের বড় বড় কিতাব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী।

তৃতীয়তঃ মুকতাদীগণের উপর সূরা-ই-ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নে আলেমদের তিনটি অভিমত রয়েছে।

(১) সূরা ফাতিহা পাঠ ইমামের উপর যেমন ওয়াজিব, মুকতাদির উপরও তেমনই ওয়াজিব।

(২) মুকতাদির উপর কিরা'আত একবারেই ওয়াজিব নয়। সূরা ফাতিহাও নয় এবং অন্য সূরাও নয়। তাঁদের দলীল-প্রমাণ মুসনাদ-ই-আহমাদের সেই হাদীসটি, যার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যার জন্যে ইমাম রয়েছে, ইমামের কিরাআতই তার কিরা'আত।' কিন্তু বর্ণনাটি হাদীসের পরিভাষায় একান্ত দুর্বল এবং স্বয়ং এটা হযরত জাবিরের (রাঃ) কথা দ্বারা বর্ণিত আছে। যদিও এই মারফূ'[১] হাদীসটির অন্যান্য সনদও রয়েছে, কিন্তু কোন সনদই অভ্রান্ত ও সঠিক নয়। অবশ্য আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন।

১. যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ স্বয়ং তাঁর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে মারফূ' হাদীস বলে।

(৩) যে নামাযে ইমাম আস্তে কিরা'আত পড়েন তাতে তো মুকতাদির উপর কিরা'আত পাঠ ওয়াজিব, কিন্তু যে নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কিরআত পড়া হয় তাতে ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলীল প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমের হাদীসটি। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'অনুসরণ করার জন্যে ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁর তাকবীরের পরে তাকবীর বল এবং যখন তিনি পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাক।' সুনানের মধ্যেও এই হাদীসটি রয়েছে। ইমাম মুসলিম (রঃ) এর বিশুদ্ধতা স্বীকার করেছেন। ইমাম শাফিঈরও (রঃ) প্রথম মত এটাই এবং ইমাম আহমদ (রঃ) হতেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

এই সব মাসয়ালা এখানে বর্ণনা করার আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, সূরা-ই ফাতিহার সঙ্গে শরীয়তের নির্দেশাবলীর যতটা সম্পর্ক রয়েছে অন্য কোন সূরার সঙ্গে ততটা সম্পর্ক নেই। মুসনাদ-ই-বাজ্জাজের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন তোমরা বিছানায় শয়ন কর তখন যদি সূরা-ই-ফাতিহা এবং সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়ে নাও, তাহলে মৃত্যু ছাড়া প্রত্যেক জিনিস হতে নিরাপদে থাকবে।'

## ইসতি'আযাহ্ বা أَعُوْذُ بِاللّٰهِ -এর তাফসীর এবং তার আহকাম ও নির্দেশাবলী

পবিত্র কুরআনে রয়েছেঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ * وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ 'ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস কর, ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা এসে যায় তবে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।' (৭ঃ ১৯৯-২০০) অন্য এক জায়গায় বলেছেনঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ * وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ * وَ اَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ *

অর্থাৎ 'অমঙ্গলকে মঙ্গলের দ্বারা প্রতিহত কর, তারা যা কিছু বর্ণনা করছে তা আমি খুব ভালভাবে জানি। বলতে থাক–হে আল্লাহ! শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তাদের উপস্থিতি হতে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' (২৩ঃ ৯৬-৯৮)

অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ

অর্থাৎ 'অমঙ্গলকে মঙ্গল দ্বারা পতিহত কর, তাহলে তোমার এবং অন্যের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে তা এমন হবে যে, যেন সে অকৃত্রিম সাহায্যকারী বন্ধু'। (৪১ঃ ৩৪) এ কাজটি ধৈর্যশীল ও ভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্যে। অর্থাৎ যখন কুমন্ত্রণা এসে পড়ে তখন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

এই মর্মে এই তিনটিই আয়াত আছে এবং এই অর্থের অন্য কোন আয়াত নেই। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মানুষের শত্রুতার সবচাইতে ভাল ঔষুধ হলো প্রতিদানে তাদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা। এরূপ করলে তারা তখন শত্রুতা করা থেকেই বিরত থাকবেন না, বরং অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হবে। আর শয়তানদের শত্রুতা হতে নিরাপত্তার জন্যে আল্লাহ তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে বলছেন। কেননা এই শয়তানরূপী অপবিত্র শত্রুদেরকে উত্তম ব্যবহারের দ্বারাও আয়ত্তে আনা কখনো সম্ভব নয়। কারণ সে মানুষের বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে আমোদ পায় এবং তার পুরাতন শত্রুতা হযরত হাওয়া ও হযরত আদম (আঃ)-এর সময় হতেই অব্যাহত রয়েছে। কুরআন ঘোষণা করছেঃ 'হে আদমের সন্তানেরা! তোমাদেরকে যেন এই শয়তান পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত না করে ফেলে, যেমন তোমাদের বাপ-মাকে পথভ্রষ্ট করে চির সুখের জান্নাত হতে বের করে দিয়েছিল।' অন্য স্থানে বলা হচ্ছেঃ 'শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রুই মনে কর। তার দলের তো এটাই কামনা যে তোমরা দোযখবাসী হয়ে যাও। কি! আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের সঙ্গে এবং তার সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছো? তারা তো তোমাদের পরম শত্রু। জেনে রেখো যে, অত্যাচারীদের জন্যে জঘন্য প্রতিদান রয়েছে।' এতো সেই শয়তান যে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)কে বলেছিলঃ 'আমি তোমার একান্ত শুভাকাংখী।' তা হলে চিন্তার বিষয় যে, আমাদের সঙ্গে তার চালচলন কি হতে পারে? আমাদের জন্যেই তো সে শপথ করে বলেছিলঃ 'মহা সম্মানিত আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে বিপথে নিয়ে যাবো। তবে হ্যাঁ, যারা তাঁর খাঁটি বান্দা তারা নিরাপদে থাকবে।' এ জন্যে মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অর্থাৎ তোমরা কুরআন পাঠের সময় বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।' (১৬ঃ ৯৮) ঈমানদারগণ ও প্রভুর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের উপরে তার কোন ক্ষমতাই নেই। আর ক্ষমতা তো শুধু তাদের উপরই রয়েছে যারা তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শিরক করে থাকে।

কারীদের একটি দল ও অন্যেরা বলে থাকেন যে, কুরআন পাঠের পর أَعُوذُ بِاللّٰهِ পড়া উচিত। এতে দু'টি উপকার রয়েছে। এক তো হলোঃ কুরআনের বর্ণনারীতির উপর আমল এবং দ্বিতীয় হলোঃ ইবাদত শেষে অহংকার দমন। আবূ হাতিম সিজিসতানী এবং ইবনে ফালূফা হামযার এই নীতিই নকল করেছেন। যেমন আবুল কাসিম ইউসুফ বিন আলী বিন জানাদাহ (রঃ) স্বীয় কিতাব 'আল ইবাদাতুল কামিল'-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীসের পরিভাষায় এর ইসনাদ গারীব। ইমাম যারী (রঃ) স্বীয় তাফসীরের মধ্যে এটা নকল করেছেন এবং বলেছেন যে, ইবরাহীম নাখ্য়ী (রঃ) ও দাউদ যাহেরীরও (রঃ) এই অভিমত। কুরতুবী (রঃ) ইমাম মালিকের (রঃ) মাযহাবও এটাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনুল আরাবী একে গারীব বলে থাকেন। একটি মাযহাব এরূপ আছে যে, প্রথমে ও শেষে এই দু'বার أَعُوذُ بِاللّٰهِ পড়া উচিত। তাহলে দু'টি দলীলই একত্রিত হয়ে যাবে। জমহূর উলামার প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, কুরআন পাঠের পূর্বে أَعُوذُ بِاللّٰهِ পাঠ করা উচিত, তাহলে কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। সুতরাং ঐ বুযুর্গদের নিকট আয়াতের অর্থ হবেঃ 'যখন তুমি পড়বে' অর্থাৎ তুমি পড়ার ইচ্ছা করবে। যেমন নিম্নের আয়াতটি إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ অর্থাৎ 'যখন তুমি নামায পড়ার জন্যে দাঁড়াও' (তবে ওযু করে নাও)-এর অর্থ হলোঃ 'যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াবার ইচ্ছা কর।' হাদীসগুলোর ধারা অনুসারেও এই অর্থটিই সঠিক বলে মনে হয়। মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে আছে যে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে নামায আরম্ভ করতেন অতঃপর,

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

তিনবার পড়ে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়তেন। তারপর পড়তেনঃ

اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَ نَفْخِهٖ وَ نَفْثِهٖ

সুনান-ই-আরবার মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এই অধ্যায়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস এটাই। هَمْزٌ শব্দের অর্থ হলো গলা

টিপে ধরা, نَفَخْ শব্দের অর্থ হলো অহংকার এবং نَفَثْ শব্দের অর্থ হলো কবিতা পাঠ। ইবনে মাজা (রঃ) স্বীয় সুনানে এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে প্রবেশ করেই তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا তিনবার وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا এবং তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا পাঠ করতেন। অতঃপর اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهٖ وَ نَفْخِهٖ وَ نَفْثِهٖ পড়তেন।

সুনান-ই-ইবনে মাজাতেও অন্য সনদে এই হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। মুসনাদ-ই- আহমাদের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ বলতেন। অতঃপর اَعُوْذُ بِاللّٰهِ শেষ পর্যন্ত পড়তেন। মুসনাদে-ই-আবি ইয়ালার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে দু'টি লোকের ঝগড়া বেধে যায়। ক্রোধে একজনের নাসারন্ধ্র ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদি লোকটি اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। পড়ে নেয় তবে তার ক্রোধ এখনই ঠাণ্ডা ও স্তিমিত হয়ে যাবে।' ইমাম নাসাঈ (রঃ) স্বীয় কিতাব اَلْيَوْمُ وَ اللَّيْلَةُ -এর মধ্যেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদ-ই-আহমাদ, সুনান-ই-আবি দাউদ এবং জামে'উত তিরমিযীর মধ্যেও হাদীসটি রয়েছে; একটি বর্ণনায় আরও একটু বেশী আছে, তা এই যে, হযরত মুআয (রাঃ) লোকটাকে তা পড়তে বলেন। কিন্তু সে তা পড়লো না এবং ক্রোধ উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এই বৃদ্ধি যুক্ত বর্ণনাটি মুরসাল। কেননা আবদুর রহমান বিন আবু লাইলা, যিনি হযরত মুআয (রাঃ) হতে সেটি বর্ণনা করেছেন, হযরত মুআযের (রাঃ) সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়াই সাব্যস্ত হয় না। কারণ তিনি বিশ বছর পূর্বে নশ্বর দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু হতে পারে যে, হয়তো আবদুর রহমান হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হতে ওটা শুনেছেন। তিনিও এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী এবং তিনি ওটাকে হযরত মুআয পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কেননা, এ ঘটনার সময় তো বহু সাহাবী (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান-ই- আবি দাউদ এবং সুনা-ই-নাসাঈর মধ্যেও বিভিন্ন সনদে এবং বিভিন্ন শব্দে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও হাদীস রয়েছে। এখানে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলে আলোচনা খুব দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। এ সবের বর্ণনার জন্য যিকর, ওযীফা এবং আমলের বহু কিতাব রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই খুব বেশী জানেন।

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম যখন প্রত্যাদেশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন তখন প্রথমে أَعُوذُ بِاللهِ পড়ার নির্দেশ দেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রথম দফায় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর নিকট ওয়াহী এনে বলেনঃ 'আঊযু পড়ুন।' তিনি أَسْتَعِيذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পাঠ করেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) পুনরায় বলেনঃ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ পাঠ করুন। তারপরে বলেনঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ অর্থাৎ যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপনার সেই প্রভুর নামে পাঠ করুন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম সূরা-যা আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাঈলের (আঃ) মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (রাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেন তা এটাই। কিন্তু হাদীসটি গারীব এবং এর সনদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। শুধু জেনে রাখার জন্যেই এখানে এটা বর্ণনা করলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

## 'মাসআলাহ' বা সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য বিষয়ঃ

জামহূর উলামার মতে 'ইসতি'আযাহ্' বা 'আউযুবিল্লাহ' পড়া মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়। সুতরাং তা না পড়লে পাপ হবে না। আ'তা বিন আবি রিবাহের (রঃ) অভিমত এই যে, কুরআন পাঠের সময় আউযু পড়া ওয়াজিব–নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। ইমাম রাযী (রঃ) এই কথাটি নকল করেছেন। ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন যে, জীবনে একবার মাত্র পড়লেই কর্তব্য পালন হয়ে যাবে। হযরত আতার (রঃ) কথার দলীল প্রমাণ হলো আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলো। কেননা, এতে فَاسْتَعِذْ শব্দটি 'আমর' বা নির্দেশ সূচক ক্রিয়াপদ। আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'আমর' অবশ্যকরণীয় কার্যের জন্যেই ব্যবহৃত হয়। ঠিক তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সদা সর্বদা এর উপর আমলও তা অবশ্যকরণীয় হওয়ার দলীল। এর দ্বারা শয়তানের দুষ্টুমি ও দুস্কৃতি দূর হয় এবং তা দূর হওয়াও একরূপ ওয়াজিব। আর যা দ্বারা ওয়াজিব পূর্ণ হয় সেটাও ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। আশ্রয় প্রার্থনা অধিক সতর্কতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং অবশ্যকরণীয় কাজের এটাও একটা পন্থা বটে। কোন কোন আলেমের কথা এই যে, 'আউযু' পাঠ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপরই ওয়াজিব ছিল, তাঁর উম্মতের উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক (রঃ) হতে এটাও বর্ণনা করা হয় যে, ফরয নামাযের নয় বরং রামাযান শরীফের প্রথম রাত্রির নামাযে 'আউযু' পড়া উচিত।

**জিজ্ঞাস্যঃ** ইমাম শাফিঈ (রঃ) স্বীয় 'ইমলা'র মধ্যে লিখেছেন যে, আঊযুবিল্লাহ জোরে সশব্দে পড়তে হবে কিন্তু আস্তে পড়লেও তেমন কোন দোষ নেই। ইমাম শাফিঈ (রঃ) স্বীয় 'কিতাবুল উম্ম' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন যে, জোরে ও আস্তে উভয়ভাবেই পড়ার অধিকার রয়েছে। কারণ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে ধীরে পড়ার এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে উচ্চৈঃস্বরে পড়ার কথা সাব্যস্ত আছে। প্রথম রাকআত ছাড়া অন্যান্য রাকআতে আঊযুবিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর (রঃ) দু'টি মত রয়েছে। প্রথমটি মুসতাহাব হওয়ার এবং দ্বিতীয়টি মুসতাহাব না হওয়ার। প্রাধান্য দ্বিতীয় মতের উপরই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সঠিক ও সুষ্ঠু জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) নিকট শুধু أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়াই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়তে হবে। আবার কেউ বলেনঃ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ পাঠ করতে হবে। সাওরী (রঃ) এবং আওযায়ীর (রঃ) এটাই মাযহাব। কেউ কেউ আবার বলেন যে, أَسْتَعِيْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়তে হবে। তা হলে আয়াতের সমস্ত শব্দের উপর আমল হয়ে যাবে এবং তার সাথে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) হাদীসের উপর আমল করা হবে। একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যেসব বিশুদ্ধ হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঐগুলোই অনুসরণের পক্ষে সর্বোত্তম। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদের (রঃ) মতে নামাযের মধ্যে আঊযুবিল্লাহ পড়া হয় তিলাওয়াতের জন্য। আর ইমাম আবূ ইউসুফের (রঃ) মতে নামাযের জন্য পাঠ করা হয়। সুতরাং মুকতাদীরও পড়ে নেয়া উচিত যদিও সে কিরআত পড়ে না। ঈদের নামাযেও প্রথম তাকবীরের পর পড়ে নেয়া দরকার। জমহূরের মাযহাব এই যে, ঈদের নামাযে সমস্ত তাকবীর বলার পর আঊযুবিল্লাহ পড়তে হবে, তারপর কিরআত পড়তে হবে। আঊযুবিল্লাহের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর উপকার ও মাহাত্ম্য। আজে বাজে কথা বলার ফলে মুখে যে অপবিত্রতা আসে তা বিদূরিত হয়। ঠিক তদ্রূপ এর দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁর ব্যাপক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয়। আর আধ্যাত্মিক প্রকাশ্য শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় দুর্বলতা ও অপারগতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়। কেননা মানুষ শত্রুর মুকাবিলা করা যায়। অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা তার শত্রুতা দূর করা যায়। যেমন পবিত্র

কুরআনের ঐ আয়াতগুলির মধ্যে রয়েছে যেগুলি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا *

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কর্তৃত্ব চলবে না, আল্লাহর প্রতিনিধিত্বই যথেষ্ট।' (১৭ঃ ৬৫) আল্লাহ পাক ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় ফেরেশতা পাঠিয়েছেন এবং তাদের গর্ব খর্ব করেছেন। এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, যে মুসলিম কাফিরের হাতে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি শহীদ হন। যে সেই গোপনীয় শত্রু শয়তানের হাতে মারা পড়ে সে আল্লাহর দরবার থেকে হবে বহিষ্কৃত, বিতাড়িত। মুসলমানের উপর কাফিরেরা জয়যুক্ত হলে মুসলমান প্রতিদান পেয়ে থাকেন। কিন্তু যার উপর শয়তান জয়যুক্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। শয়তান মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না বলে কুরআন কারীমের শিক্ষা হলোঃ 'তোমরা তার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর যিনি তাকে (শয়তানকে) দেখতে পান কিন্তু সে তাঁকে দেখতে পায় না।

আউযুবিল্লাহ পড়া হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা করা এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া। عِيَاذٌ-এর অর্থ হলো অনিষ্ট দূর করা, আর لِيَاذٌ-এর অর্থ হলো মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করা। এর প্রমাণ হিসেবে মুতানাব্বির এই কবিতাটি দ্রষ্টব্যঃ

يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أُؤَمِّلُهُ * وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أُحَاذِرُهُ

لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ * وَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ

অর্থাৎ 'হে সেই পবিত্র সত্তা, যে সত্তার সাথে সাথে আমার সমুদয় আশা ভরসা বিজড়িত হয়েছে, এবং হে সেই পালনকর্তা যাঁর নিকট আমি সমস্ত অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। যা তিনি ভেঙ্গে দেন তা কেউ জোড়া দিতে পারে না এবং যা তিনি জোড়া দেন তা কেউ ভাঙ্গতে পারে না। أَعُوذُ-এর অর্থ হলো এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যেন বিতাড়িত শয়তান ইহজগতে ও পরজগতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে। যে নির্দেশাবলী পালনের জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি তা পালনে যেন আমি বিরত না হয়ে পড়ি। আবার যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন আমি করে না ফেলি। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, শয়তানের অনিষ্ট হতে একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারে না। এ জন্যে বিশ্ব প্রভু আল্লাহ মানুষরূপী

শয়তানের দুষ্কার্য ও অন্যায় হতে নিরাপত্তা লাভ করার যে পন্থা শেখালেন তা হলো তাদের সঙ্গে সদাচরণ। কিন্তু জ্বিন রূপী শয়তানের দুষ্টুমি ও দুষ্কৃতি হতে রক্ষা পাওয়ার যে উপায় তিনি বলে দিলেন তা হলো তাঁর স্বরণে আশ্রয় প্রার্থনা। কেননা, না তাকে ঘুষ দেওয়া যায়, না তার সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে সে দুষ্টুমি হতে বিরত হয়। তার অনিষ্ট হতে তো বাঁচাতে পারেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত। প্রাথমিক তিনটি আয়াতে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। সূরা-ই-আরাফে আছেঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ * (৭ঃ ১৯৯)

সূরা-ই-হা-মী-ম সেজদায় আছেঃ

وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ (৪১ঃ ৩৪)

এবং সূরা-ই মুমেনূনে রয়েছেঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ * (২৩ঃ ৯৬)

এই তিনটি আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা ও অনুবাদ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তির আর তেমন প্রয়োজন নেই।

## شَيْطَان -শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ

আরবী ভাষার অভিধানে شَيْطَان শব্দটি شَطَنٌ থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হলো দূরত্ব। যেহেতু এই মারদূদ ও অভিশপ্ত শয়তান প্রকৃতগতভাবে মানব প্রকৃতি হতে দূরে রয়েছে, বরং নিজের দুষ্কৃতির কারণে প্রত্যেক মঙ্গল ও কল্যাণ হতে দূরে আছে, তাই তাকে শয়তান বলা হয়। একথাও বলা হয়েছে যে, এটা شاط হতে গঠিত হয়েছে। কেননা সে আগুন হতে সৃষ্টি হয়েছে এবং شَاطَ এর অর্থ এটাই। কেউ কেউ বলেন যে, অর্থের দিক দিয়ে দুটোই ঠিক। কিন্তু প্রথমটিই বিশুদ্ধতর। আরব কবিদের কবিতার মধ্যে এর সত্যতা প্রমাণিত হয় সর্বোতভাবে। প্রসঙ্গক্রমে কবি উমাইয়া বিন আবিস্সালাতের কবিতাটি এইঃ

اَيُّمَا شَاطِنٌ عَصَاهُ عَكَاهُ * ثُمَّ يُلْقِىْ فِى السِّجْنِ وَ الْاَغْلَالُ

অনুরূপভাবে কবি নাবেগার কবিতার মধ্যেও এ শব্দটি شطن হতে গঠিত হয়েছে এবং দূর হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কবি নাবেগার কবিতাটি এইঃ

نَاتِ بِسُعَادِ عَنْكَ نَوًى شَطُوْنٌ * فَبَاتَتْ وَ الْفُؤَادُ بِهَا رَهِيْنٌ

সীবাওয়াইর উক্তি আছে যে, যখন কেউ শয়তানী কাজ করে তখন আরবেরা বলেঃ تَشَيْطَنَ فُلَانٌ কিন্তু تَشَيَّطَ فُلَانٌ বলে না। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ

শব্দটি شَاطَ হতে নয়, বরং شَطَنَ হতেই নেয়া হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে দূরত্ব। কোন জ্বিন, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু দুষ্টুমি করলে তাকে শয়তান বলা হয়। কুরআন পাকে রয়েছেঃ

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا *

অর্থাৎ 'এভাবেই আমি মানব ও দানব শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি যারা একে অপরের নিকট প্রতারণামূলক বানানো কথা পৌঁছিয়ে থাকে। (৬ঃ ১১২) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ যর (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেন ঃ 'হে আবূ যর (রাঃ)! দানব ও মানব শয়তানগণ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।' আমি বলি, মানুষের মধ্যেও কি শয়তান আছে? তিনি বলেনঃ হাঁ'। সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ যর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'স্ত্রীলোক, গাধা এবং কালো কুকুর নামায ভেঙ্গে নষ্ট করে দেয়।' তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লাল, হলদে কুকুর হতে কালো কুকুরকে স্বতন্ত্র করার কারণ কি?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'কালো কুকুর শয়তান।'

হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত অছে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেনঃ 'হযরত উমার (রাঃ) একবার তুর্কী ঘোড়ার উপরে আরোহণ করেন। ঘোড়াটির সগর্বে চলতে থাকে। হযরত উমার ঘোড়াটিকে মারপিটও করতে থাকেন। কিন্তু ওর সদর্প চাল আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি নেমে পড়েন এবং বলেনঃ 'তুমি তো আমার আরোহণের জন্যে কোন শয়তানকে ধরে এনেছ! আমার মনে অহংকারের ভাব এসে গেছে। সুতরাং আমি ওর পৃষ্ঠ হতে নেমে পড়াই ভাল মনে করলাম।' رَجِيْم শব্দটি فَعِيْل -এর ওজনে اِسْم مَفْعُوْل-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে মারদুদ বা বিতাড়িত। অর্থাৎ প্রত্যেক মঙ্গল হতে সে দূরে আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

অবশ্যই আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওগুলোকে শয়তানদের তাড়নযন্ত্র করেছি।' তারা বড় বড় ফেরেশতাদের কথা শুনতে পায় না এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য চতুর্দিক হতে মারা হয়, আর তাদের জন্যে চিরস্থায়ী শাস্তি রয়েছে। তাদের মধ্য হতে কেউ কোন কথা

ছোঁ মেরে নিয়ে পালালে একটা উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তার পিছনে ধাওয়া করে। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ * وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ * اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ *

অর্থাৎ 'আকাশে আমি স্তম্ভ তৈরী করেছি এবং দর্শকদের জন্যে একে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে নিরাপদ করেছি। কিন্তু কেউ কোন কথা চুরি করে নিয়ে যায় তখন একটা উজ্জ্বল আলোক শিখা তার পিছু ধাওয়া করে।' (১৫ঃ ১৬-১৮) এরকম আরও বহু আয়াত রয়েছে। رَجِيْم -এর একটা অর্থ رَجْم ও করা হয়েছে। যেহেতু শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা এবং ভ্রান্তির দ্বারা রজম করে থাকে এ জন্যে তাকে 'রাজীম' অর্থাৎ 'রাজেম' বলা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**অতীব মেহেরবান পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।**

সকল সাহাবী (রাঃ) আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদকে বিসমিল্লাহর দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা-ই-'নামল'-এর এটা একটা আয়াত। তবে এটা প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে একটা পৃথক আয়াত কি-না, বা প্রত্যেক সূরার একটা আয়াতের অংশ বিশেষ কি-না, কিংবা এটা কি শুধুমাত্র সূরা-ই-ফাতিহারই আয়াত—অন্য সূরার নয়, কিংবা এক সূরাকে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্যেই কি একে লিখা হয়েছে এবং এটা আয়াত নয়, এ সব বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ চলে আসছে এবং আপন স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণও রয়েছে। সুনান-ই-আবি দাউদে সহীহ সনদের সঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এক সূরাকে অন্য সূরা হতে অনায়াসে পৃথক করতে পারতেন না। 'মুসতাদরিক-ই-হাকিমের' মধ্যেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। একটা মুরসাল হাদীসে হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রাঃ) হতেও হাদীসটি রেওয়ায়িত করা হয়েছে। সহীহ ইবনে খুযাইমার মধ্যে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'বিসমিল্লাহ'-কে সূরা-ই-ফাতিহার পূর্বে নামাযে পড়েছেন এবং তাকে একটা পৃথক আয়াতরূপে গণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী উমার বিন হারূন বালখী উসূলে হাদীসের পরিভাষায় দুর্বল। এর অনুসরণে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও একটা

হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং অনুরূপভাবে হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ হতেও বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ), হযরত আতা' (রঃ), হযরত তাউস (রঃ), হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত মাকহূল (রঃ) এবং হযরত যুহরীর (রঃ) এটাই নীতি ও অভিমত যে, 'বিসমিল্লাহ' 'সূরা-ই-বারাআত' ছাড়া কুরআনের প্রত্যেক সূরারই একটা পৃথক আয়াত। এসব সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রঃ) ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদের (রঃ) একটি কাওলে এবং ইসহাক বিন রাহূওয়াহ (রঃ) ও আবূ উবাইদ কাসিম বিন সালামেরও (রঃ) এটাই মাযহাব। তবে ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও তাঁদের সহচরগণ বলেন যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা-ই-ফাতিহারও আয়াত নয় বা অন্য কোন সূরারও আয়াত নয়।

ইমাম শাফিঈর (রঃ) একটি কাওল এই যে, এটা সূরা-ই-ফাতিহার একটি আয়াত বটে কিন্তু অন্য কোন সূরার আয়াত নয়। তাঁর একটা কাওল এও আছে যে, এটা প্রত্যেক সূরার প্রথম আয়াতের অংশ বিশেষ। কিন্তু হাদীসের পরিভাষায় এই দুই কাওল বা উক্তিই হচ্ছে গারীব। দাউদ (রঃ) বলেন যে, এটা প্রত্যেক সূরার প্রথমে একটা পৃথক আয়াত–সূরার অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে এবং আবূ বকর রাযী, আবূ হাসান কুরখীরও এ মাযহাবই বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) একজন বড় মর্যাদাসম্পন্ন সহচর। এ হল বিসমিল্লাহর সূরা-ই-ফাতিহার আয়াত হওয়া না হওয়ার আলোচনা। এখন একে উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে না নিম্নস্বরে এ নিয়েও মতভেদের অবকাশ রয়েছে। যাঁরা একে সূরা-ই-ফাতিহার পৃথক একটা আয়াত মনে করেন তাঁরা একে নিম্নস্বরে পড়ার পক্ষপাতি। এখন অবশিষ্ট রইলেন শুধু ঐ সব লোক যাঁরা বলেন যে, এটা প্রত্যেক সূরার প্রথম। তাঁদের মধ্যেও আবার মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈর (রঃ) মাযহাব এই যে, সূরা-ই-ফাতিহা ও প্রত্যেক সূরার পূর্বে একে উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে। সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন (রঃ) এবং মুসলমানদের পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণের এটাই মাযহাব। সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে একে উচ্চৈঃস্বরে পড়ার পক্ষপাতি হলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মু'আবিয়া (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ)। হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) হতেও গারীব বা দুর্বল সনদে ইমাম খতীব (রঃ) এটা নকল করেছেন। বায়হাকী (রঃ) ও ইবনে আবদুল বার্র (রঃ) হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)

হতেও এটা বর্ণনা করেছেন। তাবেঈগণের মধ্যে হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত আবূ কালাবাহ্ (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ), হযরত আলী বিন হাসান (রঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মদ সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), আতা' (রঃ), তাঊস (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সা'লিম (রঃ), মুহাম্মদ বিন কা'ব কারজী (রঃ), উবাইদ (রঃ), আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আম্র (রঃ), ইবনে হারাম আবূ ওয়ায়েল (রঃ), ইবনে সীরীন (রঃ), মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (র), আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মদ নাফি, ইবনে উমারের (রাঃ) গোলাম (রঃ), যায়েদ বিন আসলাম (রঃ), উমার বিন আবদুল আযীয (রঃ), আরযাক বিন কায়েস (রঃ), হাবীব বিন আবি সাবিত (রঃ), আবূ শা'শা' (রঃ), মাকহুল (রঃ), আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল বিন মাকরান (রঃ), এবং বায়হাকীর বর্ণনায় আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান (রঃ), মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ (রঃ) এবং আবদুল বার্রের বর্ণনায় আমর বিন দীনার (রঃ)। এঁরা সবাই নামাযের যেখানে কিরআত উচ্চৈঃস্বরে পড়া হয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকেও উচ্চ শব্দে পড়তেন। এর একটি প্রধান দলীল এই যে, এটা যখন সূরা ই ফাতিহারই একটা আয়াত তখন পূর্ণ সূরার ন্যায় একে উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে। তাছাড়া সুনান-ই-নাসাঈ, সহীহ ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসতাদরিক-ই- হা'কিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) নামায পড়লেন এবং কিরাআতে উচ্চ শব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন এবং নামায শেষে বললেনঃ 'তোমাদের সবার চাইতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের সঙ্গে আমার নামাযেরই সামঞ্জস্য বেশী।' দারকুতনী, খাতীব এবং বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সুনান-ই-আবি দাউদ ও জামে'উত তিরমিযীর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দ্বারা নামায আরম্ভ করতেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, হাদীসটি খুব সঠিক নয়। মুসতাদরিক-ই-হাকিমের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীমকে ' উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন। ইমাম হাকীম (রঃ) এ হাদীসকে সঠিক বলেছেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিরাআত কিরূপ ছিল?' তিনি বললেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক খাড়া শব্দকে লম্বা করে পড়তেন।' অতঃপর তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন بِسْمِ اللّٰهِ

-কে মদ (লম্বা) করেছেন اَلرَّحْمٰن -এর উপর মদ করেছেন ও رَحِيْم -এর উপর মদ করেছেন। মুসনাদ-ই-আহমাদ, সুনান-ই-আবি দাউদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা এবং মুসতাদরিক-ই-হাকিমে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক আয়াত শেষে থামতেন এবং তাঁর কিরাআত পৃথক পৃথক হতো। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন, তারপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়তেন, পুনরায় থেমে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়তেন। এইভাবে তিনি পড়তেন। দারাকুতনী (রঃ) এ হাদীসটিকে সঠিক বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও ইমাম হাকিম (রঃ) হয়রত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) মদীনায় নামায পড়ালেন এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়লেন না। সে সময় যেসব মুহাজির সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এতে আপত্তি জানালেন। সুতরাং তিনি পুনরায় যখন নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়ালেন তখন 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করলেন। প্রায় নিশ্চিতরূপেই উল্লিখিত সংখ্যক হাদীস এ মাযহাবের দলীলের জন্যে যথেষ্ট। এখন বাকী থাকলো তাঁদের বিপক্ষের হাদীস, বর্ণনা, সনদ, দুর্বলতা ইত্যাদি। ওগুলোর জন্যে অন্য জায়গা রয়েছে।

দ্বিতীয় মাযহাব এই যে, 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তে হবে না। খলীফা চতুষ্টয়, আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল, তাবেঈন ও পরবর্তী যুগের দলসমূহ হতে এটা সাব্যস্ত আছে। আবূ হানীফা (রঃ), সাওরী (রঃ) এবং আহমদ বিন হাম্বলের (রঃ) এটাই মাযহাব। ইমাম মালিকের (রঃ) মাযহাব এই যে, 'বিসমিল্লাহ' পড়তেই হবে না, জোরেও নয়, আস্তেও নয়। তাঁর প্রথম দলীল তো সহীহ মুসলিমের হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি যাতে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযকে তাকবীর ও কিরাআতকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা শুরু করতেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে আছে যে, হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'আমি নবী (সঃ), হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ) এবং হযরত উসমানের (রাঃ) পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা সবাই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা নামায আরম্ভ করতেন। সহীহ মুসলিমের মধ্যে আছে যে, বিসমিল্লাহ বলতেন না। কিরাআতের প্রথমেও না, শেষেও না। সুনানের মধ্যে হযরত মাগফাল (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। এ হলো ঐসব ইমামের 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার দলীল। এ প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, এ কোন বড় রকমের মতভেদ নয়। প্রত্যেক দলই অন্য দলের নামাযকে শুদ্ধ বলে থাকেন।

## 'বিসমিল্লাহ'র ফযীলতের বর্ণনা

তাফসীর-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে 'বিসমিল্লাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ 'এ তো আল্লাহ তা'আলার নাম। আল্লাহর বড় নাম এবং এই বিসমিল্লাহর মধ্যে এতদুর নৈকট্য রয়েছে যেমন রয়েছে চক্ষুর কালো অংশও সাদা অংশের মধ্যে।" ইবনে মরদুওয়াইর (রঃ) তাফসীরের মধ্যেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে মরদুওয়াই'-এর মধ্যে এ বর্ণনাটিও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হযরত ঈসার (আঃ) আম্মা হযরত মরঈয়াম (আঃ) যখন তাঁকে মক্তবে নিয়ে গিয়ে শিক্ষকের সামনে বসালেন তখন তাঁকে বললেনঃ 'বিসমিল্লাহ' লিখুন। হযরত ঈসা (আঃ) বললেনঃ 'বিসমিল্লাহ কি?' শিক্ষক উত্তর দিলেনঃ 'আমি জানি না।' তিনি বললেনঃ ب-এর ভাবার্থ হলো بَهَاءُ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহর উচ্চতা।' س-এর ভাবার্থ হলো سَنَاءُهُ অর্থাৎ আল্লাহর আলোক। م-এর তাৎপর্য হলো مُلْكُهُ বা আল্লাহর রাজত্ব। الله বলে উপাস্যদের উপাস্যকে। - رَحْمٰن বলে দুনিয়া ও আখেরাতের করুণাময় কৃপানিধানকে, এবং আখেরাতে যিনি দয়া প্রদর্শন করবেন তাঁকে رَحِيْم বলা হয়।' তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যেও এ বর্ণনাটি রয়েছে। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে তা খুবই গারীব বা দুর্বল। হতে পারে যে, এটি কোন সাহাবী (রাঃ) প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে কিংবা হতে পারে যে, বানী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহের মধ্যে এটা একটা বর্ণনা। এর মারফূ' হাদীস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অবশ্য আল্লাহ পাকই এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী।

ইবনে মরদুওয়াই এর তাফসীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার মত আয়াত হযরত সুলাইমান ছাড়া অন্য কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়নি। আয়াতটি হলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'।' হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন পূর্ব দিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, বায়ু মণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে যায়, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত হয়ে উঠে, জন্তুগুলো কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে, আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয়ে শয়তানকে বিতাড়ন করে এবং বিশ্বপ্রভু স্বীয় সম্মান ও মর্যাদার কসম করে বলেনঃ 'যে জিনিসের উপর আমার এ নাম নেওয়া যাবে তাতে অবশ্যই বরকত হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, দোযখের ১৯টি দারোগার হাত হতে যে বাঁচতে চায় সে যেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে। এতেও ঘটেছে ১৯টি অক্ষরের সমাবেশ। প্রত্যেকটি অক্ষর প্রত্যেক ফেরেশতার

জন্যে রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।' কুরতবীর সমর্থনে ইবনে আতিয়াহ্ এটা বর্ণনা করেছেন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি আরও একটি হাদীস এনেছেন। তাতে রয়েছেঃ 'আমি স্বচক্ষে ত্রিশের বেশী ফেরেশতা দেখেছি যাঁরা এটা নিয়ে তাড়াহুড়া করছিলেন।' এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেই সময় বলেছিলেন যখন একটি লোক رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ পাঠ করেছিলেন। এর মধ্যে ত্রিশের বেশী অক্ষর রয়েছে। তৎসংখ্যক ফেরেশতাও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ রকমই বিসমিল্লাহ'র মধ্যে উনিশটি অক্ষর আছে এবং তথায় ফেরেশতার সংখ্যাও হবে উনিশ। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সোয়ারীর উপর তাঁর পিছনে যে সাহাবী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর বর্ণনাটি এইঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উষ্ট্রীটির কিছু পদস্খলন ঘটলে আমি বললাম যে শয়তানের সর্বনাশ হোক। তখন তিনি বললেনঃ 'এরূপ বলো না, এতে শয়তান গর্বভরে ফুলে উঠে। এবং মনে করে যে, যেন সেইই স্বীয় শক্তির বলে ফেলে দিয়েছে। তবে হাঁ, 'বিসমিল্লাহ' বলাতে সে মাছির মত লাঞ্ছিত ও হৃতগর্ব হয়ে পড়ে।' ইমাম নাসাঈ (রঃ) স্বীয় কিতাব 'আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ' এর মধ্যে এবং ইবনে মরদুওয়াই (রঃ) স্বীয় তাফসীরের মধ্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সাহাবীর (রাঃ) নাম বলেছেন উসামা বিন উমায়ের (রাঃ)। আর তার মধ্যেই আছেঃ 'বিসমিল্লাহ' বল। এটা একমাত্র বিসমিল্লাহরই বরকত।' এ জন্যেই প্রত্যেক কাজ ও কথার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা মুসতাহাব। খুৎবার শুরুতেও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। হাদীসে আছে যে, বিসমিল্লাহর দ্বারা যে কাজ আরম্ভ করা না হয় তা কল্যাণহীন ও বরকতশূন্য থাকে। পায়খানায় যাওয়ার সময়ও বিসমিল্লাহ বলবে। মুসনাদ-ই- আহমাদ এবং সুনানের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওজুর সময় বিসমিল্লাহ বলে না তার অযূ হয় না।' এ হাদীসটি হাসান বা উত্তম। কোন কোন আলেম তো অযুর সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। প্রাণী যবাহ করার সময়েও বিসমিল্লাহ বলা মুসতাহাব। ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং একটি দলের ধারণা এটাই। কেউ কেউ যিকিরের সময় এবং কেউ কেউ সাধারণভাবে একে ওয়াজিব বলে থাকেন। এর বিশদ বর্ণনা ইনশাআল্লাহ আবার অতি সত্বরই আসবে।

ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে এই আয়াতটির ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যদি তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে সহমিলনের প্রাক্কালে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নাও আর তাতেই যদি আল্লাহ কোন সন্তান দান করেন, তাহলে তার

নিজের ও তার সমস্ত ঔরসজাত সন্তানের নিঃশ্বাসের সংখ্যার সমান পূণ্য তোমার আমলনামায় লিখা হবে। কিন্তু এ বর্ণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি এটা কোথাও পাইনি। খাওয়ার সময়েও বিসমিল্লাহ পড়া মুসতাহাব। সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার বিন আবূ সালামাকে (রঃ) যিনি তাঁর সহধর্মিনী হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) পূর্ব স্বামীর পুত্র ছিলেন, বলেনঃ 'বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খেতে থাক।' কোন কোন আলেম এ সময়েও বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছে করলে যেন সে এটা পাঠ করেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থাৎ আল্লাহর নামের সঙ্গে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং যা আমাদেরকে দান করবেন তাকেও শয়তানের কবল হতে রক্ষা করুন।'

তিনি আরও বলেন যে, এই মিলনের ফলে যদি সে গর্ভধারণ করে তবে শয়তান সেই সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এখান হতে এটাও জানা গেল যে, বিসমিল্লাহর ب এর সম্পর্ক কার সঙ্গে রয়েছে।

## ব্যাকরণগত শব্দ বিন্যাসঃ

ব্যাকরণবিদগণের এতে দু'টি মত রয়েছে। দুটোই কাছাকাছি। কেউ একে اِسْم বলেন আবার কেউ فِعْل বলেন। প্রত্যেকেরই দলীল প্রমাণ কুরআন থেকে পাওয়া যায়। যাঁরা একে اِسْم -এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে থাকেন তাঁরা বলেনঃ بِسْمِ اللّٰهِ اِبْتِدَائِىْ অর্থাৎ 'আমার আরম্ভ আল্লাহর নামের সঙ্গে।' কুরআন পাকে রয়েছেঃ

اِرْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ * (১১ঃ ৪১)

এ আয়াতে اِسْم অর্থাৎ مَصْدَر প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। আর যাঁরা একে فِعْل -এর সঙ্গে উহ্য বলে থাকেন সে اَمْر-فِعْل ই হোক বা خَبَر ই হোক, যেমন اِبْدَأْ بِسْمِ اللّٰهِ এবং بَدَأْتُ بِسْمِ اللّٰهِ তাঁদের দলীল হচ্ছে কুরআন কারীমের এই নিম্নরূপ আয়াতটিঃ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ প্রকৃতপক্ষে দু'টোই সঠিক ও শুদ্ধ। কেননা, فِعْل এর জন্যেও مَصْدَر হওয়া জরুরী। তাহলে এটা ইচ্ছাধীন রয়েছে

যে, فِعْل কে উহ্য মনে করা হোক এবং ওর مَصْدَر কে সেই فِعْل অনুসারে দাঁড় করানো হোক যার নাম পূর্বে নেয়া হয়েছে। দাঁড়ান হোক, বসা হোক, খানাপিনা হোক, কুরআন পাঠ হোক বা অযু ও নামায ইত্যাদি হোক, এসবের প্রথমে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সাহায্য চাওয়ার জন্যে এবং প্রার্থনা মঞ্জুরীর জন্যে আল্লাহর নাম নেয়া ইসলামী শরীয়তের একটি বিধান। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচাইতে ভাল জানেন। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিমের তাফসীর ও মুসনাদে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম যখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন তখন বলেন ঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! বলুন–

أَسْتَعِيذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আবার বলুনঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উদ্দেশ্য ছিল যেন উঠা, বসা, পড়া, খাওয়া সব কিছুই আল্লাহর নামে আরম্ভ হয়।

**اِسْمٌ শব্দটির তাহকীকঃ**

اِسْم অর্থাৎ নামটাই কি 'মুসাম্মা' অর্থাৎ নামযুক্ত না অন্য কিছু? এ ব্যাপারে তিন দল আলিমের তিন রকম উক্তি রয়েছে। প্রথম এই যে, নামটাই হচ্ছে মুসাম্মা বা নামযুক্ত। আবূ উবাইদাহ এবং সিবওয়াইয়ের কথা এটাই। বাকিল্লানী এবং ইবনে ফুরকও এটাই পছন্দ করেন। মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে খাতীব রাজী স্বীয় তাফসীরের সূচনায় লিখেছেনঃ 'হাসভিয়্যাহ কারামিয়্যাহ এবং আশরিয়্যাহগণ বলেন যে, اِسْم হলো نَفْسِ مُسَمّٰى কিন্তু نَفْسِ تَسْمِيَّة হতে পৃথক এবং মু'তাযিলারা বলেন যে, اِسْم হলো نَفْسِ تَسْمِيَّة কিন্তু نَفْسِ مُسَمّٰى হতে আলাদা। আমাদের মতে اِسْم টা مُسَمّٰى ও غَيْرِ مُسَمّٰى দু'টো থেকেই আলাদা। আমরা বলি যে, যদি اِسْم-এর উদ্দেশ্যে لَفْظ হয় যা শব্দসমূহের অংশ বা অক্ষরসমূহের সমষ্টি, তবে তো এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে সাব্যস্ত হয় যে, এটা مُسَمّٰى হতে পৃথক। আর যদি اِسْم হতে উদ্দেশ্য হয় ذَاتِ مُسَمّٰى তবে তো এ একটা স্পষ্টকে স্পষ্ট করার কাজ যা শুধু নিরর্থক ও বাজে কাজেরই নামান্তর। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, বাজে আলোচনায় সময়ের অপচয় একটা নিছক অনর্থক কাজ। অতঃপর اِسْم ও مُسَمّٰى কে পৃথকীকরণের উপর দলীল প্রমাণ আনা হয়েছে যে, কখনও اِسْم হয় কিন্তু مُسَمّٰى মোটেই হয় না। যেমন مَعْدُوْم বা অস্তিত্বহীন শব্দটি। কখনও আবার একটি مُسَمّٰى কয়েকটি اِسْم হয়। যেমন

مُتَرَادِفٌ বা একার্থবোধক শব্দ। আবার কখনও اِسْم একটি হয় এবং مُسَمّٰى হয় কয়েকটি। যেমন مُشْتَرِك, সুতরাং বুঝা গেল যে, اِسْم ও مُسَمّٰى এক জিনিস নয়। অর্থাৎ নাম এক জিনিস এবং 'মুসাম্মা' বা নামধারী অন্য জিনিস। কারণ যদি اِسْم কেই مُسَمّٰى ধরা হয় তবে আগুনের নাম নেয়া মাত্রই তার দাহন ও গরম অনুভূত হওয়া উচিত এবং বরফের নাম নিলেই ঠাণ্ডা অনুভূত হওয়া দরকার। অথচ কোন জ্ঞানীই একথা বলেন না—বলতে পারেন না। এর দলীল প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছেঃ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ 'আল্লাহর অনেক উত্তম নাম রয়েছে, তোমরা ঐসব নাম দ্বারা আল্লাহকে ডাকতে থাক।' হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ তা'আলার ৯৯টা নাম আছে। তাহলে চিন্তার বিষয় যে, নাম কত বেশী আছে। অথচ مُسَمّٰى একটিই এবং তিনি হলেন অংশীবিহীন এক অদ্বিতীয় আল্লাহ। এরকমই اَسْمَاء কে এ আয়াতে اَللّٰه -এর দিকে সম্বন্ধ লাগান হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ইত্যাদি। اِضَافَتْ-ও এটাই চায় যে, اِسْم ও مُسَمّٰى অর্থাৎ নাম ও নামধারী আলাদা জিনিস। কারণ اِضَافَتْ দ্বারা সম্পূর্ণ অন্য এক বিরোধী বস্তুকে বুঝায়। এরকমই আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত নির্দেশঃ فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নামসমূহ দ্বারাই ডাক। এটাও এ বিষয়ের দলীল প্রমাণ যে, নাম এক জিনিস এবং নামধারী আলাদা জিনিস। এখন যাঁরা اِسْم ও مُسَمّٰى-কে এক বলেন তাঁদের দলীল এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ অর্থাৎ 'তোমার মহান প্রভুর অতি সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন কল্যাণময় নাম রয়েছে।' (৫৫ঃ ৭৮) নামকে কল্যাণময় ও মর্যাদাসম্পন্ন বলা হয়েছে, অথচ স্বয়ং আল্লাহই কল্যাণময়। এর সহজ উত্তর এই যে, সেই পবিত্র প্রভুর কারণেই তাঁর নামও শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ হয়েছে। তাঁদের দ্বিতীয় দলীল এই যে, যখন কোন ব্যক্তি বলেঃ 'যয়নাবের উপর তালাক', তখন তালাক শুধু সেই ব্যক্তির ঐ স্ত্রীর উপর হয়ে থাকে যার নাম যয়নাব। যদি নাম ও নামধারীর মধ্যে পার্থক্য থাকতো তবে শুধু নামের উপরই তালাক পড়তো, নামধারীর উপর কি করে পড়তো? এর উত্তর এই যে, এ কথার ভাবার্থ হয় এইরূপঃ যার নাম যয়নাব তার উপর তালাক। تَسْمِيَّة -এর اِسْم হতে আলাদা হওয়া এই দলীলের উপর ভিত্তি করে যে, تَسْمِيَّة বলা হয় কারও নাম নির্ধারণ করাকে। আর এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা এক জিনিস এবং নামধারী অন্য জিনিস। ইমাম রাযীর (রঃ) কথা এটাই। এ সবকিছু بِاسْمِ -এর সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এখন اَللّٰه শব্দ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

## اَللّٰه শব্দের তাহকীক

اَللّٰهُ বরকত বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহান প্রভুর একটি বিশিষ্ট নাম। বলা হয় যে, এটাই اِسْمِ اَعْظَم কেননা, সমুদয় উত্তম গুণের সঙ্গে এটাই গুণান্বিত হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছেঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ * هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ * هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

অর্থাৎ 'তিনিই সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই, তিনি প্রকাশ্য ও অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞাতা, তিনি বড়ই মেহেরবান, পরম দয়ালু। তিনি এমন উপাস্য যে, তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, তিনি বাদশাহ, পবিত্র, নিরাপত্তা প্রদানকারী, আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্তা, প্রবল মহাপরাক্রম গর্বের অধিকারী, সুমহান। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অংশীবাদ হতে পবিত্র। তিনি সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবন কর্তা, রূপশিল্পী তাঁরই জন্য উত্তম উত্তম নামসমূহ রয়েছে, তিনি মহান পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।' (৫৯ঃ ২২-২৪) এ আয়াতসমূহে 'আল্লাহ' ছাড়া অন্যান্য সবগুলোই গুণবাচক নাম এবং ওগুলো 'আল্লাহ' শব্দেরই বিশেষণ। সুতরাং মূল ও প্রকৃত নাম 'আল্লাহ'। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ 'আল্লাহর জন্যে পবিত্র ও উত্তম নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে ঐসব নাম ধরে ডাক।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। এক শতের একটা কম। যে ওগুলো গণনা করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। 'জামে'উত তিরমিযী ও সুনান-ই-ইবনে মাজার বর্ণনায় এ নামগুলোর ব্যাখ্যাও এসেছে। ঐ দুই হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় শব্দের কিছু পার্থক্য আছে এবং সংখ্যায় কিছু কম-বেশী রয়েছে। ইমাম রাযী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে কোন কোন লোক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পাঁচ হাজার নাম আছে। এক হাজার নাম তো কুরআন মাজীদ ও হাদীসে রয়েছে, এক হাজার আছে

তাওরাতে, এক হাজার আছে ইঞ্জিলে, এক হাজার আছে যাবুরে এবং এক হাজার আছে 'লাওহে মাহফুযে'। 'আল্লাহ' এমন একটি নাম যা একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কারও নেই। এ কারণেই এর মূল উৎস কি তা আরবদের নিকটেও অজানা রয়েছে। এমনকি এর بَابٌ ও তাদের জানা নেই। বরং ব্যাকরণবিদগণের একটি বড় দলের ধারণা যে, এটা اِسْم جَامِد অর্থাৎ এটা কোন কিছু হতে বের হয়নি এবং এটা হতেও অন্য কিছু বের হয়নি। কুরতুবি (রঃ) উলামা-ই-কিরামের একটি বিরাট দলের পক্ষ থেকে এই নীতিটি নকল করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফেঈ (রঃ), ইমাম খাত্তাবী (রঃ), ইমামুল হারামাইন (রঃ), ইমাম গাযযালী (রঃ) প্রমুখ বিদগ্ধ মনীষীগণ। খলীল (রঃ) এবং সিবওয়াইহ্ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, اَلِف لاَم এতে আবশ্যকীয়। ইমাম খাত্তাবী (রঃ)-এর প্রমাণরূপে বলেছেন যে, يَا اَللّٰهُ তো বলা হয়ে থাকে কিন্তু يَا رَحْمٰنُ বলতে শুনা যায় না। যদি اَللّٰه শব্দের اَلِف لاَم মূল শব্দের অন্তর্ভুক্ত না হতো তবে আহ্বান সূচক শব্দ يَا ব্যবহৃত হতো না। কেননা, আরবী ব্যাকরণ অনুসারে اَلِف لاَم বিশিষ্ট اِسْم-এর পূর্বে আহ্বান সূচক শব্দের ব্যবহার বৈধ নয়। কোন কোন বিদ্বান লোকের এ অভিমতও রয়েছে যে, এ শব্দটি মূল উৎস বিশিষ্ট। তাঁরা এর দলীলরূপে রূবা ইবনু আজ্জাজের একটি কবিতা পেশ করেন। কবিতাটি নিম্নরূপঃ

لِلّٰهِ دَرُّ الْغَانِيَاتِ الْمُدَّةِ * سَبَّحْنَ وَ اسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَاَلُّهِي

এতে تَاَلُّهٌ -এর বর্ণনায় আছে যার مُضَارِع ও مَاضِي - مَصْدَر হিসেবে مَصْدَر হয় اَلَهَ يَاْلَهُ اِلٰهَةً وَ تَاَلُّهًا যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি يَذَرَكَ وَ اِلٰهَتَكَ পড়তেন। এর ভাবার্থ হলো ইবাদত। অর্থাৎ তাঁর উপাসনা করা হয় এবং তিনি কারও উপাসনা করেন না। মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ বলেনঃ 'আলোচ্য শব্দটি مُشْتَقّ বা অন্য শব্দ থেকে নির্গত হওয়ার অনুকূলে। কেউ কেউ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ فِى الْاَرْضِ এই আয়াতকে দলীলরূপে এনেছেনঃ অনুরূপভাবে অন্য আয়াতেও আছেঃ

وَ هُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّ فِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ

অর্থাৎ 'আসমানে ও যমীনে তিনিই একমাত্র আল্লাহ।' (৪৩ঃ ৮৪)এবং তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যিনি আকাশেও উপাস্য এবং পৃথিবীতেও উপাস্য। সিবওয়াইহ্ (রঃ) খলীল (রঃ) থেকে নকল করেছেন যে, اَللّٰهُ মূলে ছিল اِلٰهٌ যেমন

فَعَالٌ অতঃপর هَمْزَةٌ-এর পরিবর্তে اَلِفْ لاَمْ আনা হয়েছে। যেমন اَلنَّاسُ মূলে ছিল اُنَاسٌ । কেউ কেউ বলেন যে, اَللهُ মূলে لاَهٌ ছিল। সম্মানের জন্যে পূর্বে اَلِفْ لاَمْ আনা হয়েছে। সিবওয়াইহের পছন্দনীয় মত এটাই। আরব কবিদের কবিতার মধ্যেও এ শব্দটি পাওয়া যায়। যেমনঃ

لاَهِ ابْنُ عَمِّكَ لاَ اَفْضَلْتَ فِىْ حَسَبٍ * عَنِّىْ وَ لاَ اَنْتَ دَيَّانِىْ فَتَخْزُوْنِىْ

কাসাই ও ফার্রা বলেন যে, এটা মূলে ছিল لاَاِلٰه, অতঃপর هَمْزَةٌ কে লুপ্ত করে প্রথম لاَمْ কে দ্বিতীয় لاَمْ এ اِدْغَامْ করা হয়েছে। لٰكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّىْ এর মধ্যে لٰكِنْ اَنَا শব্দদ্বয় لٰكِنَّ হয়েছে। হাসানের (রঃ) কিরআতে لٰكِنَّ اَنَا ই রয়েছে। এটা وَلَهٌ হতে নেয়া হয়েছে। এবং এর অর্থ হলো تَحَيَّرٌ জ্ঞান লোপ পাওয়াকে وَلَهٌ বলে। আরবী ভাষায় رَجُلٌ وَالِهٌ এবং اِمْرَاَةٌ وَلْهٰى ও مَوْلُوْهَةٌ ঐ সময়ে বলা হয় যখন তাদেরকে বিয়াবান জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে বলে সেই পবিত্র সত্ত্বাকে 'আল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এ শব্দটি মূলে وِلاَهٌ ছিল। وَاوْ টি هَمْزَةٌ তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন وِشَاحٌ শব্দকে اِشَاحٌ ও وِسَادَةٌ শব্দকে اِسَادَةٌ বলা হয়।

ইমাম রাযীর (রঃ) মত এই যে, এই শব্দটি اَلِهْتُ اِلٰى فُلاَنٍ হতে নেয়া হয়েছে এবং তা سَكَنْتُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'আমি অমুক হতে অনাবিল শান্তি ও আরাম লাভ করেছি।' কেননা, জ্ঞান ও বিবেকের শান্তি শুধু আল্লাহর যিকরেই রয়েছে এবং আত্মার প্রকৃত খুশী একমাত্র তাঁরই পরিচয়ে রয়েছে। একমাত্র তিনিই হলেন পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ এরূপ নয়। এ কারণেই তাঁকে 'আল্লাহ' বলা হয়। কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছেঃ اَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ 'মুমিনদের অন্তর শুধুমাত্র আল্লাহর যিকরের দ্বারাই অনাবিল শান্তি লাভ করে থাকে।' (১৩ঃ ২৮) এটাও একটা মত যে, শব্দটি لاَهَ يَلُوْهُ হতে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ হয় গুপ্ত হওয়া ও পর্দা করা। এও বলা হয়েছে যে, শব্দটি اَلِهَ الْفَصِيْلُ হতে গৃহীত হয়েছে। বান্দা যেহেতু বিনয়ের সাথে সদা তাঁর দিকে ঝুঁকে থাকে এবং সর্বাবস্থায়ই তাঁরই কৃপা ও করুণার অঞ্চল ধরে থাকে, সেহেতু তাঁকে 'আল্লাহ বলা হয়। একটা মত এও আছে যে, আরবের লোকেরা اَلِهَ الرَّجُلُ يَاْلَهُ ঐ সময়ে বলে যখন কেউ কোন দৈব দুর্ঘটনার ফলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যে তাকে আশ্রয় দেয় ও রক্ষা করে। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টজীবকে বিপদ হতে মুক্তিদাতা একমাত্র মহান আল্লাহ, তাই তাঁকে 'আল্লাহ' বলা হয়। যেমন

কুরআন পাকে রয়েছেঃ هُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'তিনিই রক্ষা করেন ও আশ্রয় দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কাউকেও রক্ষা করা যায় না।' (২৩ঃ ৮৯) আর প্রকৃত অনুগ্রহকারী একমাত্র তিনিই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ অর্থাৎ তোমাদের উপর যতগুলো দান রয়েছে সবই আল্লাহ প্রদত্ত। তিনিই আহার দাতা।' (১৬ঃ ৫৩) সুতরাং তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেনঃ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ অর্থাৎ তিনিই আহার্য দেন তাঁকে আহার্য দেয়া হয় না।' (৬ঃ ১৪) তিনিই প্রত্যেক জিনিসের আবিষ্কারক। তাই তিনি বলেনঃ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ অর্থাৎ তুমি বল—আল্লাহর তরফ হতেই প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব লাভ হয়েছে।' (৪ঃ ৭৮) ইমাম রাযীর (রঃ) গৃহীত মাযহাব এই যে اَللّٰه শব্দটি مُشْتَق নয়। খলীল (রঃ), সিবওয়াইহ (রঃ) এবং অধিকাংশ উসূলিয়ীন ও ফাকীহদের এটাই অভিমত। এর অনেক দলীল-প্রমাণও রয়েছে। এটি مُشْتَق হলে এর অর্থের মধ্যেও বহু একক শব্দও জড়িত থাকতো। অথচ এরূপ হয় না। আবার শব্দটিকে مَوْصُوف বানানো হয় এবং এর অনেকগুলো صِفَت ও আসে । যেমন 'রহমান' 'রাহীম' 'মালিক' 'কদ্দুস' ইত্যাদি। সুতরাং বুঝা গেল যে এটা مُشْتَق নয়। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আছে عَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ এখানে এটা عَطْف بَيَان হয়েছে। আলোচ্য শব্দটির مُشْتَق না হওয়ার একটি দলীল প্রমাণ রূপে নিম্নের هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (১৯ঃ ৬৫) এই আয়াতটি বর্ণনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচাইতে ভাল জানেন।

কোন কোন লোক একথাও বলেছেন যে, اَللّٰهُ শব্দ আরবী নয় বরং (রঃ) ইব্রানী শব্দ। কিন্তু ইমাম রাযী (রঃ) একে দুর্বল বলেছেন এবং আসলেও এটা দুর্বল। ইমাম রাযী (রঃ) বলেন যে, 'মাখলূক' বা সৃষ্টজীব দুই প্রকার। এক প্রকার হলেন তাঁরাই যাঁরা আল্লাহর মা'রিফাতের সাগর সৈকতে পৌঁছে গেছেন। দ্বিতীয় প্রকার হলো ওরাই যারা তা হতে বঞ্চিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং সে বিস্ময়ের অন্ধকারে এবং বন্ধুর কন্টকাকীর্ণ উপত্যকায় পড়ে রয়েছে এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সে হারিয়ে ফেলে একেবারে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি মা'রিফাতের ধারে কাছে পৌঁছে গেছে এবং আল্লাহর নূর ও ঔজ্জ্বল্যের বাগানে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে সে সেখানেই দিশেহারা ও হতভম্ব হয়ে রয়ে গেছে। মোট কথা কেউ পূর্ণভাবে আল্লাহর পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। সুতরাং এখন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সেই মহান সত্ত্বার নামই 'আল্লাহ'। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁরই মুখাপেক্ষী, তাঁরই সামনে মস্তক অবনতকারী এবং তাঁকেই অনুসন্ধানকারী। আল্লামা খলীল বিন আহমাদ ফারাহীদীর (রঃ)

কথা অনুসারে 'আল্লাহ' শব্দের অর্থ অন্য উৎস থেকেও করা যেতে পারে। আরবের বাক পদ্ধতিতে প্রত্যেক উঁচু জিনিসকে لَاهًا বলা হয়, আর যেহেতু বিশ্ব প্রভু সবচেয়ে উঁচু ও বড় এ জন্য তাঁকেও আল্লাহ বলা হয়।

আবার اَلَهٌ -এর অর্থ হলো ইবাদত করা এবং تَالُّهٌ -এর অর্থ হলো আদেশ পালন ও কুরবানী করণ আর আল্লাহরই ইবাদত করা হয় এবং তাঁরই নামে কুরবানী দেওয়া হয় বলে তাঁকেও আল্লাহ বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কিরাআতে আছে وَ يَذَرَكَ وَ اِلٰهَتَكَ -এর মূল হচ্ছে اَلْاِلٰـهُ, فَ কালিমার স্থলে هَمْزَةٌ এসে ওটা লুপ্ত হয়েছে, অতঃপর نَفْس كَلِمَةً -এর لَام টি অতিরিক্ত لَام কে تَعْرِيْف -এর জন্য আনা হয়েছিল, তার সঙ্গে মিলে গেছে এবং দুই لَام এ اِدْغَام হয়েছে। ফলে تَشْدِيْد বিশিষ্ট একটা لَام রয়ে গেছে এবং সম্মানের জন্যে اَللّٰه বলা হয়েছে।

## اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ শব্দ দু'টিকে رَحْمَتٌ থেকে নেওয়া হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে দু'টোর মধ্যেই 'মুবালাগাহ' বা আধিক্য রয়েছে, তবে 'রাহীমের' চেয়ে 'রহমানের' মধ্যে আধিক্য বেশী আছে। আল্লামা ইবনে জারীরের (রঃ) কথামত জানা যায় যে, এতে প্রায় সবাই একমত। পূর্ববর্তী যুগের সালফে সালেহীন বা কোন আলেমের তাফসীরের মাধ্যমেও এটা জানা যায়। হযরত ঈসাও (আঃ) এই অর্থই নিয়েছেন, যা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে—তা এই যে, রাহমানের অর্থ হলো দুনিয়া ও আখেরাতে দয়া প্রদর্শনকারী এবং রাহীমের অর্থ শুধু আখেরাতে রহমকারী। কেউ কেউ বলেন যে, رَحْمٰن শব্দটি مُشْتَق নয়। কারণ যদি তা এ রকমই হত তবে مَرْحُوْم -এর সঙ্গে মিলে যেতো। অথচ কুরআন পাকের মধ্যে وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا (৩৩ঃ ৪৩) এসেছে। মুবর্রাদের বরাতে ইবনুল আমবারী (রঃ) বলেছেন যে, رَحْمٰن হচ্ছে ইব্রানী নাম, আরবী নয়। আবূ ইসহাক যাজ্জাজ 'মা'আনিল কুরআন' নামক অনবদ্য পুস্তকে লিখেছেন যে, আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়ার মতানুসারে রাহীম আরবী শব্দ এবং রাহমান ইবরানী শব্দ। দু'টিকে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু আবূ ইসহাক বলেন যে, এ কথাটি তেমন মনে ধরে না। এ শব্দটি مُشْتَق হওয়ার দলীলরূপে কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, জামেউত তিরমিযীর সহীহ হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা রয়েছেঃ 'আমি রাহমান, আমি রহমকে সৃষ্টি করেছি এবং স্বীয় নাম হতেও এ নামটি বের করেছি। যে একে সংযুক্ত করবে আমিও তাঁকে যুক্ত করবো এবং যে তাকে কেটে দেবে আমিও তাকে কেটে দেবো।' এখন

প্রকাশ্য হাদীসের বিরোধিতা ও অস্বীকার করার কোন উপায় বা অবকাশ নেই। এখন রইলো কাফিরদের এ নামকে অস্বীকার করার কথাটা। এটা শুধু তাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, 'রাহমান' ও 'রাহীমের' একই অর্থ যেমন نَدْمَانٌ ও نَدِيْمٌ শব্দদ্বয়। আবূ উবাইদারও (রঃ) একই মত। একটা মত এও আছে যে, فَعْلَانٌ শব্দটি فَعِيْلٌ-এর মত নয়। فَعْلَانٌ শব্দের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে مُبَالَغَةٌ হয়ে থাকে। যেমন غَضْبَانٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে খুবই রাগান্বিত এবং একেবারে অগ্নিশর্মা হয়। আর فَعِيْلٌ শুধু فَاعِل ও مَفْعُوْل -এর জন্যই আসে যা مُبَالَغَةٌ শূন্য থাকে। আবূ আলী ফারসী বলেন যে, رَحْمٰن শব্দটি সাধারণ اِسْم যা সর্ব প্রকারের দয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। আর 'রাহীমের' সম্পর্ক শুধু মুমিনদের সঙ্গে যেমন আল্লাহ পাক বলেন, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا অর্থাৎ 'তিনি মুমিনদের প্রতি দয়ালু।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই দুটি নামই করুণা ও দয়া বিশিষ্ট। একের মধ্যে অন্যের তুলনায় দয়া ও করুণা বেশী আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এই বর্ণনায় اَرَقٌّ শব্দটি রয়েছে। খাত্তাবী ও অন্যেরা এর অর্থ اَرْفَقُ করে থাকেন। যেমন হাদীসের মধ্যে আছেঃ 'আল্লাহ তা'আলা رِفْق বিশিষ্ট অর্থাৎ নম্র, বিনীয় ও দয়ালু। প্রত্যেক কাজে তিনি বিনয়, নম্রতা ও সরলতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতা ও সরলতার প্রতি এমন নিয়ামত বর্ষণ করেন যা কঠোরতার প্রতি করেন না।'

ইবনুল মুবারক বলেন, 'রাহমান' তাঁকেই বলে যার কাছে চাইলে তিনি দান করেন, আর 'রাহীম' তাঁকে বলে যাঁর কাছে না চাইলে তিনি রাগান্বিত হন। জামে'উত তিরমিযীতে আছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট যে ব্যক্তি চায় না তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হন। কোন একজন কবির কবিতায় আছেঃ

اَللّٰهُ يَغْضَبُ اِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهٗ * وَ بَنِيْ اٰدَمَ حِيْنَ يُسْئَلُ يَغْضَبُ

অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহর নিকট চাওয়া ছেড়ে দিলেই তিনি রাগান্বিত হন, অথচ বনী আদমের নিকট চাওয়া হলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে।' আযরামী বলেন যে, রাহমানের অর্থ হলো যিনি সমুদয় সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণা বর্ষণকারী। আর রাহীমের অর্থ হলো যিনি মুমিনদের উপর দয়া বর্ষণকারী। যেমন কুরআন কারীমের নিম্নের দু'টি আয়াতের মধ্যে রয়েছেঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (২০ঃ ৫) ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (২৫ঃ ৫৮)

এখানে মহান আল্লাহ اِسْتَوٰى শব্দের সঙ্গে رَحْمٰن শব্দটির উল্লেখ করেছেন যাতে শব্দটি স্বীয় সাধারণ দয়া ও করুণার অর্থে জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু মুমিনদের বর্ণনার সঙ্গে رَحِيْم শব্দটির উল্লেখ করেছেন, যেমন বলেছেন وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا সুতরাং জানা গেল যে, رَحْمٰن -এর মধ্যে رَحِيْم -এর তুলনায় مُبَالَغَة অনেক গুণে বেশী আছে। কিন্তু হাদীসের একটি দু'আর মধ্যে يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا এ ভাবেও এসেছে। 'রাহমান' নামটি আল্লাহ তা'আলার জন্যেই নির্ধারিত। তিনি ছাড়া আর কারও এ নাম হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছেঃ 'আল্লাহকে ডাকো বা রাহমানকে ডাকো, যে নামেই চাও তাঁকে ডাকতে থাকো। তাঁর অনেক ভাল ভাল নাম রয়েছে।' অন্য একটি আয়াতে আছেঃ

وَ سْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ *

অর্থাৎ 'তোমার পূর্ববর্তী নবীগণকে জিজ্ঞেস কর যে, রাহমান ছাড়া তাদের কোন মা'বুদ ছিল কি যার তারা ইবাদত করতো?' (৪৩ঃ ৪৫) মুসাইলামা কায্যাব যখন নবুওয়াতের দাবী করে এবং নিজেকে 'রাহমানুল ইয়ামামা' নামে অভিহিত করে, আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত করেন এবং চরম মিথ্যাবাদী নামে সে সারা দেশে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। আজও তাকে মুসাইলামা কায্যাব বলা হয় এবং প্রত্যেক মিথ্যা দাবীদারকে তার সাথে তুলনা করা হয়। আজ প্রত্যেক পল্লীবাসী ও শহরবাসী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ সবাই তাকে বিলক্ষণ চেনে।

কেউ কেউ বলেন যে, রাহমানের চেয়ে রাহীমের মধ্যেই বেশী مُبَالَغَة রয়েছে। কেননা এ শব্দের সঙ্গে পূর্ব শব্দের تَاكِيْد করা হয়েছে, আর যার تَاكِيْد করা হয় তা অপেক্ষা تَاكِيْد ই বেশী জোরদার হয়ে থাকে। এর উত্তর এই যে, এখানে تَاكِيْد ই হয়নি, বরং এতো صِفَت এবং صِفَت -এর মধ্যে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এমন নাম নেয়া হয়েছে যে নামের মধ্যে তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং রাহমানকেই সর্বপ্রথম ওর বিশেষণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং এ নাম রাখাও অন্যের জন্যে নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেছেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে ডাক বা রাহমানকে ডাকো, যে নামেই চাও ডাকো, তাঁর জন্যে বেশ ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।'

মুসাইলামা কায্যাব এ জঘন্যতম আস্পর্ধা দেখালেও সে সমূলে ধ্বংস হয়েছিল এবং তার ভ্রষ্ট সঙ্গীদের ছাড়া এটা অন্যের উপর চালু হয়নি। 'রাহীম' বিশেষণটির সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকেও বিশেষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ * (৯ঃ ১২)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে (সঃ) رَحِيمٌ বলেছেন। এভাবেই তিনি স্বীয় কতগুলি নাম দ্বারা অন্যদেরকেও স্মরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * (৭৬ঃ ২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে سَمِيعٌ ও بَصِيرٌ বলেছেন। মোটকথা এই যে, আল্লাহর কতগুলো নাম এমন রয়েছে যেগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহার অন্য অর্থে অন্যের উপরও হতে পারে এবং কতগুলো নাম আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ব্যবহৃত হতেই পারে না। যেমন আল্লাহ, রাহমান, খালেক এবং রাজ্জাক ইত্যাদি। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা প্রথম নাম নিয়েছেন 'আল্লাহ', অতঃপর ওর বিশেষণ রূপে 'রাহমান' এনেছেন। কেননা 'রাহীমের' তুলনায় এর বিশেষত্ব ও প্রসিদ্ধি অনেক গুণে বেশী। আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট নাম নিয়েছেন, কেননা নিয়ম রয়েছে সর্বপ্রথম সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নাম নেয়া। তারপরে তিনি অপেক্ষাকৃত কম পর্যায়ের ও নিম্ন মানের এবং তারও পরে তদপেক্ষা কমটা নিয়েছেন। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রাহমানের মধ্যে যখন রাহীম অপেক্ষা مُبَالَغَةٌ বেশী আছে, তখন তাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি কেন? এর উত্তরে হযরত আতা' খুরাসানীর (রঃ) এ কথাটি পেশ করা যেতে পারে যে, যেহেতু কাফিরেরা অন্যের নামও রাহমান রাখতো সেই জন্যে রাহীম শব্দটিও আনা হয়েছে যাতে কোন সংশয়ের অবকাশ না থাকে। রাহমান ও রাহীম শুধু আল্লাহ তা'আলারই নাম। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) একথাটি নকল করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা-

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (১৭ঃ ১১০)

এই আয়াতটি অবতীর্ণ করার পূর্বে কুরাইশ কাফিরেরা রাহমানের সঙ্গে পরিচিতই ছিল না। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহপাক তাদের ধারণা খণ্ডন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির বছরেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেছিলেনঃ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখ।' কাফির কুরাইশরা তখন বলেছিল আমরা রাহমান ও রাহীমকে চিনি না। সহীহ বুখারীর মধ্যে এ বর্ণনাটি রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তারা বলেছিলঃ 'আমরা ইয়ামামার রাহমানকে চিনি, অন্য কাউকেও চিনি না।' এভাবে কুরআন পাকের অন্যত্র রয়েছেঃ

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَ مَا الرَّحْمٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُورًا *

অর্থাৎ 'যখন তাদেরকে বলা হয়-রাহমানের সামনে তোমরা সিজদাহ কর, তখন তারা আরও হিংস্র হয়ে উঠে এবং বলে-রাহমান কে যে আমরা তোমার কথা মতই তাকে সিজদা করবো?' (২৫ঃ ৬০) এ সবের সঠিক ভাব ও তাৎপর্য এই যে, এই দুষ্ট লোকগুলি অহঙ্কার ও শত্রুতার বশবর্তী হয়েই রাহমানকে অস্বীকার করতো, কিন্তু তারা যে রাহমানকে বুঝতো না বা তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল তা নয়। কেননা অজ্ঞতা যুগের প্রাচীন কবিতাগুলোর মধ্যে আল্লাহর এই রাহমান নামটি দেখতে পাওয়া যায়। ওগুলো অজ্ঞতা যুগের ঐসব জাহেলী কবিরই কবিতা।

হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ 'রাহমান নামটি অন্যের জন্যে নিষিদ্ধ। ওটা স্বয়ং আল্লাহর নাম। এ নামের উপর লোকের কোন অধিকার নেই।' হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) হাদীসটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক আয়াতে থামতেন এবং এভাবেই একটা দল বিসমিল্লাহির উপর আয়াত করে তাকে আলাদাভাবে পড়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ মিলিয়েও পড়েন। দুইটি জযম একত্রিত হওয়ায় মীমে যের দিয়ে থাকেন। জমহূরের এটাই অভিমত। কোন কোন আরব মীমকে যবর দিয়ে পড়েন। তাঁরা 'হামযার' যবরটি 'মীম'কে দিয়ে থাকেন। যেমন-

الٓمٓ * اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ইবনে আতিয়্যাহ বলেনঃ 'আমার জানা মতে যবরের কিরাআতটি কোন লোক থেকে বর্ণিত হয়নি।

১। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

সাতজন কারীই اَلْحَمْدُ -এর دَالْ কে পেশ দিয়ে পড়ে থাকেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কে مُبْتَدَا و خَبَر বা উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলে থাকেন। সুফইয়ান বিন উয়াইনা এবং রু'বাহ বিন আয্যাজের মতে 'দাল' যবরের সঙ্গে হবে এবং এখানে ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। ইবনে আবী ইবলাহ اَلْحَمْدُ -এর 'দাল' কে ও لِلّٰهِ -এর প্রথম 'লাম'

এদুটোকেই পেশ দিয়ে পড়ে থাকেন এবং এ লামটিকে প্রথমটির تَابِع করে থাকেন। যদিও আরবদের ভাষায় এর প্রমাণ বিদ্যমান, তথাপি এটা সংখ্যায় অতি নগণ্য। হযরত হাসান (রঃ) এবং হযরত যায়েদ ইবনে আলী (রঃ) এই দুই অক্ষরকে যের দিয়ে পড়ে থাকেন এবং 'দাল' কে 'লামের' تَابِع করেন।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহর জন্যে, তিনি ছাড়া আর কেউ এর যোগ্য নয়, সে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে কেউ হোক না কেন। কেননা, সমুদয় দান যা আমরা গণনা করতে পারি না এবং তার মালিক ছাড়া কারও সেই সংখ্যা জানা নেই, সবই তাঁর কাছ থেকেই আগত। তিনিই তাঁর আনুগত্যের সমুদয় মালমসলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা যেন তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে পারি সেজন্যে তিনি আমাদেরকে শারীরিক সমুদয় নিয়ামত দান করেছেন। অতঃপর ইহলৌকিক অসংখ্য নিয়ামত এবং জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আমাদের অধিকার ছাড়াই তিনি আমাদের নিকট না চাইতেই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সদা বিরাজমান অনুকম্পা এবং তাঁর প্রস্তুতকৃত পবিত্র সুখের স্থান, সেই অবিনশ্বর জান্নাত আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি তাও তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এসবের যিনি মালিক, প্রথম ও শেষ সমুদয় কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য। এটা একটা প্রশংসামূলক বাক্য। আল্লাহ পাক নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গেই তিনি যেন বলে দিলেনঃ তোমরা বল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।' কেউ কেউ বলেন যে, 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম ও বড় বড় গুণাবলীর দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা হয়। আর اَلشُّكْرُ لِلّٰهِ বলে তাঁর দান ও অনুগ্রহের জন্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু একথাটি সঠিক নয়। কেননা আরবী ভাষায় যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাঁরা এ বিষয়ে এক মত যে, شُكْر -এর স্থলে حَمْد ও حَمْد -এর স্থলে- شُكْر ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জা'ফর সাদিক এবং ইবনে আতা' প্রমুখ সুফীগণ এটাই বলে থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কথা হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, কুরতুবী (রঃ) ইবনে জারীরের (রঃ) কথাকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ করার জন্যে এ দলীল বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ شُكْرًا বলে তবে ওটাও নির্ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লামা ইবনে জারীরের কথায় পূর্ণ সমালোচনা ও পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, প্রশংসিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গুণাবলীর জন্য বা পরোক্ষ গুণাবলীর জন্য মুখে তাঁর প্রশংসা করার নাম হামদ। আর শুধুমাত্র পরোক্ষ গুণাবলীর জন্যে তাঁর প্রশংসা

করার নাম শুকর এবং তা অন্তঃকরণ, জিহ্বা এবং কাজের দ্বারাও করা হয়। আরব কবিদের কবিতাও এর সাক্ষ্য ও দলীলরূপে পেশ করা যেতে পারে। তবে حَمْد শব্দটি عَام কি شُكْر শব্দটি عَام এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। সঠিক ও অভ্রান্ত কথা এই যে, ওদের মধ্যে عُمُوْم ও خُصُوْص-এর সম্পর্ক রয়েছে। এক দিক দিয়ে حَمْد শব্দটি شُكْر শব্দ হতে عَام, কেননা এটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় গুণের সাথেই সমভাবে সম্পর্কিত ও সংযুক্ত। পবিত্রতা ও দান উভয়ের জন্যেই حَمِدْتُهٗ বলা চলে। আবার শুধু জিহ্বা দিয়ে তা আদায় করা হয় বলে এটা خَاص এবং شُكْر শব্দটি হচ্ছে عَام , কেননা ওটা কথা কাজ ও অন্তঃকরণ –এ তিনটার উপরেই সমানভাবে বলা হয়। আবার পরোক্ষ গুণের উপর বলা হয় বলে شُكْر শব্দটি خَاص পবিত্রতার উপর شَكَرْتُهٗ বলা হয় না বরং شَكَرْتُهٗ عَلٰى كَرَمِهٖ وَ اِحْسَانِهٖ اِلَىَّ একথা বলা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।

আবূ নসর ইসমাইল বিন হাম্মাদ জওহারী (রঃ) বলেন যে, حَمْد অর্থাৎ প্রশংসা শব্দটি ذَم অর্থাৎ তিরস্কারের উল্টা। বলা হয়-

حَمِدْتُ الرَّجُلَ اَحْمَدُهٗ حَمْدًا وَّ مَحْمَدَةً فَهُوَ حَمِيْدٌ وَّ مَحْمُوْدٌ

تَحْمِيْد -এর মধ্যে حَمْد -এর চেয়েও বেশী مُبَالَغَة বা আধিক্য রয়েছে। حَمْد শব্দটি شُكْر শব্দ হতে عَام , দাতার দানের উপর তার প্রশংসা করাকে আরবী ভাষায় شُكْر বলা হয়। شَكَرْتُهٗ এবং شَكَرْتُ لَهٗ এ দু'ভাবেই প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু লামের সঙ্গে বলাই বেশী সমীচীন ও শোভনীয়। مَدْح শব্দটি حَمْد হতেও বেশী عَام, কেননা জীবিত ও মৃত এমনকি জড় পদার্থের উপরেও مَدْح শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অনুগ্রহের পূর্বে ও পরে, প্রত্যক্ষ গুণাবলীর উপর ও পরোক্ষ গুণাবলীর উপর তার ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে বলেই ওর عَام হওয়া সাব্যস্ত হলো। অবশ্য এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

## حَمْدٌ শব্দের তাফসীর ও পূর্বযুগীয় গুরুজনদের অভিমত

হযরত উমার (রাঃ) একবার বলেছিলেনঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ ও لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ কে আমরা জানি, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর ভাবার্থ কি?' হযরত আলী (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা এ কথাটিকে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা বললে আল্লাহকে খুবই ভাল লাগে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'এটা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। সুতরাং এই কথাটির মধ্যে শুকর ছাড়া আল্লাহর দানসমূহ, হেদায়াত, অনুগ্রহ প্রভৃতির স্বীকারোক্তি রয়েছে। হযরত কা'ব আহ্বারের (রাঃ) অভিমত এই যে, একথাটি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা। হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ পাকের চাদর। একটা হাদীসে একথাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বললেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়ে যাবে। এখন তিনি তোমাদের উপর বরকত দান করবেন।'

হযরত আসওয়াদ বিন সারী' (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আরয করেনঃ 'আমি মহান আল্লাহর প্রশংসার কয়েকটি কবিতা রচনা করেছি। অনুমতি পেলে শুনিয়ে দেবো।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করেন।' মুসনাদ-ই-আহমাদ, সুনান-ই নাসায়ী, জামে'উত তিরমিযী এবং সুনান-ই-ইবনে মাজাহ্য় হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেছেনঃ 'সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং সর্বোত্তম প্রার্থনা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে পরিভাষা অনুযায়ী 'হাসান গারীব' বলে থাকেন।

সুনান-ই-ইবনে মাজাহ্য় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কিছু দান করার পর যদি সে তার জন্যে 'আলহামদুল্লিাহ' পাঠ করে তবে তার প্রদত্ত বস্তুই গৃহীত বস্তু হতে উত্তম হবে।' আল্লাহর রাসূল (সঃ) আরও বলেনঃ 'যদি আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে কোন লোককে দুনিয়া দান করেন এবং সে যদি তার জন্য 'আলহামদুল্লিাহ' পাঠ করে তবে এ কথাটি সমস্ত দুনিয়া জাহান হতে উত্তম হবে।' কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ

এর ভাবার্থ এই যে, আল হামদুলিল্লাহ' বলার তাওফীক লাভ যত বড় নিয়ামত, সারা দুনিয়া জাহান দান করাও ততো বড় নিয়ামত নয়। কেননা দুনিয়া তো নশ্বর ও ধ্বংসশীল, কিন্তু একথার পুণ্য অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। যেমন পবিত্র কুরআনের মধ্যে রয়েছেঃ

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا -

অর্থাৎ "ধনদৌলত ও সন্তান সন্ততি দুনিয়ার সৌন্দর্য মাত্র, কিন্তু সৎকার্যাবলী চিরস্থায়ী পুণ্য বিশিষ্ট এবং উত্তম আশাবাহক।' (১৮ঃ ৪৬) সুনান-ই-ইবনে

মাজাহ্র মধ্যে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একদা এক ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করলোঃ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِى لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ قَدِيْمِ سُلْطَانِــكَ

এতে ফেরেশতাগণ পুণ্য লিখার ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা আল্লাহ পাকের নিকট আরয করলেনঃ আপনার এক বান্দা এমন একটা কালেমা পাঠ করেছে যার পুণ্য আমরা কি লিখবো বুঝতে পারছি না।' বিশ্ব প্রভু সব কিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলেনঃ 'সে কী কথা বলেছে?' তাঁরা বললেন যে, সে এই কালেমা বলেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ 'সে যা বলেছে তোমরা হুবহু তাই লিখে নাও। আমি তার সাথে সাক্ষাতের সময়ে নিজেই তার যোগ্য প্রতিদান দেবো।'

কুরতুবী (রঃ) আলেমদের একটি দল হতে নকল করেছেন যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হতেও 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' উত্তম। কেননা, এর মধ্যে অহ্দানিয়্যাত বা একত্ববাদ ও প্রশংসা দুটোই রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আলেমগণের ধারণা এই যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'ই উত্তম। কেননা ঈমান ও কুফরের মধ্যে এটাই পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয়। আর এটা বলাবার জন্যই কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। আরও একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা কিছু বলেছি তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকালাহু।"

হযরত জাবিরের (রাঃ) একটি মারফূ' হাদীস ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বোত্তম যিক্র হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং সর্বোত্তম প্রার্থনা হলো 'আল হামদু লিল্লাহ'। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

'আল হামদু'র আলিফ লাম 'ইসতিগরাকের' জন্যে ব্যবহৃত অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের 'হামদ' বা স্তুতিবাদ একমাত্র আল্লাহর জন্যেই সাব্যস্ত। যেমন হাদীসে রয়েছেঃ 'হে আল্লাহ! সমুদয় প্রশংসা তোমারই জন্যে, সারা দেশ তোমারই, তোমারই হাতে সামগ্রিক মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং সমস্ত কিছু তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।'

সর্বময় কর্তাকে 'রব' বলা হয় এবং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং সঠিকভাবে সজ্জিত ও সংশোধনকারী। এসব অর্থ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার জন্যে এ পবিত্র নামটিই শোভনীয় হয়েছে। 'রব' শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। তবে সম্বন্ধপদ রূপে ব্যবহৃত হলে সে অন্য কথা।

যেমন رَبُّ الدَّارِ বা গৃহস্বামী ইত্যাদি। কারো কারো মতে এটাই 'ইসমে 'আযম।' عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ শব্দের বহু বচন। আল্লাহ ছাড়া সমুদয় সৃষ্টবস্তুকে عَالَمٌ বলা হয়। عَالَمٌ শব্দটিও বহু বচন এবং এ শব্দের এক বচনই হয় না। আকাশের সৃষ্টজীব এবং জল ও স্থলের সৃষ্টজীবকেও عَوَالِم অর্থাৎ কয়েকটি عَالَمٌ বলা হয়। অনুরূপভাবে এক একটি যুগ-কাল ও এক একটি সময়কেও عَالَمٌ বলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা সমুদয় সৃষ্টজীবকেই বুঝায়, নভোমণ্ডলেরই হোক বা ভূমণ্ডলের হোক অথবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী জায়গারই হোক এবং তা আমাদের জানাই হোক বা অজানাই হোক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেই এর ভাবার্থরূপে দানব ও মানব বর্ণিত হয়েছে। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং ইবনে জুরাইজ (রঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে কিন্তু সনদ হিসেবে এটা নির্ভরযোগ্য নয়। একথার দলীলরূপে কুরআন পাকের এ আয়াতটিও বর্ণনা করা হয়েছেঃ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا অর্থাৎ 'যেন তিনি আলামীনের জন্যে অর্থাৎ দানব ও মানবের জন্যে ভয় প্রদর্শক হয়ে যান।' ফার্রা (রঃ) ও আবূ উবায়দার (রঃ) মতে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন প্রাণীকে 'আলাম বলা হয়। দানব, মানব ও শয়তানকে 'আলাম বলা হবে। জন্তুকে 'আলাম বলা হবে না। হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) এবং হযরত আবূ মাহীসেন (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই 'আলাম বলা হয়। হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক শ্রেণীকে একটা 'আলাম বলা হয়।

ইবনে মারওয়ান বিন হাকাম উরফে জা'দ, যাঁর উপাধি ছিল হিমার, যিনি বানূ উমাইয়াদের আমলে একজন খলীফা ছিলেন, তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা সতেরো হাজার 'আলম সৃষ্টি করেছেন। আকাশে অবস্থিত সবগুলো একটা 'আলম, যমীনে অবস্থিত সবগুলো একটা 'আলম এবং বাকীগুলো আল্লাহ তা'আলাই জানেন। মানুষের নিকট ওগুলো অজ্ঞাত।' আবুল 'আলিয়া (রঃ) বলেন যে, সমস্ত মানুষ একটা 'আলম, সমস্ত জ্বিন একটা 'আলম, এবং এ দুটো ছাড়া আরো আঠারো হাজার বা চৌদ্দ হাজার 'আলম রয়েছে। ফেরেশতাগণ যমীনের উপর আছেন। যমীনের চারটি প্রান্ত রয়েছে এবং প্রত্যেক প্রান্তে সাড়ে তিন হাজার 'আলম রয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি সম্পূর্ণ গারীব বা অপরিচিত। এ ধরনের কথা যে পর্যন্ত না সহীহ দলীল ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়,

আদৌ মানবার যোগ্য নয়। 'রাব্বুল আলামীন'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হুমাইরী (রঃ) বলেন যে, বিশ্বজাহানে এক হাজার জাতি রয়েছে। ছয়শো আছে জলে, আর চারশো আছে স্থলে। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রঃ) হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। একটা দুর্বল বর্ণনায় আছে যে, হযরত উমার ফারূকের (রাঃ) খিলাফত কালে এক বছর ফড়িং দেখা যায়নি। এমনকি অনুসন্ধান করেও এর কোন পাত্তা মিলেনি। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং সিরিয়া ও ইরাকে অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলেন এজন্য যে, কোনও স্থানে ফড়িং দেখা যায় কিনা। ইয়ামন যাত্রী অল্প বিস্তর ফড়িং ধরে এনে আমীরুল মুমেনীনের সামনে হাযির করলেন। তিনি তা দেখে তাকবীর ধ্বনি করলেন এবং বললেন 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ 'আল্লাহ তা'আলা এক হাজার জাতি সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্য ছয়শো পানিতে, চারশো স্থলে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে জাতি ধ্বংস হবে তা হবে ফড়িং। অতঃপর ক্রমাগত সব জাতিই একে একে ধ্বংস হয়ে যাবে যেমনভাবে তসবীহের সূতা কেটে গেলে দানাগুলি ক্রমাগত ঝরে পড়ে। কিন্তু এ হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন ঈসা হিলালী দুর্বল। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে।

ওয়াহিব বিন মামবাহ্ বলেন যে, আঠারো হাজার 'আলামের মধ্যে সারা দুনিয়া একটি 'আলম। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, চল্লিশ হাজার 'আলামের মধ্যে সারা দুনিয়া একটা 'আলম। যায্যাজ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহজগত ও পরজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই 'আলম। কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, এ মতটিই সত্য। কেননা এর মধ্যে সমস্ত 'আলমই জড়িত রয়েছে। যেমন ফির'আউনের 'বিশ্বপ্রভু কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ 'আসমান, যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যে স্থলে যা কিছু আছে সবারই তিনি প্রভু।'

عَالَم শব্দটি عَلَامَتْ শব্দ হতে নেওয়া হয়েছে। কেননা, 'আলম সৃষ্ট বস্তু তার সৃষ্টিকারীর অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে এবং তাঁর একত্ববাদের চিহ্নরূপে কাজ করে থাকে। যেমন কবি ইবনে মু'তায এর কথাঃ

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يَعْصِى الْاِلٰهَ * اَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ
وَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَهٗ اٰيَةٌ * تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহর অবাধ্য হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে, এবং এটাও বিস্ময়জনক যে, কিভাবে অস্বীকারকারী তাঁকে অস্বীকার করছে! অথচ প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই এমন স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে যা প্রকাশ্যভাবে তাঁর একত্ববাদের পরিচয় বহন করছে।'

২। যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। ٢- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

এর তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির আর কোন প্রয়োজন নেই। কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর বিশেষণের পর اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নামক বিশেষণটি ভয় প্রদর্শনের পর আশা ভরসার উদ্রেক কল্পে আনয়ন করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ

نَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ * وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ *

অর্থাৎ 'আমার বান্দাগণকে সংবাদ দাও যে, আমি ক্ষমতাশালী ও দয়ালু এবং আমার শাস্তিও বেদনাদায়ক।' (১৫ঃ ৪৯-৫০) তিনি আরও বলেছেনঃ 'তোমার প্রভু সত্বরই শাস্তি প্রদানকারী এবং তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীলও বটে।'

'রব' শব্দটির মধ্যে ভয় প্রদর্শন রয়েছে এবং 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ দুইটির মধ্যে আশা ভরসা রয়েছে। সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যদি ঈমানদারগণ আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হতো তবে তাদের অন্তর হতে বেহেশ্তের নন্দন কাননের লোভ লালসা সরে যেতো এবং কাফিরেরা যদি আল্লাহ তা'আলার দান ও দয়া দাক্ষিণ্য সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান রাখতো তবে তারা কখনও নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতো না।'

৩। যিনি প্রতিফল দিবসের প্রভু। ٣- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥

কারীদের কেউ কেউ একে مَالِكِ পড়েছেন এবং অন্যান্য সবাই مَلِكِ পড়েছেন। এই দুই পঠনই বিশুদ্ধ, মুতাওয়াতির এবং অনুমোদিত সাতটি কিরাআতের অন্তর্গত। مَالِكِ এর لَام কে যেরের সঙ্গে জযমের সঙ্গে এবং مَلِيْكِ ও مَلْكِي ও পড়া হয়েছে। প্রথম পঠন দুইটি অর্থ হিসেবে অগ্রগণ্য এবং দুটোই শুদ্ধতর ও উত্তম। ইমাম যামাখ্শারী (রঃ) مَلِكِ কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, মক্কা ও মদীনাবাসীদের কিরআত এটাই। তাছাড়া কুরআন মাজীদের মধ্যে لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ এবং قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হতেও নকল করা হয়েছে যে, তিনি فِعْل, فَاعِل এবং مَفْعُوْل -এর উপর ভিত্তি করে مَلَكَ পড়েছেন। কিন্তু এটা শাজ-বিরল এবং অত্যন্ত গারীব। আবূ বকর বিন আবি দাউদ (রঃ) এতে আরও একটি গারীব বর্ণনা পেশ করেছেন, তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর তিনজন খলীফা (রাঃ), হযরত

মু'আবিয়া (রাঃ) এবং তাঁর ছেলে مَالِكِ পড়তেন। ইবনে শিহাব বলেন যে, সর্বপ্রথম মারওয়ান مُلْكِ পড়েছিলেন। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, এ কিরআতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মারওয়ানের সম্যক অবগতি ছিল, যা স্বয়ং বর্ণনাকারী শিহাবের ছিল না। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনে মিরদুওয়াই কয়েকটা সনদের সঙ্গে এটা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) مَالِكِ পড়তেন। مَالِكِ শব্দটি مِلْكٌ শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। যেমন কুরআন পাকে রয়েছেঃ

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ *

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই পৃথিবী ও তার উপরিভাগের সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর মালিক আমিই এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (১৯ঃ ৪০) তিনি আরও বলেছেনঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ *

অর্থাৎ "তুমি বল—আমি মানুষের প্রভুর নিকট ও মানুষের মালিকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। مَلِكِ শব্দটি مُلْكٌ শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থাৎ 'আজ রাজ্য কার? শুধুমাত্র মহাশক্তিশালী এক আল্লাহরই।' (৪০ঃ ১৬) তিনি আরও বলেছেনঃ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ অর্থাৎ 'তাঁর কথাই সত্য এবং সমস্ত রাজ্য তাঁরই? আর এক জায়গায় বলেছেনঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا *

অর্থাৎ 'আজকে আল্লাহই রাজ্যের অধিকারী এবং আজকের দিন কাফিরদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন দিন।' (২৫ঃ ২৬) মহান আল্লাহর এ উক্তি অনুসারের কিয়ামতের দিনের সঙ্গে তাঁর অধিকারকে নির্দিষ্ট করার অর্থ এই নয় যে, কিয়ামত ছাড়া অন্যান্য জিনিসের অধিকারী হতে তিনি অস্বীকার করছেন, কেননা ইতিপূর্বে তিনি স্বীয় বিশেষণ 'রাব্বুল আলামীন' রূপে বর্ণনা করেছেন এবং ওর মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই জড়িত রয়েছে। কিয়ামতের দিনের সঙ্গে অধিকারকে নির্দিষ্টকরণের কারণ এই যে, সেই দিন তো আর কেউ সার্বিক অধিকারের দাবীদারই হবে না। বরং সেই প্রকৃত অধিকারী আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ মুখ পর্যন্ত খুলতে পারবে না। এমনকি টুঁ শব্দটিও করতে পারবে না। যেমন তিনি বলেছেনঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا *

অর্থাৎ 'প্রাণী ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে কথাও ঠিক ঠিক বলবে।' (৭৮ঃ ৩৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا-

অর্থাৎ 'আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের সামনে সমস্ত শব্দ নত হয়ে যাবে। এবং ক্ষীণকণ্ঠের গুন্ গুন্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না।' (২০ঃ ১০৮) তিনি আরও বলেছেনঃ

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ سَعِيْدٌ-

অর্থাৎ 'কিয়ামত আসবে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে বা মুখ খুলতে পারবে না, তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান।' (১১ঃ ১০৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'সেদিন তাঁর রাজত্বে তিনি ছাড়া আর কেউই থাকবে না, যেমন দুনিয়ার বুকে রূপক অর্থে ছিল।' يَوْمِ الدِّيْنِ -এর ভাবার্থ হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জীবের হিসাব দেয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের ন্যায্য ও চুলচেরা প্রতিদান দেয়া হবে। হ্যাঁ, তবে যদি মহান আল্লাহ কোন কাজ নিজ গুণে মার্জনা করেন তবে তা হবে তাঁর ইচ্ছা ভিত্তিক কাজ। সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন (রঃ) এবং পূর্ব যুগীয় সৎ ব্যক্তিগণ হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ব্যক্তি হতে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে। আল্লাহ কিয়ামত ঘটাতে সক্ষম। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ কথাটাকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এ দুটো কথার মধ্যে কোন বিরোধ নাই, প্রত্যেক কথার কথক অপরের কথার সত্যতা প্রমাণ করছে। তবে প্রথম কথাটি ভাবার্থের জন্যে বেশী প্রামাণ্য। যেমন আল্লাহ পাকের ঘোষণা রয়েছেঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ نِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا *

এবং দ্বিতীয় কথাটি নিম্নের এ আয়াতের অনুরূপঃ

وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ 'যেদিন তিনি বলবেন 'হও' তখনই হয়ে যাবে।' আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। কেননা মহান আল্লাহই সব কিছুরই প্রকৃত মালিক। যেমন তিনি বলেছেনঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইয়রা (রাঃ) হতে এই মারফূ' হাদীসটি বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তির নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত জঘন্য, ও নিকৃষ্ট যাকে শাহান শাহ বা রাজাধিরাজ বলতে হয়। কারণ সব কিছুরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।' উক্ত সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে এসেছে যে, আল্লাহ পাক সেদিন সমগ্র যমীনকে স্বীয় মুষ্ঠির মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং আকাশ তাঁর দক্ষিণ হস্তে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে জড়িয়ে থাকবে, অতঃপর তিনি বলবেনঃ 'আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ, যমীনের সেই প্রতাপশালী বাদশাহরা কোথায় গেল? কোথায় রয়েছে সেই মদমত্ত অহংকারীগণ?' কুরআন কারীমে আরও রয়েছেঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔

অর্থাৎ 'আজ রাজত্ব কার? শুধুমাত্র মহাপরাক্রান্ত এক আল্লাহরই'। অন্যকে তাই শুধু রূপক অর্থে মালিক বলা হয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তালুতকে তোমাদের জন্যে মালিক বা বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন।' (২ঃ ২৪৭) এখানে তালুতকে মালিক বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكٌ এই শব্দও এসেছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে مُلُوْك শব্দ এসেছে এবং কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে আছেঃ

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا۔

অর্থাৎ 'তিনি তোমাদের মধ্যে নবী করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন।' (৫ঃ ২১) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীসে আছেঃ مَثَلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ। অর্থাৎ 'সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহদের ন্যায়।' دِيْن শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদান, প্রতিফল এবং হিসাব নিকাশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের মধ্যে বলেছেনঃ

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ

অর্থাৎ 'সেদিন আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।' (২৪ঃ ২৫) পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় আছেঃ اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ। অর্থাৎ 'আমাদেরকে কি প্রতিদান দেয়া হবে?' হাদীসে আছেঃ পণ্ডিত সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের কাছে প্রতিদান

নেয় এবং এমন কার্যাবলী সম্পাদন করে যা অবধারিত মৃত্যুর পরে কাজে লাগে।' অর্থাৎ নিজের আত্মার কাছে নিজেই হিসাব নিকাশ নিয়ে থাকে। যেমন হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের হিসাব নিকাশ গৃহীত হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর এবং তোমাদের কার্যাবলী দাঁড়ি পাল্লায় ওজন হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেরাই ওজন কর এবং তোমরা আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হওয়ার পূর্বে সেই বড় উপস্থিতির জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেদিন তোমাদের কোন কাজ গোপন থাকবে না।' যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

অর্থাৎ 'যেদিন তোমাদেরকে হাযির করা হবে সেদিন তোমাদের কোন কথা আল্লাহর নিকট গোপন থাকবে না।' (৬৯ঃ ১৮)

---

| | |
|---|---|
| **৪। আমরা আপনারই ইবাদত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি।** | ٤- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ |

---

সাতজন কারী এবং জমহূর একে اِيَّاكَ (ঈয়্যাকা) পড়েছেন। আমর বিন সাঈদ তাশদীদ ছাড়া একে হালকা করে اِيَاكَ (ইয়্যাকা) পড়েছেন। কিন্তু এ কিরাআত বিরল ও পরিত্যাজ্য। কেননা اِيَّا ইয়্যা-এর অর্থ হচ্ছে সূর্যের আলো। আবার কেউ কেউ اَيَّاكَ (আয়্যাকা) আবার কেউ কেউ هَيَّاكَ (হাইয়্যাকা) ও পড়েছেন। আরব কবিদের কবিতায়ও هَيَّاكَ (হাইয়্যাকা) আছে। যেমন-

فَهَيَّاكَ وَ الْاَمْرُ الَّذِىْ اِنْ تَدَاحَبَتْ * مَوَارِدُهٗ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهٗ

ইয়াহইয়া বিন অস্‌সাব ও আ'মাশ ছাড়া সকল কারীর কাছেই نَسْتَعِيْنُ -এর পঠন নূনের যবরের সঙ্গে। কিন্তু এঁরা দু'জন প্রথম নূনটিকে যের দিয়ে পড়ে থাকেন। বানূ আসাদ, রাবীআ' এবং বানূ তামীম গোত্রের লোকেরাও এরকমই পড়ে থাকেন। 'ইবাদত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সার্বিক অপমান ও নীচতা। 'তারীকে মোয়াব্বাদ' সাধারণ ঐ পথকে বলে যা সবচেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ রকমই بَعِيْرٌ مُعَبَّدٌ ঐ উটকে বলা হয় যা হীনতা ও দুর্বলতার চরম সীমায় পদার্পণ করে। শরীয়তের পরিভাষায় প্রেম, বিনয়, নম্রতা এবং ভীতির সমষ্টির নাম 'ইবাদত'। اِيَّاكَ শব্দটি مَفْعُوْلٌ, একে পূর্বে আনা হয়েছে, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যাতে তার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং সাহায্য প্রার্থনার জন্যে যেন একমাত্র আল্লাহই বিশিষ্ট হয়ে যান। তা হলে বাক্যটির অর্থ

এ দাঁড়ায়ঃ 'আমরা আপনার ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না এবং আপনার ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর করি না।' আর এটাই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস। সালাফে সালেহীন বা পূর্বযুগীয় প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন যে, সম্পূর্ণ কুরআনের গোপন তথ্য রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে এবং এ পূর্ণ সূরাটির গোপন তথ্য রয়েছে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ নামক এই আয়াতটির মধ্যে। আয়াতটির প্রথমাংশে রয়েছে শিরকের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে স্বীয় ক্ষমতার উপর অনাস্থা ও মহা শক্তিশালী আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা। এ সম্পর্কীয় আরও বহু আয়াত কুরআন পাকে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেনঃ

فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ *

অর্থাৎ 'তাঁরই ইবাদ কর ও তাঁরই উপর নির্ভর কর এবং (জেনে রেখ যে,) তোমরা যা করছো তা হতে তোমাদের প্রভু উদাসীন নন।' (১১ঃ ১২) তিনি আরও বলেছেনঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ 'বলে দাও–তিনি রাহমান, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর আমরা ভরসা করেছি।' (৬৭ঃ ২৯) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا *

অর্থাৎ 'পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু তিনিই, তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, সুতরাং তাঁকেই একমাত্র কার্যসম্পাদনকারীরূপে গ্রহণ কর।' (৭৩ঃ ৯)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এই আয়াত-ই-কারীমের মধ্যেও এই বিষয়টিই রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে সম্মুখস্থ কাউকে লক্ষ্য করে সম্বোধন ছিল না। কিন্তু এ আয়াতটিতে আল্লাহ পাককে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এতে বেশ সুন্দর পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করলো তখন সে যেন মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহর সম্মুখে হাযির হয়ে গেল। এখন সে মালিককে সম্বোধন করে স্বীয় দীনতা, হীনতা ও দারিদ্রতা প্রকাশ করলো এবং বলতে লাগলোঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তো আপনার হীন ও দুর্বল দাস মাত্র এবং আমরা সর্বকার্যে, সর্বাবস্থা ও সাধনায় একমাত্র আপনারই মুখাপেক্ষী। এ আয়াতে একথারও প্রমাণ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী সমস্ত বাক্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উত্তম গুণাবলীর

জন্যে নিজের প্রশংসা নিজেই করেছিলেন এবং বান্দাদেরকে ঐ শব্দগুলি দিয়েই তাঁর প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যেই যে ব্যক্তি এ সূরাটি জানা সত্ত্বেও নামাযে তা পাঠ করে না তার নামায হয় না। যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত উবাদাহ্ বিন সাবিত হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তির নামাযকে নামায বলা যায় না যে নামাযের মধ্যে সূরা-ই-ফাতিহা পাঠ করে না।' সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেনঃ আমি নামাযকে আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি। অর্ধেক অংশ আমার ও বাকী অর্ধেক অংশ আমার বান্দার। বান্দা যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে। বান্দা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে, তখন আল্লাহ্ বলেনঃ "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো।" বান্দা যখন বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন তিনি বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার গুণগান করলো।' যখন সে বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন তিনি বলেনঃ 'আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলো।' সে যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেকার কথা এবং আমার বান্দার জন্যে তাই রয়েছে যা সে চাইবে।' অতঃপর বান্দা যখন শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন 'এ সব তো আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দা যা চাইবে তার জন্যে তাই রয়েছে।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর অর্থ হচ্ছেঃ 'হে আমার প্রভূ! আমরা বিশেষভাবে একত্ববাদে বিশ্বাসী, আমরা ভয় করি এবং মহান সত্তায় সকল সময়ে আশা রাখি। আপনি ছাড়া আর কারও আমরা ইবাদতও করি না, কাউকে ভয়ও করি না এবং কারও উপর আশাও রাখি না।' আর وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এর তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্য বরণ করি ও আমাদের সকল কার্যে একমাত্র আপনারই কাছে সহায়তা প্রার্থনা করি।

কাতাদাহ্ (রঃ) বলেনঃ 'এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন –'তোমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা কর এবং তোমাদের সকল কার্যে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।' اِيَّاكَ نَعْبُدُ কে পূর্বে আনার কারণ এই যে, ইবাদতই হচ্ছে মূল ঈপ্সিত বিষয়, আর সাহায্য চাওয়া ইবাদতেরই মাধ্যম ও ব্যবস্থা। আর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পূর্বে বর্ণনা করা এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরে বর্ণনা করা। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এখানে বহুবচন অর্থাৎ 'আমরা' ব্যবহার করার কি প্রয়োজন? যদি এটা বহুবচনের জন্যে হয় তবে উক্তিকারী তো একজনই। আর যদি সম্মান ও মর্যাদার জন্যে হয় তবে এ স্থানে এটা খুবই অশোভনীয়। কেননা, এখানে তো দীনতা ও বিনয় প্রকাশ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, একজন বান্দা যেন সমস্ত বান্দার পক্ষ থেকে সংবাদ দিচ্ছে, বিশেষ করে যখন সে জামা'আতের সঙ্গে নামাযে দাঁড়ায় ও ইমাম নির্বাচিত হয়। সুতরাং সে যেন নিজেরও তার সমস্ত মুমিন ভাই-এর পক্ষ থেকে নতশিরে স্বীকার করছে যে, তাঁরা সবাই তাঁর দীনহীন বান্দা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে, আর সে তাদের পক্ষ থেকে মঙ্গলের নিমিত্তে আগে বেড়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে এটা সম্মানের জন্যে। বান্দা যখন ইবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করে তখন যেন তাকেই বলা হয়ঃ "তুমি ভদ্র, তোমার সম্মান আমার দরবারে খুবই বেশী। সুতরাং তুমি إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলে নিজেকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ কর। কিন্তু যখন ইবাদত হতে আলাদা হবে তখন 'আমরা বলবে না, যদিও হাজার হাজার বা লাখ লাখ লোকের মধ্যে অবস্থান কর। কেননা, সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী ও তাঁর দরবারে নিঃস্ব ভিক্ষুক।' কারও কারও মতে إِيَّاكَ نَعْبُدُ -এর মধ্যে যতটা বিনয় ও নম্রতার ভাব রয়েছে إِيَّاكَ عَبَدْنَا -এর মধ্যে ততটা নেই। কেননা এর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইবাদতের উপযুক্ততা পাওয়া যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ও যথোপযুক্ত ইবাদত করতে কোন বান্দা কোন ক্রমেই সক্ষম নয়। কোন কবি বলেছেনঃ

لَا تَدْعُنِى إِلَّا بِيَا عَبْدَهَا * فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِى

অর্থাৎ "আমাকে তাঁর দাস বলেই ডাকো, কেননা এটাই আমার সর্বোত্তম নাম।" যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় দানের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই শুধু তিনি তাঁর রাসূলের (সঃ) নাম عَبْد বা দাস নিয়েছেন। বড় বড় নিয়ামত যেমন কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা, নামাযে দাঁড়ানো, মিরাজ করানো ইত্যাদি। যেমন তিনি বলেছেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ (১৮ঃ ১)

আরও বলেছেনঃ (৭২ঃ ১৯) وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ

অন্যত্র বলেছেনঃ (১৭ঃ ১) سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

সঙ্গে সঙ্গে কুরআন মাজীদের মধ্যে এ শিক্ষা দিয়েছেনঃ 'হে নবী (সঃ)! বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাসের ফলে যখন তোমার মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন তুমি আমার ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যাও।' তাই নির্দেশ হচ্ছেঃ

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ* وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ *

অর্থাৎ 'আমি জানি যে, শত্রুদের কথা তোমার মনে কষ্ট দিচ্ছে, সুতরাং সে সময় তুমি স্বীয় প্রভুর প্রশংসাকীর্তণ কর এবং সিজদাহ কর। আর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদতে লেগে থাক।' (১৫ঃ ৯৭-৯৯)

ইমাম রাযী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে কোন কোন লোক হতে নকল করেছেন যে, উবুদিয়তের মান রিসালতের মান হতে উত্তম। কেননা, ইবাদতের সম্পর্ক সৃষ্ট বান্দা হতে সৃষ্টিকর্তার দিকে হয়ে থাকে, আর রিসালাতের সম্পর্ক হয় সৃষ্টিকর্তা থেকে সৃষ্টির দিকে এবং এ দলীলের দ্বারাও যে, বান্দার সমস্ত সংশোধনমূলক কার্যের জিম্মাদার হন স্বয়ং আল্লাহ, আর রাসূল (সঃ) তাঁর উম্মতের সৎ কার্যাবলীর অভিভাবক হয়ে থাকেন। কিন্তু এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল এবং এর দুটো দলীলই দুর্বল ও ভিত্তিহীন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী না একে দুর্বল বললেন আর না একে পরিত্যাগ করলেন না এর বিরোধিতা করলেন।

কোন কোন সুফীর মত এই যে, ইবাদত করা হয় সাধারণতঃ পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে অথবা শাস্তি প্রতিরোধ করার মানসে। তিনি বলেন এটা কোন উপকারী কাজ নয়। কেননা, তখন উদ্দেশ্য থাকে শুধু স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির। ইবাদতের সবচেয়ে উত্তম পন্থা এই যে, মানুষ সেই মহান সত্তার ইবাদত করবে যিনি সমুদয় গুণে গুণান্বিত, ইবাদত করবে শুধু তাঁর সত্তার জন্যে এবং উদ্দেশ্য অন্য কিছু আর থাকবে না। এজন্যেই নামাযের নিয়্যাত হয় শুধু আল্লাহর জন্যে নামায পড়ার। যদি ওটা পুণ্যলাভ ও শাস্তি হতে বাঁচার জন্যে হয় তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। অন্য দল এটা খণ্ডন করে থাকেন এবং বলে থাকেন যে, পুণ্যের আশায় ও শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত করলেও ওটা একমাত্র আল্লাহর জন্যে হওয়াতে কোন অসুবিধে নেই। এর দলীল এই যে,একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলোঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনার মত পড়তে জানি না এবং মু'আযের (রাঃ) মতও নয়। আমি তো শুধু আল্লাহর নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি কামনা করি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ 'আমরাও তারই কাছাকাছি (উদ্দেশ্যে নামায) পড়ে থাকি।'

| ৫। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। | ٥- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ٤ |
|---|---|

আলোচ্য শব্দটি জমহূর صِرَاط পড়েছেন। কেউ কেউ سِرَاط পড়েছেন এবং زَ দ্বারাও একটা পঠনের কথা বর্ণিত আছে। ফার্রা বলেন যে, বনী উজরাহ্ ও বনী কালবের পঠন এটাই। যেহেতু বান্দা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, সেহেতু এখন তার কর্তব্য হবে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। যেমন পূর্বেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক বলেনঃ 'অর্ধেক অংশ আমার ও অর্ধেক অংশ আমার বান্দার এবং আমার বান্দার জন্যে তাই রয়েছে যা সে চাইবে।' একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মধ্যে কি পরিমাণ সূক্ষ্মতা ও প্রকৃষ্টতা রয়েছে! প্রথমে বিশ্ব প্রভুর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণকীর্তন, অতঃপর নিজের ও মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আকুল প্রার্থনা। প্রার্থিত বস্তু লাভের এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা। এ উত্তম পন্থা নিজে পছন্দ করেই মহান আল্লাহ এ পন্থা স্বীয় বান্দাদের বাতলিয়ে দিলেন। কখনও কখনও প্রার্থনার সময় প্রার্থী স্বীয় অবস্থা ও প্রয়োজন প্রকাশ করে থাকে। যেমন হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ

رَبِّ اِنِّيْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! যে কোন মঙ্গলই আপনি আমার নিকট পাঠান, আমি তার প্রত্যাশী ও মুখাপেক্ষী।' (২৮ঃ ২৪) হযরত ইউনুস (আঃ) দু'আর সময় বলেছিলেনঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ 'আপনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং নিশ্চয় আমি অত্যাচারীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি।' (২১ঃ ৮৭) কোন কোন প্রার্থনায় প্রার্থী শুধুমাত্র প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেই নীরব থাকে। যেমন কবির কথাঃ

اَاَذْكُرُ حَاجَتِيْ اَمْ قَدْ كَفَانِيْ * حَيَاءُكَ اَنَّ شِيْمَتَكَ الْحَيَاءُ
اِذَا اَثْنٰى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْمًا * كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ

অর্থাৎ 'আমার প্রয়োজনের বর্ণনা দেয়ার তেমন কোন দরকার নেই, তোমার দয়াপূর্ণ দানই আমার জন্যে যথেষ্ট। আমি জানি যে, দান ও সুবিচার তোমার পবিত্র ও চিরাচরিত অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে দেয়া, তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাই আমার প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ট।'

এখানে হিদায়াতের অর্থ ইরশাদ ও তাওফীক অর্থাৎ সুপথ প্রদর্শন ও সক্ষমতা প্রদান। কখনও এই 'হিদায়াত' শব্দটি নিজেই مُتَعَدِّى বা সকর্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে, যেমন এখানে হয়েছে। তাহলে اَلْهِمْنَا, وَفِقْنَا, وَ رَزَقْنَا, اَعْطِنَا এ সবেরই অর্থ হবে 'আমাদেরকে প্রদান করুন।' অন্যত্র রয়েছেঃ

وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ অর্থাৎ 'আমি তাদেরকে ভাল ও মন্দ এ দুটি পথ দেখিয়েছি।' (৯০ঃ ১০) কখনও 'হিদায়াত' শব্দটি اِلٰى এর সঙ্গে مُتَعَدِّى বা সকর্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন বলেছেনঃ اِجْتَبٰهُ وَ هَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (১৬ঃ ১২১) এবং অন্য জায়গায় বলেছেন فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ (৩৭ঃ ২৩) এখানে হিদায়াতের অর্থ পথ প্রদর্শন ও রাস্তা বাতলান। এইরূপ ঘোষণা রয়েছেঃ

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

অর্থাৎ 'তুমি অবশ্যই সরল পথ প্রদর্শন করেছো।' (৪২ঃ ৫২) আবার কখনও هِدَايَت শব্দটি لَام এর সঙ্গে مُتَعَدِّى হয়ে থাকে। যেমন জ্বিন বা দানবের কথা কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا

অর্থাৎ 'সেই আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে এর জন্যে পথ দেখিয়েছেন।' (৭ঃ ৪৩) (অর্থাৎ অনুগ্রহ পূর্বক সৎপথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন) صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এর কয়েকটি অর্থ আছে। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট, সরল ও পরিষ্কার রাস্তা যার কোন জায়গা বা কোন অংশই বাঁকা নয়। এ প্রসঙ্গে কবি জারীর বিন আতিয়া আল-খাতফী বলেনঃ

اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ * اِذَا اَعْرَجَ الْمَوَارِدُ مُسْتَقِيْمٌ

রূপক অর্থে صِرَاط এর ব্যবহার আরবীয়দের কাছে কথা এবং কাজের উপরও হয়ে থাকে। আবার صِرَاط এর বিশেষণ কখনও সোজা হয় এবং কখনও বাঁকা হয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাসসিরগণ হতে এর বহু তাফসীর নকল করা হয়েছে এবং ওগুলোর সারাংশ প্রায় একই, আর তা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) ইবনে জারীরও (রঃ) এরূপই বর্ণনা করেছেন। কুরআন কারীমের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসে ইতিপূর্বে

বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাব এই কুরআন পাক হচ্ছে শক্ত রশি বা রজ্জু, জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ এবং সরল পথ বা সিরাতুম মুসতাকীম। (মুসনাদ-ই-আহমাদ ও জামে' তিরমিযী) হযরত আলীরও (রাঃ) এটাই অভিমত। আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেছিলেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলুন।' অর্থাৎ আমাদেরকে হিদায়াত বিশিষ্ট পথের ইলহাম করুন এবং তা হলো আল্লাহর দ্বীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। তাঁর নিকট থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও বহু সাহাবী (রাঃ) হতেও এ তাফসীরই নকল করা হয়েছে। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন যে, صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এর ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম যা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমুদয় বস্তু হতে প্রশস্ততম। ইবনে হানাফিয়্যাহ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহর সেই দ্বীন যা ছাড়া অন্য দ্বীন গ্রহণীয় নয়। আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলামের (রঃ) উক্তি এই যে, صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ হচ্ছে ইসলাম। মুসনাদ-ই-আহমদের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এর একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। (তা এই যে,) সীরাতে মুসতাকীমের দুই দিকে দুইটি প্রাচীর রয়েছে। তাতে কয়েকটি খোলা দরজা আছে। দরজাগুলির উপর পর্দা লটকানো রয়েছে। সীরাতে মুসতাকীমের প্রবেশ দ্বারে সব সময়ের জন্যে একজন আহ্বানকারী নিযুক্ত রয়েছে। সে বলছে-' হে জনমণ্ডলী! তোমরা সবাই এই সোজা পথ ধরে চলে যাও, আঁকা বাঁকা পথে যেওনা।' ঐ রাস্তার উপরে একজন আহ্বানকারী রয়েছে। যে কেউ এ দরজাগুলির কোন একটি খুলতে চাচ্ছে সে বলছে-সাবধান, তা খোল না , যদি খোল, তবে সোজা পথ থেকে সরে পড়বে।' সীরাতে মুসতাকীম হচ্ছে ইসলাম, প্রাচীরগুলো আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, প্রবেশ দ্বারে আহ্বানকারী হচ্ছে কুরআন কারীম এবং রাস্তার উপরের আহ্বানকারী হচ্ছে আল্লাহর ভয় যা প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপদেষ্টা রূপে অবস্থান করে থাকে।' এ হাদীসটি মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম, তাফসীর-ই-ইবনে জারীর, জামে' তিরমিযী এবং সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও রয়েছে এবং এর ইসনাদ হাসান সহীহ। আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচাইতে ভাল জানেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'হক বা সত্য'। তাঁর এ কথাটিই সবচাইতে ব্যাপক এবং এসব কথার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই।

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নবী (সঃ) ও তাঁর পরবর্তী দু'জন খলীফা (রাঃ)। আবুল আলিয়া (রঃ) এ কথাটির সত্যতা ও উৎকৃষ্টতা অপকটে স্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সব মত সঠিক এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর দু'জন খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমার ফারূকের (রাঃ) অনুসারীগণ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী, যাঁরা ইসলামের অনুসারী তাঁরা পবিত্র কুরআনকে মান্যকারী এবং কুরআন আল্লাহর কিতাব, তাঁর সুদৃঢ় রজ্জু এবং তাঁর সোজা পথ। অতঃপর সীরাতে মুসতাকীমের তাফসীরের ব্যাপারে এ সমুদয় উক্তিই সঠিক এবং একে অপরের সত্যতা সমর্থনকারী। অতএব সমুদয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ সীরাতে মুসতাকীম সেই পুণ্য সনাতন পথ যার উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ছেড়ে গিয়েছেন। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীরের (রঃ) ফায়সালা হচ্ছে এইঃ 'আমার নিকট এ আয়াতের সর্বোত্তম তাফসীর এই যে, আমাদেরকে যেন এমন কাজের তাওফীক দেয়া হয় যা আল্লাহ তা'আলার ইপ্সিত কাজ এবং যার উপর চললে আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাকে পুরস্কৃত করেন। এটাই সীরাতে মুসতাকীম। কেননা, তাকে এমন দানে ভূষিত করা হবে যে দান দ্বারা আল্লাহর মনোনীত বান্দাদেরকে ভূষিত করা হয়েছিল। যাঁরা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁরা ইসলাম ও রাসূলগণের (আঃ) সত্যতা সর্বোত্তভাবে স্বীকার করেছিলেন এবং কুরআনকে হাতে দাঁতে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন, যাঁরা আল্লাহর নির্দেশাবলী নতশিরে মেনে চলে ছিলেন ও আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হতে বিরত রয়েছিলেন। আর নবী করীম (সঃ), তাঁর চার খলীফা (রাঃ) ও সমস্ত সৎ বান্দার পথে চলবার তাওফীক দেয়া, এটাই হচ্ছে সীরাতে মুসতাকীম।"

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মু'মিনের তো পূর্বেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ হয়ে গেছে, সুতরাং নামাযে বা বাইরে হিদায়াত চাওয়ার আর প্রয়োজন কি? তবে সেই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে হিদায়াতের উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাওয়া। কেননা, বান্দা প্রতিটি মুহূর্তে ও সর্বাবস্থায় প্রতি-নিয়তই আল্লাহ তা'আলার আশাধারী ও মুখাপেক্ষী। সে নিজে স্বীয় জীবনের লাভ ক্ষতির মালিক নয়। বরং নিশিদিন সে আল্লাহরই প্রত্যাশী ও মুখাপেক্ষী। এ জন্যেই আল্লাহ পাক তাকে শিখিয়েছেন যে, সে যেন সর্বদা হিদায়াত প্রার্থনা করে এবং তার উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাইতে থাকে। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর দরজায় ভিক্ষুক করে নিয়েছেন।

সে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার আকুল প্রার্থনা মঞ্জুর করার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছেন। বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় ও মুহতাজ ব্যক্তি যখন দিনরাত আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ তখন তার সেই আকুল প্রার্থনা কবুলের জিম্মাদার হয়ে যান। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ـ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর, সেই কিতাবের উপর যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ সমুদয় কিতাবের উপর যা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ করেছেন, এ সব কিছুর উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর।' (৪ঃ ১৩৬) এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান আনয়নের নির্দেশ দেয়া এমনই, যেমন হিদায়াত প্রাপ্তগণকে হিদায়াত চাওয়ার নির্দেশ দেয়া। এই দুই স্থানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে তার উপরে অটল, অনড় ও দ্বিধাহীনচিত্তে স্থির থাকা। আর এমন কার্যাবলী সদা সম্পাদন করা যা উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করে।

এর উপর এ প্রতিবাদ উঠতে পারে না যে, এ তো হলো 'তাহসীলে হাসিল' অর্থাৎ প্রাপ্ত জিনিসের পুনঃ প্রাপ্তি। আল্লাহ এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। দেখুন মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাগণকে নিম্নের এ প্রার্থনা করারও নির্দেশ দিচ্ছেনঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ *

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বাঁকা করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয় আপনি মহান দাতা।' (৩ঃ ৮)

এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) মাগরিবের তৃতীয় রাকআতে সূরা-ই ফাতিহার পরে এ আয়াতটি নিম্ন স্বরে পড়তেন। সুতরাং اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর অর্থ দাঁড়ালোঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল ও সোজা পথের উপর অটল ও স্থির রাখুন। এবং তা হতে আমাদেরকে দূরে অপসারিত করে ফেলবেন না।"

٦- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

৬। তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন;

٧- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۚ ع

৭। তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এর বর্ণনা পূর্বেই গত হয়েছে যে, বান্দার এ কথার উপর মহান আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দার জন্যে ঐ সব কিছুই রয়েছে যা সে চাইবে।' এ আয়াতটি সীরাতে মুসতাকীমের তাফসীর এবং ব্যাকরণবিদ বা নাহ্বীদের নিকট এটা 'সীরাতে মুসতাকীম' হতে বদল হয়েছে এবং আতফ্ বায়ানও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচাইতে ভাল জানেন। আর যারা আল্লাহর পুরস্কার লাভ করেছে তাদের বর্ণনা সূরা-ই-নিসার মধ্যে এসেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا * ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا *

অর্থাৎ 'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, এরূপ ব্যক্তিগণও ঐ মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেক্কারগণ। আর ঐ মহাপুরুষগণ উত্তম সহচর। এ অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (৪ঃ ৬৯-৭০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐ সব ফেরেশতা, নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎলোকের পথে পরিচালিত করুন যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন।" উল্লিখিত আয়াতটি নিম্ন বর্ণিত আয়াতের মত।

مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ (৪ঃ ৬৯)

হযরত রাবী' বিন আনাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'নবীগণ'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত মুজাহিদ (রঃ) এর অর্থ নিয়েছেন 'মুমিনগণ'

এবং হযরত অকী' (রঃ) নিয়েছেন 'মুসলমানগণ।' আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সহচরবর্গ (রাঃ)। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কথাই বেশী ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ এই غَيْرِ নামক শব্দটিতে জমহূরের পঠনে غَيْرِ (গাইরি) আছে অর্থাৎ رَ অক্ষরের নীচে 'যের' এবং তা বিশেষণ করা হয়েছে। আল্লামা যামাখ্‌শারী বলেছেন যে, رَ কে যবরের সঙ্গে পড়া হয়েছে এবং তা 'হাল' হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং হযরত উমার বিন খাত্তাবের (রাঃ) পঠন এটাই। عَلَيْهِمْ এর সর্বনামটি ওর ذُوالْحَال এবং اَنْعَمْتَ হচ্ছে عَامِل, তাহলে অর্থ হচ্ছেঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করুন, ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন, যারা হিদায়াত বা সুপথ প্রাপ্ত এবং অটল অবিচলিত ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) অনুগত ছিলেন। যারা আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী ও নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে-বহুদূরে অবস্থানকারী ছিলেন। আর ঐ সব লোকের পথ হতে রক্ষা করুন যাদের উপর আপনার ধূমায়িত ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, যারা সত্যকে জেনে শুনেও তা থেকে দূরে সরে গেছে এবং পথভ্রষ্ট লোকদের পথ হতেও আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন যাদের সঠিক পথ সম্পর্কে কোন ধারণা ও জ্ঞানই নেই, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং তাদেরকে সরল, সঠিক পুণ্য পথ দেখানো হয় না।

কথার মধ্যে খুব বেশী গুরুত্ব আনয়নের জন্যে لَا অক্ষরটিকে غَيْرِ এর পরে আনা হয়েছে, যেন জানতে পারা যায় যে, এখানে ভুলপথ দুইটি। একটি ইয়াহূদীদের পথ এবং অপরটি খৃষ্টানদের পথ। কোন কোন নাহ্‌বী বা ব্যাকরণবিদ বলেছেন যে, এখানে غَيْر শব্দটি اِسْتِثْنَاء বা প্রভেদ সৃষ্টির জন্যে এসেছে। তা হলে এটা اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع হতে পারে। কেননা যাঁদের উপর অনুগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের মধ্য হতে এ اِسْتِثْنَاء হচ্ছে অথচ এরা তাঁদের অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আমরা যে তাফসীর করেছি এটাই বেশী উত্তম। আরব কবিদের কবিতায় এরূপ দেখা যায় যে, তাঁরা বিশেষ্যকে লোপ করে শুধুমাত্র বিশেষণের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যেমন নিম্নের কবিতায় রয়েছেঃ

كَاَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِىْ اُقَيْشٍ * يُقَعْقِعُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ بِشَنٍّ

এখানে مِنْ শব্দের আগে جَمَلٌ নামক বিশেষ্যটিকে লোপ করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ের বিশেষণকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। এভাবেই আয়াতেও বিশেষণের বর্ণনা রয়েছে এবং صِرَاط নামক বিশেষ্যকে লোপ করা হয়েছে।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ এর ভাবার্থ হচ্ছে- غَيْرِ صِرَاطِ الْمَغْضُوْبِ অর্থাৎ অভিশপ্তদের পথে নয়। مُضَاف এর উল্লেখ না করে مُضَاف اِلَيْهِ এর উল্লেখই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। পূর্ব শব্দগুলিই এটা প্রমাণ করছে। পূর্বে এ শব্দটি দুইবার এসেছে। কেউ কেউ বলেন যে, وَ لَا الضَّالِّيْنَ এর لَا শব্দটি অতিরিক্ত। তাঁদের মতে বাক্যটি হবে নিম্নরূপঃ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ الضَّالِّيْنَ এবং আরব কবিদের কবিতাতেও এর সাক্ষ্য রয়েছে। যেমন কবি আজ্জাজ বলেনঃ

فِىْ بِئْرٍ لَا حُوْرٍ * سَعْىٍ مَا شَعَرَ

এখানে لَا শব্দটি অতিরিক্ত। কিন্তু সঠিক কথা সেইটাই যা আমরা ইতিপূর্বে লিখেছি। হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে সহীহ সনদে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ غَيْرِ الضَّالِّيْنَ পড়াও বর্ণিত আছে। আবূ উবাইদ আল কাসেম বিন সাল্লাম 'কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন' এর মধ্যে একথা বর্ণনা করেছেন। হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। এ মহান ব্যক্তিদ্বয় হতে যদি এটা ব্যাখ্যাদান রূপেও প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তো এটা আমাদের মতেরই সহায়ক হবে। তা হলো এই যে, لَا কে نَفِىْ تَاكِيْد এর জন্যে আনা হয়েছে, যাতে এ সন্দেহ না থাকে যে, এটা اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর উপর عَطْف হয়েছে এবং এ জন্যেও যে, যাতে দুইটি পথের পার্থক্য অনুধাবন করা যায়, যেন প্রত্যেকেই এ দুটো পথ থেকে বেঁচে থাকে। ঈমানদারদের পন্থা তো এটাই যে, সত্যের জ্ঞানও থাকতে হবে এবং তার আমলও থাকতে হবে। ইয়াহূদীদের আমল নেই এবং খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই। এজন্যেই ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত হলো এবং খৃষ্টানেরা হলো পথভ্রষ্ট। কেননা, জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল পরিত্যাগ করা লা'নত বা অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খৃষ্টানেরা যদিও একটা জিনিসের ইচ্ছে করে, কিন্তু তার সঠিক পথ তারা পায় না। কেননা, তাদের কর্মপন্থা ভুল এবং তারা সত্যের অনুসরণ হতে দূরে সরে পড়েছে। অভিশাপ ও পথভ্রষ্টতা এই দুই দলের তো রয়েছেই কিন্তু ইয়াহূদী অভিশাপের অংশে একধাপ এগিয়ে রয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ 'এরা পূর্ব হতেই পথভ্রষ্ট এবং অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে এবং তারা সোজা পথ হতে ভ্রষ্ট রয়েছে।' (৫ঃ ৭৭) একথার সমর্থনে বহু হাদীস ও বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে। মুসনাদ-ই-আহমাদে আছে যে, হযরত আদী বিন

হাতিম (রাঃ) বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সেনাবাহিনী একদা আমার ফুফুকে এবং কতকগুলো লোককে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এনে হাজির করেন। আমার ফুফু তখন বলেনঃ 'আমাকে দেখা শোনা করার লোক দূরে সরে রয়েছে এবং আমি একজন অধিক বয়স্কা অচলা বৃদ্ধা। আমি কোন খিদমতের যোগ্য নই। সুতরাং দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আল্লাহ আপনার উপরও দয়া করবেন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'যে তোমার খবরাখবর নিয়ে থাকে সে ব্যক্তিটি কে?' তিনি বললেন-'আদী বিন হাতিম।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'সে কি ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) হতে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে দেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে আর একটি লোক ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি হযরত আলীই (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সোয়ারীর প্রার্থনা কর।' আমার ফুফু তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালে সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর হয় এবং তিনি সোয়ারী পেয়ে যান। তিনি এখান হতে মুক্তি লাভ করে সোজা আমার নিকট চলে আসেন এবং বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহর (সঃ) দানশীলতা তোমার পিতা হাতিমকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর কাছে একবার কেউ গেলে আর শূন্য হস্তে ফিরে আসে না।' একথা শুনে আমিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হই। আমি দেখি যে, ছোট ছেলে ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে অবাধে যাতায়াত করছে এবং তিনি তাদের সাথে অকুণ্ঠচিত্তে অকৃত্রিমভাবে আলাপ আলোচনা করছেন। এ দেখে আমার বিশ্বাস হলো যে, তিনি কাইসার ও কিসরার মত বিশাল রাজত্ব ও সম্মানের অভিলাষী নন। তিনি আমাকে দেখে বলেনঃ 'আদী! لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলা হতে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য আছে কি? اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা হতে এখন তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? মহা সম্মানিত আল্লাহ পাক থেকে বড় আর কেউ আছে কি?' (তাঁর এই কথাগুলো এবং তাঁর সরলতা ও অকৃত্রিমতা আমার উপর এমনভাবে দাগ কাটলো ও ক্রিয়াশীল হলো যে,) আমি তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। তাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বলেনঃ مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ইয়াহূদকে বুঝানো হয়েছে এবং ضَآلِّيْنَ দ্বারা খৃষ্টানগণকে বুঝানো হয়েছে।' আরও একটি হাদীসে আছে যে, হযরত আদীর (রাঃ) প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই তাফসীরই করেছিলেন। এ হাদীসের অনেক সনদ আছে এবং বিভিন্ন শব্দে সে সব বর্ণিত হয়েছে।

বানূ কাইনের একটি লোক 'ওয়াদীউল কুরায়' রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে এটাই প্রশ্ন করেছিলেন এবং উত্তরে তিনি একথাই বলেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় তাঁর নাম দেয়া হয়েছে আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)- এর তাফসীরে হযরত আবূ যার (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) এবং আরও বহু সাহাবী (রাঃ) হতেও এ তাফসীর নকল করা হয়েছে। হযরত রাবী' বিন আনাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণও একথাই বলেন। বরং ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তো বলেন যে, মুফাসসিরগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এই ইমামগণের এ তাফসীরের একটি দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে সূরা-ই-বাকারার এ আয়াতটি যাতে বানী ইসরাঈলগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ - اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ (২ঃ ৯০)

এ আয়াতের মধ্যে আছে যে, তাদের উপর অভিশাপের পর অভিশাপ অবতীর্ণ হয়েছে এবং সূরা-ই-মায়েদার قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ الخ (৫ঃ ৬০) এই আয়াতের মধ্যেও রয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *

অর্থাৎ 'বানী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর দাঊদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর কথায় অভিশাপ দেয়া হয়েছে; কারণ তারা অবাধ্য হয়েছিল ও সীমা অতিক্রম করেছিল। এসব লোক কোন খারাপ কাজ হতে একে অপরকে বাধা দিতো না। নিশ্চয়ই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত জঘন্য।' (৫ঃ ৭৮-৭৯)

ইতিহাসের পুস্তকসমূহে বর্ণিত আছে যে, যায়েদ বিন আমর বিন নোফাইল যখন খাঁটি ধর্মের অনুসন্ধানে স্বীয় বন্ধুবান্ধব ও সাথী-সঙ্গীসহ বেরিয়ে পড়লেন এবং এদিক ওদিক বিচরণের পর শেষে সিরিয়ায় আসলেন, তখন ইয়াহূদীরা তাঁদেরকে বললোঃ 'আল্লাহর অভিশাপের কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মে আসতেই পারবেন না।' তাঁরা উত্তরে বললেনঃ 'তা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই তো আমরা সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে বের হয়েছি, কাজেই কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি?' তাঁরা খৃষ্টানদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা বললোঃ 'আল্লাহ তা'আলার লা'নত ও অসন্তুষ্টির কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মেও আসতে পারবেন না।' তাঁরা বললেনঃ 'আমরা এটাও করতে পারি না।' তারপর হযরত যায়েদ বিন আমর বিন নোফাইল স্বাভাবিক ধর্মের উপরই রয়ে গেলেন। তিনি মুর্তি পূজা ও স্বগোত্রীয় ধর্মত্যাগ করলেন, কিন্তু ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম কোন ক্রমেই গ্রহণ করলেন না। তবে তাঁর সঙ্গী সাথীরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলো, কেননা ইয়াহূদীদের ধর্মের সঙ্গে এর অনেকটা মিল ছিল। যায়েদের ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অরাকা বিন নাওফিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নবুওতের যুগ পেয়েছিলেন এবং আল্লাহর হিদায়াত তাঁকে সুপথ প্রদর্শন করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর ঈমান এনেছিলেন ও সেই সময় পর্যন্ত যে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

**জিজ্ঞাস্যঃ** ضَادْ এবং ظَا এর মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্য রয়েছে। এজন্যে উলামা-ই-কিরামের সহীহ মাযহাব এই যে, এ পার্থক্য ক্ষমার্হ। ضَادْ এর সহীহ মাখরাজ হচ্ছে জিহবার প্রথম প্রান্ত এবং ওর পার্শ্বের চোয়াল। আর ظَا এর মাখরাজ হচ্ছে জিহবার এক দিক এবং সম্মুখের উপরের দুই দাঁতের প্রান্ত। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই দু'টি অক্ষর হচ্ছে رِخْوَهْ مَجْهُوْرَه এবং مُطْبِقَهْ সুতরাং যে ব্যক্তির পক্ষে এই দুইটি অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হবে সে যদি ضَادْ কে ظَا এর মত পড়ে ফেলে তবে তার অপরাধ অমার্জনীয় নয়, বরং তাকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখা হবে। একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ضَادْ কে সবচেয়ে সঠিকভাবে পড়তে আমিই পারি। কিন্তু হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও দুর্বল।

# পরিচ্ছেদ

এই কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ সূরাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সমষ্টি। এই সাতটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার যোগ্য প্রশংসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্র নামসমূহ এবং উচ্চতম বিশেষণের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই রোজ কিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং বান্দাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেন সেই মহান প্রভুর নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে যাচ্ঞা করে, যেন তাঁর কাছে নিজের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কথা অকপটে স্বীকার করে, তাঁকে সব সময় অংশীবিহীন ও তুলনাবিহীন মনে করে, খাঁটি অন্তরে তাঁর ইবাদত; তাঁর অহ্দানিয়াত বা একত্ববাদে বিশ্বাস করে, তাঁর কাছে সরল সোজা পথ ও তার উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকার জন্যে নিশিদিন আকুল প্রার্থনা জানায়। এই অবিসম্বাদিত পথই একদিন তাকে রোজ কিয়ামতের পুলসিরাতও পার করাবে এবং নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককারদের পার্শ্বে জান্নাতুল ফিরদাউসের নন্দন কাননে স্থান দেবে। সাথে সাথে আলোচ্য সূরাটির মধ্যে যাবতীয় সৎকার্যাবলী সম্পাদনের প্রতি নিরন্তর উৎসাহ দেয়া হয়েছে যাতে কিয়ামতের দিন বান্দা আত্মকৃত নেকী ও পুন্যসমূহ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে এবং মিথ্যা ও অন্যায় পথে চলা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে কিয়ামতের দিনেও সে বাতিলপন্থীদের দল থেকে দূরে থাকতে পারে। এই বাতিলপন্থী দল হচ্ছে ইয়াহূদী এবং খৃষ্টান।

ধীরস্থির ও সূক্ষ্মভাবে জাগ্রত মস্তিষ্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণনারীতি কি সুন্দর! আলোচ্য সূরায় أَنْعَمْتَ নামক বাক্যাংশে দানের ইসনাদ বা সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে এবং أَنْعَمْتَ বলা হয়েছে। কিন্তু غَضَبَ এর ইসনাদ করা হয়নি; বরং এখানে কর্তাকেই লোপ করা হয়েছে এবং مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলা হয়েছে। এখানে বিশ্ব প্রভুর মহান মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে মূল কর্তা আল্লাহ তা'লাই। যেমন অন্যস্থানে বলা হয়েছে وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ এরূপভাবেই ভ্রষ্টতার ইসনাদ পথভ্রষ্টের দিকেই করা হয়েছে। অথচ অন্য এক জায়গায় আছেঃ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا *

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন সে সুপথ প্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার কোন বন্ধু ও পথ প্রদর্শক নেই।' (১৮ঃ ১৭) আর এক জায়গায় আছেঃ

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ يَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ *

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই এবং সে তো স্বীয় অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।' (৭ঃ ১৮৬) এ রকমই আরও বহু আয়াত রয়েছে যদ্দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পথ প্রদর্শনকারী ও পথ বিভ্রান্তকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।

কাদরিয়্যাহ দল, যারা কতকগুলো অস্পষ্ট আয়াতকে দলীলরূপে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, বান্দা তার ইচ্ছাধীন ও মুক্ত স্বাধীন, সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই সম্পাদন করে। কিন্তু তাদের একথা ভ্রমাত্মক ও প্রমাদপূর্ণ। এটা খণ্ডনের জন্যে ভূরি ভূরি স্পষ্ট আয়াতসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বাতিল পন্থীদের এটাই রীতি যে, তারা স্পষ্ট আয়াতকে পরিহার করে অস্পষ্ট আয়াতের পিছনে লেগে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে আছেঃ 'যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে লেগে থাকে তখন বুঝে নিও যে, তারা ওরাই যাদের নাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন এবং স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক। এ নির্দেশনামায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইঙ্গিত এই আয়াতের প্রতি রয়েছেঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ ..... اِلٰى اٰخِرِالْاٰيَةِ

অর্থাৎ 'সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা গোলযোগ সৃষ্টি এবং এর (মনগড়া) ব্যাখ্যা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এর ঐ অংশের পিছনে পড়ে থাকে যা দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট। সুতরাং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, বিদআতীদের অনুকূলে কুরআন পাকের মধ্যে সঠিক ও অকাট্য দলীল একটিও নেই। কুরআন মাজীদের আগমন সূচিত হয়েছে সত্য ও মিথ্যা, হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যেই। বৈপরীত্ব ও মতবিরোধের জন্যে অসেনি বা তার অবকাশও এতে নেই। এতো মহাবিজ্ঞ ও প্রশংসিত আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ হয়েছে 'লাওহে মাহফূয্' বা রক্ষিত ফলক থেকে।

# পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলা মুসতাহাব। اٰمِيْن শব্দটি يَاسِيْن শব্দটির মত এবং এটা اٰمِيْن ও পড়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ " হে আল্লাহ! আপনি কবূল করুন।" আমীন বলা মুসতাহাব হওয়ার দলীল হলো ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ-ই-আহমদ, সুনান-ই-আবি দাউদ এবং জামে' তিরমিযীতে হযরত অ'য়েল বিন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ পড়ে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি স্বর দীর্ঘ করতেন।" সুনান-ই- আবি দাউদে আছে যে, তিনি স্বর উচ্চ করতেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সশব্দ আমীন তাঁর নিকটবর্তী প্রথম সারির লোকেরা স্পষ্টতঃই শুনতে পেতেন। সুনান-ই-আবি দাউদ ও সুনান-ই-ইবনে মাজায় এ হাদীসটি আছে। সুনান-ই-ইবনে মাজায় এও আছে যে, 'আমীনের শব্দে গোটা মসজিদ প্রতিধ্বনিত হয়ে বেজে উঠতো।' ইমাম দারে-কুতনীও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন।

হযরত বেলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "আমার পূর্বে 'আমীন' বলবে না।" হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত জা'ফর সাদিক (রঃ) হতে 'আমীন' বলা বর্ণিত আছে। যেমন কুরআন মজীদের মধ্যে اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ (৫ঃ ২) রয়েছে। আমাদের সহচরেরা বলেন যে, নামাযের বাইরে থাকলেও 'আমীন' বলতে হবে। তবে যে ব্যক্তি নামাযে থাকবে তার জন্যে বেশী জোর দেয়া হয়েছে। নামাযী একাকী হোক বা মুকতাদী হোক বা ইমাম হোক, সর্বাবস্থায় তাকে আমীন বলতেই হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন ইমাম 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও আমীন বল। যার আমীন বলার শব্দ ফেরেশতাদের আমীনের সঙ্গে মিলিত হয় তার পূর্বেকার সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়।'

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযে 'আমীন' বলে এবং ফেরেশতারাও আকাশে 'আমীন' বলেন, আর একের আমীনের সঙ্গে অন্যের 'আমীন' মিলিত হয় তখন

তার পূর্বেকার সমস্ত গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়।' এর ভাবার্থ এই যে, তার 'আমীন' ও ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সময় একই হয় বা কবূল হওয়া হিসেবে অনুরূপ হয় অথবা আন্তরিকতায় অনুরূপ হয়। সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে মারফূ রূপে বর্ণিত আছেঃ 'যখন ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ বলেন তখন তোমরা 'আমীন' বল, আল্লাহ কবূল করবেন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমীনের অর্থ কি?' তিনি বললেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি কবূল করুন।' জওহারী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ 'যেন এরূপই হয়।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ 'আমাদের আশা ভঙ্গ করবেন না।' অধিকাংশ আলেম বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রার্থনা কবূল করুন।' মুজাহিদ (রঃ), জা'ফর সাদিক (রঃ) এবং হিলাল বিন সিয়াফ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার নাম সমূহের মধ্যে আমীনও একটি নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু তা বিশুদ্ধ নয়।

ইমাম মালিকের (রঃ) সহচরগণের মাযহাব এই যে, ইমাম 'আমীন' বলবেন না, শুধু মুকতাদীগণ 'আমীন' বলবেন। কেননা ইমাম মালিকের (রঃ) মুআত্তার হাদীসে আছে ঃ 'যখন ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে তখন তোমরা 'আমীন' বল।' এ রকমই তাঁর দলীলের সমর্থনে সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতেও একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে তখন তোমরা আমীন বল।' কিন্তু সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে-'যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও 'আমীন' বল।' হাদীসে এটাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে 'আমীন' বলতেন। উচ্চৈস্বরে পঠিত নামাযে মুকতাদী উচ্চৈস্বরে আমীন বলবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সহচরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, যদি ইমাম 'আমীন' বলতে ভুলে যান তবে মুকতাদীগণ জোরে আমীন বলবে। যদি ইমাম নিজেই উচ্চৈস্বরে আমীন বলেন তবে 'নতুন কথা' মতে মুকতাদী জোরে আমীন বলবে না। ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) এটাই মাযহাব। ইমাম মালিক হতেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। কেননা, নামাযের অন্যান্য যিক্রের মত এটাও একটা যিক্র। সুতরাং অন্যান্য যিক্র যেমন উচ্চ শব্দে হয় না, তেমনই এটাও উচ্চ শব্দে পড়া হবে না। কিন্তু পূর্ব যুগীয় মনীষীদের কথা এই যে, 'আমীন' উচ্চ শব্দেও পড়া যায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলেরও (রঃ) মাযহাব এটাই এবং দ্বিতীয় বর্ণনা অনুসারে ইমাম মালিকের (রঃ) এটাই মাযহাব। এর দলীল ঐ হাদীসটি যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমীনের' শব্দে মসজিদের মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনির রব উঠতো। এখানে আমাদের তৃতীয় আরও

একটি মত আছে, তা এই যে, যদি মসজিদ ছোট হয় তবে মুকতাদী জোরে আমীন বলবে না। কেননা। তারা ইমামের কিরাআত শুনছে। আর যদি মসজিদ বড় হয় তবে আমীন জোরে বলবে, যেন মসজিদের প্রান্তে প্রান্তে 'আমীনের' শব্দ পৌঁছে যায়। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসনাদ-ই- আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট ইয়াহূদীদের আলোচনা হলে তিনি বলেনঃ 'আমাদের তিনটা জিনিসের উপর ইয়াহূদীদের যতটা হিংসা বিদ্বেষ আছে ততোটা হিংসা অন্য কোন বস্তুর উপর নেই। (১) জুমআ, আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রতি হিদায়াত করেছেন ও পথ দেখিয়েছেন এবং তারা এ থেকে ভ্রষ্ট রয়েছে। (২) কিবলাহ্ এবং (৩) ইমামের পিছনে আমাদের আমীন বলা।

সুনান-ই-ইবনে মাজার হাদীসে রয়েছেঃ 'সালাম' ও 'আমীন' ইয়াহূদীদের যতোটা বিরক্তি উৎপাদন করে অন্য কোন জিনিস তা করে না। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইয়াহূদীরা তোমাদের আমীনের উপর যত হিংসা করে অন্য কাজে ততোটা করে না। তোমরা আমীন খুব বেশী বেশী বল।' এর সনদে বর্ণনাকারী তালহা বিন আমর উসূলে হাদীসের পরিভাষা অনুযায়ী দুর্বল। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমীন, আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের উপর তাঁর মোহর।' হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নামাযে 'আমীন' বলা এবং প্রার্থনায় 'আমীন' বলা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার প্রতি একটি বিশেষ দান, যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দান করা হয়নি। হাঁ, তবে এটুকু বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসার (আঃ) বিশেষ প্রার্থনার উপর হযরত হারূন (আঃ) 'আমীন' বলতেন। তোমরা তোমাদের প্রার্থনা আমীনের উপর শেষ কর। তাহলে তোমাদের পক্ষেও আল্লাহ তা কবূল করবেন।" এ হাদীসটিকে সামনে রেখে কুরআন মাজীদের ঐ শব্দগুলো লক্ষ্য করুন যা হযরত মূসার (আঃ) প্রার্থনায় বলা হয়েছেঃ

وَ قَالَ مُوسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ *

অর্থাৎ 'এবং মূসা বললো -হে আমাদের প্রভু! আপনি ফিরআউনকে ও তার সভাসদবর্গকে ইহলৌকিক জীবনে সৌন্দর্য ও সম্পদ দান করেছেন যার ফলে সে অন্যদেরকে আপনার পথ হতে সরিয়ে নিয়ে বিপথে চালিত করছে; হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের ধন মাল ধ্বংস করুন এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিন, সুতরাং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান আনবে না।' (১০ঃ ৮৮) হযরত মূসার (আঃ) এ দু'আ কবূলের ঘোষণা নিম্নের এসব শব্দ দ্বারা করা হচ্ছেঃ

قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَ لَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *

অর্থাৎ 'তিনি বললেন তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং মুর্খদের পথে যেয়ো না।' (১০ঃ ৮৯)

দু'আ শুধু হযরত মূসা (আঃ) করেছিলেন এবং হযরত হারূণ (আঃ) শুধু 'আমীন' বলেছিলেন। কিন্তু কুরআনে এই দু'আর সংযোগ দু'জনের দিকেই করা হয়েছে। কতগুলো লোক একে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে বলে থাকেন যে, যে ব্যক্তি কোন দু'আর উপর আমীন বলে সে যেন নিজেই দু'আ করলো। এখন এ প্রমাণকে সামনে রেখে আবার তাঁরা কিয়াস করেন যে, মুকতাদীকে কিরাআত পড়তে হবে না। কেননা, তার সূরা ফাতিহার উপর 'আমীন' বলাই কিরাআতের স্থলাভিষিক্ত হবে। তাঁরা এ হাদীসটিকেও দলীল রূপে পেশ করেনঃ 'যার ইমাম থাকে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (মুসনাদ-ই- আহমাদ)

হযরত বেলাল (রাঃ) বলতেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 'আমীনে' আমার অগ্রবর্তী হবেন না।' এঁরা এটা টেনে এনে যেহ্‌রী নামাযে ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা-ই-ফাতিহা না পড়া সাব্যস্ত করতে চান। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ বলার পর আমীন বলে এবং যমীনবাসীদের আমীনের' সঙ্গে আসমান বাসীদের 'আমীন' বলার শব্দও মিলিত হয়, তখন আল্লাহ বান্দার পূর্বের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেন। আমীন বলার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, এক ব্যক্তি এক গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করলো ও জয় লাভ করলো। অতঃপর যুদ্ধ লব্ধ মাল জমা করলো। এখন সে অংশ নেয়ার জন্যে নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করলো। কিন্তু তার নাম বেরই হলো না এবং সে কোন অংশও পেলো না। এতে সে বিস্মিত হয়ে বললো -'এ কেন হবে?' তখন সে উত্তর পেলো 'তোমার 'আমীন' না বলার কারণে'।"

## সূরা-ই-বাকারাহ্ এবং তার মাহাত্ম্য ও গুণাবলী

হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সূরা-ই-বাকারাহ্ কুরআনের কুঁজ এবং তার চূড়া। এর এক একটি আয়াতের সঙ্গে ৮০ জন ফেরেশতা উর্ধগগন থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিশেষ করে আয়াতুল কুরসী তো খাস আরশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই সূরার সঙ্গে মিলানো হয়েছে। সূরা-ই-ইয়াসীন কুরআনের অন্তর বিশেষ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকাল লাভের জন্যে তা পড়ে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এ সূরাটিকে মরণোন্মুখ ব্যক্তির সম্মুখে পাঠ কর।' (মুসনাদ-ই-আহমদ)

এ হাদীসের সনদের এক স্থানে عَنْ رَجُلٍ আছে, যার ফলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম অজানা ছিল। কিন্তু মুসনাদ-ই আহমাদেরই অপর একটি বর্ণনায় তাঁর নাম আবূ উসমান এসেছে। এ হাদীসটি এভাবেই সুনান-ই আবি দাউদ, সুনান-ই-নাসাঈ এবং সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও রয়েছে। জামে' তিরমিযীর একটি দুর্বল সনদ বিশিষ্ট হাদীসে আছেঃ 'প্রত্যেক জিনিসেরই একটা উচ্চতা থাকে। কুরআন মাজীদের উচ্চতা হচ্ছে সূরা-ই-বাকারাহ্। এই সূরার মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে যা সমস্ত আসমানের নেতা এবং সেটি হচ্ছে 'আয়াতুল কুরসী'।' মুসনাদ-ই-আহমাদ, সহীহ মুসলিম, জামে' তিরমিযী এবং সুনান-ই- নাসাঈর মধ্যে বর্ণিত হাদীসে আছেঃ

'তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না, যে ঘরে সূরা-ই বাকারাহ পাঠ করা হয় তথায় শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, যে ঘরে সূরা-ই-বাকারাহ পড়া হয় সেখান হতে শয়তান পলায়ন করে। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারীকে ইয়াহইয়া বিন মুঈন তো নির্ভরযোগ্য বলেছেন বটে, কিন্তু ইমাম আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তার হাদীসকে অস্বীকার্য বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতেও এরূপ কথাই বর্ণিত আছে। হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) তাঁর 'আল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাতু' নামক পুস্তকের মধ্যে এবং ইমাম হাকিম স্বীয় গ্রন্থ 'মুসতাদরাক' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। 'তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই' এ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কাউকেও যেন এরূপ না পাই যে, সে এক পায়ের উপর অন্য পা চড়িয়ে পড়তে থাকে; কিন্তু সূরা-ই-বাকারাহ পড়ে না। জেনে রেখো, যে ঘরে এই বরকতময় সূরাটি পাঠ করা হয় সেখান হতে শয়তান ছুটে পালিয়ে যায়। সবচেয়ে জঘন্য ও লাঞ্ছিত সেই ঘর যে ঘরে আল্লাহর কিতাব পাঠ করা হয় না।'

ইমাম নাসাঈ (রঃ) স্বীয় 'আল-ইয়াওমু ওয়াল লাইলাতু' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদ-ই- দারিমীর মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ঘরে সূরা-ই-বাকারাহ পড়া হয় সেই ঘর থেকে শয়তান গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পলায়ন করে। প্রত্যেক জিনিসেরই উচ্চতা থাকে এবং কুরআন কারীমের উচ্চতা হচ্ছে সূরা-ই-বাকারাহ। প্রত্যেক বস্তুরই সারাংশ আছে এবং কুরআনের সারাংশ হচ্ছে বড় সূরাগুলি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রাঃ) উক্তি আছে যে, যে ঘরে সূরা ই-বাকারার প্রথম চারটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, তার পরবর্তী দু'টি আয়াত এবং সব শেষের তিনটি আয়াত, একুনে দশটি আয়াত পাঠ করা হয়, শয়তান সেই ঘরে ঐ রাত্রে যেতে পারে না এবং সেইদিন ঐ বাড়ীর লোকদের শয়তান অথবা কোন খারাপ জিনিস কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এ আয়াতগুলি পাগলের উপর পড়লে তার পাগলামীও দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যেমন প্রত্যেক জিনিসের উচ্চতা থাকে তেমনই কুরআনের উচ্চতা হচ্ছে সূরা-ই- বাকারাহ। যে ব্যক্তি রাত্রিকালের নীরব ক্ষণে নিজের নিভৃত কক্ষে তা পাঠ করে, তিন রাত্রি পর্যন্ত শয়তান সেই ঘরে যেতে পারে না। আর দিনের বেলায় যদি ঘরে পড়ে তবে তিন দিন পর্যন্ত সেই ঘরে শয়তান পা দিতে পারে না (তাবরানী, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মিরদুওয়াই)।

জামে' তিরমিযী, সুনান-ই-নাসাঈ এবং সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটা ছোট্ট সেনাবাহিনী এক জায়গায় পাঠালেন এবং তিনি তার নেতৃত্বভার এমন ব্যক্তির উপর অর্পণ করলেন যিনি বলেছিলেনঃ 'আমার সূরা-ই-বাকারাহ মুখস্থ আছে।' সে সময় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বললেনঃ 'আমিও তা মুখস্ত করতাম। কিন্তু পরে আমি এই ভয় করেছিলাম যে, না জানি আমি তার উপর আমল করতে পারবো কি না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'কুরআন শিক্ষা কর, কুরআন পাঠ কর। যে ব্যক্তি তা শিখে ও পাঠ করে, অতঃপর তার উপর আমলও করে, তার উপমা এরকম যেমন মিশ্‌ক পরিপূর্ণ পাত্র, যার সুগন্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করলো, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লো তার দৃষ্টান্ত সেই পাত্রের মত যার মধ্যে মিশ্‌ক তো ভরা রয়েছে, কিন্তু উপর হতে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান বলেছেন এবং মুরসাল বর্ণনাও রয়েছে। আল্লাহই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হযরত উসাইদ বিন হুজাইর (রাঃ) একদা রাত্রে সূরা-ই-বাকারার পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁর ঘোড়াটি, যা তাঁর পার্শ্বেই বাঁধা ছিল, হঠাৎ করে লাফাতে শুরু করে। তিনি পাঠ বন্ধ করলে ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আবার তিনি পড়তে আরম্ভ করেন এবং ঘোড়াও লাফাতে শুরু করে। তিনি পুনরায় পড়া বন্ধ করেন এবং ঘোড়াটিও স্তব্ধ হয়ে থেমে যায়। তৃতীয় বারও এরূপই ঘটে। তাঁর শিশু পুত্র ইয়াহ্ইয়া ঘোড়ার পার্শ্বেই শুয়ে ছিল। কাজেই তিনি ভয় করলেন যে, না জানি ছেলের আঘাত লেগে যায়। সুতরাং তিনি পড়া বন্ধ করে ছেলেকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন যে, ঘোড়ার চমকে উঠার কারণ কি? সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। তিনি শুনতে থাকেন ও বলতে থাকেনঃ 'উসাইদ! তুমি পড়েই যেতে!' হযরত উসাইদ (রাঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! তৃতীয় বারের পরে প্রিয় পুত্র ইয়াহইয়ার কারণে আমি পড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি মাথা আকাশের দিকে উঠালে ছায়ার ন্যায় একটা জ্যোতির্ময় জিনিস দেখতে পাই এবং দেখতে দেখতেই তা উপরের দিকে উত্থিত হয়ে শূন্যমার্গে মিলিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ 'তুমি কি জান সেটা কি ছিল? তাঁরা ছিলেন গগন বিহারী অগণিত জ্যোতির্ময় ফেরেশতা। তোমার (পড়ার) শব্দ শুনে তাঁরা ত্রস্তপদে নিকটে এসেছিলেন। যদি তুমি পাঠ বন্ধ না করতে তবে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এরকমই থাকতেন এবং মদীনার সকল লোক তা দেখে চক্ষু জুড়াতো। একটি ফেরেশতাও তাদের দৃষ্টির অন্তরাল হতেন না।' এ হাদীসটি কয়েকটি হাদীসের পুস্তকে বিভিন্ন সনদের সঙ্গে বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া ইমাম কাসিম বিন সাল্লাম স্বীয় কিতাব 'কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন'-এ আবদুল্লাহ বিন সাহিল থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরই কাছাকাছি রয়েছে হযরত সাবিত বিন কায়েস বিন শাম্মাসের ঘটনাটি। তা হচ্ছেঃ একদা মদীনাবাসী রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করেনঃ 'আমরা গত রাত্রে দেখেছি যে, হযরত সাবিতের (রাঃ) পর্ণ কুটীর খানা সারা রাত ধরে উজ্জ্বল প্রদীপের আলোকে ঝলমল করছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'সম্ভবত রাত্রে সে সূরা-ই-বাকারাহ পড়েছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, সত্যই আমি রাত্রে সূরা বাকারাহ পড়েছিলাম।' এর ইসনাদ তো খুব উত্তম। কিন্তু এতে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে এবং এটা মুরসালও বটে। সুতরাং আল্লাহই নিঃসন্দেহে এ সম্পর্কে সুষ্ঠু ও উত্তম জ্ঞানের অধিকারী।

## সূরা-ই-বাকারাহ্ ও সূরা-ই-আলে ইমরানের গুণাবলী

নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা অভিনিবেশ সহকারে সূরা-ই-বাকারাহ শিক্ষা কর। কারণ এর শিক্ষা অতি কল্যাণকর এবং এ শিক্ষার বর্জন অতি বেদনাদায়ক। এমনকি বাতিলপন্থী যাদুকরও এর ক্ষমতা রাখে না।'অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেনঃ 'সূরা-ই-বাকারাহ ও সূরা-ই আলে ইমরান শিক্ষা কর। এ দু'টি হচ্ছে জ্যোতির্ময় নূর বিশিষ্ট সূরা। এরা এদের পাঠকের উপর সামিয়ানা, মেঘমালা অথবা পাখির ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন ছায়া বিস্তার করবে। কুরআনের পাঠক কবর থেকে উঠে দেখতে পাবে যে, এক জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট সুন্দর যুবক তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছেঃ 'আপনি আমাকে চিনেন কি?' এ বলবেঃ 'না'। সে বলবেঃ 'আমি সেই কুরআন যে তোমাকে দিনে ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত রেখেছিল এবং রাত্রে বিছানা দূরে সরিয়ে সদা জাগ্রত রেখেছিল। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পিছনে রয়েছে; কিন্তু আজ সমুদয় ব্যবসা তোমার পিছনে আছে।' আজ তার দক্ষিণ হস্তে রাজ্য এবং অনন্তকালের জন্যে বাম হস্তে চির অবস্থান দেয়া হবে। তার মস্তকে সার্বিক সম্মান ও অনন্ত মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার বাপ-মাকে এমন দু'টি সুন্দর মূল্যবান পরিধেয় বস্ত্র পরানো হবে যার মূল্যের সামনে সারা দুনিয়া জাহানও অতি নগণ্য মনে হবে। তারা বিচলিত হয়ে বলবেঃ 'এ দয়া ও অনুগ্রহ, এ পুরস্কার ও অবদানের কারণ কি?' তখন তাদেরকে বলা হবেঃ 'তোমাদের ছেলেদের কুরআন পাঠের কারণে তোমাদেরকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে।' অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ 'পড়ে যাও এবং ধীরে ধীরে বেহেশ্তের সোপানে আরোহণ কর।' সুতরাং তারা পড়তে থাকবে ও উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করবে। সে ধীরে ধীরেই পাঠ করুক বা তাড়াতাড়ি পাঠ করুক।' সুনান-ই-ইবনে মাজায় এ হাদীসটি আংশিকভাবে বর্ণিত আছে। এর ইসনাদ হাসান এবং মুসলিমের শর্ত বিদ্যমান। এর বর্ণনাকারী বশীর বিন মুহাজির হতে ইমাম মুসলিমও (রঃ) বর্ণনা নিয়েছেন এবং ইমাম ইবনে মুঈনও তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসাঈর (রঃ) মতে এতে কোন দোষ নেই। হাঁ, তবে ইমাম আহমাদ (রঃ) তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন এবং এর কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ 'আমি ব্যাপক অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, সে অদ্ভূত হাদীস এনে থাকে।' ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, তার কতকগুলো হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। আবূ হাতিম রাযীর ফায়সালা এই যে, তার হাদীস লিখা যেতে পারে; কিন্তু দলীল রূপে গৃহীত হতে পারে না। ইবনে 'আদীর কথা এই যে, তার এমন কতকগুলো বর্ণনা আছে যেগুলোর অনুসরণ করা যায় না। ইমাম দারকুতনী (রঃ) বলেন ঃ এটা সবল নয়।' আমি বলি যে, তার এই বর্ণনার কতকগুলো বিষয় অন্য সনদেও এসেছে।

মুসনাদ-ই- আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'কুরআন পাঠ করতে থাকো, কারণ তা তার পাঠকের জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। দু'টি জ্যোতির্ময় সূরা, সূরা-ই- বাকারাহ্ ও সূরা-ই-আলে ইমরান পড়তে থাকো। এ দুটো সূরা কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেমন দুটো সামিয়ানা, দুটো মেঘ খণ্ড অথবা পাখির দুটো বিরাট ঝাঁক। তাছাড়া সে তার পাঠকদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবে।' পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'সূরা-ই-বাকারাহ পড়তে থাকো; কেননা, এর পাঠে বরকত আছে এবং তা বর্জন বা পরিত্যাগ করাতে সমূহ আফসোস আছে। এর শক্তি বাতিলপন্থীদের নেই।' সহীহ মুসলিম শরীফেও অনুরূপ হাদীস আছে।

মুসনাদ-ই-আহ্মাদের আর একটি হাদীসে আছেঃ 'কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন পাঠকদের আহবান করা হবে। সূরা-ই-বাকারাহ ও সূরা-ই-আলে ইমরান অগ্রে অগ্রে চলবে। মেঘ ছায়া অথবা পাখির ঝাঁকের মত (চলতে থাকবে)। এর বেশ ডাঁটের সঙ্গে বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করবে। সহীহ মুসলিম ও জামে' তিরমিযীতেও এ হাদীসটি আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন।

এক ব্যক্তি নামাযে সূরা-ই-বারাকাহ ও সূরা-ই-আলে ইমরান পাঠ করলেন। তা শেষ করলে পর হযরত কা'ব (রাঃ) বলেনঃ 'যে আল্লাহর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এতে আল্লাহর ঐ নাম রয়েছে যে নাম ধরে প্রার্থনা করলে তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে থাকে।' এখন লোকটি হযরত কা'বের (রাঃ) নিকট আরজ করলেনঃ 'আমাকে বলে দিন ঐ নামটি কি?' হযরত কা'ব (রাঃ) তা অস্বীকার করে বললেনঃ 'যদি আমি বলে দেই তবে ভয় হয় যে, আপনি হয়তো ঐ নামের বরকতে এমন প্রার্থনা করবেন যা আমার ও আপনার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) বলেনঃ 'তোমাদের ভাইকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, যেন মানুষ একটা উঁচু পাহাড়ের উপর চড়ে রয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় দু'টি সবুজ বৃক্ষ রয়েছে এবং ও দুটোর মধ্য হতে শব্দ হচ্ছেঃ তোমাদের মধ্যে কেউ -সূরা-ই-বাকারার পাঠক আছে কি? যখন কেউ বলছে যে, হাঁ আছে, তখন বৃক্ষদ্বয় ফলসহ তার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং এ লোকটি ওদের শাখার উপর বসে যাচ্ছে এবং গাছগুলি তখন তাকে উপরে উঠিয়ে নিচ্ছে।'

হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) বলেন যে, একজন কুরআনের পাঠক তার প্রতি বেশীকে মেরে ফেলে। অতঃপর প্রতিশোধ গ্রহণ আইনে তাকেও মেরে ফেলা হয়। তারপর কুরআন এক একটি সূরা হয়ে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত তার পাশে শধুমাত্র সূরা-ই-বাকারাহ ও সূরা-ই-আলে ইমরান বাকী রয়ে যায়। এক জুমআ'র পরে সূরা-ই-আলে ইমরানও পৃথক হয়ে পড়ে। আবার এক জুমআ' অতিবাহিত হলে দৈব বাণী হয়ঃ 'আমার কথার পরিবর্তন

নেই এবং আমি আমার বান্দাদের উপর আদৌ অত্যাচার করি না।' সুতরাং এই বরকতময় সূরাটিও অর্থাৎ সূরা-ই-বাকারাও পৃথক হয়ে পড়ে। ভাবার্থ এই যে, এই সূরা দু'টি তার পক্ষ থেকে বিপদ ও শাস্তির বাধা স্বরূপ হয়ে থাকে এবং কবরে তাকে পরিতুষ্ট করতে থাকে। সর্বশেষে তার পাপের আধিক্যের ফলে এদের সুপারিশও কার্যকরী হয় না।

ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ জুরশী বলেন যে, এই সূরা দু'টি যে ব্যক্তি দিনে পাঠ করে সে সারা দিন কপটতা থেকে মুক্ত থাকে। আর যে ব্যক্তি রাত্রে তা পাঠ করে সে সারা রাতে কপটতা থেকে মুক্ত থাকে। স্বয়ং হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) সকাল সন্ধ্যায় কুরআন মাজীদ ছাড়াও এ দু'টি সূরাকে সাধারণ অজীফারূপে পাঠ করতেন। হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলতেনঃ ' যে ব্যক্তি এ দু'টি সূরা রাত্রে পাঠ করবে সে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' এর সনদ মুনকাতি'। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সূরা দু'টি (রাত্রির নামাযে) এক রাকাতে পড়তেন।

## সাতটি দীর্ঘ সূরার মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তাওরাতের স্থলে আমাকে দীর্ঘ সাতটি সূরা দেয়া হয়েছে, ইঞ্জীলের স্থলে আমি দু'শো আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ প্রাপ্ত হয়েছি এবং যাবূরের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আমাকে দু'শোর কম বিশিষ্ট সূরাগুলো দেয়া হয়েছে। অতঃপর আমাকে বিশেষ মর্যাদা হিসেবে সূরা-ই-কাফ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলো দেয়া হয়েছে।' এ হাদীসটি গারীব এবং এর এক বর্ণনাকারী সাঈদ বিন আবূ বাশীর সম্পর্কে কিছুটা সমালোচনা রয়েছে। আল্লাহই এ সম্পর্কে খুব ভাল জানেন।

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি এই সাতটি সূরা লাভ করে সে খুব বড় আলেম। এই বর্ণনাটিও গারীব। মুসনাদ-ই-আহমাদেও এ রেওয়ায়েতটি আছে।

একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে এমন একজনকে নেতৃত্ব দান করেন যাঁর সূরা-ই-বাকারাহ মুখস্থ ছিল অথচ বয়সে তিনি সবচেয়ে ছোট ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) নিম্নের وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ (১৫ঃ ৮৭) এ আয়াতের তাফসীরেও বলেন যে, এর ভাবার্থ নিম্নলিখিত সাতটি দীর্ঘ সূরাঃ

(১) সূরা-ই-বাকারাহ্, (২) সূরা-ই- আলে-ইমরান, (৩) সূরা-ই-নিসা, (৪) সূরা-ই-মায়েদা, (৫) সূরা-ই-আন'আম, (৬) সূরা-ই আ'রাফ এবং (৭) সূরা-ই ইউনুস। মুজাহিদ (রঃ), মাকহুল (রঃ), আতিয়্যাহ বিন কায়েস (রঃ), আবূ মুহাম্মদ ফারেসী (রঃ), শাদ্দাদ বিন আউস (রঃ) এবং ইয়াহইয়া ইবনে হারিস জিমারী (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

## সূরাঃ বাকারাহ্ মাদানী

## سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াতঃ ২৮৬, রুকূ'ঃ ৪০) (اٰيَاتُهَا: ٢٨٦، رُكُوْعَاتُهَا: ٤٠)

সূরা-ই-বাকারার সমস্তটাই মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রথম যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, এটাও তন্মধ্যে একটি। তবে অবশ্যই এর وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ (২ঃ ২৮১) এই আয়াতটি সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে একথা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন মাজীদের মধ্যে সবশেষে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভবতঃ তা শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এইভাবে সুদের নিষিদ্ধতার আয়াতগুলোও শেষের দিকে নাযিল হয়েছে। হযরত খালিদ বিন মি'দান সূরা-ই-বাকারাহ্কে فُسْطَاطُ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআনের শিবির বলতেন। কিছু সংখ্যক আলেমের উক্তি আছে যে, এর মধ্যে এক হাজার সংবাদ, এক হাজার অনুজ্ঞা এবং এক হাজার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে দু'শো সাতাশিটি আয়াত আছে। এর শব্দ হচ্ছে ছ'হাজার দুশো একুশটি এবং এতে অক্ষর আছে পঁচিশ হাজার পাঁচশ' টি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মাদানী। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ), হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এবং বহু ইমাম, আলেম এবং মুফাস্সির হতে সর্বসম্মতভাবে এটাই বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা সূরা-ই-বাকারাহ্, সূরা-ই-আলে-ইমরান, সূরা-ই-নিসা ইত্যাদি বল না, বরং এরূপ বল যে, ঐ সূরা যার মধ্যে গাভীর বর্ণনা আছে, ঐ সূরা যার মধ্যে ইমরানের পরিবার পরিজন বা সন্তানাদির বর্ণনা রয়েছে এবং ঐরূপভাবেই কুরআন কারীমের সমস্ত সূরার নাম উল্লেখ কর।' কিন্তু এ হাদীসটি গারীব। বরং এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ হওয়াই সঠিক নয়। এর বর্ণনাকারী ঈসা বিন মাইমূন ও আবূ সালমা খাওমাস দুর্বল। তাদের বর্ণনা দ্বারা সনদ নেয়া যেতে পারে না। এর বিপরীত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'বাত্নে ও'য়াদীতে শয়তানের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। বায়তুল্লাহ তাঁর বাম দিকে ছিল এবং মিনা ছিল ডান দিকে এবং তিনি বলছিলেন, 'এ স্থান হতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন যাঁর উপর সূরা-ই-বাকারাহ অবতীর্ণ হয়েছিল।' যদিও এ হাদীস দ্বারাই পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, 'সূরা-ই-বাকরাহ' ইত্যাদি বলা জায়েয, তবুও আরও কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে।

ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে কিছু অলসতা লক্ষ্য করলেন তখন তিনি তাঁদেরকে يَا أَصْحَابَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ বলে ডাক দিলেন। খুব সম্ভব এটা হুনায়েনের যুদ্ধের ঘটনা হবে। যখন মুসলিম সৈন্যদের পদস্খলন ঘটেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁরেদকে 'হে গাছওয়ালাগণ!' অর্থাৎ 'হে বায়'াতে রিযওয়ান কারীগণ' এবং 'হে সূরা-ই-বাকারাহ ওয়ালাগণ' বলে ডাক দিয়েছিলেন। যেন তাঁদের মধ্যে আনন্দ ও বীরত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সেই ডাক শোনা মাত্রই সাহাবীগণ (রাঃ) চুতর্দিক থেকে বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়ে আসলেন। মুসায়লামা, যে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করেছিল, তার সাথে যুদ্ধ করার সময়েও ইয়ামামার রণ প্রান্তরে বানূ হানীফার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মুসলমানদেরকে বেশ বিচলিত ও সন্ত্রস্ত করেছিল এবং তাঁদের পা টলমল করে উঠেছিল, তখন সাহাবীগণ (রাঃ) এভাবেই লোকদেরকে يَا أَصْحَابَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ বলে ডাক দিয়েছিলেন। সেই শব্দ শুনে সবাই ফিরে এসে একত্রিত হয়েছিলেন, আর এমন শৌর্য ও বীরত্বের সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা সেই ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকেই জয়ী করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সব সময় সন্তুষ্ট থাকুন।

**আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**১। আলীফ-লাম -মীম।**

١- الٓمّٓ ٥

الٓمّٓ -এর মত مُقَطَّعَة বা খণ্ডকৃত অক্ষরগুলো যা অনেক সূরার প্রথমে এসেছে, এগুলোর তাফসীরের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে,ওগুলোর মর্মার্থ শুধুমাত্র আল্লাহ পাকই সম্যক অবহিত। অন্য কেউ এগুলোর অর্থ জানে না। এ জন্যে তারা এ অক্ষরগুলোর কোন তাফসীর করেন না। ইমাম কুরতুবী (রঃ) একথা হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে নকল করেছেন। 'আমির শা'বী (রঃ), সুফইয়ান সাওরী (রঃ) এবং রাবী' বিন খাইসামও (রঃ) এই অভিমতের সমর্থনকারী। আবুল হাতিম বিন হাব্বানও (রঃ) এই মতকে পছন্দ করেন। আবার কতকগুলো লোক এ অক্ষরগুলোরও তাফসীর করে থাকেন এবং তা করতে গিয়ে বিভিন্নরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন। এতে অনেক কিছু মতভেদও পরিলক্ষিত হয়। আবদুর রহমান বিন

যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) বলেন যে, এগুলো সূরাসমূহেরই নাম। আল্লামা আবুল কাসিম মাহমুদ বিন উমার যামাখশারী, তাঁর 'কাশশাফ' নামক তাফসীরে লিখেছেন যে, অধিকাংশ লোক এ কথার উপরই একমত। বিখ্যাত বৈয়াকরণ সিবওয়াইহও এই অভিমত পোষণ করেছেন। এর দলীল সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ঐ হাদীসটি যার মধ্যে এ কথা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জুম'আর দিন ফজরের নামাযে الٓمّٓ السَّجْدَةَ এবং هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ নামক সূরাদ্বয় পড়তেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, الٓمّٓ, الٓمّٓصٓ, حٰمٓ এবং صٓ সব সূরাসমূহের প্রথম অংশ যদ্দ্বারা সূরা আরম্ভ হয়ে থাকে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, الٓمّٓ কুরআনের নামসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নাম। হযরত কাতাদাহ (রঃ) এবং হযরত যায়েদ বিন আসলামেরও (রঃ) উক্তি এটাই। সম্ভবতঃ এ উক্তির মর্ম ও ভাবার্থ হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ বিন আসলামের (রাঃ) উক্তির সাথে মিলে যায় যে উক্তিতে তিনি বলেন যে, এগুলো সূরাসমূহেরই নাম, কুরআন কারীমের নাম নয়। প্রত্যেক সূরাকে কুরআন বলা যেতে পারে, কিন্তু الٓمّٓصٓ পূর্ণ কুরআনের নাম হতে পারে না। কারণ, যখন কোন লোক বলেঃ 'আমি الٓمّٓصٓ পড়েছি' তখন বাহ্যতঃ এটাই বুঝা যাবে যে, সে সূরা-ই-'আরাফ পড়েছে, পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়েনি। আল্লাহ পাকই এসব ব্যাপারে সঠিক ও সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, এগুলো আল্লাহ পাকেরই নাম। হযরত শা'বী (রঃ) হযরত সালিম বিন আবদুল্লাহ (রঃ) এবং ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান সুদ্দী কাবীর (রঃ) একথাই বলে থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, الٓمّٓ আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নাম। অন্য বর্ণনায় আছে যে, حٰمٓ, طٰسٓ এবং الٓمّٓ এসব আল্লাহ পাকের বিশেষ নাম। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। অন্য রেওয়ায়িতে আছে যে, এগুলো আল্লাহর কসম বা শপথ এবং তাঁর নামও বটে। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, এগুলো কসম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, তার অর্থ হচ্ছে اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ অর্থাৎ আমিই আল্লাহ –সবচেয়ে বেশী জান্তা। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রাঃ) থেকেও এটা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার নামের পৃথক পৃথক অক্ষর আছে। আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, اَلِفْ, لَامْ এবং مِيْمْ এই তিনটি অক্ষর আরবী বর্ণনমালার উনত্রিশটি অক্ষরসমূহের অন্তর্গত যা সমস্ত ভাষায় সমভাবে এসে থাকে। ওগুলোর প্রত্যেকটি অক্ষর আল্লাহ তা'আলার এক একটি নামের আদ্যঅক্ষর এবং তাঁর নিয়ামত ও বিপদ আপদের নাম, আর এর

মধ্যে সম্প্রদায়সমূহের সময়কাল ও তাদের আয়ুর বর্ণনা সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) বিস্মিতভাবে বলেছিলেন যে, তারা কি ক'রে অবিশ্বাস করছে! অথচ তাদের মুখে তো আল্লাহর নাম রয়েছে! তাঁর প্রদত্ত আহার্যে তারা লালিত পালিত হচ্ছে!

মহান প্রভুর নাম اَللّٰهُ শব্দটি اَلِف দ্বারা আরম্ভ হয়, لَام দ্বারা তাঁর لَطِيْفٌ নামটি শুরু হয় এবং مِيْم দ্বারা তাঁর مَجِيْدٌ নামটি আরম্ভ হয়। اَلِف অর্থ اٰلَاءٌ অর্থাৎ দানসমূহ, لَام -এর অর্থ আল্লাহ তা'আলার لُطْف অর্থাৎ তাঁর দয়া দাক্ষিণ্য ও করুণা এবং مِيْم -এর অর্থ আল্লাহ পাকের مَجْدٌ অর্থাৎ তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। اَلِف -এর অর্থ এক বছর, لَام এর অর্থ ত্রিশ বছর এবং مِيْم -এর অর্থ চল্লিশ বছর (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এসব মতের মধ্যে সামঞ্জস্য দান করেছেন অর্থাৎ সাব্যস্ত করেছেন যে, এর মধ্যে এমন কোন মতবিরোধ নেই যা একে অপরের উল্টো। হতে পারে যে, এগুলো সূরাসমূহেরও নাম, আল্লাহ তা'আলারও নাম এবং সূরার আদ্য শব্দসমূহও বটে। উহার এক একটি অক্ষর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এক একটি নাম, এক একটি গুণ এবং সময় প্রভৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক একটি শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাবী বিন আনাস এবং আবুল আলিয়াহ্ প্রমুখ সুধীবৃন্দ বলেন যে, এগুলো দ্বারা আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী বা সময়কালও বুঝা যেতে পারে। যেমন اُمَّةٌ শব্দটি। এর একটি অর্থ হচ্ছে 'দ্বীন' বা ধর্ম। যেমন কুরআন মাজীদের মধ্যে আছেঃ

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ

অর্থাৎ 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ ধর্মের উপরই পেয়েছি।' (৪৩ঃ২২) দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে বান্দা। যেমন—আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা।' (১৬ঃ ১২০ তৃতীয় অর্থ হচ্ছে 'দল'। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

وَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ـ

অর্থাৎ 'একদল লোককে দেখতে পেলেন, যারা (পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছিল।' (২৮ঃ ২৩) অন্য স্থানে আছেঃ

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক দলে রাসূল পাঠিয়েছি।' (১৬ঃ ৩৬) চতুর্থ হচ্ছে 'সময়' ও 'কাল' যেমন কুরআন পাকে রয়েছেঃ

وَ قَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ

অর্থাৎ 'উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিত্রাণ পেলো সে বললো এবং বহুদিন পর এটা তার স্মরণ হলো।' (১২ঃ ৪৫)

সুতরাং যেমন এখানে اُمَّةٌ নামক শব্দের কয়েকটি অর্থ হলো, তদ্রূপ এটাও সম্ভব যে, এই حُرُوْفٌ مُقَطَّعَةٌ এরও কয়েকটি অর্থ হবে। ইমাম ইবনে জারীরের (রঃ) এই বিশ্লেষণের বিপক্ষে আমরা বলতে পারি যে, আবুল আলিয়া (রঃ) যে তাফসীর করেছেন তার ভাবার্থ হচ্ছে—একটি শব্দ এক সঙ্গে একই স্থানে এসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর اُمَّةٌ ইত্যাদি শব্দগুলো কয়েকটি অর্থে আসে যাকে আরবী পরিভাষায় اَلْفَاظٌ مُشْتَرَكَةٌ বলা হয়, এগুলোর অর্থ তো অবশ্যই প্রত্যেক স্থলে পৃথক পৃথক হয়। কিন্তু প্রত্যেক স্থলে একটি অর্থ হয়ে থাকে যা রচনা পদ্ধতির ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায়। একই স্থানে সমস্ত অর্থ হতে পারে না এবং একই স্থানে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করার ব্যাপারে উসূল-শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে খুবই মতবিরোধ রয়েছে এবং এটা আমাদের তাফসীরের বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।

দ্বিতীয়তঃ اُمَّةٌ প্রভৃতি শব্দগুলোর অর্থ অনেক এবং এগুলো এজন্যই গঠন করা হয়েছে, আর তা পূর্বের বাক্য ও শব্দের উপর ঠিকভাবে বসে যাচ্ছে। কিন্তু একটি অক্ষরকে এমন একটি নামের সঙ্গে চিহ্নিত করা—যে নাম ছাড়া অন্য একটি নামের উপরও ওটা চিহ্নিত হতে পারে এবং একে অপরের উপর কোন দিক দিয়েই কোন মর্যাদাও নেই, তাহলে এরূপ কথা জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। তবে যদি নকল করা হয়ে থাকে সেটা অন্য কথা। কিন্তু এখানে মতৈক্য না থেকে বরং মতানৈক্য রয়ে গেছে। কাজেই এ ফায়সালা বেশ চিন্তা সাপেক্ষ।

এখন কতকগুলো অরবী কবিতা যা একথার দলীলরূপে পেশ করা হয় যে, শব্দের বর্ণনার জন্যে শুধুমাত্র প্রথম অক্ষরটি বলা হয়ে থাকে, এটা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু ঐ কবিতার মধ্যে এমন বাকরীতি বর্তমান থাকে যা তার অস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। একটা অক্ষর বলা মাত্রই পুরো কথাটি বোধগম্য হয়ে যায়। কিন্তু এখানে এইরূপ নয়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, একটি হাদীসে আছেঃ

مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মুসলমানকে হত্যা করার কাজে অর্ধেক কথা দিয়েও সাহায্য করে' এর ভাবার্থ এই যে, اُقْتُلْ পূর্ণভাবে না বলে শুধুমাত্র اُقْ বলে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সূরাসমূহের প্রথমে

যে অক্ষরগুলো আছে যেমন الٓرٰ، طٰسٓمٓ، حٰمٓ، صٓ، قٓ ইত্যাদি এ সবগুলোই حُرُوْف هِجَا, কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন যে, এই অক্ষরগুলো যা পৃথক পৃথকভাবে ২৮টি আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করে বাকীগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন কেউ বলে থাকেঃ 'আমার পুত্র ا، ب، ت، ث লিখে, তখন ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে, তার পুত্র এ ধরনের ২৮টি অক্ষর লিখে। কিন্তু প্রথম কয়েকটির নাম উল্লেখ করে বাকীগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

পুনরুক্ত অক্ষরগুলোকে বাদ দিয়ে সূরাসমূহের প্রথমে এ প্রকারের চৌদ্দটি অক্ষর এসেছে। অক্ষরগুলো হচ্ছেঃ

ا، ل، م، ص، ر، ك، ه، ى، ع، ط، س، ح، ق، ن

এসব একত্রিত করলে نَصٌّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لَهٗ سِرٌّ গঠিত হয়। সংখ্যা হিসেবে এ অক্ষরগুলো হয় চৌদ্দটি এবং মোট অক্ষর হলো আটাশটি। সুতরাং এগুলো পুরো অর্ধেক হচ্ছে এবং এগুলো পরিত্যক্ত অক্ষরগুলো হতে বেশী মর্যাদাপূর্ণ। এ নিপুণতাও এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যে, যত প্রকারের অক্ষর রয়েছে ততো প্রকারেরই অধিক সংখ্যক এর মধ্যে এসে গেছে। অর্থাৎ-

رِخْوَة ، شَدِيْدَة، مُطْبِقَة، مُفْتُوحَة، مُسْتَعْلِيَة، مُنْخَفِضَة، وَ حُرُوْف قَلْقَلَة، مَجْهُوْرَة، مَهْمُوْسَة.

ইত্যাদি। সুবহানাল্লাহ! প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই বিশ্বপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রকাশ পাচ্ছে। এটা সুনিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ তা'আলার কথা কখনও বাজে ও অর্থহীন হতে পারে না। তাঁর কথা এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কিন্তু কতকগুলো নির্বোধ বলে থাকে যে, এসব অক্ষরের কোন তাৎপর্য বা অর্থই নেই। তারা সম্পূর্ণ ভুলের উপর রয়েছে। ওগুলোর কোন না কোন অর্থ অবশ্যই রয়েছে। যদি নিষ্পাপ নবী (সঃ) হতে তার কোন অর্থ সাব্যস্ত হয় তবে আমরা সেই অর্থ করবো ও বুঝবো। আর যদি নবী (সঃ) কোন অর্থ না করে থাকেন তবে আমরাও কোন অর্থ করবো না, বরং বিশ্বাস করবো যে, তা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দান করেননি এবং আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে অত্যধিক মতভেদ রয়েছে। যদি কারও কোন কথার দলীল জানা থাকে তবে ভাল কথা, সে তা মেনে নেবে। নতুবা মঙ্গল এই যে, এগুলো আল্লাহপাকের কথা তা বিশ্বাস করবে এবং এও বিশ্বাস করবে যে, এগুলোর অর্থ অবশ্যই আছে, যা একমাত্র আল্লাহই জানেন, আমাদের নিকট তা প্রকাশ পায়নি।

এ অক্ষরগুলো আনার দ্বিতীয় হেকমত ও অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, এগুলো দ্বারা সূরাসমূহের সূচনা জানা যায়। কিন্তু এ কারণটি দুর্বল। কেননা এছাড়াও

অন্য জিনিস দ্বারা সূরাগুলোর বিভিন্নতা জানা যায়। আর যে সূরাগুলোর প্রথমে এ অক্ষরগুলো নেই ওগুলোর প্রথম ও শেষ কি জানা যায় না? আবার সূরাগুলোর প্রথমে বিস্‌মিল্লাহর লিখন ও পঠন কি ওগুলোকে অন্য সূরা থেকে পৃথক করে দেয় না? ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এর একটা রহস্য এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু মুশরিকরা আল্লাহর কিতাব শুনতোই না, কাজেই তাদেরকে শুনাবার জন্য অক্ষরগুলো আনা হয়েছে যেন নিয়মিত পাঠ আরম্ভ দ্বারা তাদের মন কিছুটা আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু এ কারণটিও দুর্বল। কেননা, যদি এরূপই হতো তবে প্রত্যেক সূরা এই অক্ষরগুলো দ্বারা আরম্ভ করা হতো, অথচ তা করা হয়নি। বরং অধিকাংশ সূরাই তা থেকে শূন্য রয়েছে। আবার তাই যদি হতো তবে যখনই মুশরিকদের সাথে কথা বলা আরম্ভ করা হতো তখনই শুধু এই অক্ষরগুলো আনা উচিত ছিল, এটা নয় যে, শুধু সূরাগুলো আরম্ভ করার সময়ই এই অক্ষরগুলো আনা উচিত। তাছাড়া এটাও একটা চিন্তা ভাবনার বিষয় যে, এই সূরাটি অর্থাৎ সূরা-ই-বাকারাহ্ এবং এর পরবর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা-ই-আলে ইমরা'ন মদীনা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ এ দুটো সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় মক্কার মুশরিকরা তথায় ছিলই না। তা হলে এ দু'টি সূরার পূর্বে অক্ষরগুলো আসলো কেন? তবে হাঁ, এখানে আর একটি হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, এগুলো আনায় কুরআন মাজীদের একটা মু'জিযা বা অলৌকিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যা আনয়ন করতে সমস্ত সৃষ্টজীব অপারগ হয়েছে। অক্ষরগুলো দৈনন্দিন ব্যবহৃত অক্ষর দ্বারা বিন্যস্ত হলেও তা সৃষ্টজীবের কথা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। মুবার্রাদ (রঃ) ও এবং মুহাক্কিক আলেমগণের একটি দল ফার্রা ও (রঃ) কাতরাব (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

যামাখ্‌শারী (রঃ) তাফসীরী-ই-কাশ্‌শাফের মধ্যে এ কথার সমর্থনে অনেক কিছু বলেছেন। শায়খ ইমাম আল্লামা আবূ আব্বাস হযরত ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) এবং হাফিয মুজতাহিদ আবুল আজ্জাজ মজ্জীও (রঃ) এই ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বরাতে হিকমতটি বর্ণনা করেছেন। যামাখ্‌শারী (রঃ) বলেন যে, সমস্ত অক্ষর একত্রিতভাবে না আসার এটাই কারণ। হাঁ, তবে ঐ অক্ষরগুলোকে বার বার আনার কারণ হচ্ছে মুশরিকদের বার বার অপারগ ও লা-জবাব করে দেয়া, তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। যেমনভাবে কুরআন কারীমের মধ্যে অধিকাংশ কাহিনী ও ঘটনা কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার স্পষ্ট ভাষায় কুরআনের অনুরূপ কিতাব আনার ব্যাপারে তাদের অপারগতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কোন স্থানে শুধুমাত্র একটি অক্ষর এসেছে। যেমন صٓ، نٓ، قٓ কোন কোন স্থানে এসেছে দু'টি অক্ষর, যেমন حٰمٓ, কোন জায়গায় তিনটি অক্ষর এসেছে,

যেমন الٓمٓ, কোন কোন স্থানে চারটি অক্ষর এসেছে, যেমন الٓمٓرٰ ও الٓمٓصٓ এবং কোন কোন জায়গায় এসেছে পাঁচটি অক্ষর যেমন كٓهٰيٰعٓصٓ এবং حٰمٓ عٓسٓقٓ কেননা, আরবদের শব্দগুলো সমস্তই এরকমই এক অক্ষর বিশিষ্ট, দুই অক্ষর বিশিষ্ট, তিন অক্ষর বিশিষ্ট, চার অক্ষর বিশিষ্ট এবং পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট। তাদের পাঁচ অক্ষরের বেশী শব্দ নাই।

যখন এ কথাই হলো যে, এ অক্ষরগুলো কুরআন মাজীদের মধ্যে মু'জিযা বা অলৌকিক স্বরূপ আনা হয়েছে তখন যে সূরাগুলোর প্রথমে এ অক্ষরগুলো এসেছে সেখানে কুরআনেরও আলোচনা হওয়া এবং এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা হওয়া উচিত। হয়েছেও তাই। উনিত্রিশটি সূরায় এগুলো এসেছে। যেমনঃ

الٓمٓ * ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ (২ঃ ১-২)

এখানেও এ অক্ষরগুলোর পরে বর্ণনা আছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অন্য স্থানে আল্লাহপাক বলেছেনঃ

الٓمٓ * اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ـ

অর্থাৎ 'আল্লাহ এমন যে, তিনি ব্যতীত মা'বুদ রূপে গ্রহণযোগ্য আর কেউ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, যাবতীয় বস্তুর সংরক্ষণকারী, তিনি বাস্তব সত্যের সঙ্গে তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন বা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। (৩ঃ ১-৩) এখানেও এ অক্ষরগুলোর পরে কুরআন কারীমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

الٓمٓصٓ * كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ

অর্থাৎ 'এ একটি কিতাব যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তোমার অন্তরে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে।' (৭ঃ ১-২) আর এক জায়গায় আছেঃ

الٓرٰ * كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ 'এ একটি কিতাব, যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষকে তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আন।' (১৪ঃ ১-২) আবার ইরশাদ হচ্ছেঃ

الٓمٓ * تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থাৎ 'এই কিতাব বিশ্বপ্রভুর তরফ হতে অবতীর্ণ হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।' (৩২ঃ ১-২) আল্লাহপাক আরও বলেছেনঃ

حٰمٓ * تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

অর্থাৎ 'পরম করুণাময় অতি দয়ালুর পক্ষ হতে অবতীর্ণ।' (৪১ঃ ১-২) আরও এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

حٰمٓ * عٓسٓقٓ * كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ*

অর্থাৎ 'এরূপে মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছেন।' (৪২ঃ ১-৩) এরকমই অন্যান্য সূরার গোড়া বা সূচনাংশের প্রতি চিন্তা করলে জানা যাবে যে, এসব অক্ষরের পরে পবিত্র কালামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে, যদ্দ্বারা এ কথা ভালভাবে জানা যায় যে, এ অক্ষরগুলো মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপারগতা প্রমাণ করার জন্যেই আনা হয়েছে। আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

কতকগুলো লোক এটাও বলেছে যে, এ অক্ষরগুলো দ্বারা সময়কাল জানান হয়েছে এবং হাঙ্গামা, যুদ্ধ ও এরূপ অন্যান্য কাজের সময় বাতলানো হয়েছে। কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ দুর্বল ও ভিত্তিহীন মনে হচ্ছে। একথার দলীলরূপে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু একদিকে তো তা দুর্বল, অপর দিকে হাদীসটি দ্বারা কথাটির সত্যতার চেয়ে বাতিল হওয়াই বেশী সাব্যস্ত হচ্ছে। ঐ হাদীসটি মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন যিনি সাধারণতঃ মাগাযী বা যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস লেখক। ঐ হাদীসটির মধ্যে আছে যে, আবূ ইয়াসার বিন আখতার নামক একজন ইয়াহূদী একদা তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা-ই-বাকারার প্রথম আয়াত পাঠ করছিলেনঃ

الٓمّٓ * ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

এ শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে তার ভাই হুয়াই বিন আখতাবের নিকট এসে বলেঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সূরা-ই-বাকারার এই প্রথম আয়াতটি পড়তে শুনেছি। সে জিজ্ঞেস করেঃ 'তুমি কি স্বয়ং শুনেছো?' সে বলেঃ 'হ্যাঁ, আমি নিজে শুনেছি।' হুয়াই তার সঙ্গীগণসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি এ আয়াতটি পাঠ করেছিলেন তা কি সত্য?' তিনি বলেন হ্যাঁ, সত্য। সে বলেঃ 'তবে শুনুন! আপনার পূর্বে যতগুলো নবী এসেছিলেন তাঁদের কাউকেই একথা বলা হয়নি যে, তাঁর দেশ ও ধর্মের

অস্তিত্ব কতদিন থাকবে। কিন্তু আপনাকে তা বলে দেয়া হয়েছে।' অতঃপর সে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে বলতে থাকেঃ 'শুনে রাখো! اَلِف -এর সংখ্যা হলো এক, لَام -এর ত্রিশ এবং مِيْم চল্লিশ, একুনে একাত্তর হলো। তোমরা কি সেই নবীর অনুসরণ করতে চাও যাঁর দেশ ও উম্মতের সময়কাল মোট একাত্তর বছর হবে?' অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখোমুখী হয়ে জিজ্ঞেস করেঃ 'এ রকম আর কোন আয়াত আছে কি?' তিনি বলেনঃ হ্যাঁ الٓمٓصٓ, সে বলে 'এটা খুব ভারী ও অত্যন্ত লম্বা। اَلِف -এর এক, لَام -এর ত্রিশ, مِيْم -এর চল্লিশ এবং صَاد এর নব্বই। একুনে হলো একশো একষট্টি বছর।' সে বলেঃ 'এরূপ আরও কোন আয়াত আছে কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ الٓرٰ, সে বলেঃ 'এটাও খুব ভারী ও দীর্ঘ। اَلِف এর এক, لَام -এর ত্রিশ, رَ -এর দু'শো, একুনে দু'শো একত্রিশ বছর হলো। আরও কি এরূপ আয়াত আছে?' তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, الٓمّٓرٰ, সে বলেঃ 'এতো অতিরিক্ত ভারী। اَلِف -এর এক, لَام -এর ত্রিশ, مِيْم -এর চল্লিশ এবং ر -এর দু'শো, একুনে দু'শো একাত্তর হলো। এখনতো মুশকিল হয়ে পড়লো আর কথাও ভুল হয়ে গেল। ও লোকেরা! চল যাই।' আবু ইয়াসির তার ভাই ও অন্যান্য ইয়াহূদী আলেমকে বললোঃ 'কি বিস্ময়জনক ব্যাপার যে, এসব অক্ষরের সমষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে দেয়া হয়েছে একাত্তর, একশো একত্রিশ, দু'শো একত্রিশ, দু'শো একাত্তর, সর্বমোট সাতশো চার বছর হলো। তারা বললোঃ 'কাজ তো এলো মেলো হয়ে গেল।'

কতকগুলো লোকের ধারণা এই যে, নিম্নের আয়াতটি এই লোকদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছিলঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ

অর্থাৎ 'তিনি এমন সত্তা, যিনি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যার একাংশে ঐ আয়াতসমূহ রয়েছে যা অস্পষ্ট মর্ম হতে সংরক্ষিত, এ আয়াতগুলোই কিতাবের মূল ভিত্তি, আর অন্যান্যগুলো অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট।' (৩ঃ ৭) এ হাদীসের স্থিতি সম্পূর্ণরূপে মুহাম্মদ বিন সাইব কালবীর উপর রয়েছে এবং যে হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয়, মুহাদ্দিসগণ তা দলীলরূপে গ্রহণ করেন না এবং করতেও পারেন না। আর যদিও এটা মেনে নেয়া হয় এবং এরকম প্রত্যেক অক্ষরের সংখ্যা বের করা হয় তবে যে চৌদ্দটি অক্ষর আমরা বের করেছি ওগুলোর সংখ্যা অনেক হয়ে যাবে এবং ওগুলোর মধ্যে যে অক্ষরগুলো কয়েকবার এসেছে সেগুলোর সংখ্যা গণনাও কয়েকবার হবে। সুতরাং গণনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

২। এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্মভীরুদের জন্যে এ গ্রন্থ হিদায়াত বা মুক্তিপথের দিশারী।

٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

ইবনু জুরাইজ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে ذٰلِكَ শব্দটি هٰذَا -র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), সুদ্দী (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান, (রঃ) যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) এবং ইবনে জুরাইজেরও (রঃ) এটাই মত। আরবী ভাষায় এই দু'টি শব্দ অধিকাংশই একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। কারণ আরবরা এতদুভয়ের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য করে না। ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) থেকেও এটাই নকল করেছেন। ভাবার্থ এই যে, ذٰلِكَ প্রকৃত পক্ষে দূরের ইঙ্গিতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হচ্ছে 'ঐ' কিন্তু আবার কখনও কখনও নিকটবর্তী বস্তুর জন্যেও আসে। তখন তার অর্থ হবে 'এই'। এখানেও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যামাখ্শারী (রঃ) বলেন যে, এই ذٰلِكَ দ্বারা الٓمّٓ -এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। যেমন নিম্নের এ আয়াতে রয়েছেঃ

لَا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ 'গরুটি বৃদ্ধও নয় আর একেবারে বাচ্চাও নয়, বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান।' (২ঃ ৬৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

অর্থাৎ 'এটা আল্লাহর নির্দেশ, যিনি তোমাদের মধ্যে নির্দেশ দেন।' (৬০ঃ১০) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ ইনিই হলেন আল্লাহ।' এ রকম আরও বহু স্থান আছে যেখানে পূর্বোল্লিখিত বস্তুর দিকে ذٰلِكَ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, এই ذٰلِكَ দ্বারা কুরআন মাজীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে করা হয়েছিল। কেউ তাওরাতের দিকে কেউ ইঞ্জিলের দিকে ইঙ্গিতের কথাও বলেছেন। এই প্রকারের দশটি মত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সির ওগুলোকে দুর্বল বলেছেন।

كِتٰبٌ এর অর্থ কুরআন কারীম। যাঁরা বলেছেন যে, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ বলে তাওরাত ও ইঞ্জিলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাঁরা খুব দূরের রাস্তা অনুসন্ধান

করতে চেয়েছেন অথবা খুব কষ্ট স্বীকার করেছেন। অকারণে এমন কথা বলেছেন যার সুষ্ঠু ও সঠিক জ্ঞান আদৌ তাঁদের নেই। رَيْبٌ -এর অর্থ হচ্ছে সংশয় ও সন্দেহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত আবূ মালিক নাফি' (রঃ), যিনি হযরত ইবনে উমারের কৃতদাস, আতা' (রঃ), আবুল আলিয়া (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ), সুদ্দী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ) এবং ইসমাঈল বিন আবু খালিদ (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বলেন যে, মুফাস্সিরগণের মধ্যে এতে কোন মতভেদ নেই। رَيْبٌ শব্দটি আরবদের কবিতায় অপবাদের অর্থেও এসেছে। যেমন প্রখ্যাত কবি জামীল বলেনঃ

بُثَيْنَةُ قَالَتْ يَا جَمِيلُ اَرَبْتَنِىْ * فَقُلْتُ كِلَانَا يَابُثَيْنَ مُرِيْبٌ

অর্থাৎ 'বুসাইনা বললো–হে জামীল! তুমি আমাকে অপবাদ দিয়েছো। আমি তখন বললাম–হে বুসাইনা! আমরা উভয়েই উভয়ের অপবাদ দানকারী।'

এছাড়া প্রয়োজনের অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরব কবি বলেনঃ

قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلَّ رَيْبٍ * وَ خَيْبَرَ ثُمَّ اَجْمَمْنَا السُّيُوْفَا

অর্থাৎ 'তেহামার নিম্নভূমি থেকে এবং খাইবারের মালভূমি থেকেও সব প্রয়োজন মিটিয়ে নিলাম, অবশেষে তলোয়ার গুটিয়ে নিলাম। তাহলে لَا رَيْبَ فِيْهِ –এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন সূরা-ই-সিজদার মধ্যে আছেঃ (নিশ্চয় এই কুরআন) বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ হতে অবতীর্ণ।' কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা خَبَر হলেও نَهِى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ لَا تَرْتَابُوْا فِيْهِ 'তোমরা এতে আদৌ সন্দেহ করো না।' কোন কোন কার لَا رَيْبَ এর উপরে وَقْف করে থাকেন এবং فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ কে পৃথক বাক্য রূপে পাঠ করেন। কিন্তু لَا رَيْبَ فِيْهِ এর উপর وَقْف করা বা না থামা খুবই উত্তম। কেননা, একই বিষয় এভাবেই সূরা-ই-সিজদার আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে এবং এর মধ্যে তুলনামূলক ভাবে فِيْهِ هُدًى এর চেয়ে বেশী مُبَالَغَة হয়। هُدًى শব্দটি আরবী ব্যাকরণ হিসেবে صِفَت হয়ে مَرْفُوْع হতে পারে এবং حَال হিসেবে مَنْصُوْبও হতে পারে। এ স্থানে হিদায়াতকে মুত্তাকীনের সঙ্গে বিশিষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ ؕ وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

অর্থাৎ 'এই কুরআন ঈমানদারদের জন্যে হিদায়াত ও শিফা বা আরোগ্য স্বরূপ এবং অবিশ্বাসীদের কর্ণ বধির এবং চক্ষু অন্ধ।' (৪১ঃ ৪৪) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

অর্থাৎ 'এ কুরআন ঈমানদারদের জন্যে হিদায়াত ও শিফা বা প্রতিষেধক ও রহমত এবং অত্যাচারী লোকদের শুধু ক্ষয়-ক্ষতি বেড়ে চলেছে।' (১৭ঃ ৮২) এ বিষয়ের আরও ভূরি ভূরি আয়াত রয়েছে এবং এগুলোর ভাবার্থ এই যে, যদিও কুরআন কারীম সকলের জন্যেই হিদায়াত স্বরূপ, তথাপি শুধু সৎ লোকেরাই এর দ্বারা উপকার পেয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ *

অর্থাৎ 'হে লোক সকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ ও অন্তর-রোগের আরোগ্য এসে গেছে, যা মু'মিনদের জন্যে হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ।' (১০ঃ ৫৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হিদায়াতের অর্থ হচ্ছে আলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মুত্তাকীন তাঁরাই যাঁরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ শিরক হতে দূরে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী মেনে চলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মুত্তাকীন তাঁরাই যাঁরা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করতঃ হিদায়াতকে পরিত্যাগ করেন না এবং তাঁর রহমতের আশা রেখে তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করে থাকেন। সুফইয়ান সাওরী (রঃ) ও হযরত হাসান বসরী বলেন, 'মুত্তাকীন তাঁরাই যাঁরা হারাম থেকে বেঁচে থাকেন এবং অবশ্য করণীয় কাজ নত মস্তকে পালন করে থাকেন। হযরত আবূ বাকর বিন আইয়াশ (রঃ) বলেন, 'আমাকে হযরত আ'মাশ (রঃ) প্রশ্ন করেন, 'মুত্তাকী কারা?' আমি উত্তর দেই। তখন তিনি বলেন, 'হযরত কালবী (রঃ) কে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন।' তিনি বলেন-'মুত্তাকীন তাঁরাই যাঁরা কাবীরা গুনাহ থেকে

বেঁচে থাকেন।' এতে দু'জনেই একমত হন।" হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, মুত্তাকীন তাঁরাই যাঁদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের পরে বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ * وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ *

'যারা অদৃষ্ট বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করে এবং যথা নিয়মে নামায কায়েম রাখে, আর আমি তাদেরকে যে সব রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, আর তোমার প্রতি (হে রাসূল) যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতে যারা বিশ্বাস করে এবং আখেরাত সম্বন্ধে যারা দৃঢ় ইয়াকীন রাখে।' (২ঃ ৩-৪)

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেন যে, এসব গুণ মুত্তাকীনের মধ্যে একত্রে জমা হয়। জামে' তিরমিযী ও সুনান-ই-ইবনে মাজার হাদীসে আতীয়াহ সা'দী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'বান্দা প্রকৃত মুত্তাকী হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে ঐ সমুদয় জিনিস ছেড়ে দেয় যাতে কোন দোষ নেই এই ভয়ে যে, দোষের মধ্যে যেন না পড়ে। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে আছে, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে আটক করা হবে সে সময় একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেন, মুত্তাকীন কোথায়? এ ডাক শুনে তাঁরা দাঁড়িয়ে যাবেন এবং আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর বাহুতে নিয়ে নেবেন এবং কোন পর্দা ছাড়াই তাঁদেরকে স্বীয় দর্শন দ্বারা সম্মানিত করবেন। আবূ আফীফ(রঃ) স্বীয় উস্তাদ মুআয (রঃ) কে প্রশ্ন করেনঃ 'জনাব! মুত্তাকীন কে?' তিনি বলেন, যাঁরা শিরক হতে এবং মূর্তিপূজা হতে বেঁচে থাকেন এবং খাঁটি অন্তরে তাঁর ইবাদত করেন, তাঁদেরকেই এরূপ সম্মানের সঙ্গে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।' কখনও কখনও হিদায়াতের অর্থ হয় অন্তরের মধ্যে ঈমানের স্থিতিশীলতা। বান্দার অন্তরে এই হিদায়াতের উপর মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখে না। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হচ্ছেঃ اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! যাকে তুমি হিদায়াত করতে চাও তাকে হিদায়াত করতে পার না।' (২৮ঃ ৫৬) আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ

অর্থাৎ 'তাদেরকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নেই।' (২ঃ ২৭২) অন্য স্থানে তিনি বলেছেনঃ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার পথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই।' (৭ঃ ১৮৬) আর এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অর্থাৎ 'যাকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন সে-ই পথ প্রাপ্ত, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন (হে নবী (সঃ)!) তুমি তার জন্যে কস্মিনকালেও সাহায্যকারী ও পথ প্রদর্শক পাবে না।' (১৮ঃ ১৭)

এই প্রকারের আরও আয়াত আছে। কখনও কখনও হিদায়াতের অর্থ হয়ে থাকে সত্য, সত্যকে প্রকাশ করা এবং সত্য পথ প্রদর্শন করা। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ وَاِنَّكَ لَتَهْدِیْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তুমি সোজা পথ প্রদর্শনকারী।' (৪২ঃ ৫২) অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেছেনঃ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অর্থাৎ 'তুমি তো শুধু ভয় প্রদর্শক এবং প্রত্যেক কওমের জন্যে ভয় প্রদর্শক আছে।' (১৩ঃ ৭) পবিত্র কুরআনের অন্য স্থানে আছেঃ

وَ اَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى

অর্থাৎ 'আমি সামুদ সম্প্রদায়কে সত্য পথ দেখিয়েছি, কিন্তু তারা সত্য পথের পরিবর্তে অন্ধত্বকে পছন্দ করেছে।' (৪১ঃ ১৭) অন্য স্থানে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ অর্থাৎ 'আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গলের পথ।' تَقْوٰى শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে খারাপ বা অপছন্দনীয় জিনিস থেকে বেঁচে থাকা। এটা মূলে ছিল وَقْىٌ যা وِقَايَةٌ হতে নেয়া হয়েছে। কবি নাবিগা যুবিয়ানী বলেনঃ

سَقَطَ النَّصِيْفُ وَ لَمْ تُرِدْ اِسْقَاطَهٗ * فَتَنَاوَلَتْهُ وَ اتَّقَتْنَا بِالْيَدِ

অনুরূপভাবে আরও একজন কবি বলেনঃ

فَاَلْقَتْ قِنَاعًا دُوْنَهُ الشَّمْسُ وَ اتَّقَتْ * بِاَحْسَنِ مَوْصُوْلَيْنِ كَفٍّ وَّ مِعْصَمٍ

অর্থাৎ 'সূর্য কিরণকে আড়াল করে সে (নারী) তার ওড়না নিক্ষেপ করলো আর এভাবে স্বীয় কব্জি ও করতল মিলিয়ে সুন্দরভাবে নিজেকে রক্ষা করলো।'

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হযরত উবাই বিন কা'বকে (রাঃ) প্রশ্ন করেনঃ তাক্ওয়া কি?' তিনি উত্তরে বলেনঃ

'কাঁটাযুক্ত দুর্গম পথে চলার আপনার কোন দিন সুযোগ ঘটেছে কি?' তিনি বলেনঃ 'হাঁ' তখন হযরত উবাই (রাঃ) বলেনঃ 'সেখানে আপনি কি করেন?'

হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ 'কাপড় ও শরীরকে কাঁটা হতে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করি।' তখন হযরত উবাই (রাঃ) বলেনঃ تَقْوٰى ও ঐ রকমই নিজেকে রক্ষা করার নাম। ইবনুল মুআ'য তাঁর নিম্নের কবিতায় এ অর্থই গ্রহণ করেছেনঃ

خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا * وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقٰى
وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْ * ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرٰى
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً * إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصٰى

অর্থাৎ 'ছোট ও বড় পাপসমূহ পরিত্যাগ কর, এটাই তাক্ওয়া। এমনভাবে কাজ কর যেমন বন্ধুর কন্টকাকীর্ণ পথের পথিক যা দেখে সে সম্পর্কে সতর্ক ও সজাগ থাকে। ছোট পাপগুলোকেও হালকা মনে করনা, জেনে রেখো যে, ছোট ছোট নুড়ি পাথর দ্বারাই পর্বত তৈরী হয়ে থাকে।'

হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ) স্বীয় কবিতায় বলেনঃ

يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُؤْتٰى مُنَاهُ * وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا مَا أَرَادَا
يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالِي * وَتَقْوَى اللّٰهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

অর্থাৎ ' মানুষ চায় যে, তার অন্তরের বাসনা কামনা পূরণ হোক, কিন্তু আল্লাহ তা অস্বীকার করেন। শুধু মাত্র সেটাই পূরণ হয় যেটা তিনি চান। মানুষ বলে এটা আমার লাভ আর এটা আমার মাল, কিন্তু আল্লাহর 'তাকওয়াই' হচ্ছে তার লাভ ও মাল থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।'

সুনান-ই-ইবনে মাজার হাদীসে হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ 'মানুষ সর্বোত্তম উপকার যা লাভ করে তা হচ্ছে আল্লাহর ভয়, এর পর সতী সাধ্বী স্ত্রী; স্বামী যখন তার দিকে চায় তখন সে তাকে সন্তুষ্ট করে এবং তাকে যা নির্দেশ দেয় তা সে পালন করে, কোন কসম দিলে তা পূর্ণ করে দেখায় এবং সে অনুপস্থিত থাকলে তার স্ত্রী তার মাল এবং স্বীয় নফসের রক্ষণাবেক্ষণ করে।'

**৩। যারা অ-দৃষ্ট বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে,**

٣- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, সত্য বলে স্বীকার করাকে ঈমান বলে। হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) এটাই বলেন। হযরত যুহরী (রঃ) বলেন যে, 'আমলকে ঈমান বলা হয়। হযরত রাবী' বিন আনাস (রাঃ) বলেন যে, ঈমান

আনার অর্থ হচ্ছে 'অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা'। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এসব মতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এগুলোর একই অর্থ। ভাবার্থ এই যে, তারা মুখের দ্বারা, অন্তর দ্বারা ও আমল দ্বারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভয় রাখে। 'ঈমান' শব্দটি আল্লাহর উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের (আঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা-এ কয়টির সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকে। আমি বলি যে, আভিধানিক অর্থে শুধু সত্য বলে স্বীকার করাকেই ঈমান বলে। কুরআন মাজীদের মধ্যেও এ অর্থের ব্যবহার এসেছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ঈমানদারগণকে সত্য বলে স্বীকার করে।' (৯ঃ ৬১) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভ্রাতাগণ তাঁদের পিতাকে বলেছিলেনঃ

وَ مَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ 'আমরা সত্যবাদী হলেও আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না।' (১২ঃ ১৭)

এভাবে 'ঈমান শব্দটি ইয়াকীনের অর্থেও এসে থাকে যখন ওটা আমলের বর্ণনার সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (১০৩ঃ ৩)

কিন্তু যখন ওটা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হবে তখন ঈমানে শরঈ' হবে-অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকারোক্তি এবং কার্যসাধনা এই তিনের সমষ্টির নাম। অধিকাংশ ইমামের এটাই মাযহাব। ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ), ইমাম আবূ উবাইদাহ (রঃ) প্রভৃতি ইমামগণ একমত হয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মুখে উচ্চারণ করা ও কার্যসাধন করার নাম হচ্ছে ঈমান এবং ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এর প্রমাণ আছে বহু হাদীসে যা আমরা বুখারী শরীফের শরাহ্তে বর্ণনা করেছি।

কেউ কেউ ঈমানের অর্থ করেছেন 'আল্লাহর ভয়।' যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় যারা তাদের প্রভুকে না দেখেই ভয় করে।' (৬৭ঃ ১২) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে না দেখেই ভয় করেছে এবং (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে এসেছে।' (৫০ঃ ৩৩) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে ঈমান ও ইল্মের সারাংশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহকে তাঁর আলেম বান্দাগণই ভয় করে থাকে।' (৩৫ঃ ২৮)

কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা বাহ্যিকভাবে যেমন ঈমান আনে তদ্রূপ ভিতরেও ঈমান এনে থাকে। তারা ঐ মুনাফিকদের মত নয় যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ *

অর্থাৎ 'যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন তারা তাদের শয়তানদের সন্নিকটে একাকী হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা শুধু উপহাস করছিলাম।' (২ঃ ১৪) অন্য জায়গায় মুনাফিকদের অবস্থা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ *

অর্থাৎ 'মুনাফিকেরা যখন তোমার নিকট আগমন করে তখন বলে আমরা (অন্তরের সঙ্গে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল, আর এটা তো আল্লাহ ভালভাবে অবগত আছেন যে, তুমি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরাই মিথ্যাবাদী।' (৬৩ঃ ১)

এই অর্থ হিসেবে بِالْغَيْبِ শব্দটি حَال হবে, অর্থাৎ তারা ঈমান আনয়ন করে এমন অবস্থায় যে, মানুষ হতে তা গোপন থাকে। এখানে আয়াতে যে غَيْبٌ শব্দটি রয়েছে তার অর্থ সম্বন্ধেও মুফাস্সিরগণের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ঐ সবগুলোই সঠিক এবং সব অর্থই নেয়া যেতে পারে। আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উপর, ফেরেশতাদের উপর,

কিতাবসমূহের উপর, কিয়ামতের উপর, বেহেশতের উপর, দোযখের উপর, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কাতাদাহ্ বিন দায়ামারও (রঃ) এটাই মত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঐ সব গোপনীয় জিনিস যা দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। যেমন জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি যা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা এসেছে সবই بِالْغَيْبِ এর অন্তর্গত। হযরত জার (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ কুরআন'। আতা' বিন আবূ রাবাহ্ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীই হচ্ছে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ইসলামের সমুদয় গোপনীয় বিষয়সমূহ। যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ভাগ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন। সুতরাং এ সমস্ত কথা অর্থ হিসেবে একই। কেননা এসব জিনিসই অদৃশ্য এবং بِالْغَيْبِ এর তাফসীরের মধ্যে এসবই জড়িত রয়েছে এবং সবগুলোর উপরেই ঈমান আনা ওয়াজিব।

একদা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) মজলিসে সাহাবীগণের (রাঃ) গুণাবলীর আলোচনা চলছিল। তিনি বলেনঃ যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে দেখেছেন তাঁদের তো কর্তব্যই হলো তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা; কিন্তু আল্লাহর শপথ! ঈমানী মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁরাই উত্তম যাঁরা না দেখেই তাঁকে বিশ্বাস করে থাকেন। অতঃপর তিনি الٓمّٓ থেকে শুরু করে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করলেন'। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ও তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই) ইমাম হাকিম (রঃ) এই বর্ণনাটিকে সঠিক বলে থাকেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যেও এ বিষয়ের একটি হাদীস আছে। ইবনে মাহীরীজ (রঃ) আবূ জুমআ' (রাঃ) নামক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'এমন একটি হাদীস আমাকে শুনিয়ে দিন যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন। তিনি বলেনঃ 'আচ্ছা, আমি আপনাকে খুবই ভাল একটা হাদীস শুনাচ্ছি। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে নাশ্তা করছিলাম। আমাদের সঙ্গে হযরত আবূ উবাইদাহ বিন জাররাহ্ও (রাঃ) ছিলেন। তিনি বলেনঃ ' হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের চেয়েও উত্তম আর কেউ আছে কি? আমরা আপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সঙ্গে ধর্ম যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।' তিনি বলেনঃ 'হাঁ, আছে। ঐ সমুদয় লোক তোমাদের চেয়ে উত্তম যারা তোমাদের পরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা আমাকে দেখতেও পাবে না।'

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে হযরত সা'লিহ বিন জুবাইর (রঃ) বলেন হযরত আবু জুমআ' আনসারী বায়তুল মুকাদ্দাসে আমাদের নিকট আগমন করেন। রিযা বিন হাইঅহ্ও (রাঃ) আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি ফিরে যেতে লাগলে আমরা তাঁকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলি। তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় বলেনঃ 'আপনাদের এই অনুগ্রহের প্রতিদান ও হক আদায় করা আমার উচিত। শুনে রাখুন! আমি আপনাদেরকে এমন একটা হাদীস শুনাবো যা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি।' আমরা বলিঃ 'আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন! আমাদেরকে তা অবশ্যই বলুন'। তিনি বললেনঃ

'শুনুন! আমরা দশজন লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। হযরত মুআয' বিন জাবালও (রাঃ) ছিলেন। আমরা বলিঃ

"হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমাদের চেয়েও কি বড় পুণ্যের অধিকারী আর কেউ হবে? আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার অনুসরণ করেছি। তিনি বললেনঃ "তোমরা কেন করবে না? আল্লাহর রাসূল (সঃ) তো স্বয়ং তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। আকাশ হতে আল্লাহর ওয়াহী তোমাদের সামনেই মুহুর্মুহু অবতীর্ণ হচ্ছে। ঈমান তো ঐ সব লোকের যারা তোমাদের পরে আসবে, তারা দুই জিলদের মধ্যে কিতাব পাবে এবং তার উপরেই ঈমান এনে আমল করবে। তারাই তোমাদের দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী।" এ হাদীসটি তাদের প্রার্থনা কবুল হওয়ার দলীল যাতে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমি এ বিষয়টি বুখারী শরীফের শারাহ্তে খুব স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছি। কেননা পরবর্তীদের প্রশংসা এর উপরে ভিত্তি করেই হচ্ছে এবং এই হিসেবেই তাদেরকে বড় পুণ্যের অধিকারী বলা হয়েছে। নতুবা সাধারণভাবে তো সাহাবীগণই (রাঃ) প্রত্যেক দিক দিয়েই উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তোমাদের মতে ঈমান আনার ব্যাপারে সর্বোত্তম কে?' তাঁরা বলেনঃ 'ফেরেশতাগণ।' তিনি বলেন, 'তারা কেন ঈমান আনবে না? তারা তো প্রভুর নিকটেই আছে।' সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন, 'তারপর নবীগণ (আঃ)।' তিনি বলেন, 'তারা ঈমান আনবে না কেন? তাদের উপর তো ওয়াহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে।' তাঁরা বলেন, 'তাহলে আমরা।' তিনি বলেন, তোমরা ঈমান কবুল কেন করবে না? আমি তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছি। জেনে রেখো, আমার মতে সর্বোত্তম ঈমানদার তারাই হবে যারা তোমাদের পরে আসবে। সহীফাসমূহের মধ্যে তারা

লিখিত পুস্তক পাবে এবং তার উপরেই তারা ঈমান আনবে।' এর সনদে মুগীরা বিন কায়েস রয়েছে। আবূ হাতিম রাযী তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বলে থাকেন। কিন্তু তারই মত একটি হাদীস দুর্বল সনদে 'মুসনাদ-ই-আবূ ইয়ালা', তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এবং মুসতাদরাক-ই-হাকিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এবং হাকীম (রঃ) তাকে সহীহ বলেছেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতেও তারই মত মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত বুদাইলা বিনতে আসলাম (রাঃ) বলেনঃ 'বানু হারিসার মসজিদে আমরা যোহর বা আসরের নামাযে ছিলাম এবং আমাদের মুখ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ছিল। দুই রাকাত পড়েছি এমন সময়ে কোন একজন এসে সংবাদ দিল যে, নবী (সঃ) বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করেছেন। শোনা মাত্রই আমরা ঘুরে গেলাম। স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের জায়গায় চলে আসলো এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের জায়গায় চলে গেল এবং বাকী দুই রাকআত আমরা বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে আদায় করলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেনঃ 'এসব লোক তারাই যারা অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করে থাকে।' এই ইসনাদে এই হাদীসটি গরীব।

---

| | |
|---|---|
| **এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা হতে দান করে থাকে।** | وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ |

---

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'তারা ফরয নামায আদায় করে, রুকূ' সিজদাহ্, তিলাওয়াত, নম্রতা এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত করে।' কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, নামায প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হচ্ছে নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ভালভাবে অযু করা এবং রুকূ' ও সিজদাহ্ যথাযথভাবে আদায় করা। মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, সময়ের হিফাযত করা, পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা 'রুকূ' ও সিজদাহ্ ধীরস্থিরভাবে আদায় করা, ভালভাবে কুরআন পাঠ করা, আত্তাহিয়্যাতু এবং দুরূদ পাঠ করার নাম হচ্ছে ইকামাতে সালাত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -এর অর্থ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মানুষের তার সন্তান সন্ততিকে পানাহার করানো। এটা যাকাতের হুকুমের পূর্বেকার আয়াত।

হযরত যহ্হাক (রাঃ) বলেন যে, সূরা-ই- বারা'আতের মধ্যে যাকাতের যে সাতটি আয়াত আছে তা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই নির্দেশ ছিল যে,বান্দা যেন নিজ সাধ্য অনুসারে কমবেশী কিছু দান করতে থাকে। কাতাদাহ্ (রঃ) বলেনঃ 'এই মাল তোমাদের নিকট আল্লাহর আমানত, অতি সত্বরই এটা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় কর।'

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি সাধারণ। যাকাত, সন্তান সন্ততির জন্যে খরচ এবং যেসব লোককে দেয়া প্রয়োজন এ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যে মহান প্রভু একটা সাধারণ বিশেষণ বর্ণনা করেছেন এবং সাধারণভাবে প্রশংসা করেছেন, কাজেই সব খরচই এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আমি বলি যে, কুরআন কারীমের মধ্যে অধিকাংশ জায়গায় নামায ও মাল খরচ করার বর্ণনা মিলিতভাবে এসেছে। এজন্যে নামায হচ্ছে আল্লাহর হক এবং তাঁর ইবাদত–যা তাঁর একত্ববাদ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর উপর ভরসা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করার নাম। আর খরচ করা হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা–যার দ্বারা তাদের উপকার হয়। এর সবচেয়ে বেশী হকদার হচ্ছে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং দাসদাসী। অতঃপর দূরের লোক এবং অপরিচিত ব্যক্তিরা তার হকদার। সুতরাং অবশ্যকরণীয় সমস্ত ব্যয় ও ফরয যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। (১) আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রেরিতত্বের সাক্ষ্য প্রদান। (২) নামায প্রতিষ্ঠিত করণ। (৩) যাকাত প্রদান। (৪) রমযান শরীফের রোযা পালন এবং (৫) বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ কার্য সম্পাদন। এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে।

আরবী ভাষায় সালাতের অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা। আরব কবিদের কবিতা এর সাক্ষ্য দেয়। সালাতের প্রয়োগ হয়েছে নামাযের উপর যা রুকূ' সিজদাহ এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কতকগুলি কার্যের নাম এবং যা নির্দিষ্ট সময়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত , সিফাত ও পদ্ধতির মাধ্যমে পালিত হয়। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ 'সালাত নামাযকে বলার কারণ এই যে, নামাযী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বীয় কার্যের পুণ্য প্রার্থনা করে এবং তাঁর নিকট তার প্রয়োজন যাচ্ঞা করে। কেউ কেউ বলেছেনঃ 'যে দু'টি শিরা পৃষ্ঠদেশ থেকে মেরুদণ্ডের অস্থির দু দিকে এসে থাকে তাকে আরবী ভাষায় صُلَوَيْن বলা হয়। নামাযের এটা নড়ে থাকে বলে একে صَلٰوة বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথাটি সঠিক নয়। আবার কেউ

কেউ বলেছেন যে, এটা صَلْيٌ হতে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সংলগ্ন ও সংযুক্ত থাকা। যেমন কুরআন মাজীদে আছে لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى অর্থাৎ 'দুর্ভাগা ব্যক্তি ছাড়া কেউই দোযখে চিরকাল থাকবে না।' (৯২ঃ ১৫)

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, যখন কাঠকে সোজা করার জন্যে আগুনের উপর রাখা হয় তখন আরববাসীরা تَصْلِيَةٌ বলে থাকে। নামাযের মাধ্যমে আত্মার বক্রতাকে সোজা করা হয় বলে একে صَلٰوةٌ বলে। যেমন কুরআন মাজীদে আছে–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় নামায নির্লজ্জতা ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখে।' (২৯ঃ৪৫) কিন্তু এর অর্থ প্রার্থনা হওয়াই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও প্রসিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। যাকাত শব্দের আলোচনা ইনশাআল্লাহ পরে আসবে।

---

**৪। এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।**

٤- وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ

---

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'তুমি তোমার প্রভু আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যা কিছু এনেছো এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীগণ (আঃ) যা কিছু এনেছিলো তারা ঐ সমুদয়ের সত্যতা স্বীকার করে। এ নয় যে, কোনটা মানে ও কোনটা মানে না, বরং প্রভুর সমস্ত কথাই বিশ্বাস করে এবং পরকালের উপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' অর্থাৎ পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মীযান ইত্যাদি সমস্তই পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। কিয়ামত দুনিয়া ধ্বংসের পরে আসবে বলে তাকে আখেরাত বলা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে,পূর্বে যাদের অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইত্যাদি বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে, তাদেরই দ্বিতীয় বার এই বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ ঈমানদার আরবেরই মুমিন হোক বা আহ্লে কিতাব হোক বা অন্য যে কোন হোক। মুজাহিদ (রঃ), আবুল আলিয়া (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ) এবং কাতাদার (রঃ) এটাই মত। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ দুটো একই কিন্তু এ

থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে আহ্‌লে কিতাব। এই দুই অবস্থায় وَاوْ টি عَطْف -এর وَاوْ হবে এবং صِفَت -এর عَطْف হবে صِفَت -এর উপর। যেমন–

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى * الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى * وَ الَّذِى قَدَّرَ فَهَدٰى * وَ الَّذِىٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى * (৮৭ঃ ১-৪)

এখানে صِفَت -এর عَطْف হয়েছে صِفَت -এর উপর। এই প্রকারের عَطْف বা সংযোগ কবিদের কবিতাতেও এসেছে। তৃতীয় মত এই যে, প্রথম صِفَت গুলো তো হচ্ছে আরব মুমিনদের এবং

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ *

হতে আহ্‌লে কিতাবের মুমিনদের صِفَت ধরা হবে। কুরআন বিশারদ মনীষী হযরত সুদ্দী (রঃ) এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে নকল করেছেন এবং আল্লামা ইবনে জারীরও (রাঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি এই আয়াতটি এনেছেনঃ

وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ،

অর্থাৎ 'বস্তুতঃ আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ তা'আলার উপর এবং যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ও যা তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে।' (৩ঃ ১৯৮) অনুরূপ ভাবে আরও এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ * وَ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ * اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ *

অর্থাৎ 'যাদেরকে আমি এর পূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম তার উপর তারা ঈমান এনে থাকে এবং যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা বলে- আমরা এর উপর ঈমান আনলাম এবং আমাদের প্রভুর তরফ হতে সত্যরূপে

বিশ্বাস করলাম, আমরা এর পূর্বেই তো মুসলমান ছিলাম। তাদেরকে তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে ও মন্দের পরিবর্তে ভাল করার এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার বিনিময়ে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে।' (২৮ঃ ৫২-৫৪) এ ছাড়া সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তিকে তাঁদের কাজের বিনিময়ে দ্বিগুণ পুণ্য দেয়া হবেঃ (১) ঐ আহলে কিতাব-যে তার নবীর (আঃ) উপর ঈমান এনেছে এবং সেই সঙ্গে আমার উপরও ঈমান রেখেছে। (২) সেই কৃতদাস-যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং স্বীয় মনিবেরও হক আদায় করে। (৩) ঐ ব্যক্তি-যে তার দাসীকে ভালভাবে শিক্ষা দিয়ে তাকে আযাদ করে দেয়, অতঃপর তাকে বিয়ে করে।' ইমাম ইবনে জারীরের (রঃ) এই পার্থক্যের সম্বন্ধ এর দ্বারাও জানা যায় যে, এ সূরার প্রথমে মুমিন ও কাফিরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন কাফিরের দু'টি অংশ আছে, কাফির ও মুনাফিক, তদ্রূপ মুমিনদেরও দু'টি ভাগ রয়েছে, আরবী মুমিন ও কিতাবী মুমিন। আমি বলি-বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, মুজাহিদের একথাটিই সঠিকঃ 'সূরা-ই- বাকারার প্রথম চারটি আয়াতে মুমিনদের আলোচনা আছে, এবং তার পরবর্তী তেরোটি আয়াতে মুনাফিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।' সুতরাং এ চারটি আয়াত প্রত্যেক মুমিনের জন্যে সাধারণ বা সমভাবে প্রযোজ্য। সে আরবী হোক আযমী হোক, কিতাবী হোক, মানবের মধ্যে হোক বা দানবের মধ্যেই হোক না কেন। কারণ, এর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ অন্যের ক্ষেত্রেই একেবারে জরুরী শর্ত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা হতেই পারে না। অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত দেয়া শুদ্ধ নয়, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর ঈমান আনবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। যেমন প্রথম তিনটি পরবর্তী তিনটি ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য নয়। তদ্রূপ, পরবর্তী তিনটিও পূর্ববর্তী তিনটি ছাড়া পরিশুদ্ধ হয় না। এই জন্যে ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ হচ্ছেঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর, তাঁর রাসূলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং পূর্বে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।' অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অত্যাচারী ছাড়া সমস্ত আহলে কিতাবের সঙ্গে ঝগড়ার ব্যাপারে তোমরা উত্তম পন্থা অবলম্বন কর এবং বল-আমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর এবং তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপরও আমরা সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন করছি; আমাদেরও তোমাদের ইবাদতের প্রভু একই।'

পবিত্র কুরআনের আর এক স্থানে ঘোষিত হয়েছেঃ 'হে আহলে কিতাব! তোমাদের উপর আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, এটা তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা স্বীকারকারী।' অন্য জায়গায় আছে, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা কোন জিনিসের উপরই নও যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যা তোমাদের প্রভুর নিকট হতে তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত রাখো।' অন্য জায়গায় সমস্ত ঈমানদারকে সংবাদ প্রদান রূপে কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ 'আল্লাহর রাসূল (সঃ) বিশ্বাস রাখে সেই বিষয়ের প্রতি যা তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এবং মুমিনগণও সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর বার্তাবাহকগণের প্রতি এই মর্মে যে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও কোন পার্থক্য করি না।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেছেনঃ 'যারা আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসূলদের (আঃ) মধ্যে কাউকেও কোন পার্থক্য করে না।' এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে যার মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহর উপর, তাঁর সমস্ত রাসূলের উপর এবং সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনার কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা হয়েছে। আহলে কিতাবের ঈমানদারগণের যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অবশ্য একটা অন্য কথা। কেননা তাদের কিতাবের উপর তাদের ঈমান হয় পূর্ণ পরিণত। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তখন কুরআন কারীমের উপরও তাদের ঈমান পূর্ণ পরিণত হয়ে থাকে। এ জন্যই তারা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হয়। এই উম্মতের লোকেরও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনে বটে, কিন্তু তাদের ঈমান হয় সংক্ষিপ্ত আকারে। যেমন সহীহ হাদীসের মধ্যে আছে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ 'আহলে কিতাব তোমার নিকট কোন সংবাদ প্রচার করলে তোমরা তাকে সত্যও বল না আর মিথ্যাও বল না বরং বলে দাও—যা কিছু আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস করি এবং যা কিছু তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপরও আমরা বিশ্বাস রাখি।' কোন কোন স্থলে এমনও হয়ে থাকে যে, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উপর ঈমান আনে, তুলনামূলকভাবে আহলে কিতাব অপেক্ষা তাদের ঈমানই বেশী পূর্ণ ও দৃঢ় হয়। এই হিসেবে তারা হয় তো আহলে কিতাব অপেক্ষা বেশী পুণ্য লাভ করবে; যদিও তারা তাদের নবীর (আঃ) উপর এবং শেষ নবীর (সঃ) উপর ঈমান আনার কারণে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী। কিন্তু এরা ঈমানের পরিপক্কতার কারণে পুণ্যে তাদেরকেও ছাড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন।

**৫। এরাই তাদের প্রভুর পক্ষ হতে প্রাপ্ত হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এরাই পূর্ণ সফলকাম।**

٥- أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

অর্থাৎ ঐ সব লোক, যাদের গুণাবলী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যেমন অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা, নামায কায়েম করা, আল্লাহর দেয়া বস্তু হতে দান করা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনা, তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা, পরকালের প্রতি বিশ্বাস রেখে তথায় উপকার দেয় এরূপ কাজ করা এবং মন্দ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা। এসব লোকই হিদায়াত প্রাপ্ত, এদেরকেই আল্লাহর নূর ও তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর এ সমুদয় লোকের জন্যেই ইহকালে ও পরকালে সফলতা রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'হিদায়াতের' তাফসীর করেছেন নূর ও দৃঢ়তা দ্বারা এবং 'ফালাহ' -এর তাফসীর করেছেন প্রয়োজন মিটে যাওয়া ও পাপ এবং দুষ্কার্য থেকে বেঁচে যাওয়া ইত্যাদি দ্বারা।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেছেনঃ 'এসব লোক স্বীয় প্রভুর পক্ষ হতে নূর, দলীল, দৃঢ়তা এবং সত্যতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর এরাই তাদের পবিত্র কার্যাবলীর কারণে পুণ্য ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের দাবীদার এবং এরাই শাস্তি হতে দূরে সরে থাকবে।' ইবনে জারীর (রঃ) আরও বলেন যে, দ্বিতীয় أُولَٰٓئِكَ -এর ইঙ্গিত হয়েছে আহলে কিতাবের দিকে, যার صِفَت তার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ হিসেবে وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ প্রথম আয়াত হতে পৃথক হবে এবং مُبْتَدَاء হয়ে مَرْفُوع হবে এবং তার خَبَر হবে أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ কিন্তু তার ইঙ্গিত পূর্বোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারীদের দিকে হওয়াই বেশী পছন্দনীয় মত। তারা আহ্লে কিতাব হোক অথবা আরবের মুমিনই হোক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ আরবের মুমিনগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে এবং তার পরবর্তী বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আহলে কিতাবের মুমিনগণ। অতঃপর এই উভয় দলের জন্যেই শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, এরা হিদায়াত প্রাপ্ত ও সফলকাম। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতগুলো সাধারণ এবং ইঙ্গিত ও সাধারণ। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন।

মুজাহিদ (রঃ) আবুল আলিয়া, (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। একবার কেউ রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে প্রশ্ন করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পবিত্র কুরআনের কতগুলো আয়াত তো আমাদেরকে উৎসাহিত করছে এবং আমাদের মনে অনন্ত আশার সঞ্চার করছে, কিন্তু কতকগুলো আয়াত আবার আমাদের আশা ভরসাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে এবং নৈরাশ্যের সাগরে নিক্ষেপ করছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ 'এসো! আমি তোমাদের জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেই।' অতঃপর তিনি الٓمّٓ হতে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করে বললেনঃ 'এরা তো জান্নাতী।' সাহাবীগণ (রাঃ) খুশী হয়ে বললেনঃ 'আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের আশা আছে যে, আমরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবো।' অতঃপর তিনি اِنَّ الَّذِيْنَ হতে عَظِيْمٌ পর্যন্ত পড়লেন এবং বললেনঃ 'এরা জাহান্নামী।' তাঁরা বললেনঃ 'আমরা এরূপ নই।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'হাঁ' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)।

**৬। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের জন্য সমান—তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।**

٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

অর্থাৎ যারা সত্যকে গোপন করতে অভ্যস্ত এবং তাদের ভাগ্যে এই আছে, তারা কখনও সেই ওয়াহীকে বিশ্বাস করবে না, যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন অন্য এক স্থানে বলা হয়েছেঃ 'যেসব লোকের উপর আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন এসে যায়—যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।' এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা দুষ্টমতি আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলেছেনঃ 'যদিও তুমি আহলে কিতাবের নিকট সমস্ত দলীল-প্রমাণ নিয়ে আস, তথাপি তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না।' অর্থাৎ ঐ অর্বাচীন দুর্ভাগাদের সৌভাগ্য লাভ হবেই না, কাজেই পথভ্রষ্টদের সুপথ প্রাপ্তি কিরূপে হবে? হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের জন্যে আফসোস করো না। তোমার কাজ তো শুধু রিসালাতের হক আদায় করে দেয়া। যারা মেনে নেবে তারা ভাগ্যবান, আর যারা মানবে না, তবে ঠিক আছে, তোমার দায়িত্ব ঠিক মতোই পালন হয়ে গেছে। আমি স্বয়ং অনতি বিলম্বে তাদের হিসাব নিয়ে নেবো। তুমি তো শুধু ভয় প্রদর্শক মাত্র। আল্লাহই প্রত্যেক কাজের সমাধানকারী।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ছিল যে, সবাই যেন ঈমানদার হয়ে যায় এবং হিদায়েত কবূল করে নেয়। কিন্তু মহান প্রভু বলে দিলেন যে, এ সৌভাগ্য প্রত্যেকের জন্যে নয়। এ দান ভাগ করে দেয়া হয়েছে। যার ভাগ্যে এর অংশ পড়েছে আপনা আপনি তোমার কথা মেনে নেবে, আর যে হতভাগা সে কখনও মানবে না। সুতরাং অর্থ এই যে, যারা কুরআন কারীমকে অস্বীকার করে তারা বলেঃ 'আমরা পূর্বের কিতাবগুলোকে মেনে থাকি।' তাদেরকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের কিতাবকেও মানে না। কারণ, তার মধ্যে তোমাকেও মানার অনুরূপ অঙ্গীকার রয়েছে। তাহলে তারা যখন ঐ কিতাব ও ঐ নবীর (আঃ) উপদেশ মানছে না; যাকে তারা মানতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, তখন হে নবী (সঃ)! তোমার কথাকে তারা কি করে মানতে পারে?

আবুল আলিয়ার (রঃ) মত এই যে, এই আয়াতটি খন্দকের যুদ্ধে ঐ নেতৃবর্গের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফরমান রয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ...... الخ (১৪ঃ ২৮)

কিন্তু যে অর্থ আমরা প্রথমে বর্ণনা করেছি সেটাই বেশী প্রকাশমান এবং অন্যান্য আয়াতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। ঐ হাদীসটির উপর পুনরায় চোখ ফিরানো উচিত যা ইবনে আবি হাতিমের উদ্ধৃতি দিয়ে এখনই বর্ণিত হয়েছে। لَا يُؤْمِنُونَ প্রথম বাক্যটির تَاكِيد হয়েছে। অর্থাৎ ভয় দেখানো না দেখানো সমান, কোন অবস্থাতেই তারা ঈমান আনবে না। لَا يُؤْمِنُونَ তার خَبَر হওয়াও সম্ভব। কেননা অনুমিত বাক্য হচ্ছেঃ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ এবং سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ হয়ে যাবে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَة আল্লাহই প্রত্যেক বিষয়ে সবচেয়ে ভাল ও সুষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী।

---

৭। আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।

٧- خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ع

মুফাস্সির হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেছেন যে, خَتَمَ -এর অর্থ মোহর করে দেয়া। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেনঃ 'অর্থাৎ শয়তান তাদের উপর বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং তারা তারই আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তরে ও কানে আল্লাহর মোহর লেগে গেছে এবং চোখের উপর পর্দা পড়ে গেছে। সুতরাং তারা হিদায়াতকে দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না এবং তা বুঝতেও পারছে না!' হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ 'পাপ মানুষের অন্তরে চড়ে বসে এবং তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নেয়। এটাই হচ্ছে মোহর। অন্তর ও কানের জন্যে প্রচলিত অর্থে মোহর ব্যবহৃত হয়।' মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ 'পবিত্র কুরআনে رَانَ - طَبَعَ এবং اَقْفَالٌ এই তিন প্রকারের শব্দ এসেছে। رَانَ শব্দটি طَبَعَ হতে কম এবং طَبَعَ শব্দটি اَقْفَالٌ হতে কম। اَقْفَالٌ সবচেয়ে বেশী।' মুজাহিদ (রঃ তাঁর হাতটি দেখিয়ে বললেনঃ 'অন্তর হাতের তালুর মত। বান্দার পাপের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। বান্দা একটা পাপ করলে তখন তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি বন্ধ হয়ে গেল। দু'টো পাপ করল তখন তার দ্বিতীয় অঙ্গুলিও বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে সমস্ত অঙ্গুলি বন্ধ হয়ে গেল। এখন মুষ্টি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল এবং ওর ভিতরে কোন জিনিস অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। এভাবেই নিরন্তর পাপের ফলে অন্তরের উপর কালো পর্দা পড়ে যায় এবং মোহর লেগে যায়। তখন আর সত্য তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয় না। একে رَيْن ও বলা হয়। ভাবার্থ হলো এই যে, তার অহমিকা, এবং সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি এ কথা শুনা হতে বধির হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য হয় এই যে, অহংকার করে সে এ কথার দিকে কান দেয়নি।'

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেছেন যে, এ অর্থ ঠিক হতে পারে না। কেননা, এখানে তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। যামাখশারী (রঃ) এ খণ্ডনের অনেক কিছু খণ্ডন করেছেন এবং পাঁচটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সবগুলোই নিরর্থক, বাজে এবং মু'তাযেলী হওয়ার ফলে তাঁকে কল্পনার আশ্রয়ে এগুলো বানিয়ে নিতে হয়েছে। কেননা তাঁর কাছে এটা খুবই খারাপ কথা যে, মহান আল্লাহ কারও অন্তরে মোহর করে দেবেন! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি অন্যান্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট আয়াতগুলির উপর আদৌ কোন চিন্তা গবেষণা করেননি। পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'যখন তারা বক্রই রইলো তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে আরও বক্র করে দিলেন।' তিনি আরও বলেছেনঃ 'আমি তাদের অন্তর ও চক্ষুকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেই, যেন তারা প্রথম থেকেই ঈমান আনেনি এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেই যে, তারা অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে থাকে।' এ

ধরনের আরও আয়াত রয়েছে যা স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, তাদের সত্যকে পরিত্যাগ ও মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের উপর মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের অন্তর থেকে হিদায়াত বিদূরিত করেছেন। এটা একটা সরাসরি ও প্রত্যক্ষ সুবিচার আর সুবিচার ভাল বই কোন দিন মন্দ হয় না। যদি যামাখশারীও চিন্তাদৃষ্টি দ্বারা এ আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করতেন তবে তিনি ঐ ব্যাখ্যা দিতেন না। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন।

ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ 'উম্মতের ইজমা আছে যে, মহান আল্লাহ মোহর করাকেও নিজের একটি বিশেষ গুণ রূপে বর্ণনা করেছেন যে, মোহর কাফিরদের কুফরীর প্রতিদান স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেছেনঃ 'বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তার উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।' হাদীসেও আছে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে পরিবর্তন করে থাকেন। প্রার্থনায় আছেঃ 'হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমাদের অন্তরকে আপনার ধর্মের উপর অটল রাখুন।' হযরত হুজাইফা (রাঃ) হতে ফিৎনার অধ্যায়ে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'অন্তরের মধ্যে ফিৎনা এমনভাবে উপস্থিত হয় যেমন ছেঁড়া মাদুরের একটা খড়কুটা। যে অন্তর তা গ্রহণ করে নেয় তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায় এবং যে অন্তরের মধ্যে এই ফিৎনা ক্রিয়াশীল হয় না তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে যায়, আর সেই শুভ্রতা বাড়তে বাড়তে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়ে সমস্ত অন্তরকে আলোকে উদ্ভাসিত করে দেয়। অতঃপর ফিৎনা এই অন্তরের কোন ক্ষতি করতে পারে না। পক্ষান্তরে, অন্য অন্তরে কৃষ্ণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায় এবং শেষে সমস্ত অন্তরকে কালো মসিময় করে দেয়। তখন তা উল্টানো কলসের মত হয়ে যায়, ভাল কথাও তার ভাল লাগে না এবং মন্দ কথাও খারাপ লাগে না।'

ইমাম ইবনে জারীরের (রঃ) ফায়সালা এই যে, হাদীসে এসেছেঃ 'মুমিন যখন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ হয়ে যায়। যদি সে পাপ কার্য হতে ফিরে আসে ও বিরত হয়, তবে ঐ দাগটি আপনি সরে যায় এবং তার অন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর যদি সে গুনাহ করতেই থাকে তবে সেই পাপও ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত অন্তরকে ছেয়ে ফেলে। এটাই সেই মরিচা যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছেঃ 'নিশ্চয় তাদের খারাপ কাজের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে' (সুনান-ই-নাসাঈ, জামে'উত তিরমিযী, তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে জানা গেল যে, পাপের প্রাচুর্য অন্তরের উপর পর্দা ফেলে দেয় এবং এর পরে আল্লাহর মোহর হয়ে যায়।

একেই বলে খাত্‌ম এবং তবা'। এরূপ অন্তরের মধ্যে ঈমান প্রবেশ করার ও কুফর বের হওয়ার আর কোন পথ থাকে না। এই মোহরের বর্ণনাই এই আলোচ্য আয়াতে করা হয়েছে। আর এটা আমাদের চোখের দেখা যে, যখন কোন জিনিসের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়, তখন যে পর্যন্ত মোহর ভেঙ্গে না যায় সে পর্যন্ত তার ভিতরে কিছু যেতেও পারে না এবং তা থেকে কিছু বেরও হতে পারে না। এ রকমই কাফিরদের অন্তরে ও কানে আল্লাহ্‌র মোহর লেগে গেছে, সেই মোহর না সরা পর্যন্ত তার ভিতরে হিদায়াত প্রবেশ করতে পারবে না এবং তা থেকে কুফরও বেরিয়ে আসতে পারবে না। سَمْعِهِمْ -এর উপর পূর্ণ বিরতি আছে এবং عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ পৃথক পৃথক বাক্য। خَتَمَ ও طَبَعَ অন্তর ও কানের উপর হয় এবং غِشَاوَةٌ অর্থাৎ পর্দা চোখের উপর পড়ে। যেমন এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ গণ্যমান্য সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। পবিত্র কুরআনে আছেঃ

فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ (৪২ঃ ২৪)

অন্য স্থানে আছেঃ

وَ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً (৪৫ঃ ২৩)

এই আয়াতগুলোতে অন্তরের ও কানের উপর خَتَمَ -এর উল্লেখ আছে এবং চোখের উপর আছে পর্দার উল্লেখ। তাহলে সম্ভবতঃ তাঁদের নিকট جَعَلَ ক্রিয়াপদ উহ্য আছে এবং وَعَلٰى سَمْعِهِمْ -এর অনুসরণে غِشَاوَةً শব্দটিকে نَصَبَ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কুরআন কারীমের আয়াত وَحُوْرٌ عِيْنٌ -এর মধ্যেও তাই এসেছে। প্রসঙ্গক্রমে আরব কবির একটি কবিতা নিম্নরূপঃ

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا * حَتّٰى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا

এখানে سَقَيْتُهَا উহ্য থেকে مَاءً শব্দকে نَصَبَ দিয়েছে। অনুরূপভাবে আরও একটি কবিতার চরণঃ

وَرَاَيْتُ زَوْجَكَ فِى الْوَغٰى * مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَ رُمْحًا

অর্থাৎ 'আমি তোমার স্বামীকে রণপ্রান্তরে দেখেছি গলায় তলোয়ার লটকানো অবস্থায় এবং কটি দেশে বর্শা বাঁধা অবস্থায়।' এখানেও مُعْتَقِلًا শব্দটি উহ্য থেকে رُمْحًا শব্দকে نَصَبَ দিয়েছে।

সূরার প্রথম চারটি আয়াতে মুমিনদের বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর এই দু'টি আয়াতে কাফিরদের বর্ণনা দেয়া হলো। এখন কপটাচারী মুনাফিকদের বিস্তারিত আলোচনা হতে যাচ্ছে যারা বাহ্যতঃ ঈমানদাররূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও গোপনে গোপনে তারা কাফির। সাধারণতঃ তাদের চতুরতা গোপন থেকে যায় বলে তাদের আলোচনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে হয়েছে এবং তাদের অনেক কিছু নিদর্শনও বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরই সম্বন্ধে সূরা-ই-বারাআত অবতীর্ণ হয়েছে এবং সূরা-ই-নূর প্রভৃতিতে তাদের সম্বন্ধেই আলোচনা রয়েছে যাতে তাদের থেকে পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মুসলমানেরা তাদের জঘন্য ও নিন্দনীয় স্বভাব থেকে দূরে সরে থাকতে পারে। তাই মহান আল্লাহ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ

৮- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮। আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।

৯- يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯। তারা আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে চালবাজি করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা নিজেদের ব্যতীত আর কারও সঙ্গে চালবাজি করে না, অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।

'নিফাক'-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ভাল-র প্রকাশ ও মন্দ গোপন করা। 'নিফাক' দু' প্রকারঃ (১) বিশ্বাস জনিত ও (২) কার্য জনিত। প্রথম প্রকারের মুনাফিক তো চির জাহান্নামী এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিক জঘন্যতম পাপী। ইনশাআল্লাহ আপন জায়গায় এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হবে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, মুনাফিকের কথা তার কাজের উল্টো, তার গোপনীয়তা তার প্রকাশ্যের বিপরীত। তার আগমন তার প্রস্থানের উল্টো এবং উপস্থিতি অনুপস্থিতির বিপরীত হয়ে থাকে। নিফাক ও কপটতা মক্কায় তো ছিলই না, বরং সেখানে ছিল তার বিপরীত। কতকগুলো এমন ছিলেন যাঁরা বাহ্যতঃ ও আপাতঃদৃষ্টিতে কাফিরদের সঙ্গে থাকতেন কিন্তু অন্তরে ছিলেন মুসলমান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করলেন তখন

এখানকার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আনসার উপাধি লাভ করে তাঁর সঙ্গী হলেন ও অন্ধকার যুগের মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে মুসলমান হলেন। কিন্তু ইয়াহূদীরা তখনও যেই তিমিরের সেই তিমিরে থেকে মহান আল্লাহর এ দান হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকলো। তাদের মধ্যে শুধু আবদুল্লাহ বিন সালাম এই সত্য ধর্মের সুশীতল ছায়ায়আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তখন পর্যন্ত মুনাফিকদের জঘন্যতম দল সৃষ্টি হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসব ইয়াহূদী ও আরবের অন্যান্য কতকগুলো গোত্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। এই দল সৃষ্টির সূচনা এইভাবে হয় যে, মদীনা শরীফে ইয়াহূদীদের ছিল তিনটি গোত্রঃ (১) বানূ কাইনুকা, (২) বানূ নাযীর এবং (৩) বানু কুরাইযাহ। বানু কাইনুকা ছিল খাযরাজের মিত্র এবং বাকী দু'টি গোত্র ছিল আউসের মিত্র। যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে জয়যুক্ত করলেন, ইসলামের জয়ডংকা চারদিকে বেজে উঠলো ও তার অপূর্ব দীপ্তি ও জাঁকজমক চতুর্দিকে বিকশিত হয়ে উঠলো, মুসলমানদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কাফিরদের গর্ব খর্ব হয়ে গেল, তখনই এই খবীস দলের গোড়া পত্তন হলো। আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল খাযরাজ গোত্রের লোক হলেও আউসও খাযরাজ উভয় দলের লোকই তাকে খুব সম্মান করতো। এমনকি নিয়মিত আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বাদশাহ বলে ঘোষণা দেওয়ার পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে এই গোত্রের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো। ফলে তার বাদশাহ্ হওয়ার আশার গুড়ে বালি পড়লো। এই দুঃখ পরিতাপ তো তার অন্তরে ছিলই, এদিকে ইসলামের অপ্রত্যাশিত ক্রমোন্নতি আর ওদিকে যুদ্ধের উপর্যুপরি বিজয় দুন্দুভি তাকে একেবারে পাগল প্রায় করে তুললো। এখন সে চিন্তা করলো যে, এমনিতে কাজ হবে না। কাজেই সে ঝট করে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে নিলো এবং অন্তরে কাফির থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। দলের যা কিছু লোক তার অধীনে ছিল তাদেরকেও সে এই গোপন পন্থা বাতলিয়ে দিলো এবং এভাবেই মদীনা ও তার আশে পাশে কপটাচারীদের একটি দল রাতারাতি কায়েম হয়ে গেল। আল্লাহর ফযলে এই কপটদের মধ্যে মক্কার মুহাজিরদের একজনও ছিলেন না, আর থাকবেনই বা কেন? এই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তো নিজেদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও ধনসম্পদ সবকিছু আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সঙ্গে এসেছিলেন! আল্লাহ্ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

এই কপটেরা আউস ও খাযরাজ গোত্রভুক্ত ছিল এবং কতক ইয়াহূদীও তাদের দলে ছিল। এই আয়াতে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের কপটতার বর্ণনা রয়েছে। আবুল আলিয়া (রঃ) হযরত হাসান (রঃ), কাতাদাহ (রঃ) এবং সুদ্দী

(রঃ) এটাই বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব প্রভু আল্লাহ পাক এখানে কপটাচারীদের অনেকগুলো বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন, যেন মুসলমানেরা তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রতারিত না হয় এবং তাদেরকে মুসলমান মনে করে অসতর্ক না থাকে, নচেৎ একটা বিরাট বড় হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, অসৎকে সৎ মনে করার পরিণাম খুবই খারাপ ও ভয়াবহ। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা মুখে তো অবশ্যই স্বীকার করছে, কিন্তু অন্তরে ঈমান নেই। এভাবেই সূরা-ই- মুনাফিকুনের মধ্যেও বলা হয়েছেঃ 'মুনাফিকরা তোমার নিকট এসে বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, তুমি তাঁর রাসূল।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের কথা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না বলেই তাদের জোরদার সাক্ষ্য দান সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করলেন। যেমন তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।' এখানেও বললেনঃ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ 'তারা ঈমানদার নয়।' তারা ঈমানকে প্রকাশ করে ও কুফরীকে গোপন রেখে নিজেদের বোকামী দ্বারা আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে এবং মনে করছে যে, এটা তাদেরকে আল্লাহর কাছে উপকার ও সুযোগ সুবিধে দেবে এবং কতকগুলো মু'মিন তাদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ হবে। কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে আছেঃ 'যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে উত্থিত করবেন সেদিন যেমন তারা দুনিয়ায় মু'মিনদের সামনে কসম করত, আল্লাহর সামনেও তেমনই কসম করবে এবং মনে করবে যে, তারাও কতটা সাবধান! নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।' এখানেও তাদের ভুল বিশ্বাসের পক্ষে তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কার্য্যের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে অবহিতই নয়। এ ধোকা তো তারা নিজেদেরকেই দিচ্ছে। যেমন কালামে পাকের অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ 'নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় এবং তিনিও তাদেরকে ধোঁকা দেন অর্থাৎ ফলাফল দান করেন।

কোন কোন কারী ইয়াখ্দাউনা পড়েছেন আবার কেউ কেউ ইউখাদেউনা পড়েছেন। দুটো কিরাআতেরই ভাবার্থ এক। এখন যদি কেউ পশ্ন করে যে, মুনাফিকরা আল্লাহকে ও মু'মিনদেরকে কেমন করে ধোকা দেবে? ওরা তো মনের বিপক্ষে যা কিছু প্রকাশ করে থাকে তা তো শুধু তাদের নিরাপত্তার খাতিরে। তবে উত্তরে বলা যাবে যে, যে ব্যক্তি কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে এ রকম কথা বলে আরবী ভাষায় তাকে مُخَادِعٌ বা প্রতারক বলা হয়। মুনাফিকরাও হত্যা, বন্দী হওয়া এবং ইহলৌকিক শাস্তি হতে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে এই চালাকি করতো এবং মনের বিপরীত কথা বাইরে প্রকাশ করতো, এজন্যে তাদেরকে প্রতারক বলা হয়েছে। তাদের এ কাজ দুনিয়ার লোককে কিছু

ধোঁকা দিলেও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেকেই ধোঁকা দিচ্ছে। কারণ তার মধ্যে মঙ্গল ও সফলতা রয়েছে বলে তারা মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা শাস্তি ও আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে এবং তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যা তাদের সহ্য করার ক্ষমতা হবে না। সুতরাং এই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা তাদের অশান্তির কারণ হবে, যে কাজের পরিণাম তারা নিজেদের জন্যে ভাল মনে করছে তা তাদের জন্যে অত্যন্ত খারাপ হবে। তাদের কুফরী, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের কারণে তাদের প্রভু তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাদের বোধশক্তিই নেই। তারা ভুল ধারণাতেই মত্ত রয়েছে।

ইবনে জুরাইয (রঃ) এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা মুখে প্রকাশ করে তারা জীবনের নিরাপত্তা কামনা করে। এই কালেমাটি তাদের অন্তরে স্থান পায় না। হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের অবস্থা এই-ইঃ তাদের মুখ পৃথক, অন্তর পৃথক, কাজ পৃথক, বিশ্বাস পৃথক, সকাল পৃথক, সন্ধ্যা পৃথক, তারা নৌকার মত যা বাতাসে কখনও এদিকে ঘুরে কখনও ওদিকে ঘুরে।

| | |
|---|---|
| **১০। তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, পরন্তু আল্লাহ তাদের পীড়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলতো।** | ١٠- فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ○ |

পীড়ার অর্থ এখানে সংশয় ও সন্দেহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত আবুল আলিয়া (রঃ), হযরত রাবী' বিন আনাস (রঃ) এবং হযরত কাতাদারও (রঃ) এটাই মত। হযরত ইকরামা (রঃ) এবং হযরত তাউস (রঃ) এর তাফসীর করেছেন 'রিয়া' বা কৃত্রিমতা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এর তাফসীর 'নিফাক' বা কপটতাও বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) বলেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় রোগ, শারীরিক রোগ নয়। ইসলাম সম্পর্কে তাদের সংশয় ও সন্দেহজনিত একটা বিশেষ রোগ ছিল, আল্লাহ তাদের সেই রোগ বাড়িয়ে দিলেন। যেমন কুরআন মাজীদে আছেঃ 'ঈমানদারদের ঈমান আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তারা এতে আরও আনন্দ উপভোগ করে; আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদের এই অশ্লীলতা ও

অপবিত্রতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।' অর্থাৎ তাদের পাপ ও গুমরাহী আরও বেড়ে যায় এবং এই প্রতিদান তাদের কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপুর্ণ।

এই তাফসীরই উত্তম। এই ফরমানও ঠিক এরই মতঃ '(আল্লাহ্) হিদায়াত প্রাপ্তদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে পরহেযগারী দান করেন।' কারীগণ ইয়াকযেবূনকে ইউকায্যেবূনাও পড়েছেন। মুনাফিকদের মধ্যে এই বদ অভ্যাস ছিল যে, তারা মিথ্যা কথাও বলতো এবং অবিশ্বাসও করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুনাফিকদেরকে চেনা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করেননি। এর কারণ এই যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমারকে (রাঃ) বলেনঃ 'মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সঙ্গীগণকে হত্যা করে থাকেন এ চর্চা হওয়াটা আমি আদৌ পছন্দ করি না।' ভাবার্থ এই যে, কপটদেরকে তাদের অন্তরের কুফরীর জন্যে যে হত্যা করা হয়েছে, আশে পাশের মরুচারী বেদুঈনদের এটা জানা থাকবে না। তাদের দৃষ্টি তো শুধু বাহ্যিকের উপরই থাকবে। সুতরাং যখন তাদের মধ্যে এ সংবাদ প্রচারিত হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের সঙ্গীগণকে হত্যা করেছেন তখন তারা হয়তো ভয়ে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ 'আমাদের আলেমদেরও এটাই মত।' ঠিক এরূপভাবেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুআল্লাফাতে কুলূবকে (অর্থাৎ যাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হতো) মালধন দান করতেন, যদিও তিনি তাদের খারাপ আকীদা সম্পর্কে অবহিত থাকতেন।

হযরত ইমাম মালিকও (রঃ) মুনাফিকদের হত্যা না করার কারণ এটাই বর্ণনা করেছেন। যেমন মুহাম্মদ বিন জাহাম (রঃ), কাযী ইসমাঈল (রঃ) এবং আবহারী (রঃ) নকল করেছেন। হযরত ইবনে মাজেশূনের (রঃ) কথায় একটি কারণ এও নকল করা হয়েছেঃ 'নবী (সঃ)-এর উম্মত যেন জানতে পারে যে, বিচারক নিজের অবগতির উপর ফায়সালা করতে পারেন না, মুনাফিকদেরকে হত্যা না করার এটাও ছিল অন্যতম কারণ।' অন্যান্য ধর্মীয় নীতির ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে সবাই একমত যে, বিচারক শুধু নিজের অবগতির উপর ভিত্তি করে কাউকে হত্যা করতে পারেন না। হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) আরও একটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেনঃ 'মুনাফিকরা নিজেদের ঈমানের কথা মুখে প্রকাশ করতো বলেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত ছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে, তাদের অন্তর এর বিপরীত, কিন্তু এ প্রকাশ্য কথাই হত্যা করার সিদ্ধান্তকে দূরে সরিয়ে রাখতো।' একথার সমর্থনে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ইত্যাদির বিশুদ্ধ হাদীসও পেশ করা যেতে পারে।

একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। যখন তারা এটা বলে দেবে তখন তারা তাদের জান ও মাল আমার কাছ থেকে বাঁচিয়ে নেবে এবং তাদের হিসাব মহাসম্মানিত আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে।' উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর ইসলামের প্রকাশ্য নির্দেশাবলী চালু হয়ে যাবে। এখন যদি তাদের আন্তরিক বিশ্বাসও এর অনুরূপ হয় তবে তো এটা আখেরাতে তাদের মুক্তির কারণ হবে, নতুবা এটা সেখানে কোনই উপকারে আসবে না। কিন্তু দুনিয়ার বুকে তাদের উপর অন্যান্য মুসলমানদের আইন চালু থাকবে। এসব লোকের নাম ধাম এখানে যদিও মুসলমানদের নামের তালিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আখেরাতে ঠিক পুলসিরাতের উপর মুসলমানদের মধ্য হতে তাদেরকে দূরে পৃথক করে দেয়া হবে। তখন তারা অন্ধকারে বিচলিত হয়ে উচ্চশব্দে মুলমানদেরকে ডাক দিয়ে বলবেঃ 'আমরা কি তোমাদেরই সঙ্গে একত্রে ছিলাম না?' উত্তর আসবেঃ 'ছিলে বটে, কিন্তু তোমরা কপটতার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে এবং অপেক্ষমান ও সন্দিহান থেকে প্রবৃত্তির ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলে, ঠিক এমতাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে।' মোট কথা, পরকালেও মুনাফিকরা মুসলমানদের পিছনে থেকে তাদেরকে জড়িয়ে থাকতে সচেষ্ট হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে।, তাদের মধ্যে ও তাদের আশা আকাংখার মধ্যে বাধার বিন্ধ্যাচল সৃষ্টি হয়ে যাবে, তারা মুসলমানদের সঙ্গে সিজদায় পড়ে যাবে, কিন্তু সিজদা করতে সক্ষম হবে না। যেমন এটা হাদীসসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বিশ্লেষণকারীর মতে তাদেরকে হত্যা না করার কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) বিদ্যমানতায় তাদের দুষ্টুমি মারাত্মক ধরনের কোন ক্ষতির কারণ ছিল না। কেননা, মহান আল্লাহ ওয়াহীর দ্বারা মুসলমানদেরকে তাদের দুষ্টুমি হতে রক্ষা করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সঃ) পরে আল্লাহ না করুন, যদি এরূপ লোক থাকে যাদের কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং মুসলমানেরা ভালভাবে জানতে পারে তবে তাদেরকে হত্যা করে দেয়া উচিত হবে। ইমাম মালিকের (রঃ) মতে নিফাক ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সোনালী যুগে। কিন্তু আজকাল আছে 'যিনদাকাহ' বা ধর্মহীনতা এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসহীনতা। 'যিন্দীক' বা আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, তাদের কুফরী প্রকাশ পেলে তাদেরকে হত্যা করার কথা বলা হবে কি না? আর যে যিন্দীকরা অন্য মানুষকে তার শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং যারা শিক্ষা দেয় না তাদের মধ্যে কোন পার্থক্যের সীমারেখা টানতে হবে কি? এই কুফরী কয়েকবার প্রকাশ পেলেও কি এই নির্দেশ? কিংবা একবার হলেও কি এই নির্দেশ? আবার এ ব্যাপারেও মতভেদ আছে যে, এই ইসলাম গ্রহণ বা এই কুফরী হতে প্রত্যাবর্তন স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে হলে বা

তাদের উপর বিজয় লাভের পর হলে কি এ নির্দেশই থাকবে? মোট কথা এসব বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু ঐগুলো বর্ণনার জায়গা হচ্ছে আহকামের কিতাবসমূহ, তাফসীর নয়। সুতরাং আমরাও তা আর বর্ণনা করতে চাইনে।

চৌদ্দজন প্রধান ও কুখ্যাত লোকের 'নিফাক' রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিশ্চিত রূপেই জানতেন। এসব কলুষিত লোক তারাই ছিল যারা তাবূকের যুদ্ধে পরস্পরের সুপরিকল্পিত পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে প্রতারণা করবেই। তারা তাঁকে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এঁটেছিল যে, রাতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে যখন তিনি অমুক ঘাঁটির নিকটবর্তী হবেন তখন তাঁর উষ্ট্রিকে তারা তাড়া করবে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘাঁটির মধ্যে পড়ে যাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীকে (সঃ) তাঁর ওয়াহীর মাধ্যমে এই মারাত্মক জঘন্য কপটতার কথা জানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুজাইফাকে (রাঃ) ডেকে এ ঘটনার সংবাদ দেন, এমন কি এক এক করে ঐ কপটদের নাম পর্যন্তও তিনি বলে দেন। তথাপি তিনি উপরোক্ত কারণে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ জারী করলেন না। এরা ছাড়া অন্যান্য মুনাফিকদের নাম তাঁর জানা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ .... الخ

অর্থাৎ 'তোমাদের আশে পাশের কতকগুলো বেদুঈন হচ্ছে মুনাফিক এবং কতক (দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফিক) মদীনাতেও আছে, তোমরা তাদেরকে জান না, কিন্তু আমি তাদেরকে জানি।' (৯ঃ ১০১) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا * مَّلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَ قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا *

অর্থাৎ 'এই নাপাক অন্তর বিশিষ্ট বিবাদী ও অহংকারী মুনাফিকরা যদি তাদের দুষ্টুমি থেকে বিরত না হয় তবে আমিও তাদের ছেড়ে দেবো না এবং তারা মদীনার মাটিতে আশে পাশে খুব কমই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের উপর অভিশাপ দেওয়া হবে, যেখানেই পাওয়া যাবে তাদেরকে মারা ও ধরা হবে এবং টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে।' (৩৩ঃ ৬০-৬১)

এই আয়াতগুলো থেকে জানা গেল যে, ঐ মুনাফিকরা কে কে ছিল, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তা জানতেন না। তবে তাদের নিন্দনীয় স্বভাবের যে বর্ণনা দেয়া

হয়েছিল তা যাদের মধ্যে পাওয়া যেতো, তাদের উপর নিফাক প্রযোজ্য হতো। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবেই বলেছেনঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ

অর্থাৎ 'আমি যদি ইচ্ছে করি তবে তোমাকে আমি তাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তুমি নিশান ও কথাবার্তার মধ্যেই তাদেরকে চিনে নেবে।' (৪৭ঃ ৩০)

এই কপটাচারী মুনাফিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল। হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) তার কপটতাপূর্ণ স্বভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে সাক্ষ্য দানও করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এ সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যখন সে মারা যাচ্ছে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায পড়েছেন। এবং অন্যান্য মুসলমান সাহাবীদের (রাঃ) মত তারও দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করেছেন। এমন কি হযরত উসমান (রাঃ) যখন একটু জোর দিয়ে তার কপটতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তখন তিনি বলছেনঃ 'আরবের লোক সমালোচনা করবে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সহচরগণকে হত্যা করে থাকেন, এ আমি চাই না।'

সহীহ হাদীসের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বা না করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।' কিন্তু আমি ক্ষমা প্রার্থনা করাকেই পছন্দ করেছি।' অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি যদি জানতাম যে সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে মার্জনা করা হবে, তবে আমি অবশ্যই তার অধিকই করতাম।

১১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করো না, তখন তারা বলে আমরা তো শুধু শান্তি স্থাপনকারীই।

١١- وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ○

১২। সাবধান! নিশ্চয় তারাই অশান্তি উৎপাদনকারী কিন্তু তারা বুঝে না।

١٢- أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতেও মুনাফিকদের বর্ণনা রয়েছে এবং এই ধূলির ধরণীতে তাদের বিবাদ বিপর্যয় সৃষ্টি, কুফর এবং অবাধ্যতা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করা হচ্ছে। অর্থাৎ এ দুনিয়ায় আল্লাহর অবাধ্য হওয়া এবং অপরকে নাফরমান ও অবাধ্য হওয়ার আদেশ করাই হচ্ছে দুনিয়ার বুকে বিবাদ সৃষ্টি করা। আর যমীন ও আসমানের শান্তি রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা হতে বিরত থাকতে বলা হয়, তখন তারা বলে 'আমরা তো সঠিক সনাতন পথের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।'

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেনঃ 'এই স্বভাবের লোক আজ পর্যন্ত আসেনি।' ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় তো এরূপ বদ স্বভাবের লোক বিদ্যমান ছিলই কিন্তু এখন যারা আসবে তারা ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। এটা যেন মনে না করা হয় যে, হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেনঃ 'এরূপ বদ স্বভাবের জঘন্য লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে ছিলই না।' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, ঐ মুনাফিকদের বিবাদ ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে তারা এসব কাজ করতো যা করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁর ফরযগুলোও তারা হেলা করে নষ্ট করতো। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তা'আলার সত্য ধর্মের প্রতি তারা সন্দেহ পোষণ করতো এবং তাঁর সত্যতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতো না। মুমিনদের কাছে আসলে তাদের ঈমানের কথা তারা প্রচার করতো অথচ তাদের অন্তর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) সম্বন্ধে সন্দেহে পরিপূর্ণ ছিল। তারা সুযোগ সুবিধা পেলেই আল্লাহর শত্রুদের সাহায্য ও সহায়তা করতো এবং তাঁর সৎ বান্দাদের বিরুদ্ধাচরণ করতো। আর এতসব করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে শান্তিকামী মনে করতো। কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাকেও কুরআন মাজীদে ফাসাদ বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۭاِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ *

অর্থাৎ 'কাফিররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু, যদি তোমরা এরূপ না কর (অর্থাৎ যদি ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর) তবে যমীনের বুকে ভীষণ হাঙ্গামা ও গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়বে।' (৮ঃ ৭৩)

এই আয়াতটি মুসলমানও কাফিরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেনঃ

يَايُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا *

অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি নিজেদের প্রতিকূলে আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে নিতে চাও' (৪ঃ ১৪৪) অর্থাৎ তোমাদের মুক্তির সনদ কেটে যাক এই কি তোমরা চাও? অতঃপর তিনি আরও বলেছেনঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا *

অর্থাৎ 'মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তোমরা তাদের জন্যে কখনই কোন সাহায্য সহায়তাকারী পাবে না।' (৪ঃ ১৪৫)

মুনাফিকদের বাহ্যিক আচরণ ভাল ছিল বলে মুসলমানদের নিকট তাদের প্রকৃত অবস্থা গোপন থেকে যায়। তারা মু'মিনগণকে মুখমিষ্টি অথচ অবাস্তব কথা দিয়ে ধোঁকা দেয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী ও কাফিরদের কাছে তাদের গোপন বন্ধুত্বের ফলে মুসলমানগণকে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং বিবাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী এই মুনাফিকরাই। অতএব যদি এরা কুফরের উপরেই কায়েম থাকতো তবে তাদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও গভীর চতুরতা কখনও মুসলমানদের জন্য এত ক্ষতিকর হতো না। আর যদি তারা পূর্ণ মুসলমান হয়ে যেতো এবং ভিতর ও বাহির তাদের এক হতো তবে তারা এই নশ্বর দুনিয়ার নিরাপত্তা লাভের সাথে সাথে আখেরাতের মুক্তি ও সফলতার অধিকারী হয়ে যেতো। এত ভয়াবহ পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যখন তাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেঃ আমরা তো শান্তি স্থাপনকারী,আমরা কারও সাথে বিবাদ করতে চাইনে। আমরা মু'মিন ও কাফির এই দুই দলের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে ঐক্য বজায় রাখতে চাই।' হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা বলতোঃ 'আমরা দুই দল অর্থাৎ মুসলমান ও আহলে কিতাবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী।' কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন যে, এ শুধু তাদের মুর্খতা। যাকে তারা সন্ধি বলছে এটাই তো প্রকৃত বিবাদ। কিন্তু তাদের বোধশক্তি নেই।

| | |
|---|---|
| ১৩। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়-লোকে যেরূপ বিশ্বাস করেছে তোমরাও তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন কর; তখন তারা বলে-নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেরূপ বিশ্বাস করবো? সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই নির্বোধ কিন্তু তারা অবগত নয়। | ١٣- وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○ |

ভাবার্থ এই যে, যখন এই মুনাফিকদেরকে সাহাবীদের (রাঃ) মত আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের (আঃ) উপর ঈমান আনতে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং বেহেশত ও দোযখের সত্যতা স্বীকার করতে ও রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য বরণ করতে ভাল কাজ করতে ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন এই অভিশপ্ত দলটি এরূপ ঈমান আনাকে নির্বোধদের ঈমান আনা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), আবদুর রহ্মান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) প্রমুখও এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। سُفَهَآءُ শব্দটি سَفِيْهٌ শব্দের বহুবচন যেমন حَكِيْمٌ শব্দের বহুবচন حُكَمَآءُ, عَلِيْم শব্দের বহুবচন عُلَمَآءُ এসে থাকে। মূর্খ, দুর্বল অভিমত, স্বল্পজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং যারা লাভ ক্ষতি মাসলিহাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে.না তাদেরকে سَفِيْه বলা হয়। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আছেঃ

وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا

অর্থাৎ 'তোমরা অল্প বুদ্ধিসম্পন্নদেরকে স্বীয় মাল প্রদান করো না যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে জীবন ধারণের উপরকণ করে দিয়েছেন।' (৪ঃ ৫) সাধারণ মুফাস্সিরগণের অভিমত এই যে, এই আয়াতে سُفَهَآءُ -এর ভাবার্থ হচ্ছে নারীগণ ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। ঐ মুশরিকদের উপর এখানেও বিশ্বপ্রভু আল্লাহ জোর দিয়ে বলছেন যে, নির্বোধ তো এরাই, কিন্তু সাথে সাথে তারা এতই গণ্ডমূর্খ যে, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার অনুভূতিও রাখে না এবং মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা অনুধাবনও করতে পারে না। এর চেয়ে বেশী তাদের অন্ধত্ব, দৃষ্টিহীনতা এবং সুপথ থেকে দূরে সরে থাকা আর কি হতে পারে?

১৪। এবং যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয়, তখন বলে—আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা বিদ্রূপ ও প্রহসন করে থাকি।

١٤- وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ○

১৫। আল্লাহ তাদের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছেন এবং তাদেরকে ঢিল দিচ্ছেন, ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।

١٥- اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

ভাবার্থ এই যে এসব মুনাফিকগণ মুসলমানদের নিকট এসে নিজেদের ঈমান, বন্ধুত্ব ও মঙ্গল কামনার কথা প্রকাশ করে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে চায়, যাতে জান ও মালের নিরাপত্তা এসে যায় এবং যুদ্ধলব্ধ মালেও ভাগ পাওয়া যায়। আর যখন নিজেদের দলে থাকে তখন তাদের হয়েই কথা বলে। خَلَوْا শব্দের অর্থ এখানে اِنْصَرَفُوْا - ذَهَبُوْا - خَلَصُوْا এবং مَضَوْا অর্থাৎ তারা প্রত্যাবর্তন করে, পৌঁছে, গোপনে বা নিভৃতে থাকে এবং যায়। সুতরাং خَلَوْا এখানে اِلٰى -এর সঙ্গে مُتَعَدِّىْ হয়ে 'ফিরে যাওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, اِلٰى-এর অর্থ হচ্ছে مَعَ, কিন্তু প্রথমটিই সঠিক। ইবনে জারীরের (রঃ) কথার সারাংশ এটাই। شَيَاطِيْن -এর অর্থ হচ্ছে নেতা, বড় দলপতি এবং সর্দার। যেমন 'আহ্বার' বা ইয়াহূদী আলেমগণ, কুরায়েশ কাফিরদের সর্দারগণ এবং কপটগণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের (রাঃ) মতে شَيَاطِيْن হচ্ছে তাদের প্রধান, কাফির সর্দারগণ এবং তাদের সমবিশ্বাসী লোকও বটে। এই ইয়াহূদী নেতারাও নবুওয়াতকে অবিশ্বাস করার এবং কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরামর্শ দিতো। মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ شَيَاطِيْن -এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের সাথী সঙ্গী। তারা হয় মুশরিক ছিল,

না হয় মুনাফিক ছিল। কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঐসব লোক খারাপ কাজ ও শিরকের কাজে তাদের সর্দার ছিল। আবুল আলিয়া (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং রাবী' বিন আনাসও (রঃ) এ তাফসীরই করে থাকেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক পথভ্রষ্টকারী ও অবাধ্যকে شَيْطَانْ বলা হয়। তারা জ্বিন বা দানব থেকেই হোক অথবা মানব থেকেই হোক। কুরআন কারীমের মধ্যেও এসেছেঃ

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ (৬ঃ ১১২)

হাদীস শরীফে এসেছেঃ 'আমরা জ্বিন ও মানুষের শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

হযরত আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ ' হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কি শয়তান আছে? তিনি উত্তরে বলেনঃ 'হাঁ' যখন এই মুনাফিকরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলেঃ 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি, অর্থাৎ যেমন তোমরা, তেমনই আমরা, আমরা তো তাদেরকে উপহাস করছিলাম।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত রাবী' বিন আনাস (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) -এর তাফসীরও এটাই। মহান আল্লাহ তাদেরকে উত্তর দিতে গিয়ে তাদের প্রতারণামূলক কার্যের মুকাবিলায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে উপহাস করবেন এবং অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে দেবেন। যেমন কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আছেঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ-

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন মুনাফিক নর ও নারী মুমিনদেরকে বলবে, একটু থামো, আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা একটু উপকার গ্রহণ করি। বলা হবে– পিছনে ফিরে আলো অনুসন্ধান কর, ফিরা মাত্রই মধ্যস্থলে একটি প্রাচীরের আড়াল দেয়া হবে, যার মধ্যে দরজা থাকবে, এর এদিকে থাকবে রহমত এবং ওদিকে থাকবে শাস্তি।' (৫৭ঃ ১৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা করেছেনঃ

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا-

অর্থাৎ 'কাফিরেরা যেন আমার ঢিল দেয়াকে তাদের জন্যে মঙ্গলজনক মনে না করে, তাদের পাপ আরও বেড়ে যাক এজন্যেই আমি তাদের ঢিল দিচ্ছি।' (৩ঃ ১৭৮) সুতরাং কুরআন মাজীদের যেখানেই خُدِيعَتٌ - سُخْرِيَتٌ - اِسْتِهْزَاءٌ ইত্যাদি শব্দগুলো এসেছে সেখানেই ভাবার্থ হবে এটাই। অন্য একদল বলেন যে, এসব শব্দ শুধুমাত্র ভয় দেখানো এবং সতর্ক করার জন্যে এসেছে। তাদের পাপ কার্য এবং শিরক ও কুফরের জন্যে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। মুফাস্সিরগণ বলেন যে, এ শব্দগুলি শুধু তাদেরকে উত্তর দেয়ার জন্যে আনা হয়েছে। যেমন, কোন ভাল লোক কোন প্রতারকের প্রতারণা থেকে রক্ষা পেয়ে তার উপর জয়যুক্ত হওয়ার পর তাকে বলেঃ ' দেখ! আমি কেমন করে তোমাকে প্রতারিত করেছি।' অথচ তার পক্ষ থেকে প্রতারণা হয় নাই। এরকমই আল্লাহ তা'আলার কথাঃ

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ এবং (৩ঃ ৫৪) وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُالْمَاكِرِيْنَ (২ঃ ১৫) ইত্যাদি। নচেৎ মহান আল্লাহর সত্তা প্রতারণা ও উপহাস থেকে পবিত্র। ভাবার্থ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতারণা ও বিদ্রূপের উপযুক্ত প্রতিফল দেবেন। কাজেই বিনিময়ে ঐ শব্দগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। দু'টি শব্দের অর্থ দুই জায়গায় পৃথক পৃথক হবে। যেমন কুরআন মাজীদে আছেঃ

وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

অর্থাৎ মন্দের বিনিময় ঐরূপ মন্দই হয়।' (৪২ঃ ৪০) অন্যস্থানে রয়েছেঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ

অর্থাৎ 'যে তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করে তোমরাও তার উপর বাড়াবাড়ি কর।' (২ঃ ১৯৪) তাহলে বুঝা গেল যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা অন্যায় নয়। বাড়াবাড়ির মুকাবিলায় প্রতিশোধ নেয়া বাড়াবাড়ি নয়। কিন্তু দুই স্থানে একই শব্দ আছে, অথচ প্রথম অন্যায় ও বাড়াবাড়ি হচ্ছে জুলুম এবং দ্বিতীয় অন্যায় ও বাড়াবাড়ি হচ্ছে সুবিচার। আর একটি ভাবার্থ এই যে, মুনাফিকরা তাদের এই নাপাক নীতি দ্বারা মুসলমানদেরকে উপহাস ও বিদ্রূপ করতো। মহান আল্লাহও তাদের সঙ্গে এইরূপই করলেন যে, দুনিয়ায় তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা দান করলেন, তারা এতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল, অথচ এটা অস্থায়ী নিরাপত্তা। কিয়ামতের দিন তাদের কোন নিরাপত্তা নেই। এখানে যদিও তাদের জান ও মাল রক্ষা পেয়ে গেল, কিন্তু আল্লাহর নিকট তারা বেদনাদায়ক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই কথাটিকেই বেশী গুরুত্ব

দিয়েছেন। কেননা বিনা কারণে যে ধোঁকা ও বিদ্রূপ হয়, আল্লাহ্ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তবে প্রতিশোধ হিসেবে আল্লাহ্ পাকের দিকে এসব শব্দের সম্বন্ধ লাগানোতে কোন দোষ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও (রাঃ) একথাই বলেন যে, এটা তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ও শাস্তি। يَمُدُّهُمْ -এর অর্থ 'ঢিল দেয়া এবং বাড়ানো' বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْنَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ *

অর্থাৎ 'তারা কি ধারণা করেছে যে, তাদের মাল ও সন্তানাদির আধিক্য দ্বারা তাদের জন্যে আমি মঙ্গল ও কল্যাণকেই ত্বরান্বিত করছি? বস্তুতঃ তাদের সঠিক বোধই নেই।' (২৩ঃ ৫৫-৫৬) আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাত আরও বলেছেনঃ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ 'এভাবেই আমি তাদেরকে ঢিল দেয়ার পর এমনভাবে টেনে ধরব যে, তারা কোন দিক-দিশাই পাবে না।' (৬৮ঃ ৪৪)

তাহলে ভাবার্থ দাঁড়াল এই যে, এদিকে এরা পাপ করছে আর ওদিকে তাদের দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কাজেই এরা সুখী হচ্ছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাস্তিই বটে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে বলেছেনঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ*

অর্থাৎ 'যখন তারা উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদের উপর সমস্ত জিনিসের দরজা খুলে দিলাম, অতঃপর যা তাদেরকে দেয়া হলো তার উপর যখন তারা সর্বোতভাবে খুশী হলো, হঠাৎ করে অতর্কিতে আমি তাদেরকে আঁকড়ে ধরলাম, সুতরাং তারা ভীত সন্ত্রস্ত ও নিরাশ হয়ে পড়লো। অত্যাচারীদের মূলোৎপাটন করে ধ্বংস করে দেয়া হলো এবং বলা হলো যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যে।' (৬ঃ ৪৪-৪৫)

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, তাদেরকে ঢিল দেয়ার জন্যে এবং তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে তাদেরকে অধিক পরিমাণে ঢিল দেয়া হয়। কোন জিনিসের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকে طُغْيَان বলা হয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِى الْجَارِيَةِ

অর্থাৎ "যখন পানি সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমি তাদেরকে নৌকায় উঠালাম।' (৬৯ঃ ১১) পথভ্রষ্টতাকে عَمَهٌ বলা হয়। সুতরাং আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, পথভ্রষ্টতা ও কুফরীর মধ্যে ডুবে গেছে এবং এই নাপাকী তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। এখন তারা ঐ কাদার মধ্যেই নেমে যাচ্ছে এবং ঐ নাপাকীর মধ্যে ঢুকে পড়ছে। আর এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সমস্ত পথ তাদের বন্ধ হয়ে গেছে। তারা এখন পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে। তদুপরি তারা বধির এবং নির্বোধ। সুতরাং তারা কিভাবে মুক্তি পেতে পারে? চোখের অন্ধত্বের জন্যে আরবী ভাষায় عَمِىٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়, আর অন্তরের জন্যে ব্যবহৃত হয় عَمَهٌ শব্দটি। কিন্তু কখনও আবার অন্তরের জন্যে عَمِىٌ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কুরআন পাকে আছে−

وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ

অর্থাৎ 'তাদের সেই অন্তর অন্ধ যা রয়েছে তাদের সীনার মধ্যে।' (২২ঃ৪৬)

---

**১৬। এরা তারাই যারা সুপথের পরিবর্তে বিপথকে ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের বাণিজ্য লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক সরল পথে চলেনি।**

١٦- أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

---

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা হিদায়াতকে ছেড়ে গুমরাহীকে গ্রহণ করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করেছিল।" মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ তারা ঈমান আনার পরে কাফির হয়েছিল।' কাতাদাহ (রঃ) বলেনঃ 'তারা হিদায়াতের চাইতে গুমরাহীকেই অধিক পছন্দ করেছিল।' যেমন অন্যস্থানে সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমি সামূদ কাউমকে সুপথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা

সুপথের তুলনায় ভ্রান্ত পথকে পছন্দ করেছিল। ভাবার্থ এই যে, মুনাফিকরা হিদায়াত হতে সরে গিয়ে গুমরাহীর উপর এসে গেছে এবং হিদায়াতের পরিবর্তে গুমরাহীকেই গ্রহণ করেছে। এখন ঈমান এনে পুনরায় কাফির হয়েছে। হয়তো বা আসলেই ঈমান লাভের সৌভাগ্য হয়নি। মুনাফিকদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক ছিল। যেমন কুরআন পাকে এসেছেঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

অর্থাৎ 'এটা এই হেতু যে, তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফির হয়েছে, অতএব তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।' (৬৩ঃ ৩) আবার এমনও মুনাফিক ছিল যাদের ভাগ্যে ঈমান লাভই ঘটেনি। সুতরাং এরা এই সওদায় কোন উপকারও লাভ করেনি এবং পথও প্রাপ্ত হয়নি, বরং হিদায়াতের বাগান হতে বের হয়ে কাঁটার জঙ্গলে পড়ে গেছে। নিরাপত্তার প্রশস্ত মাঠ হতে বেরিয়ে ভীতিপ্রদ অন্ধকার ঘরে এবং সুন্নতের পবিত্র বাগান হতে বের হয়ে বিদ'আতের শুষ্ক জঙ্গলে এসে পড়েছে।

---

১৭- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ○

১৮- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

১৭। এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হলো, তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায় না।

১৮। তারা বধির, মূক, অন্ধ অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবে না।

---

مِثَالٌ কে আরবীতে مَثِيْلٌ ও বলে। এর বহুবচন اَمْثَالٌ আসে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ *

অর্থাৎ 'এই দৃষ্টান্তগুলো আমি মানুষের জন্যে বর্ণনা করে থাকি, যেগুলো শুধু আলেমরাই বুঝে থাকে।' (২৯ঃ ৪৩) আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, যে

মুনাফিকরা সঠিক পথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ এবং দৃষ্টির পরিবর্তে দৃষ্টিহীনতাকে ক্রয় করে থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়েছে, তার ফলে আশে পাশের জিনিস তার চোখে পড়েছে। মনের উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে উপকার লাভের আশার সঞ্চার হয়েছে, এমন সময়ে হঠাৎ আগুন নিভে গেছে এবং চারিদিক ভীষণ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কাজেই সে রাস্তা দেখেতে পাচ্ছে না। এছাড়া লোকটি বধির, সে কারও কথা শুনতে পায় না, সে বোবা, তার কথা রাস্তার কোন লোককে জিজ্ঞেস করতেও পারে না, সে অন্ধ, আলোতেও সে কাজ চালাতে পারে না। এখন তাহলে সে পথ পাবে কি করে? মুনাফিকরা ঠিক তারই মত। সঠিক পথ ছেড়ে দিয়ে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং ভাল ছেড়ে দিয়ে মন্দের কামনা করছে। এই উদাহরণে বুঝা যাচ্ছে যে, ঐসব লোক ঈমান কবূল করার পরে কুফরী করেছিল। যেমন কুরআন কারীমে কয়েক জায়গায় এটা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম রাযী (রঃ) স্বীয় তাফসীরের মধ্যে সুদ্দী (রঃ) হতে এটাই নকল করেছেন, অতঃপর বলেছেন যে, এই তুলনা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কেননা, প্রথমে এই মুনাফিকরা ঈমানের আলো লাভ করেছিল। অতঃপর তাদের কপটতার ফলে তা নিভে গেছে এবং এর ফলে তারা অস্থির হয়ে পড়েছে, আর ধর্মের অস্থিরতার চেয়ে বড় অস্থিরতা আর কি হতে পারে? ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, যাদের এ উপমা বর্ণনা করা হয়েছে তাদের ভাগ্যে কখনও ঈমান লাভ ঘটেনি। কেননা ইতিপূর্বে আল্লাহ বলেছেনঃ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদিও তারা মুখে আল্লাহ তা'আলার উপর এবং কিয়ামতের উপর ঈমান আনার কথা বলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। তবে সঠিক কথা এই যে, এই পবিত্র আয়াতে তাদের কুফরও নিফাকের সময়কার খবর দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ অস্বীকৃতি বুঝায় না যে, এই কুফর ও নিফাকের অবস্থার পূর্বে তারা ঈমান এনেছিল । বরং হতে পারে যে, তারা ঈমান আনার পর তা হতে সরে পড়েছিল। অতঃপর তাদের অন্তরে মোহর করে দেয়া হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ 'এটা এজন্যে যে, তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফির হয়েছে, অতএব তাদের অন্তরে মোহর করে দেয়া হয়েছে, তারা কিছুই বুঝে না।' এই কারণে উপমায় আলো ও অন্ধকারের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ঈমানের কালেমা প্রকাশ করার কারণে দুনিয়ায় কিছু আলো হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তরে কুফরী থাকার কারণে আখেরাতের অন্ধকার তাদেরকে ঘিরে নিয়েছে। একটি দলের উপমা একটি লোকের সঙ্গে প্রায়ই এসে থাকে। কুরআন পাকের অন্যস্থানে আছেঃ 'তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমার

দিকে দেখছে সেই ব্যক্তির মত যার উপর মরণের অজ্ঞানতা এসে গেছে।' অন্য আয়াতে আছেঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

অর্থাৎ 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা এবং মরণের পর পুনরুজ্জীবিত করা একটি প্রাণের মতই।' (৩১ঃ ২৮) অন্য জায়গায় আছেঃ যারা তাওরাত শিক্ষা করে কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করে না তাদের উপমায় বলা হয়েছেঃ

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

অর্থাৎ 'গাধার মত–যে কিতাবসমূহের বোঝা বহন করে থাকে।' (৬২ঃ ৫)

এইসব আয়াতে দলের উপমা একের সঙ্গে দেয়া হয়েছে। এ রকমই উল্লিখিত আয়াতে মুনাফিক দলের উপমা একটি লোকের সঙ্গে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, অনুমিত বাক্য হবে নিম্নরূপঃ

مَثَلُ قِصَّتِهِمْ كَمَثَلِ قِصَّةِ الَّذِيْنَ اسْتَوْقَدُوْا نَارًا

অর্থাৎ তাদের ঘটনার দৃষ্টান্ত ঐসব লোকের ঘটনার মত যারা আগুন জ্বালিয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, আগুন জ্বালায় তো একজন, কিন্তু এমন একটি দলের জন্যে জ্বালিয়ে থাকে যে দল তার সাথে রয়েছে। অন্য কেউ বলেন যে, এখানে اَلَّذِىْ-এর অর্থ اَلَّذِيْنَ হবে। যেমন কবিদের কবিতায়ও এরূপ আছে।

আমি বলি যে, স্বয়ং এই উদাহরণেও তো একবচনের রূপের পরেই বহুবচনের রূপ এসেছে। যেমন بِنُوْرِهِمْ - تَرَكَـهُـمْ এবং لَا يَرْجِـعُـوْنَ এভাবে বলায় ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিয়েছেন –এর অর্থ এই যে, যে আলো তাদের জন্যে উপকারী ছিল তা সরিয়ে নিয়েছেন এবং যেমনভাবে আগুন নিবে যাবার পর তা ধুঁয়া এবং অন্ধকার থেকে যায় তদ্রূপ তাদের কাছে ক্ষতিকর জিনিস যেমন সন্দেহ, কুফর এবং নিফাক রয়ে গেছে, সুতরাং তারা নিজেরাও পথ দেখতে পায় না, অন্যের ভাল কথাও শুনতে পায় না এবং কারও কাছে প্রশ্নও করতে পারে না। এখন পুনরায় সঠিকপথে আসা অসম্ভব হয়ে গেছে। এর সমর্থনে মুফাস্সিরগণের অনেক কথা রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর মদীনায় আগমনের পর কতকগুলো লোক ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু পরে আবার মুনাফিক হয়ে যায়। তাদের উপমা ঐ লোকটির মত যে অন্ধকারে রয়েছে। অতঃপর আগুন জ্বালিয়ে আলো লাভ করেছে এবং আশে পাশের ভালমন্দ জিনিস দেখতে পেয়েছে। আর কোন্ পথে

কি আছে তা সবই জানতে পেরেছে। এমন সময় হঠাৎ আগুন নিভে গেছে, ফলে আলো হারিয়ে গেছে। এখন পথে কি আছে না আছে তা জানতে পারে না। ঠিক এরকমই মুনাফিকরা শিরক ও কুফরের অন্ধকারে ছিল। অতঃপর ঈমান এনে ভাল-মন্দ অর্থাৎ হারাম হালাল ইত্যাদি দেখতে থাকে। কিন্তু পুনরায় কাফির হয়ে যায় এবং তখন আর হারাম, হালাল, ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আলোর অর্থ ঈমান এবং অন্ধকারের অর্থ ভ্রান্তপথ ও কুফরী। এসব লোক সঠিক পথেই ছিল। কিন্তু আবার দুষ্টুমি করে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হিদায়াত ও ঈমানদারীর দিকে মুখ করাকে উপমায় আশে পাশের জিনিসকে আলোকিত করার সঙ্গে তাবীর করা হয়েছে। হযরত আতা' খুরাসানীর (রঃ) অভিমত এই যে, মুনাফিক কখনও কখনও ভাল জিনিস দেখে নেয় এবং চিনেও নেয়। কিন্তু আবার তার অন্তরের অন্ধত্ব তার উপর জয়যুক্ত হয়ে যায়।

হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত আবদুর রহমান (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ), এবং রাবী' (রঃ) হতেও এটাই নকল করা হয়েছে। হযরত আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) বলেনঃ মুনাফিকদের অবস্থা এটাই যে, তারা ঈমান আনে এবং তার পবিত্র আলোকে তাদের অন্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠে, যেমন আগুন জ্বালালে তার আশে পাশের জিনিস আলোকিত হয়। কিন্তু আবার কুফরীর কারণে আলো শেষ হয়ে যায়, যেমন আলো নিভে গেলে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

আমাদের এসব কথা তো ঐ তাফসীরের সমর্থনে ছিল যে, যে মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তারা ঈমান এনেছিল, অতঃপর কুফরী করেছে। এখন ইমাম ইবনে জারীরের (রঃ) সমর্থনে যে তাফসীর রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত যে, তারা ইসলামের কারণে সম্মান পেয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে চলতে থাকে। উত্তরাধিকার এবং গণীমতের মাল অংশ ইত্যাদি পেতে থাকে। কিন্তু মরণের সঙ্গে সঙ্গেই এ সম্মান হারিয়ে যায়। যেমন আগুনের আলো নিভে গেলেই শেষ হয়ে যায়। আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, মুনাফিক যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে তখন তার অন্তরে আলো সৃষ্টি হয়। অতঃপর যখনই সন্দেহ করে তখনই তা চলে যায়। যেমনভাবে কাঠ যতক্ষণ জ্বলতে থাকে ততক্ষণ আলো থাকে, যেমনই নিভে যায় তেমনিই তা শেষ হয়ে যায়। হযরত কাতাদার (রঃ) কথা এই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলায় মুনাফিক ইহলৌকিক লাভ, যেমন

মুসলমানদের ছেলে-মেয়ে, লেন-দেন, উত্তরাধিকারের মাল বন্টন এবং জান-মালের নিরাপত্তা ইত্যাদি পেয়ে যায়। কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান এবং তাদের কাজে সততা পাওয়া যায় না বলে মরণের সময় এসব লাভ ছিনিয়ে নেয়া হয়, যেমন আগুনের আলো যা নিভে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার অর্থ মরণের পর শাস্তি হওয়া। কিন্তু পুনরায় স্বীয় কুফর ও নিফাকের কারণে সুপথ ও সত্যের উপর কায়েম থাকা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। সুদ্দীর (রঃ) কথা এই যে, মরণের সময় মুনাফিকদের অসৎ কাজগুলি তাদের উপর অন্ধকারের মত ছেয়ে যায় এবং মঙ্গলের এমন কোন আলো তাদের উপর অবশিষ্ট থাকে না যা তাদের একত্ববাদের সত্যতা প্রমাণ করে। তারা সত্য শোনা হতে বধির, সঠিক পথ দেখা ও বুঝা হতে অন্ধ। তারা সঠিক পথের দিকে ফিরে যেতে পারে না, তাদের এ সৌভাগ্যও হয় না, তার উপদেশও লাভ করতে পারে না।

১৯। অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায়—যাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ রয়েছে, তারা বজ্রধ্বনি বশতঃ মৃত্যু ভয়ে তাদের কর্ণসমূহে স্ব স্ব অঙ্গুলি গুঁজে দেয়, এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টনকারী।

১৯- اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

২০। অচিরে বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টি হরণ করবে, যখন তাদের প্রতি প্রদীপ্ত হয়—তাতে তারা চলতে থাকে এবং যখন তা তাদের উপর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন—নিশ্চয় তাদের শ্রবণ শক্তি ও তাদের দর্শন শক্তি হরণ করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর শক্তিমান।

٢٠- يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ ۙ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ع

এটা দ্বিতীয় উদাহরণ যা দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিকদের জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এরা সেই সম্প্রদায় যাদের নিকট কখনও সত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। এবং কখনও সন্দেহে পতিত হয়। সন্দেহের সময় তাদের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মত। صَيِّبٌ -এর অর্থ হচ্ছে বৃষ্টিপাত ও বর্ষণ। কেউ কেউ এর অর্থ মেঘও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু খুব প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি বা অন্ধকারে বর্ষে। ظُلُمَاتٌ -এর ভাবার্থ হচ্ছে সন্দেহ, কুফর ও নিফাক। رَعْدٌ -এর অর্থ হচ্ছে বজ্র, যা ভয়ংকর শব্দের দ্বারা অন্তর কাঁপিয়ে তোলে। মুনাফিকের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সব সময় তার মনে ভয়, সন্ত্রাস ও উদ্বেগ থাকে। যেমন কুরআন মজীদের এক জায়গায় আছেঃ

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ 'প্রত্যেক শব্দকে তারা নিজেদের উপরই মনে করে থাকে।' (৬৩ঃ ৪) অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেনঃ 'এই মুনাফিকরা শপথ করে বলে থাকে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভীত লোক, যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল বা পথ পায় তবে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয়ে সেখানেই প্রবেশ করবে।' বিদ্যুতের সঙ্গে সেই ঈমানের আলোর তুলনা করা হয়েছে যা কখনও কখনও তাদের অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সে সময়ে তারা মরণের ভয়ে তাদের অঙ্গুলিগুলো কানের মধ্যে ভরে দেয়, কিন্তু ওটা তাদের কোন উপকারে আসে না। এরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীন রয়েছে। সুতরাং এরা বাঁচতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেছেনঃ' তোমাদের নিকট কি ঐ সেনাবাহিনীর কাহিনী পৌঁছেছে, অর্থাৎ ফির'আউন ও সামূদের? বরং কাফিরেরা অবিশ্বাস করার মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহ্ তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছেন।'

বিদ্যুতের চক্ষুকে কেড়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে তার শক্তি ও কাঠিন্য এবং ঐ মুনাফিকদের দৃষ্টি শক্তিতে দুর্বলতার অর্থ হচ্ছে তাদের ঈমানের দুর্বলতা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, কুরআন মাজীদের মজবুত আয়াতগুলো ঐ মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থা খুলে দেবে ও তাদের গোপনীয় দোষ প্রকাশ করবে এবং আপন ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায় তখন তারা দাঁড়িয়ে যায়, অর্থাৎ যখন তাদের ঈমান প্রকাশ পায় তখন তাদের অন্তর কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তারা এর অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু যেমনই সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হয় তেমনই অন্তরের মধ্যে অন্ধকার ছেয়ে যায় এবং তখন সে হয়রান পেরেশান হয়ে যায়। এর ভাব এও হতে পারে যে, যখন

ইসলামের কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়, তখন তাদের মনে কিছুটা স্থিরতা আসে, কিন্তু যখনই ওর বিপরীত পরিলক্ষিত হয় তখনই তারা কুফরীর দিকে ফিরে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ কতকগুলো লোক এমনও আছে যারা প্রান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকে অতঃপর মঙ্গল পৌঁছলে স্থির থাকে এবং অমঙ্গল পৌঁছলে তৎক্ষণাৎ ফিরে যায়।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের আলোতে চলার অর্থ হচ্ছে সত্যকে জেনে ইসলামের কালেমা পাঠ করা এবং অন্ধকারে থেমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া। আরও বহু মুফাস্‌সিরেরও এটাই মত আর সবচেয়ে বেশী সঠিক ও স্পষ্টও হচ্ছে এটাই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কিয়ামতের দিনেও তাদের এই অবস্থা হবে যে, যখন লোকদেরকে তাদের ঈমানের পরিমাপ অনুযায়ী আলো দেয়া হবে, কেউ পাবে বহু মাইল পর্যন্ত, কেউ কেউ তারও বেশী, কেউ তার চেয়ে কম, এমনকি শেষ পর্যন্ত কেউ এতটুকু পাবে যে, কখনও আলোকিত হবে এবং কখনও অন্ধকার। কিছু লোক এমনও হবে যে, তারা একটু দূরে গিয়েই থেমে যাবে, আবার কিছু দূর পর্যন্ত আলো পাবে, আবার নিবে যাবে। আবার কতকগুলো এমন দুর্ভাগা লোকও হবে যে, তাদের আলো সম্পূর্ণ রূপে নিভে যাবে। এরাই হবে পূর্ণ মুনাফিক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফরমান রয়েছেঃ 'যেদিন মুনাফিক নর ও নারী ঈমানদারগণকে ডাক দিয়ে বলবে—একটু থামো, আমাদেরকেও আসতে দাও যেন আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই, তখন বলা হবে, তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলো অনুসন্ধান কর।' মুমিন নারী ও পুরুষের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সেইদিন তুমি মুমিন পুরুষ ও নারীর সামনে ও ডানে আলো দেখতে পাবে এবং তাদেরকে বলা হবে—আজকে তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে।' আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ 'যেদিন আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ) কে, মুমিনগণকে অপমানিত করবেন না। তাদের সামনে ও ডানে আলো থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে—হে আমাদের প্রভু! আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন! নিশ্চয়ই আপনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।' এই আয়াতসমূহের পর নিম্নের এ বিষয়ের হাদীসগুলিও উল্লেখযোগ্যঃ

নবী (সঃ) বলেছেন, 'মুমিনদের কেউ কেউ মদীনা হতে আদন পর্যন্ত আলো পাবে। কেউ কেউ তার চেয়ে কম পাবে। এমনকি কেউ কেউ এত কম পাবে যে, শুধুমাত্র পা রাখার জায়গা পর্যন্ত আলোকিত হবে। তাফসীর-ই-ইবনে

জারীর।) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 'মুমিনগণকে তাদের আমলের পরিমাপ অনুযায়ী আলো দেয়া হবে। কেউ কেউ পাবে খেজুর গাছের সমান জায়গা ব্যাপী, কেউ পাবে হযরত আদমের (আঃ) পায়ের সমান স্থান ব্যাপী, কেউ কেউ শুধু এতটুকু পাবে যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলি মাত্র আলোকিত হবে কখনও জ্বলে উঠবে আবার কখনও নিবে যাবে। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আমল অনুযায়ী তারা আলো পাবে, সেই আলোতে তারা পুলসিরাত অতিক্রম করবে। কোন কোন লোকের নূর পাহাড়ের সমান হবে, কারও হবে খেজুর গাছের সমান, আর সবচেয়ে ছোট নূর ঐ লোকটার হবে, যার শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর থাকবে। ওটা কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত একত্ববাদীকে নূর দেয়া হবে। যখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে তখন একত্ববাদীরা ভয় পেয়ে বলবেঃ ' হে আল্লাহ! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন। (মুসনাদ-ই- ইবনে আবি হাতিম)। যহ্হাক বিন মাযাহিমেরও (রঃ) এটাই মত। এ হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন কয়েক প্রকারের লোক হবেঃ (১) খাঁটি মুমিন যাদের বর্ণনা পূর্বের চারটি আয়াতে হয়েছে। (২) খাঁটি কাফির, যার বর্ণনা তার পরবর্তী দু'টি আয়াতে হয়েছে। (৩) মুনাফিক–এদের আবার দু'টি ভাগ আছে। প্রথম হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক যাদের উপমা আগুনের আলো দিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই মুনাফিক যারা সন্দেহের মধ্যে আছে। কখনও ঈমানের আলো জ্বলে, কখনও নিভে যায়। তাদের উপমা বৃষ্টির সঙ্গে দেয়া হয়েছে। এরা প্রথম প্রকারের মুনাফিক হতে কিছু কম দোষী। ঠিক এই ভাবেই সূরা-ই নূরের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা মুমিনের ও তার অন্তরের আলোর উপমা সেই উজ্জ্বল প্রদীপের সঙ্গে দিয়েছেন যা উজ্জ্বল চিমনীর মধ্যে থাকে এবং স্বয়ং চিমনিও উজ্জ্বল তারকার মত হয়। যেহেতু একেতো স্বয়ং ঈমানদারের অন্তর উজ্জ্বল, দ্বিতীয়তঃ খাঁটি শরীয়ত দিয়ে তাকে সাহায্য করা হয়েছে। সুতরাং এ হচ্ছে নূরের উপর নূর। এভাবেই অন্য স্থানে কাফেরদের উপমাও তিনি বর্ণনা করেছেন যারা মূর্খতা বশতঃ নিজেদেরকে অন্য কিছু একটা মনে করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই নয়। তিনি বলেছেনঃ 'ঐ কাফিরদের কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত সেই মরীচিকার ন্যায় যাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। শেষ পর্যন্ত কাছে এসে দেখে, কিন্তু কিছুই পায় না।' অন্যস্থানে ঐ কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যারা খাঁটি মূর্খতায় জড়িত হয়ে পড়েছে। বলছেন যে, তারা গভীর সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকারের মত যে সমুদ্রে ঢেউ এর পর ঢেউ খেলছে আবার আকাশ মেঘে ঢাকা রয়েছে এবং অন্ধকার ছেয়ে গেছে, এমনকি নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না।

আসল কথা এই যে, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নূর থাকে না সে নূর পাবে কোথায়? সুতরাং কাফেরদেরও দু'টি ভাগ হলো। প্রথম হলো ওরাই যারা অন্যদেরকে কুফরীর দিকে আহ্বান করে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যারা তাদেরকে অনুকরণ করে থাকে। যেমন সূরা-ই-হজ্জের প্রথমে রয়েছেঃ 'কতক লোক এমন আছে যারা অজ্ঞানতা সত্ত্বেও আল্লাহ সম্বন্ধে ঝগড়া করে এবং প্রত্যেক দুষ্ট শয়তানের অনুকরণ করে থাকে।' আর এক জায়গায় আছেঃ 'কতকগুলো লোক জ্ঞান, সঠিক পথ এবং উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে ঝগড়া করে থাকে। সূরাই ওয়াকিয়ার প্রথমে ও শেষে এবং সূরা-ই নিসার মধ্যে মুমিনদেরও দুই প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। তারা হচ্ছে সাবেকিন ও আসহাব-ই ইয়ামীন অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী এবং পরহেযগার ও সৎ ব্যক্তিগণ। সুতরাং এ আয়াতসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, মুমিনদের দু'টি দল–আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও সৎ। কাফিরদেরও দু'টি দল–কুফরের দিকে আহ্বানকারী ও তাদের অনুসরণকারী। মুনাফিকদেরও দু'টি ভাগ–খাঁটি ও পাকা মুনাফিক এবং সেই মুনাফিক যাদের মধ্যে নিফাকের এক আধটি শাখা আছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যার মধ্যে তিনটি অভ্যাস আছে সে পাকা মুনাফিক। আর যার মধ্যে একটি আছে তার মধ্যে নিফাকের একটি অভ্যাস আছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। (তিনটি অভ্যাস হচ্ছে কথা বলার সময় মিথ্যাবলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা)। এর দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, কখনও কখনও মানুষের মধ্যে নিফাকের কিছু অংশ থাকে। তা কার্য সম্বন্ধীয়ই হোক বা বিশ্বাস সম্বন্ধীয়ই হোক। যেমন আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা গেল। পূর্ববর্তী একটি জামা'আত এবং উলামা-ই-কিরামের একটি দলেরও এটাই মাযহাব। এর বর্ণনা পূর্বে হয়ে গেছে এবং আগামীতে হবে ইনশাআল্লাহ।

মুসনাদ-ই-আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'অন্তর চার প্রকারঃ (১) সেই পরিষ্কার অন্তর যা উজ্জ্বল প্রদীপের মত ঝলমল করে। (২) ঐ অন্তর যা পর্দায় ঢাকা থাকে। (৩) উল্টো অন্তর এবং (৪) মিশ্রিত অন্তর। প্রথমটি হচ্ছে মুমিনের অন্তর যা পূর্ণভাবে উজ্জ্বল। দ্বিতীয়টা কাফিরের অন্তর যার উপর পর্দা পড়ে রয়েছে। তৃতীয়টি খাঁটি মুনাফিকের অন্তর যা জেনে শুনে অস্বীকার করে এবং ৪র্থটি হচ্ছে মুনাফিকের অন্তর যার মধ্যে ঈমান ও নিফাক এ দুটোর সংমিশ্রণ রয়েছে। ঈমানের দৃষ্টান্ত সেই সবুজ উদ্ভিদের মত যা নির্মল পানি দ্বারা বেড়ে ওঠে। নিফাকের উপমা ঐ ফোঁড়ার ন্যায় যার মধ্যে রক্ত ও পুঁজ বাড়তে থাকে। এখন যে মূল বেড়ে যায়, তার প্রভাব অন্যের উপর পড়ে থাকে। এই হাদীসটি সনদ হিসেবে খুবই মজবুত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও চক্ষু ধ্বংস করে দেবেন। ভাবার্থ এই যে, তারা যখন সত্যকে জেনে ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি দেবেন বা ক্ষমা করে দেবেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে তাঁর শাস্তি ও মহা শক্তির ভয় দেখাবার জন্যেই 'কাদীর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে قَادِرٌ -এর অর্থে قَدِيْرٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন عَالِمٌ -এর অর্থে عَلِيْمٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইমাম ইবনে জারীর বলেন যে, এই দু'টি উদাহরণ হচ্ছে একই প্রকারের মুনাফিকের জন্যে। اَوْ এখানে وَاوْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'এবং অর্থে। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

وَ لَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا

অর্থাৎ 'তাদের অন্তর্গত কোন ফাসিক ও কাফির ব্যক্তির অনুসরণ করো না।' (৭৬ঃ ২৪) কিংবা اَوْ শব্দটি 'ইখতিয়ার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর অথবা ঐ দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, اَوْ এখানে সমান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরবী বাক পদ্ধতি আছেঃ

جَالِسِ الْحَسَنَ اَوِ ابْنَ سِيْرِيْنَ

যামাখ্শারী (রঃ) এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তাহলে অর্থ হবে যে, দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে যা চাও তাই বর্ণনা কর, দুটোই তাদের অবস্থার অনুরূপ হবে। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, এটা মুনাফিকদের শ্রেণী হিসেবে এসেছে, তাদের অবস্থা ও বিশেষণ বিভিন্ন প্রকারের। যেমন সূরা-ই-বারাআতের মধ্যে وَمِنْهُمْ ,وَمِنْهُمْ এবং وَمِنْهُمْ করে করে তাদের অনেক শ্রেণী অনেক কাজ এবং অনেক কথার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দু'টি দৃষ্টান্ত হচ্ছে দু'প্রকার মুনাফিকের যা তাদের অবস্থা ও গুণাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন সূরা-ই-নূরের মধ্যে দুই প্রকারের কাফিরের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম প্রকার হচ্ছে কুফরীর দিকে আহ্বানকারী এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে তাদের অনুসরণকারী। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

২১। হে মানববৃন্দ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও।

٢١- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ لا

২২। যিনি তোমাদের জন্যে ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা তোমাদের জন্যে উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতএব তোমরা আল্লাহর জন্যে সদৃশ স্থির করো না এবং তোমরা এটা অবগত আছ।

٢٢- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ ও তাঁর উলুহিয়্যাতের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের দিকে টেনে এনেছেন, তিনিই প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত দান করেছেন, তিনিই যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং আকাশকে ছাদ করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ 'আমি আকাশকে নিরাপদ চাঁদোয়া বা ছাদ বানিয়েছি এবং এতদসত্ত্বেও তারা নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আকাশ হতে বারিধারা বর্ষণ করার অর্থ হচ্ছে মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা এমন সময়ে যখন মানুষ ও পূর্ণ মুখাপেক্ষী থাকে। অতঃপর ঐ পানি থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল উৎপন্ন করা, যা থেকে মানুষ এবং জীবজন্তু উপকৃত হয়। যেমন কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এর বর্ণনা এসেছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন, সুন্দর সুন্দর কমনীয় আকৃতি দান করেছেন, ভাল ভাল এবং স্বাদে অতুলনীয় আহার্য পৌঁছিয়েছেন, তিনিই আল্লাহ যিনি বরকতময় সারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক, সকলের সৃষ্টিকর্তা, সকলের

আহারদাতা, সকলের মালিক আল্লাহ তা'আলাই এবং এ জন্যেই তিনি সর্বপ্রকার ইবাদত ও তাঁর জন্যে অংশীদার স্থাপন না করার আসল হকদার।" এজন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার জন্যে অংশীদার স্থাপন করো না, তোমরা তো বিলক্ষণ জান ও বুঝ।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা।' আর একটি হাদীসে আছে, হযরত মু'আযকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'বান্দার উপরে আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান? (তা হচ্ছে এই যে,) তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকেও অংশীদার করবে না।' অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে যেন কেউ একথা না বলে যে, যা আল্লাহ একা চান ও অমুক চায়।' বরং যেন এই কথা বলে যে, যা কিছু আল্লাহ একাই চান অতঃপর অমুক চায়। হযরত আয়িশার (রাঃ) বৈমাত্রেয় ভাই হযরত তুফাইল বিন সাখবারাহ (রাঃ) বলেনঃ 'আমি স্বপ্নে কতকগুলো ইয়াহূদকে দেখে জিজ্ঞেস করলামঃ 'তোমরা কে?' তারা বললোঃ 'আমরা ইয়াহূদী।' আমি বললাম, আফসোস! তোমাদের মধ্যে বড় অন্যায় এই আছে যে, তোমরা হযরত উযায়েরকে (রাঃ) আল্লাহর পুত্র বলে থাক।' তারা বললোঃ 'তোমরাও ভাল লোক, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমরা বলে থাক যে, যা আল্লাহ চান ও মুহাম্মদ (সঃ) চান।' অতঃপর আমি খৃষ্টানদের দলের নিকট গেলাম এবং তারাও এ উত্তর দিল। সকাল হলে আমি আমার স্বপ্নের কথা কতকগুলি লোককে বললাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে তাঁর কাছেও ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কারও কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছ কি?' আমি বললাম জ্বি হাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বললেনঃ 'তুফাইল (রাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেছে এবং তোমাদের কারও কারও কাছে বর্ণনাও করেছে। আমি তোমাদেরকে একথাটি বলা হতে বিরত রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক কার্যের কারণে এ পর্যন্তও বলতে পারিনি। স্মরণ রেখো! এখন হতে আর কখনও 'যা আল্লাহ চান ও মুহাম্মদ (সঃ) চান' একথা বলবে না, বরং বলবে 'যা শুধু মাত্র আল্লাহ একাই চান' (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বললঃ 'যা আল্লাহ চান ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) চান। তিনি বললেনঃ 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর অংশীদার করছো? এ

কথা বল–'যা আল্লাহ একাই চান' (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। এ সমস্ত কথা সরাসরি একত্ববাদের বিপরীত। আল্লাহর একত্ববাদের জন্যে এসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন। সমস্ত কাফির ও মুনাফিককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর অর্থাৎ তাঁর একত্ববাদের অনুসারী হয়ে যাও, তাঁর সঙ্গে কাউকেও অংশীদার করো না–যে কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও না। তোমরা তো জান যে তিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই, তিনি তোমাদেরকে আহার্য দান করেন এবং তোমরা এটাও জান যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে এই একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছেন এবং যার সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শিরক এটা থেকেও বেশী গোপনীয় যেমন পীপিলিকা–যা অন্ধকার রাতে কোন পরিষ্কার পাথরের উপর চলতে থাকে। মানুষের একথা বলা যে–যদি এ কুকুর না থাকতো তবে রাত্রে চোর আমাদের ঘরে ঢুকে পড়তো–এটাও শিরক। মানুষের একথা বলা যে, যদি হাঁস বাড়ীতে না থাকতো তবে চুরি হয়ে যেতো, এটাও শিরক। কারও একথা বলা যে, যা আল্লাহ চান ও আপনি চান' একথাও শিরক। কারও একথা বলা যে, যদি আল্লাহ না হতেন অমুক না হতো' এ সমস্তই শিরকের কথা।

সহীহ হাদীসে আছে কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বললেনঃ যা আল্লাহ চান ও আপনি চান', তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহর অংশীদার রূপে দাঁড় করছো? অন্য হাদীসে আছেঃ তোমরা কতই না উত্তম লোক হতে যদি তোমরা শিরক না করতে! তোমরা বলছো যে, যা আল্লাহ চান এবং অমুক চায়।' হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে اندادا -এর অর্থ হচ্ছে অংশীদার ও সমতুল্য। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীল পড়ছ এবং জানছো যে আল্লাহ অংশীদার বিহীন, অতঃপর জেনেশুনে জ্ঞাতসারে আল্লাহ তা'আলার জন্যে অংশীদার স্থাপন করছ কেন?

মুসনাদ-ই- আহমাদে আছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মহাসম্মানিত আল্লাহ হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) কে পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিয়ে বললেনঃ 'এগুলোর উপর আমল কর এবং বানী ইসরাঈলকেও এর উপর আমল করার নির্দেশ দাও।' তিনি এ ব্যাপারে প্রায়ই বিলম্ব করে দিলে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'আপনার উপর বিশ্ব প্রভুর যে নির্দেশ ছিল যে,পাঁচটি কাজ আপনি নিজেও পালন করবেন এবং অপরকেও পালন করার নির্দেশ দিবেন। সুতরাং আপনি নিজেই বলে দিন বা আমি পৌঁছিয়ে দিই।' হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বললেনঃ 'আমার ভয় হচ্ছে যে, যদি আপনি আমার অগ্রগামী হয়ে যান

তবে না জানি আমাকে শাস্তি দেয়া হবে বা মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হবে।' অতঃপর হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্রিত করলেন। যখন মসজিদ ভরে গেল তখন তিনি উঁচু স্থানে বসলেন, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বললেনঃ 'আল্লাহ্পাক আমাকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি নিজেও পালন করি এবং তোমাদেরকেও পালন করার নির্দেশ দেই। (তা হচ্ছে এই যে) (১) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না। এর দৃষ্টান্ত এই রূপ যেমন একটি লোক নিজস্ব মাল দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করলো। গোলাম কাজ কাম করে এবং যা পায় তা অন্য লোককে দিয়ে দেয়। লোকটির গোলাম এরূপ হওয়া কি তোমরা পছন্দ কর? ঠিক এরকমই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের আহার্য দাতা, তোমাদের প্রকৃত মালিক এক আল্লাহ, যাঁর কোন অংশীদার নেই। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকেও অংশীদার করবে না। (২) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত করবে। বান্দা যখন নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক না তাকায় তখন আল্লাহা তা'আলা তার মুখোমুখী হন। যখন তোমরা নামায পড়বে তখন সাবধান! এদিক ওদিক তাকাবে না। (৩) তোমরা রোযা রাখবে। এর দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন একটি লোকের কাছে থলে ভর্তি মৃগনাভি রয়েছে, যার সুগন্ধে তার সমস্ত সঙ্গীর মস্তিষ্ক সুবাসিত হয়েছে। স্মরণ রেখো যে, রোযাদার ব্যক্তির মুখের সুগন্ধি আল্লাহর নিকট এই মৃগনাভির সুগন্ধি হতেও বেশী পছন্দনীয়। (৪) সাদকা ও দান খায়রাত করতে থাকবে। এর দৃষ্টান্ত এরূপ যে, যেমন কোন এক ব্যক্তিকে শত্রুরা বন্দী করে ফেলেছে এবং তার ঘাড়ের সঙ্গে হাত বেঁধে দিয়েছে গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। তখন সে বলছেঃ 'আমাকে তোমরা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দাও।' সুতরাং কম বেশী যা কিছু ছিল তা দিয়ে সে তার প্রাণ রক্ষা করলো। (৫) খুব বেশী তাঁর নামের অযিফা পাঠ করবে এবং তাঁর খুব যিক্র করবে। এর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যার পিছনে খুব দ্রুত বেগে শত্রু দৌড়িয়ে আসছে এবং সে একটি মজবুত দুর্গে ঢুকে পড়ছে ও সেখানে নিরাপত্তা পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহর যিকর দ্বারা শয়তান হতে রক্ষা পাওয়া যায়।'

একথা বলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বলেনঃ 'আমিও তোমাদের পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি, যার নির্দেশ মহান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেনঃ (১) মুসলমানদের দলকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। (আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং স্বীয় যুগের মুসলমান শাসন কর্তার নির্দেশাবলী মেনে চলা)। (২) (ধর্মীয় উপদেশ) শ্রবণ করা। (৩) মান্য করা। (৪) হিজরত করা এবং (৫) আল্লাহর

পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ দল থেকে সরে গেল সে নিজের গলদেশ হতে ইসলামের হাঁসুলী নিক্ষেপ করে দিল। হ্যাঁ, তবে যদি সে ফিরে আসে তবে তা অন্য কথা। যে ব্যক্তি অজ্ঞতা যুগের নাম ধরে ডেকে থাকে সে দোযখের খড়কুটো।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদিও সে রোযাদার ও নামাযী হয়?' তিনি বললেন, 'যদিও সে নামায পড়ে রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। মুসলমানদেরকে তাদের সেই নামে ডাকতে থাকো যে নাম স্বয়ং কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন, (তা হচ্ছে) মুসলেমীন, মুমেনীন এবং ইবাদুল্লাহ।'

এ হাদীসটি হাসান। এই আয়াতের মধ্যেও এটাই বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন। সুতরাং ইবাদতও তাঁরই কর। তাঁর সঙ্গে কাউকেও অংশীদার করো না। এ আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের পূর্ণ খেয়াল রাখা উচিত। সমগ্র ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। ইমাম রাযী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপরেও এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এবং প্রকৃত পক্ষেও এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপরে খুব বড় দলিল। আকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রং, বিভিন্ন স্বভাব এবং বিভিন্ন উপকারের প্রাণীসমূহ, ওদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা ও নৈপুণ্য এবং তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

কোন একজন বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ 'আল্লাহ যে আছে তার প্রমাণ কি?' সে উত্তরে বলেছিলঃ 'সুবহানাল্লাহ! উটের বিষ্ঠা দেখে উট আছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, পায়ের চিহ্ন দেখে পথিকের পথ চলার প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহলে এই যে বড় বড় নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশ, বহু পথ বিশিষ্ট যমীন, বড় বড় ঢেউ বিশিষ্ট সমুদ্র কি সেই মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় না?

খলীফা হারূনুর রশীদ হযরত ইমাম মালিককে প্রশ্ন করেছিলেনঃ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ কি?' তিনি বলেছিলেনঃ

'ভাষা পৃথক হওয়া, শব্দ আলাদা হওয়া, স্বর মাধুর্য পৃথক হওয়া আল্লাহ আছেন বলে সাব্যস্ত করছে।' হযরত ইমাম আবূ হানীফাকেও (রঃ) এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এখন অন্য চিন্তায় আছি। জনগণ আমাকে বলেছে যে, একখানা বড় নৌকা আছে যার মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ের মাল রয়েছে, ওর না আছে কোন রক্ষক বা না আছে কোন চালক।

এটা সত্ত্বেও ওটা বরাবর নদীতে যাতায়াত করছে এবং বড় বড় ঢেউগুলো নিজে নিজেই চিরে ফেড়ে চলে যাচ্ছে। থামবার জায়গায় থামছে, চলবার জায়গায় চলছে, ওতে কোন মাঝিও নেই, কোন নিয়ন্ত্রকও নেই।' তখন প্রশ্নকারীরা বললোঃ 'আপনি কি বাজে চিন্তায় পড়ে আছেন? কোন্ জ্ঞানী এ কথা বলতে পারে যে, এত বড় নৌকা শৃংখলার সাথে তরঙ্গময় নদীতে আসছে-যাচ্ছে অথচ ওর কোন চালক নেই? তিনি বললেনঃ 'আফসোস তোমাদের জ্ঞানে! একটি নৌকা চালক ছাড়া শৃংখলার সঙ্গে চলতে পারে না, কিন্তু এই সারা দুনিয়া, আসমান ও যমীনের সমুদয় জিনিস ঠিকভাবে আপন আপন কাজে লেগে রয়েছে অথচ ওর কোন মালিক, পরিচালক এবং সৃষ্টিকর্তা নেই? উত্তর শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেল এবং সত্য জেনে নিয়ে মুসলমান হয়ে গেল।

হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) কেও এই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ তুঁত গাছের একই পাতা একই স্বাদ। ওকে পোকা, মৌমাছি, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি সবাই খেয়ে থাকে ও চরে থাকে। ওটা খেয়েই পোকা হতে রেশম বের হয়, মৌমাছি মধু দেয়, হরিণের মধ্যে মৃগনাভি জন্মলাভ করে এবং গরু-ছাগল গোবর ও লাদি দেয়। এটা কি ঐ কথার স্পষ্ট দলীল নয় যে, একই পাতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টিকারী একজন আছেন" তাঁকেই আমরা আল্লাহ মেনে থাকি, তিনিই আবিষ্কারক এবং তিনিই শিল্পী।'

হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের (রঃ) নিকটেও একবার আল্লাহর অসিত্বের উপর দলীল চাওয়া হলে তিনি বলেনঃ ' জেনে রেখো! এখানে একটি মজবুত দুর্গ রয়েছে। তাতে কোন দরজা নেই, কোন পথ নেই এমনকি ছিদ্র পর্যন্তও নেই। বাহিরটা চাঁদির মত চকচক করছে এবং ভিতরটা সোনার মত জ্বল জ্বল করছে, আর উপর নীচ, ডান বাম চারদিক সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ রয়েছে। বাতাস পর্যন্তও ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। হঠাৎ ওর একটি প্রাচীর ভেঙ্গে পড়লো এবং ওর ভিতর হতে চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট, চলৎ শক্তি সম্পন্ন সুন্দর আকৃতি অধিকারী একটি জীবন্ত প্রাণী বেরিয়ে আসলো। আচ্ছা বলতো এই রুদ্ধ ও নিরাপদ ঘরে এ প্রাণীটির সৃষ্টিকারী কেউ আছে- কি নেই? সেই স্রষ্টার অস্তিত্ব মানবীয় অস্তিত্ব হতে উচ্চতর এবং তার ক্ষমতা অসীম কি-না?' তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ' ডিমকে দেখ, ওর চারদিকে বন্ধ রয়েছে, তথাপি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ওর ভিতর জীবন্ত মুরগীর বাচ্চা সৃষ্টি করেছেন। এটাই আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদের প্রমাণ'

হযরত আবূ নুয়াস (রঃ) এই জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেনঃ 'আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া ও তা হতে বৃক্ষরাজি সৃষ্টি হওয়া এবং তরতাজা শাখার উপর সুস্বাদু ফলের অবস্থান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্ববাদের দলীল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। ইবনে মুআয (রঃ) বলেনঃ 'আফসোস! আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা এবং তাঁর সত্তাকে অবিশ্বাস করার উপর মানুষ কি করে সাহসিকতা দেখাচ্ছে অথচ প্রত্যেক জিনিসই সেই বিশ্ব প্রতিপালকের অস্তিত্ব এবং তার অংশীবিহীন হওয়ার উপর সাক্ষ্য প্রদান করছে!'

**অন্যান্য গুরুজনের বচন হচ্ছে ঃ** 'তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ওর উচ্চতা, প্রশস্ততা, ওর ছোট বড় উজ্জ্বল তারকারাজির প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক, ওদের আবর্তন ও স্থিরতা এবং ওদের প্রকাশ পাওয়া ও গোপন হওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ যার ঢেউ খেলতে রয়েছে ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। তারপর উঁচু নীচু পাহাড়গুলোর দিকে দেখ যা যমীনের বুকে গাড়া রয়েছে এবং ওকে নড়তে দেয় না, ওদের রং ও আকৃতি বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, আবার ক্ষেত্র ও বাগানসমূহকে সবুজ সজীবকারী ইতস্তত প্রবাহমান সুদৃশ্য নদীগুলোর দিকে তাকাও, ক্ষেত্র ও বাগানের সবজীগুলো এবং ওদের নানা প্রকার ফল, ফুল এবং সুস্বাদু মেওয়াগুলোর কথা চিন্তা কর যে, মাটিও এক এবং পানিও এক, কিন্তু আকৃতি, গন্ধ, রং স্বাদ এবং উপকার দান পৃথক পৃথক। এসব কারিগরী কি তোমাদেরকে বলে দেয় না যে, ওদের একজন কারিগর আছেন? এসব আবিষ্কৃত জিনিস কি উচ্চরবে বলে না যে, ওদের আবিষ্কারক কোন একজন আছেন? এ সমুদয় সৃষ্টজীব কি স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর সত্তা ও একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করে না? এ হচ্ছে দলীলের বোঝা বা মহা সম্মানিত ও মহা মর্যাদাবান আল্লাহ স্বীয় সত্তাকে স্বীকার করার জন্যে প্রত্যেক চক্ষুর সামনে রেখে দিয়েছেন যা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা, পূর্ণ নৈপুণ্য, অদ্বিতীয় রহমত, অতুলনীয় দান এবং অফুরন্ত অনুগ্রহের উপর সাক্ষ্য দান করার জন্য যথেষ্ট। আমরা স্বীকার করছি যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষাকর্তা নেই। তিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্যও নেই এবং নিঃসন্দেহে তিনি ছাড়া সিজদার হকদারও আর কেউ নেই। হ্যাঁ, হে দুনিয়ার লোকেরা! তোমরা শুনে রেখো যে, আমার আস্থা ও ভরসা তাঁরই উপর রয়েছে, আমার কাকুতি মিনতি প্রার্থনা তাঁরই নিকট, তাঁরই সামনে আমার মস্তক অবনত হয়, তিনিই আমার আশ্রয় স্থল, সুতরাং আমি তাঁরই নাম জপছি।

২৩। এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তবে তৎ সদৃশ্য একটি 'সূরা' আনয়ন কর এবং তোমাদের সেই সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও যারা আল্লাহ হতে পৃথক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٢٣- وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৪। অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তা হলে তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় কর যার ইন্ধন মনুষ্য ও প্রস্তরপুঞ্জ—যা অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

٢٤- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

## নবুওয়াতের উপর আলোচনা

তাওহীদের পর এখন নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছেঃ "আমি যে পবিত্র কুরআন আমার বিশিষ্ট বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছি তাকে যদি তোমরা আমার বাণী বলে বিশ্বাস না কর তবে তোমরা ও তোমাদের সাহায্যকারীরা সব মিলে পূর্ণ কুরআন তো নয় বরং শুধুমাত্র ওর একটি সূরার মত সূরা আনয়ন কর। তোমরা তো তা করতে কখনও সক্ষম হবে না, তা হলে ওটিযে আল্লাহ্র কালাম এতে সন্দেহ করছে কেন?" شُهَدَاءُ -এর ভাবার্থ হচ্ছে সাহায্যকারী ও অংশীদার, যারা তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করত। তাহলে ভাবার্থ হলো এইঃ "যাদেরকে তোমরা পূজনীয়রূপে স্বীকার করছ তাদেরকেও ডাকো এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় হলেও ওটির মত একটি সূরা রচনা কর।"

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তোমরা তোমাদের শাসনকর্তা এবং বাকপটু ও বাগ্মীদের নিকট হতেও সাহায্য নিয়ে নাও। কুরআন পাকের এই মু'জিযার প্রকাশ এবং এই রীতির বাণী কয়েক স্থানে আছে। সূরা-ই- কাসাসের মধ্যে আছেঃ "(হে নবী সঃ) তুমি বলে দাও যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্র নিকট হতে অন্য কোন কিতাব নিয়ে এসো-যা সৎ পথ প্রদর্শনে এ দু'টো (কুরআন ও তাওরাত) অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট হয়, তা হলে আমিও তার অনুসরণ করবো।" আল্লাহ তা'আলা সূরা-ই-বানী ঈসরাইলে বলেছেনঃ "তুমি বলে দাও যে, যদি মানুষ ও জ্বিন এ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, এরূপ কুরআন রচনা করে আনবে, তথাপিও তার অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়।"

সূরা-ই-হূদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তবে কি তারা এরূপ বলে যে, এটা তুমি নিজেই রচনা করেছ? বলে দাও, তোমরাও তাহলে ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহকে ছাড়া যাকে যাকে ডাকতে পার ডেকে আন যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" সূরা-ই- ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "এ কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, বরং এটা তো সেই কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা আবশ্যকীয় বিধানসমূহের ব্যাখ্যা দানকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই, এটা বিশ্ব প্রভুর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তোমার স্বরচিত? তুমি বলে দাও, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা-ই এনে দাও এবং আল্লাহ্কে ছাড়া যাকে পার ডাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" এ সমস্ত আয়াত তো মক্কা মুকার্‌রামায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মক্কাবাসীকে এর মুকাবিলায় অসমর্থ সাব্যস্ত করে মদীনা শরীফেও এ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যেমন উপরের আয়াত।

مِثْلِهٖ -এর 'ہٖ' সর্বনামটিকে কেউ কেউ কুরআনের দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ এর (কুরআনের) মত কোন একটি সূরা রচনা কর। কেউ কেউ সর্বনামটি মুহাম্মদ (সঃ)-এর দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মত কোন নিরক্ষর লোক এরূপ হতেই পারে না যে, লেখাপড়া কিছু না জেনেও এমন বাণী রচনা করতে পারে যার মত বাণী কারও দ্বারা রচিত হতে পারে না। কিন্তু প্রথম মতটিই সঠিক।

মুজাহিদ (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), আমর বিন মাসউদ (রঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং অধিকাংশ চিন্তাবিদের এটাই মত। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রঃ), যামাখশারী এবং ইমাম রাযীও (রঃ) এই মত পছন্দ করেছেন। এটাকে প্রাধান্য দেয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি এই যে, এতে সবারই প্রতি ধমক রয়েছে। একত্রিত করেও এবং পৃথক পৃথক

করেও, সে নিরক্ষরই হোক বা আহ্লে কিতাব ও শিক্ষিত লোকই হোক, এতে এই মু'জিযার পূর্ণতা রয়েছে এবং শুধুমাত্র অশিক্ষিত লোকদেরকে অপারগ করা অপেক্ষা এতে বেশী গুরুত্ব এসেছে। আবার দশটি সূরা আনতে বলা এবং ওটা আনতে না পারার ভবিষ্যদ্বাণী করাও এটাই প্রমাণ করছে যে, এর ভাবার্থ কুরআনই হবে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যক্তিত্ব নয়। সুতরাং এই সাধারণ ঘোষণা, যা বার বার করা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে যে, এরা এর উপর সক্ষম নয়। এ ঘোষণা একবার মক্কায় করা হয়েছে এবং পরে মদীনাতেও এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আর ঐসব লোক, যাদের মাতৃভাষা আরবী ছিল এবং নিজেদের বাকপটুতা ও বাগ্মীতার জন্যে গর্ববোধ করতো তারা সবাই এর মুকাবিলা করতে অসমর্থ হয়েছিল। তারা পূর্ণ কুরআনের উত্তর দিতে পারেইনি।' দশটি সূরাও নয় এমনকি একটি আয়াতেরও উত্তর দিতে সমর্থ হয়নি। সুতরাং পবিত্র কুরআনের একটি মু'জিযা তো এই যে, তারা এর মত একটি ছোট সূরাও রচনা করতে পারেনি।

## দ্বিতীয় মু'জিযাঃ

কুরআন কারীমের দ্বিতীয় মু'জিযা এই যে, তারা কখনও এর মত কিছুই রচনা করতে পারবে না যদিও তারা সবাই একত্রিত হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সেই যুগেও কারও সাহস হয়নি, তার পরে আজ পর্যন্তও হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্তও কারও সাহস হবে না। আর এ হবেই বা কিরূপে? যেমনভাবে আল্লাহর সত্তা অতুলনীয়, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অতুলনীয়। প্রকৃত ব্যাপারও এটাই যে, কুরআন পাককে এক নযর দেখলেই তার প্রকাশ্য ও গোপনীয়, শাব্দিক ও অর্থগত সব কিছু এমনভাবে প্রকাশ পায় যা সৃষ্টজীবের শক্তির বাইরে। স্বয়ং বিশ্বপ্রভু বলছেনঃ "এটা এমন কিতাব যার আয়াতগুলো প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতার পক্ষ হতে (প্রমাণাদি দ্বারা) জোরদার করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"

সুতরাং শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ বিশ্লেষিত কিংবা শব্দ বিশ্লেষিত এবং অর্থ সংক্ষিপ্ত। কাজেই কুরআন স্বীয় শব্দ ও রচনায় অতুলনীয়, এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সারা দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে অপারগ ও অসমর্থ। পূর্ব যুগের যেসব সংবাদ দুনিয়ার অজানা ছিল তা হুবহু এই পাক কালামে বর্ণিত হয়েছে, আগামীতে যা ঘটবে তারও আলোচনা রয়েছে এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে সমস্ত ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেনঃ "তোমার প্রভুর কথা সংবাদের সত্যতায় এবং নির্দেশের ন্যায্যতায় পূর্ণ হয়েছে। এই পবিত্র কুরআন সমস্তটাই সত্য, সত্যবাদিতা, সুবিচার এবং হিদায়াতে ভরপুর।

## কুরআন কাব্য নয়

পবিত্র কুরআনের মধ্যে কোন আজে বাজে কথা, ক্রীড়া-কৌতুক এবং মিথ্যা অপবাদ নেই যা সাধারণতঃ কবিদের কবিতায় পাওয়া যায়। বরং তাদের কবিতার কদর ও মূল্য ওরই উপর নির্ভর করে। মশহূর প্রবাদ আছে যে, 'اَعْذَبُهٗ اَكْذَبُهٗ। অর্থাৎ যা খুব বেশী মিথ্যা তা খুব বেশী সুস্বাদু।' লম্বা চওড়া জোরালো প্রশংসামূলক কবিতাগুলোকে দেখা যায় যে, তা অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা মিশ্রিত। ওতে থাকবে নারীদের প্রশংসা ও সৌন্দর্য বর্ণনা, ঘোড়া ও মদের প্রশংসা, কোন মানুষের বাড়ানো তা'রীফ, উষ্ট্রীসমূহের ভূষণ ও সাজ-সজ্জা, বীরত্বের অতিরঞ্জিত গীত, যুদ্ধের চালবাজী কিংবা ডর-ভয়ের কাল্পনিক দৃশ্য। এতে না আছে কোন দুনিয়ার উপকার, না আছে কোন দ্বীনের উপকার। এতে শুধু কবির বাকপটুতা ও কথা শিল্প প্রকাশ পায়। চরিত্রের উপরেও ওর কোন ভাল প্রভাব পড়ে না, আমলের উপরেও না। পুরো কাসিদার মধ্যে দু' একটি ভাল কবিতা হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু বাকী সবগুলোই আজে বাজে কথায় ভর্তি থাকে। পক্ষান্তরে, কুরআন পাকের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে,ওর এক একটি শব্দ ভাষা-মাধুর্যে, দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারে এবং মঙ্গল ও কল্যাণে ভরপুর। আবার বাক্যের বিন্যাস ও সৌন্দর্য, শব্দের গাঁথুনী, রচনার গঠন শৈলী অর্থের সুস্পষ্টতা এবং বিষয়ের পবিত্রতা যেন সোনায় সোহাগা। এর খবরের আস্বাদন, এর বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীর সরলতা মৃত সঞ্জীবনী, এর সংক্ষেপণ উচ্চ আদর্শ, এর বিশ্লেষণ মু'জিযার প্রাণ। এর কোন কিছুর পুনরাবৃত্তি দ্বিগুণ স্বাদ দিয়ে থাকে। মনে হয় যেন খাঁটি মুক্তার বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। বার বার পড়লেও মনে বিরক্তি আসবে না। স্বাদ গ্রহণ করতে থাকলে সব সময় নতুন স্বাদ পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে থাকলে শেষ হবে না। এটা একমাত্র কুরআন পাকের বৈশিষ্ট্য। এর চাটনীর মজা এবং মিষ্টতার স্বাদের কথা তাঁকেই জিজ্ঞেস করা উচিত যাঁকে মহান আল্লাহ জ্ঞান, অনুভূতি এবং বিদ্যাবুদ্ধির কিছু অংশ দান করেছেন। এর ভয় প্রদর্শন, ধমক এবং শাস্তির বর্ণনা মজবুত পাহাড়কেও নড়িয়ে দেয়, মানুষের অন্তর তো কি ছার। এর অঙ্গীকার, সুসংবাদ, দান ও অনুগ্রহের বর্ণনা অন্তরের শুষ্ক কুঁড়ির মুখ খুলে দেয়। এটা ইচ্ছা ও আকাংখার প্রশমিত আবেগের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং বেহেশ্ত ও আরামের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য চোখের সামনে উপস্থাপনকারী। এতে মন আনন্দিত হয় এবং চক্ষু খুলে যায়। এতে আগ্রহ উৎপাদক ঘোষণা হচ্ছেঃ "অতএব এইরূপ লোকদের জন্য কত কি নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে এটা কারও জানা নেই।"

আরও বলা হচ্ছেঃ "এবং তার (বেহেশতের) মধ্যে মনঃপুত ও চক্ষু জুড়ানো দ্রব্যাদি রয়েছে।" ভয় প্রদর্শন ও ধমকরূপে বলা হচ্ছেঃ "তোমরা কি তাঁর হতে, যিনি আকাশে রয়েছেন, নির্ভয় রয়েছো যে, তিনি তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে ধ্বসিয়ে দেন, অতঃপর ঐ যমীন থর থর করতে থাকে? না কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গেছো এটা হতে যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে দেন? সুতরাং তোমরা সত্ত্বরই জানতে পারবে যে, ভয় প্রদর্শন কিরূপ ছিল।" আরও বলা হচ্ছেঃ "অতঃপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি।" উপদেশ দান রূপে বলা হয়েছেঃ "যদিও আমি তাদেরকে কয়েক বছর ধরে সুখ-সম্ভোগে রেখেছি তাতে কি হয়েছে? অতঃপর যার ওয়াদা তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিল তা এসে গেল। যে জাঁকজমকের মধ্যে তারা ছিল তা তাদের কোন কাজে আসলো না।

মোটকথা এভাবে আল্লাহ কুরআন পাকের মধ্যে যখন যে বিষয় ধরেছেন তাকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে ছেড়েছেন। আর একে বিভিন্ন প্রকারের বাকপটুতা, ভাষালংকার এবং নিপুণতা দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক নির্দেশের মধ্যে মঙ্গল, সততা, লাভ এবং পবিত্রতার একত্র সমাবেশ ঘটেছে, আর প্রত্যেক নিষেধাজ্ঞা পাপ, হীনতা, ইতরামি এবং ভ্রষ্টতা কর্তনকারী। হযরত ইবনে মাউদ (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ বলেছেন যে, যখন কুরআন মাজীদের মধ্যে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শুনতে পাও তখন তোমরা কান লাগিয়ে দাও, হয়তো কোন ভাল কাজের হুকুম দেয়া হবে, বা কোন মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা হবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তিনি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন, পবিত্র জিনিস হালাল করেন এবং অপবিত্র জিনিস হারাম করেন, যে ভারী শিকল পায়ে জড়ানো ছিল এবং যে গলাবন্ধ গলায় দেয়া ছিল তা তিনি দূরে নিক্ষেপ করেন।"

কুরআন কারীমের মধ্যে আছে কিয়ামতের বর্ণনা, তথাকার ভয়াবহ দৃশ্য, বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা, দয়া ও কষ্টের পূর্ণ বিবরণ। আরও রয়েছে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের জন্যে নানা প্রকার নিয়ামতের বর্ণনা ও তাঁর শত্রুদের জন্যে নানা প্রকার শাস্তির বর্ণনা। কোথাও বা আছে সুসংবাদ এবং কোথায়ও আছে ভয় প্রদর্শন। কোন স্থানে আছে সৎকার্যের প্রতি আগ্রহ উৎপাদন এবং কোন স্থানে আছে মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান। কোন জায়গায় আছে দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতার শিক্ষা এবং কোন জায়গায় আছে আখেরাতের প্রতি আগ্রহের শিক্ষা। এ সমুদয় আয়াতই মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর পছন্দনীয় শরীয়তের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, অন্তরের কালিমা দূর করে, শয়তানী পথগুলো বন্ধ করে এবং মন্দ ক্রিয়া নষ্ট করে থাকে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবীকে (আঃ) এমন মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যা দেখে মানুষ তাদের উপর ঈমান এনেছিল, কিন্তু আমার ম'জিযা আল্লাহর ওয়াহী অর্থাৎ পবিত্র কুরআন। কাজেই আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীদের (আঃ) অপেক্ষা আমার অনুসারী বেশী হবে।" কেননা, অন্যান্য নবীদের (আঃ) মু'জিযা তাঁদের সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই মু'জিয়া কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। জনগণ ওটা দেখতে থাকবে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ ফরমানঃ "আমার মু'জিযা ওয়াহী যা আমাকে দেয়া হয়েছে" এর ভাবার্থ এই যে, এই কুরআনকে তাঁর জন্যেই বিশিষ্ট করা হয়েছে এবং এটা একমাত্র তাঁকেই দেয়া হয়েছে যা প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সারা দুনিয়াকে হার মানিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য আসমানী কিতাব অধিকাংশ আলেমের মতে এই বিশেষণ হতে শূন্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের সত্যতার উপর এবং ইসললাম ধর্মের সত্যতার উপর এই মু'জিযা ছাড়াও আরও এত দলীল আছে যে, তা গুণে শেষ করা যায় না। আল্লাহ্র জন্যেই সমুদয় প্রশংসা।

কোন কোন ইসলামী দর্শন বেত্তা কুরআন কারীমের মু'জিয়া হওয়াকে এমন পন্থায় বর্ণনা করেছেন যে, তা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং মু'তাযিলার কথারই অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা বলেন যে, হয়তো বা কুরআন নিজেই মু'জিয়া, এর মত কিছু রচনা করা মানুষের সাধ্যেরই বাইরে। এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার তাদের ক্ষমতাই নেই। কিংবা যদিও এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব এবং এটা মানবীয় শক্তির বাইরে নয়, তথাপি তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে। তারা কঠিন শত্রুতার মধ্যে রয়েছে, সত্য ধর্মকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলার জন্যে তারা সর্বশক্তি ব্যয় করতে এবং সব কিছু ধ্বংস করতে সদা প্রস্তুত রয়েছে। তবুও তারা কুরআন কারীমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না। এটা কুরআনের পক্ষ হতেই হচ্ছে যে, তাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কুরআন তাদেরকে বাধা দিচ্ছে যার ফলে তারা এর অনুরূপ পেশ করতে অপারগ হচ্ছে।

যদিও শেষের মতটি ততো পছন্দনীয় নয়, তথাপি তাকেও যদি মেনে নেয়া হয় তবে তার দ্বারাও কুরআনের মু'জিযা হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে। এটা সত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তর্কের খাতিরে নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়া হলেও কুরআনের মু'জিযা হওয়াই সাব্যস্ত হচ্ছে। ইমাম রাযীও (রঃ) ছোট ছোট সূরার প্রশ্নের উত্তরে এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

وَقُوْدُ -এর অর্থ হচ্ছে জ্বালানী, যা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। যেমন গাছের ডাল, কাঠ, খড়ি ইত্যাদি। কুরআন কারীমের এক জায়গায় আছেঃ "অত্যাচারী লোকেরা দোযখের জ্বালানী কাষ্ঠ।" অন্য স্থানে আছেঃ "তোমরা ও তোমাদের ঐ সব মা'বূদ, আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তোমরা ইবাদত করতে, দোযখের খড়ি হবে, তোমরা সব ওর মধ্যে আসবে। যদি তারা সত্য মা'বূদ হতো তবে সেখানে আগমন করতো না।" প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই চিরকাল অবস্থানকারী। اَلْحِجَارَةُ বলা হয় পাথরকে। এখানে অর্থ হচ্ছে গন্ধকের পাথর যা অত্যন্ত কালো, বড় এবং দুর্গন্ধময়, যার আগুনে অত্যন্ত তেজ থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই এই পাথরগুলো প্রথম আকাশে সৃষ্টি করা হয়েছে। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর, মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম, মুসতাদরিক- ই-হাকিম)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে সুদ্দী (রঃ) নকল করেছেন যে, দোযখের মধ্যে এই কালো গন্ধকের পাথরও থাকবে যার কঠিন আগুন দ্বারা কাফিরদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই পাথরগুলোর দুর্গন্ধ মৃতদেহের দুর্গন্ধের চেয়েও বেশী কঠিন। মুহাম্মদ বিন আলী (রঃ) এবং ইবনে জুরাইয্‌ও (রঃ) বলেন যে, গন্ধকের অর্থ হচ্ছে বড় বড় ও শক্ত শক্ত পাথর। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা হতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ পাথরগুলো যেগুলোর ছবি ইত্যাদি বানানো হতো, অতঃপর ঐগুলোকে পূজা করা হতো। যেমন এক জায়গায় আছেঃ "তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করতে, তারা জাহান্নামের জ্বালানী খড়ি।"

কুরতুবী (রঃ) এবং রাযী (রঃ) এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, গন্ধকের পাথরে আগুন ধরা কোন নতুন কথা নয়। কাজেই ভাবার্থ হবে এই মূর্তিগুলোই এবং আরও অন্যান্য পাথর—আল্লাহ্ পাককে ছাড়া যেগুলো যে কোন আকারে পূজনীয় হবে। কিন্তু এই যুক্তিটা জোরালো যুক্তি নয়। কেননা, যখন গন্ধকের পাথর দিয়ে আগুন উস্কানো হয়, তখন এটা জানা কথা যে, এর তাপ ও প্রখরতা সাধারণ আগুন হতে বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ওর জ্বাল, স্ফীতি এবং শিখাও খুব বেশী হবে। তাছাড়া পূর্ববর্তী গুরুজনেরাও এর তাফসীর এটাই বর্ণনা করেছেন। এরকমই পাথরগুলোতে আগুন লাগাও সর্বজন বিদিত এবং আয়াতের উদ্দেশ্যও হচ্ছে আগুনের তেজ এবং স্ফীতি বর্ণনা করা, আর এটা বর্ণনা করার জন্যও পাথরের অর্থ গন্ধকের পাথর মনে করাই বেশী যুক্তিযুক্ত। কেননা, এতে আগুনও তেজ হবে এবং শাস্তিও কঠিন হবে। কুরআন মাজীদে রয়েছেঃ

"যখন অগ্নিশিখা হালকা হয়, আমি তখন ওকে আরও উস্‌কিয়ে দেই।" আরও একটি হাদীসে আছে যে, প্রত্যেক কষ্টদায়ক জিনিস আগুনে আছে। কিন্তু এ হাদীসটি সুরক্ষিত ও পরিচিত নয়। কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, এর দু'টো অর্থ আছে। একটি এই যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি জাহান্নামী যে অপরকে কষ্ট দেয়। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, প্রত্যেক কষ্টদায়ক জিনিস আগুনে বিদ্যমান থাকবে যা জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেবে।

أُعِدَّتْ অর্থাৎ তৈরী করা হয়েছে। বাহ্যতঃ ভাবার্থ বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ আগুন কাফিরদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে। এর ভাবার্থ পাথরও হতে পারে। অর্থাৎ ঐ পাথর কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদেরও (রাঃ) এটাই মত। প্রকৃতপক্ষে এই দু' অর্থে কোন বিরোধ নেই। কেননা, আগুন জ্বালাবার জন্যেই পাথর তৈরী করা, আর আগুন তৈরী করার জন্যে পাথর তৈরী করা জরুরী। সুতরাং একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কুফরীর উপর রয়েছে তার জন্যও ঐ শাস্তি তৈরী আছে। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জাহান্নাম এখনও বিদ্যমান ও সৃষ্ট রয়েছে। কেননা, أُعِدَّتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দলীল স্বরূপ বহু হাদীসও রয়েছে। একটি সুদীর্ঘ হাদীসে আছে, জান্নাত ও জাহান্নামে ঝগড়া হলো (শেষ পর্যন্ত)। দ্বিতীয় হাদীসে আছেঃ "জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'টি শ্বাস গ্রহণের অনুমতি চাইলো এবং তাকে শীতকালে একটি এবং গ্রীষ্মকালে একটি শ্বাস নেয়ার অনুমিত দেয়া হলো।" ৩য় হাদীসে আছে, সাহাবীগণ (রাঃ) বলেনঃ "আমরা একদিন একটি বড় শব্দ শুনতে পাই। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করিঃ "এটা কিসের শব্দ?" তিনি বলেনঃ "সত্তর বছর পূর্বে একটি পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আজ তা তথায় পৌঁছেছে।" ৪র্থ হাদীস এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামায পড়া অবস্থায় জাহান্নামকে দেখেছিলেন। ৫ম হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিরাযের রাত্রে জাহান্নাম ও তার শাস্তি অবলোকন করেছিলেন। এরকমই আরও সহীহ মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে। মু'তাযিলারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এটা স্বীকার করে না এবং বিপরীত কথা বলে থাকে। কাযী-ই-উনদুলুস মুনজির বিন সাঈদ বালুতীও তাদের অনুকরণ করেছেন।

## ইমাম রাযী (রঃ) এর বিশ্লেষণঃ

ইমাম রাযী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে লিখেছেনঃ "কেউ যদি বলে যে, সূরা-ই-কাওসার, সূরা-ই-আসর এবং সূরা-ই-আল কাফিরূনের মত ছোট ছোট সূরাগুলোও سُوْرَةٌ শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত, আর এটা সর্বজনবিদিত যে, এরকম সূরা কিংবা এর সমপর্যায়ের কোন সূরা রচনা করা সম্ভব, সুতরাং একে মানবীয় শক্তির বাইরে বলা নেহায়েত হঠধর্মী ও অযথা পক্ষপাতিত্ব করারই শামিল, তাহলে আমি উত্তরে বলব যে, আমরা তো কুরআন মাজীদের মু'জিযা হওয়ার দু'টি পন্থা বর্ণনা করে দ্বিতীয় পন্থাকে এজন্যেই পছন্দ করেছি যে, আমরা বলি, যদি এই ছোট সূরাগুলোও ভাষার সৌন্দর্য ও অলংকারের দিক দিয়ে এরকমই হয় যে,ওগুলোকেও মু'জিযা বলা যেতে পারে এবং ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব না হয়, তবে তো আমাদের উদ্দেশ্য লাভ হয়েই গেল। কেননা, এরূপ সূরা রচনা মানুষের সাধ্যের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও তারা এরূপ সূরা রচনা করতে পারছে না–এটা একথারই দলীল যে, ছোট ছোট আয়াতগুলোসহ সম্পূর্ণ কুরআনই মু'জিযা।" এটা তো ইমাম রাযীর (রঃ) কথা। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন কারীমের ছোট বড় প্রত্যেকটি সূরা মু'জিযা এবং মানুষ এর অনুরূপ রচনা করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অপারগ।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, মানুষ যদি গভীর চিন্তা সহকারে শুধুমাত্র সূরা 'আল–আসর'কে বুঝবার চেষ্টা করে তাহলেই যথেষ্ট। হযরত আমর বিন আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে প্রতিনিধি হিসেবে মুসাইলামা কায্যাবের নিকট উপস্থিত হলে সে তাকে জিজ্ঞেস করেঃ "তুমি তো মক্কা থেকেই আসছো, আচ্ছা বলতো আজকাল কোন নতুন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে?" তিনি বলেনঃ সম্প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা অত্যন্ত চারুবাক ও ভাষার সৌন্দর্য ও অলংকারে পরিপূর্ণ এবং খুবই ব্যাপক।" অতঃপর সূরা-ই-আল-আসর পড়ে শুনান। মুসাইলামা কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলেঃ "আমার উপরও এ রকমই একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।" তিনি বলেনঃ "ঠিক আছে, শুনাও দেখি।" সে বলেঃ

يَا وَبَرُ يَا وَبَرُ إِنَّمَا أَنْتَ أُذُنَانِ وَ صَدْرٌ * وَسَائِرُكَ حَقْرٌ بَقْرٌ

অর্থাৎ "ওহে জংলী ইঁদুর! তোমার অস্তিত্ব তো দু'টি কান ও বক্ষ ছাড়া কিছুই নয়, বাকী তো তোমার সবই নগণ্য।" অতঃপর সে বলেঃ বল হে আমর! কেমন হয়েছে? তিনি (আমর রাঃ) বলেনঃ আমাকে জিজ্ঞেস করছো কি? তুমি তো সবই জান যে, এর সবই মিথ্যা। কোথায় এই বাজে কথা আর কোথায় সেই জ্ঞান ও দর্শনপূর্ণ বাণী।"

٢٥- وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ لا وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

**২৫। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাদের জন্যে এমন বেহেশ্‌ত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে; যখন তা হ'তে তাদেরকে উপজীবিকার জন্যে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখন তারা বলবে–আমাদের এটা তো পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল এবং তাদেরকে এতদ্বারা ওর সদৃশ প্রদান করা হবে এবং তাদের জন্যে তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ রয়েছে এবং তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।**

যেহেতু এর পূর্বে কাফির ও ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কাজেই এখানে মুমিন ও সৎলোকদের প্রতিদান, পুণ্য ও সম্মানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কুরআনের مَثَانِى হওয়ার এটাও একটা অর্থ এবং সঠিক অর্থ এটাই যে, এতে প্রত্যেক বিষয় জোড়া জোড়া রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণও উপযুক্ত জায়গায় দেয়া হবে। ভাবার্থ এই যে, ঈমানের সঙ্গে কুফরের এবং কুফরের সঙ্গে ঈমানের পুণ্যের সঙ্গে পাপের ও পাপের সঙ্গে পুণ্যের বর্ণনা অবশ্যই আসে। যে জিনিসের বর্ণনা দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত জিনিসেরও বর্ণনা দেয়া হয়। কোন জিনিসের বর্ণনা দিয়ে কোন জায়গায় তার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়। مُتَشَابِهٌ এরকমই।

জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার বৃক্ষরাজী ও অট্টালিকার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া। হাদীস শরীফে আছে যে, তথায় নদী প্রবাহিত হয়, কিন্তু গর্ত নেই। অন্য হাদীসে আছে যে, কাওসার নদীর দু'ধারে খাঁটি মুক্তার গম্বুজ আছে, তার মাটি হচ্ছে খাঁটি মৃগনাভি, তার কুচি পাথরগুলো হচ্ছে মণি-মুক্তা ও অতি মূল্যবান পাথর। আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে যেন আমাদেরকে ঐ নিয়ামত দান করেন। তিনি বড় অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

হাদীসে আছে যে, জান্নাতের নদীগুলো মুশ্কের পাহাড়ের নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)। হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। জান্নাতবাসীদের এই কথা "ইতিপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।" এর ভাবার্থ এই যে, দুনিয়াতেও তাদেরকে এই ফলগুলো দেয়া হয়েছিল। তাদের এটা বলার কারণ এই যে, বাহ্যিক আকারে এটা সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।

ইয়াহ্ইয়া বিন কাসীর (রঃ) বলেন যে, এক পেয়ালা আসবে, তা সে খাবে আর এক পেয়ালা আসলে বলবেঃ "এটা এতো এখন খেলাম।" ফেরেশতারা বলবেনঃ "খেতে থাকুন। বরং এক হলেও স্বাদ আলাদা। তিনি আরও বলেন যে, বেহেশতের ঘাস হচ্ছে জাফরান এবং পাহাড়গুলো হচ্ছে মুশকের। ছোট ছোট সুন্দর ছেলেরা ফল এনে হাজির করছে এবং তারা খাচ্ছে। আবার আনলে তারা বলছেঃ ওটা এখনই তো খেলাম।" তারা উত্তর দিচ্ছেঃ জনাব! রং ও রূপ তো এক, কিন্তু স্বাদ পৃথক; খেয়ে দেখুন।" খেয়েই তারা আরও সুস্বাদু অনুভব করছে। সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার এটাই অর্থ। দুনিয়ার ফলের সঙ্গেও নামে ও আকারে সাদৃশ্য থাকবে, কিন্তু স্বাদ হবে পৃথক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাদৃশ্য শুধু নামে হবে, নচেৎ কোথায় এখানকার জিনিস আর কোথায় ওখানকার জিনিস। এখানে তো শুধু নামই আছে। আবদুর রহমানের (রাঃ) কথা এই যে, দুনিয়ার ফলের মত ফল দেখে বলবেঃ "এটা তো খেয়েছি।" কিন্তু যখন খাবে তখন বুঝবে যে, মজা অন্য কিছু। তথায় তারা যেসব স্ত্রী পাবে তারা মলিনতা, অপবিত্রতা, মাসিক ঋতু প্রস্রাব, পায়খানা, থুথু ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। হযরত হাওয়াও (আঃ) প্রথমে মাসিক ঋতু হতে পবিত্র ছিলেন। কিন্তু অবাধ্যতা প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তার উপরেও এ বিপদ এসে যায়। কিন্তু একথাটি সনদ হিসেবে গরীব বা দুর্বল।

আর একটি গরীব মারফূ হাদীসে আছে যে, হায়েয, পায়খানা, থুথু হতে পাক। হাকিম (রঃ) এই হাদীসটিকে শায়খাইনের শর্তের উপরে সঠিক বলেছেন। কিন্তু এ দাবী সত্য নয়। এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছে আবদুর রায্যাক বিন উমার বাযীঈ, যার হাদীসকে আবূ হাতিম বাসতী দলীলরূপে গ্রহণের যোগ্য মনে করেন না। প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, হাদীসটি মারফূ' নয়। বরং এটা হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর কথা। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

٢٦- إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ○

২৬। নিশ্চয় আল্লাহ মশক অথবা তদপেক্ষা বৃহত্তর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে খুবই স্থানোপযোগী হয়েছেঃ আর যারা কাফির হয়েছে, সর্বাবস্থায় তারা এটাই বলবে–এসব নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করে থাকেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই বিপথগামী করে থাকেন।

٢٧- الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

২৭। যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ঐসব সম্বন্ধ ছিন্ন করে যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা ভূপৃষ্ঠে বিবাদের সৃষ্টি করে, তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন উপরের তিনটি আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হলো অর্থাৎ আগুন ও পানি, তখন তারা বলতে লাগলো যে, এরকম ছোট ছোট দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা কখনও বর্ণনা করেন না। তার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন। হযরত

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, যখন কুরআন পাকের মধ্যে মাকড়সা ও মাছির দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয় তখন মুশরিকরা বলতে থাকে যে, কুরআনের মত আল্লাহ্র কিতাবে এরকম নিকৃষ্ট প্রাণীর বর্ণনা দেয়ার কি প্রয়োজন? তাদের একথার উত্তরে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, সত্যের বর্ণনা দিতে আল্লাহ আদৌ লজ্জাবোধ করেন না, তা কমই হোক বা বেশীই হোক। কিন্তু এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এই আয়াতগুলো বুঝি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তা নয়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন। এগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ অন্যান্য গুরুজন হতেও এরকমই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত রাবী' বিন আনাস (রাঃ) বলেন যে, এটা একটা মজবুত দৃষ্টান্ত যা দুনিয়ার দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মশা ক্ষুধার্ত থাকা পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং মোটা তাজা হলেই মারা যায়। এ রকমই এ লোকেরাও যখন ইহলৌকিক সুখ সম্ভোগ প্রাণভরে ভোগ করে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন। যেমন আল্লাহ পাক এক জায়গায় বলেনঃ "যখন এরা আমার উপদেশ ভুলে যায়, তখন আমি তাদের জন্যে সমস্ত জিনিসের, দরজা খুলে দেই, শেষ পর্যন্ত তারা গর্বভরে চলতে থাকে, এমন সময় হঠাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করি।" ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এইরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) প্রথম মতটি পছন্দ করেছেন এবং সম্বন্ধও এরই বেশী ভাল মনে হচ্ছে। তা'হলে ভাবার্থ হলো এই যে, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হতে বৃহৎতম কোন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে আল্লাহ পাক লজ্জা ও সংকোচ বোধ করেন না। مَا শব্দটি এখানে নিম্নমানের অর্থ বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। بَعُوْضَةً শব্দটি بَدَلْ হওয়ায় ওকে نَصَبْ দেয়া হয়েছে। কিংবা مَا শব্দটি نَكِرَة مَوْصُوفَة এবং بَعُوْضَةً -এর صِفَت হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ) مَا শব্দটির مَوْصُوْلَة হওয়া এবং بَعُوْضَةٌ শব্দটির ওর اِعْرَاب দ্বারা مُعْرَب হওয়াকে পছন্দ করেছেন এবং আরবদের কালামেও এটা খুব বেশী প্রচলিত আছে। তারা مَا ও مَنْ -এর صِلَة কে এ দু'টোরই اِعْرَاب দিয়ে থাকে। এজন্যই এটা কখনও نَكِرَة হয় এবং কখনও مَعْرِفَة হয়। যেমন হযরত হাস্সান বিন সাবিতের (রাঃ) কবিতায় রয়েছেঃ

يَكْفِى بِنَا فَضْلاً عَلٰى مَنْ غَيْرُنَا * حُبُّ النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ اِيَّانَا

অর্থাৎ "অন্যদের উপর আমাদের শুধু এটুকুই মর্যাদা যথেষ্ট যে, আমাদের অন্তর আল্লাহ্র নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রেমে পরিপূর্ণ।" লুপ্ত جَار -এর ভিত্তিতেও بَعُوْضَةً শব্দটি مَنْصُوْب হতে পারে এবং ওর পূর্বে بَيْنَ শব্দটি উহ্য মেনে

নেয়া হবে। কাসাঈ (রঃ) এবং কারা (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। যহ্‌হাক (রঃ) ও ইবরাহীম বিন আবলাহ (রঃ) بَعُوْضَةٌ পড়ে থাকেন। ইবনে জনী (রঃ) বলেন যে, এটা مَا এর صِلَةٌ হবে এবং عَائِدٌ শব্দটিকে লুপ্ত মেনে নেয়া হবে। যেমন, تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ اَحْسَنَ অর্থাৎ عَلَى الَّذِيْ هُوَ اَحْسَنَ হবে। فَمَا فَوْقَهَا-র দু'টি অর্থ। একটি তো হলো এই যে, ওর চেয়েও হালকা ও খারাপ জিনিস। যেমন কেউ কোন লোকের কৃপণতা ইত্যাদির কথা বর্ণনা করলে অন্যজন বলে যে, সে আরও উপরে। তখন ভাবার্থ এই হয় যে, এই দোষে সে আরও নীচে নেমে গেছে। কাসাঈ এবং আবূ আবীদ এটাই বলে থাকেন।

একটি হাদীসে আছে যে, যদি দুনিয়ার কদর আল্লাহ্‌র কাছে একটি মশার ডানার সমানও হতো তবে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও দেয়া হতো না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে,ওর চেয়ে বেশী বড়। কেননা, মশার চেয়ে ছোট প্রাণী আর কি হতে পারে? কাতাদাহ্ বিন দাআ'মার এটাই মত। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে যে, যদি কোন মুসলমানকে কাঁটা লাগে বা এর চেয়েও বেশী তবে তার জন্যেও তার মর্যাদা বেড়ে যায় এবং পাপ মোচন হয়। এ হাদীসেও فَمَا فَوْقَهَا শব্দটি আছে। তাহলে ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যেমন এ ছোট বড় জিনিসগুলো সৃষ্টি করতে আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জাবোধ করেন না, তেমনই ওগুলোকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণনা করতেও তাঁর কোন দ্বিধা ও সংকোচ নেই। কুরআন কারীমের মধ্যে আল্লাহ্ পাক এক জায়গায় বলেছেনঃ হে লোক সকল! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তোমরা কান লাগিয়ে শোনোঃ আল্লাহকে ছেড়ে যাকে তোমরা ডাকছো, তারা যদি সবাই একত্রিত হয় তবুও একটি মাছিও তারা সৃষ্টি করতে পারবে না বরং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে এরা ওর কাছ থেকে তা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। উপাসক ও উপাস্য উভয়েই খুবই দুর্বল।" অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ "আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদেরকে যারা তাদের মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জালের ন্যায়, যার ঘর সমূদয় ঘর হতে নরম ও দুর্বল। অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহর তা'আলা কালিমায়ে তাইয়্যেবার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, এটা একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় যার শিকড়গুলো খুবই শক্ত এবং ওর শাখাগুলো উপর দিকে যাচ্ছে। ওটা আল্লাহর আদেশে প্রত্যেক মৌসুমে ফল দিয়ে থাকে; এবং আল্লাহ দৃষ্টান্তগুলো এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তারা খুব বুঝে নেয়। আর অপবিত্র কালেমার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ, যা যমীনের উপর থেকে উপড়িয়ে নেয়া যায়, ওর কোন স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদেরকে সেই অটল বাক্যের দরুন ইহকালে ও পরকালের সুদৃঢ় রাখেন, এবং জালিমদেরকে বিভ্রান্ত করে

দেন এবং আল্লাহ যা চান তাই করেন।” অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা সেই ক্রীতদাসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যার কোন জিনিসের উপর স্বাধীনতা নেই।” তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ “আল্লাহ দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে একজন তো বোবা এবং সে কোন কিছুর উপরেই ক্ষমতা রাখে না, সে তার মনিবের উপর বোঝা স্বরূপ, সে যেখানেই যায়, অপকার ছাড়া উপকারের কিছু আনতে পারে না, এবং দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে ন্যায় ও সত্যের আদেশ করে, এ দুজন কি সমান হতে পারে।” অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ “আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদেরই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, তোমরা কি তোমাদের নিজেদের জিনিসে তোমাদের গোলামদেরকে শরীক ও সমান অংশদীর মনে করছো? অন্যত্র বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যার বহু সমান সমান অংশীদার রয়েছে।” অপর জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেনঃ “এই দৃষ্টান্তগুলো আমি আলেমগণের জন্যে বর্ণনা করে থাকি এবং একমাত্র আলেমগণই তা অনুধাবন করতে থাকে।” এ ছাড়া আরও বহু দৃষ্টান্ত কুরআন পাকের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

পূর্বযুগের কোন একজন মনীষী বলেছেনঃ “যখন আমি কুরআন মাজীদের কোন দৃষ্টান্ত শুনি এবং বুঝতে পারি না তখন আমার কান্না এসে যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, এ দৃষ্টান্তগুলো শুধুমাত্র আলেমরাই বুঝে থাকে।” হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, দৃষ্টান্ত ছোটই হোক আর বড়ই হোক, ঈমানদারগণ ওর উপর ঈমান এনে থাকে, ওকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তা' দ্বারা সুপথ পেয়ে থাকে। কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, তারা ওকে আল্লাহ্র কালাম মনে করে। أَنَّهُ এর ضَمِير টির مَرْجَعْ হচ্ছে مِثَال অর্থাৎ মু'মিন এ দৃষ্টান্তকে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য মনে করে, আর কাফিরেরা কথা বানিয়ে থাকে। যেমন সূরা-ই-মুদ্দাসসিরে আছেঃ “এবং দোযখের কর্মচারী আমি শুধু ফেরেস্তাদেরকেই নিযুক্ত করেছি, আর আমি তাদের সংখ্যা শুধু এরূপ রেখেছি যা কাফিরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, এজন্যে যে, কিতাবীগণ যেন বিশ্বস্ত হয় এবং ঈমানদারদের ঈমান আরও বর্ধিত হয়, আর কিতাবীগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ না করে, আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা এবং কাফিরেরা যেন বলে যে, এ বিস্ময়কর উপমা দ্বারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য কি? এরূপেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করে থাকেন; আর তোমার প্রভুর সৈন্যবাহিনীকে তিনি ছাড়া কেউই জানে না আর এটা শুধু মানুষের উপদেশের জন্যে।” এখানেও হিদায়াত ও গুমরাহীর বর্ণনা রয়েছে। সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুনাফিক পথভ্রষ্ট হয় এবং মু'মিন সুপথ প্রাপ্ত হয়। মুনাফিকরা ভ্রান্তির মধ্যে বেড়ে চলে, কেননা এ দৃষ্টান্ত যে সত্য তা জানা সত্ত্বেও তারা একে অবিশ্বাস করে, আর মু'মিন এটা বিশ্বাস করে ঈমান আরও বাড়িয়ে নেয়।

فَاسِقِيْنَ -এর ভাবার্থ হচ্ছে 'মুনাফিক'। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন 'কাফির'—যারা জেনে শুনে অস্বীকার করে। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা খারেজীগণকে বুঝান হয়েছে। একথার সনদ যদি হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে হওয়া সঠিক হয়, তবে ভাবার্থ হবে এই যে, এ তাফসীর অর্থের দিক দিয়ে এ নয় যে, এর ভাবার্থ খারেজীরা বরং ঐ দলটিও ফাসিকদের অন্তর্ভুক্ত যারা 'নাহারওয়ানে' হযরত আলীর (রাঃ) উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। তাহলে এরা যদিও আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল না, তথাপি তাদের জঘন্য দোষের কারণে অর্থের দিক দিয়ে তারাও ফাসিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা ন্যায় ও সঠিক ঈমানের আনুগত্য হতে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী শরীয়ত হতে সরে পড়েছিল বলে তাদেরকে খারেজী বলা হয়েছে।

যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে বেরিয়ে যায়, আরবী পরিভাষায় তাকে ফাসিক বলা হয়। ছাল সরিয়ে শীষ বের হলে আরবেরা فَسَقَتْ বলে থাকে। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে ক্ষতি সাধন করতে থাকে বলে ওকেও فُوَاسِقَةٌ বলা হয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "পাঁচটি প্রাণী 'ফাসিক'। কাবা শরীফের মধ্যে এবং ওর বাইরে এদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে। এগুলো হচ্ছেঃ ১। কাক, ২। চিল, ৩। বিচ্ছু, ৪। ইঁদুর এবং ৫। কালো কুকুর। সুতরাং কাফির এবং প্রত্যেক অবাধ্যই ফাসিকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাফির ফাসিক সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে খারাপ। আর এ আয়াতে ফাসিকের ভাবার্থ হচ্ছে কাফির। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

এর বড় দলীল এই যে, পরে তাদের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, তাঁর নির্দেশ অমান্য করা, যমীনে ঝগড়া-বিবাদ করা, আর কাফিরেরাই এসব দোষে জড়িত রয়েছে, মু'মিনদের বিশেষণ তো এর সম্পূর্ণ বিরপীত হয়ে থাকে। যেমন সূরা-ই-রা'দে বর্ণিত হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে যে, যা কিছু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার উপর নাযিল হয়েছে, তা সবই সত্য—এ ব্যক্তি কি তার মত হতে পারে যে অন্ধ? বস্তুতঃ উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে থাকে। যারা আল্লাহর সঙ্গে যা অঙ্গীকার করেছে তা পুরো করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। আর তারা এমন যে, আল্লাহ যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা বহাল রাখে এবং তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে ও কঠিন শাস্তির আশংকা করে।" একটু আগে বেড়ে বলা হয়েছেঃ "আর যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকারসমূহকে তা শক্ত করার পর ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় ফিৎনা ফাসাদ করে, এমন লোকদের উপর হবে লা'নৎ এবং তাদের পরিণাম হবে অশুভ।" আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এখানে অঙ্গীকারের অর্থ এটাই আর তা হচ্ছে আল্লাহর

সম্পূর্ণ নির্দেশ মেনে চলা এবং সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। তাকে ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তার উপর আমল না করা। কেউ কেউ বলেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরা হচ্ছে আহলে কিতাবের কাফির ও মুনাফিকরা। অঙ্গীকার হচ্ছে ওটাই যা তাওরাতে তাদের কাছে নেয়া হয়েছিল যে, তারা ওর সমস্ত কথা মেনে চলবে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য মনে করবে। আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এই যে, জেনেশুনে তারা তাঁর নবুওয়াত ও আনুগত্য অস্বীকার করেছে এবং অঙ্গীকার সত্ত্বেও ওকে গোপন করেছে, আর পার্থিব স্বার্থের কারণে ওর উল্টো করেছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) এই কথাকে পছন্দ করে থাকেন এবং মুকাতিল বিন হিব্বানেরও (রঃ) এটাই কথা। কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থে কোন নির্দিষ্ট দলকে বুঝায় না, বরং সমস্ত কাফির, মুশরিক ও মুনাফিককে বুঝায়। অঙ্গীকারের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং তাঁর নবীর (সঃ) নবুওয়াতকে স্বীকার করা—যার প্রমাণে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও বড় বড় মু'জিযা—বিদ্যমান রয়েছে। আর ওটা ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ ও সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং অস্বীকার করা। এই কথাটিই বেশী মজবুত ও যুক্তিসঙ্গত। ইমাম যামাখ্শারীর (রঃ) ঝোঁকও এদিকেই। তিনি বলেন যে, অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস করা—যা মানবীয় প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া অঙ্গীকারের দিন এর অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ পাক বলেছিলেনঃ "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তখন সবাই উত্তর দিয়েছিলঃ "হাঁ, নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রভু।" অতঃপর যেসব কিতাব দেয়া হয়েছে তাতেও অঙ্গীকার করানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তোমরা আমার অঙ্গীকার পুরো কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পুরো করব।" কেউ কেউ বলেন যে, অঙ্গীকারের ভাবার্থ হচ্ছে সেই অঙ্গীকার যা আত্মাসমূহের নিকট হতে নেয়া হয়েছিল, যখন তাদেরকে হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে বের করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তোমাদের প্রভু যখন আদম (আঃ) এর সন্তানদের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমিই তোমাদের প্রভু এবং তারা সবাই স্বীকার করেছিল।" আর একে ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে একে ছেড়ে দেয়া। এ সমুদয় কথা তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

## মুনাফিকের লক্ষণ

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভেঙ্গে দেয়া যা মুনাফিকদের কাজ ছিল, তা হচ্ছে এই ছয়টি অভ্যাসঃ (১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলা, (২) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, (৩) গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করা, (৪) আল্লাহ্র অঙ্গীকার দৃঢ় করণের পর তা ভঙ্গ করা (৫) যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ

দেয়া হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন করা এবং (৬) পৃথিবীতে বিবাদের সৃষ্টি করা। তাদের এই ছয়টি অভ্যাস তখনই প্রকাশ পায় যখন তারা জয়যুক্ত হয়। আর যখন তারা পরাজিত হয় তখন তারা প্রথম তিনটি কাজ করে থাকে।" সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, কুরআনের আদেশ ও নিষেধাবলী পড়া, সত্য বলিয়া জানা, অতঃপর না মানাও ছিল অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আল্লাহ যা মিলিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন—এর ভাবার্থ হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখা এবং আত্মীয়দের হক আদায় করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আছেঃ "সুতরাং যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাকো, তবে কি তোমাদের এ সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিবাদ সৃষ্টি কর এবং পরস্পর আত্মীয়তা কর্তন করে ফেল?" ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) একেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতটি সাধারণ। যা মিলিত রাখার ও আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা তারা ছিন্ন করেছিল এবং আদায় করেনি। خَاسِرُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে আখেরাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "তাদের উপর হবে লা'নত এবং তাদের পরিণাম হবে খারাপ।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, কুরআন মাজীদে মুসলমান ছাড়া অন্যদেরকে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে সেখানে ভাবার্থ হবে কাফির এবং যেখানে মুসলমানকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে সেখানে অর্থ হবে পাপী। خَاسِرُوْنَ শব্দটি خَاسِرٌ -এর বহুবচন। জনগণ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহ্র রহমত হতে সরে গেছে বলে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে। মুনাফিক ও কাফির ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মতই। যখন দয়া অনুগ্রহের খুবই প্রয়োজন হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন—সেই দিন এরা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত থাকবে।

**২৮। কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছো? অথচ তোমরা নির্জীব ছিলে, পরে তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন, পরে আবার জীবন্ত করবেন, অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রতিগমন করতে হবে।**

٢٨- كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

## আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জোরালো দলীলসমূহ

আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান রয়েছেন, তিনি ব্যাপক ক্ষমতবান এবং তিনিই সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি প্রমাণ করার পর এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ "কেমন করে তোমরা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করছো? অথচ তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী তো একমাত্র তিনিই। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেছেনঃ "তারা কি কোন জিনিস ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? কিংবা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা নাকি? বা তারা কি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? (কখনও নয়) বরং তারা বিশ্বাস করে না।" অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ "নিঃসন্দেহে মানুষের উপর কালের মধ্যে এমন একটি সময় অতীত হয়েছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।" এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ কাফিরেরা যে বলবে– 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দু'বার মেরেছেন এবং দু'বার জীবিত করেছেন, আমরা আমাদের পাপসমূহ স্বীকার করছি,' এর ভাবার্থ এবং এই আয়াতের ভাবার্থ একই যে, তোমরা তোমাদের পিতার পৃষ্ঠে মৃত ছিলে। অর্থাৎ কিছুই ছিলে না। তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, আবার তোমাদেরকে মারবেন। অর্থাৎ মৃত্যু একদিন অবশ্যই আসবে। আবার তিনি তোমাদেরকে কবর হতে উঠাবেন। এভাবেই মরণ দু'বার এবং জীবন দু'বার।

আবূ সালিহ্ (রঃ) বলেন যে, কবরে মানুষকে জীবিত করা হয়। আবদুর রহমান বিন যায়েদের (রঃ) বর্ণনা আছে যে, হযরত আদমের (আঃ) পৃষ্ঠে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তাদের কাছে আহাদ বা অঙ্গীকার নিয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রাণহীন করেছেন। আবার মায়ের পেটে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উপর ইহলৌকিক মৃত্যু এসেছে। আবার কিয়ামতের দিন তাদেরকে জীবিত করবেন। কিন্তু এ মতটি দুর্বল। প্রথম মতটিই সঠিক। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাবেঈগণের একটি দলেরও এটাই মত। কুরআন মাজীদে আর এক জায়গায় আছেঃ "আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই মারেন, অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন।"

যেসব পাথর ও ছবিকে মুশ্রিকরা পূজা করত, কুরআন ওগুলোকেও মৃত বলেছে। আল্লাহ বলেনঃ "ঐ সব মৃত, জীবিত নয়।" যমীন সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তাদের জন্যে মৃত জমীনও নিদর্শন যাকে আমি জীবিত করি এবং তা হতে দানা বের হয় যা তারা খেয়ে থাকে।"

২৯। তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যা কিছু আছে-সমস্তই সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

٢٩- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

পূর্বের আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ দলীলসমূহ বর্ণনা করেছিলেন যা স্বয়ং মানুষের মধ্যে রয়েছে। এখন আল্লাহ পাক এই পবিত্র আয়াতে ঐ দলীলসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যা দৈনন্দিন মানুষের চোখের সামনে ভাসছে। اِسْتَوٰى শব্দটি এখানে ইচ্ছা করা ও মনঃসংযোগ করা অর্থে এসেছে। কেননা এর صِلَة এসেছে اِلٰى এবং سَوَّاهُنَّ -এর অর্থ হচ্ছে ঠিক করা এবং নির্মাণ করা। سَمَاءٌ শব্দটি اِسْم جِنْس -অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, প্রত্যেক জিনিস সম্বন্ধে তাঁর জানা আছে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ "যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না?" এ আয়াতটির ব্যাখ্যা যেন সূরা-ই- হা-মীম আস্ সিজদাহ্র এ আয়াতটিঃ "(হে নবী সঃ!) তুমি বলে দাও, তোমরা কি এমন আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাস করছ, যিনি যমীনকে দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করছ? তিনিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আর তিনি যমীনের, তার উপরিভাগে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, আর তাতে চার দিনে তার অধিবাসীবৃন্দের খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করেছেন, এটা জিজ্ঞাসুগণের জন্যে পূর্ণ (বর্ণনা)। অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, আর তা (তখন) ধূম্রবৎ ছিল, তিনি তাকে এবং যমীনকে বললেন-তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় (আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে নিতে) এস; তখন উভয়ে বললো আমরা সানন্দে (উক্ত আদেশাবলীর জন্যে) প্রস্তুত রয়েছি। অতঃপর দু'দিনে আল্লাহ সাতটি আকাশ সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার কাজ ভাগ করে দিলেন এবং দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করলেন এবং তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এটা তাঁরই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহাপরাক্রান্ত জ্ঞানময়।"

## সৃষ্টিসমূহের বিন্যাসঃ

এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অট্টালিকা নির্মাণের এটাই নিয়ম যে, প্রথমে নির্মাণ করা হয় নীচের অংশ এবং পরে

উপরের অংশ। মুফাস্সিরগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা ইনশাআল্লাহ এখনই আসছে। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, আল্লাহ পাক অন্য স্থানে বলেছেনঃ "আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি কঠিন কাজ, নাকি আসমান? আল্লাহ ওটা (এরূপে) নির্মাণ করেছেন যে, ওর ছাদ উঁচু করেছেন এবং ওকে সঠিকভাবে নির্মাণ করেছেন। আর ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর দিনকে প্রকাশ করেছেন। আর এরপর জমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তা হতে পানি ও তৃণ বের করেছেন এবং পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন। (তিনি এ সব কিছু করেছেন) তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর উপকারের জন্যে।" এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আকাশের পরে যমীন সৃষ্টি করেছেন।" কোন কোন মনীষী তো বলেছেন যে, উপরের আয়াতটিতে ثُمَّ শুধু عَطْفِ خَبَرِ -এর জন্যে এসেছে, عَطْفِ فِعْل -এর জন্যে নয়। অর্থাৎ ভাবার্থ এই নয় যে, যমীনের পরে আকাশের সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করেছেন, বরং উদ্দেশ্য শুধু সংবাদ দেয়া যে, আকাশসমূহও সৃষ্টি করেছেন এবং জমীনও সৃষ্টি করেছেন। আরব কবিদের কবিতায় এ দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন কোন স্থলে ثُمَّ শুধুমাত্র খবর দেয়ার জন্যেই সংযুক্ত হয়ে থাকে–'আগে ও পরে' উদ্দেশ্য হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, পরবর্তী আয়াতটিতে আসমানের সৃষ্টির পরে যমীন বিছিয়ে দেয়া ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে, সৃষ্টি করা নয়। তাহলে ঠিক আছে যে, প্রথমে যমীন সৃষ্টি করেছেন, পরে আসমান। অতঃপর যমীনকে ঠিকভাবে সাজিয়েছেন। এতে আয়াত দু'টি পরস্পর বিরোধী আর থাকলো না। এ দোষ হতে মহান আল্লাহ্র কালাম সম্পূর্ণ মুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ অর্থই করেছেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার আরশ পানির উপরে ছিল। এর পূর্বে তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর যখন তিনি অন্যান্য জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছে করেন, তখন তিনি পানি হতে ধূম্র বের করেন এবং সেই ধূম্র উপরে উঠে যায়। তা হতে তিনি আকাশ সৃষ্টি করেন। তারপর পানি শুকিয়ে যায় এবং ওকে তিনি যমীনে পরিণত করেন। এবং পরে পৃথক পৃথকভাবে সাতটি যমীন করেন। রোববার ও সোমবার এই দু'দিনে সাতটি যমীন নির্মিত হয়। যমীন আছে মাছের উপরে, মাছ ওটাই যার বর্ণনা কুরআন মাজীদের نٓ وَ الْقَلَمِ এই আয়াতটিতে রয়েছে। মাছ আছে পানির উপরে, পানি আছে, 'সাফাতের' পিঠের উপর এবং 'সাফাত' আছে ফেরেশতার পিঠের উপর এবং ফেরেশতা আছেন পাথরের উপর, এটা ঐ পাথর, যার বর্ণনা হযরত লোকমান করেছেন।

পাথরটি আছে বাতাসের উপর, আসমানেও নেই এবং যমীনেও নেই। যমীন কাঁপতে থাকলে আল্লাহ তাঁর উপর পাহাড় স্থাপন করেন, তখন তা থেমে যায়। আল্লাহ তা'আলার এ কথার অর্থ এটাইঃ 'আমি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে। পাহাড়, যমীনে উৎপাদিত শস্য এবং যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস মঙ্গল ও বুধ এই দু'দিনে সৃষ্টি করেন। এরই বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত আয়াতটিতে রয়েছে। অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ওটা ছিল ধূম্র।। অতঃপর তা হতে সাতটি আকাশ নির্মাণ করেন। এটা বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই দু'দিনে নির্মিত হয়। শুক্রবার আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ কার্য জমা হয়েছিল বলে তাকে জুমআ' বলা হয়েছে।

আকাশে তিনি ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেন–যার জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারও নেই। দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন এবং ওগুলোকে শয়তান হতে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেন। এসব সৃষ্টি করার পর বিশ্বপ্রভু আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হন। যেমন তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তিনিই যিনি আসমানসমূহ ও জমীনকে এবং ঐ সমুদয় বস্তুকে, যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হন।"

## জগত সৃষ্টির মোট সময়ঃ

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে–হযরত আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, রোববার হতে মাখলুকের সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। দু'দিনে সৃষ্টি করা হয় যমীন, দু'দিনে যমীনের সমস্ত জিনিস এবং দু'দিনে আসমান সৃষ্টি করা হয়। শুক্রবারের শেষাংশে আসমানের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ঐ সময়েই হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ সময়েই কিয়ামত সংঘটিত হবে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। ওটা হতে যে ধোঁয়া উপরের দিকে উঠেছে তা হতে আকাশ নির্মাণ করেন–যা একটির উপর আর একটি এভাবে সাতটি এবং যমীনও একটির নীচে আরেকটি এভাবে সাতটি। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন সূরা-ই-সিজদাহ্র মধ্যে রয়েছে। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত। শুধুমাত্র কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, আকাশ যমীনের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। কুরতুবী (রঃ) এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। وَالنّٰزِعٰتِ -এর আয়াতকে সামনে রেখে ইনি বলেন যে, আকাশের সৃষ্টির বর্ণনা পৃথিবীর পূর্বে রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে আছে, হযরত আব্বাস (রাঃ) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, যমীন তো আকাশসমূহের পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু বিছানো হয়েছে পরে। সাধারণ

আলেমদেরও উত্তর এটাই। সুরা-ই- وَ النّٰزِعٰتِ -এর তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ এর বর্ণনা দেয়া হবে। ফলকথা এই যে, যমীন বিছানো হয়েছে পরে। কুরআন মাজীদের মধ্যে دَحٰهَا শব্দটি আছে এবং এর পরে পানি, চারা, পাহাড় ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এ শব্দটির ব্যাখ্যা যেন নিম্নরূপঃ মহান আল্লাহ যে যে জিনিসের বৃদ্ধির ক্ষমতা এই যমীনে রেখেছিলেন, ঐ সবকে প্রকাশ করে দিলেন এবং এর ফলে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপাদন বেরিয়ে আসলো। এভাবেই আকাশেও স্থির ও গতিশীল তারকারাজি ইত্যাদি নির্মাণ করলেন।

সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই-নাসাঈতে হাদীস আছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড় রোববারে, বৃক্ষরাজি সোমবারে, খারাপ জিনিসগুলো মঙ্গলবারে, আলো বুধবারে, জীবজন্তু বৃহস্পতিবারে এবং হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন শুক্রবারে আসরের পর সেই দিনের শেষ সময়ে আসরের পর থেকে নিয়ে রাত পর্যন্ত।" এ হাদীসটি 'গারাইব-ই-মুসলিম' এর মধ্যে রয়েছে। ইমাম ইবনে মাদীনী (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এর বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা হযরত কা'বের (রাঃ) নিজস্ব উক্তি এবং হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হযরত কা'বের (রাঃ) একথা শুনেছেন এবং কতক বর্ণনাকারী একে ভুলবশতঃ মারফূ' হাদীস হিসেবে ধরে নিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী (রঃ) এটাই বলেন।

---

৩০। এবং যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাগণকে বললেন– নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো, তারা বললো–আপনি কি যমীনে এমন সৃষ্টি করবেন যে, তারা তন্মধ্যে অশান্তি উৎপাদন করবে এবং শোণিতপাত করবে? এবং আমরাই তো আপনার প্রশংসা কীর্তন করছি এবং আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি তিনি বললেন– তোমরা যা অবগত নও নিশ্চয় আমি তা পরিজ্ঞাত আছি।

٣٠- وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٥

মহান আল্লাহ্র এই অনুগ্রহের কথা চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, তিনি হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশতাদের মধ্যে ওর আলোচনা করেন, যার বর্ণনা এ আয়াতের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেন নবী (সঃ) কে সম্বোধন করে বলছেন যে, হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি মানব সৃষ্টির ঘটনাটি স্মরণ কর এবং তোমার উম্মতকে জানিয়ে দাও। আবূ উবাইদাহ (রঃ) বলেন যে, এখানে اِذْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। কিন্তু ইবনে জারীর (রঃ) এবং অন্যান্য মুফাস্সিরগণ এটা অগ্রাহ্য করেন।

## খিলাফতের মূল তত্ত্বঃ

خَلِيْفَةٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে পরস্পর স্থলাভিষিক্ত হওয়া। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন।" অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ "যদি আমি চাইতাম তবে এ যমীনে ফেরেশতাগণকে তোমাদের খলীফা বানিয়ে দিতাম।" আর এক জায়গায় আল্লাহ বলেছেনঃ তাদের পরে তাদের খলীফা অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত খারাপ লোকেরা হয়েছে।" একটি অপ্রচলিত পঠনে خَلِيْقَةٌ খালায়ফাহ্ও পড়া হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, খলীফা শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র হযরত আদম (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়। তাফসীর-ই-রাযী প্রভৃতি কিতাবের মধ্যে এই মতভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, ভাবার্থ এটা নয়। এর প্রমাণ তো ফেরেশতাদের নিম্নের উক্তিটিঃ "তারা জমীনে ফাসাদ করবে ও রক্তারক্তি করবে। এটা স্পষ্ট কথা যে, তারা এটা হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের সম্পর্কে বলেছিলেন–খাস করে তাঁর সম্পর্কে নয়।

ফেরেশতারা এটা কি করে জেনেছিলেন সেটা অন্য কথা। হয়তো মানব প্রকৃতির চাহিদা লক্ষ্য করেই তাঁরা এটা বলেছিলেন। কেননা, এটা বলে দেয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হবে। কিংবা হয়তো 'খলীফা' শব্দের ভাবার্থ জেনেই তাঁরা এটা বুঝেছিলেন যে, মানুষ হবে ন্যায় অন্যায়ের ফায়সালাকারী, অনাচারকে প্রতিহতকারী। এবং অবৈধ ও পাপের কাজে বাধাদানকারী। অথবা তাঁরা জমীনের প্রথম সৃষ্টজীবকে দেখেছিলেন বলেই মানুষকেও তাদের মাপকাঠিতে ফেলেছিলেন। এটা মনে রাখা দরকার যে, ফেরেশতাদের এই আরয প্রতিবাদমূলক ছিল না বা তাঁরা যে এটা বানী আদমের প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে বলেছিলেন তাও নয়। ফেরেশতাদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা হচ্ছেঃ "যে কথা বলার তাদের অনুমতি নেই, তাতে তারা মুখ খুলে না।" (এটাও স্পষ্ট কথা যে, ফেরেশতাদের স্বভাব হিংসা হতে পবিত্র) বরং সঠিক ভাবার্থ এই যে তাঁদের এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র এর হিকমত

জানবার ও এর রহস্য প্রকাশ করবার, যা তাদের বোধশক্তির উর্ধে ছিল। আল্লাহ তো জানতেনই যে, এ শ্রেষ্ঠ জীব বিবাদ ও ঝগড়াটে হবে। কাজেই ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এ রকম মাখলূক সৃষ্টি করার মধ্যে বিশ্বপ্রভুর কি নিপূণতা রয়েছে? যদি ইবাদতেরই উদ্দেশ্যে হয়, তবে ইবাদত তো আমরাই করছি। আমাদের মুখেই তো সদা তাঁর তাস্‌বীহ ও প্রশংসাগীত উচ্চারিত হচ্ছে এবং আমরা ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি হতেও পবিত্র। তথাপি এরূপ বিবাদী মাখলূক সৃষ্টি করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা রয়েছে?"

মহান আল্লাহ তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তারা দুনিয়ায় ঝগড়া-বিবাদ, কাটাকাটি, মারামারি ইত্যাদি করবে এই জ্ঞান তাঁর আছে। তথাপি তাদেরকে সৃষ্টি করার মধ্যে যে নিপূণতা ও দূরদর্শিতা রয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি জানেন যে, তাদের মধ্যে নবী রাসূল; সত্যবাদী, শহীদ, সত্যের উপাসক, ওয়ালী, সৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী, আলেম, খোদাভীরু, প্রভৃতি মহা-মানবদের জন্ম লাভ ঘটবে, যারা তাঁর নির্দেশাবলী যথারীতি মান্য করবে এবং তারা তাঁর বার্তাবাহকদের ডাকে সাড়া দেবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, দিনের ফেরেশতাগণ সুবহে সাদেকের সময় আসেন এবং আসরের সময় চলে যান। সে সময় রাতের ফেরেশতাগণ আগমন করেন, তাঁরা আবার সকালে চলে যান। আগমনকারীগণ যখন আগমন করেন তখন অন্যেরা চলে যান। কাজেই তাঁরা ফজর ও আসরে জনগণকে পেয়ে থাকেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে দুই দলই একথা বলেনঃ "আমরা যাবার সময় আপনার বান্দাদেরকে নামাযে পেয়ে ছিলাম এবং আসার সময়ও তাদেরকে নামাযে ছেড়ে এসেছি।"এটাই হলো মানব সৃষ্টির যৌক্তিকতা যার সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে বলেছিলেনঃ "নিশ্চয় আমি জানি যার তোমরা জাননা।" ঐ ফেরেস্তাগণকে তা দেখবার জন্যও পাঠান হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দিনের আমলগুলো রাত্রির পূর্বে এবং রাত্রির আমলগুলো দিবসের পূর্বে আল্লাহর নিকট উঠে যায়।" মোটকথা মানব সৃষ্টির মধ্যে যে ব্যাপক দুরদর্শিতা নিহিত ছিল সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন যে, এটা তাঁদের 'আমরাই আপনার তাস্‌বীহ পাঠ করি' একথার উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহই সব জানেন অর্থাৎ ফেরেশতারা নিজেদের দলের সবকে সমান মনে করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেননা, তাদের মধ্যে ইবলিসও একজন। তৃতীয় মত এই যে, ফেরেশতাদের এটা বলার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের পরিবর্তে তাদেরকেই যেন ভু-পৃষ্ঠে বাস করতে দেয়া হয়। এর উত্তরেই আল্লাহ পাক বলেন যে, আকাশই তাদের বসবাসের উপযুক্ত স্থান, এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

হাসান (রঃ), কাতাদাহ্ (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাগণকে সংবাদ দিয়েছিলেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, পরামর্শ নিয়েছিলেন। কিন্তু এর অর্থও সংবাদ দেয়া হতে পারে, তা না হলে একথাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন মক্কা হতে যমীন ছড়ানো ও বিছানো হয় তখন সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করেন ফেরেশতাগণ। তখন আল্লাহ বলেনঃ "আমি যমীনে খলীফা বানাবো অর্থাৎ মক্কায়।" এর হাদীসটি মুরসাল; আবার এতে দুর্বলতা এবং এতে 'মুদরজ'ও রয়েছে, অর্থাৎ যমীনের ভাবার্থ 'মক্কা' নেয়া এটা বর্ণনাকারীর নিজস্ব ধারণা।

বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, 'যমীন' থেকে ভাবার্থ হচ্ছে সাধারণ। এর দ্বারা সমস্ত যমীনকেই বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ এটা শুনে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ঐ খলীফা দিয়ে কি কাজ হবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তার সন্তানদের মধ্যে এমন লোকও হবে যারা ভূ-পৃষ্ঠে ঝগড়া বিবাদ, কাটাকাটি মারামারি করবে এবং একে অপরের প্রতি হিংসা করবে। তাদের মধ্যে ওরা সুবিচার করবে এবং আমার আহকাম তাদের মধ্যে চালু করবে।

এটা হতে ভাবার্থ হচ্ছে হযরত আদম (আঃ) এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে ও সৃষ্টজীবের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁর স্থলবর্তীগণ, কিন্তু বিবাদীরা ও খুনাখুনিকারীরা খলীফা নয়। এখানে খিলাফতের ভাবার্থ হচ্ছে এক যুগীয় লোকের পরে অন্য যুগীয় লোকের আগমন। خَلِيْفَةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ শব্দের ওজনে এসেছে। যখন একের পরে অন্যজন তার স্থলবর্তী হয় তখন আরবেরা বলে থাকেঃ خَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির খলীফা হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছেঃ "আমি তাদের পরে তোমাদেরকে খলীফা করে তোমরা কিরূপ আমল কর তা দেখতে চাই।"

এজন্যেই বড় সম্রাটকে খলীফা বলা হয়। কেননা তিনি পূর্ববর্তী বাদশাহ্দের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলো যমীনে অবস্থানকারী, একে আবাদকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে জ্বিনেরা বাস করতো। তারা কাটাকাটি, মারামারি ও লুটতরাজ করতো। অতঃপর ইবলিসকে পাঠান হলে সে ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে মেরে ধরে দ্বীপে ও পাহাড়ে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে যমীনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি যমীনে বসতি স্থাপন করেন। কাজেই তিনি যেন তাঁর পূর্ববর্তীদের খলীফা বা স্থলবর্তী হলেন। সুতরাং মহান আল্লাহ যখন ফেরেশতাগণকে বলেনঃ "আমি যমীনে বসবাসকারী মাখলূক সৃষ্টি করতে চাই।" এর উত্তরে ফেরেশতাগণ যা বলেছিলেন তার দ্বারা তাঁরা আদম (আঃ)-এর সন্তানাদিকেই বুঝাতে চেয়েছিলেন।

সে সময় শুধু যমীন ছিল, কোন বসতি ছিল না। কোন কোন সাহাবী (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বানী আদমের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্বেই অবহিত করেছিলেন বলেই তাঁরা এ প্রশ্ন করেছিলেন। আবার এও বর্ণিত আছে যে, জ্বিনদের ফাসাদের উপর অনুমান করেই তাঁরা বানী আদমের ফাসাদের কথা বলেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ)-এর দু'হাজার বছর পূর্ব হতে জ্বিনেরা যমীনে বসবাস করতো। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতাদেরকে বুধবারে, জ্বিনদেরকে বৃস্পতিবারে এবং হযরত আদম (আঃ) কে শুক্রবারে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতাদেরকে বানী আদমের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্বেই জানান হয়েছিল বলে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন আলী (রঃ) বলেন যে, 'সাজল' নামক একজন ফেরেশতা আছেন। হারূত ও মারূত ছিলেন তাঁর সঙ্গী। দৈনিক তিনবার লাওহে মাহ্ফুজের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অনুমতি সাজলকে দেয়া হয়েছিল। একদা তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ক কার্যাবলী অবলোকন করতঃ তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে গোপনে বলে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলে এঁরা দু'জন এ প্রশ্ন করেন। কিন্তু বর্ণনাটি গরীব এবং গ্রহণের অযোগ্য। তাঁরা দু'জন প্রশ্ন করেছিলেন, একথা কুরআন মাজীদের বাকরীতির উল্টো।

এও বর্ণিত আছে যে, এ প্রশ্নকারী ফেরেশতারা ছিলেন দশ হাজার। তাঁদের সবাইকেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এটাও ইসরাঈলী বর্ণনা এবং খুবই গরীব বা দুর্বল। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, তাঁদেরকে এ প্রশ্ন করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং এও জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, এই মাখলূক অবাধ্য হবে। তখন তাঁরা বিস্মিতভাবে মানুষ সৃষ্টির যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানবার জন্যে প্রশ্ন করেছিলেন মাত্র। তারা কোন পরামর্শও দেননি অস্বীকারও করেননি বা কোন প্রতিবাদও করেননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয় তখন ফেরেশতাগণ বলেছিলেনঃ "আমাদের অপেক্ষা বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ও বিদ্বান মাখলূক সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব।" এর কারণে তাঁদের উপর আল্লাহ্র পরীক্ষা এসে যায় এবং কোন সৃষ্টজীবই পরীক্ষা হতে নিস্তার পায়নি। যমীন ও আসমানের উপরেও পরীক্ষা এসেছিল এবং ওরা অবনত মস্তকে ও সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছিল।

ফেরেশতাদের তাসবীহ ও তাকদীসের অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, নামায পড়া, বেয়াদবী হতে বেঁচে থাকা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা এবং তাঁর অবাধ্য না হওয়া। قُدُّوسٌ -এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্র ভূমিকে مُقَدَّسٌ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হচ্ছেনঃ "কোন কালামটি সর্বোত্তম?" উত্তরে তিনি বলছেনঃ "ওটা হচ্ছে ঐ কালামটি যা মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। ঐ কালামটি হচ্ছেঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ (সহীহ মুসলিম)।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) মি'রাজের রাত্রে আকাশে ফেরেশতাদের এই তাসবীহ শুনেছিলেনঃ-

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَعْلٰى سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى

ইমাম কুরতবী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এই আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, খলীফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব। তিনি মতবিরোধের মীমাংসা করবেন, ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দেবেন, অত্যাচারী হতে অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেবেন, 'হুদুদ' কায়েম করবেন, অন্যায় ও পাপের কাজ হতে জনগণকে বিরত রাখবেন ইত্যাদি বড় বড় কাজগুলো যার সমাধান ইমাম ছাড়া হতে পারে না। এসব কাজ ওয়াজিব এবং এগুলো ইমাম ছাড়া পুরো হতে পারে না, আর যা ছাড়া কোন ওয়াজিব পুরো হয় না ওটাও ওয়াজিব। সুতরাং খলীফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো।

ইমামতি হয়তো বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট শব্দের দ্বারা লাভ করা যাবে। যেমন আহলে সুন্নাতের একটি জামা'আতের হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খিলাফতের জন্যে তাঁর নাম নিয়েছিলেন। কিংবা কুরআন ও হাদীসে ওঁর দিকে ইঙ্গিত আছে। যেমন আহলে সুন্নাতেরই অপর একটি দলের প্রথম খলীফার ব্যাপারে ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইঙ্গিতে খিলাফতের জন্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন। অথবা হয়তো একজন খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফার নাম বলে যাবেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ) কে তাঁর স্থলবর্তী করে গিয়েছিলেন। কিংবা তিনি হয়তো সৎলোকদের একটি কমিটি গঠন করে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্বভার তাঁদের উপর অর্পণ করে যাবেন যেমন হযরত উমার (রাঃ) এরূপ করেছিলেন। অথবা আহ্লে হিল্লওয়াল আক্দ (অর্থাৎ প্রভাবশালী সেনাপতিগণ, আলেমগণ, সৎলোকগণ ইত্যাদি) একত্রিতভাবে তাঁর হাতে বায়আত করবেন, তাদের কেউ কেউ বায়আত করে নিলে জমহূরের মতে তাঁকে মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। মক্কা ও মদীনার ইমাম তা হতে ইজমা নকল

করেছেন। অথবা কেউ যদি জনগণকে জোরপূর্বক তাঁর কর্তৃত্বাধীন করে নেয় তবে হাঙ্গামা ও গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে তারও আনুগত্য স্বীকার করা ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) পরিষ্কার ভাষায় এর ফায়সালা করেছেন। এ বায়আত গ্রহণের সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি ওয়াজিব কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা শর্ত। আবার কারও মতে শর্ত বটে, কিন্তু দু'জন সাক্ষীই যথেষ্ট। জবাঈ (রঃ) বলেন যে, বায়আত গ্রহণকারী ও যাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করা হচ্ছে এ দু'জন ছাড়া চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। যেমন হযরত উমার (রাঃ) পরামর্শ সভার জন্যে ছয়জন লোক নির্ধারণ করেছিলেন। অতঃপর তাঁরা হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) কে অধিকার দিয়েছিলেন এবং তিনি বাকী চারজনের উপস্থিতিতে হযরত উসমান (রাঃ)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। কিন্তু এটা হতে দলীল গ্রহণের ব্যাপারে সমালোচনা আছে।

ইমাম হওয়ার জন্যে পুরুষ লোক হওয়া, আযাদ হওয়া, বালিগ হওয়া, বিবেক সম্পন্ন হওয়া, মুসলমান হওয়া, সুবিচারক হওয়া, ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়া, চক্ষু বিশিষ্ট হওয়া, সুস্থ ও সঠিক অঙ্গ বিশিষ্ট হওয়া, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া, সাধারণ অভিমত সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং কুরায়েশী হওয়া ওয়াজিব।

এটাই সঠিক মত। হাঁ, তবে হাশিমী হওয়া ও দোষমুক্ত হওয়া শর্ত নয়। গালী রাফেযী এ শর্ত দু'টি আরোপ করে থাকে। ইমাম যদি ফাসিক হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করা উচিত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সঠিক মত এই যে, তাকে পদচ্যুত করা হবে না। কেননা হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে পর্যন্ত না তোমরা এমন খোলাখুলি কুফরী লক্ষ্য কর যার কুফরী হওয়ার প্রকাশ্য দলীল আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট বিদ্যমান থাকে।" অনুরূপভাবে ইমাম নিজেই পদত্যাগ করতে পারে কিনা সে বিষয়েও মতবিরোধ রয়েছে। হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) নিজে নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন এবং ইমামের দায়িত্ব হযরত মু'আবিয়াকে (রাঃ) অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এটা ওজরের কারণে ছিল এবং যার জন্যে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে একাধিক ইমাম একই সময়ে হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমাদের মধ্যে কোন কাজ সম্মিলিতভাবে হতে যাচ্ছে এমন সময় কেউ যদি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তবে তাকে হত্যা করে দাও, সে যে কেউই হোক না

কেন।" জমহূরের এটাই মাযহাব এবং বহু গুরুজনও এর উপর ইজমা নকল করেছেন। যাঁদের মধ্যে ইমামুল হারামাইনও (রঃ) একজন।

কারামিয়াহদের (শীআ'হ) কথা এই যে, একই সময়ে দুই বা ততোধিক ইমাম হতে পারে। যেমন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) দু'জনই আনুগত্যের যোগ্য ছিলেন। এই দলটি বলে যে, যখন একই সময়ে দুই অথবা ততোধিক নবী হওয়া জায়েয, তখন ইমামদের হওয়া জায়েয হবে না কেন? নবুওয়াতের মর্যাদা তো নিঃসন্দেহে ইমামতের মর্যাদা হতে বহু উর্ধে। কিন্তু উপরের লেখা হাদীসে জানা গেল যে, অন্যকে হত্যা করে দিতে হবে। সুতরাং সঠিক মাযহাব ওটাই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইমামুল হারামাইন তাঁর শিক্ষক আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, একই সময়ে দুই বা ততোধিক ইমাম নিযুক্ত করা তখনই জায়েয হয়, যখন মুসলমানদের সাম্রাজ্য খুবই প্রশস্ত হয় এবং চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে ও দু'জন ইমামের মধ্যে কয়েকটি দেশের ব্যবধান থাকে। ইমামুল হারামাইন এতে সন্দেহ পোষণ করেন। খুলাফায়ে বানী আব্বাস ইরাকে, খুলাফায়ে বানী ফাতিমা মিসরে এবং উমাইয়া বংশধরগণ পশ্চিমে ইমামতের কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার ধারণায় তো অবস্থা এইরূপই ছিল। ইনশাআল্লাহ এর বিস্তারিত বিবরণ কিতাবুল আহকামের কোন উপযুক্ত স্থানে দেয়া হবে।

---

**৩১। এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, অনন্তর তৎসমূদয় ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন; তৎপর বললেন যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এসব বস্তুর নামসমূহ বিজ্ঞপিত কর।**

৩১- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

**৩২। তারা বলেছিল–আপনি পরম পবিত্র; আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের কোনই জ্ঞান নেই; নিশ্চয়ই আপনি মহা জ্ঞানী বিজ্ঞানময়।**

৩২- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৩৩। তিনি বলেছিলেন-হে আদম, তুমি তাদেরকে ঐ সকলের নামসমূহ জ্ঞাপন কর; অতঃপর যখন সে তাদেরকে ঐগুলোর নামসমূহ পরিজ্ঞাপন করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তাও পরিজ্ঞাত আছি।

٣٣- قَالَ يٰاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

এখানে একথারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটা বিশেষ জ্ঞানে হযরত আদম (আঃ) কে ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন।

এটা ফেরেশতাদের হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করার পরের ঘটনা। কিন্তু তাঁকে সৃষ্টি করার মধ্যে মহান আল্লাহ্র যে হিকমত নিহিত ছিল এবং যা ফেরেশতাগণ জানতেন না, তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে এ ঘটনাকেই পূর্বে বর্ণনা করেছেন এবং ফেরেশতাদের সিজদা করার ঘটনা, যা পূর্বে ঘটেছিল তা পরে বর্ণনা করেছেন, যেন খলীফা সৃষ্টি করার যৌক্তিকতা ও নিপুণতা প্রকাশ পায় এবং জানা যায় যে, হযরত আদম (আঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মান লাভ হয়েছে। এমন এক বিদ্যার কারণে যে বিদ্যা ফেরেশতাদের নেই। আল্লাহ পাক বলেন যে, তিনি হযরত আদম (আঃ) কে সমুদয় বস্তুর নাম শিখিয়ে দেন, অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের নাম, সমস্ত জীব জন্তুর নাম, যমীন, আসমান, পাহাড় পর্বত, জল-স্থল, ঘোড়া, গাধা, বরতন, পশু-পাখী, ফেরেশতা ও তারকারাজি ইত্যাদি সমুদয় ছোট বড় জিনিসের নাম।

হযরত ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, তাঁকে ফেরেশতা ও মানুষের নাম শিখানো হয়েছিল। কেননা এর পরে عَرَضَهُمْ শব্দটি এসেছে এবং এটা বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ইবনে জারীরের (রঃ) একথাটি বিবেক সম্মত কথা নয় যে, যেখানে বিবেক সম্পন্ন ও বিবেকহীন একত্রিত হয়ে থাকে সেখানে যে শব্দ আনা হয় তা শুধু বুদ্ধিজীবিদের জন্যেই আনা হয়। যেমন কুরআন মাজীদে আছেঃ 'আল্লাহ সমুদয় সৃষ্টজীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি

করেছেন, তাদের মধ্যে কতকগুলো পেটের ভরে ধীরে ধীরে চলে, কতকগুলো চলে দুই পায়ের ভরে, আবার কতকগুলো চার পায়ের ভরে চলে থাকে। আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করে থাকেন এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।"

সুতরাং এই আয়াতে প্রকাশিত হলো যে, বিবেকহীন প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু صِيغَة বা শব্দের রূপ এসেছে বিবেক সম্পন্নদের। তা ছাড়া হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) পঠনে عَرَضَهُنَّ ও আছে। হযরত উবাই বিন কা'আবের (রাঃ) পঠনে عَرَضَهَا ও আছে। সঠিক কথা এই যে, হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জিনিসের নামই শিখিয়ে ছিলেন। প্রজাতিগত নাম, গুণগত নাম এবং ক্রিয়াগত নামও শিখিয়েছিলেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কথা আছে যে, গুহ্যদ্বার দিয়ে নির্গত বায়ুর নামও শিখিয়েছিলেন (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর)।

### একটি সুদীর্ঘ হাদীসঃ

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি এনেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ একত্রিত হয়ে বলবে–'আমরা যদি কোন একজনকে সুপারিশকারীরূপে আল্লাহ্র নিকট পাঠাতাম তবে কতই না ভাল হতো।' সুতরাং তারা সবাই মিলে হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট আসবে এবং তাঁকে বলবে 'আপনি আমাদের সবারই পিতা। আল্লাহ পাক আপনাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন, আপনাকে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন যেন আমরা আমাদের এই স্থানে শান্তি লাভ করতে পারি।' এ কথা শুনে তিনি উত্তরে বলবেনঃ 'আমার এ যোগ্যতা নেই।' তাঁর স্বীয় পাপের কথা স্মরণ হয়ে যাবে, সুতরাং তিনি লজ্জিত হবেন। তিনি বলবেনঃ 'তোমরা হযরত নূহের (আঃ) কাছে যাও। তিনি প্রথম রাসূল যাঁকে আল্লাহ পৃথিবীবাসীর নিকট পাঠিয়েছিলেন।' তারা এ উত্তর শুনে হযরত নূহের (আঃ) নিকট আসবে। তিনিও এ উত্তরই দেবেন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্রের জন্যে প্রার্থনার কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হবেন এবং বলবেনঃ 'তোমরা রাহমানের (আল্লাহর) বন্ধু হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) নিকট যাও।' তারা সব তাঁর কাছে আসবে কিন্তু এখানেও ঐ উত্তরই পাবে। তিনি বলবেনঃ 'তোমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও, তাঁর সাথে আল্লাহ পাক কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে তাওরাত দান করেছিলেন।' এ কথা শুনে সবাই হযরত মূসার (আঃ) নিকট আসবে এবং তাঁর নিকট এ প্রার্থনাই জানাবে। কিন্তু এখানেও একই উত্তর পাবে। প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই একটি লোককে মেরে

ফেলার কথা তাঁর স্মরণ হয়ে যাবে এবং তিনি লজ্জাবোধ করবেন ও বলবেনঃ 'তোমরা হযরত ঈসার (আঃ) কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর কালেমা এবং তাঁর রূহ্।' এরা সব এখানে আসবে কিন্তু এখানেও ঐ উত্তরই পাবে। তিনি বলবেনঃ 'তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট যাও। তাঁর পূর্বেও পরের সমস্ত পাপ মার্জনা করা হয়েছে।' তারা সবাই আমার নিকট আসবে। আমি অগ্রসর হব। আমার প্রভুকে দেখা মাত্রই আমি সিজদায় পড়ে যাব। যে পর্যন্ত আল্লাহ্ পাককে মঞ্জুর হবে, আমি সিজদায় পড়েই থাকবো। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেনঃ 'মাথা উঠাও, যাচ্ঞা কর, দেয়া হবে; বল, শোনা হবে এবং সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি আমার মস্তক উত্তোলন করবো এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করবো যা তিনি আমাকে ঐ সময়েই শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করবো। আমার জন্যে সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। তাদেরকে আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পুনরায় তাঁর নিকট ফিরে আসবো। আবার আমার প্রভুকে দেখে এ রকমই সিজদায় পড়ে যাবো। পুনরায় সুপারিশ করবো। আমার জন্যে সীমা নির্ধারিত হবে। তাদেরকেও বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তৃতীয়বার আসবো। আবার চতুর্থবার আসবো। শেষ পর্যন্ত দোযখে শুধুমাত্র ওরাই থাকবে যাদেরকে কুরআন মাজীদ বন্দী রেখেছে এবং যাদের জন্য জাহান্নামে চির অবস্থান ওয়াজিব হয়ে গেছে (অর্থাৎ মুশরিক ও কাফির)।

সহীহ্ মুসলিম, সুনান-ই- নাসাঈ, সুনান-ই- ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদির মধ্যে শাফা'আতের এই হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। এখানে এই হাদীসটি আনার উদ্দেশ্য এই যে, এই হাদীসটির মধ্যে এ কথাটিও আছেঃ লোকেরা হযরত আদম (আঃ) কে বলবে 'আল্লাহ আপনাকে সব জিনিষের নাম শিখিয়েছেন।' অতঃপর ঐ জিনিষগুলো ফেরেশ্তাদের সামনে পেশ করেন এবং তাদেরকে বলেন–'তোমরা যদি তোমাদের একথায় সত্যবাদী হও যে, সমস্ত মাখলূক অপেক্ষা তোমরাই বেশী জ্ঞানী বা একথাই সঠিক যে, যমীনে আল্লাহ খলীফা বানাইবেন না, তবে এসব জিনিসের নাম বল। এটাও বর্ণিত আছে যে, যদি তোমরা এ কথায় সত্যবাদী হও 'বানী আদম বিবাদ বিসম্বাদ ও রক্তারক্তি করবে,' তবে এ গুলোর নাম বল। কিন্তু প্রথমটিই বেশী সঠিক মত। যেন এতে এ ধমক রয়েছে যে, আচ্ছা! তোমরা যে বলছো 'যমীনে খলীফা হওয়ার যোগ্য আমরাই, মানুষ নয়,' যদি তোমরা এতে সত্যবাদী হও তবে যেসব জিনিষ তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর নাম বলতো? আর যদি তোমরা তা বলতে না পার তবে তোমাদের এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, যা তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোরই নাম তোমরা বলতে পারলে না, তবে ভবিষ্যতে আগত জিনিষের জ্ঞান তোমাদের কিরূপে হতে পারে?

ফেরেশতারা এটা শোনা মাত্রাই আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে এবং তাঁদের জ্ঞানের স্বল্পতা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। আর বললেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, আমরা ততটুকুই জানি। সমস্ত জিনিষকে পরিবেষ্টনকারী জ্ঞান তো একমাত্র আপনারই আছে। আপনিই সমুদয় জিনিষের সংবাদ রাখেন। আপনার সমুদয় আদেশ ও নিষেধ হিকমত পরিপূর্ণ। যাকে কিছু শিখিয়ে দেন তাও হিকমত এবং যাকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত রাখেন সেও হিকমতে। আপনি মহা প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক।

## 'সুবহানাল্লাহ'-এর তাফসীর ও তার অর্থ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'সুবহানাল্লাহ' -এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র পবিত্রতা, অর্থাৎ তিনি সমস্ত অশ্লীলতা থেকে পবিত্র। হযরত উমার (রাঃ) একদা হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো জানি, কিন্তু 'সুবহানাল্লাহ' কি কালেমা?" হযরত আলী (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "এ কালেমাটি মহান আল্লাহ নিজের জন্যে পছন্দ করেন এবং এতে তিনি খুব খুশী হন, আর এটা বলা তাঁর নিকট খুবই প্রিয়।" হযরত মাইমুন বিন মাহ্রান (রঃ) বলেন যে, ওতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত অশ্লীলতা হতে পবিত্র হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। হযরত আদম (আঃ) এভাবে নাম বলেছেনঃ "আপনার নাম জিবরাইল (আঃ), আপনার নাম মিকাঈল (আঃ), আপনার নাম ইসরাফীল (আঃ) এমন কি তাঁকে চিল, কাক ইত্যাদি সব কিছুর নাম জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সবই বলে দেন। ফেরেশতারা যখন হযরত আদম (আঃ)-এর মর্যাদার কথা বুঝতে পারলেন তখন আল্লাহ পাক তাঁদেরকে বললেনঃ 'দেখ, আমি তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আমি প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় জানি।"

যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "তোমরা উচ্চস্বরে বল (বা না বল), আল্লাহ গোপন হতে গোপনতম খবর জানেন। আরেক জায়গায় আছেঃ "এ লোকেরা সেই আল্লাহকে কেন সিজদা করে না যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর গোপনীয় জিনিসগুলো বের করে থাকেন এবং যিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই জানেন? আল্লাহ একাই উপাস্য এবং তিনিই আরশ-ই-'আযীমের প্রভু। তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ আমি তা জানি।" ভাবার্থ এই যে, ইবলীসের অন্তরে যে ফখর ও অহংকার লুকায়িত ছিল আল্লাহ তা জানতেন। আর ফেরেশতারা যা বলেছিলেন তাতো ছিল প্রকাশ্য কথা। তাহলে আল্লাহ তা'আলা যে বললেনঃ "তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ, আমি সবই জানি" এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ফেরেশতারা যা প্রকাশ করেছিলেন তা আল্লাহ জানেন এবং ইবলীস তার অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সেটাও তিনি জানতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) ও সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), যহ্‌হাক (রঃ) এবং সাওরীরও এটাই মত। ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকে পছন্দ করেছেন। আবুল আলিয়া (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), হাসান (রঃ) এবং কাতাদার (রঃ) কথা এই যে, ফেরেশতাদের গোপনীয় কথা ছিলঃ যে মাখলূকই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করুন না কেন, আমরাই তাদের চাইতে বেশী জ্ঞানী ও মর্যাদাবান হবো।' কিন্তু পরে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং তারাও জানতে পারলেন যে, জ্ঞান ও মর্যাদা দু'টোতেই হযরত আদম (আঃ) তাঁদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন।

হযরত আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেনঃ 'যেমন তোমরা এসব জিনিসের নাম অবহিত নও, তদ্রূপ তোমরা এটাও জানতে পার না যে, তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়ই হবে। তাদের মধ্যে কতকগুলো অনুগত হবে এবং কতকগুলো হবে অবাধ্য। আর পূর্বেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমাকে বেহেশত ও দোযখ দু'টোই পুরণ করতে হবে। কিন্তু তোমাদেরকে তার সংবাদ দেইনি।' এখন ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আঃ) কে প্রদত্ত জ্ঞান উপলব্ধি করে তাঁর প্রধান্য স্বীকার করে নেন।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, সবচেয়ে উত্তম মত হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতটি। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন বলছেনঃ 'ফেরেশতামণ্ডলী! আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্যের জ্ঞান, তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয়তার জ্ঞান আমার আছে।' তাঁদের প্রকাশ্য কথা এবং ইবলীসের গোপনীয় অহংকারের কথাও আল্লাহ জানতেন। এতে গোপনকারী শুধুমাত্র ইবলীস ছিল। কিন্তু বহুবচনের صِيغَة বা রূপ আনা হয়েছে। কেননা, আরবে এই প্রচলন আছে ও তাদের কথায় এটা পাওয়া যায় যে, তারা এক বা কয়েকজনের একটি কাজকে সকলের দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে থাকে। তারা বলে থাকেঃ 'সৈন্যগণকে মেরে ফেলা হয়েছে বা তারা পরাজিত হয়েছে।' অথচ পরাজয় বা হত্যা একজনের বা কয়েকজনের হয়ে থাকে, কিন্তু তারা বহু বচনের রূপ এনে থাকে।

বানূ তামীম গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে তাঁর ঘরের পিছন হতে ডেকেছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদে এর বর্ণনা নিম্নরূপে এসেছেঃ "যারা তোমাকে (নবী সঃ)কে ঘরের পিছন থেকে ডেকে থাকে....।' তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ডাক দিয়েছিল একজনই কিন্তু রূপ আনা হয়েছে বহু বচনের। কাজেই ফেরেশতাদের মধ্যে গোপনকারী শুধু শয়তান হলেও বহু বচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩৪। এবং যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সিজদা করেছিল; সে অগ্রাহ্য করলো ও অহংকার করলো এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

٣٤- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

## ফেরেশতাদের সিজদা এবং আদম (আঃ)-এর মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর এই বড় মর্যাদার কথা বর্ণনা করে মানুষের উপর তাঁর বড় অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে হযরত আদম (আঃ)-এর সামনে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়ার সংবাদ দিয়েছেন। এর প্রমাণ রূপে বহু হাদীস রয়েছে। একটি তো শাফা'য়াতের হাদীস যা একটু আগেই বর্ণিত হলো। দ্বিতীয় হাদীসে আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেনঃ "আমাকে হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দিন যিনি নিজেও বেহেশত হতে বের হয়েছিলেন এবং আমাদেরকেও বের করেছিলেন।' দুই নবী (আঃ) একত্রিত হলে হযরত মূসা (আঃ) তাকে বলেনঃ 'আপনি কি সেই আদম (আঃ) যাকে আল্লাহ স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় রূহ তাঁর মধ্যে ফুঁকেছেন এবং তাঁর সামনে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করিয়েছেন।' পূর্ণ হাদীস ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই বর্ণিত হবে।

## শয়তান কি?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবলীস ফেরেশতাদের একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে জ্বীন বলা হয়। তারা অগ্নিশিখা দ্বারা সৃষ্ট ছিল। তার নাম ছিল হারিস এবং সে বেহেশতের খাজাঞ্চি ছিল। এই গোত্রটি ছাড়া অন্যান্য সব ফেরেশতা আলো দ্বারা সৃষ্ট ছিল। কুরআন মাজীদের মধ্যেও এই জ্বীনদের সৃষ্টি কথা বর্ণনা করা হয়েছে, مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

অগ্নিশিখার যে প্রখরতা উপর দিকে উঠে তাকে مَارِجٌ বলা হয়। এর দ্বারাই জ্বীনদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রথমে জ্বীনেরা পৃথিবীতে বাস করতো। তারা বিবাদ বিসম্বাদ ও কাটাকাটি, মারামারি করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে ফেরেশতাদের সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। ওদেরকেই জ্বীন বলা হতো।

ইবলীস ও তাঁর সঙ্গীরা তাদেরকে মেরে কেটে সমুদ্র দ্বীপে এবং পর্বত প্রান্তে তাড়িয়ে দেয়। ইবলীসের অন্তরে এই অহংকারের সৃষ্টি হয়ে গেল যে, সে ছাড়া আর কারও দ্বারা এ কার্য সাধন সম্ভব হয়নি। তার অন্তরের এ পাপ ও আমিত্বের কথা একমাত্র আল্লাহই জানতেন। যখন বিশ্বপ্রভু বললেনঃ "আমি যমীনে খলীফা বানাতে চাই" তখন ফেরেশতারা আরজ করেছিলেনঃ "আপনি এদেরকে কেন সৃষ্টি করবেন যারা পূর্বসম্প্রদায়ের মত ঝগড়া ফাসাদও রক্তারক্তি করবে?" তখন আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ "আমি জানি যা তোমরা জাননা, অর্থাৎ ইবলীসের অন্তরে যে ফখর ও অহংকার আছে তার জ্ঞান আমারই আছে, তোমাদের নেই।"

অতঃপর হযরত আদম (আঃ)-এর মাটি উঠিয়ে আনা হলো। তা ছিল খুবই মসৃণ ও উত্তম। তা খামীর করা হলে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা হযরত আদম (আঃ) কে স্বহস্তে সৃষ্টি করলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা এ রকমই পুতুলের আকারে ছিল। ইবলীস আসতো ও তার উপর লাথি মেরে দেখতো যে, ওটা কোন ফাঁপা জিনিসের মত শব্দকারী মাটি। অতঃপর সে মুখের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে পিছনের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসতো এবং আবার পিছন দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো। অতঃপর সে বলতোঃ প্রকৃতপক্ষে এটা কোন জিনিসই নয়। আমি যদি এর উপর বিজয়ী হই তবে একে আমি ধ্বংস করে ছাড়বো এবং যদি এর শাসনভার আমার উপর অর্পিত হয় তবে আমি কখনও এটা স্বীকার করবো না।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওর মধ্যে ফুঁদিয়ে রূহ ভরে দিলেন। ওটা যেখান পর্যন্ত পৌঁছলো, রক্ত-গোশত হতে থাকলো। যখন রূহ নাভি পর্যন্ত পৌঁছলো তখন তিনি স্বীয় শরীরকে দেখে খুশী হয়ে গেলেন। এবং তৎক্ষণাৎ উঠার ইচ্ছে করলেন। কিন্তু রূহ তখনও নীচের অংশে পৌঁছেনি বলে উঠতে পারলেন না। এই তাড়াহুড়ার বর্ণনাই নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ "মানুষকে অধৈর্য ও ত্রস্তরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।" খুশী বা দুঃখ কোন অবস্থাতেই তার ধৈর্য নেই। যখন রূহ শরীরে পৌঁছে গেল এবং হাঁচি এলো তখন তিনি বলেনঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ পাক উত্তরে বলেনঃ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোক।"

তারপর শুধুমাত্র ইবলীসের সঙ্গী ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "আদম (আঃ) কে সিজদা কর।" সবাই সিজদা করলেন, কিন্তু ইবলীসের অহংকার প্রকাশ পেয়ে গেল, সে অমান্য করলো এবং বললোঃ "আমি তার চেয়ে উত্তম, তার চেয়ে আমি বয়সে বড়, তার চেয়ে আমি বেশী শক্তিশালী, সে সৃষ্ট

হয়েছে মাটি দ্বারা, আমি সৃষ্ট হয়েছি আগুন দ্বারা এবং আগুন মাটি অপেক্ষা শক্তিশালী।" তার এ অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় রহমত হতে বঞ্চিত করে দেন এবং এ জন্যেই তাকে ইবলীস বলা হয়।

তার অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাকে বিতাড়িত শয়তান করে দিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আদম (আঃ) কে মানুষ, জীবজন্তু, জমীন, সমুদ্র পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির নাম বলে দিয়ে তাঁকে ঐ সব ফেরেশতার সামনে হাজির করলেন যারা ইবলীসের সঙ্গী ছিল ও আগুন দ্বারা সৃষ্ট ছিল। মহান আল্লাহ তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা যদি এ কথায় সত্যবাদী হও যে, আমি জমীনে খলীফা পাঠাবো না, তবে তোমরা আমাকে এ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও?" যখন ফেরেশতারা দেখলো যে, আল্লাহ তাদের পূর্ব কথায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কাজেই তারা বললোঃ হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আমরা আমাদের পূর্ব কথা হতে প্রত্যাবর্তন করছি এবং স্বীকার করছি যে, আমরা ভবিষ্যতের কথা জানি না। আমরা তো শুধু ঐটুকুই জানতে পারি যেটুকু আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আমরা তো শুধু ঐটুকুই জানতে পারি যেটুকু আপনি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)কে ওগুলোর নাম তাদেরকে বলে দিতে আদেশ করলেন। হযরত আদম (আঃ) তাদেরকে ওগুলোর নাম বলে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে ফেরেশতার দল! আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ জমীনের অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান একমাত্র আমারই আছে আর কারও নেই? আমি প্রত্যেক গোপনীয় বিষয় ঠিক ঐরূপই জানি যেমন জানি প্রকাশ্য বিষয়সমূহ। অর্থাৎ ইবলীসের গোপনীয় অহংকারের কথাও আমি জানতাম। আর তোমরা তার মোটেই খবর রাখতে না।" কিন্তু এ মতটি গরীব এবং এর মধ্যে এমন কতকগুলো কথা আছে সেগুলো সমালোচনার যোগ্য। আমরা যদি ওগুলো পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করি তবে বিষয়টি খুব দীর্ঘ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত এ হাদীসটির সনদও ওটাই যা হতে তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর বর্ণিত আছে। এ রকমই আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে, তাতে কিছু হ্রাস বৃদ্ধিও রয়েছে। তার মধ্যে এটাও আছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের মাটি নেয়ার জন্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) জমীনে গেলে জমীন বললোঃ "আপনি আমা হতে কিছু কমিয়ে দেবেন এ জন্যে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" তিনি ফিরে আসলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মরণের ফেরেশতা (আযরাইল আঃ) কে পাঠালেন। জমীন তাঁকেও ঐ কথাই বললো। কিন্তু তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমি যে মহান আল্লাহর আদেশ পুরো না করেই ফিরে যাবো এ থেকে আমিও তাঁর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" সুতরাং তিনি সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ হতে একমুষ্টি মাটি গ্রহণ করলেন। মাটির রং কোন স্থানে লাল, কোন জায়গায় সাদা এবং কোথাও বা কালো ছিল বলে মানুষের রং বিভিন্ন

প্রকারের হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটিও বনী ইসরাঈলের কথায় পরিপূর্ণ। এর মধ্যে বেশীর ভাগই পূর্ববর্তী লোকদের কথা মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। ওগুলো সাহাবীদের (রাঃ) কথা হলেও তাঁরা হয়তো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হতে তা গ্রহণ করে থাকবেন। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হা'কিম তাঁর 'মুসতাদরিক' গ্রন্থে এরূপ বহু বর্ণনা এনেছেন এবং ওগুলোর সনদকে বুখারীর (রঃ) শর্তের উপর বলেছেন। ভাবার্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ "তোমরা হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা কর"—ইবলীসও এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, যদিও সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু সে তাদের মতই ছিল এবং তাদের মতই কাজ করতো। সুতরাং সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত সেও ছিল। আর এজন্যেই অমান্য করার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়েছে। এর ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ (كَانَ مِنَ الْجِنِّ) -এর তাফসীরে আসবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন সে, অবাধ্যতার পূর্বে যে ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল, তার নাম আযাযীল। ভূ-পৃষ্ঠে ছিল তার বাসস্থান। বিদ্যা ও জ্ঞানে সে খুব বড় ছিল। এ জন্যেই তার মস্তিষ্ক অহংকারের ভরপুর ছিল। তার ও তার দলের সম্পর্ক ছিল জ্বীনদের সঙ্গে। তার চারটি ডানা ছিল। সে ছিল বেহেশতের খাজাঞ্চী। জমীন ও দুনিয়ার আকাশের সে ছিল সম্রাট। হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, ইবলীস কখনও ফেরেশতা ছিল না। তার মূল বা গোড়া হলো জ্বীন হতে। যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর মূল মানুষ হতে। এর ইসনাদ সঠিক।

আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) ও শহর বিন হাওশাব (রঃ) -এর এটাই মত। হযরত সা'দ বিন মাসউদ (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতাগণ জ্বীনদের কতককে মেরে ফেলেছিলেন এবং কতকগুলোকে বন্দী করে আকাশের উপর নিয়ে গিয়েছিলেন। তথায় তারা ইবাদতের জন্যে রয়ে গিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, প্রথমে আল্লাহ একটি মাখলূক সৃষ্টি করেন। হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেন। তা তারা অমান্য করে এবং এর ফলে তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় মাখলূক সৃষ্টি করেন তাদেরও এ অবস্থাই ঘটে। তার পরে তিনি তৃতীয় মাখলূক সৃষ্টি করেন এবং তারা আদেশ পালন করে। কিন্তু এ হাদীসটিও গরীব এবং এর ইসনাদ সঠিক নয়। এর একজন বর্ণনাকারীর উপর সন্দেহ পোষণ করা হয়। সুতরাং এটা প্রমাণ যোগ্য নয়। ইবলীসের গোড়াই ছিল কুফর ও ভ্রান্তির উপর। কিছু দিন সঠিকভাবে চলেছিল। কিন্তু পুনরায় স্বীয় মূলের উপর এসে পড়েছিল। সিজদা করার নির্দেশ পালন ছিল আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার ও হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

কেউ কেউ বলেন যে, এই সিজদাহ্ ছিল সালাম প্রদান ও সম্মান প্রদর্শনের সিজদা। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ব্যাপারে রয়েছে যে, তিনি তার পিতাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং সবাই সিজদায় পড়ে যায়। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেনঃ "হে পিতা! এটাই আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা আমার প্রভু সত্যরূপে দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এটা বৈধ ছিল, কিন্তু আমাদের ধর্মে এটা রহিত হয়ে গেছে।

হযরত মু'আয (রাঃ) বলেনঃ "আমি সিরিয়াবাসীকে তাদের নেতৃবর্গ এবং আলেমদের সামনে সিজদা করতে দেখেছিলাম। কাজেই আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) কে বলি-হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি সিজদা পাওয়ার বেশী হকদার।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি যদি কোন মানুষকে কোন মানুষের সামনে সিজদা করার অনুমতি দিতে পারতাম তবে নারীদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীকে সিজদা করে। কেননা তাদের ওদের উপর বড় হক রয়েছে।"

ইমাম রাযী (রঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে, সিজদা ছিল আল্লাহ তা'আলার জন্যে। হযরত আদম (আঃ) কিবলাহ হিসেবে ছিলেন। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়। প্রথম মতটিই বেশী স্পষ্ট এবং উত্তম বলে মনে হচ্ছে। এই সিজদা ছিল হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সালাম প্রদান হিসেবে। আর এটা মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের উপরেই ছিল। কেননা ওটা ছিল তাঁর নির্দেশ, কাজেই ওটা অবশ্যই পালনীয় ছিল। ইমাম রাযীও (রঃ) এই মতকেই জোরালো বলেছেন এবং অন্য দু'টি মতকে দুর্বল বলেছেন। মত দু'টির একটি হচ্ছে হযরত আদম (আঃ)-এর কিবলাহ্ হিসেবে হওয়া, এতে বড় একটা মর্যাদা প্রকাশ পায় না। আর অপরটি হচ্ছে সিজদার ভাবার্থ লওয়া অপারগতা ও হীনতা স্বীকার, মাটিতে কপাল রেখে প্রকৃত সিজদাহ্ করা নয়। কিন্তু এ দু'টো ব্যাখ্যাই দুর্বল।

হযরত কাতাদ (রঃ) বলেন যে, এই অহংকারের পাপই ছিল সর্বপ্রথম পাপ যা ইবলীস হতে প্রকাশ পেয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ লাভ করবে না। এই অহংকার, কুফর এবং অবাধ্যতার কারণেই ইবলীসের গলদেশে অবিসম্পাতের গলাবন্ধ লেগে গেছে এবং মহান আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ে তাঁর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে।

এখানে كَانَ শব্দটি صَارَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ (فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ) অর্থাৎ "যাদেরকে ডুবানো হলো সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অন্যত্র বলেছেনঃ

(فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ) অর্থাৎ "তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" কবিদের কবিতাতেও كَانَ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলে অর্থ হচ্ছেঃ "সে কাফির হয়ে গেল।"

ইবনে ফোরাক বলেন যে, সে আল্লাহ্‌র ইলমে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুরতুবী (রঃ) একেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং একটি মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন যে, কোন লোকের হাতে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পাওয়া তার আল্লাহ্‌র ওয়ালী হওয়ার প্রমাণ নয়–যদিও কতকগুলো সূফী ও রাফেযী এর বিপরীত বলে থাকে। কেননা, আমরা কারও জন্যে এ কথার ফায়সালা দিতে পারি না যে, সে ঈমানের অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হবে। এ শয়তানের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, ওয়ালী তো দুরের কথা, সে ফেরেশতা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষে কাফিরদের নেতা হয়ে গেল। তাছাড়া কতকগুলো অলৌকিক কাজ যা বাহ্যত কারামাত রূপে পরিলক্ষিত হয়, তা আল্লাহ্‌র ওয়ালীগণ ছাড়া অন্যান্য লোকের হাতেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। এমনকি ফাসিক, ফাজির, মুশরিক এবং কাফিরের হাতেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন মাজীদের فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ (৪৪ঃ ১০) এই আয়াতটি অন্তরে গোপন রেখে যখন ইবনে সাইয়াদ নামক একজন কাফিরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "বলতো, আমি অন্তরে কি গোপন রেখেছি?" সে বলঃ اَلدُّخُّ। কোন বর্ণনায় আছে যে, রাগের সময় সে এত ফুলে উঠতো যে, তার দেহ দ্বারা সে সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) তাকে হত্যা করেন।

দাজ্জালের এরূপ বহু কথা তো হাদীসসমূহে এসেছে। যেমন তার আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা, ভূ-পৃষ্ঠ হতে শস্য উৎপাদন করা, পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তার পিছনে লেগে যাওয়া, এক যুবককে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করা ইত্যাদি। হযরত লায়েস বিন সা'দ (রাঃ) এবং হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ "যদি তোমরা কোন মানুষকে পানির উপর চলতে দেখ, তবে তাকে আল্লাহ্‌র ওয়ালী মনে করো না, যে পর্যন্ত না তার সমস্ত কাজ কর্ম কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হয়।" আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতার উপর এই সিজদার নির্দেশ ছিল, যদিও একটি দলের এই মতও রয়েছে যে, এই নির্দেশ শুধু জমীনের ফেরেশতাদের উপর ছিল। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছেঃ "ইবলীস ছাড়া সমস্ত ফেরেশতাই সিজদা করেছিল।" এখানে শুধু ইবলীসকেই পৃথক করা হয়েছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, সিজদার এ আদেশ ছিল সাধারণ। জমীন ও আসমান উভয় স্থানের ফেরেশতাদের উপরই সিজদার নির্দেশ ছিল। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٣٥- وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৩৫। এবং আমি বললাম–হে আদম! তুমি ও তোমার সহধর্মিণী বেহেশতে অবস্থান কর এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না–অন্যথা তোমরা অত্যাচারীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

٣٦- فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

৩৬। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে তথা হতে বিচ্যুত করলো, তৎপরে তারা উভয়ে যাতে ছিল তথা হতে তাদেরকে বহির্গত করলো; এবং আমি বললাম–তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং পৃথিবীতেই তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্টকালের অবস্থিতি ও ভোগ সম্পদ রয়েছে।

হযরত আদম (আঃ)-এর এটা অন্য মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনা। ফেরেশতাদেরকে সিজদা করানোর পর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের স্বামী-স্ত্রীকে বেহেশতে স্থান দিলেন এবং সব জিনিসের উপর অধিকার দিয়ে দিলেন। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হযরত আদম (আঃ) কি নবী ছিলেন?" তিনি বলেনঃ "তিনি নবীও ছিলেন এবং রাসূলও ছিলেন। এমন কি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে কথাবার্তা বলেছেন এবং তাঁকে বলেছেন–'তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে অবস্থান কর।' সাধারণ মুফাস্সিরগণের ধারণা এই যে, আসমানী বেহেশতে তাঁদের বাসের জায়গা করা হয়েছিল। কিন্তু মু'তাযিলাহ্ ও কাদরিয়্যাগণ বলে যে, এ বেহেশত ছিল যমীনের উপর। সূরা-ই-আ'রাফে এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ আসবে। কুরআন পাকের

বাকরীতি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বেহেশতে অবস্থানের পূর্বে হযরত হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছিল।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রঃ) বলেন যে, আহলে কিতাব ইত্যাদি আলেমগণ হতে ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা অনুসারে বর্ণিত আছে যে, ইবলীসকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের পর হযরত আদম (আঃ)-এর জ্ঞান প্রকাশ করতঃ তাঁর উপর তন্দ্রা চাপিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর বাম পাঁজর হতে হযরত হাওয়া (আঃ) কে সৃষ্টি করেন। চোখ খোলামাত্র হযরত আদম (আঃ) তাঁকে দেখতে পান এবং রক্ত ও গোশতের কারণে অন্তরে তাঁর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিশ্বপ্রভু উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং বেহেশতে বাস করার নির্দেশ দেন। কেউ কেউ বলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেশতে প্রবেশের পর হযরত হাওয়া (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীগণ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবলীসকে জান্নাত হতে বের করে দেয়ার পরে হযরত আদম (আঃ) কে তথায় জায়গা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সময় তিনি একাকী ছিলেন। সুতরাং তাঁর ঘুমের অবস্থায় হযরত হাওয়াকে (আঃ) তাঁর পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়। জেগে ওঠার পর তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি কে? তুমি কেনই বা সৃষ্টি হলে? হযরত হাওয়া উত্তরে বলেনঃ "আমি একটি নারী, আপনার শান্তির কারণ রূপে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

তৎক্ষণাৎ ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আঃ) কে জিজ্ঞেস করেনঃ "বলুন তাঁর নাম কি?" হযরত আদম (আঃ) বলেন 'হাওয়া'।" তাঁরা বলেনঃ "এ নামের কারণ কি?" তিনি বলেনঃ "তাকে এক জীবিত হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে।" তথায় আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে ডাক দিয়ে বলেনঃ "হে আদম (আঃ)! তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতের মধ্যে সুখে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান কর এবং মনে যা চায় তাই খাও ও পান কর, আর এই বৃক্ষের নিকট যেয়ো না।"

এই বিশেষ বৃক্ষ হতে নিষেধ করা একটা পরীক্ষা ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, এটা আঙ্গুরের গাছ ছিল। আবার কেউ বলেন যে, এটা ছিল গমের গাছ। কেউ বলেছেন শীষ, কেউ বলেছেন খেজুর এবং কেউ কেউ ডুমুরও বলেছেন। ঐ গাছের ফল খেয়ে মানবীয় প্রয়োজন (পায়খানা-প্রস্রাব) দেখা দিতো এবং ওটা বেহেশতের যোগ্য নয়। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ গাছের ফল খেয়ে ফেরেশতাগণ চিরজীবন লাভ করতেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, ওটা কোন একটি গাছ ছিল যা থেকে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছিলেন। ওটা যে কোন নির্দিষ্ট গাছ ছিল তা কুরআন কারীম বা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত

হয় না। তাছাড়া এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে খুবই মতভেদ রয়েছে। এটা জানলেও আমাদের কোন লাভ নেই। এবং না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং এ জন্যে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই বা কি? মহান আল্লাহই এটা খুব ভাল জানেন। ইমাম রাযীও (রঃ) এই ফায়সালাই দিয়েছেন। এবং সঠিক কথাও এটাই বটে।

عَنْهَا এর هَا সর্বনামটি কেউ কেউ جَنَّتْ -এর দিকে ফিরিয়েছেন, আবার কেউ কেউ شَجَرْ -এর দিকে ফিরিয়েছেন। একটি কিরআতে فَاَزَالَهُمَا এরূপও রয়েছে। তবে অর্থ হবেঃ 'শয়তান তাদের দু'জনকে বেহেশ্ত হতে পৃথক করে দেয়।' আর দ্বিতীয়টির অর্থ হবেঃ 'ঐ গাছের কারণেই শয়তান তাদের দুজনকে ভুলিয়ে দেয়।' عَنْ শব্দটি سَبَبْ -এর কারণেও এসে থাকে যেমন (يُؤْفَكُ عَنْهُ) -এর মধ্যে এসেছে। ঐ অবাধ্যতার কারণে তাঁদের বেহেশতী পোষাক, সেই পবিত্র স্থান, ঐ উত্তম আহার্য ইত্যাদি সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের বলা হয়ঃ 'এখন পৃথিবীতেই তোমাদের আহার্য ইত্যাদি রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা সেখানেই পড়ে থাকবে এবং তথায় উপকার লাভ করবে।'

সাপ ও ইবলীসের গল্প, ইবলীস কিভাবে বেহেশতে পৌঁছে, কি প্রকারে সে কুমন্ত্রণা দেয় ইত্যাদি লম্বা চওড়া গল্প মুফাস্সিরগণ এখানে এনেছেন। কিন্তু ওগুলো সবই বানী ইসরাঈলের ভাণ্ডারের অংশ বিশেষ। তথাপি আমরা তা সূরা-ই-আরাফের মধ্যে বর্ণনা করবো। কেননা, এ ঘটনার বর্ণনা তথায় কিছু বিস্তারিত ভাবে রয়েছে।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের একটি হাদীসে আছে যে, গাছের ফল মুখে দেয়া মাত্রই বেহেশতী পোষাক তাঁর শরীরে হতে পড়ে যায়। নিজেকে উলঙ্গ দেখে হযরত আদম (আঃ) এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। কিন্তু দেহ দীর্ঘ ছিল বলে তা গাছে আটকে যায়। আল্লাহ পাক বলেনঃ 'হে আদম (আঃ)! আমা হতে কি পলায়ন করছো?' তিনি আরয করেনঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনা হতে পালিয়ে যাইনি, লজ্জায় মুখ ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' অন্য বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে আদম (আঃ)! আমার নিকট হতে চলে যাও। আমার মর্যাদার শপথ! আমার নিকটে আমার অবাধ্য থাকতে পারে না। তোমার মত আমি এত মাখলূক সৃষ্টি করবো যে, তাদের দ্বারা পৃথিবী ভরে যাবে। অতঃপর যদি তারা আমার অবাধ্য হয় তবে আমি অবশ্যই তাদেরকেও অবাধ্যদের ঘরে পৌঁছিয়ে দেবো।' এ বর্ণনাটি গরীব। এর মধ্যে ইনকিতা বরং ই'যালও আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ) আসরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেহেশতে ছিলেন। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন যে, এই এক ঘন্টা ছিল একশো ত্রিশ বছরের সমান। বাঈ' বিন আনাস (রাঃ) বলেন যে, নবম ও দশম ঘন্টায় হযরত আদম (আঃ) বহিষ্কৃত হন। তাঁর সঙ্গে বেহেশতের গাছের একটি শাখা ছিল। এবং মাথায় ছিল বেহেশতের একটি মুকুট। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) ভারতে অবতরণ করেন। তাঁর সঙ্গে কালো পাথর (হাজারে আসওয়াদ) ছিল এবং বেহেশতের বৃক্ষের পাতা ছিল যা তিনি ভারতে ছড়িয়ে দেন এবং ওটা দ্বারা সুগন্ধময় গাছের জন্ম লাভ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি ভারতের 'দাহ্না' শহরে অবতরণ করেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ করেন। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) ভারতে এবং হযরত হাওয়া (আঃ) জিদ্দায় অবতরণ করেন। আর ইবলীস বসরা হতে কয়েক মাইল দূরে 'দাস্তামিসানে' নিক্ষিপ্ত হয় এবং সাপ 'ইসবাহানে' পতিত হয়।

হযরত ইবনে উমারের (রাঃ) মতে হযরত আদম (আঃ) সাফা পাহাড়ের উপর অবতরণ করেন। অবতরণের সময় হযরত আদম (আঃ)-এর হাত জানুর উপর ছিল এবং মাথা ছিল নিম্নমুখী। আর ইবলীসের অঙ্গুলীর উপর অঙ্গুলী রাখা ছিল এবং মাথা ছিল আকাশের দিকে।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) কে প্রত্যেক জিনিসের কারিগরী শিখিয়েছিলেন এবং বেহেশতী ফলের পাথেয় দিয়েছিলেন। একটি হাদীসে আছে যে, সমস্ত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে শুক্রবারের দিন। ঐ দিনেই হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়, ঐদিনেই বেহেশতে প্রবেশ করানো হয় এবং ঐদিনেই বেহেশ্ত হতে বের করে দেয়া হয়। ইমাম রাযী (রাঃ) বলেনঃ 'এটা যে ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের আয়াত তার কয়েকটি যুক্তি আছে। একটি এই যে, সামান্য পদস্খলনের জন্যে হযরত আদম (আঃ) কে কতই না গুরুতর শাস্তি দেয়া হলো।' কোন কবি কতই না সুন্দর কথা বলেছেনঃ 'তোমারা পাপের পর পাপ করছো অথচ জান্নাতের প্রার্থী হচ্ছো? তোমরা কি ভুলে গেছো যে, তোমাদের পিতা আদম (আঃ) কে শুধু একটি লঘু পাপের কারণে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছে?' ইবনুল কাসেম বলেছেনঃ 'আমরা তো এখানে শত্রুদের হাতে বন্দী রয়েছি, দেখ, কখন আমরা নিরাপদে স্বদেশে পৌঁছবো।' ফাতহ্ মুসেলী বলেনঃ 'আমরা জান্নাতবাসী ছিলাম। শয়তান আমাদেরকে বন্দী করে দুনিয়ায় এনেছে। এখন সে আমাদের জন্যে এখানে চিন্তা ও দুঃখ ছাড়া আর কি রেখেছে? এ বন্দীত্বের শিকল তখনই ভাঙ্গবে যখন আমরা ঐ স্থানে পৌঁছবো, যে স্থান হতে আমাদেরকে বের করা হয়েছে।'

যদি কোন প্রতিবাদাকরী এ প্রতিবাদ করে যে, হযরত আদম (আঃ) যখন আসমানী বেহেশতে ছিলেন, তখন শয়তান আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছিল। তবে আবার তথায় কিভাবে পৌঁছলো? এর প্রথম উত্তর তো এই হবে যে, ঐ বেহেশত ছিল যমীনে, এরূপ একটি মত তো আছেই। এ ছাড়া আরও উত্তর এই যে, সম্মানিত অবস্থায় তার প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু লাঞ্ছিত অবস্থায় ও চুরি করে যাওয়া বাধা ছিল না। যেহেতু তাওরাতে আছে যে, সে সাপের মুখে বসে বেহেশতে গিয়েছিল। এও একটি উত্তর যে, সে বেহেশতে যায়নি, বরং বাহির থেকেই কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, যমীনে থেকেই সে তাঁর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। কুরতুবী (রঃ) এখানে সর্প সম্পর্কীয় এবং তাকে মেরে ফেলার হুকুমের হাদীসগুলিও এনেছেন, যা খুবই উত্তম ও উপকারী হয়েছে।

**৩৭। অনন্তর আদম স্বীয় প্রতিপালক হতে কতিপয় বাক্য শিক্ষা করলো, আল্লাহ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।**

٣٧- فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

যে কথাগুলো হযরত আদম (আঃ) শিখে ছিলেন তা কুরআন মাজীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তা হচ্ছেঃ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

অর্থাৎ 'তারা দুইজন বললো—হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের নফসের উপরে অত্যাচার করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়ে যাবো।' (৭ঃ ২৩) অধিকাংশ লোকের এটাই অভিমত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে হজ্জের নির্দেশাবলী শিক্ষা করাও বর্ণিত আছে। হযরত উবাইদ বিন উমাইর (রাঃ) বলেন যে, কথাগুলি নিম্নরূপঃ 'হে আল্লাহ! যে ভুল আমি করেছি, তা কি আমার জন্মের পূর্বে আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল, না আমি নিজেই তা আবিষ্কার করেছি?' উত্তর হলোঃ 'তুমি নিজে আবিষ্কার করনি, বরং আমি তোমার ভাগ্যে তা লিখে রেখেছিলাম।' এটা শুনে তিনি বললেন' 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ) বলেছিলেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি কি আমাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেননি? এবং

স্বীয় রূহ কি আমার মধ্যে ফুঁকে দেননি? আপনি কি আমার হাঁচির উপর (يَرْحَمُكَ اللّٰهُ) বলেননি? আপনার দয়া কি আপনার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করেনি? আমার সৃষ্টির পূর্বেই কি এই ভুল আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেননি? উত্তর হলোঃ 'হাঁ, এ সব কিছুই করেছি।' তখন বললেনঃ 'তা হলে হে আমার প্রভু! আমার তওবা কবূল হওয়ার পর পুনরায় আমি জান্নাত পেতে পারি কি?' উত্তর হলোঃ 'হাঁ।' এটাই ঐকথাগুলো যা হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্র নিকট শিখেছিলেন।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের আর একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, হযরত আদম (আঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমি যদি এ পাপ হতে ফিরে যাই তবে কি পুনরায় বেহেশতে যেতে পারব?' উত্তর হলোঃ 'হাঁ'। আল্লাহ্র নিকট হতে কথাগুলো শিক্ষা করার এটাই অর্থ। কিন্তু এ হাদীসটি গরীব হওয়ার সাথে সাথে মুনকাতিও বটে। কোন কোন মুরুব্বী হতে বর্ণিত আছে যে, কথাগুলো নিম্নরূপঃ 'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, আমি আপনার প্রশংসা করছি, হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার আত্মার উপর জুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি উত্তম ক্ষমাশীল। হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বূদ নেই, আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং প্রশংসা করছি, হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার আত্মার উপর অত্যাচার করেছি, সুতরাং আপনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন, নিশ্চয়ই আপনি উত্তম দয়ালু। হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি, হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার নাফ্সের উপর জুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমার তাওবা কবূল করুন, নিশ্চয় আপনি তাওবা কবূলকারী ও পরম দয়ালু। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় আছেঃ "এই লোকেরা কি জানেনা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন?" অন্যত্র রয়েছেঃ 'যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করে বা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করে বসে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে দেখে নেবে যে, আল্লাহ তার তাওবা কবূল করবেন এবং তাকে স্বীয় করুণার মধ্যে নিয়ে নিবেন। আর এক জায়গায় আছেঃ 'যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং ভাল কাজ করে ..... ।' এসব আয়াতে বর্ণনা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন। ঐ রকমই এখানেও রয়েছে যে, সেই আল্লাহ তাওবাকারীদের তাওবা কবূলকারী এবং অত্যন্ত দয়ালু। আল্লাহ তা'আলার করুণা ও দয়া এত সাধারণ যে, তিনি তাঁর পাপী বান্দাদেরকেও স্বীয় রহমতের দরজা হতে ফিরিয়ে দেন না। সত্যই তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি বান্দাদের অনুতাপ গ্রহণকারী এবং পরম দয়ালু।

৩৮। আমি বললাম–তোমরা সবাই এখান হতে নীচে নেমে যাও; অনন্তর আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট যে উপদেশ উপস্থিত হবে–পরে যে আমার সেই উপদেশের অনুসরণ করবে বস্তুতঃ তাদের কোনই ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।

৩৮- قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৩৯। আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী–তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে।

৩৯- وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ ع

**জগতের চিত্রঃ** জান্নাত হতে বের করার সময় হযরত আদম (আঃ), হযরত হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছিল তারই বর্ণনা হচ্ছে যে, জগতে কিতাবাদি ও নবী রাসূলগণকে পাঠান হবে, অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করা হবে, দলীল প্রমাণাদি বর্ণিত হবে, সত্যপথ প্রকাশ করে দেয়া হবে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কেও পাঠান হবে এবং তাঁর প্রতি কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা হবে। অতঃপর যারা আপন আপন যুগের নবী ও কিতাবের অনুসরণ করবে, পরকালে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দুনিয়া হাত ছাড়া হওয়ার কারণে তারা কোন চিন্তাও করবে না। সুরা-ই-ত-হা'র মধ্যে এটাই বলা হয়েছেঃ "আমার হিদায়াতের অনুসারীরা পথভ্রষ্ট হবে না। এবং হতভাগ্য হবে না, আর আমার স্মরণ হতে মুখ প্রত্যাবর্তনকারী দুনিয়ার সংকীর্ণতায় এবং আখেরাতের অপমানজনক শাস্তিতে গ্রেফতার হবে।"

এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, অস্বীকারকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা জাহান্নামের মধ্যে চিরদিন অবস্থান করবে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যারা মূল দোযখী তাদের মরণও হবে না বা তারা ভাল জীবনও লাভ করবে না। তবে হাঁ, যেসব একত্ববাদী ও সুন্নাতের অনুসারীকে কিছু পাপের জন্যে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তারা পুড়ে কয়লা হয়ে মরে যাবে। পুনরায় তাদেরকে সুপারিশের মাধ্যমে

বের করা হবে। সহীহ মুসলিম শরীফেও এই হাদীসটি আছে। দ্বিতীয়বার যে জান্নাত হতে বের হওয়ার হুকুম বর্ণিত হয়েছে ঐ ব্যাপারে কতক লোক বলেনঃ "এটা এজন্যেই যে, এখানে অন্যান্য আহকাম বর্ণনা করার ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, প্রথমবার বেহেশত হতে প্রথম আকাশে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ার প্রথম আকাশ হতে পৃথিবীতে নামান হয়েছিল। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক কথা। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

٤٠- يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ۝

৪০। হে ইসরাঈল বংশধরগণ, আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং আমার অঙ্গীকার পুর্ণ কর–আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করবো এবং তোমার শুধু আমাকেই ভয় কর।

٤١- وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ۝

৪১। এবং আমি যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের সাথে যা আছে–তা তারই সত্যতা প্রমাণকারী এবং এতে তোমরাই প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না এবং আমার নিদর্শনাবলীর পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না এবং তোমরা বরং আমাকেই ভয় কর।

---

**বানী ইসরাঈলকে ইসলামের আমন্ত্রণঃ**

উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে বানী ইসরাঈলকে ইসলাম গ্রহণের ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কি সুন্দর রীতিতে তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, তোমরা এক নবীরই সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত এবং তোমাদের হাতে আল্লাহ্র কিতাব বিদ্যমান রয়েছে, আর কুরআন কারীম এর সত্যতা স্বীকার করছে। সুতরাং তোমাদের জন্যে এটা মোটেই উচিত নয় যে, তোমরাই সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হয়ে যাবে। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর নাম

ছিল ইসরাঈল (আঃ)। তাহলে যেন তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা আমার সৎ ও অনুগত বান্দারই সন্তান। সুতরাং তোমাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষের মত তোমাদেরও সত্যের অনুসরণ করা উচিত। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, তুমি দানশীলের ছেলে, সুতরাং তুমি দানশীলতায় অগ্রগামী হয়ে যাও। তুমি বীরের পুত্র, সুতরাং বীরত্ব প্রদর্শন কর। তুমি বিদ্বানের ছেলে, সুতরাং বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ কর।

অন্য স্থানে এ রচনা রীতি এভাবে এসেছেঃ 'আমার কৃতজ্ঞ বান্দা হযরত নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে যাদেরকে বিশ্বব্যাপী তুফান হতে রক্ষা করেছিলাম, এরা তাদেরই সন্তান।

একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াহূদীদের একটি দলকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর নাম যে ইসরাঈল ছিল তা কি তোমরা জান না?' তারা সবাই শপথ করে বলেঃ'আল্লাহ্র শপথ! এটা সত্য।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।'

'ইসরাঈল'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ্র বান্দা।' তাদেরকে ঐ সব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যা ব্যাপক ক্ষমতার বড় বড় নিদর্শন ছিল। যেমন পাথর হতে নদী প্রবাহিত করা, 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতরণ করা, ফিরআউনের দলবল হতে রক্ষা করা, তাদের মধ্যে হতেই নবী রাসূল প্রেরণ করা, তাদেরকে সাম্রাজ্য ও রাজত্ব দান করা ইত্যাদি।

আমার অঙ্গীকার পুরো কর, অর্থাৎ তোমাদের কাছে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, যখন মুহাম্মদ (সঃ) আগমন করবেন এবং তাঁর উপর আমার কিতাব অবতীর্ণ হবে তখন তোমরা তাঁর উপর ও কিতাবের উপর ঈমান আনবে। তিনি তোমাদের বোঝা হালকা করবেন, তোমাদের শৃংখল ভেঙ্গে দেবেন এবং গলাবন্ধ দূরে নিক্ষেপ করে দেবেন। আর আমার অঙ্গীকারও পুরো হয়ে যাবে এইভাবে যে, আমি এই ধর্মের কঠিন নির্দেশগুলো যা তোমরা নিজেদের উপরে চাপিয়ে রেখেছো, সরিয়ে দেবো এবং শেষ যুগের নবীর (সঃ) মাধ্যমে একটি সহজ ধর্ম প্রদান করবো।

অন্য জায়গায় এর বর্ণনা এভাবে হচ্ছেঃ 'যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত আদায় কর এবং আমাকে উত্তম ঋণ প্রদান কর তবে আমি তোমাদের অমঙ্গল দূর করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবাহমান নদী বিশিষ্ট বেহেশতে প্রবেশ করাবো।' এই ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাওরাতে অঙ্গীকার করা হয়েছিলঃ 'হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে এমন এক বড় মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল সৃষ্টি করবো যার অনুসরণ করা সমস্ত সৃষ্টজীবের প্রতি ফরয করে দেবো, এবং দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করবো।'

হযরত ইমাম রাযী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বড় বড় নবীগণের ভবিষ্যদ্বানী উদ্ধৃত করেছেন। এও বর্ণিত আছে যে, বান্দার অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে ইসলামকে মান্য করা এবং তার উপর আমল করা। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পুরো করার অর্থ হচ্ছে–তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বেহেশ্ত দান করা। 'আমাকেই ভয় কর' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দারদেরকে বলছেন যে, তাঁর বান্দাদের তাঁকে ভয় করা উচিত। কেননা, যদি তারা তাঁকে ভয় না করে তবে তাদের উপরও এমন শাস্তি এসে পড়বে যে শাস্তি তাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল।

বর্ণনা রীতি কি চমৎকার যে, উৎসাহ প্রদানের পরই ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শন একত্রিত করে সত্য গ্রহণ ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কুরআন মাজীদ হতে উপদেশ গ্রহণ করতে, তাতে বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করতে এবং নিষিদ্ধ কার্য হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এজন্যেই এর পরেই আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন যে, তারা যেন সেই কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যা তাদের নিজস্ব কিতাবেরও সত্যতা স্বীকার করে। এটা এনেছেন এমন নবী যিনি নিরক্ষর আরবী, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী, আলোকময় প্রদীপ সদৃশ, যাঁর নাম মুহাম্মদ (সঃ),যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলকে সত্য প্রতিপন্নকারী এবং যিনি সত্যের বিস্তার সাধনকারী। তাওরাত ও ইঞ্জীলেও মুহাম্মদ (সঃ)-এর বর্ণনা ছিল বলে তাঁর আগমনই ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যতার প্রমাণ। আর এ জন্যেই তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তিনি তাদের কিতাবের সত্যতার প্রমাণরূপে আগমন করেছেন। সুতরাং তাদের অবগতি সত্ত্বেও যেন তারা তাঁকে প্রথম অস্বীকার না করে বসে। কেউ কেউ বলেন যে, بِهٖ -এর 'ه' সর্বনামটি কুরআনের দিকে ফিরেছে। কেননা পূর্বে بِمَآ اَنْزَلْتُ এসেছে। প্রকৃতপক্ষে দু'টি মতই সঠিক। কেননা কুরআনকে মান্য করার অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মান্য করা এবং রাসূলের (সঃ) সত্যতা স্বীকার করে নেয়া। اَوَّلَ كَافِرٍ -এর ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের প্রথম কাফির। কারণ কুরায়েশ বংশীয় কাফিরেরাও তো কুফরী ও অস্বীকার করেছিল। কিন্তু বানী ইসরাঈলের কুফরী ছিল আহ্লে কিতাবের প্রথম দলের কুফরী। এজন্যেই তাদেরকে প্রথম কাফির বলা হয়েছে। তাদের সেই অবগতি ছিল যা অন্যদের ছিল না। 'আমার আয়াতসমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করো না। এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, বানী ইসরাঈল যেন আল্লাহ্র আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর রাসূলের (সঃ) সত্যতা স্বীকার পরিত্যাগ না করে। এর বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়াও তারা পেয়ে যায় তথাপি আখেরাতের তুলনায় এটা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর এটা স্বয়ং তাদের কিতাবেও বিদ্যমান আছে।

সুনান-ই-আবি দাঊদের মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে বিদ্যার দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি কেউ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে তবে সে কিয়ামতের দিন বেহেশতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবে না।' নির্ধারণ না করে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার মজুরী নেয়া বৈধ। শিক্ষক যেন স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারেন, এবং স্বীয় প্রয়োজনাদি পুরো করতে পারেন তজ্জন্যে বায়তুলমাল হতে গ্রহণ করাও তাঁর জন্যে বৈধ। যদি বায়তুল মাল হতে কিছুই পাওয়া না যায় এবং বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার কারণে শিক্ষক অন্য কাজ করারও সুযোগ না পান তবে তাঁর জন্যে বেতন নির্ধারণ করাও বৈধ। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং জমহূর উলামার এটাই মাযহাব।

সহীহ বুখারী শরীফের ঐ হাদীসটিও এর দলীল যা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নির্ধারণ করে মজুরী নিয়েছেন এবং একটি সাপে কাটা রোগীর উপর কুরআন পড়ে ফুঁক দিয়েছেন। এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ 'যার উপরে তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাক তার সবচেয়ে বেশী হকদার হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।' অন্য একটি সুদীর্ঘ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটি পুরুষ লোকের বিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে বলেছেনঃ 'তোমার সঙ্গে এই নারীর বিয়ে দিলাম এই মোহরের উপরে যে, তোমার যেটুকু কুরআন মাজীদ মুখস্থ আছে তা তুমি তাকে মুখস্থ করিয়ে দেবে।'

সুনান-ই-আবি দাঊদের একটি হাদীসে আছে যে, একটি লোক আহ্‌লে সুফ্‌ফাদের কোন একজনকে কিছু কুরআন মাজীদ শিখিয়েছিলেন। তার বিনিময়ে তিনি তাঁকে একটি কামান উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেনঃ 'তুমি যদি আগুনের কামান নেয়া পছন্দ কর তবে তা গ্রহণ কর।' সুতরাং তিনি তা ছেড়ে দেন। হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হতেও এইরূপই একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে। এই দু'টি হাদীসের ভাবার্থ এই যে, তিনি যখন 'একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই' এই নিয়্যাতে শিখিয়েছিলেন, তখন আর তার জন্যে উপঢৌকন গ্রহণে স্বীয় পুণ্য নষ্ট করার কি প্রয়োজন? কিন্তু যখন প্রথম হতে বিনিময় গ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেয়া হবে তখন নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। যেমন উপরের দু'টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন।

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র রহমতের আশায় তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে লেগে থাকতে হবে এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা

ত্যাগ করতে হবে। এই দু'অবস্থাতেই স্বীয় প্রভুর পক্ষ হতে সে একটি জ্যোতির উপর থাকে। মোটকথা তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, তারা যেন দুনিয়ার লোভে তাদের কিতাবে উল্লিখিত নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়াতের সত্যতা গোপন না করে এবং দুনিয়ার শাসন ক্ষমতার মোহে পড়ে বিরুদ্ধাচরণ না করে, বরং প্রভুকে ভয় করতঃ সত্যকে প্রকাশ করতে থাকে।

**৪২। এবং তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সেই সত্য গোপন করো না যেহেতু তোমরা তা অবগত আছ।**

٤٢- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

**৪৩। আর তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকু'কারীদের সাথে রুকূ' কর।**

٤٣- وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ ○

**তিরস্কারঃ**

ইয়াহূদীদেরকে এ বদ অভ্যাসের জন্যে তিরস্কার করা হচ্ছে যে, তারা জানা সত্ত্বেও কখনও তো সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করতো, আবার কখনও সত্যকে গোপন করতো এবং মিথ্যাকে প্রকাশ করতো। তাদেরকে এ কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে এবং উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সত্যকে প্রকাশ করে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। আর তারা যেন ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত না করে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের মঙ্গল কামনা করে, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের বিদ'আতকে ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে মিশ্রিত না করে। আর তারা তাদের কিতাবে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী পাচ্ছে তা যে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে কার্পণ্য না করে।

تَكْتُمُوا শব্দটি জযম বিশিষ্ট ও যবর বিশিষ্ট দুই-ই হতে পারে। অর্থাৎ এটা ওটার মধ্যে একত্রিত করো না। হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) পঠনে تَكْتُمُونَ ও আছে। তখন এটা حَال হবে এবং পরের বাক্যটিও حَال হবে। তখন অর্থ হবে এইঃ 'সত্যকে সত্য জেনে এ রকম নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ করো না এবং অর্থ এও হবেঃ এই গোপন করা ও মিশ্রিত করার শাস্তি যে কি হতে পারে তা জানা সত্ত্বেও তোমরা এই পাপের কাজ করতে রয়েছো!' অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে নামায পড়ে, তাঁকে

যাকাত প্রদান করে, তাঁর উম্মতের সাথে রুকু' ও সিজদায় অংশগ্রহণ করতে থাকে, তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তারা নিজেরাও যেন তাঁরই উম্মত হয়ে যায়। আনুগত্য ও অন্তরঙ্গতাকেও যাকাত বলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে এটাই বলেছেন। দু'শ ও ততোধিক দিরহামের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। নামায ও যাকাত ফরয ও ওয়াজিব। এ দু'টো ছাড়া আমল ব্যর্থ হয়ে যায়। কেউ কেউ যাকাতের অর্থ ফিৎরাও নিয়েছেন।

'রুকু'কারীদের সাথে রুকু' কর, এর অর্থ এই যে, তারা যেন ভাল কাজে মুমিনদের সাথে অংশগ্রহণ করে। আর ঐ কাজগুলোর মধ্যে নামাযই হলো সর্বোত্তম। এ আয়াত দ্বারা অধিকাংশ 'আলিম জামা'আতের সাথে নামায ফরয হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। এখানে ইমাম কুরতবী (রঃ) জামা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

---

| | |
|---|---|
| **৪৪। তবে কি তোমরা লোকদেরকে সৎকার্যে আদেশ করছো এবং তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছো—অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর; তবে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছো না?** | ٤٤- اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ |

---

উপদেশঃ অর্থাৎ কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, যারা অন্যকে ভাল কাজের আদেশ করে থাকে—অথচ নিজেরা তা পালন করে না। তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে—এটা জানা সত্ত্বেও যে কিতাবীরা এ কাজ করছে এটা বড়ই বিস্ময়জনক ব্যাপারই বটে। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা অপরকে যেমন খোদাভীতি ও পবিত্রতার কথা শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের নিজেদেরও তার উপর আমল করা উচিত। অপরকে নামায রোযার নির্দেশ দেয়া আর নিজে পালন না করা বড়ই লজ্জার কথা। জনগণকে বলার পূর্বে মানুষের উচিত নিজে আমলকারী হওয়া। অর্থ এও হচ্ছে যে, তারা অন্যদেরকে তো তাদের কিতাবকে অস্বীকার করতে নিষেধ করছে অথচ আল্লাহ্র নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে অস্বীকার করে নিজেরাই তাদের কিতাবকে অস্বীকার করছে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছে, অথচ ইহলৌকিক ভয়ের কারণে তারা নিজেরাই ইসলাম কবূল করছে না।

হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ) বলেন যে, মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে ঐসব লোকের শত্রু হয়ে যায় যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে এবং যে পর্যন্ত না সে স্বীয় নাফসের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে যায়। ঐসব ইয়াহূদী ঘুষ পেলে অসত্যকেও সত্য বলে দিতো, কিন্তু নিজেরা ওর উপর আমল করতো না। এ কারণেই আল্লাহ তাদের নিন্দে করেছেন।

## একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য

এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়ার জন্যে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং তারা নিজেরা পালন না করার জন্যে তিরস্কৃত হয়েছে। ভাল কথা বলা তো ভালই, বরং এটা তো ওয়াজিব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজেরও তার প্রতি 'আমল করা উচিত। যেমন হযরত শু'আইব (আঃ) বলেছেনঃ 'আমি এরূপ নই যে, তোমাদেরকে বিরত রাখি আর নিজে করি, আমার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে সাধ্যানুসারে সংস্কার সাধন, এবং আমার শক্তি তো আল্লাহ্র সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।' সুতরাং ভাল কাজ করতে বলা ওয়াজিব এবং নিজে করাও ওয়াজিব। একটি না করলে অন্যটিও ব্যর্থ হয়ে যাবে তা নয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের মত এটাই। যদিও কতকগুলো লোকের মত এই যে, যারা নিজেরা খারাপ কাজ করে তারা যেন অপরকে ভাল কাজের কথা না বলে। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। আবার এসব লোকের এ আয়াতকে দলীল রূপে পেশ করা মোটেই ঠিক নয়। বরং সঠিক কথা এটাই যে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে এবং নিজেও পালন করবে ও বিরত থাকবে। যদি দু'টোই ছেড়ে দেয় তবে দ্বিগুণ পাপী হবে এবং একটি ছাড়লে একগুণ পাপী হবে।

## আমলহীন উপদেশ দাতার শাস্তি

তিবরানী (রঃ)-এর 'মু'জিম কাবীর'-এ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে আলেম জনগণকে ভাল কথা শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজে আমল করে না তার দৃষ্টান্ত ঐ প্রদীপের মত যে লোক তার আলো দ্বারা উপকার লাভ করে কিন্তু তা নিজে পুড়ে থাকে। এ হাদীসটি গরীব বা দুর্বল।

মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মি'রাজের রাত্রে আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোকের ওষ্ঠ আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এরা কারা? তখন আমাকে বলা হলো যে, এরা আপনার উম্মতের বক্তা, উপদেশ দাতা ও আলেম। এরা মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা দিতো কিন্তু নিজে আমল করতো না, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বুঝতো না।' অন্য হাদীসে আছে যে, তাদের জিহ্বা ও ওষ্ঠ উভয়ই কাটা হচ্ছিল। হাদীসটি বিশুদ্ধ।

ইবনে হিব্বান (রঃ), ইবনে আবি হাতিম, ইবনে মিরদুওয়াই প্রভৃতি মনীষীদের লিখিত কিতাবের মধ্যে এটা বিদ্যমান আছে। আবূ অ'য়েল (রঃ) বলেন যে, একদা হযরত উসামা (রাঃ) কে বলা হয়ঃ 'আপনি হযরত উসমান (রাঃ) কে কিছু বলেন না?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'আপনাদেরকে শুনিয়ে বললেই কি শুধু বলা হবে? আমি তো গোপনে তাঁকে সব সময়েই বলে আসছি। কিন্তু আমি কোন কাজ ছড়াতে চাইনে। আল্লাহ্র শপথ! আমি কোন লোককে সর্বোত্তম বলবো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন একটি লোককে আনা হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়ীভূঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং সে তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে। অন্যান্য দোযখবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ 'জনাব আপনি তো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন, আপনার এ অবস্থা কেন?' সে বলবেঃ 'আফসোস! আমি তোমাদেরকে বলতাম কিন্তু নিজে আমল করতাম না। আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতাম না। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।' সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও এ বর্ণনাটি আছে।

মুসনাদের আরো একটি হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা অশিক্ষিতদেরকে যত ক্ষমা করবেন তত ক্ষমা তিনি শিক্ষিতদেরকে করবেন না। কোন কোন হাদীসে এটাও আছে যে, আলেমকে যদি একবার ক্ষমা করা হয় তবে সাধারণ লোককে সত্তর বার ক্ষমা করা হবে। বিদ্বান ও মূর্খ এক হতে পারে না। কুরআন মাজীদে আছেঃ 'যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? উপদেশ তো জ্ঞানীরাই গ্রহণ করে থাকে।' ইবনে আসাকীরের কিতাবের মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীরদেরকে দেখে বলবে–'আপনাদের উপদেশ শুনেই তো আমরা জান্নাতবাসী হয়েছি, আপনারা জাহান্নামে এসে পড়েছেন কেন?' তারা বলবে–'আফসোস! আমরা তোমাদেরকে বলতাম বটে, কিন্তু নিজেরা আমল করতাম না।

### একটি ঘটনাঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে এক ব্যক্তি বলেনঃ 'জনাব! আমি ভাল কাজের হুকুম করতে ও মন্দ কাজ হতে জনগণকে বিরত রাখতে চাই।' তিনি বললেনঃ 'তুমি কি এ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছে গেছো?' লোকটি বলেঃ 'হাঁ' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'এক স্থানে তো আল্লাহ পাক বলেছেন–'তোমরা জনগণকে ভাল কাজের আদেশ করছো আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর রয়েছো।' অন্যত্র বলেছেন–'তোমরা কেন বলছো যা নিজেরা কর না? আল্লাহ্র নিকট এটা

খুব অসন্তুষ্টির কারণ যে, তোমরা বলবে যা নিজেরা করবে না।' অন্য আয়াতে হযরত শু'আইব (আঃ)-এর কথাঃ যে কাজ হতে আমি তোমাদেরকে বিরত রাখি তাতে আমি তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাইনে, আমার উদ্দেশ্য শুধু সাধ্যানুসারে সংস্কার সাধন।' আচ্ছা বলতো-তুমি কি এই তিনটি আয়াত হতে নির্ভয়ে রয়েছো?' সে বলেঃ 'না।' তিনি বলেনঃ 'তুমি স্বীয় নাফ্স হতেই আরম্ভ কর (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)।' তিবরানীর একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে জনগণকে কোন কথা বা কাজের দিকে আহ্বান করে এবং নিজে করে না, সে আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে অবস্থান করে যে পর্যন্ত না সে নিজে তার আমলে লেগে যায়। হযরত ইবরাহীম নাখঈও (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনাকৃত তিনটি আয়াতকে সামনে রেখে বলেনঃ 'এরই কারণে আমি গল্প বলা পছন্দ করি না।'

**৪৫। এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; অবশ্যই ওটা কঠিন, কিন্তু বিনীতগণের পক্ষে নয়।**

**৪৬। যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সম্মিলিত হবে এবং তারা তাঁরই দিকে প্রতিগমন করবে।**

٤٥- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ٥

٤٦- الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ٥ (ع ٥)

এ আয়াতে মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

কর্তব্য পালন করতে এবং নামায পড়তে বলা হয়েছে। রোযা রাখাও হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা। এ জন্যেই রমযান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'রোযা অর্ধেক ধৈর্য।' ধৈর্যের ভাবার্থ পাপের কাজ হতে বিরত থাকাও বটে। এ আয়াতে যদি ধৈর্যের ভাবার্থ এটাই হয়ে থাকে তবে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকাও পুণ্যের কাজ করা এ দু'টোরই বর্ণনা হয়ে গেছে। পুণ্যের কার্যসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে নামায। হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'ধৈর্য দু'প্রকার। (১) বিপদের সময় ধৈর্য, (২) পাপের কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য। দ্বিতীয় ধৈর্য প্রথম ধৈর্য হতে উত্তম।' হযরত সাঈদ বিন যুবাইর

(রঃ) বলেনঃ 'প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ্র পক্ষ হতে হয়ে থাকে মানুষের এটা স্বীকার করা, পুণ্য প্রার্থনা করা এবং বিপদের প্রতিদানের ভাণ্ডার আল্লাহ্র নিকটে আছে এ মনে করার নাম ধৈর্য।' আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কাজে ধৈর্যধারণ করলেও আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করা হয়। পুণ্যের কাজে নামায দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

স্বয়ং কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছেঃ 'তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, নিশ্চয় এ নামায সমুদয় নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে, আর আল্লাহ্র স্মরণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম বস্তু।' হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখনই কোন কঠিন ও চিন্তাযুক্ত কাজের সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

খন্দকের যুদ্ধে রাতের বেলায় হযরত হুযাইফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হলে তাঁকে নামাযে দেখতে পান। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ 'বদর যুদ্ধের রাত্রে আমরা সবাই শুয়ে গেছি, আর দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা রাত নামাযে রয়েছেন। সকাল পর্যন্ত তিনি নামায ও প্রার্থনায় লেগে রয়েছেন।' তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে আছে যে, নবী করীম (সঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে দেখতে পান যে, তিনি ক্ষুধার জ্বালায় পেটের ব্যাথায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি ফারসী ভাষায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ اشكم درد অর্থাৎ 'তোমার পেটে কি ব্যথা আছে?' তিনি বলেনঃ 'হাঁ।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'উঠো, নামায আরম্ভ কর, এতে রোগমুক্তি রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) সফরে তাঁর ভাই কাসামের (রাঃ) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (২ঃ ১৫৬) পাঠ করতঃ পথের এক ধারে সরে গিয়ে উটকে বসিয়ে দেন এবং নামায শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ নামায পড়ার পর সাওয়ারীর নিকট আসেন এবং এই আয়াত দু'টি পড়তে থাকেন। মোটকথা ধৈর্য ও নামায এ দু'টো দ্বারা আল্লাহ্র করুণা লাভ করা যায়।

إِنَّهَا-এর هَا সর্বনামটি কেউ কেউ صَلٰوةٌ-এর দিকে ফিরিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর مَرْجَعٌ হচ্ছে مَدْلُوْلُ الْكَلَامِ অর্থাৎ وَصِيَّت শব্দটি। যেমন কারূণের ঘটনায় وَ لَا يُلَقّٰهَا-এর هَا সর্বনামটি এবং মন্দের বিনিময়ে ভাল করার হুকুমে وَ مَا يُلَقّٰهَا এর هَا সর্বনামটি। ভাবার্থ এই যে, ধৈর্য ও নামায এ দু'টি প্রত্যেকের সাধ্যের মধ্যে নয়। এ অংশ হচ্ছে ঐ দলের জন্যে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে থাকে। অর্থাৎ কুরআনকে মান্যকারী সত্য মু'মিন, বিনয়ী, আনুগত্য স্বীকারকারী এবং জান্নাতের অঙ্গীকার ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনের উপর

বিশ্বাস স্থাপনকারীরগণই এ বিশেষণে বিশেষিত হবে। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ 'এটা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু যার উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ হয় তার জন্যে সহজ।' ইবনে জারীর (রঃ) আয়াতটির অর্থ করতে গিয়ে বলেন যে, এটাও ইয়াহূদীদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই যে, বর্ণনাটি তাদের জন্যে হলেও আদেশ হিসেবে সাধারণ। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

### বিনয়ীগণঃ

সামনে এগিয়ে خَاشِعِيْنَ -এর বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে ধারণা অর্থ বিশ্বাস, যদিও এটা সন্দেহের অর্থেও এসে থাকে। যেমন سَدَفَةٌ শব্দটি অন্ধকারের অর্থেও আসে এবং আলোর অর্থেও আসে। অনুরূপভাবে صَارِخٌ শব্দটি অভিযোগকারী ও অভিযোগের প্রতিকারকারী উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরকম আরও বহু শব্দ আছে যেগুলো দু'টি বিভিন্ন জিনিসের উপর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ظَن শব্দটি يَقِيْن অর্থে ব্যবহার আরব কবিদের কবিতায়ও দেখা যায়। স্বয়ং কুরআন মাজীদেরই অন্য স্থানে আছেঃ

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا

অর্থাৎ 'পাপীরা জাহান্নাম দেখে বিশ্বাস করে নেবে যে, নিশ্চয় তারা তার মধ্যে পতিত হয়ে যাবে।' (১৮ঃ ৫৩) এখানেও ظَن শব্দটি يَقِيْن অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে এরকম প্রত্যেক জায়গাতে ظَن শব্দটি يَقِيْن -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আবুল আলিয়াও (রঃ) এখানে ظَن -এর অর্থ يَقِيْن করে থাকেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ) এবং কাতাদারও (রঃ) মত এটাই। ইবনে জুরাইযও (রঃ) এ কথাই বলেন। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় আছেঃ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ অর্থাৎ 'আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে (৬৯ঃ ২০)।

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন এক পাপীকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন—'আমি কি তোমাকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দেইনি? তোমার প্রতি কি নানা প্রকারের অনুগ্রহ করিনি, ঘোড়া ও উটকে কি তোমার অধীনস্থ করিনি? তোমাকে কি শান্তি, আরাম, আহার্য ও পানীয় দেইনি? সে বলবে—'হাঁ', হে প্রভু! এ সব কিছুই ছিল, তখন আল্লাহ বলবেন—'তবে তোমার কি এই জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল না যে, তোমাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে?' সে বলবে—'হাঁ, হে

প্রভু! এর প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল।' আল্লাহ বলবেন–'তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তেমনই আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম।' এ হাদীসেও ظَنّ শব্দটি এসেছে এবং يَقِيْن -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আরও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ (৫৯ঃ ১৯)-এর তাফসীরে আসবে।

৪৭। হে বানী ইসরাঈলগণ! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

٤٧- يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

## উপদেশ ও আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের বিস্তারিত আলোচনা

বানী ইসরাঈলের বাপ দাদার উপর মহান আল্লাহ যে নিয়ামত দান করেছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে রাসূল হয়েছেন, তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তাদের যুগের অন্যান্য লোকের উপর তাদেরকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ 'নিশ্চয় আমি তাদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানে সারা বিশ্বজগতের উপর মর্যাদা দান করেছি।' অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 'এবং যখন মূসা (আঃ) বললোঃ– 'হে আমার গোত্র তোমাদের উপর আল্লাহ্র যে নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন যা সারা বিশ্বের আর কাউকেও দেয়া হয়নি।' সমস্ত লোকের উপর মর্যাদা লাভের অর্থ হচ্ছে তাদের যুগের সমস্ত লোকের উপর। কেননা, মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত নিশ্চিতরূপে তাদের চেয়ে উত্তম। এ উম্মত সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ 'তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে জনমণ্ডলীর জন্যে প্রকাশ করা হয়ছে.. ..।

মুসনাদসমূহের ও সুনানের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা সত্তরতম উম্মত এবং তোমরা সর্বোত্তম ও মর্যাদবান।'

এ প্রকারের বহু হাদীস ইনশাআল্লাহ (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ) এর তাফসীরে আসবে। আবার এও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সমস্ত লোকের উপর একটি বিশেষ প্রকারের ফযীলত', ওর দ্বারা সর্বপ্রকারের ফযীলত সাব্যস্ত হয় না। ইমাম রাযী (রঃ) এটাই বলেছেন। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়। এটাও বলা হয়েছে,

তাদের মর্যাদা সমস্ত উম্মতের উপর এই দিক দিয়ে যে, নবীগণ তাদের মধ্য হতেই হয়ে এসেছেন। কিন্তু এর মধ্যেও চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা, এরকম সাধারণভাবে দেখতে গেলে তাদের পূর্ববর্তীগণও এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে আগের নবীগণ (আঃ) এদের মধ্য হতে ছিলেন না। যেমন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)। আর হযরত মুহাম্মদও (সঃ) তাদের মধ্য হতে ছিলেন না–যিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী এবং যিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্বোত্তম আর যিনি হচ্ছেন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে সমস্ত আদম সন্তানের নেতা (তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।)

৪৮। এবং তোমরা সেই দিবসের ভয় কর–যেদিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবে না এবং কোন ব্যক্তি হতে কোন সুপারিশও গৃহীত হবে না, কোন ব্যক্তি হতে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না।

٤٨- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

## শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন

নিয়ামতসমূহের বর্ণনার পর এখন শাস্তি হতে ভয় দেখান হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, কেউ কারও কোন উপকার করবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেনঃ 'কেউ কারও বোঝা বহন করবে না। আর এক জায়গায় বলেছেনঃ 'সেদিন প্রত্যেক লোক এক বিস্ময়কর অবস্থায় পড়ে থাকবে।' অন্য স্থানে আছেঃ 'হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, ঐদিনকে ভয় কর যেদিন পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার কোন উপকার করতে পারবে না।' আরও বলেছেনঃ 'না কোন কাফিরের জন্যে কেউ সুপারিশ করবে, না তার সুপারিশ কবূল করা হবে।' আর এক জায়গায় আছেঃ 'ঐ কাফিরদের জন্যে সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না।' অন্য এক জায়গায় জাহান্নামবাসীদের এ উক্তি নকল করা হয়েছেঃ 'আফসোস! আমাদের না আছে কোন সুপারিশকারী এবং না আছে কোন বন্ধু।'

এক স্থানে আছে ঃ 'মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না।' আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কুফরীর অবস্থায় মারা যায় সে যদি শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পৃথিবীপূর্ণ সোনা প্রদান করে তবে তাও গ্রহণ করা হবে

না।' মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ 'কাফিরদের নিটক যদি সারা পৃথিবীর জিনিস এবং ওর মত আরও থাকে, আর কিয়ামতের দিন সে ঐ সমুদয় জিনিস মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করে শাস্তি হতে বাঁচতে চায়, তাহলেও কবূল করা হবে না এবং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে জড়িত থাকবে।"

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেনঃ 'তারা মোটা রকমের মুক্তিপণ দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না।' আর এক জায়গায় বলেনঃ 'আজ না তোমাদের নিকট হতে বিনিময় গ্রহণ করা হবে, না কাফিরদের নিকট হতে, তোমাদের অবস্থানস্থল জাহান্নাম, ওর আগুনই তোমাদের প্রভু।' ভাবার্থ এই যে, ঈমান ছাড়া শুধুমাত্র সুপারিশের উপর নির্ভর করলে তা কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। কুরআন মাজীদে এক জায়গায় আছেঃ 'তোমরা ঐ দিন আসার পূর্বে পুণ্য কামিয়ে নাও যেদিন না ক্রয় বিক্রয় হবে, না কোন বন্ধুত্ব থাকবে।' এখানে عَدْلٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনিময় এবং বিনিময় ও মুক্তিপণের একই অর্থ।

হযরত আলী (রাঃ) হতে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'শাফা'আত' এর অর্থ নফল এবং 'আদল'-এর অর্থ ফরয। কিন্তু এখানে এ কথাটি গরীব বা দুর্বল, প্রথম কথাটিই সঠিক। একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে প্রশ্ন করা হয়ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! 'আদল'-এর অর্থ কি?' তিনি বলেনঃ 'মুক্তিপণ।' 'তার সাহায্য করা হবে না'-এর অর্থ এই যে, তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না, আত্মীয়তার বন্ধন কেটে যাবে, তার জন্যে কারও অন্তরে দয়া থাকবে না এবং তার নিজেরও কোন শক্তি থাকবে না।

কুরআন মাজীদের আর এক জায়গায় আছেঃ 'তিনি আশ্রয় দিয়ে থাকেন এবং তাঁর পাকড়াও হতে আশ্রয়দাতা কেউই নেই।' অন্যত্র আছেঃ 'সেদিন না কেউ আল্লাহর শাস্তি প্রদানের ন্যায় শাস্তি প্রদানকারী হবে, আর না তাঁর বন্ধনের ন্যায় কেউ বন্ধনকারী হবে।' আর এক জায়গায় আছেঃ 'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করছো না?' বরং তারা সেদিন সবাই নতশির থাকবে।' অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পূজা করতো, আজ সেই পূজনীয়গণ তাদের পূজকদের সাহায্য করছে না কেন?' বরং তারা তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছে। ভাবার্থ এই যে, প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে গেছে, ঘুষ কেটে গেছে, সুপারিশ বন্ধ হয়েছে, পরস্পরের সাহায্য সহানুভূতি দূর হয়ে গেছে। আজ মোকদ্দামা চলে গেছে সেই ন্যায় বিচারক, মহাপ্রতাপান্বিত সারাজাহানের মালিক আল্লাহ্র হাতে, যাঁর বিচারালয়ে সুপারিশকারীদের সুপারিশ এবং সাহায্যকারীদের সাহায্য কোন কাজে আসবে না, বরং সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। তবে বান্দার প্রতি তাঁর পরম করুণা ও

দয়া এই যে, তাদেরকে তাদের পাপের প্রতিদান ঠিক পাপের সমানুপাতেই দেয়া হবে, আর পুণ্যের প্রতিদান দেয়া হবে কমপক্ষে দশগুণ বাড়িয়ে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদের মধ্যে এক জায়গায় বলেছেনঃ 'থামাও তাদেরকে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এখন তোমাদের কি হলো যে, একে অপরকে সাহায্য করছো না? বরং সেদিন তারা সবাই নতশিরে থাকবে।

৪৯। এবং যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের সম্প্রদায় হতে বিমুক্ত করেছিলাম– তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতো, তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করতো ও তোমাদের কন্যাগণকে জীবিত রাখতো এবং এতে তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের জন্যে মহাপরীক্ষা ছিল।

٤٩- وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ
الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ وَفِيْ
ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

৫০। এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, তৎপর তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফির'আউনের স্বজনবৃন্দকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে।

٥٠- وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ
فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ
فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

এই আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে, আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের কথা তাদের স্মরণ করা উচিত যে, তিনি তাদেরকে ফির'আউনের জঘন্যতম শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। অভিশপ্ত ফির'আউন স্বপ্নে দেখেছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক হতে এক আগুন জ্বলে উঠে মিসরের প্রত্যেক কিবতীর ঘরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা বানী ইসরাঈলের ঘরে যায়নি। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল এই যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে তার অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার খোদায়ী দাবীর চরম শাস্তি তার হাতেই হবে। এজন্যেই সেই অভিশপ্ত ব্যক্তি চারদিকে এ নির্দেশ জারী করে দিল যে, বানী ইসরাঈলের ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সরকারী লোক যাচাই করে দেখবে। যদি পুত্র সন্তান

হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলা হবে। আর যদি মেয়ে সন্তান হয় তবে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আরও ঘোষণা করলো যে, বানী ইসরাঈলের দ্বারা কঠিন ও ভারী কাজ করিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের মাথার উপরে ভারী ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। এখানে শাস্তির তাফসীর পুত্র সন্তান হত্যার দ্বারা করা হয়েছে। সূরা-ই-ইবরাহীমে একের সংযোগ অন্যের উপর করা হয়েছে। এর পূর্ণ ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ সূরা-ই কাসাসের প্রথমে দেয়া হবে।

يَسُوْمُوْنَكُمْ -এর অর্থ হচ্ছে 'লাগিয়ে দেয়া' এবং 'সদা করতে থাকা'। অর্থাৎ তারা বরাবরই কষ্ট দিয়ে আসছিল। যেহেতু এই আয়াতের পূর্বে বলেছিলেন যে, তারা যেন আল্লাহ্র পুরস্কার রূপে দেয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করে। এজন্যে ফির'আউনীদের শাস্তিকে ব্যাখ্যা হিসেবে পুত্র সন্তান হত্যা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর সূরা-ই-ইবরাহীমের প্রথমে বলেছিলেন যে, তারা যেন আল্লাহ্র নিয়ামতকে স্মরণ করে এজন্যে সেখানে সংযোগের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, যাতে নি'য়ামতের সংখ্যা বেশী হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্তি হতে এবং পুত্র সন্তান হত্যা হতে তাদেরকে হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন।

মিসরের আমালীক কাফির বাদশাহদেরকে ফির'আউন বলা হতো। যেমন রূমের কাফির বাদশাহকে কাইসার, পারস্যের কাফির বাদশাহকে কিসরা, ইয়ামনের কাফির বাদশাহকে 'তুব্বা', হাবশের কাফির বাদশাহকে নাজ্জাসী এবং ভারতের কাফির বাদশাহকে বলা হতো বাতলীমুস।

ঐ ফির'আউনের নাম ছিল ওয়ালিদ বিন মুসআব বিন রাইহান। কেউ কেউ মুসআব বিন রাইয়ানও বলেছেন। আমালীক বিন আউদ বিন আরদাম বিন সাম বিন নূহের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার কুনইয়াত ছিল আবূ মাররাহ্। প্রকৃতপক্ষে সে ইসতাগার ফারসীদের মুলোদ্ভূত ছিল। তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহ পাক বলেন যে, এ মুক্তি দেয়ার মধ্যে তাঁর পক্ষ হতে এক অতি নিয়ামত ছিল। بَلَاءٌ -এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নিয়ামত। পরীক্ষা ভাল ও মন্দ উভয়ের সাথেই হয়ে থাকে। কিন্তু بَلَوْتُهُ بَلَاءً -এর শব্দ সাধারণতঃ মন্দের পরীক্ষার জন্যে এবং أَبْلَيْتُهُ اِبْلَاءً وَ بَلَاءً -এর শব্দ মঙ্গলের পরীক্ষার জন্যে এসে থাকে। এটা বলা হয়েছে যে, এতে অর্থাৎ ঐ শাস্তি এবং পুত্র সন্তানদের হত্যা করার মধ্যে তাদের পরীক্ষা ছিল।

কুরতবী (রঃ) দ্বিতীয় ভাবকে জমহূরের কথা বলে থাকেন। তাহলে এতে ইঙ্গিত হবে যবাহ্ ইত্যাদির দিকে এবং بَلَاءٌ -এর অর্থ হবে মন্দ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে ফির'আউনের দল হতে বাঁচিয়ে

নিয়েছেন। তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং ফির'আউন তাদেরকে ধরার জন্যে দলবলসহ বেরিয়ে পড়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিয়ে তাদেরকে পার করেছিলেন এবং তাদের চোখের সামনে ফির'আউনের তার সৈন্যবানিহীসহ ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কথার বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সূরা-ই-শু'রার মধ্যে আসবে।

আমর বিন মাইমুন আওদী (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হন তখন ফির'আউন এ সংবাদ পেয়ে তার লোকজনকে বলে যে, তারা যেন মোরগের ডাকের সাথে সাথে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে ধরে যেন হত্যা করে দেয়। কিন্তু সেই রাতে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ্র হুকুমে মোরগ ডাকেনি। অতঃপর মোরগের ডাক শোনা মাত্রই ফির'আউন একটি ছাগী যবাহ্ করে এবং বলেঃ 'আমি এর কলিজা খাওয়ার পূর্বেই ছয় লাখ কিবতী সৈন্য আমার সামনে হাজির চাই।' সুতরাং সৈন্যরা হাজির হয়ে গেল। ফির'আউন এই দলবল নিয়ে বড়ই জাঁকজমকের সাথে বানী ইসরাঈলকে ধ্বংস করার জন্যে বেরিয়ে বানী ইসরাঈলকে তারা সমুদ্রের ধারে পেয়ে গেল। এখন বানী ইসরাঈলের নিকট বিরাট পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। পিছনে সরলে ফির'আউনদের তরবারীর নীচে পড়তে হবে, আবার সামনে এগুলে মাছে গ্রাস করে নেবে। সে সময় হযরত ইউসা বিন নূন বললেন যে, হে আল্লাহ্র নবী (আঃ)! এখন কি করা যায়? তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর নির্দেশ আগে আগে রয়েছে।' এটা শোনা মাত্রই তিনি ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু গভীর পানিতে যখন ঘোড়া ডুবতে লাগলো তখন তিনি ধারে ফিরে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ 'হে মূসা! প্রভুর সাহায্য কোথায়? আমরা আপনাকেও মিথ্যাবাদী মনে করি না, প্রভুকেও নয়।' তিনবার তিনি এরকমই করলেন। এখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওয়াহী আসলোঃ 'হে মূসা (আঃ)! তোমার লাঠিটি নদীর উপর মার।' লাঠি মারা মাত্রই পানির মধ্যে রাস্তা হয়ে গেল এবং পানি পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ ঐ রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেলেন। তাদেরকে এভাবে পার হতে দেখে ফির'আউন ও তার সঙ্গীরা এ পথে তাদের ঘোড়া ছেড়ে দিল। যখন সবাই তার মধ্যে এসে গেল তখন আল্লাহ পানিকে মিলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। দুই দিকের পানি একাকার হয়ে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরে গেল। বানী ইসরাঈল নদীর অপর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র ক্ষমতার এ দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করলো। তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলো। নিজেদের মুক্তি এবং ফির'আউনের ধ্বংস তাদের জন্য খুশীর কারণ হয়ে গেল। এও বর্ণিত আছে যে, এটা আশূরার দিন ছিল। অর্থাৎ মহর্‌রম মাসের ১০ তারিখ।

মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় এসে যখন দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা আশূরার রোযা রয়েছে, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এইদিন তোমরা রোযা রাখ কেন?' তারা উত্তরে বলেঃ 'এজন্যে যে, এ কল্যাণময় দিনে বানী ইসরাঈল ফির'আউনের হাত হতে মুক্তি পেয়েছিল এবং তাদের শত্রুরা ডুবে মরেছিল। তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপে হযরত মূসা (আঃ) এ রোযা রেখেছিলেন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আঃ)-এর আমিই বেশী হকদার।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ও (সঃ) ঐ দিন রোযা রাখেন এবং জনগণকে রোযা রাখতে নির্দেশ দেন। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই- ইবনে মাজার মধ্যেও এ হাদীসটি আছে। অন্য একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ঐ দিন আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাঈলের জন্যে পানি উঁচু করে দিয়েছিলেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী জায়দুলআমা দুর্বল এবং তার শিক্ষক ইয়াযীদ রেকাশী তার চেয়েও বেশী দুর্বল।

**৫১। এবং যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রজনীর অঙ্গীকার করেছিলাম, অনন্তর তার পরে তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে।**

٥١- وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

**৫২। পুনরায় এর পরেও আমি তোমাদেরকে মার্জনা করেছিলাম- যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।**

٥٢- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

**৫৩। আর যখন আমি মূসাকে গ্রন্থ ও ফুরকান (প্রভেদকারী) দিয়েছিলাম, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।**

٥٣- وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

এখানেও মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন চল্লিশ দিনের অঙ্গীকারে বানী ইসরাঈলের নিকট হতে তূর পাহাড়ে চলে যান তখন তারা ইতিমধ্যেই বাছুর পূজা আরম্ভ করে দেয়। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা এ শিরক হতে তাওবা করে। তাই, আল্লাহ পাক বলেন যে, এত বড় অপরাধের পরেও তিনি

তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এটা বানী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর কম বড় অনুগ্রহ নয়। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় আছেঃ 'যখন আমি মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করেছিলাম এবং আরও দশ বাড়িয়ে পুরো চল্লিশ করেছিলাম।' বলা হয় যে, এ ওয়াদার সময়কাল ছিল জীক'কাদার পুরো মাস এবং জিলহজ্জ মাসের দশ দিন। এটা ফির'আউনীদের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার পরের ঘটনা। 'কিতাব'-এর ভাবার্থ তাওরাত এবং ফুরকান প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয় যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। এ কিতাবটিও উক্ত ঘটনার পরে পেয়েছিলেন। যেমন সূরা-ই-'আরাফের এ ঘটনার বর্ণনা রীতি দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। অন্যত্র রয়েছে 'আমি পূর্ব যুগীয় লোকদেরকে ধ্বংস করার পর মূসা (আঃ) কে এ কিতাব দিয়েছিলাম যা সমুদয় লোকের জন্য উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তারা উপদেশ লাভ করে।' এটাও বলা হয়েছে واو টি অতিরিক্ত এবং স্বয়ং কিতাবকেই ফুরকান বলা হয়েছে। কিন্তু এটা গরীব।

কেউ কেউ বলেন যে, কিতাবের উপরে ফুরকানের সংযোগ হয়েছে, অর্থাৎ 'কিতাবও দিয়েছি এবং মু'জিযাও দিয়েছি।' প্রকৃতপক্ষে অর্থ হিসেবে দু'টোর অর্থ একই এবং এ রকম দু'নামের একই জিনিস সংযোগরূপে আরবদের কথায় দেখা যায়। আরব কবিদের কবিতাগুলোও এর সাক্ষ্য বহন করে।

---

٥٤- وَاِذْقَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৫৪। আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো-হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করে তোমাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছো; অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তোমরা তোমাদের ঐ ব্যক্তিবর্গকে হত্যা কর; তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা দান করেছিলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল,করুণাময়।

এখানে তাদের তাওবার পন্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা বাছুরের পূজা করেছিল এবং তার প্রেম তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল। অতঃপর হযরত মূসার (আঃ) বুঝানোর ফলে তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে এবং তারা লজ্জিত হয় ও নিজেদের পথভ্রষ্টতার কথা বিশ্বাস করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজা করেছে তাদেরকে যেন হত্যা করে ঐসব লোক যারা এতে যোগ দেয়নি। তারা তাই করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের তাওবা কবূল করেন এবং হত্যাকারী ও নিহত সবকেই ক্ষমা করে দেন। এর পূর্ণ বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সূরা-ই- তা-হা'য় আসবে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর তাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তাওবা করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ এই যে, তাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যকে পূজা করা–এর চেয়ে বড় জুলুম আর অত্যাচার আর কী হতে পারে? একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ শুনিয়ে দেন এবং যেসব লোক বাছুর পূজা করেছিল তাদেরকে বসিয়ে দেন এবং অন্যান্য লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে অন্ধকার ছেয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে বিরত রাখা হয়। তখন গণনা করে দেখা যায় যে, সত্তর হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। এরপর সারা গোত্রের তাওবা কবূল হয়ে যায়। ওটা একটি কঠিন নির্দেশ ছিল যা তারা পালন করেছিল এবং আপন ও পর সকলকেই সমানভাবে হত্যা করেছিল। এরই ফলে পরম করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেনঃ 'যথেষ্ট হয়েছে, মহান আল্লাহ নিহতদেরকে শহীদের পুণ্যদান করেছেন। হত্যাকারী ও অবশিষ্ট লোকদের তাওবা আল্লাহ পাক কবূল করেছেন এবং তাদেকে জিহাদের পূণ্য দান করেছেন।'

হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) এভাবে তাঁদের গোত্রের হত্যাকার্য দর্শন করে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহ! এখন তো বনী ইসরাঈল দুনিয়ার বুক হতে মুছে যাবে!' সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং বিশ্বপ্রভু বলেনঃ 'হে আমার নবীগণ! তোমরা নিহতদের জন্যে দুঃখ করো না, তারা আমার নিকট শহীদদের মর্যাদা পেয়েছে। তারা এখানে জীবিত রয়েছে ও আহার্য পাচ্ছে।' তখন তাদের ও গোত্রের লোকদের সান্ত্বনা লাভ হয় এবং স্ত্রীলোকদের ও শিশুদের বিলাপ বন্ধ হয়, তরবারী, বর্শা, ছোরা ইত্যাদি থেমে যায়। পিতা পুত্র ও ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তারক্তি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবূল করেন।

٥٤- وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ○

৫৫। এবং যখন তোমরা বলেছিলে–হে মূসা! আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবো না–তখন বিদ্যুৎ তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল ও তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে।

٥٥- ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ○

৫৬। তৎপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

হযরত মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলের সত্তরজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী তূর পাহাড়ে যান এবং ঐ লোকগুলি আল্লাহ্র কথা শুনতে পায়, তখন তারা মূসা (আঃ) কে বলে যে, তারা আল্লাহ্কে সামনে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্নের ফলে দেখতে দেখতেই তাদের উপর আকাশ হতে বিদ্যুৎ পড়ে যায় এবং এক ভয়াবহ উচ্চ শব্দ হয়, তার ফলে তারা সবাই মরে যায়। এদিকে হযরত মূসা (আঃ) বিলাপ করতে থাকেন এবং কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহ্র নিকট আরজ করেনঃ 'হে আল্লাহ্! আমি বানী ইসরাঈলকে কি উত্তর দেবো! এরা তো তাদের মধ্যে উত্তম ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। হে প্রভু! আপনার এরূপ করার ইচ্ছে থাকলে ইতিপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে মেরে ফেলতেন। হে আল্লাহ! অজ্ঞ লোকদের অজ্ঞতার কারণে আমাকে ধরবেন না।

তাঁর এ প্রার্থনা কবূল হয় এবং তাঁকে বলা হয় যে, এরাও বাছুর পূজকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের শাস্তি হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর গোত্রের নিকট আসেন এবং তাদেরকে বাছুর পূজতে দেখেন, তিনি তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) ও সামেরীকে তিরস্কার করেন। অতঃপর বাছুরকে পুড়িয়ে ফেলেন এবং ওর ছাই নদীতে ভাসিয়ে দেন। তারপর তাদের মধ্যে হতে উত্তম লোকদেরকে বেছে নেন। তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর। তাওবা করাবার জন্যে তিনি তাদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যান। তাদেরকে বলেনঃ 'তোমরা তাওবা কর, রোযা

রাখ, পবিত্র হয়ে যাও এবং কাপড় পাক কর।' যখন হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে নিয়ে তূরে সীনায় পৌঁছেন , তখন ঐলোকগুলো বলেঃ 'হে নবী (আঃ)! আপনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাঁর কথা আমাদেরকেও শুনিয়ে দেন।'

হযরত মূসা (আঃ) পাহাড়ের কাছে পৌঁছলে এক খণ্ড মেঘ এসে সারা পাহাড় ঢেকে নেয় এবং তিনি ওরই ভিতর ভিতর আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হয়ে যান। আল্লাহ পাকের কথা আরম্ভ হলে হযরত মূসার (আঃ) কপাল আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই সময় কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখতো না। লোকেরা এগিয়ে গেলে তারা মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সবাই সিজদায় পড়ে যায়। হযরত মূসার (আঃ) প্রার্থনার ফলে তাঁর সঙ্গীয় বানী ইসরাঈলও আল্লাহ তা'আলার কথা শুনতে থাকে। তাঁর কথা শেষ হলে মেঘ সরে যায় এবং হযরত মূসা (আঃ) তাদের নিকট চলে আসেন। তখন তারা তাঁকে বলেঃ 'হে মূসা (আঃ)! আমরা কখনও ঈমান আনবো না যে পর্যন্ত না আমরা আমাদের প্রভুকে আমাদের সামনে দেখতে পাই।' এ ঔদ্ধত্যের ফলে এক ভূমিকম্প আসে এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। এখন হযরত মূসা (আঃ) খাঁটি অন্তরে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন এবং বলেন যে, এর চেয়ে তো বরং এর পূর্বেই মরে যাওয়া ভাল ছিল। নির্বোধদের কার্যের জন্যে আল্লাহ পাক যেন তাঁকে ধ্বংস না করেন। ওরা তো বানী ইসরাঈলের মধ্যে উত্তম লোক ছিল। এখন তিনি একাই ফিরে গেলে তাদেরকে কি উত্তর দেবেন? কেই বা তাঁর কথা বিশ্বাস করবে এবং কেই বা আর তাঁর উপর ঈমান আনবে? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর তাওবা কবূল করেন ও তাঁর প্রতি দয়া করেন।

হযরত মূসা (আঃ) এভাবে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং আল্লাহ ঐ মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করেন। এখন সবাই সম্মিলিতভাবে বানী ইসরাঈলের পক্ষ হতে তাওবা করতে আরম্ভ করে। তাদেরকে বলা হয় যে, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করবে এবং একে অপরকে হত্যা করবে, সেই পর্যন্ত তাদের তাওবা কবূল করা হবে না। সুদ্দী কাবীর (রঃ) বলেন যে, এটা বানী ইসরাঈলের পরস্পর রক্তারক্তির পরের ঘটনা। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এ সম্বোধন সাধারণ হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা দ্বারা উদ্দেশ্য এই সত্তর ব্যক্তিই বটে।

ইমাম রাযী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে এই সত্তর ব্যক্তির ঘটনায় লিখেন যে, তারা জীবিত হওয়ার পর বলেছিলঃ 'হে নবী (আঃ)! আপনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা

করুন যে, তিনি যেন আমাদেরকে নবী করেন।' তিনি প্রার্থনা করেন এবং তা কবূল হয়। কিন্তু এ কথাটি গরীব। হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে হযরত হারূন (আঃ) ছাড়া এবং তার পরে হযরত ইউশা (আঃ) ছাড়া আর কোন নবী থাকার প্রমাণ নেই। আহলে কিতাব এটাও দাবী করে যে, ঐসব লোক তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী ঐ স্থানেই আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখেছিল। এটাও ভুল কথা। কেননা, হযরত মূসা (আঃ) স্বয়ং যখন আল্লাহ্কে দর্শনের প্রার্থনা করেন তখন তাঁকে নিষেধ করা হয়। তাহলে এই সত্তরজন লোক দীদার-ই-ইলাহীর ঔজ্জ্বল্য কিরূপে সহ্য করতো?

এ আয়াতের তাফসীরে আর একটি মত এও আছে যে, তারা বলেঃ 'হযরত! আমার কি জানি? আল্লাহ স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে আমাদেরকে বলেন না কেন? তিনি আপনার সাথে কথা বলবেন আর আমাদের সাথে বলবেন না এর কারণ কি হতে পারে? যে পর্যন্ত না আমরা তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পাই, কখনও ঈমান আনবো না।' এ কথার কারণে তাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পুনরায় জীবিত করা হয়। অতঃপর মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ 'এখন তোমরা তাওরাতকে ধরে রাখো।' তারা আবার অস্বীকার করে। এবার ফেরেশতাগণ পাহাড় উঠিয়ে এনে তাদের মাথার উপর লটকিয়ে রেখে বলেন যে, এবার না মানলে তাদের উপর পাহাড় নিক্ষেপ করা হবে। এর দ্বারা এও জানা গেল যে, মৃত্যুর পরে জীবিত হয়ে পুনরায় তারা 'মুকাল্লাফ' হয়েছিল অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ্র আহকাম জারী হয়েছিল। মাঅরদী বলেছেন যে, কেউ কেউ বলেছেনঃ 'যখন তারা আল্লাহ্র এই বড় নিদর্শন দেখলো, মৃত্যুর পরে জীবিত হলো তখন শরীয়তের নির্দেশাবলী তাদের উপর হতে সরে গেল। কেননা, তখন তো তারা সব কিছু মানতে বাধ্য ছিল।

দ্বিতীয় দল বলেন যে, এটা নয়, বরং এটা সত্ত্বেও তাদের উপর শরীয়তের আহকাম জারী থাকবে। কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, সঠিক কথা এটাই। এসব ঘটনা তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটেছিল। এটা তাদেরকে শরীয়ত পালন হতে আযাদ করতে পারে না। স্বয়ং বানী ইসরাসঈলও বড় বড় অলৌকিক ঘটনা দেখেছিল। স্বয়ং তাদের উপরেই এমন এমন ঘটনা ঘটেছিল যা ছিল সম্পূর্ণলরূপে অসাধারণ ও স্বভাব বিরুদ্ধ। তা সত্ত্বেও তো তাদের উপর শরীয়তের নির্দেশাবলী চালু ছিল। এ রকমই এটাও। এটাই সঠিক ও স্পষ্ট কথা। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

**৫৭। এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম; আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি সেই পবিত্র জিনিস হতে ভক্ষণ কর; এবং তারা আমার কোন অনিষ্ট করেনি, বরং তারা নিজেদেরই অনিষ্ট করেছিল।**

٥٧- وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۭ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۭ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ তাদেরকে অমুক অমুক বিপদ হতে রক্ষা করেছিলেন। এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অমুক অমুক সুখ সম্ভোগ দান করেছেন।

غَمَامٌ শব্দটি غَمَامَةٌ শব্দের বহুবচন। এটা আকাশকে ঢেকে রাখে বলে একে غَمَامَةٌ বলা হয়ে থাকে। এটা একটা সাদা রঙ্গের মেঘ ছিল যা 'তীহের' মাঠে তাদের উপর ছায়া করেছিল। যেমন সুনান-ই-নাসাঈ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বলেন যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), আবূ মুযলিজ (রঃ), যহ্হাক (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) এটাই বলেছেন। হাসান (রঃ) এবং কাতাদাও (রঃ) এ কথাই বলেন। অন্যান্য লোক বলেন যে, এ মেঘ সাধারণ মেঘ হতে বেশী ঠাণ্ডা ও উত্তম ছিল। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা ঐ মেঘ ছিল যার মধ্যে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন আগমন করবেন। আবূ হুযাইফার (রঃ) এটাই উক্তি।

এ আয়াতটির মধ্যে এর বর্ণনা রয়েছেঃ 'এসব লোক কি এরই অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘের মধ্যে আসবেন এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী?' এটা ঐ মেঘ যার মধ্যে বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছিলেন।

## 'মান্না' ও 'সালওয়া'

যে 'মান্না', তাদেরকে দেয়া হতো তা গাছের উপর অবতারণ করা হতো। তারা সকালে গিয়ে তা জমা করতো এবং ইচ্ছে মত খেয়ে নিতো। ওটা আঠা জাতীয় জিনিস ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, শিশিরের সঙ্গে ওর সাদৃশ্য ছিল।

কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, শিলার মত 'মান্না' তাদের ঘরে নেমে আসতো, যা দুধের চেয়ে সাদা ও মধু অপেক্ষা বেশী মিষ্ট ছিল। সুবেহ্ সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবতারিত হতে থাকতো। প্রত্যেক লোক তার বাড়ীর জন্যে ঐ পরিমাণ নিয়ে নিতো যা ঐ দিনের জন্যে যথেষ্ট হতো। কেউ বেশী নিলে তা পচে যেতো। শুক্রবারে তারা শুক্র ও শনি এ দু'দিনের জন্যে গ্রহণ করতো। কেননা, শনিবার ছিল তাদের জন্যে সাপ্তাহিক খুশীর দিন। সে দিন তারা জীবিকা অন্বেষণ করতো না। রাবী' বিন আনাস (রঃ) বলেন যে, 'মান্না' ছিল মধু জাতীয় জিনিস যা তারা পানি দিয়ে মিশিয়ে পান করতো।

শাবঈ (রঃ) বলেনঃ 'তোমাদের এ মধু ঐ 'মান্না' -এর সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। কবিতাতেও 'মান্না' মধু অর্থে এসেছে। মোটকথা এই যে, তা একটি জিনিস ছিল যা তারা বিনা পরিশ্রমে লাভ করতো। শুধু ওটাকেই খেলে ওটা ছিল খাওয়ার জিনিস, পানির সাথে মিশ্রিত করলে তা ছিল পানের জিনিস এবং অন্য কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত করলে তা অন্য জিনিস হয়ে যেতো। কিন্তু এখানে মান্নার ভাবার্থ এটা নয়, বরং ভাবার্থ হচ্ছে পৃথক একটা খাওয়ার জিনিস।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন 'মান্না' ব্যাঙ-এর ছাতার অন্তর্গত এবং ওর পানি চক্ষু রোগের ঔষধ।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান বলেছেন।

জামে'উত তিরমিযীর মধ্যে আছেঃ "আজওয়াহ নামক মদীনার এক প্রকার খেজুর হচ্ছে বেহেশতী খাদ্য ও বিষক্রিয়া নষ্টকারী এবং ব্যাঙের ছাতা 'মান্না' এর অন্তর্গত ও চক্ষুরোগে আরোগ্যদানকারী।" এ হাদীসটি হাসান গারীব। আরও বহু পন্থায় এটা বর্ণিত আছে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, ঐ গাছের ব্যাপারে সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে মতভেদ রয়েছে যা মাটির উপরে হয় এবং যার মূল শক্ত হয় না। কেউ বললেন যে, ওটা ব্যাঙের ছাতা। তখন তিনি বললেন যে, ব্যাঙের ছাতা তো 'মান্না'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং ওর পানি চক্ষু রোগের ঔষধ।'

'সালওয়া' এক প্রকার পাখী, চড়ুই পাখি হতে কিছু বড়, বরং অনেকটা লাল। দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত হতো এবং ঐ পাখিগুলোকে জমা করে দিতো। বানী ইসরাঈল নিজেদের প্রয়োজন মত ওগুলো ধরতো এবং যবাহ্ করে খেতো। একদিন খেয়ে বেশী হলে তা শড়ে যেতো। শুক্রবারে তারা দুই দিনের জন্যে জমা করতো। কেননা, শনিবার তাদের জন্যে সাপ্তাহিক খুশীর দিন ছিল। সেই দিন তারা ইবাদতে মশগুল থাকতো এবং ঐদিন শিকার করা তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন লোক বলেছেন যে, ঐ পাখিগুলো কবুতরের সমান

ছিল। দৈর্ঘ ও প্রস্থে এক মাইল জায়গা ব্যাপী ঐ পাখিগুলোর বর্শা পরিমাণ উঁচু স্তূপ জমে যেতো। ঐ তীহের মাঠে ঐ দু'টো জিনিস তাদের খাদ্যরূপে প্রেরিত হতো, যেখানে তারা তাদের নবীকে বলেছিলঃ 'এ জঙ্গলে আমাদের আহারের ব্যবস্থা কিরূপে হবে?' তখন তাদের উপর 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতারিত হয়েছিল। হযরত মূসাকে (আঃ) পানির জন্যে আবেদন জানানো হলে বিশ্বপ্রভু তাঁকে একটি পাথরের উপর লাঠি মারতে বলেন। লাঠি মারতেই ওটা হতে বারোটি ঝরণা প্রবাহিত হয়। বানী ইসরাঈলের বারোটি দল ছিল। প্রত্যেক দল নিজের জন্যে একটি করে ঝরণা ভাগ করে নেয়। সেই মরুময় প্রান্তরে ছায়া ছাড়া চলা কঠিন বলে তারা ছায়ার জন্যে প্রার্থনা জানায়। তখন মহান আল্লাহ তূর পাহাড় দ্বারা তাদের উপর ছায়া করে দেন। এখন বাকী থাকে বস্ত্র। আল্লাহ্র হুকুমে যে কাপড় তারা পরেছিল, তাদের দেহ বাড়ার সাথে সাথে কাপড়ও বাড়তে থাকলো। এক বছরের শিশুর কাপড় তার দেহ বেড়ে ওঠার সাথে সাথে বেড়ে যেতো। সেই কাপড় ছিঁড়তোও না ময়লাও হতো না। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এসব নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

হাজলী (রঃ) বলেন যে, 'সালওয়া' মধুকে বলা হয়। কিন্তু এটা তাঁর ভুল কথা। সাওরাজ (রঃ) এবং জাওহারী (রঃ) এই দু'জনও একথাই বলেছেন এবং এর প্রমাণরূপে আরব কবিদের কবিতা ও কতকগুলো আরবী বাকরীতি পেশ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা একটা ঔষধের নাম। কাসাঈ (রঃ) বলেন যে, سَلْوٰى শব্দটি এক বচন এবং এর বহু বচন سَلَاوٰى এসে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর এক বচন ও বহু বচনের একই রূপ। অর্থাৎ– سَلْوٰى শব্দটি। মোট কথা এই দু'টি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ছিল, যা খাওয়া তাদের জন্যে বৈধ ছিল। কিন্তু ঐ লোকগুলো তাঁর ঐ সব নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং ওটাই ছিল তাদের নাফ্সের উপর অত্যাচার।

## সাহাবীদের (রাঃ) বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের মর্যাদা

বানী ইসরাঈলের এ নক্সাকে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা কঠিন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েও এবং সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও রাসূলুল্লাহ্র (সঃ) আনুগত্যের উপর ও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উপর অটল ছিলেন। না তাঁরা মু'জিযা দেখতে চেয়েছিলেন, না দুনিয়ার কোন আরাম চেয়েছিলেন। তাবূকের যুদ্ধে তাঁরা ক্ষুধার জ্বালায় যখন কাতর হয়ে পড়েন, তখন যাঁর কাছে যেটুকু খাবার ছিল সবকে জমা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হাজির করে বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাদের এ খাবারে বরকতের জন্য প্রার্থনা করুন।"

আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সে প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ তাতে বরকত দান করেন। তাঁরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হন এবং খাবারের পাত্র ভর্তি করে নেন। পিপাসায় তাঁদের প্রাণ শুকিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দু'আর বরকতে এক খণ্ড মেঘ এসে পানি বর্ষিয়ে দেয়। তাঁরা নিজেরা পান করেন পশুকে পান করান এবং মশক, কলস ইত্যাদি ভর্তি করে নেন। সুতরাং সাহাবীদের এই অটলতা, দৃঢ়তা, পূর্ণ আনুগত্য এবং খাঁটি একত্ববাদীতা তাঁদেরকে হযরত মূসা (আঃ)-এর সহচরদের উপর নিশ্চিতরূপে মর্যাদা দান করেছে।

৫৮- وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

৫৮। এবং যখন আমি বললাম- তোমরা এ নগরে প্রবেশ কর, অতঃপর তা হতে যথা ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর এবং প্রণতভাবে দ্বারে প্রবেশ কর ও তোমরা বল- আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তাহলে আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবো এবং অচিরেই সৎকর্মশীলগণকে অধিকতর দান করবো।

৫৯- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ ع

৫৯। অনন্তর যারা অত্যাচার করেছিল-তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তৎপরিবর্তে তারা সেই কথার পরিবর্তন করলো, পরে অত্যাচারীরা যে দুষ্কার্য করেছিল- তজ্জন্যে আমি তাদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলাম।

## জিহাদের নির্দেশ ও তা অমান্য করণ

হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে যখন মিসরে আসেন এবং তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, যা ছিল তাদের পৈত্রিক ভূমি ও তথায় তাদেরকে আমালুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়,

তখন তারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করে, যার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে তীহের মাঠে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন সূরা-ই- মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে। قَرْيَة -এর ভাবার্থ হচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাস। সুদ্দী (রঃ), রাবী' (রঃ), কাতাদাহ্ (রঃ) এবং আবূ মুসলিম (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এটাই বলেছেন। কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেনঃ "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পবিত্র ভূমিতে গমন কর যা তোমাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা 'আরীহা' নামক জায়গাকে বুঝান হয়েছে। আবার কেউ কেউ মিসরের কথা বলেছেন। কিন্তু এর ভাবার্থ "বায়তুল মুকাদ্দাস' হওয়াই সঠিক কথা। এটা 'তীহ্' হতে বের হওয়ার পরের ঘটনা। শুক্রবার সন্ধ্যার সময় আল্লাহ তা'আলা স্থানটি মুসলমানদের দ্বারা বিজিত করান। এমন কি তাদের জন্যে সূর্যকে কিছুক্ষণের তরে থামিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তাদের বিজয় লাভ সম্ভব হয়ে যায়।

বিজয়ের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নতশিরে উক্ত শহরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সিজদার অর্থ রুকু' নিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এখানে সিজদার অর্থ বিনয় ও নম্রতা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দরজাটি ছিল কিবলার দিকে। ওর নাম ছিল বাবুল হিত্তাহ্। ইমাম রাযী (রঃ) একথাও বলেছেন যে, দরজার অর্থ হচ্ছে এখানে কিবলার দিক।

সিজদার পরিবর্তে তারা জানুর ভরে যেতে আরম্ভ করে এবং পার্শ্বদেশের ভরে প্রবেশ করতে থাকে। মস্তক নত করার পরিবর্তে উঁচু করে। حِطَّة শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষমা। কেউ কেউ বলেন যে, এটা সত্যের নির্দেশ। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এতে পাপের স্বীকারোক্তি রয়েছে। হাসান (রঃ) এবং কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, এটার অর্থ হচ্ছেঃ "হে আল্লাহ! আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো দূর করে দিন।"

অতঃপর তাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে যে, যদি তারা এটাই বলতে বলতে শহরে প্রবেশ করে এবং বিজয়ের সময়েও বিনয় প্রকাশ করতঃ আল্লাহ্র নিয়ামত ও নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে এটা তাঁর নিকট খুবই প্রিয় বলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে সূরা-ই- إِذَا جَاءَ অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যেই এ নির্দেশ দেয়া হয়ঃ "যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি জনগণকে দেখবে যে তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করছে, তখন তুমি তোমার প্রভুর

তাস্বীহ পাঠ ও প্রশংসা কীর্তন করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী।” এ সূরার মধ্যে যেন যিক্র ও ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা রয়েছে, তেমনই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণের ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত উমারের (রাঃ) সামনে এ ভাবার্থও বর্ণনা করেছিলেন এবং তা তিনি খুব পছন্দ করেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন শহরে প্রবেশ করেন, তখন অত্যন্ত বিনয় ও দারিদ্র তাঁর উপর বিরাজ করছিল। তিনি স্বীয় মস্তক এত নীচু করেছিলেন যে, তার উষ্ট্রীর জিনে ঠেকে গিয়েছিল। শহরে প্রবেশ করেই তিনি প্রথম প্রহরের আট রাকআত নামায আদায় করেন। ওটা ‘যুহা’র নামায ছিল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশক নামাযও বটে। দু’টোই মুহাদ্দিসগণের কথা।

হযরত সা’দ বিন আবি ওক্কাস (রাঃ) ইরান দেশ বিজয়ের পর যখন কিসরার শাহী প্রাসাদে পৌঁছেন, তখন তিনিও সেই সুন্নাত অনুযায়ী আট রাক‘আত নামায আদায় করেন। এক সালামে দুই রাক‘আত করে পড়া কারও কারও মাযহাবে আছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, একই সালামে আট রাক‘আত পড়তে হবে। আল্লাহ্ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সহীহ বুখারী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “বানী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন সিজদা করা অবস্থায় ও حِطَّةٌ বলতে বলতে দরজায় প্রবেশ করে। কিন্তু তারা তা পরিবর্তন করে ফেলে এবং জানু ভরে ও حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ বলতে বলতে চলতে থাকে। সুনান-ই-নাসাঈ, মুসনাদ-ই-আবদুর রায্যাক, সুনান-ই-আবি দাঊদ, সহীহ মুসলিম এবং জামে‘উত তিরমিযীর মধ্যেও শব্দের বিভিন্নতার সঙ্গে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। এর সনদ বিশুদ্ধ।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ “আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। ‘যাতুল হানযাল’ নামক ঘাঁটির নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ বলেনঃ “এ ঘাঁটির দৃষ্টান্ত বানী ইসরাঈলের সেই দরজার মত যেখান দিয়ে তাদেরকে নতশিরে এবং حِطَّةٌ বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ও তাদেরকে তাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়ার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল।”

হযরত বারআ’ (রঃ) বলেন যে, سَيَقُوْلُ السُّفَهَاۤءُ (২ঃ ১৪২) নির্বোধ ইয়াহূদীগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র কথা পরিবর্তন করেছিল। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, حِطَّةٌ -এর পরিবর্তে তারা حِنْطَةٌ حَبَّةٌ حَمْرَاءُ فِيْهَا شَعِيْرَةٌ বলেছিল। তাদের নিজের ভাষায় ওটা ছিল هُطًّا سُمْعَاثًا اَزْبَةٌ مَزْبًا ।

হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) তাদের এ পরিবর্তনকে বর্ণনা করেন যে, নতশিরে চলার পরিবর্তে তারা জানুর ভরে এবং حِطَّةٌ -এর পরিবর্তে حِنْطَةٌ (গম) বলতে বলতে চলছিল। হযরত আতা' (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), যহ্হাক (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), কাতাদাহ্ (রঃ) এবং ইয়াহইয়াও (রঃ) এটাই বর্ণনা করেছেন। ভাবার্থ এই যে, তাদেরকে যে কথা ও কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল, যা ছিল প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করেন। তিনি বলেনঃ "আমি অত্যাচারীদের উপর তাদের পাপের কারণে আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ করেছি।" কেউ বলেছেন অভিশাপ, আবার কেউ বলেছেন মহামারী।

একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মহামারী একটি শাস্তি। ওটা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা শুনবে যে, অমুক জায়গায় মহামারী আছে তখন তোমরা তথায় যেয়ো না।" তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এটা দুঃখ, রোগ এবং শাস্তি, যা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।"

---

٦٠- وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

৬০। এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্যে পানি প্রার্থনা করেছিল তখন আমি বলেছিলাম–তুমি স্বীয় যষ্টি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর; অনন্তর তা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ বিনিসৃত হলো; প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ঘাট জেনে নিল; তোমরা আল্লাহ্র উপজীবিকা হতে ভক্ষণ কর ও পান কর এবং পৃথিবীতে শান্তি ভঙ্গকারী রূপে বিচরণ করো না।

---

**আর একটি পুরস্কারঃ** এখানে বানী ইসরাঈলকে আর একটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যে, যখন তাদের নবী হযরত মূসা (আঃ) তাদের জন্যে মহান আল্লাহ নিকট পানির প্রার্থনা জানালেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বারটি

প্রস্রবণ সেই পাথর হতে বের করলেন যা তাদের সাথে থাকতো এবং তাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি এক একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেন যা প্রত্যেক গোত্র জেনে নেয়। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে বলেন যে, তারা যেন 'মান্না' ও 'সালওয়া' খেতে থাকে এবং ঐ ঝর্ণার পানি পান করতে থাকে, আর বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত ঐ আহার্য ও পানীয় খেয়ে ও পান করে যেন তারা তাঁর ইবাদত করতে থাকে, কিন্তু তারা যেন তাঁর অবাধ্য হয়ে দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি না করে, নচেৎ সেই নিয়ামত তাদের নিকট হতে কেড়ে নেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা একটা চার কোণ বিশিষ্ট পাথর ছিল যা তাদের সাথেই থাকতো। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে হযরত মূসা (আঃ) ওর উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে চার কোণা হতে তিনটি করে বারোটি ঝর্ণা বেরিয়ে আসে। পাথরটি বলদের মাথার মত ছিল যা বলদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো। তারা যেখানে যেখানে অবতরণ করতো, ওটা নামিয়ে রাখতো এবং লাঠির আঘাত করতেই ওটা হতে ঝর্ণা বেরিয়ে আসতো। আবার যখন যাত্রা আরম্ভ করতো তখন ঝর্ণা বন্ধ হয়ে যেতো। এবং তারা তা উঠিয়ে নিতো। ঐ পাথরটি ছিল তূর পাহাড়ের। ওটা ছিল এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া। কেউ কেউ বলেন যে, ওটা ছিল বেহেশ্তী পাথর, যা দশ হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া ছিল। ওর দু'টি শাখা ছিল যা ঝলমল করতো। অন্য একটি মত এই যে, ঐ পাথরটি হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে বেহেশ্ত হতে এসেছিল এবং এভাবে হস্তান্তর হতে হতে হযরত শুআইব (আঃ) ওটা প্রাপ্ত হন এবং তিনি লাঠি ও পাথরটি হযরত মূসা (আঃ) কে প্রদান করেন।

কেউ কেউ বলেন যে, ওটা ছিল সেই পাথর যার উপর হযরত মূসা (আঃ) তাঁর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর পরামর্শক্রমে তিনি পাথরটি উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং ওটা হতেই তাঁর মুজিযা প্রকাশ পায়।

ইমাম যামাখ্শারী (রঃ) বলেন যে, ওটা কোন নির্দিষ্ট পাথর ছিল না, বরং তাঁকে যে কোন একটি পাথরে আঘাত করতে বলা হয়েছিল। হযরত হাসান (রঃ) হতেও বর্ণিত আছে এবং এর দ্বারাই মু'জিযার পূর্ণতা প্রকাশ পায়। তাঁর লাঠিটা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলেই তা বইতে থাকতো, অন্য লাঠি দ্বারা আঘাত করলেই তা শুকিয়ে যেতো। বানী ইসরাঈল পরস্পর বলাবলি করতে থাকে যে, ঐ পাথরটি হারিয়ে গেলেই তারা পিপাসায় মরে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ) কে বলেনঃ "তুমি লাঠি দ্বারা আঘাত করো না, শুধু মুখেই উচ্চারণ কর, তাহলে তাদের বিশ্বাস হবে।" আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রত্যেক গোত্র আপন আপন ঝরণা এভাবে চিনতো যে, প্রত্যেক গোত্রের এক একটি লোক পাথরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যেতো এবং লাঠির আঘাত দেয়া মাত্রই ওটা হতে ঝরণা বেরিয়ে আসত। যে ব্যক্তির দিকে যে ঝরণা বয়ে আসতো সে তখন তার গোত্রকে ডেকে বলতোঃ "এই ঝরণা তোমাদের।" এটা 'তীহ' প্রান্তরের ঘটনা। সূরা-ই-আ'রাফের মধ্যেও এ ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু ঐ সূরাটি 'মাক্কী' বলে তথায় ওটার বর্ণনা নাম পুরুষের সর্বনাম দ্বারা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা যেসব অনুগ্রহ তাদের উপর করেছিলেন, স্বীয় রাসূলের (সঃ) সামনে তিনি তার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

আর এই সূরাটি 'মাদানী' বলে এখানে স্বয়ং তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা-ই-আ'রাফের মধ্যে فَانْبَجَسَتْ বলেছেন এবং এখানে فَانْفَجَرَتْ বলেছেন। কেননা, সেখানে প্রথম প্রথম জারী হওয়ার অর্থ এবং এখানে শেষ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন। এই দু'জায়গায় দশটি যুক্তিতে পার্থক্য রয়েছে এবং এ পার্থক্য শব্দ ও অর্থ উভয় হিসেবেই। ইমাম যামাখ্শারী (রঃ) এসব যুক্তি বর্ণনা করেছেন এবং প্রকৃতভাব প্রায় একই।

---

٦١- وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ الْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ

৬১। এবং যখন তোমরা বলেছিলে–হে মূসা, আমরা একইরূপ খাদ্যে ধৈর্যধারণ করতে পারছি না, অতএব তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর–যেন তিনি আমাদের জন্মভূমিতে যা উৎপন্ন হয়, তা হতে ওর শাক সব্জি, ওর কাঁকুড়, ওর গম, ওর মসুর এবং ওর পেঁয়াজ উৎপাদন করেন; সে বলেছিল–যা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তার সঙ্গে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও? কোন নগরে উপনীত হও, তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলো অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

এখানে বানী ইসরাঈলের অধৈর্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের অমর্যাদা করার কথা বর্ণিত হচ্ছে। তারা 'মান্না' ও সালওয়া'র মত পবিত্র আহার্যের উপরেও ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি এবং তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তুর জন্যে প্রার্থনা জানায়। একই খাদ্যের ভাবার্থ হচ্ছে এক প্রকারের খাদ্য, অর্থাৎ 'মান্না' ও 'সালওয়া'। فُوْمٌ -এর অর্থে মতভেদ আছে। ইবনে মাসউদের (রাঃ) পঠনে ثُوْمٌ আছে। মুজাহিদ (রঃ) فُوْمٌ-এর তাফসীর ثُوْمٌ করেছেন, অর্থাৎ 'রসুন'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। পরবর্তী অভিধানের পুস্তকগুলোতে فُوْمُوْالَنَا র অর্থ হচ্ছে اِخْتَبِزُوْا لَنَا অর্থাৎ আমাদের জন্যে রুটি তৈরী কর।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, যদি এটা সঠিক হয় তবে এটা حُرُوْفٌ مُبَادَلَة -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন عَاثُوْرِشَرٍّ ও عَافُوْرِشَرٍّ, اَثَافِيْ ও اَثَاثِيْ এবং مَغَافِيْر ও مَغَاثِيْر ইত্যাদি যাতে ف অক্ষরটি ث দ্বারা এবং ث অক্ষরটি ف অক্ষর দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। কেননা, এ দু'টি অক্ষরের বের হওয়ার স্থান খুব কাছাকাছি। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

কেউ কেউ বলেন যে, فُوْمٌ -এর অর্থ হচ্ছে গম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এ তাফসীর নকল করা হয়েছে। আহীহার কবিতাতেও فُوْمٌ শব্দটি গমের অর্থে ব্যবহৃত হতো। فُوْمٌ এর অর্থ রুটিও বলা হয়। কেউ কেউ শীষের অর্থও নিয়েছেন। হযরত কাতাদাহ (রঃ) এবং হযরত আতা' (রঃ) বলেন যে, যে শস্যে রুটি তৈরী হয় তাকে فُوْمٌ বলে। কেউ কেউ বলেন যে, প্রত্যেক প্রকারের শস্যকেই فُوْمٌ বলা হয়। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে ধমক দিয়ে বলেনঃ 'উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু তোমরা কেন চাচ্ছ? অতঃপর বলেনঃ 'তোমরা শহরে এসব জিনিস পাবে।' জমহূরের পঠনে مِصْرًا (মিস্রান)ই আছে এবং সব পঠনেই এটাই লিখিত আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ 'তোমরা কোন এক শহরে চলে যাও।' হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে مِصْرَ (মিস্‌রা)ও আছে এবং এর তাফসীরে মিসর শহর বুঝানো হয়েছে। مِصْرًا শব্দটি দ্বারাও নির্দিষ্ট 'মিস্‌র' শহর ভাবার্থ নেয়া যেতে পারে। مِصْر -এর অর্থ সাধারণ শহর নেয়াই উত্তম। তাহলে ভাবার্থ দাঁড়াবে এইঃ "তবে তোমরা যা চাচ্ছো তা খুব সহজ জিনিস। যে কোন শহরে গেলেই ওটা পেয়ে যাবে। দু'আরই বা প্রয়োজন কি? তাদের একথা শুধুমাত্র অহংকার ও অবাধ্যতা হিসেবে ছিল বলে তাদেরকে কোন উত্তর দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

এবং তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র নিপতিত হলো এবং তারা আল্লাহ্র কোপে পতিত হলো এই হেতু যে, নিশ্চয় তারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাস করতো এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করতো; এই হেতু যে, তারা অবাধ্যাচরণ করেছিল ও তারা সীমা অতিক্রম করেছিল।

ভাবার্থ এই যে, তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র চিরস্থায়ী করে দেয়া হয়। অপমান ও হীনতা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদের নিকট হতে জিযিয়া কর আদায় করা হয়। তারা মুসলমানদের পদানত হয়। তাদেরকে উপবাস করতে হয় এবং ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিতে হয়। তাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। بَآءُوْا -এর অর্থ হচ্ছে তারা ফিরে গেল। بَآءٌ কখনও ভালো অবস্থা এবং কখনও কখনও মন্দের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে মন্দ বুঝানোর জন্য এসেছে। তাদের অহংকার, অবাধ্যতা, সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি, আল্লাহ্র আয়াতসমূহের প্রতি অবিশ্বাস এবং নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা ইত্যাদির কারণেই তাদের প্রতি এসব শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করা এবং তাঁর নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, 'তাকাব্বুরের' অর্থ হচ্ছে সত্য গোপন করা এবং জনগণকে ঘৃণার চোখে দেখা। হযরত মালিক বিন মারারাহ্ রাহভী (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আরজ করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমি একজন সুশ্রী লোক। আমি চাই না, কারও জুতার শুকতলাও আমার চেয়ে সুন্দর হয়, তবে কি এটাও অবাধ্যতা ও অহংকার হবে?" তিনি বলেনঃ "না, বরং অহংকার ও অবাধ্যতা হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং জনগণকে ঘৃণা করা।"

বানী ইসরাঈলের অহংকার, কুফরী এবং হত্যার কাজ নবীগণ পর্যন্তও পৌছে গিয়েছিল বলেই তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ অবধারিত হয়েছে। তারা ইহকালেও অভিশপ্ত এবং পরকালেও অভিশপ্ত। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ

(রাঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈল প্রত্যহ তিনশ' করে নবীকে হত্যা করতো। তারপরে বাজারে গিয়ে তাদের লেনদেনের কাজে লেগে যেত (সুনান-ই-আবি দাউদ ও তায়ালেসী)।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন যাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তারা হচ্ছে ওরাই যাদেরকে নবী হত্যা করেছেন অথবা তারা নবীকে হত্যা করেছে, পথভ্রষ্ট ইমাম এবং চিত্র শিল্পী।" এগুলো তাদের অবাধ্যতা, যুলূম এবং সীমা অতিক্রমের প্রতিফল ছিল।

٦٢- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৬২। নিশ্চয় মুসলমান ইয়াহূদী, খৃষ্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়, (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভাল কাজ করে, তাদের জন্যে তাদের প্রভুর নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

## সৎ লোকদের প্রতিদান

উপরে অবাধ্যদের শাস্তির বর্ণনা ছিল। এখানে তাদের মধ্যে যারা ভাল লোক ছিল তাদের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। নবীর অনুসারীদের জন্যে এ সু-সংবাদ কিয়ামত পর্যন্ত রয়েছে যে, তারা ভবিষ্যতের ভয় হতে নির্ভয় এবং অতীতের হাত ছাড়া জিনিসের জন্যে আফসোস করা হতে পবিত্র।

অন্য জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "মনে রেখো, আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" যে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের রূহ্ বের হবার সময় আগমন করে থাকেন। তাঁদের কথা উদ্ধৃত করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ "তোমরা ভয় করো না এবং চিন্তিত হয়ো না, আর তোমরা ঐ বেহেশ্তের সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল।"

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হওয়ার পূর্বে যেসব ধর্মপ্রাণ লোকের সাথে সাক্ষাৎ করি, তাদের নামায, রোযা ইত্যাদির বর্ণনা দেই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়

(মুসনাদ-ই- ইবনে আবি হাতিম)।” আর একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত সালমান (রাঃ) তাঁদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ “তারা নামাযী, রোযাদার ও ঈমানদার ছিল এবং আপনি যে প্রেরিত পুরুষ এর উপরও তাদের বিশ্বাস ছিল।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তারা জাহান্নামী।” এতে হযরত সালমান (রাঃ) দুঃখিত হলে সেখানেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তাওরাতের উপর ঈমান আনে এবং তা অনুযায়ী কাজ করে, কিন্তু যখন হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করেন তখন তাঁরও অনুসরণ করে এবং তাঁর নবুওয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তখনও যদি তাওরাতের উপর অটল থাকে এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে অস্বীকার করতঃ তাঁর অনুসরণ না করে, তবে সে বে-দ্বীন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে ইঞ্জীলকে আল্লাহ্‌র কিতাব বলে বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করে এবং তাঁর যুগে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে পেলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে ও তাঁর নবুওয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তখনও যদি ইঞ্জীল ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর আনুগত্যের উপর স্থির থাকে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সুন্নাতের অনুসরণ না করে তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)। সুদ্দীও (রঃ) এটাই বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বিন যুবাইরও (রঃ) এটাই বলেছেন। ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক নবীর অনুসারী, তাঁকে মান্যকারী হচ্ছে ঈমানদার ও সৎলোক। সুতরাং সে আল্লাহ তা'আলার নিকট মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু তার যুগেই যদি অন্য নবী এসে যান এবং নবীকে সে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসন্ধান করে, তা কবূল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই দু'টি আয়াতের মধ্যে আনুকূল্য এটাই। কোন ব্যক্তির কোন কাজও কোন পন্থা গ্রহণীয় নয় যে পর্যন্ত না শরীয়তে মুহাম্মদীর (সঃ) অনুরূপ হয়। কিন্তু এটা সে সময় যে সময় তিনি প্রেরিতরূপে দুনিয়ায় এসে গেছেন। তাঁর পূর্বে যে নবীর যুগ ছিল এবং যেসব লোক সে যুগে ছিল তাদের জন্যে সে নবীর অনুসরণ ও তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করা শর্ত।

## ‘ইয়াহূদ’ এর ইতিহাস

يَهُوْدُ শব্দটি هُوْدَاتْ শব্দ হতে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ‘বন্ধুত্ব’। কিংবা এটা تَهُوْدُ শব্দ হতে নেয়া হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে ‘তাওবা’। যেমন কুরআন মাজীদে আছে (اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ) “অর্থাৎ (হযরত মূসা আঃ) বলেন হে আল্লাহ!) নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট তাওবা করেছি (৭ঃ ১৫৬)।” সুতরাং তাদেরকে

এ কারণেই ইয়াহূদী বলা হয়েছে অর্থাৎ তাওবার কারণে এবং পরস্পর বন্ধুত্বের কারণে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তারা ইয়াহূদের সন্তান ছিল বলে তাদেরকে ইয়াহূদী বলা হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বড় ছেলে নাম ছিল ইয়াহূদ। একটি মত এও আছে যে তারা তাওরাত পড়ার সময় নড়াচড়া করতো বলে তাদেরকে ইয়াহূদ অর্থাৎ হরকতকারী বলা হয়েছে।

## 'নাসারা' এর ইতিহাস

হযরত ঈসার (আঃ) নবুওয়াতের যুগ আসলে বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর নবুওয়াতকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর অনুসারী হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তাদের নাম হয় 'নাসারা' অর্থাৎ সাহায্যকারী। কেননা, তারা একে অপররের সাহায্য করেছিল। তাদেরকে আনসারও বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসার (আঃ) কথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহ্র দ্বীনে আমার সাহায্যকারী কে আছে? হাওয়ারীগণ বলে-আমরা আল্লাহ্র (দ্বীনের) সাহায্যকারী।' কেউ কেউ বলেন যে, এসব লোক যেখানে অবতরণ করে ঐ জায়গার নাম ছিল 'নাসেরাহ', এ জন্যে তাদেরকে 'নাসারা' বলা হয়েছে। কাতাদাহ্ (রঃ) এবং ইবনে জুরাইজের এটাই মত। نَصْرٰى শব্দটি نَصْرَان শব্দের বহুবচন। যেমন نَشْوَان শব্দের বহুবচন نَشَاوٰى এবং سَكْرَان শব্দের বহুবচন سُكْرٰى এর স্ত্রীলিঙ্গ نَصْرَانَةٌ এসে থাকে।

অতঃপর যখন শেষ নবীর (সঃ) যুগ এসে গেল এবং তিনি সারা দুনিয়ার জন্যে রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন তাদের সবারই উপর তাঁর সত্যতা স্বীকার ও তাঁর অনুসরণ ওয়াজিব হয়ে গেল। আর তাঁর উম্মতের ঈমান বা বিশ্বাসের পরিপক্কতার কারণে তাদের নাম রাখা হয় মু'মিন এবং এ জন্যেও যে, পূর্বের নবীগণের প্রতি ও ভবিষ্যতের সমস্ত কথার প্রতিও তাদের ঈমান রয়েছে।

## সাবেঈ দল

صَابِئ -এর একটি অর্থ তো হচ্ছে বে-দ্বীন ও ধর্মহীন। এটা আহ্লে কিতাবের একটি দলেরও নাম ছিল যারা 'যাবূর' পড়তো। এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) এবং ইসহাক (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, তাদের হাতে যবাহ্কৃত প্রাণী আমাদের জন্যে হালাল এবং তাদের নারীদেরকে বিয়ে করাও বৈধ। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত হাকাম (রঃ) বলেন যে, এ দলটি মাজুসদের মত। এটাও বর্ণিত আছে যে, তারা ফেরেশতাদের পূজা করতো। জিয়াদ যখন শুনেন যে, তারা কেবলামুখী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে থাকে, তখন তিনি তাদের জিযিয়া কর মাফ করতে চাইলেন, কিন্তু সাথে সাথেই জানতে পারেন যে,তারা মুশরিক। তখন তিনি তাঁর ঐ ইচ্ছা হতে বিরত হন।

আবূজিনাদ (রঃ) বলেন যে, সাবেঈরা ইরাকের 'কাওসা'র অধিবাসী। তারা সব নবীকেই মানে। প্রতি বছর ত্রিশটি রোযা রাখে। এবং ইয়ামনের দিকে মুখ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। অহাব বিন মামবাহ্ (রঃ) বলেন যে, তারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা কোন শরীয়তের অনুসারী নয় এবং কাফিরও নয়। আবদুর রহমান বিন যায়েদের কথা এই যে, এটাও একটি মাযহাব। তারা 'মুসিল' দ্বীপে ছিল। তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তো। কিন্তু কোন কিতাব বা কোন নবীকে মানতো না। এবং নির্দিষ্ট কোন শরীয়তেরও তারা অনুসারী ছিল না। এর উপর ভিত্তি করেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কেও তাঁর সাহাবীবর্গকে (রাঃ) 'সাবী' বলতো, অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার কারণে। তাদের ধর্ম খৃষ্টানদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তাদের কিবলাহ ছিল দক্ষিণ দিক। তারা নিজেদেরকে হযরত নূহের (আঃ) ধর্মাবলম্বী বলতো। একটি মত এও আছে যে, ইয়াহূদ ও মাজুস ধর্মের মিশ্রণই ছিল এ মাযহাবটি। তাদের যবাহকৃত প্রাণী খাওয়া এবং তাদের নারীদেরকে বিয়ে করা অবৈধ। মুজাহিদ (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং ইবনে আবি নাজীহের এটাই ফত্ওয়া।

কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ 'আমি যেটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছি যে, সাবেঈরা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তারকার ফলাফলের প্রতি এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। আবূ সাঈদ ইসতাখ্রী (রঃ) তাদের উপর কুফরীর ফত্ওয়া দিয়েছেন। ইমাম রাযী বলেন যে, তারা ছিল তারকা পূজক। তারা কাসরানীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের নিকট হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রকৃত অবস্থা তো আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন, তবে বাহ্যতঃ এ মতটিই সঠিক বলে মনে হচ্ছে যে, এসব লোক ইয়াহূদী, খৃষ্টান, মাজুসী বা মুশরিক ছিল না। বরং তারা স্বভাব ধর্মের উপর ছিল। তারা কোন বিশেষ মাযহাবের অনুসারী ছিল না। এই অর্থেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীবর্গকে (রাঃ) 'সাবী' বলতো, অর্থাৎ তাঁরা সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। কোন কোন আলেমের মত এই যে, 'সাবী' তারাই যাদের কাছে কোন নবীর দাওয়াত পৌঁছেনি। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

---

**৬৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম যে, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর– সম্ভবতঃ তোমরা নিষ্কৃতি পাবে।**

٦٣- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

৬৪। এরপর পুনরায় তোমরা ফিরে গেলে, অতএব যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং তাঁর করুণা না থাকতো, তবে অবশ্য তোমরা বিনাশ প্রাপ্ত হতে।

٦٤- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

এ আয়াত দু'টোতে আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে আহাদ ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেনঃ 'আমার ইবাদত ও আমার নবী (আঃ)-এর অনুসরণের অঙ্গীকার আমি তোমাদের কাছে নিয়েছিলাম এবং সেই অঙ্গীকার পুরো করার জন্যে আমি তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর সমুচ্চ করেছিলাম।" যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'যখন আমি পাহাড়কে সামিয়ানার মত তাদের মাথার উপর সমুচ্চ করেছিলাম এবং তারা এই বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে, তা তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে দলিত করবে, সে সময় আমি বলেছিলাম যে, আমার প্রদত্ত জিনিসকে শক্ত করে ধর এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তা স্মরণ কর—তা হলে রক্ষা পেয়ে যাবে।'

'তূর'—এর ভাবার্থ পাহাড়—যেমন সূরা-ই- আ'রাফের আয়াতে আছে এবং সাহাবীগণ (রাঃ) ও তাবেঈগণ এর তাফসীর করেছেন। আর এটাই স্পষ্ট। 'তূর' ঐ পাহাড়কে বলা হয় যার উপর গাছ পালা জন্মে। ফিৎনার হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হলে পাহাড়টি তাদের মাথার উপর উঠিয়ে দেয়া হয় যেন তারা আনুগত্য স্বীকারে সম্মত হতে বাধ্য হয়। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তারা সিজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তাদের মাথার উপর পর্বত উঠে যায়। কিন্তু সাথে সাথেই তারা সিজদায় পড়ে যায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আড় চোখে উপরের দিকে দেখতে থাকে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সদয় হন এবং পাহাড় সরিয়ে নেন। এ জন্যেই তারা ঐ সিজদাই পছন্দ করে যে, অর্ধেক দেহ সিজদায় থাকে এবং অন্য দিক দিয়ে উপরের দিকে দেখতে থাকে।

'যা আমি দিয়েছি' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'তাওরাত'। قُوَّةٍ -এর অর্থ হচ্ছে 'শক্তি।' অর্থাৎ "তোমরা তাওরাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতঃ এর উপর আমল করার অঙ্গীকার কর, নতুবা তোমাদের উপর পাহাড় নিক্ষেপ করা হবে। আর 'এর মধ্যে যা আছে তা স্মরণ কর' অর্থাৎ তাওরাত পড়তে থাক।" কিন্তু তারা এতো পাকা ও শক্ত অঙ্গীকারকেও গ্রাহ্য করলো না এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দিলো।

এখন মহান আল্লাহ যদি দয়াপরবশ হয়ে তাদের তাওবা কবূল না করতেন এবং নবীদের (আঃ) ক্রম পরম্পরা চালু না রাখতেন তবে অবশ্যই তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এই ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস হয়ে যেতো।

٦٥- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـئِيْنَ ۝

৬৫। এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের সীমা লংঘন করেছিল, আমি তাদেরকে বলে ছিলাম যে, তোমরা অধম বানর হয়ে যাও।

٦٦- فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৬৬। অনন্তর আমি এটা তাদের সমসাময়িক ও তাদের পরবর্তীদের জন্যে দৃষ্টান্ত এবং ধর্মভীরুগণের জন্যে উপদেশর স্বরূপ করেছিলাম।

## চেহারা পরিবর্তনের ঘটনা

সূরা-ই-আ'রাফের মধ্যে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তথায় এর তাফসীরও ইনশাআল্লাহ পূর্ণভাবে করা হবে। ঐলোকগুলো আইলা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল। শনিবার দিনের সম্মান করা তাদের উপর ফরয করা হয়েছিল। ঐদিনে শিকার করা তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। আর মহান আল্লাহ্র হুকুমে সেই দিনেই নদীর ধারে মাছ খুব বেশী আসতো। তারা একটা কৌশল অবলম্বন করতো। একটা গর্ত খনন করে শনিবারে ওর মধ্যে রজ্জু ও কাঁটা ফেলে দিতো। শনিবারে মাছসমূহ ঐ ফাঁদে পড়ে যেতো। রোববারের রাতে তারা ওগুলো ধরে নিতো। ঐ অপরাধের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের রূপ বদলিয়ে দেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তাদের আকার পরিবর্তিত হয়নি, বরং অন্তর পরিবর্তিত হয়েছিল। এটা শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ আনা হয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমলহীন আলেমের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন গাধার সঙ্গে। কিন্তু একথাটি দুর্বল। তা ছাড়া এটা কুরআন কারীমের প্রকাশ্য শব্দেরও বিপরীত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যুবকেরা বানর হয়েছিল এবং বুড়োরা শূকর হয়েছিল। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, নারী পুরুষ সবাই তারা

লেজযুক্ত বানর হয়ে গিয়েছিল। আকাশবাণী হয়ঃ "তোমরা সব বানর হয়ে যাও।" আর তেমনই সব বানর হয়ে যায়। যেসব লোক তাদেরকে ঐ কৌশল অবলম্বন করতে নিষেধ করেছিল তারা তখন তাদের নিকট এসে বলতে থাকেঃ "আমরা কি তোমাদেরকে পূর্বেই নিষেধ করিনি?" তখন তারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়নি। দুনিয়ায় কোন আকার পরিবর্তিত গোত্র তিন দিনের বেশী বাঁচেনি। এরাও তিন দিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। নাক ঘসটাতে ঘসটাতে তারা সব মরে যায়। পানাহার ও বংশ বৃদ্ধি সবই বিদায় নেয়। যে বানরগুলো এখন আছে এবং তখনও ছিল, এরা তো জন্তু এবং এরা এভাবেই সৃষ্ট হয়েছে। আল্লাহ পাক যা চান এবং যেভাবে চান, তাই সৃষ্টি করে থাকেন এবং সেভাবেই সৃষ্টি করে থাকেন। তিনি মহান ক্ষমতাবান।

## ঘটনার বিস্তারিত আলোচনাঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শুক্রবারের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা তাদের উপর ফরয করা হয়, কিন্তু তারা শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারকে পছন্দ করে। ঐ দিনের সম্মানার্থে তাদের জন্যে ঐদিনে শিকার ইত্যাদি হারাম করে দেয়া হয়। ওদিকে আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসেবে ঐদিনই সমস্ত মাছ নদীর ধারে চলে আসতো এবং লাফা ঝাঁপা দিতো। অন্য দিনে ও গুলো দেখাই যেত না। কিছু দিন পর্যন্ত তো ঐসব লোক নীরবই থাকে এবং শিকার করা হতে বিরত থাকে। একদিন ওদের মধ্যে একটি লোক এই ফন্দি বের করে যে,শনিবার মাছ ধরে জালের মধ্যে আঁটকিয়ে দেয়া এবং তীরের কোন জিনিসের সঙ্গে বেঁধে রাখে। তারপরে রোববার দিন গিয়ে ওগুলো বের করে নেয় এবং বাড়ীতে এনে রেঁধে খায়। মাছের সুগন্ধ পেয়ে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে– "আমি তো আজ রোববারে মাছ শিকার করেছি। অবশেষে এ রহস্য খুলে যায়। লোকেরাও এ কৌশল পছন্দ করে এবং ঐভাবে তারা মাছ শিকার করতে থাকে। কেউ কেউ নদীর তীরে গর্ত খনন করে। শনিবারে মাছগুলো ঐ গর্তের ভিতরে জমা হলে তারা ওর মুখ বন্ধ করে দিতো। রোববারে ধরে নিতো। তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মুমিন ছিল তারা তাদেরকে এ কাজে বাধা দিতো এবং নিষেধ করতো। কিন্তু তাদের উত্তর এই হতো 'আমরা তো শনিবারে শিকারই করি না, শিকার করি আমরা রোববারে।'

শিকারকারী ও নিষেধকারীদের ছাড়া আরও একটি দল সৃষ্টি হয়ে যায়, যারা দুই দলকেই সন্তুষ্ট রাখতো। তারা নিজেরা শিকার করতো না বটে, কিন্তু যারা শিকার করতো তাদেরকে নিষেধও করতো না। বরং নিষেধকারীগণকে বলতোঃ

"তোমরা এমন 'কওম'কে উপদেশ কেন দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দেবেন? তোমরা তো তোমাদের কতর্ব্য পালন করেছো যেহেতু তাদেরকে নিষেধ করেছো। তারা যখন মানছে না তখন তাদেরকে তাদের কাজের উপর ছেড়ে দাও"। তখন নিষেধকারীগণ উত্তর দিতোঃ "একেতো এ জন্যে যে, আমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট ওজর পেশ করতে পারবো। দ্বিতীয়তঃ এজন্যেও যে, তারা হয়তো আজ না হলে কাল কিংবা কাল না হলে পরশু আমাদের কথা মানতে পারে এবং আল্লাহ্র কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে।" অবশেষে এই মুমিন দলটি সেই কৌশলীদল হতে সম্পূর্ণ রূপে সম্পর্ক ছিন্ন করলো এবং তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর দিয়ে দিল। একটি দরজা দিয়ে এরা যাতায়াত করে এবং অপর দরজা দিয়ে ঐ ফাঁকিবাজেরা যাতায়াত করে। এভাবেই দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ এক বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটে। একদা রাত্রি শেষে দিন হয়েছে। মুমিনরা সব জেগে উঠেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত ঐ ফন্দিবাজেরা তাদের দরজা খুলেনি এবং কোন সাড়া শব্দও পাওয়া যায় না। মুমিনরা বিস্মিত হলো যে, ব্যাপার কি? শেষে অত্যাধিক বিলম্বের পরেও যখন তাদের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না তখন তারা প্রাচীরের উপরে উঠে গেল। তথায় এক বিস্ময়কর দৃশ্য তারা অবলোকন করলো। তারা দেখলো যে, ঐ ফন্দিবাজেরা নারী ও শিশুসহ সবাই বানর হয়ে গেছে। তাদের ঘরগুলো রাত্রে যেমন বন্ধ ছিল ঐরূপ বন্ধই আছে। আর ভিতরে সমস্ত মানুষ বানরের আকার বিশিষ্ট হয়ে গেছে। এবং ওদের লেজও বেরিয়েছে। শিশুরা ছোট বানর, পুরুষেরা বড় বানর এবং নারীরা বানরীতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেককেই চেনা যাচ্ছে যে, এ অমুক লোক সে অমুক নারী। এবং এ অমুক শিশু ইত্যাদি।

এতে যে শুধু মাছ শিকারকারীরাই ধ্বংস হয়েছিল তা নয়, বরং যারা তাদেরকে শুধু নিষেধ করেই চুপচাপ বসে থাকতো এবং তাদের সাথে মেলা মেশা বন্ধ করতো না তারাও ধ্বংস হয়েছিল। এ শাস্তি থেকে শুধুমাত্র তারাই মুক্তি পেয়েছিল যারা তাদেরকে নিষেধ করতঃ তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়েছিল।

এ সমুদয় কথা এবং কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত এটা প্রমাণ করে যে, তারা সত্য সত্যই বানর হয়েছিল, রূপক অর্থে নয়। অর্থাৎ তাদের অন্তর যে বানরের মত হয়েছিল তা নয়-যেমন মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ সঠিক তাফসীর এটাই যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শূকর ও বানর করেছিলেন এবং তাদের বাহ্যিক আকারও ঐ জন্তুদ্বয়ের মত হয়েছিল। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

فَجَعَلْنٰهَا -এর মধ্যে هَا সর্বনামটির সম্বন্ধ হচ্ছে قِرَدَةً শব্দটির সঙ্গে অর্থাৎ 'আমি ঐ বানরগুলোকে শিক্ষণীয় বিষয় করেছি।' কিংবা এর প্রত্যাবর্তন স্থল হচ্ছে حِيْتَان অর্থাৎ মাছগুলোকে অথবা এর সম্বন্ধ হচ্ছে عُقُوْبَة -এর সঙ্গে অর্থাৎ ঐ শাস্তিকে আমি শিক্ষণীয় বিষয় করেছি। আবার এও বলা হয়েছে যে, এর প্রত্যাবর্তন স্থল হচ্ছে قَرْيَة অর্থাৎ ঐ গ্রামকে আমি পূববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্যে উপদেশমূলক বিষয় করেছি। قَرْيَة ভাবার্থ হওয়াই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। আর 'গ্রাম' হতে ভাবার্থ হচ্ছে 'গ্রামবাসী'।

نَكَالً -এর অর্থ হচ্ছে 'শাস্তি'। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ আল্লাহ তাকে পরকাল ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেন (৭৯ঃ ২৫)।' এর ভাবার্থ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ সময়ে যারা বিদ্যমান ছিল তাদের জন্যে এবং পরে আগমনকারীদের জন্যে এটা শিক্ষনীয় বিষয় করেছেন। যদিও কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে, এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়, কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, পূর্বে অতীত লোকদের জন্যে এই ঘটনা দলীল হতে পারে না, এটা যত বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় হোক না কেন। কেননা তারা তো অতীত হয়েছে। সুতরাং সঠিক কথা এই যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে স্থান ও জায়গা–অর্থাৎ আশেপাশের গ্রামগুলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত সাঈদ বিন যুবাইরের (রঃ) তাফসীর এটাই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জনেন।

আবার এ অর্থও করা হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী পাপ এবং তাদের পরে আগমনকারীদের এরকমই পাপের জন্যে এ শাস্তিকে আমি শিক্ষণীয় বিষয় করেছি। কিন্তু সঠিক কথা ওটাই যার সঠিকতা আমরা বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ আশেপাশের গ্রামগুলো। মোটকথা, এ শাস্তি সে যুগে বিদ্যমান লোকদের জন্যে এবং তাদের পরে আগমনকারীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'ওতে পরে আগমনকারীদের জন্যে নসীহত ও উপদেশের মূলধন রয়েছে।' এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের জন্যেও বটে। এরা যেন ভয় করে যে, কৌশল ও ফন্দির কারণে এবং প্রতারণা করে হারামকে হালাল করার কারণে যে শাস্তি তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, এখন যারা এরূপ করবে তাদের উপরও না জানি ঐ শাস্তি এসে যায়। ইমাম আবদুল্লাহ বিন বাত্তাহ্ (রঃ) একটি বিশুদ্ধ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইয়াহূদীরা যা করেছিল তোমরা তা করো না। ফন্দি করে হারামকে হালালরূপে গ্রহণ করো না। অর্থাৎ শরীয়তের নির্দেশাবলীতে ফন্দি ও কৌশল হতে বেঁচে থাক।' এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক। এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

৬৭। এবং যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন নিশ্চয়–আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা একটি গরু ‘যবাহ্’ কর, তারা বলেছিল– তুমি কি আমাদেরকে উপহাস করছ? সে বলেছিল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আমি মূর্খদের অন্তর্গত না হই।

٦٧- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে আর একটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি একটি গরুর মাধ্যমে একটি নিহত লোককে জীবিত করেন এবং তার হত্যাকারীর পরিচয় দান করেন। এটা একটা অলৌকিক ঘটনাই বটে।

## গল্পের বিস্তারিত আলোচনা

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একটি ধনী বন্ধ্যা লোক ছিল, তার কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। তার উত্তরাধিকারী ছিল তার এক ভ্রাতুস্পুত্র। সত্বর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির আশায় সে তার পিতৃব্যকে হত্যা করে ফেলে এবং রাত্রে তাদের গ্রামের একটি লোকের দরজার উপরে রেখে আসে। সকালে গিয়ে ঐ লোকটির উপর হত্যার অপবাদ দেয়। অবশেষে এর দলের ও ওর দলের লোকদের মধ্যে মারামারি ও খুনাখুনি হওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় তাদের জ্ঞানী লোকেরা তাদেরকে বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল (হযরত মূসা আঃ)) বিদ্যমান থাকতে তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে কেন?” সুতরাং তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করে। তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবাহ্ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।” একথা শুনে তারা বলেঃ “আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করছেন?” তিনি বলেনঃ “মূর্খদের ন্যায় কাজ করা হতে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।” এখন যদি তারা যে কোন একটি গরু যবাহ্ করতো তাহলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা কাঠিন্য অবলম্বন করে, সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তা কঠিন করে দেন।

অতঃপর তারা ঐরূপ গরু একটি লোকের নিকট প্রাপ্ত হয়। একমাত্র তার নিকট ছাড়া আর কারও কাছে ছিল না। লোকটি বলেঃ "আল্লাহ্র শপথ! এই গরুর চামড়া পূর্ণ স্বর্ণের কম মূল্যে আমি এটা বিক্রি করবো না।" সুতরাং তারা ঐ মূল্যেই তা কিনে নেয়। এবং যবাহ্ করে। তারপর তারা ওর এক খণ্ড মাংস দ্বারা নিহত ব্যক্তির উপর আঘাত করে। তখন মৃত লোকটি দাঁড়িয়ে যায়। লোকগুলো তাকে জিজ্ঞেস করেঃ "তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে বলেঃ "আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র।" একথা বলেই সে পুনরায় মরে যায়। সুতরাং তাকে মৃত ব্যক্তির কোন মাল দেয়া হলো না।

তাফসীর-ই-আব্দ বিন হামীদে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একটি ধনী লোক ছিল যার কোন সন্তান ছিল না। তার শুধুমাত্র একটি নিকটতম আত্মীয় ছিল এবং সেই ছিল তার উত্তরাধিকারী। সে (নিকটাত্মীয়) লোকটিকে হত্যা করে ফেলে অতঃপর তার মৃত দেহ রাজপথে এনে রেখে দেয়। অতঃপর সে হযরত মূসার (আঃ) নিকট এসে বলেঃ আমার এক আত্মীয় নিহত হয়েছে। সুতরাং আমি কঠিন সমস্যায় পড়ে গেছি। আমি এমন কাউকেও পাচ্ছি না যে আমাকে তার হত্যাকারীর কথা বলে দেয়। হে আল্লাহ্র নবী (আঃ)! এটা একমাত্র আপনিই বলতে পারেন। তখন হযরত মূসা (আঃ) জনগণকে ডাক দিয়ে বলেনঃ "আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের মধ্যে যার এটা জানা রয়েছে সে যেন তা বলে দেয়।" তাদের মধ্যে কেউই এটা বলতে পারলো না। তখন হত্যাকারী ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে বলেঃ "আপনি আল্লাহ্র নবী। সুতরাং আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদেরকে এটা বলে দেন। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি তাঁর নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবাহ্ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" তখন তারা বিস্মিত হয়ে বলেঃ 'আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করছেন?' তিনি বলেনঃ "আমি মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ি এ থেকে আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তারা বলেঃ "আপনি আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন ওর কি কি গুণ থাকতে হবে?" তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, ওটা এমন একটি গরু হবে যা পূর্ণ বৃদ্ধও নয়, একেবারে বাচ্চাও নয়, এতদুভয়ের মধ্যে বয়স্ক পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত।"তারা বলে "আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর নিকট দরখাস্ত করুন, যেন তিনি আমাদেরকে বলে দেন ওর বর্ণ কিরূপ হবে?" তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, ওটা একটি হলদে রঙের গরু, উজ্জ্বল হলদে রঙের যা দর্শকদের জন্যে আনন্দদায়ক হয়। তারা বলেঃ' আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর

নিকট আবেদন করুন, যেন তিনি আমাদেরকে বলেন দেন যে, ওর গুণাবলী কি কি হবে? কেননা, এই গরু সম্বন্ধে আমাদের সংশয় রয়েছে এবং নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ ঠিক বুঝতে পারবো।" তখন মূসা (আঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলেছেন যে, ওটা এমন হবে যা জমি কর্ষণের জন্যে হাল চাষেও ব্যবহৃত হয় না কিংবা ওটা কৃষির জন্যে পানিও সেচন করে না। তা হবে নিখুঁত, তাতে কোন দাগ থাকবে না।' তারা বলেঃ "এখন আপনি পূর্ণ বর্ণনা দিলেন। তখন তারা ওটা যবাহ্ করল, কিন্তু তারা তা করবে বলে মনে হচ্ছিল না। যদি তারা যেকোন একটি গরু যবাহ্ করতো তবে তাই তাদের জন্যে যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা নিজেদের উপর কাঠিন্য আনয়ন করে বলে আল্লাহও তাদের উপর কাঠিন্য আরোপ করে দেন। আর যদি তারা 'ইনশাআল্লাহ আমরা সুপথ প্রাপ্ত হবো। একথা না বলতো তবে তারা কখনও এর সমাধানে পৌঁছতে পারতো না।

ঐ লোকগুলো এ সকলগুণ বিশিষ্ট গরুটি একজন বৃদ্ধার নিকট ছাড়া আর কারও কাছে প্রাপ্ত হয়নি। ঐ বৃদ্ধার কয়েকটি পিতৃহীন ছেলে মেয়ে ছিল। গরুটি ঐ লোকদের নিকট খুবই দুর্মূল্য ছিল। যখন ঐ বৃদ্ধা জানতে পারে যে, সেই গরু ক্রয় করা ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই, তখন সে তার মূল্য খুব বেশী চাইলো। তখন লোকগুলো হযরত মূসার (আঃ) নিকট আগমন করে তাঁকে বলে যে, এরূপ গুণবিশিষ্ট গরু অমুক বৃদ্ধা ছাড়া আর কারও কাছে নেই। এবং সে ওর মূল্য অত্যন্ত বেশী চাচ্ছে। হযরত মূসা (আঃ) তখন বললেনঃ "তোমাদের উপর আল্লাহ্ পাক হালকা করেছিলেন কিন্তু তোমরা নিজেদের জীবনের উপর তা ভারী করে নিয়েছো। সুতরাং সে যা চায় তাই দিয়ে গরুটি কিনে নাও।"

অতঃপর তারা গরুটি কিনে নিয়ে যবাহ্ করে। হযরত মূসা(আঃ) তখন তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন, সেই গরুটির একখানা অস্থি নিয়ে মৃতের উপর আঘাত করে। তারা তাই করে। তখন লোকটি জীবিত হয়ে উঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলে দিয়েই পুনরায় মরে যায়। অতঃপর হত্যাকারীকেও পাকড়াও করা হয় এবং সেছিল ঐ ব্যক্তি যে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে তারা মন্দ কার্যের প্রতিশোধ রূপে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশক্রমে হত্যা করে।

সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একটি বিরাট ধনী লোক ছিল। তার কোন ছেলে ছিল না। তার ছিল শুধুমাত্র একটি মেয়ে ও একটি ভ্রাতুষ্পুত্র। ভাতিজা তার চাচার মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে চাচার নিকট প্রস্তাব দিলে চাচা তা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং সে শপথ করে বলেঃ "নিশ্চয়

আমি আমার চাচাকে হত্যা করে তার ধন-সম্পদ হস্তগত করবো এবং তার মেয়েকে বিয়ে করে নেবো।" অতঃপর সে কৌশল করে তার চাচাকে কোন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলে। বানী ইসরাঈলের মধ্যে কয়েকজন ভাল লোক ছিল। তারা দুষ্ট লোকদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায় এবং অন্য একটি শহরে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। সন্ধ্যায় তারা তাদের দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিতো এবং সকালে খুলতো। কোন অপরাধীকে তারা তথায় প্রবেশ করতে দিতো না। সেই ভাতিজা তার চাচার মৃত দেহ নিয়ে গিয়ে সেই দুর্গের সদর দরজার সামনে রেখে দেয়। এখানে এসে ফাঁকি দিয়ে সে তার চাচাকে খুঁজতে থাকে। অতঃপর সে চেঁচিয়ে বলে যে, কে তার চাচাকে হত্যা করেছে। অবশেষে সে এ দুর্গবাসীদের উপর দোষ চাপিয়ে দেয় এবং তাদের কাছে রক্তপণ দাবী করে। কিন্তু দুর্গবাসীরা বলে যে, তারা তার হত্যার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কিন্তু সে কিছুই শুনতে চায় না। এমনকি সে তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এরা তখন বাধ্য হয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আসে এবং ঘটনা বর্ণনা করে বলেঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (আঃ)! এ লোকটি অযথা আমাদের উপর একটা হত্যার অপবাদ দিচ্ছে, অথচ আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ।" হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন। তখন তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হয়। তিনি তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা একটি গরু যবাহ্ কর।" তারা তখন বলেঃ "হে আল্লাহ্র নবী (আঃ)! কোথায় হত্যাকারীর পরিচয় প্রদান আর কোথায় গরু যবাহ্ করার নির্দেশ? আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করছেন?" হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, (শরীয়তের জিজ্ঞাস্যের ব্যাপারে) উপহাস তো মূর্খদের কাজ। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এটাই।"

এখন যদি এরা সব গিয়ে কোন একটি গরু যবাহ্ করতো তবেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা প্রশ্নাবলীর দরজা খুলে দেয়। তারা বলেঃ "গরুটি কেমন হতে হবে?" তখন নির্দেশ হয়, "এটা বুড়োও নয় বা একেবারে বাচ্চাও নয়, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান।" তারা বলেঃ "জনাব! এ রকম গরু তো অনেক আছে, এর রঙের বর্ণনা দিন।" ওয়াহী অবতীর্ণ হয় ঃ 'এটা হলদে রঙের, উজ্জ্বল হলদে এর রং, দর্শকদেরকে যা আনন্দ দেয়।' আবার তারা বলেঃ "এরূপ গরু ও তো অনেক আছে, অন্য কোন বিশিষ্ট গুণের বর্ণনা দিন, জনাব!" আবার ওয়াহী নাযিল হয়ঃ 'ওটা এমন গরু যা না জমি কর্ষণে ব্যবহার হয় না ক্ষেতে পানি সেচনে, নিখুঁত, তার মধ্যে কোন দাগ থাকবে না।'

যেমন তারা প্রশ্ন বাড়াতে থাকে, নির্দেশও তেমনি কঠিন হতে থাকে। অতঃপর তারা এরূপ গরুর খোঁজে বের হয়। এরূপ গরু তারা একটি বালকের কাছে প্রাপ্ত হয়। ছেলেটি তার পিতা-মাতার খুবই বাধ্য ছিল। একদা তার পিতা ঘুমিয়ে ছিলেন এবং টাকার বাক্সের চাবি তাঁর শিয়রে ছিল। এক বণিক একটি মূল্যবান হীরা বেচতে আসে এবং বলেঃ "আমি এটা বেচতে চাই।" ছেলেটি বলেঃ আমি ক্রয় করবো।" মূল্য সত্তুর হাজার টাকা ঠিক হলো। ছেলেটি বলেঃ "একটু অপেক্ষা করুন, আমার পিতা জেগে উঠলেই তাঁর নিকট হতে চাবি নিয়ে আপনাকে মূল্য দিয়ে দেবো।" বণিক বলেঃ "না, তা হবে না, টাকা এখনই দাও। এখনই টাকা দিলে দশ হাজার টাকা কমিয়ে দিচ্ছি।" ছেলেটি বলেঃ না জনাব" পিতাকে জাগাবো না, যদি আপনি অপেক্ষা করেন তবে আমি আশি হাজার দেবো। এভাবেই এদিকে কম হতে ওদিকে বেশী হতে থাকে। অবশেষে বণিক ত্রিশ হাজারে নেমে আসে এবং বলেঃ "এখন যদি আমাকে টাকা দিয়ে দাও তবে ত্রিশ হাজারেই দিয়ে দেবো।" তখন ছেলেটি বলেঃ আমার পিতা জেগে ওঠা পর্যন্ত যদি আপনি অপেক্ষা করেন তবে আপনাকে এক লাখ টাকা দেবো।"

অবশেষে বণিক অসন্তুষ্ট হয়ে হীরা ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। ছেলেটি যে তার পিতার আরামের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বুঝেছে, এ জন্যে মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে এ গরুটি দান করেন। বানী ইসরাঈল ঐ প্রকারের গরু খুঁজতে বেরিয়ে ঐ ছেলেটির নিকট ছাড়া আর কারও কাছে পায়নি। সুতরাং তারা তাকে বলে ঃ তোমার এ গরুটি আমাদেরকে দাও। এর পরিবর্তে আমরা তোমাকে দু'টি গরু দিচ্ছি। সে কিন্তু সম্মত হয় না। তিনটি ও চারটি দিতে চাইলেও সে রাযী হয় না। দশটি দিতে চাইলেও সে অসম্মতই থাকে। লোকগুলো তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে। হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "সে যা চায় তাই দিয়ে গরুটি কিনে নাও।" শেষে তারা ছেলেটির নিকট এসে তাকে গরুর ওজনের সমান সোনা নিতে চাইলে সে সম্মত হয় এবং তার গরুটি বিক্রি করে। সে তার বাপ-মার খিদমত করেছিল বলেই আল্লাহ তা'আলা তাকে এরূপ বরকত দান করেন। সে তো খুব দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। তার পিতা মারা গিয়েছিলেন এবং তার মা অত্যন্ত দারিদ্র ও সংকীর্ণতার মধ্যে কাল যাপন করছিলেন।

যা হোক, গরুটি কেনা হলে সেটিকে যবাহ্ করা হয় এবং ওর এক গোশত খণ্ড দিয়ে নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সে জীবিত হয়ে ওঠে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'তোমাকে হত্যা করেছিল কে?" সে উত্তরে বলেঃ "আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সম্পদ অধিকারের জন্যে ও আমার মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে আমাকে হত্যা করেছিল।" এটুকু বলার পরই সে পুনরায় মরে যায়। এখন হত্যাকারীকে চেনা

যায় এবং এ হত্যার ফলে বানী ইসরাঈলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল তা প্রশমিত হয়। অতঃপর জনগণ মৃত ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধরে কিসাস রূপে হত্যা করে দেয়।

এ গল্পটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, এটা বানী ইসরাঈলের সে যুগের ঘটনা। আমরা একে সত্যও বলতে পারি না এবং মিথ্যাও না। যা হোক, এ আয়াতে বানী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার এ নিয়ামতকে ভুলে না যায় যে, তিনি এমন এক স্বভাব বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটালেন যার ফলে গরুর এক খণ্ড গোশতের দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করায় সে জীবিত হয়ে যায় এবং সে তার হত্যাকারীর নাম বলে দেয় এবং যার ফলে একটা বড় বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

---

٦٨- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○

৬৮। তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি আমাদেরকে যেন ওটা কি কি গুণ বিশিষ্ট হওয়া দরকার তা বলে দেন, সে বলেছিল–তিনি বলছেন যে, নিশ্চয় সেই গরু বয়োবৃদ্ধ নয় এবং শাবকও–নয়–এ দুয়ের মধ্যবর্তী, অতএব তোমরা যেরূপ আদিষ্ট হয়েছো তা করে ফেল।

٦٩- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّٰظِرِينَ ○

৬৯। তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি ওর বর্ণ কিরূপ তা আমাদেরকে বলে দেন; সে বলেছিল–তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয় সেই গরুর বর্ণ গাঢ় পীত, ওটা দর্শকগণকে আনন্দ দান করে।

৭০। قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ○

৭০। তারা বলেছিল—তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন ওটা কিরূপ তা আমাদের জন্যে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আমাদের নিকট সকল গরুই সমতুল্য এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা সুপথগামী হবো।

৭১। قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

৭১। সে বলেছিল, নিশ্চয় তিনি বলছেন যে, অবশ্যই সেই গরু সুস্থকায়, নিষ্কলংক, ওটা ভূ-কর্ষণের জন্যে লাগানো হয়নি এবং ক্ষেতে পানি সেচনেও নিযুক্ত হয়নি, তারা বলেছিল—এক্ষণে তুমি সত্য এনেছো, অতঃপর তারা ওটা যবাহ্ করলো যা তাদের করবার ইচ্ছা ছিল না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, দুষ্টামি ও আল্লাহ্র নির্দেশের ব্যাপারে তাদের খুঁটি নাটি প্রশ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন। তাদের উচিত ছিল হুকুম পাওয়া মাত্রই তার উপর আমল করা। কিন্তু তা না করে তারা বার বার প্রশ্ন করতে থাকে। ইবনে জুরাইয (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যদি তারা যে কোন গরু যবাহ্ করতো তবে তাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকে এবং তার ফলে কার্যে কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। এমন কি যদি তারা 'ইনশাআল্লাহ' না বলতো তবে কখনও এ কাঠিন্য দূর হতো না এবং ওটা তাদের কাছে প্রকাশিত হতো না।"

তাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, ওটা বৃদ্ধও নয় বা একেবারে কম বয়সেরও নয়, বরং মধ্যম বয়সের। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ওর রং বর্ণনা করা হয় যে, ওটা হলদে রঙের সুদৃশ্য একটি গরু। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) গরুটির রং হলদে বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে এখানে অর্থ হচ্ছে কালো

রং। কিন্তু প্রথম মতটিই সঠিক। তবে রঙের তীব্রতা ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে গরুটি যে কালো রঙের মত দেখাতো সেটা অন্য কথা।

অহাব বিন মুনাব্বাহ্‌র (রঃ) বলেনঃ "ওর রং এতো গাঢ় ছিল যে, মনে হতো যেন ওটা থেকে সূর্যের কিরণ উত্থিত হচ্ছে।" তাওরাতে ওর রং লাল বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ যিনি ওকে আরবীতে অনুবাদ করেছেন তিনিই ভুল করেছেন। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন। ঐ রঙের ও ঐ বয়সের বহু গরু তাদের চোখে পড়তো বলে তারা হযরত মূসা (আঃ) কে বলেঃ "হে আল্লাহ্‌র নবী (আঃ)! আপনি আল্লাহকে অন্য কোন নিদর্শনের কথা জিজ্ঞেস করুন যেন আমাদের সন্দেহ কেটে যায়। ইনশাআল্লাহ আমরা এবারে রাস্তা পেয়ে যাবো।" যদি তারা ইনশাআল্লাহ না বলতো তবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা ওরকম গরুর ঠিকানা পেত না। আর যদি তারা প্রশ্নই না করতো তবে তাদের প্রতি এত কঠোরতা অবলম্বন করা হতো না, বরং যে কোন গরু যবাহ্ করলেই যথেষ্ট হতো। এ বিষয়টি একটি মারূফূ' হাদীসেও আছে। কিন্তু ওর সনদটি গরীব। সঠিক কথা এটাই যে, এটা হযরত আবূ হুরাইরার (রাঃ) নিজস্ব কথা। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

এখন গরুটির বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ওটা জমি কর্ষণ করে না বা পানি সেচের কাজেও ওটা ব্যবহৃত হয় না। ওর শরীরে কোন দাগ নেই। ওটা একই রঙের—অন্য কোন রঙের মিশ্রণ মোটেই নেই। ওটা সুস্থ ও সবল। কেউ কেউ বলেন যে, ওটা কাজের গরু নয়। তবে ক্ষেতে কাজ করে থাকে বটে কিন্তু পানি সেচের কাজ করে না। কিন্তু একথাটি ভুল, কেননা ذَلُوْلٌ -এর তাফসীর এটাই যে, ওটা জমি কর্ষণ করে না, পানি সেচন করে না এবং ওর শরীরে কোন দাগ নেই। এখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা ওর কুরবানী দিতে এগিয়ে গেল। এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা ওটা যবাহ্ করবে বলে মনে হচ্ছিল না। বরং যবাহ্ না করার জন্যেই তারা টালবাহানা করছিল।

কেউ কেউ বলেছেন যে, অপদস্থ হওয়ার ভয়েই তারা ঐরূপ করছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তারা ওর মূল্য শুনেই ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ওর মূল্য লেগেছিল মোট তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা। কিন্তু এ বর্ণনাটি এবং গরুর ওজন বরাবর সোনা দেয়ার বর্ণনাটি, এ দুটোই ইসরাঈলী কথা। সঠিক কথা এই যে, তাদের নির্দেশ পালনের ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু এভাবে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ফলে এবং হত্যার মামলার কারণে তাদেরকে ওটা মানতেই হয়েছিল। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

এ আয়াত দ্বারা এই মাসয়ালার উপরও দলীল নেয়া যেতে পারে যে, জন্তুকে না দেখেও ধার দেয়া জায়েয। কেননা, পূর্ণভাবে এর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন হযরত ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আওযায়ী (রঃ), ইমাম লায়েস (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) ও জমহূর উলামার এটাই মাযহাব। এর দলীলরূপে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের নিম্নের হাদীসটিও আনা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন স্ত্রীলোক যেন তার স্বামীর সামনে অপর কোন স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য এমনভাবে বর্ণনা না করে যেন সে তাকে দেখছে।" অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভুলবশতঃ হত্যার এবং স্বেচ্ছায় অনুরূপ হত্যার দিয়্যাতের উটসমূহের বিশেষত্বও বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম সাওরী (রঃ) এবং অন্যান্য কুফীগণ 'বায়-ই-সালামকে সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন যে, জন্তুসমূহের গুণাবলী ও অবস্থা পূর্ণভাবে বর্ণনা করা ছাড়া অবস্থা আয়ত্বে আসতে পারে না। এ ধরনের বর্ণনা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ হতেও বর্ণিত হয়েছে।

---

৭২। এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পর তদ্বিষয়ে বিরোধ করছিলে এবং তোমরা যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তার প্রকাশক হলেন।

٧٢- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

৭৩। তৎপর আমি বলেছিলাম– ওর এক খণ্ড দ্বারা তাকে আঘাত কর; এই রূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন–যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

٧٣- فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

---

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে اَدّٰرَءْتُمْ-এর অর্থ করা হয়েছে 'তোমরা মতভেদ করলে।' হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে। মুসীব বিন রাফে (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি সাতটি ঘরের মধ্যে লুকিয়েও কোন কাজ করে, আল্লাহ তার পুণ্য প্রকাশ করে দেবেন। এ রকমই যদি কোন লোক সাতটি ঘরের মধ্যে ঢুকেও কোন খারাপ কাজ করে, আল্লাহ ওটাও প্রকাশ করে

দেখেন। অতঃপর وَ اللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ এই আয়াতটি পাঠ করেন। এখানে ঐ চাচা ভাতিজারই ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যে কারণে গরু যবাহ্ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বলা হচ্ছে যে, ওর কোন অংশ নিয়ে মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত কর, যদি বলা হয় যে ঐ অংশটি কোন অংশ ছিল? তবে বলা হবে যে, ওর বর্ণনা না কুরআন মাজীদের মধ্যে আছে, না কোন সহীহ হাদীসে আছে। এটা জানায় না কোন উপকার আছে বা না জানায় কোন ক্ষতি আছে। যে জিনিসের কোন বর্ণনা নেই তার পিছনে না পড়ার মধ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ওটা আযরুকের নরম হাড় ছিল। কেউ বলেন যে, হাড় নয় বরং রানের গোশত। কেউ বলেন যে, ওটা দুই ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের গোশত ছিল। কেউ বলেন যে, ওটা জিহ্বার গোশত ছিল, আবার কারও মতে ওটা ছিল লেজের গোশত। কিন্তু আমাদের মঙ্গল ওতেই আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা গুপ্ত রেখেছেন আমরা ও যেন তা গুপ্ত রাখি। ঐ অংশ দ্বারা স্পর্শ করা মাত্রই সে জীবিত হয়ে ওঠে এবং আল্লাহ তা'আলা সেই ঝগড়ার ফায়সালা ওর দ্বারাই করেন আর কিয়ামতের দিন মৃতেরা যে জীবিত হয়ে উঠবে তার দলীলও একেই করেন। এ সূরার মধ্যে পাঁচ জায়গায় মরার পরে জীবিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। প্রথম হচ্ছে নিম্নের আয়াতটির মধ্যে ثُمَّ بَعَثۡنٰكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَوۡتِكُمۡ দ্বিতীয় আলোচ্য ঘটনায়, তৃতীয় ঐ লোকদের ঘটনায় যারা হাজার হাজার সংখ্যায় বের হয়েছিল এবং একটি বিধ্বস্ত পল্লী তারা অতিক্রম করেছিল। চতুর্থ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর চারটি পাখীকে মেরে ফেলার পর জীবিত হওয়ার মধ্যে এবং পঞ্চম হচ্ছে যমীনের মরে যাওয়ার পর বৃষ্টির সাহায্যে পুনর্জীবন দান করাকে মরণ ও জীবনের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে।

আবূ দাউদ তায়ালেসীর একটি হাদীসে আছে যে, আবূ রাজীন আকিলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কিভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করবেন?" তিনি বলেনঃ "তুমি কোন দিন বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছো কি?" তিনি বলেনঃ 'হাঁ', রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আবার কখনও ওকে সবুজ ও সতেজ দেখেছো কি?' তিনি বলেন, 'হাঁ'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'এভাবেই মৃত্যুর পর জীবন লাভ ঘটবে।'

কুরআন মাজীদের অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ তাদের (অবিশ্বাসীদের) জন্যে মৃত ভূমিও একটি নিদর্শন যাকে আমি জীবিত করে থাকি এবং তা হতে শস্য উৎপাদন করে থাকি, তারা তা হতে আহার করে থাকে। আমি তার মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ করে দিয়েছি এবং তাতে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করেছি, যেন তারা ফলসমূহ হতে ভক্ষণ করতে পারে, তাদের হস্তসমূহ তা তৈরী করেনি, তবুও তারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না?'

কোন আহত ব্যক্তি যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে হত্যা করেছে তবে তার এ কথাকে সত্য মনে করা হবে। এ জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উপর এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। এবং হযরত ইমাম মালিক (রঃ)-এর মাযহাবকে এর দ্বারা মজবুত করা হয়েছে। কেননা, নিহত লোকটি জীবিত হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করায় সে যাকে তার হত্যাকারী বলে, তাকে হত্যা করা হয় এবং নিহত ব্যক্তির কথাকেই বিশ্বাস করা হয়। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষ মুমূর্ষ অবস্থায় সাধারণতঃ সত্য কথাই বলে থাকে এবং সে সময় তার উপর কোন অপবাদ দেয়া হয় না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, এক ইয়াহূদী একটি দাসীর মাথা পাথরের উপরে রেখে অন্য পাথর দ্বারা ভীষণভাবে প্রহার করে এবং তার অলংকার খুলে নেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেনঃ 'ঐ দাসীকে জিজ্ঞেস কর যে তাকে কে মেরেছে?' লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করেঃ "তোমাকে অমুক মেরেছে? অমুক মেরেছে?" সে তার মাথার ইশারায় অস্বীকার করতে থাকে। ঐ ইয়াহূদীর নাম করলে সে মাথার ইশারায় সম্মতি জানায়। সুতরাং ইয়াহূদীকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে বারবার জিজ্ঞেস করায় সে স্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দেন যে, তার মাথাকেও এভাবেই দু'টি পাথরের মধ্যস্থলে রেখে দলিত করা হোক। ইমাম মালিকের (রঃ) মতে এটা উত্তেজনার কারণে হলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণকে শপথ করাতে হবে। কিন্তু জমহূর এর বিরোধী এবং এক নিহত ব্যক্তির কথাকে এ ব্যাপার প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন না।

---

٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

**৭৪। অনন্তর এর পর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বরং তদপেক্ষা কঠিনতর হলো এবং নিশ্চয় প্রস্তর হতেও প্রস্রবণ নির্গত হয় এবং নিশ্চয় ওগুলোর মধ্যে কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়, তৎপরে তা হতে পানি নির্গত হয় এবং নিশ্চয় ঐগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়, এবং তোমরা যা করছো তৎপ্রতি আল্লাহ অমনোযোগী নন।**

এ আয়াতে বানী ইসরাঈলকে ধমকান হচ্ছে যে,এত বড় বড় মুজিযা এবং আল্লাহ্র ব্যাপক ক্ষমতার নিদর্শনাবলী দেখার পরেও এত তাড়াতাড়ি তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল? এজন্যই মুমিনগণকে এরকম শক্তমনা হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে-"এখনও কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহ্র যিক্রের দ্বারা এবং যে সত্য তিনি অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা মুমিনের অন্তর কেঁপে ওঠে? এবং তারা যেন পূর্বের কিতাবীদের মত না হয়ে যায় যাদের অন্তর যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর শক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ নিহত ব্যক্তির ভাতিজাও তার চাচার দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পর তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল এবং বলেছিল যে, সে মিথ্যা বলেছে।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বানী ইসরাঈলের অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গিয়েছিল। কেননা, পাথর হতেও তো ঝরণা প্রবাহিত হয়। কোন কোন পাথর ফেটে যায় এবং তা হতে পানি বের হয়, যদিও তা প্রবাহিত হওয়ার যোগ্য নয়। কোন কোন পাথর আল্লাহ্র ভয়ে উপর হতে নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ লোকদের অন্তর নসীহত বা উপদেশে কখনও নরম হয় না।

## পাথরের মধ্যে বোধশক্তি আছে

এখান হতে এটাও জানা যাচ্ছে যে, পাথরের মধ্যেও জ্ঞান বিবেক আছে। কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে আছেঃ "সাত আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহ্র তাসবীহ্ পাঠ করে ও প্রশংসা কীর্তন করে, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝ না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সহনশীল ও ক্ষমাশীল।"

হযরত আবূ ইয়ালা জবাঈ (রঃ) পাথরের আল্লাহ্র ভয়ে উপর হতে নীচে পড়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন আকাশ হতে শিলা বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। ইমাম রাযীও (রঃ) এটাকে বেঠিক বলেছেন এবং আসলেও এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কেননা, এর দ্বারা বিনা দলীলে শাব্দিক অর্থকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

নহর প্রবাহিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে খুব বেশী ক্রন্দন করা। ফেটে যাওয়ার ও পানি বের হওয়ার অর্থ হচ্ছে ওর অপেক্ষা কম ক্রন্দন করা এবং নীচে গড়িয়ে পড়ার অর্থ হচ্ছে অন্তরে ভয় করা। কেউ কেউ বলেন যে, এটা রূপক অর্থে নেয়া হয়েছে। যেমন অন্যস্থানে আছেঃ "প্রাচীর পড়ে যেতে চাচ্ছিল।" স্পষ্ট কথা এই যে, এটা রূপক অর্থ। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের ইচ্ছাই থাকে না। ইমাম রাযী (রঃ) এবং কুরতবী (রঃ) বলেন যে, এরূপ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ

তা'আলা যে জিনিসের মধ্যে যে বিশেষণ দেয়ার ইচ্ছা করেছেন তা তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ "আমি আমার এ আমানত (অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলী) আকাশসমূহ, যমীন ও পর্বতসমূহের সমানে পেশ করে ছিলাম, তখন তারা ঐ আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং ভীত হয়ে যায়।" উপরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সমস্ত জিনিস আল্লাহ্র তাসবীহ্ বর্ণনা করে। অন্যস্থানে রয়েছেঃ "তারকা ও বৃক্ষ আল্লাহ্কে সিজদাহ করে। আর এক জায়গায় আছেঃ "যমীন ও আসমান বলে-আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে হাজির আছি।" আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ "তারা (পাপীরা) তাদের চামড়াকে বলবে-তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? তারা বলবে-আমাদেরকে সেই আল্লাহই কথা বলাচ্ছেন যিনি প্রত্যেক জিনিসকে কথা বলার শক্তি দান করে থাকেন।"

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উহুদ পাহাড় সম্পর্কে বলেনঃ "এ পাহাড়টি আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি।" আর একটি সহীহ্ হাদীসে আছে, যে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর হেলান দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুৎবা দিতেন, যখন মেম্বর তৈরী হয় ও কাণ্ডটিকে সরিয়ে ফেলা হয় তখন কাণ্ডটি অঝোরে কাঁদতে থাকে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি মক্কার ঐ পাথরকে চিনি যা আমার নবুওয়াতের পূর্বে আমাকে সালাম করতো।' 'হাজরে আসওয়াদ' সম্বন্ধে আছে যে, যে ওকে সত্যের সঙ্গে চুম্বন করবে, কিয়ামতের দিন ওটা তার ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করবে। এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে যদ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এসব জিনিসের মধ্যে বিবেক ও অনুভূতি আছে এবং ওগুলো প্রকৃত অর্থেই আছে, রূপক অর্থে নয়।

اَوْ শব্দটি সম্পর্কে কুরতবী (রঃ) এবং ইমাম রাযী (রঃ) বলেন যে, এটা ইচ্ছার স্বাধীনতার জন্যে এসেছে। অর্থাৎ 'তাদের অন্তরকে পাথরের মত শক্ত মনে কর অথবা তার চেয়ে বেশী শক্ত মনে কর। ইমাম রাযী (রঃ) একটি কারণ এও বর্ণনা করেছেন যে, এটা দ্ব্যর্থবোধকের জন্য। সম্বোধিত ব্যক্তির একটি জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার সামনে যেন দু'টি জিনিসকে দ্ব্যর্থবোধক হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। কারও কারও কথামত এটার ভাবার্থ এই যে, কতক অন্তর পাথরের মত শক্ত এবং কতক অন্তর তার চেয়েও বেশী শক্ত। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

একথার উপর ইজমা' হয়েছে যে, এখানে اَوْ শব্দটি সন্দেহের জন্যে নয়। অথবা اَوْ শব্দটি এখানে وَاوْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অন্তর

পাথরের মত এবং তার চেয়েও বেশী শক্ত হয়েছে। যেমন لَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا এবং عُذْرًا اَوْ نُذْرًا এই দু' জায়গায় اَوْ শব্দটি وَاوْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরব কবিদের কবিতায়ও اَوْ শব্দটি وَاوْ -এর অর্থে বহুবচনের জন্যে এসেছে। কিংবা এখানে اَوْ -এর অর্থ بَلْ অর্থাৎ বরং, যেমন كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً (৪:৭৭) এবং وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ (৩৭: ১৪৭) এই দু'স্থানে اَوْ শব্দটি بَلْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারও কারও মতে এর ভাবার্থ এই যে, ওটা পাথরের মত কিংবা কঠোরতায় তোমাদের নিকট তার চেয়েও বেশী। কেউ কেউ বলেন যে, এটা সম্বোধিত ব্যক্তির সামনে শুধু দ্ব্যর্থবোধক হিসেবে আনা হয়েছে এবং এটা কবিদের কবিতার মধ্যেও পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় আছে ঃ

وَاِنَّا وَ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ "আমরা অথবা তোমরা স্পষ্ট সুপথের উপরে অথবা ভ্রান্ত পথের উপরে রয়েছি।" (৩৪: ২৪) এটা স্পষ্ট যে, মুসলমানরা সঠিক পথে আছে এবং কাফিরেরা ভ্রান্ত পথে আছে, এটা নিশ্চিত কথা। তথাপি সম্বোধিত ব্যক্তির সামনে অস্পষ্টভাবে কথা বলা হয়েছে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তোমাদের অন্তর দু'টো অবস্থা হতে বাইরে নয়। হয়তো বা এটা পাথরের মত কিংবা ওর চেয়েও কঠিন। এ কথার মত এ কথাগুলোও ঃ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا (২: ১৭) আবার বলেছেন اَوْ كَصَيِّبٍ অন্য জায়গায় আছেঃ كَسَرَابٍ অন্য স্থানে রয়েছে اَوْ كَظُلُمٰتٍ ভাবার্থ এটাই যে, কিছু এরূপ এবং কিছু ঐরূপ। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

'তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই' এর মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লা্হর জিক্র ছাড়া বেশী কথা বলো না। এরকম বেশী কথা অন্তরকে শক্ত করে দেয়। আর শক্ত অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা হতে বহু দূরে থাকে।" ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর একটি পন্থাকে গরীব বলেছেন। মুসনাদ-ই-বায্যারের মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের অন্তর্গতঃ (১) আল্লাহ্র ভয়ে চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া।, (২) অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া, (৩) আশা বৃদ্ধি পাওয়া এবং (৪) লোভী হয়ে যাওয়া।

٧٥- اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৫। তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে এমন কতক লোক গত হয়েছে যারা আল্লাহ্র কালাম শুনতো, অতঃপর ওকে বুঝার পর ওকে বিকৃত করতো, অথচ তারা জানতো।

٧٦- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৭৬। আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তাদের কেউ কারও (ইয়াহূদীদের) নিকট গোপনে যায়, তখন তারা বলে, তোমরা কি মুসলমানদেরকে এমন কথা বলে দাও যা আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন? পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে (এই বলে) যে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র নিকট হতে তোমাদের কিতাবে রয়েছে, তোমরা কি বুঝ না?

٧٧- اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৭৭। তারা কি জানেনা যে, তারা যা গুপ্ত রাখে এবং যা প্রকাশ করে আল্লাহ সবই জানেন?

---

এই পথভ্রষ্ট ইয়াহূদ সম্প্রদায়ের ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে (সঃ) ও সাহাবীবর্গকে (রাঃ) নিরাশ করে দিচ্ছেন যে, এসব লোক যখন এত বড় বড় নিদর্শন দেখেও তাদের অন্তরকে শক্ত করে ফেলেছে এবং আল্লাহর কালাম শুনে বুঝার পরেও ওকে পরিবর্তন করে ফেলেছে তখন তোমরা তাদের কাছে আর কিসের আশা করতে পার? ঠিক এরকমই আয়াত অন্য জায়গায়

আছেঃ “তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের উপর অভিশাপ নাযিল করেছি এবং তাদের অন্তরকে শক্ত করে দিয়েছি, এরা আল্লাহ্র কালামকে পরিবর্তন করে ফেলতো।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামকে শুনার কথা বলেছেন। এর দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-এর ঐ সহচরদের বুঝানো হয়েছে যারা অল্লাহ্র কালাম নিজ কানে শুনার জন্যে তাঁর নিকট আবেদন করেছিল। আর তারা পাক-সাফ হওয়ার পর রোযা রেখে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তূর পাহাড়ে গিয়ে সিজদায় পড়ে গেলে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় কালাম শুনিয়েছিলেন। যখন তারা ফিরে আসে এবং আল্লাহ্র নবী হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র কালাম বানী ইসরাঈলের মধ্যে বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন তখন তারা তা পরিবর্তন করতে শুরু করে।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ঐসব লোক তাওরাতের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করেছিল। এই সাধারণ অর্থটিই সঠিক, যার মধ্যে তারাও শামিল হয়ে যাবে এবং এই বদ স্বভাবের অন্যান্য ইয়াহূদীরাও জড়িত থাকবে। কুরআন পাকের এক জায়গায় আছেঃ “মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে তুমি আশ্রয় দান কর যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করে।”

এখানে ভাবার্থ যেমন 'আল্লাহ্র কালাম' নিজের কানে শুনা নয়, তেমনি এখানে আল্লাহ্র কালাম অর্থে 'তাওরাত'। এ পরিবর্তনকারী ও গোপনকারী ছিল তাদের আলেমেরা। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলী তাদের কিতাবে বিদ্যমান ছিল। ওর মধ্যে তারা মূল ভাব পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এভাবেই তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করে দিতো। ঘুষ নিয়ে ভুল ফতওয়া দেয়ার অভ্যাস করে ফেলেছিল। তবে হাঁ, ঘুষ না পেলে এবং শাসন ক্ষমতা হাত ছাড়া হওয়ার ভয় না থাকলে শিষ্যদের হতে পৃথক থাকার সময় মাঝে মাঝে তারা সত্য কথাও বলে দিতো। মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে বলতো-'তোমাদের নবী সত্য। তিনি সত্যই আল্লাহ্র রাসূল।' কিন্তু যখন তারা পরস্পরে বসতো তখন একে অপরকে বলতো- 'তোমরা মুসলমানদেরকে এসব বললে তারা তোমাদেরকেও তাদের ধর্মে টেনে নেবে এবং আল্লাহ্র কাছেও তোমাদেরকে লা-জবাব করে দেবে।' তাদেরকে এর উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন যে, এই নির্বোধদের কি এতটুকুও জ্ঞান নেই যে, আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথাই জানেন?

একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাদের কাছে যেন মু'মিনরা ছাড়া আর কেউ না আসে।” তখন কাফিরেরা ও ইয়াহূদীরা পরস্পর বলাবলি করে, “তোমরা মুসলমানদের কাছে গিয়ে বল যে, আমরা ঈমান

এনেছি, আবার এখানে যখন আসবে তখন ঐরূপই থাকবে যেমন ছিলে।" সুতরাং ঐসব লোক সকালে এসে ঈমানের দাবী করতো এবং সন্ধ্যায় গিয়ে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিতাবীদের একটি দল বলে মু'মিনদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে ওর উপর দিনের এক অংশে ঈমান আন এবং অপর অংশে কুফরী কর, তা হলে স্বয়ং মু'মিনরাও ফিরে আসবে।" এরা এই প্রতারণা দ্বারা মুসলমানদের গোপন তথ্য জেনে নিয়ে তাদের দলের লোককে জানিয়ে দিতে চাইতো এবং মুসলমানদেরকেও পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছে করতো। কিন্তু তাদের চতুরতায় কাজ হয়নি। কারণ মহান আল্লাহ তাদের এই গোপন কথা মু'মিনদেরকে জানিয়ে দেন। তারা মুসলমানদের কাছে এসে ইসলাম ও ঈমানের কথা প্রকাশ করলে তাঁরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেনঃ "তোমাদের কিতাবে কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শুভাগমন ইত্যাদির কথা নেই?" তারা স্বীকার করতো। অতঃপর যখন তারা তাদের বড়দের কাছে যেতো তখন ঐ বড়রা তাদেরকে ধমক দিয়ে বলতো–'তোমরা কি নিজেদের কথা মুসলমানদেরকে বলে তোমাদের অস্ত্র তাদেরকে দিয়ে দিতে চাও?' মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানু কুরাইযার উপর আক্রমণের দিন ইয়াহূদীদের দুর্গের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বলেনঃ "ও বানর, শূকর ও শয়তানের পূজারীদের ভ্রাতৃমণ্ডলী!" তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকেঃ "তিনি আমাদের ভিতরের কথা কি করে জানলেন। খবরদার! তোমাদের পরস্পরের সংবাদ তাদেরকে দিও না, নচেৎ ওটা আল্লাহ্র সামনে দলীল হয়ে যাবে।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা গোপন করলেও আমার কাছে কোন কথা গোপন থাকে না। তোমরা গোপনে গোপনে যে নিজের লোককে বল–'তোমরা নিজেদের কথা তাদেরকে বলো না' এবং তোমরা যে তোমাদের কিতাবের কথা গোপন করে থাক, আমি তোমাদের এই সমস্ত খারাপ কাজ হতে সম্পূর্ণ সচেতন। আর তোমরা যে বাইরে তোমাদের ঈমানের কথা প্রকাশ করছো, ওটা যে তোমাদের অন্তরের কথা নয় তাও আমি জানি।"

---

৭৮। এবং তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, যারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন গ্রন্থ অবগত নয় এবং তারা শুধু কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।

٧٨- وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

৭৯। তাদের জন্যে আফসোস! যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে, এবং বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে সমাগত– এতদ্বারা তারা সামান্য মূল্য অর্জন করছে। তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ এবং তারা যা উপার্জন করছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ!

٧٩- فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

اُمِّیٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ভালভাবে লিখতে জানে না। اُمِّيُّوْنَ ওর বহু বচন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি বিশেষণ হচ্ছে اُمِّیٌّ –কেননা, তিনি ভাল লিখতে জানতেন না। আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি তো এর পূর্বে পড়তেও পারতে না এবং লিখতেও পারতে না, এমন হলে তো এ অসত্যের পূজারীরা কিঞ্চিত সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ আমি তো একজন 'উম্মী' ও নিরক্ষর লোক, আমি লিখতেও জানি না এবং হিসাবও বুঝি না, মাস কখনও এরকম হয় এবং কখনও ওরকম হয়।" প্রথমবারে তিনি তাঁর দু'হাতের সমস্ত অঙ্গুলি তিনবার নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন অর্থাৎ ত্রিশ দিনে এবং দ্বিতীয় বারে দু'বার দু'হাতের সমস্ত অঙ্গুলি ঝুঁকান এবং তৃতীয়বার এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃত্ত করে রাখেন, অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে। ভাবার্থ এই যে, আমাদের ইবাদত এবং ওর সময় হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করে না। কুরআন মাজীদের এক স্থানে আছেঃ 'আল্লাহ তা'আলা নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের মধ্য হতেই একজন নবী পাঠিয়েছেন।'

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আরবেরা অশিক্ষিত লোককে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা আছে যে,এখানে উম্মী ওদেরকেই বলা হয়েছে যারা না কোন নবীকে বিশ্বাস করেছিল, না কোন কিতাবকে মেনেছিল। বরং নিজের লিখিত কিতাবকে অন্যদের দ্বারা আল্লাহ্‌র কিতাব স্বীকার করিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রথমতঃ এ কথাটিতো আরবী বাকরীতির উল্টো, দ্বিতীয়তঃ এ কথাটির সনদ ঠিক নয়। اَمَانِیَّ –এর অর্থ হচ্ছে কথাসমূহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে

বর্ণিত আছে যে, أَمَانِيَّ–এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যা আশা ও মনভুলানো কথা। আবার কেউ কেউ এর অর্থ 'তিলাওয়াত' বা 'পাঠ'ও বলেছেন। যেমন কুরআন মাজীদে এক জায়গায় আছেঃ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى এখানে 'পাঠ' অর্থ স্পষ্ট। কবিদের কবিতায়ও এ শব্দটি পাঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তারা শুধু ধারণার উপরই রয়েছে, অর্থাৎ তারা প্রকৃত ব্যাপারে অবগত নয়; বরং নিরর্থক ধারণা করে থাকে। অতঃপর ইয়াহূদীদের অন্য এক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা লিখা পড়া জানতো ও জনগণকে ভ্রান্ত পথের দিকে আহবান করতো, আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলতো এবং শিষ্যদের নিকট হতে টাকা পয়সা আদায় করার উদ্দেশ্যে ভুল পন্থা অবলম্বন করতো।

وَيْلٌ–এর অর্থ হচ্ছে 'দুর্ভাগ্য' ও 'ক্ষতি'–এটা দোযখের একটি গর্তের নামও বটে, যার আগুনে তাপ এত প্রচণ্ড যে, ওর ভিতরে পাহাড় নিক্ষেপ করলেও তা গলে যাবে। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দোযখের একটি উপত্যকার নাম 'অয়েল' যার মধ্যে কাফিরকে নিক্ষেপ করা হবে। চল্লিশ বছর পরে ওর তলদেশে সে পৌঁছবে।" কেননা, এর গভীরতা খুবই বেশী। কিন্তু সনদ হিসেবে এ হাদীসটি গরীব বা দুর্বল। আরও একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম 'অয়েল'। ইয়াহূদীরা তাওরাতের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করেছিল এবং ওতে কম বেশী করেছিল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নাম তা হতে বের করে ফেলেছিল। এজন্যে তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ বললেনঃ "যা তারা হাত দ্বারা লিখেছে এবং যা কিছু উপার্জন করেছে তজ্জন্যে তাদের সর্বনাশ হবে। 'অয়েল' এর অর্থ কঠিন শাস্তি, ভীষণ ক্ষতি, ধ্বংস, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিও হয়ে থাকে। وَيْلٌ, وَيْحٌ, وَيْشٌ, وَيْهٌ, وَيْكٌ, وَيْبٌ, এসব শব্দের অর্থ একই। যদিও কেউ কেউ এ শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থও করেছেন। وَيْلٌ শব্দটির نَكِرَةٌ এবং نَكِرَةٌ কখনও مُبْتَدَأٌ হতে পারে না। কিন্তু এটা বদ দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এটাকে مُبْتَدَأٌ করা হয়েছে। কেউ কেউ ওর উপর نَصَبٌ দেয়াও বৈধ বলেছেন, কিন্তু وَيْلًا-র পঠন নেই।

এখানে ইয়াহূদী আলেমদেরকে নিন্দে করা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের কথাকে আল্লাহ্র কালাম বলতো এবং নিজেদের লোককে সন্তুষ্ট করে দুনিয়া কামাতো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলতেনঃ "তোমরা কিতাবীদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস কর কেন? তোমাদের কাছে তো নব প্রেরিত আল্লাহ্র কিতাব

**বিদ্যমানই আছে। কিতাবীরা** তো আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন করে **ফেলেছে। নিজেদের হস্তলিখিত কথাকেই** আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই তোমাদের নিজস্ব রক্ষিত কিতাব ছেড়ে তাদের পরিবর্তিত কিতাবের কি প্রয়োজন? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তারা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে না, কিন্তু তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছ।'

'অল্প মূল্যে'র অর্থ হচ্ছে আখেরাতের তুলনায় স্বল্পতা। অর্থাৎ ওর বিনিময়ে সারা দুনিয়া পেলেও আখেরাতের তুলনায় এটা অতি নগণ্য জিনিস। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা যে এভাবে নিজেদের কথাকে আল্লাহ্র কথা বলে জনগণের কাছে স্বীকৃতি নিচ্ছে এবং ওর বিনিময়ে দুনিয়া কামাচ্ছে,এর ফলে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

৮০। এবং তারা বলে– নির্ধারিত দিবসসমূহ ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না; তুমি বল– তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছো যে, পরে আল্লাহ কখনই স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করবেন না? অথবা আল্লাহ সম্বন্ধে যা জানো না তোমরা তাই বলছো?

٨٠- وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইয়াহূদীরা বলতোঃ "পৃথিবীর মোট সময়কাল হচ্ছে সাত হাজার বছর। প্রতি হাজার বছরের পরিবর্তে আমাদের একদিন শাস্তি হবে। তা হলে আমাদেরকে মাত্র সাত দিন জাহান্নামে থাকতে হবে।" তাদের এ কথাকে খণ্ডন করতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কারও কারও মতে তারা চল্লিশ দিন দোযখে থাকবে বলে ধারণা করতো। কেননা, তাদের পূর্বপুরুষরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাছুরের পূজা করেছিল। কারও কারও মতে তাদের এই ধারণা হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাওরাতে আছেঃ " দোযখের দুই ধারের 'যাক্কুম' নামক বৃক্ষ পর্যন্ত চল্লিশ দিনের পথ"–তাই তারা বলতো যে, এ সময়ের পরে শাস্তি উঠে যাবে।

একটি বর্ণনায় আছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বলেঃ "চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমরা দোযখে অবস্থান করবো, অতঃপর অন্যেরা আমাদের জায়গায় এসে যাবে। অর্থাৎ আপনার উম্মত।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদের মাথায় হাত রেখে বলেনঃ 'না, বরং তোমরা চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে।' সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, খাইবার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশ্ত 'হাদিয়া' স্বরূপ আসে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমাদের বাপ কে?' তারা বলেঃ 'অমুক।' তিনি বলেনঃ 'তোমরা মিথ্যা বলছো, তোমাদের বাপ অমুক।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ 'আমি তোমাদেরকে কতকগুলো প্রশ্ন করবো, তোমরা ঠিক ঠিক উত্তর দেবে তো?' তারা বলেঃ 'হাঁ, হে আবুল কাসিম (সঃ)! আমরা যদি মিথ্যে বলি তবে আপনি জেনে ফেলবেন যেমন আমাদের বাপের ব্যাপারে জেনে ফেলেছেন।' তখন তিনি বলেনঃ "আচ্ছা বল তো দোযখী কারা?' তারা বলেঃ 'কিছু দিন তো আমরা দোযখে অবস্থান করবো, অতঃপর আপনার উম্মত আমাদের স্থলে অবস্থান করবে।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্র শপথ! তখনও আমরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ 'আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, তোমরা সত্য বলবে তো?' তারা বলেঃ 'হাঁ, হে আবুল কাসিম (সঃ)! তিনি বলেনঃ 'তোমরা কি এতে (গোশতে) বিষ মিশিয়েছো?' তারা বলেঃ 'হাঁ।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'কেন?' তারা বলেঃ 'এই জন্যে যে, যদি আপনি সত্যবাদী হন তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করবে না, আর যদি মিথ্যেবাদী হন, তবে আমরা আপনা হতে শান্তি লাভ করবো। (মুসনাদ-ই-আহমাদ, সহীহ বুখারী, সুনান-ই- নাসাঈ)।

---

৮১। হাঁ, যে ব্যক্তি অনিষ্ট অর্জন করেছে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে, বস্তুতঃ তারাই অগ্নির অধিবাসী, তথায় তারা সদা অবস্থান করবে।

৮১- بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮২। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকার্য করেছে তারাই বেহেশ্তবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

৮২- وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝

ভাবার্থ এই যে, যার কর্ম সবই মন্দ, যার মধ্যে পুণ্যের লেশ মাত্র নেই সে দোযখী, পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) উপর ঈমান এনেছে এবং সুন্নাহ্ অনুযায়ী কাজ করেছে সে জান্নাতবাসী। যেমন অন্যস্থানে আছেঃ "না তোমাদের কোন অভিসন্ধি চলবে, না আহ্লে কিতাবের। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে এবং তার জন্যে আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। আর মু'মিন নর বা নারীর মধ্যে যারা ভাল কাজ করবে তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে এবং বিন্দুমাত্র জুল্ম করা হবে না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কাজের অর্থ কুফরী। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে 'শির্ক'। আবূ অয়েল (রঃ), আবূল 'আলিয়া (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) কাতাদাহ্ (রঃ) এবং রাবী 'বিন আনাস (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ হতেও এটা বর্ণিত আছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, মন্দ কাজের অর্থ হচ্ছে 'কবিরা গুনাহ' যা স্তর স্তর হয়ে অন্তরের অবস্থা খারাপ করে দেয়।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ শিরক, যা অন্তরকে অধিকার করে বসে। হযরত রাবী' বিন খাসিম (রঃ)-এর মতে এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পাপের অবস্থাতেই মরে এবং তাওবা করার সুযোগ লাভ করে না। মুসনাদ-ই-আহমাদে হাদীস আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা পাপকে ছোট মনে করো না, এগুলো জমা হয়ে মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। তোমরা কি দেখনা যে, কতকগুলো লোক একটি করে খড়ি নিয়ে আসলে খড়ির একটি স্তূপ হয়ে যায়। অতঃপর ওতে আগুন ধরিয়ে দিলে ওটা বড় বড় জিনিসকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়?" অতঃপর ঈমানদারগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা কুফরীর মুকাবিলায় ঈমান আনে এবং অসৎ কাজের মুকাবিলায় সৎকার্য করে, তাদের জন্যে চিরস্থায়ী আরাম ও শান্তি। তারা শান্তিদায়ক বেহেশ্তের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি ও শান্তি উভয়ই চিরস্থায়ী।

৮৩। আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করবে না। এবং পিতা মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, পিতৃহীনদের ও মিসকীনদের সঙ্গেও (সদ্ব্যবহার করবে), আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত প্রদান করবে; তৎপর তোমাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে, যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে।

٨٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

## বানী ইসরাঈলের নিকট হতে কতকগুলো প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও তার বিস্তারিত বিবরণ

বানী ইসরাঈলের উপর যে নির্দেশাবলী রয়েছে এবং তাদের নিকট হতে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আলোচনা করা হচ্ছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহ্র একত্ববাদ মেনে নেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা না করে। শুধু মাত্র বানী ইসরাঈলই নয়, বরং সমস্ত মাখলূকের প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ "সব রাসূলকেই আমি এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন ঘোষণা করে দেয় আমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউই নেই,সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।" তিনি আরও বলেছেনঃ "এবং আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি (তারা মানুষকে বলেছে) যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য বাতিল মা'বুদ হতে বেঁচে থাকো।" সবচয়ে বড় হক আল্লাহ তা'য়ালারই, এবং তাঁর যতগুলো হক আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই যে, তাঁরই ইবাদত করা হবে এবং তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদত করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলার হকের পর এখন বান্দাদের হকের কথা বলা হচ্ছে। বান্দাদের মধ্যে মা-বাপের হক সবচেয়ে বড় বলে প্রথমে ওরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং মা-বাপের প্রতিও এহসান কর।" অন্যত্র তিনি বলেনঃ "তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত এই যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না এবং মা-বাপের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! সর্বোত্তম আমল কোন্টি?' তিনি বলেনঃ "নামাযকে সময় মত আদায় করা।" জিজ্ঞেস করেনঃ 'তার পর কোন্টি? তিনি বলেনঃ 'মা-বাপের খিদমত করা।" জিজ্ঞেস করেনঃ "এরপর কোন্টি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।'

আর একটি সহীহ হাদীসে আছে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমি কার সাথে সৎ ব্যবহার করবো?' তিনি বলেনঃ 'তোমার মায়ের সঙ্গে।' লোকটি জিজ্ঞেস করেনঃ 'তারপরে কার সঙ্গে?' তিনি বলেনঃ 'তোমার মায়ের সঙ্গে।' আবার জিজ্ঞেস করেনঃ 'তারপর কার সঙ্গে?' তিনি বলেনঃ 'তোমার বাপের সঙ্গে এবং তারপরে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে।'

এ আয়াতে لَا تَعْبُدُوْنَ বলেছেন, কেননা لَا تَعْبُدُوْا অপেক্ষা এতে গুরুত্ব বেশী আছে। কেউ কেউ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا ও পড়েছেন। হযরত উবাই (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা لَا تَعْبُدُوْا পড়েছেন। يَتِيْمٌ সেই ছোট ছেলেকে বলা হয় যার পিতা নেই। مِسْكِيْنٌ ঐ সব লোককে বলা হয় যারা নিজের ও স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের খাওয়া পরার খরচ চালাতে পারে না। এরপূর্ণ ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ্ সূরা-ই-নিসার মধ্যে এর অর্থের আয়াতে আসবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "সর্বসাধারণের সাথে উত্তম রূপে কথা বল"। অর্থাৎ তাদের সাথে নম্রভাবে ও হাসিমুখে কথা বল। তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দাও ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ। যেমন হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "এর ভাবার্থ হচ্ছে- তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ। আর সহনশীলতা, ক্ষমা ও অপরাধ মাফ করার নীতি গ্রহণ কর। এটাই উত্তম চরিত্র যা গ্রহণ করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "ভাল জিনিসকে ঘৃণা করো না, কিছু করতে না পারলেও অন্ততঃ তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ কর"। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)। সুতরাং আল্লাহ্ প্রথমে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দেন, অতঃপর পিতা মাতার খিদমত করা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি সুনজর দেয়া এবং জনসাধারণের সাথে উত্তমরূপে কথা বলা ইত্যাদির নির্দেশ দেন। এরপর কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও আলোচনা করেন। যেমন বলেনঃ 'নামায পড়, যাকাত দাও।' তারপর এ সংবাদ দেন যে, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং অল্প লোক ছাড়া তাদের অধিকাংশই অবাধ্য হয়ে যায়। এ উম্মতকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর,তাঁর সঙ্গে অন্যকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে, আত্মীয়দের সঙ্গে, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সঙ্গে, নিকটতম প্রতিবেশীর সঙ্গে, দূরবর্তী প্রতিবেশীর সঙ্গে, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে, মুসাফিরদের সঙ্গে এবং দাস দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। মনে রেখো যে, আল্লাহ আত্মম্ভরী অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'

এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এ সব নির্দেশ মানার ব্যাপারে এবং ওর উপর আমল করার ব্যাপারে অনেক বেশী দৃঢ় প্রমাণিত হয়েছে।

অদাআহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইয়াহূদীও খ্রীষ্টানদেরকে সালাম দিতেন এবং এর দলীল রূপে আল্লাহ্র এ নির্দেশটি পেশ করতেনঃ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا অর্থাৎ 'তোমরা জন সাধারণের সাথে উত্তমরূপে কথা বলবে।' কিন্তু এ বর্ণনাটি গরীব এবং হাদীসের উল্টো। হাদীসে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে যে, তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে প্রথমতঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলবে না। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

---

৮৪। এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করছিলাম যে, পরস্পর শোণিতপাত করবে না এবং স্বীয় বাসস্থান হতে আপন ব্যক্তিদেরকে বহিষ্কৃত করবে না; তৎপরে তোমরা স্বীকৃত হয়েছিলে এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ছিলে।

٨٤- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৮৫। অনন্তর সেই তোমরাই তোমাদের ব্যক্তিদেরকে হত্যা করছো এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক দলকে তাদের গৃহ হতে বহিষ্কৃত করে দিচ্ছ, তাদের প্রতি শত্রুতাবশতঃ অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য করছ। এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান কর; অথচ তাদেরকে বহিষ্কৃত করা তোমাদের জন্যে অবৈধ; তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর ও কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই। এবং উত্থান দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছো আল্লাহ্ তদ্বিষয়ে অমনোযোগী নন।

٨٥- ثُمَّ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ
أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا
مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ
عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ
يَّأْتُوْكُمْ أُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ
وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ
مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا
خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰٓى أَشَدِّ
الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ○

৮৬। এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; অতএব তাদের দণ্ড লঘু হবে না ও তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

٨٦- أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنْصَرُوْنَ ○ ع

## মদীনার দু'টি বিখ্যাত গোত্র এবং তাদের পরস্পর শত্রুতা

মদীনার আনসারদের দু'টি গোত্র ছিলঃ (১) আউস ও (২) খাযরায। ইসলামের পূর্বে এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কখনও কোন মিল ছিল না। পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো। মদীনার ইয়াহূদীদের তিনটি গোত্র ছিলঃ (১) বানূ কাইনুকা, (২) বানু নাযীর এবং (৩) বানূ কুরাইযা। বানূ কাইনুকা ও বানূ নাযীর খাযরাজের পক্ষপাতী ছিল এবং তাদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। আর বানূ কুরাইযার বন্ধুত্ব ছিল আউসের সঙ্গে। আউস ও খাযরাযের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হতো তখন ইয়াহূদীদের তিনটি দল নিজ নিজ মিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। দুই পক্ষের ইয়াহূদী স্বয়ং তাদেরই হাতে মারাও পড়তো এবং সুযোগ পেলে একে অপরের ঘর বাড়ী ধ্বংস করতো এবং দেশ থেকে তাড়িয়েও দিতো। ধন-মালও দখল করে নিতো। অতঃপর যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে পরাজিত দলের বন্দীদেরকে তারা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিতো এবং বলতোঃ "আমাদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ আছে যে, আমাদের মধ্যে যদি কেউ বন্দী হয়ে যায় তবে আমরা যেন তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেই। তারই উত্তরে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে বলছেনঃ "এর কারণ কি যে, আমার এ হুকুম তো মানছো, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমরা পরস্পর কাটাকাটি করো না, একে অপরকে বাড়ী হতে বের করে দিও না, তা মাননা কেন? এক হুকুমের উপর ঈমান আনা এবং অন্য হুকুমকে অমান্য করা, এটা আবার কোন ঈমানদারী?" আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ "নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করো না, নিজেদের লোককে তাদের বাড়ী হতে বের করে দিও না। কেননা তোমরা এক মাযহাবের লোক এবং সবাই এক আত্মার মত।"

হাদীস শরীফেও আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সমস্ত মু'মিন পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া ও সাহায্য-সহানুভূতি করার ব্যাপারে একটি শরীরের মত। কোন একটি অঙ্গের ব্যথায় সমস্ত শরীর অস্থির হয়ে থাকে, শরীরে জ্বর চলে আসে এবং রাত্রে নিদ্রা হারিয়ে যায়।" এরকমই একজন সাধারণ মুসলমানের বিপদে সারা বিশ্ব জাহানের মুসলমানদের অস্থির হওয়া উচিত।

আব্দ খায়ের (রাঃ) বলেনঃ "আমরা সালমান বিন রাবী'র নেতৃত্বে 'লালজারে' জিহাদ করছিলাম। ওটা অবরোধের পর আমরা ঐ শহরটি দখল করি। ওর মধ্যে কিছু বন্দীও ছিল। এদের মধ্যে একটি ক্রীতদাসীকে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ) সাতশো তে কিনে নেন। রাসূল জালুতের নিকট পৌঁছে হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)তার নিকট গমন করেন এবং তাকে বলেনঃ "দাসীটি তোমার ধর্মের নারী। আমি একে সাত শোর বিনিময়ে কিনেছি। এখন তুমি তাকে কিনি আযাদ করে দাও।" সে বলেঃ 'খুব ভাল কথা, আমি চৌদ্দশো দিচ্ছি।' তিনি বলেনঃ 'আমি চার হাজারের কমে একে বেচবো

না। তখন সে বলেঃ 'তাহলে আমার কেনার প্রয়োজন নেই।' তিনি বলেনঃ 'একে ক্রয় কর,নতুবা তোমার ধর্ম চলে যাবে। তাওরাতে লিখিত আছে–বানী ইসরাঈলের কোন একটি লোকও যদি বন্দী হয়ে যায় তবে তাকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। সে যদি বন্দী অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে তবে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নাও এবং বাস্তুহারা করো না। এখন হয় তাওরাতকে মেনে তাকে ক্রয় কর,আর না হয় তাওরাতকে অস্বীকার কর।' সে বুঝে নেয় এবং বলেঃ 'তুমি কি আবদুল্লাহ বিন সালাম?' তিনি বলেনঃ 'হাঁ'। সুতরাং সে চার হাজার নিয়ে আসে। তিনি দু'হাজার তাকে ফেরত দেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, রাসূল জালুত কুফায় ছিল। আরবের স্ত্রী লোক ছাড়া সে অন্য কারও মুক্তিপণ দিতো না। কাজেই আবদুল্লাহ বিন সালাম তাকে তাওরাতের এ আয়াতটি শুনিয়ে দেন। মোট কথা, কুরআন মাজীদের এ আয়াতটিতে ইয়াহূদীদেরকে নিন্দে করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী জানা সত্ত্বেও তাকে পৃষ্ঠের পিছনের নিক্ষেপ করেছে। আমানতদারী ও ঈমানদারী তাদের মধ্যে লোপ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলী, তাঁর নির্দেশাবলী, তাঁর জন্ম স্থান, তাঁর হিজরতের স্থান ইত্যাদি সব কিছুই তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এ সবগুলোই তারা গোপন করে রেখেছে। শুধু এটুকুই নয়, বরং তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এরই কারণে তাদের উপর ইহলৌকিক লাঞ্ছনা এসেছে এবং পরকালেও তাদের জন্যে চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তি রয়েছে।

---

৮৭। এবং অবশ্যই আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি ও তৎপরে ক্রমান্বয়ে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি; এবং আমি মরিয়াম নন্দন ঈসাকে নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম এবং পবিত্র আত্মা যোগে তাকে শক্তি সম্পন্ন করেছিলাম; কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল–তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছে করতো না, তা নিয়ে উপস্থিত হলো তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে একদলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।

٨٧- وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ
وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا
تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

এখানে বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, অহংকার এবং প্রবৃত্তি পূজার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা তাওরাতের পরিবর্তন সাধন করলো, হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে তাঁর শরীয়ত নিয়ে অন্য যে সব নবী (আঃ) আসলেন তাঁদের তারা বিরোধিতা করলো। আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে হিদায়াত আছে ও নূর রয়েছে, যা মোতাবেক নবীগণ ও মুসলমানগণ ইয়াহূদীদেরকে নির্দেশ প্রদান করতো এবং তাদের আলেম ও দরবেশগণও তাদেরকে ওটা মানবার নির্দেশ দিতো।'

মোট কথা-ক্রমান্বয়ে নবীগণ (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে আসতে থাকেন এবং হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করা হয়। এর মধ্যে কতকগুলো নির্দেশ তাওরাতের বিপরীতও ছিল। এজন্যেই তাঁকে নতুন নতুন মু'জিযাও দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করা,মাটি দ্বারা পাখী তৈরী করে ওর মধ্যে ফুঁ দিয়ে আল্লাহ্র হুকুমে তাকে উড়িয়ে দেয়া, আল্লাহ্র হুকুমে কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, তাঁর হুকুমে কতকগুলো ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা ইত্যাদি। অতঃপর মহান আল্লাহ হযরত ঈসার সহায়তার জন্যে 'রূহুল কুদ্স' অর্থাৎ হযরত জীবরাঈল (আঃ) কে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বানী ইসরাঈলের মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও অহংকার আরও বেড়ে যায় এবং তারা হিংসা করতে থাকে। আর তারা নবী (আঃ)-এর সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করতে থাকে। কোন কোন নবীকে তারা মিথ্যাবাদী বলে, আবার কোন কোন নবীকে তারা হত্যা করে ফেলে। এর কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে,নবীদের শিক্ষা তাদের প্রবৃত্তি ও মনের উল্টো ছিল। তাঁরা তাদেরকে তাওরাতের ঐ নির্দেশাবলী মেনে চলতে বলতেন, যা তারা পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এজন্যেই তারা তাঁদের শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে যেতো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মদ বিন কা'ব (রাঃ), ইসমাঈল বিন খালিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), আতিয়্যাতুল আওফী (রঃ) এবং কাতাদাহ (রঃ) প্রভৃতি মনীষীবর্গের এটাই অভিমত যে, রূহুল কুদ্সের ভাবার্থ হচ্ছে হযরত জিবরাঈল (আঃ)। কুরআন মাজীদের এক স্থানে আছেঃ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ অর্থাৎ 'তা নিয়ে রূহুল আমীন অবতীর্ণ হতো।' (২৬ঃ ১৯৩)

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত হাসসান কবির (রাঃ) জন্যে মসজিদে একটি মিম্বর রাখেন। তিনি মুশরিকদের ব্যঙ্গ কবিতার উত্তর দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর জন্যে প্রার্থনা করতেনঃ 'হে আল্লাহ্! আপনি রূহুল কুদ্স দ্বারা হাস্সান (রাঃ)-কে সাহায্য করুন। সে আপনার নবীর (সঃ) পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আর একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ফারূকের (রাঃ) খিলাফতের আমলে একদা হযরত হাস্সান (রাঃ) মসজিদে নববীতে (সঃ) কতকগুলো কবিতা পাঠ করছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বলেনঃ "আমি তো ঐ সময়েও এখানে এ কবিতাগুলো পাঠ করতাম, যখন এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকতেন।' অতঃপর তিনি হযরত আবূ হুরাইরাকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলেনঃ ' হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! আল্লাহ্র শপথ করে বলুনতো, আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)কে একথা বলতে শুনেননি? 'হাস্সান (রাঃ) মুশরিকদের কবিতার উত্তর দিয়ে থাকে, হে আল্লাহ! রূহুল কুদুস দ্বারা তাকে সাহায্য করুন?' হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তখন বলেনঃ 'আল্লাহ্র কসম! আমি শুনেছি।'

কোন কোন বর্ণনায় এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলতেনঃ 'হে হাস্সান (রাঃ)! তুমি মুশকিরদেরকে ব্যঙ্গ কর। হযরত জিবরাঈলও (আঃ) তোমার সঙ্গে আছেন।' হযরত হাস্সানের (রাঃ) কবিতার মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে রূহুল কুদুস বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে রূহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ 'তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি যে, তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ স্মরণ করে বল তো তিনি যে হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)তা কি তোমরা জান না?' তারা সবাই তখন বলেঃ হাঁ, নিশ্চয়ই'।-(ইবনে ইসহাক)

ইবনে হিব্বানের (রঃ) গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জিবরাঈল (আঃ) আমার অন্তরে বলেনঃ 'কোন লোকই স্বীয় আহার্য ও জীবন পুরো করা ছাড়া মরে না। আল্লাহ্কে তোমরা ভয় কর এবং দুনিয়া কামানোর ব্যাপারে দ্বীনের প্রতি লক্ষ্য রেখো'।" কেউ কেউ রূহুল কুদুস অর্থ 'ইসমে আযম' ও নিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, 'রূহুল কুদুস' হচ্ছেন ফেরেশতাদের একজন সরদার ফেরেশতা। কেউ বলেন যে, 'কুদুস'-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা এবং রূহের অর্থ জিবরাঈল (আঃ)। আবার কেউ বলেছেন যে, 'কুদুস' এর অর্থ 'বরকত' এবং কেউ বলেছেন 'পবিত্র'। কেউ কেউ বলেছেন যে, রূহ এর ভাবার্থ হচ্ছে ইঞ্জিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا

অর্থাৎ 'এভাবেই আমি আমার হুকুম দ্বারা তোমার কাছে রূহের ওয়াহী করেছি।' (৪২ঃ ৫২) ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর স্থির সিদ্ধান্ত এটাই যে, এখানে 'রুহুল কুদুস' এর ভাবার্থ হযরত জিবরাঈল (আঃ) হবেন।

এই আয়াতের 'রূহুল কুদুস' দ্বারা সাহায্য করার বর্ণনার সাথে সাথে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখানোরও বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ওটা এক জিনিস এবং ওগুলো অন্য জিনিস। রচনা রীতিও এটার অনুকূলে রয়েছে। 'কুদুস' এর ভাবার্থ হচ্ছে মুকাদ্দাস, যেমন حَاتِمٍ جُوْدٍ এবং رَجُلٍ صَادِقٍ এর মধ্যে। رُوْحُ الْقُدُسِ ও رُوْحٌ مِّنْهُ বলার মধ্যে নৈকট্য ও মাহাত্ম্যের একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে। এটা এজন্যও বলা হয়েছে।

কোন কোন মুফাস্সির 'রূহ' দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর 'রূহ' অর্থ নিয়েছেন। কেননা, তাঁর রূহ মানুষের পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'এক দলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো ও একটি দলকে হত্যা করছো।' মিথ্যাবাদী বলার ব্যাপারে مَاضِيٌ –এর রূপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং হত্যার ব্যাপারে مُسْتَقْبِلٌ এর রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও তাদের অবস্থা এরূপই ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যু যন্ত্রণার সময় বলেছিলেনঃ 'সেই বিষ মিশ্রিত গ্রাস বরাবরই আমার উপর ক্রিয়াশীল ছিল এবং এখনতো এটা আমার গিরা কেটে দিয়েছে।'

---

৮৮। এবং তারা বলে যে, আমাদের হৃদয় আবৃত, বরং তাদের অবিশ্বাসের জন্যে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন–যেহেতু তারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে।

٨٨- وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

---

ইয়াহূদীরা এ কথাও বলতো যে, তাদের অন্তরের উপর আচ্ছাদন রয়েছে। অর্থাৎ ওটা জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে, সুতরাং এখন আর তাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। উত্তরে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এটা নয়, রবং তাদের অন্তরেরর উপর আল্লাহর লা'নতের মোহর লেগে গেছে। তাদের ঈমান লাভের সৌভাগ্যই হয় না। غُلْفٌ শব্দটিকে غُلُوْفٌ ও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ 'ইলমের বরতন।' কুরআন পাকের অন্য জায়গায় আছেঃ 'তোমরা যে জিনিসের দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছো ওটা হতে আমাদের অন্তর পর্দার আড়ালে রয়েছে।' ওর উপর মোহর লেগে রয়েছে, ওটা (অন্তর) এটা বুঝে না, ওর প্রতি আসক্তও হয় না, ওকে স্মরণও রাখে না।' একটি হাদীসের মধ্যেও আছে যে, কতক অন্তর আচ্ছাদনী যুক্ত রয়েছে, যার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ থাকে, এ রকম অন্তর কাফিরদের হয়ে থাকে।

সূরা নিসার মধ্যেও এ অর্থের একটি আয়াত আছে। অল্প ঈমান রাখার একটি অর্থ তো এই যে, তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই ঈমানদার আছে। আর দ্বিতীয় অর্থ এটাও হয় যে, তাদের ঈমান খুবই অল্প। অর্থাৎ যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে তারা কিয়ামত, পুণ্য, শাস্তি ইত্যাদির উপর ঈমান রাখে, তাওরাতকে আল্লাহ্র কিতাব বলে মেনে থাকে। কিন্তু শেষ নবী (সঃ)-এর উপর ঈমান এনে তাদের ঈমানকে পূর্ণ করে না, বরং তাঁর সঙ্গে কুফরী করতঃ ঐ অল্প ঈমানকেও নষ্ট করে থাকে।

তৃতীয় অর্থ এই যে, তারা সরাসরি বেঈমান। কেননা, আরবী ভাষায় এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ না হওয়ার অবস্থাতেও এরকম শব্দ আনা হয়ে থাকে। যেমন 'আমি এরকম লোক খুব কমই দেখেছি , অর্থাৎ মোটেই দেখিনি। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

৮৯। এবং যখন আল্লাহ্র সন্নিধান হতে তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদক গ্রন্থ উপস্থিত হলো, এবং পূর্ব হতেই তারা কাফিরদের নিকট তা বর্ণনা করতো, অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব আসলো, তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসলো, সুতরাং এরূপ কাফিরদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক।

٨٩- وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

## ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে অপেক্ষমান ছিল

যখন ইয়াহূদী ও আরবের মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ বাধতো তখন ইয়াহূদীরা কাফিরদেরকে বলতোঃ 'অতি সত্তরই একজন বড় নবী (সঃ) আল্লাহ্র সত্য কিতাব নিয়ে আবির্ভূত হবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো যে, তোমাদের নাম ও নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে।' তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতোঃ 'হে আল্লাহ! আপনি অতি সত্তরই ঐ নবীকে পাঠিয়ে দিন যাঁর গুণাবলী আমরা তাওরাতে পাচ্ছি,

যাতে আমরা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর সঙ্গ লাভ করতঃ আমাদের বাহু মজবুত করে আপনার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারি।' তারা কাফিরদেরকে বলতো যে, ঐ নবীর (সঃ) আগমনের সময় খুবই নিকটবর্তী হয়েছে। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রেরিত হলেন তখন তারা তাঁর মধ্যে সমস্ত নিদর্শন দেখতে পেল, তাঁকে চিনতে পারলো এবং মনে মনে বিশ্বাস করলো। কিন্তু যেহেতু তিনি আরবদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে বসলো। ফলে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসলো। বরং মদীনার মুশরিকগণ, যাঁরা তাদের মুখেই একথা শুনে আসছিল তারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী হয়ে তাঁরাই ইয়াহূদীদের উপর বিজয় লাভ করেন।

একদা হযরত মুআ'য বিন জাবাল (রাঃ), হযরত বাসার বিন বারা' (রাঃ) এবং হযরত দাউদ বিন সালমা রাঃ) মদীনার ঐ ইয়াহূদীদেরকে বলেই ফেলেনঃ 'তোমরাই তো আমাদের শির্কের অবস্থায় আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নবুওয়াতের আলোচনা করতে; বরং আমাদেরকে ভয়ও দেখাতে, তাঁর যে গুণাবলী তোমরা বর্ণনা করতে তা সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে। তবে স্বয়ং তোমরাই ঈমান আনছো না কেন? তাঁর সঙ্গী হচ্ছো না কেন?' তখন সালামা বিন মুশ্কিম উত্তর দেয়ঃ 'আমরা তাঁর কথা বলতাম না।' এ আয়াতের মধ্যে তারই বর্ণনা রয়েছে যে,তারা প্রথম হতেই মানতো,অপেক্ষমানও ছিল, কিন্তু তাঁর আগমনের পর হিংসা ও অহংকার বশতঃ এবং শাসন ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বসে।

৯০। তারা নিজ জীবনের জন্যে যা ক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যেহেতু আল্লাহ তাঁর দাসগণের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ অবতারণ করেন– এহেতু আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা বিদ্রোহ বশতঃ তা অবিশ্বাস করছে, অতঃপর তারা কোপের পর কোপে পতিত হয়েছে, এবং কাফিরদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি রয়েছে।

٩٠- بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

## অভিশাপের উপর অভিশাপ

ভাবার্থ এই যে,ঐ ইয়াহূদীরা–যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা স্বীকারের পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে কুফরী করে, তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করে; আর এর কারণে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র যে রোষানলে নিক্ষেপ করেছে তা অত্যন্ত জঘন্য জিনিস, যা তারা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে গ্রহণ করেছে। ওর কারণ শুধুমাত্র হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার ও অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মধ্য হতে না হয়ে আরবদের মধ্য হতে হয়েছিলেন বলেই তারা মুখ তুলে বসে পড়ে। অথচ আল্লাহ্র উপরে পরম বিচারক আর কেউ নেই। রিসালাতের হকদার কে তা তিনি ভালভাবেই জানেন। তিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তাকেই দিয়ে থাকেন। সুতরাং এক তো তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য না করার কারণে তাদের উপর আল্লাহ্র গযব ছিলই, এখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে অস্বীকার করার কারণে তাদের উপর দ্বিতীয় গযব নেমে আসে। কিংবা এটাও হতে পারে যে, প্রথম গযব হয় হযরত ঈসা (আঃ)কে না মানার কারণে এবং দ্বিতীয় গযব হয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে না মানার কারণে। অথবা প্রথম গযব হয় বাছুর পূজার কারণে এবং দ্বিতীয় গযব হয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে।

তারা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং এ হিংসা বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ তাদের অংহকার। এ জন্যেই তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছিল, যেন পাপের পূর্ণ প্রতিদান হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ 'নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার করে তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে মানুষের আকারে পিঁপড়ার ন্যায় উঠানো হবে, তাদেরকে সমস্ত জিনিস দলিত মথিত করে চলে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের 'বূস' নামক কয়েদখানার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে– যে স্থানের আগুন অন্য আগুন অপেক্ষা অধিক তাপ বিশিষ্ট হবে। আর তাদেরকে জাহান্নামের রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি পান করানো হবে।'

৯১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে– যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাই বিশ্বাস করি, এবং তাছাড়া যা রয়েছে তা তারা অবিশ্বাস করে, অথচ এটা সত্য,তাদের সাথে যা আছে এটা তারই সত্যতা প্রতিপাদক; তুমি বল– যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে, তবে ইতিপূর্বে কেন আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করেছিলে?

٩١- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯২। এবং নিশ্চয়ই মূসা (আঃ) উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল, অনন্তর তোমরা তার পরে গোবৎস গ্রহণ করেছিলে, যেহেতু তোমরা অত্যাচারী ছিলে।

٩٢- وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

অর্থাৎ যখন তাদেরকে কুরআন কারীমের উপর ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর ঈমান আনতে বলা হয় তখন তারা বলে– 'তাওরাতের উপর ঈমান আনাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তারা তাদের এ কথায় মিথ্যাবাদী। কুরআন কারীম তো পূর্বের সমস্ত কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর স্বয়ং তাদের কিতাবেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আছেঃ 'আহ্লে কিতাব তাঁকে (মুহাম্মদ সঃ কে) এভাবেই চেনে যেমন চেনে তারা তাদের সন্তান সন্ততিকে।' সুতরাং তাঁকে অস্বীকার করার ফলে তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপরও তাদের ঈমান রইল না। এ দলীল কায়েম করার পর অন্যভাবে দলীল কায়েম করা হচ্ছে যে, তারা যদি তাদের কথায় সত্যবাদী হয় তবে যে সব নবী নতুন কোন শরীয়ত ও কিতাব না এনে পূর্ব নবীদেরই অনুসারী হয়ে তাঁদের নিকট এসেছিলেন, তারা তাঁদেরকে হত্যা করেছিল কেন? তাহলে প্রমাণিত হলো যে, তাদের ঈমান কুরআন মাজীদের উপরও নেই এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপরও নেই।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, হযরত মূসা (আঃ) হতে তো তারা বড় বড় মু'জেযা প্রকাশ পেতে দেখেছে, যেমন তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি তাঁর বদ দু'আর কারণে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া লাঠির সাপ হওয়া, হাত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় হওয়া, মেঘের ছায়া করা, 'মান্না ও সালওয়া' অবতারিত হওয়া এবং পাথর হতে নদী প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি বড় বড় অলৌকিক ঘটনাবলী–যা হযরত মুসার (আঃ) নুবুওয়াতের ও আল্লাহ্র একত্ববাদের জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল এবং ওগুলো তারা স্বচক্ষে দেখেছিল। অথচ হযরত মূসার (আঃ) তূর পাহাড়ে গমনের পরই তারা বাছুরকে তাদের উপাস্য বানিয়ে নেয়। তা হলে তাওরাতের উপর ও স্বয়ং হযরত মূসার (আঃ) উপর তাদের ঈমান থাকলো কোথায়?

এসব অসৎ ও অপরাধমূলক কার্যের ফলে তারা কি অনাচারী ও অত্যাচারীরূপে প্রমাণিত হচ্ছে না? مِنْ بَعْدِهٖ হতে ভাবার্থ হচ্ছে 'হযরত মূসার (আঃ) তুর পাহাড়ে যাওয়ার পর।' যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ 'মূসার (আঃ) তূরে যাওয়ার পর তাঁর সম্প্রদায় বাছুরকে তাদের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল এবং ঐ গো পূজার কারণে তারা তাদের নফসের উপর স্পষ্ট জুলুম করেছিল। পরে এ অনুভূতি তাদেরও হয়েছিল। যেমন আল্লাহপাক বলেনঃ 'যখন তাদের জ্ঞান ফিরলো তখন তারা লজ্জিত হলো এবং নিজেদের ভ্রান্তি অনুভব করলো। সে সময় তারা বললো– হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাদের প্রতি সদয় না হন এবং আমাদের পাপ ক্ষমা না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।'

---

৯৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম যে, আমি যা প্রদান করলাম তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর– তারা বলেছিল, আমরা শুনলাম ও অগ্রাহ্য করলাম; এবং তাদের অবিশ্বাসের নিমিত্ত তাদের অন্তরসমূহে গো-বৎস প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল; তুমি বল–যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের বিশ্বাস যা কিছু আদেশ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

٩٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের পাপ, বিরোধিতা, অবাধ্যতা এবং সত্য হতে ফিরে যাওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তূর পাহাড়কে যখন তারা তাদের মাথার উপর দেখলো তখন সব কিছু স্বীকার করে নিলো। কিন্তু যখনই পাহাড় সরে গেল তখনই তারা অস্বীকার করে বসলো। এর তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে। বাছুরের প্রেম তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'কোন জিনিসের ভালবাসা মানুষকে অন্ধ বধির করে দেয়।'

হযরত মূসা (আঃ) ঐ বাছুরটিকে কেটে টুকরা টুকরা করে পুড়িয়ে ফেলেন এবং ওর ছাই নদীতে ফেলে দেন। অতঃপর বানী ইসরাঈল নদীর পানি পান করলে তাদের উপর ওর ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাছুরটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয় বটে; কিন্তু তাদের অন্তরের সম্পর্ক ঐ বাতিল মা'বুদের সঙ্গে থেকেই যায়। দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ এই যে, তারা কিরূপে ঈমানের দাবি করছে? তারা কি তাদের ঈমানের প্রতি লক্ষ্য করছে না? বার বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা কি তারা ভুলে গেছে? হযরত মূসা (আঃ)-এর সামনে তারা কুফরী করেছে, তাঁর পরবর্তী নবীদের সাথে তারা শয়তানী করেছে, এমনকি সর্বশেষ ও সর্বোত্তম নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়াতকেও তারা অস্বীকার করেছে। এর চেয়ে বড় কুফরী আর কি হতে পারে?

---

٩٤- قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৯৪। তুমি বল- যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٩٥- وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৯৫। এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তজ্জন্যে তারা কখনই তা কামনা করবে না; এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন।

৯৬। এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু আকাংখী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে সে যেন হাজার বছর আয়ু প্রদত্ত হয়; এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবে না এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিদর্শক।

৯٦- وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সব ইয়াহূদীকে বলেনঃ ' তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসো, আমরা ও তোমরা মিলিত হয়ে আল্লাহ্র কিনট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে ধ্বংস করেন।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যদ্বাণী হয় যে, তারা কখনও এতে সম্মত হবে না। আর হলোও তাই। তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসলো না। কারণ তারা অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে ও কুরআন মজীদকে সত্য বলে জানতো। যদি তারা এ ঘোষণা অনুযায়ী মুকাবিলায় আসতো তবে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতো এবং দুনিয়ার বুকে একটি ইয়াহূদীও অবশিষ্ট থাকতো না।

একটি মারফূ' হাদীসেও রয়েছে যে, যদি ইয়াহূদীরা মুকাবিলায় আসতো এবং মিথ্যাবাদীদের জন্যে মৃত্যুর প্রার্থনা জানাতো তবে তারা সবাই মরে যেতো এবং নিজ নিজ জায়গা তারা দোযখে দেখে নিতো।

অনুরূপভাবে খ্রীষ্টানরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসেছিল, তারা যদি মুবাহালার জন্যে প্রস্তুত হতো তবে তারা ফিরে গিয়ে তাদের পরিবারবর্গের এবং ধনসম্পদের নাম নিশানাও দেখতে পেতো না। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)। তাদের দাবী ছিল যে, نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয়।' (৫ঃ ১৮) তারা বলতোঃ لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى অর্থাৎ 'ইয়াহূদী অথবা খ্রীষ্টান ছাড়া কেউ কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না।' (২ঃ ১১১) এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে (ইয়াহূদীদেরকে) বলেনঃ 'এসো এর

ফয়সালা আমরা এভাবে করি যে, আমরা দুটো দল মাঠে বেরিয়ে যাই। অতঃপর আমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন আমাদের মধ্যকার মিথ্যাবাদী দলকে ধ্বংস করে দেন।' কিন্তু এ দলটির নিজেদের মিথ্যাবাদীতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলে তারা এর জন্যে প্রস্তুত হলো না। সুতরাং তাদের মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেল।

অনুরূপভাবে নাজরানের খ্রীষ্টানেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। বহু তর্ক বিতর্কের পর তাদেরকেও বলা হয়ঃ 'এসো, আমরা নিজ নিজ সন্তান সন্ততি, স্ত্রীলোক ও নিজেরা বেরিয়ে যাই, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন মিথ্যাবাদীদের উপর তাঁর লা'নত নাযিল করেন।' কিন্তু তারা পরস্পর বলতে থাকে-'এ নবীর সঙ্গে কখনও মুকাবিলা করো না, নতুবা এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে।' সুতরাং তারা মুকাবিলা হতে বিরত হয় এবং জিযিয়া কর দিতে রাযী হয়ে সন্ধি করে নেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ্কে (রাঃ)আমীর করে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন।

এভাবেই আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যে ভ্রান্ত পথে রয়েছে, আল্লাহ তার ভ্রান্তি বাড়িয়ে দেন।' এর পূর্ণ ব্যাখ্যা এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বর্ণিত হবে। উপরের আয়াতটির তাফসীরে একটি মত এও আছে যে, যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ 'তোমরা নিজেদের জন্যে মৃত্যু যাজ্ঞা কর-কেননা, তোমাদের কথা অনুসারে পরকালের সুখ সম্ভোগ তো শুধু তোমাদের জন্যেই।' তখন তারা তা অস্বীকার করে। কিন্তু এ কথাটি মনে ধরে না। কেননা বহু ভাল লোকও বেঁচে থাকতে চায়। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যার বয়স বেশী হয় এবং আমল ভাল হয়।' সঠিক তাফসীর ওটাই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, দু'টি দল মিলিত হয়ে মিথ্যাবাদী দলের ধ্বংস ও মৃত্যুর প্রার্থনা করবে। এ ঘোষণা শোনা মাত্রই ইয়াহূদীরা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং জনগণের মধ্যে তাদের মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে যায়। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী ও সত্য প্রমাণিত হয় যে, তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না । এ মুবাহালাকে আরবী পরিভাষায় تَمَنِّى বলা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক দল বাতিল দলের জন্যে মৃত্যু কামনা করছে। আবার আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তারা মুশরিকদের চেয়ে ও বেশী দীর্ঘায়ু কামনা করে। কেননা ঐ কাফিরদের জন্যে দুনিয়াটাই বেহেশ্ত। সুতরাং তাদের চেষ্টা ও বাসনা এই যে, তারা যেন এখানে বেশী দিন থাকতে পারে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের ইহলৌকিক জীবনের লালসা কাফিরদের চেয়েও বেশী থাকে। এই ইয়াহূদীরা তো এক হাজার বছরের

আয়ু চায়। আল্লাহ পাক বলেন যে, এ হাজার বছরের আয়ুও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারবে না। কাফিরেরা তো পরকালকে বিশ্বাসই করে না, কাজেই তাদের মরণের ভয় কম; কিন্তু ইয়াহূদীদের ওর প্রতি বিশ্বাস ছিল, আবার তারা খারাপ কাজও করতো। এজন্যেই তারা মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করতো। কিন্তু ইবলীসের সমান বয়স পেলেও কি হবে? শাস্তি হতে তো বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ পাক তাদের কাজ হতে বে-খবর নন। সকল বান্দার ভাল মন্দ কাজের তিনি খবর রাখেন এবং প্রত্যেকের কর্ম অনুপাতেই প্রতিদান দেবেন।

৯৭- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

**৯৭। তুমি বল-যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে (সে রাখুক) সে আল্লাহ্র হুকুমে এ কুরআনকে তোমারা অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যে অবস্থায় তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে, পথ দেখাচ্ছে মু'মিনদের ও সুসংবাদ দিচ্ছে।**

৯৮- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

**৯৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্তাগণের, তাঁর রাসূলগণের জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু।**

ইমাম আবূ যা'ফর তাবারী (রঃ) বলেনঃ 'মুফাস্সিরগণ এতে একমত যে, যখন ইয়াহূদীরা হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে তাদের শত্রু এবং হযরত মীকাঈল (আঃ) কে তাদের বন্ধু বলেছিল তখন তাদের একথার উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, নবুওয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে তাদের যে কথোপকথন হয়েছিল তার মধ্যে তারা একথা বলেছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, হযরত উমর ফারূক (রাঃ) এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াত সম্বন্ধে তাদের যে বিতর্ক হয়েছিল তাতে তারা এ কথা বলেছিল।

## রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের উপর কতকগুলো প্রমাণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট এসে বলেঃ 'আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি যার সঠিক উত্তর নবী ছাড়া অন্য কেউই দিতে পারে না। আপনি সত্য নবী হলে এর উত্তর দিন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আচ্ছা ঠিক আছে, যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন কর। কিন্তু অঙ্গীকার কর, যদি আমি ঠিক ঠিক উত্তর দেই তবে তোমরা আমার নবুওয়াতকে স্বীকার করতঃ আমার অনুসারী হবে তো?' তারা অঙ্গীকার করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মত আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তাদের নিকট হতে পাকা ওয়াদা গ্রহণ করতঃ তাদেরকে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করেন। তারা বলেঃ 'প্রথমে এটা বলুন তো, হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজের উপরে কোন্ জিনিসটি হারাম করেছিলেন?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'শুন! যখন হযরত ইয়াকুব 'আরকুন সিনা' রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁকে এ রোগ হতে আরোগ্যদান করেন তবে তিনি উটের গোশ্ত খাওয়া ও উষ্ট্রীর দুধ পান করা পরিত্যাগ করবেন। আর এ দুটি ছিল তাঁর খুবই লোভনীয় ও প্রিয় বস্তু।'

অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে গেলে এ দুটো জিনিস নিজের উপর হারাম করে দেন। তোমাদের উপর সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, সত্য করে বলতো এটা সঠিক নয় কি?' তারা শপথ করে বলেঃ 'নিশ্চয়ই সত্য।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।'

অতঃপর তারা বলেঃ "আচ্ছা বলুন তো, তাওরাতের মধ্যে যে নিরক্ষর নবীর সংবাদ রয়েছে তাঁর বিশেষ নিদর্শন কি? আর তাঁর কাছে কোন্ ফেরেশতা ওয়াহী নিয়ে আসেন?' তিনি বলেনঃ তাঁর বিশেষ নির্দশন এই যে, যখন তাঁর চক্ষু ঘুমিয়ে থাকে তখন তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে। তোমাদেরকে সেই প্রভুর কসম, যিনি হযরত মূসা (আঃ) এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, বলতো এটা সঠিক উত্তর নয় কি?' তারা সবাই কসম করে বলে ঃ 'আপনি সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ ' হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' তারা বলেঃ 'এবার আমাদেরকে দ্বিতীয় অংশের উত্তর দিন। এটাই আলোচনার সমাপ্তি।' তিনি বলেনঃ 'আমার বন্ধু জিবরাঈলই (আঃ) আমার নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন এবং তিনিই সমস্ত নবীর নিকট ওয়াহী নিয়ে আসতেন। সত্য করে বল এবং কসম করে বল, আমার এ উত্তরটিও সঠিক নয় কি? তারা শপথ করে বলেঃ 'হাঁ, উত্তর সঠিকই বটে; কিন্তু তিনি আমাদের শত্রু। কেননা, তিনি কঠোরতা

ও হত্যাকাণ্ডের কারণসমূহ ইত্যাদি নিয়ে আসেন। এজন্যে আমরা তাঁকে মানি না এবং আপনাকেও মানবো না। তবে হাঁ, যদি আপনার নিকট আমাদের বন্ধু হযরত মীকাঈল (আঃ) ওয়াহী নিয়ে আসতেন তবে আমরা আপনার সত্যতা স্বীকার করতঃ আপনার অনুসারী হতাম।' তাদের একথার উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন বর্ণনায় এও আছে যে, তারা এটাও প্রশ্ন করেছিল ঃ 'বজ্র কি জিনিস?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'তিনি একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘের উপর নিযুক্ত রয়েছেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাকে এদিক ওদিক নিয়ে যান।' তারা বলে 'এ গর্জনের শব্দ কি?' তিনি বলেনঃ 'এটা ঐ ফেরেশ্তারই শব্দ'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ ইত্যাদি)

সহীহ বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আগমন করেন সেই সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) স্বীয় বাগানে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি ইয়াহূদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আগমন সংবাদ শুনেই তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেনঃ 'জনাব, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি যার উত্তর নবী ছাড়া কেউই জানে না। বলুন, কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ কি? জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার কি? এবং কোন্ জিনিস সন্তানকে কখনও মায়ের দিকে আকৃষ্ট করে এবং কখনও বাপের দিকে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর এখনই জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলে গেলেন।' আবদুল্লাহ বিন সালাম বলেনঃ 'জিবরাঈল তো আমাদের শত্রু।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ এই যে, এক আগুন হবে যা জনগণকে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে নিয়ে জমা করবে। জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা। যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।' এ উত্তর শুনেই হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম মুসলমান হয়ে যান এবং পাঠ করেনঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল।'

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) ইয়াহূদীরা খুবই নির্বোধ ও অস্থির প্রকৃতির লোক। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্বেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে নেয় তবে তারা আমার সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করবে (সুতরাং আপনি তাদেরকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ

করুন)।' অতঃপর ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন সালাম কেমন লোক?' তারা বলেঃ তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম লোক ও উত্তম লোকের ছেলে, তিনি আমাদের মধ্যে নেতা ও নেতার ছেলে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তোমাদের মত কি?' তারা বলেঃ 'আল্লাহ তাঁকে ওটা হতে রক্ষা করুন!' অতঃপর আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বের হয়ে পড়েন (তিনি এতক্ষণ আড়ালে ছিলেন) এবং পাঠ করেনঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল।' তখনই তারা বলে উঠেঃ ' সে আমাদের মধ্যে খারাপ লোক এবং খারাপ লোকের ছেলে, সে অত্যন্ত নিম্ন স্তরের লোক।' হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) তখন বলেনঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) আমি এই ভয়ই করেছিলাম।'

সহীহ বুখারী শরীফে আছে, হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেনঃ مِيْكَ, جِبْرُ, اِسْرَافْ-এর অর্থ হচ্ছে 'দাস' এবং اِيْل-এর অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ।' সুতরাং جِبْرَائِيْلَ ইত্যাদির অর্থ দাঁড়ালো 'আল্লাহর দাস'। কেউ কেউ এর বিপরীত অর্থও করেছেন। তাঁরা বলেন যে, اِيْل শব্দের অর্থ 'দাস' এবং এর পূর্বের শব্দগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র নাম। যেমন আরবী ভাষায় عَبْدُ اللّٰهِ, عَبْدُ الرَّحْمٰنِ, عَبْدُ الْمَلِكِ, عَبْدُ الْقُدُّوْسِ, عَبْدُ السَّلَامِ, عَبْدُ الْكَافِىْ, عَبْدُ الْجَلِيْلِ ইত্যাদি। عَبْد শব্দটি সব জায়গায় একই থাকছে এবং আল্লাহ্র নাম পরিবর্তিত হচ্ছে। এরকমই اِيْل প্রত্যেক স্থলে ঠিক আছে, আর আল্লাহ্র উত্তম নামগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে। আরবী ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় مُضَاف اِلَيْهِ পূর্বে এবং مُضَاف পরে এসে থাকে। এ নিয়ম এখানেও রয়েছে। যেমনঃ جِبْرَائِيْل, مِيْكَائِيْل, اِسْرَافِيْل, عَزْرَائِيْل ইত্যাদি।

এখন মুফাস্সিরগণের দ্বিতীয় দলের দলীল দেয়া হচ্ছে-যাঁরা বলেন যে, এ আলোচনা হযরত উমারের (রাঃ) সঙ্গে হয়েছিল। শা'বি (রঃ) বলেনঃ 'হযরত উমার (রাঃ) 'রাওহা' নামক স্থানে এসে দেখেন যে, জনগণ দৌড়াদৌড়ি করে একটি পাথরের ঢিবির পার্শ্বে গিয়ে নামায আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'ব্যাপার কি?' উত্তর আসে যে, এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায আদায় করেছিলেন। এতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন যে, যেখানেই সময় হতো সেখানেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)নামায পড়ে নিতেন, তারপরে সেখান হতে চলে যেতেন। এখন ঐ স্থানগুলোকে বরকতময় মনে করে অযথা সেখানে গিয়ে নামায পড়তে কে বলেছে? অতঃপর তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি

বলেনঃ 'আমি মাঝে মাঝে ইয়াহূদীদের সভায় যোগদান করতাম এবং দেখতাম যে, কিভাবে কুরআন তাওরাতের ও তাওরাত কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে থাকে। ইয়াহূদীরাও আমার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে থাকে এবং প্রায়ই তাদের সাথে আমার আলোচনা হতো। একদিন আমি তাদের সাথে কথা বলছি এমন সময় দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ পথ দিয়ে চলে যাচ্ছেন।' তারা আমাকে বলেঃ 'ঐ যে তোমাদের নবী (সঃ) চলে যাচ্ছেন। আমি বলিঃ আচ্ছা আমি যাই। কিন্তু তোমাদের এক আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র সত্যকে স্মরণ করে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তোমাদের নিকট যে আল্লাহ্র কিতাব বিদ্যমান রয়েছে ওর প্রতি খেয়াল করে সেই প্রভুর নামে শপথ করে বলতো, তোমরা কি মুহাম্মদ (সঃ) কে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার কর না?' তারা সবাই নীরব হয়ে যায়। তাদের বড় আলেম, যে তাদের মধ্যে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলো এবং তাদের নেতাও ছিল, তাদেরকে সে বলেঃ 'তোমাদের এরূপ কঠিন কসম দেয়ার পরও তোমরা স্পষ্ট ও সত্য উত্তর দিচ্ছ না কেন? তারা বলেঃ 'জনাব! আপনি আমাদের প্রধান, সুতরাং আপনিই উত্তর দিন।'

পাদরী তখন বলেঃ 'তাহলে শুনুন জনাব! আপনি খুব বড় কসম দিয়েছেন। এটা তো সত্যিই যে, মুহাম্মদ (সঃ) যে আল্লাহ্র রাসূল তা আমরা অন্তর থেকেই জানি।' আমি বলি, 'আফসোস! জান তবে মাননা কেন?' সে বলেঃ 'তার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁর নিকট যে বার্তাবাহক আসেন তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল (আঃ), তিনি অত্যন্ত কঠোর, সংকীর্ণমনা, কঠিন শাস্তি ও কষ্টের ফেরেশ্তা। তিনি আমাদের শত্রু এবং আমরা তাঁর শত্রু। মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট যদি হযরত মীকাঈল (আঃ) আসতেন যিনি দয়া, নম্রতা ও শান্তির ফেরেশ্তা তবে আমরা তাঁকে স্বীকার করতে কোন দ্বিধাবোধ করতাম না। তখন আমি বলি–' আচ্ছা বলতো, আল্লাহ্র নিকট এই দু'জনের কোন সম্মান ও মর্যাদা আছে কি?' সে বলেঃ 'একজন মহান আল্লাহ্র ডান দিকে আছেন এবং অন্য জন তাঁর বাম দিকে আছেন।' আমি বলি– সেই আল্লাহ্র কসম যিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। যে তাঁদের কোন একজনের শত্রু সে আল্লাহ পাকের শত্রু এবং অপর ফেরেশতারও শত্রু। জিবরাঈল (আঃ)-এর শত্রু মীকাঈল (আঃ)-এর বন্ধুত্ব হতে পারে না এবং মীকাঈল (আঃ)-এর শত্রু জিবরাঈল (আঃ) এর বন্ধুত্ব হতে পারে না অথবা তাঁদের কারও শত্রু আল্লাহ তা'আলার বন্ধু হতে পারে না। তাঁদের দু'জনের কেউই আল্লাহ পাকের অনুমতি ছাড়া পৃথিবীতে আসতে পারেন না বা কোন কাজও করতে পারেন না। আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের প্রতি আমার লোভ নেই বা ভয়ও নেই। জেনে রেখো যে, যে আল্লাহ্র শত্রু এবং তাঁর রাসূলগনের, ফেরেশতাগণের, জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈল (আঃ)-এর শত্রু, এরূপ কাফিরদের স্বয়ং আল্লাহ্ শত্রু। এ বলেই আমি চলে আসি।

আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আমাকে দেখেই বলেনঃ ‘খাত্তাব তনয়! আমার উপর নতুন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে।’ আমি বলি– ‘হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! শুনিয়ে দিন।’ তিনি তখন উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। আমি তখন বলি– ‘হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমার বাপ মা আপনার প্রতি কুরবান হোক! এখনই ইয়াহূদীদের সাথে আমার এ কথাগুলো নিয়েই আলোচনা চলছিল। আপনাকে এ সংবাদ দেয়ার জন্যেই আমি হাজির হয়েছি। কিন্তু আমার আগমনের পূর্বেই সেই সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিদিত আল্লাহ্ আপনার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।’ (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ইত্যাদি)। কিন্তু এ বর্ণনাটি মুনকাতা’ এবং মুত্তাসিল নয়। শা‘বী (রঃ) হযরত উমারের (রাঃ) যুগ পান নি।

আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার একজন বিশ্বস্ত ফেরেশতা। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তিনি তাঁর বাণী নবীদের (আঃ) নিকট পৌঁছানোর কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন। ফেরেশতাগণের মধ্যে তিনি আল্লাহ্র রাসূল। কোন একজন রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী সমস্ত রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী। যেমন একজন রাসূলের উপর ঈমান আনলেই সব রাসূলের উপর ঈমান আনা হয়, অনুরূপভাবে একজন রাসূলকে অস্বীকার করা মানেই সব রাসূলকেই অস্বীকার করা। যারা কোন কোন রাসূলকে অস্বীকার করে থাকে, স্বয়ং আল্লাহ্ই তাদেরকে কাফির বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ ‘নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র সঙ্গে ও তাঁর রাসূলগণের সঙ্গে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করতে চায় আর বলে– আমরা কাউকে মানি ও কাউকে মানি না------।’

এ সব আয়াতে ঐ ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে কাফির বলা হয়েছে। যে কোন একজন নবীকে অমান্য করে থাকে। এরকমই জিব্রাঈল (আঃ)-এর শত্রুও আল্লাহ্র শত্রু। কেননা তিনি স্বেচ্ছায় আসেন না। কুরআন পাকে ঘোষিত হচ্ছেঃ ‘আমরা আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া অবতীর্ণ হই না।’ অন্যত্র আছেঃ ‘এটা বিশ্ব প্রভু কর্তৃক অবতারিত যা নিয়ে রূহুল আমীন এসে থাকে, এবং তোমার অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে, যেন তুমি ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।’

সহীহ্ বুখারী শরীফের মধ্যে ‘হাদীসে কুদসীতে আছেঃ ‘আমার বন্ধুদের প্রতি শত্রুতা পোষনকারী আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী।’ কুরআন কারীমের এটাও একটা বিশেষত্ব যে, এটা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং ঈমানদারগণের জন্যে এটা হিদায়াত স্বরূপ, আর তাদের জন্যে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে থাকে। রাসূলগণের মধ্যে মানুষ রাসূল ও

ফেরেশতা রাসূল সবাই জড়িত রয়েছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে স্বীয় রাসূল বেছে নেন।' জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈল (আঃ) ফেরেশতাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তথাপি বিশেষভাবে তাঁদের নাম নেয়ার কারণ হচ্ছে যেন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত জিবরাঈলের (আঃ)শত্রু হযরত মীকাঈল (আঃ)-এরও শত্রু, এমনকি আল্লাহ্রও শত্রু।

মাঝে মাঝে হযরত মীকাঈলও (আঃ) নবীগণের (আঃ) কাছে এসেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে প্রথম প্রথম এসে ছিলেন। কিন্তু ঐ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। যেমন হযরত মীকাঈল (আঃ) নিযুক্ত রয়েছেন গাছপালা উৎপাদন ও বৃষ্টি বর্ষণ ইত্যাদি কাজে। আর হযরত ইসরাফীল (আঃ) নিযুক্ত রয়েছেন শিঙ্গা ফুঁৎকার কাজে।

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘুম থেকে জেগে নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেনঃ ' হে আল্লাহ, হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়সমূহের জ্ঞাতা! আপনার বান্দাদের মতভেদের ফয়সালা আপনিই করে থাকেন। হে আল্লাহ! মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আপনার হুকুমে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আপনি যাকে চান তাকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন।'

جِبْرَائِيْل ইত্যাদি শব্দের বিশ্লেষণ এবং অর্থ ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল আযীয ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈলের (আঃ) নাম খাদেমুল্লাহ। আয়াতের শেষে এটা বলেননি যে, অল্লাহ্ও ঐ লোকদের শত্রু বরং বলেছেন আল্লাহ কাফিরদের শত্রু। এর দ্বারা এরকম লোকদেরও হুকুম জানা গেল। একে আরবী ভাষায় مُضْمَر-এর স্থানে مُظْهَر বলা হয়। আরবের কথায় এর দৃষ্টান্ত কবিতার মধ্যেও প্রায়ই পাওয়া যায়। যেন এরূপ বলা হচ্ছেঃ ' যে আল্লাহ্র বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করলো সে আল্লাহ্র সঙ্গে শত্রুতা করলো এবং যে আল্লাহ্র শত্রু, আল্লাহও তার শত্রু। আর স্বয়ং আল্লাহ যার শত্রু তার কুফরী ও ধ্বংসের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? সহীহ বুখারীর হাদীস ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতাকারীর বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করছি।' অন্য হাদীসে আছেঃ 'আমি আমার বন্ধুদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকি।' আর একটি হাদীসে আছেঃ 'যার শত্রু স্বয়ং আমি হই তার ধ্বংস অনিবার্য।'

৯৯। এবং নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি এবং দুষ্কার্যকারী ব্যতীত কেউই তা অবিশ্বাস করবে না।

٩٩- وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

১০০। কি আশ্চর্য যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলো তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করলো! বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

١٠٠- أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০১। এবং যখন আল্লাহ্‌র নিকট হতে তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী রাসূল তাদের কাছে আগমন করলো, তখন যাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাদের একদল আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে নিজেদের পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করলো, যেন তারা কিছুই জানে না।

١٠١- وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১০২। এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা ওরই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান অবিশ্বাসী হয়নি— কিন্তু শয়তানরাই অবিশ্বাস করছিল, তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেলে হারূত-মারূত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের

١٠٢- وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى

الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ
حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا
مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
زَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَاۤرِّيْنَ بِهٖ مِنْ
اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ
عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى
الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا
شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ○

প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিতো, এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না–এমনকি তারা বলতো যে, আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা বিশ্বাস করো না; অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়–তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন করতে পারতো না, এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না; এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই লভ্যাংশ নেই এবং তদ্বিনিময়ে তারা যে আত্ম-বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট–যদি তারা তা জানতো!

١٠٣- وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا
لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

১০৩। এবং যদি তারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করতো ও ধর্মভীরু হতো তবে আল্লাহ্‌র নিকট হতে কল্যাণ লাভ করতো– যদি তারা এটা বুঝতো।

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ (সঃ) আমি এমন এমন নিদর্শনাবলী তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি যা তোমার নবুওয়াতের জন্যে প্রকাশ্য দলীল হতে পারে। ইয়াহূদীদের বিশেষ জ্ঞান ভাণ্ডার তাওরাতের গোপনীয় কথা, তাদের পরিবর্তনকৃত আহ্কাম ইত্যাদি সব কিছুই আমি এই অলৌকিক কিতাব কুরআন মাজীদের মধ্যে বর্ণনা করেছি। ওটা শুনে প্রত্যেক জীবিত অন্তর তোমার নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। তবে ইয়াহূদীরা যে হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ মানছে না ওটা অন্য কথা। নতুবা প্রত্যেক লোকই এটা বুঝতে পারে যে, একজন নিরক্ষর লোক কখনও এরকম পবিত্র অলংকার ও নিপুণতাপূর্ণ কথা বানাতে পারে না।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবনে সুরিয়া কাতভীনী মুহাম্মদ (সঃ)-কে বলেছিল ঃ 'আপনি এমন কোন সৌন্দর্য ও দর্শন পূর্ণবাণী আনতে পারেন নি যা দ্বারা আপনার নবুওয়াতের পরিচয় পেতে পারি বা কোন জ্বলন্ত প্রমাণও আপনার নিকট নেই।' তখনই এই পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইয়াহূদীদের নিকট শেষ নবী (সঃ)-কে স্বীকার করার উপর অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তা তারা অস্বীকার করেছিল বলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা, এটা তো ইয়াহূদীদের চিরাচরিত অভ্যাস, বরং তাদের অধিকাংশের অন্তর তো ঈমান থেকেই শূন্য।

نَبَذَ-এর অর্থ হচ্ছে 'ফেলে দেয়া।' ইয়াহূদীরা আল্লাহ্র কিতাবকে এবং তাঁর অঙ্গীকারকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছিল যে, যেন তারা তা ফেলেই দিয়েছিল। এ জন্যেই তাদের নিন্দের ব্যাপারে এ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন কারীমের এক জায়গায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছেঃ 'তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বর্ণনা বিদ্যমান পেয়ে থাকে।' এখানেও আল্লাহ পাক বলেছেন যে,যখন তাদের একটি দল কিতাবের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতঃ ওকে এমনভাবে ছেড়ে দেয় যে, যেন সে জানেই না। বরং যাদুর পিছনে লেগে পড়ে। এমনকি মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপরও যাদু করে। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ)কে এটা জানিয়ে দেন এবং ওর ক্রিয়া নষ্ট করতঃ তাঁকে আরোগ্য দান করেন। তাওরাতের মাধ্যমে তো তারা তাঁর মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। কেননা, ওটা তো তাঁর সত্যতা প্রমাণকারী। সুতরাং ওটাকে তারা পরিত্যাগ করতঃ অন্য কিতাব গ্রহণ করে ওর পিছনে লেগে পড়ে। আল্লাহ্র কিতাবকে তারা এমনভাবে ছেড়ে দেয় যে, যেন তারা ওর সম্বন্ধে কিছু জানতই না। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ্র কিতাবকে তাদের পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে। এও বলা হয়েছে যে; গান-বাজনা, খেল-তামাশা এবং আল্লাহ্র স্মরণ হতে বিরত রাখে এমন প্রত্যেক জিনিসই مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ-এর অন্তর্ভুক্ত।

## হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঘটনা এবং যাদুর মূল তত্ত্বের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট একটি আংটি ছিল। পায়খানায় গেলে তিনি ওটা তাঁর স্ত্রী জারাদার নিকট রেখে যেতেন। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পরীক্ষার সময় এলে একটি শয়তান জ্বীন তাঁর রূপ ধরে তাঁর স্ত্রীর নিকট আসে এবং আংটি চায়। তা তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সে তা পরে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনে বসে যায়। সমস্ত জ্বীন, মানব ও শয়তান তার খিদমতে হাজির হয়। সে শাসন কার্য চালাতে থাকে। এদিকে হযরত সুলাইমান (আঃ) ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীর নিকট আংটি চান। তাঁর স্ত্রী বলেনঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি সুলাইমান (আঃ) নও। সুলাইমান (আঃ) তো আংটিটি নিয়েই গেছেন।'

হযরত সুলাইমান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা হচ্ছে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর উপর পরীক্ষা। এ সময়ে শয়তানরা যাদু বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা এবং ভবিষ্যতের সত্য-মিথ্যা খবরের কতকগুলো কিতাব লিখে এবং ওগুলো হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পরীক্ষার যুগ শেষ হলে পুনরায় তিনি সিংহাসন ও রাজপাটের মালিক হয়ে যান। স্বাভাবিক বয়সে পৌঁছে যখন তিনি রাজত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন শয়তানরা জনগণকে বলতে শুরু করে যে, হযরত সুলাইমানের (আঃ) ধনাগার এবং ঐ পুস্তক যার বলে তিনি বাতাস ও জ্বীনদের উপর শাসনকার্য চালাতেন তা তাঁর সিংহাসনের নীচে পোঁতা রয়েছে। জ্বীনেরা ঐ সিংহাসনের নিকটে যেতে পারতো না বলে মানুষেরা ওটা খুঁড়ে ঐ সব পুস্তক বের করে। সুতরাং বাইরে এর আলোচনা হতে থাকে এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের রহস্য এটাই ছিল। এমনকি জনগণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নবুওয়াতকেও অস্বীকার করে বসে এবং তাঁকে যাদুকর বলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা অস্বীকার করেন এবং আল্লাহ্র ফরমান জারী হয় যে, যাদু বিদ্যার এ কুফরী শয়তানরা ছড়িয়ে ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) ওটা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একটি লোক আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'কোথা হতে আসছো?' সে বলেঃ 'ইরাক হতে।' তিনি বলেনঃ 'ইরাকের কোন্ শহর হতে?' সে বলেঃ 'কুফা হতে'। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'তথাকার সংবাদ কি?' সে বলেঃ 'তথায় আলোচনা হচ্ছে যে, হযরত আলী (রাঃ) মারা যাননি; বরং তিনি জীবিত আছেন এবং সত্বরই আসবেন।

একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কেঁপে উঠেন এবং বলেনঃ 'এটা সত্য হলে আমরা তাঁর মীরাস বন্টন করতাম না। আর তাঁর স্ত্রীগণকে বিয়ে করতাম না। শুন! শয়তানরা আকাশবানী চুরি করে শুনে নিতো এবং তাদের নিজস্ব কথা মিলিয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতো।

হযরত সুলাইমান (আঃ) ঐ সব পুস্তক জমা করে তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর জ্বীনেরা পুনরায় তা বের করে নেয়। ঐ পুস্তকগুলো ইরাকের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে এবং ঐ পুস্তকগুলোর কথাই তারা বর্ণনা করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে'। এ আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে।

সেই যুগে এটাও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, শয়তানরা ভবিষ্যত জানে। হযরত সুলাইমান (আঃ) এই পুস্তকগুলো বাক্সে ভরে পুঁতে ফেলার পর এই নির্দেশ জারী করেন যে, যে একথা বলবে তার মাথা কেটে নেয়া হবে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর জ্বীনেরা ঐ পুস্তকগুলো তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে এবং ওর প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে রাখেঃ "এই জ্ঞানভাণ্ডার 'আসিফ বিন বরখিয়া' কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়েছে, যিনি হযরত সুলাইমান বিন দাউদের (আঃ) প্রধানমন্ত্রী, বিশিষ্ট পরামর্শ দাতা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।" ইয়াহূদীদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) নবী ছিলেন না, বরং যাদুকর ছিলেন। এই কারণেই উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্র সত্য নবী (সঃ) অন্য এক সত্য নবীকে (আঃ) কালিমামুক্ত করেন এবং ইয়াহূদীদের বদ-আকীদার অসারতা ঘোষণা করেন। তারা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নাম নবীদের নামের তালিকাভুক্ত শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠতো। এজন্যেই এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও একটা কারণ যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) কষ্টদায়ক প্রাণী হতে কষ্ট না দেয়ার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাদেরকে ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই তারা কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকতো। অতঃপর জনগণ নিজেরাই কথা বানিয়ে নিয়ে যাদু মন্ত্র ইত্যাদির সম্বন্ধ হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। ওর অসারতা এই পবিত্র আয়াতে রয়েছে।

এখানে عَلٰى শব্দটি فِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিংবা تَتْلُوْا শব্দটি تَكْذِبُ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি আছে যে, যাদু হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পূর্বেও ছিল। এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। হযরত সুলাইমান (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর পর যুগের নবী। আর হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদুকরদের বিদ্যমানতা কুরআন মাজীদ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে এবং হযরত সুলাইমান

(আঃ)-এর আগমন হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে হওয়াও কুরআন কারীম দ্বারাই প্রকাশ পেয়েছে। হযরত দাঊদ (আঃ) ও জালুতের ঘটনায় আছেঃ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى অর্থাৎ 'মূসা (আঃ)-এর পরে।' এমনকি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরও পূর্বে হযরত সালিহ্ (আঃ)কে তাঁর 'কওম' বলেছিলঃ اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ অর্থাৎ 'তুমি যাদুকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত'। (২৬ঃ ১৮৫)

অতঃপর আল্লাহ বলেন وَمَا اُنْزِلَ কেউ কেউ বলেন যে, এখানে مَا শব্দটি না বাচক এবং ওর সংযোগ রয়েছে مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ-এর উপর।

ইয়াহূদীদের আর একটি বদ-আকীদা ছিল এই যে, ফেরেশতাদের উপর যাদু অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতে তাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। هَارُوْتَ ও مَارُوْتَ শব্দ দুটি شَيَاطِيْنَ হতে بَدَلْ হয়েছে। দ্বিবচনের উপরও বহু বচনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন- اِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ-এর মধ্যে রয়েছে। কিংবা তাদের অনুসারীদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের দু'জনের নাম খুবই অবাধ্যতার কারণে প্রকাশ করা হয়েছে।

কুরতুবী (রঃ) তো বলেন এটাই সঠিক ভাব। এছাড়া অন্য ভাব নেয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাদু আল্লাহ্, নাযিল করেননি। রাবী' বিন আনাস (রঃ) বলেন যে, তাদের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ হয়নি। এর উপর ভিত্তি করে আয়াতের তরজমা হবে এইঃ 'ঐ ইয়াহূদীরা ঐ জিনিসের অনুসরণ করেছে যা শয়তানরা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগে পড়তো। হযরত সুলাইমান (আঃ) কুফরী করেনি, না আল্লাহ তা'আলা ঐ দু' ফেরেশতার উপর যাদু অবতীর্ণ করেছেন; (যেমন-হে ইয়াহূদী! জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈলের (আঃ) প্রতি তোমাদের ধারণা রয়েছে) বরং এ কুফরী ছিল শয়তানদের, যারা বাবেলে জনগণকে যাদু শিখাতো এবং তাদের সরদার ছিল মানুষ, যাদের নাম ছিল হারূত ও মারূত। হযরত আবদুর রহমান বিন আব্যা (রঃ) নিম্নরূপ পড়তেনঃ وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ অর্থাৎ 'দাঊদ ও সুলাইমান এই দু'বাদশাহ্র উপরেও যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি?' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) একে শক্তভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে, مَا শব্দটি اَلَّذِيْ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আর হারূত ও মারূত দু'জন ফেরেশতা। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এবং বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিতে ঐ দু'ফেরেশতাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তারা আল্লাহ্র সে আদেশ পালন করেছিলেন।

একটি দুর্বল মত এও আছে যে, এটা জ্বীনদের দু'টি গোত্র। مَلَكَيْنِ দু'বাদশাহর কিরআতে اُنْزِلَ-এর অর্থ হবে সৃষ্টি করা। যেমন, আল্লাহ পাক বলেছেনঃ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ অর্থাৎ 'তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকারের চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন।' (৩৯ঃ ৬) আরও বলেছেনঃ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ। অর্থাৎ 'আমি লোহা সৃষ্টি করেছি।' (৫৭ঃ ২৫) হাদীসের মধ্যেও اِنْزَالٌ শব্দটি সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ مَـآ اَنْزَلَ اللّٰهُ دَآءً الخ অর্থাৎ 'আল্লাহ যতগুলো রোগ সৃষ্টি করেছেন, ওগুলোর ওষুধও সৃষ্টি করেছেন।' উপরোক্ত সব স্থানেই اِنْزَالٌ শব্দটি সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; আনা বা অবতীর্ণ করা অর্থে নয়। তদ্রূপ এ আয়াতেও।

পূর্ব যুগীয় অধিকাংশ মনীষীদের মাযহাব এই যে, এই দু'জন ফেরেশতা ছিলেন। একটি মারফূ' হাদীসেও এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণিত হচ্ছে। কেউ যেন এ প্রশ্ন উত্থাপন না করেন যে, ফেরেশতাগণ তো নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা তো পাপকার্য হতেই পারে না। অথচ জনগণকে যাদু শিক্ষা দেয়া, এতো কুফরী? এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে না। কেননা, এ দু'জন ফেরেশতা সাধারণ ফেরেশতাগণ হতে পৃথক হয়ে যাবে, যেমন ইবলিস পৃথক হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত কা'বুল আহবার (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ) এবং হযরত কালবীও (রঃ) এটাই বলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলতে শুনেছেনঃ 'যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করতে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করেন– 'দেখ এরা কত দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং এরা কতই না অবাধ্য! আমরা এদের স্থলে থাকলে কখনও আল্লাহর অবাধ্য হতাম না–তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে নিয়ে এসো; আমি তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতঃ তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি; তার পরে দেখা যাক তারা কি করে।' তাঁরা তখন হারূত ও মারূতকে হাজির করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতঃ তাদেরকে বলেনঃ 'দেখ, বানী আদমের নিকট তো আমি নবীদের মাধ্যমে আমার আহ্‌কাম পৌঁছিয়ে থাকি; কিন্তু তোমাদেরকে মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আমি বলে দিচ্ছি– আমার সাথে কাউকেও অংশীদার করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং মদ্যপানও করবে না।'

তখন তারা দু'জন পৃথিবীতে অবতরণ করে। তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা 'যুহরাকে' একটি সুন্দরী নারীর আকারে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। তারা তাকে দেখেই বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে ব্যভিচার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে বলেঃ 'তোমারা শিরক করলে আমি সম্মত আছি।' তারা উত্তর দেয়ঃ 'এটা আমাদের দ্বারা হবে না।' সে চলে যায়। আবার সে এসে বলেঃ তোমরা যদি এই শিশুটিকে হত্যা কর তবে আমি তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হবো।' তারা ওটাও প্রত্যাখ্যান করে। সে আবার আসে এবং বলেঃ 'আচ্ছা, এই মদ পান করে নাও। তারা ওটাকে ছোট পাপ মনে করে তাতে সম্মত হয়ে যায়। এখন তারা নেশায় উন্মত্ত হয়ে ব্যভিচারও করে বসে এবং শিশুটিকে হত্যা করে ফেলে।

তাদের চৈতন্য ফিরে আসলে ঐ স্ত্রীলোক তাদেরকে বলেঃ যে যে কাজ করতে তোমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলে তা সবই করে ফেলেছো।' তারা তখন লজ্জিত হয়ে যায়। তাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি বা আখেরাতের শাস্তির যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়। তারা দুনিয়ার শাস্তি পছন্দ করে। সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদ-ই- আহমাদ, তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এবং তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের এ বর্ণনাটি গরীব। ওর মধ্যে একজন বর্ণনাকারী মূসা বিন যুবাইর আনসারী রয়েছে—ইবনে আবি হাতিমের (রঃ) মতে সে নির্ভরযোগ্য নয়। তাফসীর-ই- ইবনে মিরদুওয়াই এর মধ্যে একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, একদা রাত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হযরত নাফে' (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'যুহরা তারকাটি বের হয়েছে কি?' তিনি বলেনঃ 'না'। দু'তিন বার প্রশ্নের পর বলেনঃ 'এখন উদিত হয়েছে।' হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) তখন বলেন ' ও যেন খুশিও না হয় এবং ওর আনন্দ লাভও যেন না হয়।' হযরত নাফে' (রাঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ 'জনাব, একটি তারকা যা আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে উদিত ও অস্তমিত হয় তাকে আপনি মন্দ বলেন?' তিনি তখন বলেনঃ 'তবে শুনুন জনাব আমি ঐ কথাই বলছি যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হতে শুনেছি।' অতঃপর উল্লিখিত হাদীসটি শব্দের বিভিন্নতার সাথে বর্ণনা করেন। কিন্তু এটাও গরীব বা দুর্বল। হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি মারফু' হওয়া অপেক্ষা মাওকুফ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সম্ভবতঃ এটা ইসরাঈলী বর্ণনাই হবে। আল্লাহ্ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। সাহাবা (রাঃ) এবং তাবেঈন (রাঃ) হতেও এ ধরনের বহু বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, যুহরা একটি স্ত্রী লোক ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে শর্ত করে বলেছিলঃ ' তোমরা আমাকে ঐ দো'আটি শিখিয়ে দাও যা পড়ে তোমরা আকাশে উঠে থাকো। তারা তাকে তা শিখিয়ে দেয়। সে এটা পড়ে

আকাশে উঠে যায় এবং তথায় তাকে তারকায় রূপান্তরিত করা হয়। কতকগুলো মারফু' বর্ণনায়ও এটা আছে; কিন্তু ওটা মুন্কার ও বে-ঠিক। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, এ ঘটনার পূর্বে তো ফেরেশতাগণ শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, কিন্তু এর পর তাঁরা সারা দুনিয়াবাসীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, যখন এই ফেরেশতাদ্বয় হতে এ অবাধ্যতা প্রকাশ পায় তখন অন্যান্য ফেরেশতাগণ স্বীকার করেন যে, বানী আদম আল্লাহ্ পাক হতে দূরে রয়েছে এবং তাঁকে না দেখেই ঈমান এনেছে, সুতরাং তাদের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ঐ ফেরেশতাদ্বয়কে বলা হয়ঃ 'তোমরা দুনিয়ার শাস্তি গ্রহণ করে নাও, অথবা পরকালের শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।' তারা দু'জন পরামর্শ করে দুনিয়ার শাস্তিই গ্রহণ করে। কেননা, এটা অস্থায়ী এবং পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী। সুতরাং বাবেলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

একটি বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন তাতে হত্যা ও অবৈধ মালের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং এ হুকুমও ছিল যে,তারা যেন ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করে। এও এসেছে যে, তারা তিনজন ফেরেশ্তা ছিল। কিন্তু একজন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরে যায়। অতঃপর দু'জনের পরীক্ষা নেয়া হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগের ঘটনা। এখানে বাবেল দ্বারা দুনিয়ায় অন্দের বাবেলকে বুঝান হয়েছে। স্ত্রীলোকটির নাম আরবী ভাষায় ছিল 'যুহরা' বানতী ভাষায় ছিল 'বেদখত্ এবং ফারসী ভাষায় ছিল 'আনাহীদ'। এ স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মোকাদ্দমা এনেছিল। যখন তারা তার সাথে অসৎ কাজের ইচ্ছে করে তখন সে বলে–'যদি আগে আমাকে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ফায়সালা দাও তবে আমি সম্মত আছি।' তারা তাই করে। পুনরায় সে বলেঃ 'তোমরা যা পড়ে আকাশে উঠে থাকো ও যা পড়ে নীচে নেমে আস ওটাও আমাকে শিখিয়ে দাও। তারা ওটাও তাকে শিখিয়ে দেয়। সে ওটা পাঠ করে আকাশে উঠে যায়। কিন্তু নীচে নেমে আসার দু'আ ভুলে যায়। সেখানেই তার দেহকে তারকায় রূপান্তরিত করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) কখনও যুহরা তারকা দেখলে তাকে অভিশাপ দিতেন। যখন এই ফেরেশতারা আকাশে উঠতে চাইলো কিন্তু উঠতে পারলো না। তখন তারা বুঝে নিলো যে, এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রথম কিছুদিন তো এই ফেরেশ্তারা স্থিরই ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করতো এবং সন্ধ্যার পর আকাশে উঠে যেতো। অতঃপর যুহ্রাকে দেখে নিজেদের নফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যুহরা তারকাকে একটি সুন্দরী স্ত্রীর আকৃতিতে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। মোট কথা, হারূত ও মারূতের এ ঘটনা তাবেঈগণের মধ্যেও বহু লোক বর্ণনা করেছেন। যেমন, মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ) প্রভৃতি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাস্সিরগণও নিজ নিজ তাফসীরে এটা এনেছেন। কিন্তু এর অধিকাংশই বানী ইসরাঈলের কিতাবসমূহের উপর নির্ভরশীল। এ অধ্যায়ে কোন সহীহ মারফূ' মুত্তাসিল হাদীস রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে সাব্যস্ত নেই। আবার কুরআন হাদীসের মধ্যেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং আমাদের ঈমান ওর উপরেই রয়েছে যে, যেটুকু কুরআন মাজীদে আছে ওটাই সঠিক। আর প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে একটি দুর্বল হাদীস রয়েছে, যাতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরলোক গমনের অল্প দিন পরে 'দাওমাতুল জানদাল' হতে একটি স্ত্রীলোক তাঁর খোঁজে আগমন করে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই সে উদ্বিগ্ন হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি– ব্যাপার কি? সে বলেঃ 'আমার মধ্যে ও আমার স্বামীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায় লেগেই থাকতো। একবার সে আমাকে ছেড়ে কোন্ অজানা জায়গায় চলে যায়। একটি বৃদ্ধার নিকট আমি এসব কিছু বর্ণনা করি। সে আমাকে বলে– 'তোমাকে যা বলি তাই কর, সে আপনা আপনি চলে আসবে।' আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম। রাত্রে সে দু'টি কুকুর নিয়ে আমার নিকট আগমন করে। একটির উপর সে আরোহণ করে এবং অপরটির উপর আমি আরোহণ করি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা দু'জন বাবেলে চলে যাই। তথায় গিয়ে দেখি যে, দু'টি লোক শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় লটকানো রয়েছে। ঐ বৃদ্ধা আমাকে বলে–'তাদের নিকট যাও ও বল–'আমি যাদু শিখতে এসেছি।' আমি তাদেরকে একথা বলি। তারা বলে–'জেনে রেখো, আমরা তো পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি। তুমি যাদু শিক্ষা করো না, যাদু শিক্ষা করা কুফরী।' আমি বলি–'শিখবো।' তারা বলে–'আচ্ছা, তাহলে যাও, ঐ চুল্লীর মধ্যে প্রস্রাব করে চলে এসো।' আমি গিয়ে প্রস্রাবের ইচ্ছে করি, কিন্তু আমার অন্তরে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হয়, সুতরাং আমি ফিরে এসে বলি–' আমি কাজ সেরে এসেছি।' তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে -'তুমি কি দেখলে'? আমি বলি–'কিছুই না'। তারা বলে–'তুমি ভুল বলছো'। এখন পর্যন্ত তুমি

বিপথে চালিত হওনি।' তোমার ঈমান ঠিক আছে, তুমি এখনও ফিরে যাও এবং কুফরী করো না।' আমি বলি–'আমাকে যে যাদু শিখতেই হবে।' তারা পুনরায় আমাকে বলে–'ঐ চুল্লীতে প্রস্রাব করে এসো।' আমি আবার যাই। কিন্তু এবারও মন চায় না, সুতরাং ফিরে আসি। আবার এভাবেই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। পুনরায় আমি চুল্লীর নিকট যাই এবং মনকে শক্ত করে প্রস্রাব করতে বসে পড়ি। আমি দেখি যে, একজন ঘোড়া সওয়ার মুখের উপর পর্দা ফেলে আকাশের উপর উঠে গেল। আমি ফিরে এসে তাদের নিকট এটা বর্ণনা করি। তারা বলে– 'হাঁ, এবার তুমি সত্য বলছো। ওটা তোমার ঈমান ছিল, যা তোমার মধ্য হতে বেরিয়ে গেল। এখন চলে যাও'।

আমি এসে ঐ বৃদ্ধাকে বলি– 'তারা আমাকে কিছুই শিক্ষা দেয়নি।' সে বলে– 'যথেষ্ট হয়েছে। তোমার নিকট সবই চলে এসেছে। এখন তুমি যা বলবে তাই হবে।' আমি পরীক্ষামূলকভাবে একটি গমের দানা নিয়ে মাটিতে ফেলে দেই। অতঃপর বলি– গাছ হও।' ওটা গাছ হয়ে গেল। আমি বলি– 'তোমাতে ডাল পাতা গজিয়ে যাক।' তাই হয়ে গেল। তার পর বলি– 'শুকিয়ে যাও।' ডালপাতা শুকিয়ে গেল। অতঃপর বলি–'পৃথক পৃথকভাবে দানা দানা হয়ে যাও।' ওটা তাই হয়ে গেল। তারপরে আমি বলি–'শুকিয়ে যাও।' ওটা শুকিয়ে গেল। অতঃপর বলি–'আটা হয়ে যাও।' আটা হয়ে গেল। আমি বলি–'রুটি হয়ে যাও।' রুটি হয়ে গেল। এটা দেখেই আমি লজ্জিত হয়ে যাই এবং বে-ঈমান হয়ে যাওয়ার কারণে আমার খুবই দুঃখ হয়। হে উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! আমি যাদুর দ্বারা কোন কামও নেইনি এবং কারও উপর এটা প্রয়োগও করিনি। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁকে পেলাম না। এখন আমি কি করি?'

একথা বলেই সে পুনরায় কাঁদতে আরম্ভ করে এবং এত কাঁদে যে, সবারই মনে তার প্রতি দয়ার সঞ্চার হয়। তাকে কি ফতওয়া দেয়া যেতে পারে এ ব্যাপারে সাহাবীগণও (রাঃ) খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। অবশেষে তাঁরা বলেন– 'এখন এ ছাড়া আর কি হবে যে, তুমি এ কাজ করবে না, তাওবা করবে এবং মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর পিতা-মাতার খিদমত করবে।' এই ইসনাদ সম্পূর্ণ সঠিক।

কেউ কেউ বলেন যে, যাদুর বলে প্রকৃত জিনিসই পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, না, দর্শকের শুধু এর ধারণা হয়ে থাকে মাত্র, প্রকৃত জিনিস যা ছিল তাই থাকে। যেমন কুরআন পাকে রয়েছেঃ سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ অর্থাৎ 'তারা মানুষের চোখে যাদু করে দিয়েছে।' (৭ঃ ১১৬) অন্যত্র আল্লাহ

পাক বলেন–يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ অর্থাৎ 'হযরত মূসার (আঃ) মনে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে, যেন ঐ সাপগুলো তাদের যাদুর বলে চলাফেরা করছে।' (২০ঃ ৬৬) এ ঘটনা দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে 'বাবেল' শব্দ দ্বারা ইরাকের বাবেলকে বুঝানো হয়েছে, 'দুনিয়া অন্দের' বাবেল নয়। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তাবিল (রাঃ) বাবেলের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আসরের নামাযের সময় হলে তিনি তথায় নামায আদায় করলেন না, বরং বাবেলের সীমান্ত পার হয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর বললেনঃ 'আমার প্রিয় রাসূল (সঃ) আমাকে গোরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং বাবেলের ভূমিতেও নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এটা অভিশপ্ত ভূমি।' সুনান-ই-আবি দাউদের মধ্যেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এ হাদীসের উপর কোন সমালোচনা করেননি। আর যে হাদীসকে ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) স্বীয় কিতাবে নিয়ে আসেন এবং ওর সনদের উপর নীরবতা অবলম্বন করেন ঐ হাদীস ইমাম সাহেবের মতে হাসান হয়ে থাকে। এর দ্বারা জানা গেল যে, বাবেলের ভূমিতে নামায পড়া মাকরূহ। যেমন সামুদ সম্প্রদায়ের ভূমি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তাদের বাস ভূমিতেও যেয়ো না। যদি ঘটনাক্রমে যেতেই হয়, তবে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাও।'

আল্লাহ তা'আলা হারূত ও মারূতের মধ্যে ভাল-মন্দ, কুফর ও ঈমানের জ্ঞান দিয়ে রেখেছিলেন বলে তারা কুফরীর দিকে গমনকারীদের উপদেশ দিতো। এবং তাদেরকে ওটা হতে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। কিন্তু যখন কোনক্রমেই মানতো না তখন তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিখিয়ে দিতো। ফলে তাদের ঈমানের আলো বিদায় নিতো এবং যাদু চলে আসতো। শয়তান তাদের বন্ধু হয়ে যেতো। ঈমান বিদায় নেয়ার পর আল্লাহর অভিশাপ তাদের উপর নেমে আসতো। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন যে, কাফির ছাড়া আর কেউ যাদু বিদ্যা শিখবার সৎ সাহস রাখতে পারে না। فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ এখানে বিপদ, আজমায়েশ ও পরীক্ষা। এ আয়াতের মাধ্যমে এটাও জানা গেল যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা কুফরী। হাদীসের মধ্যেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন যাদুকরের নিকট গমন করে এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর নাযিলকৃত ওয়াহীর সাথে কুফরী করে।' (বায্যার)'। এ হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং-এর সমর্থনে অন্যান্য হাদীসও এসেছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মানুষ হারূত ও মারূতের কাছে গিয়ে যাদু বিদ্যা শিক্ষা করতো। ফলে তারা খারাপ কাজ করতো এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে

বিচ্ছেদ ঘটে যেতো। সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'শয়তান তার সিংহাসনটি পানির উপর রাখে। অতঃপর মানুষকে বিপথে চালানোর জন্যে সে তার সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দেয়। সেই তার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত যে হাঙ্গামা সৃষ্টির কাজে সবচেয়ে বেড়ে যায়। এরা ফিরে এসে নিজেদের জঘন্যতম কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়। কেউ বলেঃ 'আমি অমুককে এভাবে পথ ভ্রষ্ট করেছি।' কেউ বলেঃ 'আমি অমুক ব্যক্তিকে এ পাপ কার্য করিয়েছি।' শয়তান তাদেরকে বলেঃ 'তোমরা কিছুই করনি। এতো সাধারণ কাজ।' অবশেষে একজন এসে বলেঃ 'আমি একটি লোক ও তার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছি, এমনকি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।' শয়তান তখন তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলেঃ 'হাঁ, তুমি বড় কাজ করেছো।' সে তাকে পার্শ্বে বসিয়ে নেয় এবং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।'

যাদুকরও তার যাদুর দ্বারা ঐ কাজই করে থাকে, যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। যেমন তার কাছে স্ত্রীর আকৃতি খারাপ মনে হবে কিংবা তার স্বভাব চরিত্রকে সে ঘৃণা করবে অথবা অন্তরে শত্রুতার ভাব জেগে যাবে ইত্যাদি। আস্তে আস্তে এসব বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদই ঘটে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, যাদু দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। অর্থাৎ ক্ষতি সাধন করা তাদের ক্ষমতার মধ্যেই নেই। আল্লাহর ভাগ্য লিখন অনুযায়ী তার ক্ষতিও হতে পারে, আবার তাঁর ইচ্ছে হলে যাদু নিষ্ক্রিয়ও হতে পারে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যাদু শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিরই ক্ষতি করে থাকে, যে ওটা লাভ করে ওর মধ্যে প্রবেশ করে।

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেন যে, তারা এমন জিনিস শিক্ষা করে যা তাদের জন্যে শুধু ক্ষতিকারক, যার মধ্যে উপকার মোটেই নেই। ঐ ইয়াহূদীরা জানে যে,যারা আল্লাহর রাসূলের (সঃ) আনুগত্য ছেড়ে যাদুর পিছনে লেগে থাকে তাদের জন্যে আখেরাতের কোনই অংশ নেই। তাদের না আছে আল্লাহর কাছে কোন সম্মান, না তাদেরকে ধর্মভীরু মনে করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, যদি তাদের এ মন্দ কাজের অনুভূতি হতো এবং ঈমান এনে খোদাভীরুতা অবলম্বন করতো তবে ওটা নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে মঙ্গলজনক ছিল। কিন্তু এরা অজ্ঞান ও নির্বোধ।

অন্য জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'জ্ঞানীগণ বলে– তোমাদের জন্যে আফসোস! আল্লাহ্ প্রদত্ত পূর্ণ ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে বড়ই উত্তম, কিন্তু ওটা একমাত্র ধর্মশীলগণই পেয়ে থাকে।'

হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) ও পূর্ব যুগীয় মনীষীদের একটি দল যাদু বিদ্যা শিক্ষার্থীকে কাফির বলেছেন। কেউ কেউ কাফির তো বলেন না, কিন্তু বলেন যে, যাদুকরকে হত্যা করাই হচ্ছে তার উপযুক্ত শাস্তি। হযরত বাজালাহ বিন উবাইদ (রঃ) বলেনঃ 'হযরত উমার (রাঃ) তাঁর এক নির্দেশ নামায় লিখেছিলেনঃ 'যাদুকর পুরুষ বা স্ত্রীকে তোমরা হত্যা করে দাও।' এ নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তিনজন যাদুকরের গর্দান উড়িয়েছি।'

সহীহ বুখারী শরীফে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রাঃ) উপর তাঁর দাসী যাদু করেছিল বলে তাকে হত্যা করা হয়। হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেন যে, তিনজন সাহাবী (রাঃ) হতে যাদুকরকে হত্যা করার ফতওয়া রয়েছে। জামে' উত তিরমিযীর মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারি দ্বারা হত্যা করা।' এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইসমাঈল বিন মুসলিম দুর্বল। সঠিক কথা এটাই মনে হচ্ছে যে, এ হাদীসটি মাওকুফ। কিন্তু তাবরানীর হাদীসের মধ্যে অন্য সনদেও এ হাদীসটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

ওয়ালীদ বিন উকবার নিকট একজন যাদুকর ছিল, সে তার যাদু কার্য বাদশাহকে দেখাতো। সে প্রকাশ্যভাবে একটি লোকের মাথা কেটে নিতো। অতঃপর একটা শব্দ করতো, আর তখনই মাথা জোড়া লেগে যেতো মুহাজির সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে একজন মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী (রাঃ) ওটা দেখেন এবং পরের দিন তরবারি নিয়ে আসেন। যাদুকর খেলা আরম্ভ করার সাথে সাথেই তিনি স্বয়ং যাদুকরেরই মাথা কেটে ফেলেন এবং বলেনঃ 'তুমি সত্যবাদী হলে নিজেই জীবিত হয়ে যাও।' অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ 'তোমরা যাদুর নিকট যাচ্ছ ও তা দেখছো?' ঐ সাহাবী (রাঃ) ওয়ালীদের নিকট হতে তাকে হত্যা করার অনুমতি নেননি বলে বাদশাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং শেষে তাঁকে ছেড়ে দেন।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) হযরত উমারের (রাঃ) নির্দেশ ও হযরত হাফসার (রাঃ) ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন যে, ঐ হুকুম ঐ সময় কার্যকরী হবে যখন যাদুর মধ্যে শিরক যুক্ত শব্দ থাকবে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় যাদুর অস্তিত্বই মানে না। তারা বলে যে,যারা যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করে তারা কাফির। কিন্তু আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাদুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা স্বীকার করে যে, যাদুকর তার যাদুর বলে বাতাসে উড়তে পারে, মানুষকে বাহ্যতঃ গাধা ও গাধাকে বাহ্যতঃ মানুষ করে ফেলতে পারে; কিন্তু নির্দিষ্ট কথাগুলো মন্ত্রতন্ত্র পড়ার সময় ঐগুলো সৃষ্টিকারী হচ্ছেন

আল্লাহ তা'আলা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আকাশকে ও তারকাকে ফলাফল সৃষ্টিকারী মানে না। দার্শনিকেরা, জোতির্বিদেরা এবং বে-দ্বীনেরা তো তারকা ও আকাশকেই ফলাফল সৃষ্টিকারী মেনে থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রথম দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ 'তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করা। তৃতীয় দলীল হচ্ছে ঐ স্ত্রী লোকটির ঘটনা যা হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আরও এ ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে।

ইমাম রাযী (রঃ) বলেন যে, যাদু বিদ্যা লাভ করা দুষনীয় নয়। মাসয়ালা বিশ্লেষণকারীগণের এটাই অভিমত। কেননা, এটাও একটা বিদ্যা। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'যারা জানে এবং যারা জানে না, এরা কি সমান?' আর এ জন্যেও যাদু বিদ্যা শিক্ষা দুষণীয় নয় যে, তার দ্বারা মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পূর্ণভাবে পার্থক্য করা যায় এবং মু'জিযার জ্ঞান ওয়াজিব ও ওটা নির্ভর করে যাদু বিদ্যার উপর, যার দ্বারা পার্থক্য বুঝা যায়। সুতরাং যাদু বিদ্যা শিক্ষা করাও ওয়াজিব হয়ে গেল। ইমাম রাযীর (রাঃ) একথা গোড়া হতে আগা পর্যন্ত ভুল। বিবেক হিসেবে যদি তিনি ওটাকে খারাপ না বলেন তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায় বিদ্যমান রয়েছে, যারা ওকে বিবেক হিসেবেও খারাপ বলে থাকে। আর যদি শরীয়তের দিক দিয়ে খারাপ না বলেন তবে কুরআন মাজীদের এ শারঈ আয়াত ওকে খারাপ বলার জন্যে যথেষ্ট। সহীহ হাদীসে রয়ছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন যাদুকর বা গণকের নিকট গমন করে সে কাফির হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম রাযীর (র) উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর একথা বলা যে, 'মুহাককিকগণের অভিমত এটাই' এটাও ঠিক নয়।

মুহাক্কিকগণের এরূপ কথা কোথায় আছে? ইসলামের ইমামগণের মধ্যে কে এ কথা বলেছেন? অতঃপর 'যারা জানে এবং জানে না, তারা কি সমান?' এ আয়াতটিকে দলীলরূপে পেশ করা হঠধর্মী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, এ আয়াতের 'ইলম' এর ভাবার্থ হচ্ছে ধর্মীয় 'ইলম'। এ আয়াতে শারঈ আলেমগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তাঁর এ কথা বলা যে, এর দ্বারা মু'জিযার 'ইলম' লাভ হয়, এটা একেবারে বাজে কথা। কেননা, আমাদের রাসূল (সঃ)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হচ্ছে পবিত্র কুরআন, যা বাতিল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু তাঁর মু'জিযা জানা যাদু জানার উপর নির্ভরশীল নয়। ঐ সব লোক যাদের যাদুর সঙ্গে দূরের সম্পর্ক নেই তাঁরাও এটাকে মু'জিযা বলে স্বীকার করেছেন। সাহাবীগণ (রাঃ), তাবেঈগণ, ইমামগণ এমনকি সাধারণ মুসলমানগণও একে মু'জিযা মেনে থাকেন। অথচ তাঁদের মধ্যে কেউ কখনও যাদু জানা তো দূরের কথা, ওর কাছেই যাননি। তাঁরা ওটা নিজে শিক্ষা করেননি

এবং অপরকেও শিক্ষা দেননি। তাঁরা যাদু করেননি এবং করাননি। বরং এসব কাজকে তাঁরা কুফরই বলে এসেছেন। অতঃপর এ দাবী করা যে, মু'জিযা জানা ওয়াজিব এবং যাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য যাদুর উপর নির্ভর করে, সুতরাং যাদু শিখাও ওয়াজিব হলো, এটা কতই না অর্থহীন দাবী! যাদু বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে, যা আবূ আব্দিল্লাহ রাযী বর্ণনা করেছেন।

(১) প্রথম যাদু হচ্ছে তারকা পূজকদের। তারা সাতটি গতিশীল তারকার উপর বিশ্বাস রাখে যে, ভাল-মন্দ ওদের কারণেই হয়ে থাকে। এ জন্যে তারা কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ পাঠ করতঃ ওদের পূজা করে থাকে। এ সম্প্রদায়ের মধ্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগমন করেন এবং হিদায়াত করেন। ইমাম রাযী (রঃ) এ বিষয়ের উপর একটি বিশিষ্ট পুস্তক রচনা করেছেন এবং ওর নাম اَلسِّرُّ الْمَكْتُوْبُ فِىْ مُخَاطِبَةِ الشَّمْسِ وَ النُّجُوْمِ وَ السَّاعَةِ রেখেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, পরে তিনি ওটা হতে তাওবা করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি শুধু জানাবার জন্যে এবং তাঁর এই বিদ্যা প্রকাশ করার জন্যেই এ পুস্তক লিখেছেন, এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। কেননা এটা সরাসরি কুফরী।

(২) দ্বিতীয় যাদু হচ্ছে ধারণা শক্তির উপর বিশ্বাসী লোকদের যাদু । ধারণা ও খেয়ালের বড় রকমের প্রভাব রয়েছে। যেমন একটি সংকীর্ণ সাঁকো মাটির উপর রেখে দিলে মানুষ অনায়াসেই তার উপর দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু এই সংকীর্ণ সাঁকোটি যদি নদীর উপর হয় তবে মানুষ আর তার উপর দিয়ে চলতে পারে না। কেননা ধারণা হয় যে, এখনই পড়ে যাবে। ধারণার এই দুর্বলতার কারণেই যেটুকু জায়গার উপর দিয়ে মাটিতে চলতে পারছিল, ঐ জায়গার উপর দিয়েই এরকম ভয়ের সময় চলতে পারে না। এ জন্যেই হেকিমগণ ও ডাক্তারগণ ভীত লোককে লাল জিনিস দেখা হতে বিরত রাখেন এবং মৃগী রোগে আক্রান্ত লোককে খুব বেশী আলোকময় ও দ্রুত গতিসম্পন্ন জিনিস দেখতে নিষেধ করে থাকেন। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রকৃতির উপর ধারণার একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। জ্ঞানীগণ এ বিষয়েও একমত যে, 'নযর' লেগে থাকে। সহীহ হাদীসেও এসেছে যে, 'নযর' লাগা সত্য। ভাগ্যের উপর যদি কোন জিনিস প্রাধান্য লাভকারী হতো তবে তা 'নযর্'ই হতো। এখন যদি নাফস্ শক্ত হয় তবে বাহ্যিক সাহায্য ও বাহ্যিক কার্যের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি নাফস্ ততো শক্ত না হয় তবে ঐ সব যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়। নাফ্সের যে পরিমাণ শক্তি বেড়ে যাবে সেই পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি বেড়ে যাবে এবং প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে। আর যে পরিমাণ এ শক্তি কম হবে সে পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তিও কমে যাবে।

এ শক্তি কখনও কখনও খাদ্যের স্বল্পতা এবং জনগণের মেলামেশা ত্যাগ করার মাধ্যমেও লাভ হয়ে থাকে। কখনও তো মানুষ এ শক্তির দ্বারা শরীয়ত অনুযায়ী পুণ্যের কাজ করে থাকে। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'কারামত' বলে, যাদু বলে না। আবার কখনও কখনও মানুষ এ শক্তি দ্বারা বাতিল ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করে থাকে এবং দ্বীন হতে বহু দূরে সরে পড়ে। এ রকম লোকের ঐ অলৌকিক কার্যাবলী দেখে প্রতারিত হয়ে তাকে ওয়ালী বলা কারও উচিত নয়। কেননা, যারা শরীয়তের উল্টো কাজ করে তারা কখনও আল্লাহ্র ওয়ালী হতে পারে না। তা নাহলে সহীহ হাদীস সমূহে দাজ্জালদেরকে অভিশপ্ত ও দুষ্ট বলা হতো না। অথচ তারা তো বহু অলৌকিক কাজ করে দেখাবে।

(৩) তৃতীয় যাদু হচ্ছে জ্বীন প্রভৃতি পার্থিব আত্মাসমূহের দ্বারা সহায্য প্রার্থনা করা। দার্শনিকরা ও মু'তাযেলীরা এটা স্বীকার করে না। কতগুলো লোক এসব পার্থিব আত্মার মাধ্যমে কতকগুলো শব্দ ও কার্যের দ্বারা সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে। ওকে মোহমন্ত্র ও প্রেতাত্মার যাদুও বলা হয়।

(৪) চতুর্থ প্রকারের যাদু হচ্ছে ধারণা বদলিয়ে দেয়া, নযরবন্দ করা এবং প্রতারিত করা,যার ফলে প্রকৃত নিয়মের উল্টো কিছু দেখা যায়। কলাকৌশলের মাধ্যমে কার্য প্রদর্শনকারীকে দেখা যায় যে, সে প্রথমে একটা কাজ আরম্ভ করে, যখন মানুষ একাগ্র চিত্তে ওর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে যায়, তখন তড়িৎ করে সে আর একটি কাজ আরম্ভ করে দেয়, যা মানুষের দৃষ্টির অন্তারলে থেকে যায়। তা দেখে তারা তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ফিরআউনের যাদুকরদের যাদু এ প্রকারেরই ছিল। এ জন্যেই কুরআন পাকে রয়েছেঃ 'তারা মানুষের চোখে যাদু করে দেয় এবং তাদের অন্তরে ভয় বসিয়ে দেয়।' অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'মূসার (আঃ) মনে এ ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, ঐ সব লাঠি ও দড়ি যেন সাপ হয়ে চলাফেরা করছে।' অথচ এরূপ ছিল না। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন।

(৫) পঞ্চম প্রকারের যাদু হচ্ছে কয়েকটি জিনিসের সংমিশ্রণে একটি জিনিস তৈরী করা এবং ওর দ্বারা আশ্চর্যজনক কাজ নেয়া। যেমন, ঘোড়ার আকৃতি তৈরী করে দিল। ওর উপর একজন কৃত্রিম আরোহী বসিয়ে দিল যার হাতে বাদ্য যন্ত্র রয়েছে। এক ঘন্টা অতিবাহিত হতেই ওর মধ্য হতে শব্দ বের হতে লাগল। অথচ কেউই ওকে বাজাচ্ছে না। এরূপভাবেই এমন নিপুণতার সাথে মানুষের ছবি বানালো যে, মনে হচ্ছে যেন প্রকৃত মানুষই হাসছে বা কাঁদছে। ফিরআউনের যাদুকরদের যাদুও এই প্রকারেরই ছিল। তাদের কৃত্রিম সাপগুলো পারদ জাতীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরী ছিল বলে মনে হতো যেন জীবিত সাপ নড়াচড়া

করছে। ঘড়ি, ঘন্টা এবং ছোট ছোট জিনিস, যা থেকে বড় বড় জিনিস বেরিয়ে আসে, এসবগুলোই এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে একে যাদু বলা উচিত নয়। কেননা, এটা তো এক প্রকার নির্মাণ ও কারিগরি, যার কারণগুলো সম্পূর্ণ প্রকাশ্য। যে ওটা জানে সে এসব শব্দ দ্বারা একাজ করতে পারে। যে ফন্দি বাইতুল মুকাদ্দাসের খৃষ্টানেরা করতো ওটাও এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ঐ ফন্দি এই যে, তারা গোপনে গির্জার প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দিতো। অতঃপর ওকে গির্জার মাহাত্ম্য বলে প্রচার করতঃ জনগণকে তাদের ধর্মে টেনে আনতো।

কতক কারামিয়াহ ও সুফিয়্যাহ্ সম্প্রদায়েরও ধারণা এই যে, জনগণকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শনের হাদীসগুলো বানিয়ে নিলে কোন দোষ নেই। কিন্তু এটা চরম ভুল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার নামে মিথ্যা কথা বলে সে যেন দোযখে তার স্থান ঠিক করে নেয়।' তিনি আরও বলেনঃ 'আমার হাদীসগুলো তোমরা বর্ণনা করতে থাকো; কিন্তু আমার নামে মিথ্যা কথা বলো না। যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলে সে নিঃসন্দেহে জাহান্নামী।'

একজন খ্রীষ্টান পাদরী একদা দেখে যে, পাখীর একটি ছোট বাচ্চা যা উড়তে পারে না, একটি বাসায় বসে আছে। যখন ওটা দুর্বল ও ক্ষীণ স্বর বের করছে তখন অন্যান্য পাখীরা ওর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে 'যাইতুন' ফল এনে ওর বাসায় রেখে দিচ্ছে। ঐ পাদরী কোন জিনিস দিয়ে ঐ আকারেরই একটি পাখী তৈরী করে। ওর নীচের দিক ফাঁপা রাখে এবং ওর ঠোঁটের দিকে একটি ছিদ্র রাখে, যার মধ্য দিয়ে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। অতঃপর যখন বাতাস বের হয় তখন ঐ পাখীর মতই শব্দ করে। ওটা নিয়ে গিয়ে সে গির্জার মধ্যে বাতাস মুখো রেখে দেয়। ছাদে একটি ছোট ছিদ্র করে দেয় যেন বাতাস সেখান দিয়ে যাতায়াত করে। এখন যখনই বাতাস বইতে থাকে তখনই ওটা হতে শব্দ বের হতে থাকে। আর এ শব্দ শুনে ঐ প্রকারের পাখী তথায় একত্রিত হয় এবং 'যাইতুন' ফল এনে এনে রেখে যায়। ঐ পাদরী তখন প্রচার করতে শুরু করে যে, গির্জার মধ্যে এটা এক অলৌকিক ব্যাপার। এখানে একজন মনীষীর সমাধি রয়েছে এবং এটা তাঁরই কারামত। এখন জনগণ স্বচক্ষে এটা দেখে বিশ্বাস করে নেয়। অতঃপর তারা ঐ কবরের উপর নযর-নিয়ায আনতে থাকে এবং এই কারামত বহু দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথচ ওটা না ছিল কারামত, না ছিল মু'জিযা। বরং শুধুমাত্র ছিল ওটা একটা গোপনীয় বিষয় যা সেই পাদরী; একমাত্র তার পেট পূরণের জন্যেই গোপনীয়ভাবে করে রেখেছিল। আর ঐ অভিশপ্ত দল ওতেই লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

(৬) যাদুর ষষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কতকগুলো ওষুধের গোপন কোন বৈশিষ্ট্য জেনে ওটা কাজে লাগানো। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে,এতে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চুম্বককেই তো দেখা যায় যে, ওটা কিভাবে লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে। অধিকাংশ সূফী ও দরবেশই ঐ ফন্দি ফিকিরকেই জনগণেরই মধ্যে কারামত রূপে প্রদর্শন করতঃ তাদেরকে মুরীদ করতে থাকে।

(৭) সপ্তম প্রকারের যাদু হচ্ছে কারও মধ্যে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলে যা চায় তাই তার দ্বারা করিয়ে নেয়া। যেমন তাকে বলে যে, তার 'ইসমে 'আযম' মনে আছে কিংবা জ্বিনেরা তার তাবে আছে। এখন যদি তার সামনে লোকটি দুর্বল ঈমানের লোক হয় এবং অশিক্ষিত হয় তবে তো সে তাকে বিশ্বাস করে নেবে এবং তার প্রতি তার একটা ভয় ও সম্ভ্রম থাকবে যা তাকে আরও দুর্বল করে দেবে। এখন সে যা চাইবে তাই সে করবে। আর এই প্রভাব সাধারণতঃ স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির উপরই পড়ে থাকে। একেই 'মুতাবান্নাহ' বলা হয়। আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে জ্ঞানী ও অজ্ঞানকে চিনতে পারে, কাজেই সে নিরেটের উপরই তার ক্রিয়া চাপিয়ে থাকে।

(৮) অষ্টম প্রকারের যাদু হচ্ছে চুগলী করা। সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কারও অন্তরে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং গোপনীয় চতুরতা দ্বারা তাকে বশীভূত করা। এ চুগলী যদি মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্যে হয় তবে এটা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম হবে। আর যদি এটা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের জন্যে হয় কিংবা এর ফলে যদি মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি আগত বিপদ থেকে রক্ষা করা যায় এবং কাফিরদের শক্তি নষ্ট করতঃ তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করা যায় তবে এটা বৈধ হবে। যেমন হাদীস শরীফে আছে যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মঙ্গলের জন্যে এদিক ওদিক কথা নিয়ে যায়। হাদীসে আরও আছে যে, যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণার নাম। হযরত নঈম বিন মাসউদ (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে আরবের কাফির ও ইয়াহূদীদের মধ্যে এদিক ওদিকের কথার মাধ্যমে বিচ্ছেদ আনয়ন করেছিলেন এবং এরই ফলে মুসলমানদের নিকট তাদের পরাজয় ঘটেছিল। এটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ইমাম রাযী যে যাদুর এই আটটি প্রকার বর্ণনা করেছেন তা শুধু শব্দ হিসেবে। কেননা আরবী ভাষায় سِحْرٌ বা যাদু প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয়, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল হয় এবং যার কারণসমূহ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। এজন্যেই একটি হাদীসে আছে যে, কোন কোন বর্ণনাও যাদু। আর এ কারণেই সকালের প্রথম ভাগকে 'সহূর' বলা হয়। কেননা, ওটা

মানুষের চক্ষুর অন্তরালে থাকে। আর ঐ শিরাকের 'সিহর' বলে যা আহার্যের স্থানে থাকে। আবু জেহেলও বদরের যুদ্ধে বলেছিল যে, তার খাদ্যের শিরা ভয়ে ফুলে গেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমার 'সিহর' ও 'নাহারের' মাঝে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহলে সিহ্রের অর্থ হচ্ছে খাদ্যের শিরা এবং নাহারের অর্থ হচ্ছে বুক। কুরআন পাকে আছেঃ 'তারা (যাদুকরেরা) মানুষের চক্ষু থেকে তাদের কার্যাবলী গোপন রেখেছিল। আবূ আবদুল্লাহ কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ 'আমরা বলি যে, যাদু আছে এবং এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্কে মঞ্জুর হলে তিনি যাদুর সময় যা চান তাই ঘটিয়ে থাকেন। যদিও মু'তাযিলা, আবূ ইসহাক ইসফিরাঈনী এবং ইমাম শফিঈ (রঃ) এটা বিশ্বাস করেন না।' যাদু কখনও হাতের চালাকি দ্বারাও হয়ে থাকে আবার কখনও ডোরা, সুতা ইত্যাদির মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কখনও আল্লাহর নাম পড়ে ফুঁ দিলেও একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। কখনও শয়তানের নাম নিয়ে শয়তানী কার্যাবলী দ্বারাও লোক যাদু ক'রে থাকে। কখনও ঔষধ ইত্যাদি দ্বারাও যাদু করা হয়।"রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে বলেছেনঃ 'কতকগুলো বর্ণনাও যাদু' এর দুটোই ভাবার্থ হতে পারে। হয়তো তিনি এটা বর্ণনাকারীর প্রশংসার জন্যে বলেছেন, কিংবা তার নিন্দে করেও বলে থাকতে পারেন যে, সে তার মিথ্যা কথাকে এমন ভঙ্গিমায় বর্ণনা করছে যে, তা সত্য মনে হচ্ছে।

মন্ত্রী আবূল মুযাফ্ফর ইয়াহ্ইয়া বিন মুহাম্মদ বিন হাবীর (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আল আশরাফূ আ'লা মাযাহিবিল আশরাফে' এর মধ্যে যাদু অধ্যায়ে লিখেছেনঃ 'এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, যাদুর অস্তিত্ব আছে।' কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ওটা স্বীকার করেননি। যারা যাদু শিক্ষা করে ও ওটা ব্যবহার করে তাদেরকে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ), এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) কাফির বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) কয়েকজন শিষ্যের মতে যাদু যদি আত্মরক্ষার জন্যে কেউ শিক্ষা করে তবে সে কাফির হবে না। তবে হাঁ, যারা ওর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ওকে উপকারী মনে করে সে কাফির। অনুরূপ ভাবে যারা ধারণা করে যে, শয়তানরা এ কাজ করে থাকে এবং তারা এরকম ক্ষমতা রাখে, তারাও কাফির।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যাদুকরদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি তারা বাবেলবাসীদের মত বিশ্বস রাখে এবং সাতটি গতিশীল তারকাকে প্রভাব সৃষ্টিকারীরূপে বিশ্বাস করে তবে তারা কাফির। আর যদি এ না হয়, কিন্তু যাদুকে বৈধ মনে করে তবে তারাও কাফির। ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) অভিমত এও আছে যে, যারা যাদু করে এবং ওকে

ব্যবহারে লাগায় তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যে পর্যন্ত বারবার না করে কিংবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে নিজে স্বীকার না করে সেই পর্যন্ত হত্যা করা হবে না।

তিনজন ইমামই বলেন যে, তার হত্যা হচ্ছে শাস্তির জন্যে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, এ হত্যা হচ্ছে প্রতিশোধের জন্য। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) একটি প্রসিদ্ধ উক্তিতে এ নির্দেশ আছে যে, যাদুকরকে তাওবাও করানো হবে না এবং তার তাওবা করার ফলে তার শাস্তি লোপ পাবে না।

ইমাম শাফিঈর (রঃ) মতে তার তাওবা গৃহীত হবে। একটি বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলেরও (রঃ) এ উক্তি আছে। ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) মতে কিতাবীদের যাদুকরকেও হত্যা করা হবে। কিন্তু অন্যান্য তিনজন ইমামের অভিমত এর উল্টো। লাবীদ বিন আসাম নামক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করেছিল, কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়নি। যদি কোন মুসলমান মহিলা যাদু করে তবে তার সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) মত এই যে, তাকে বন্দী করা হবে। আর অন্যান্য তিনজন ইমামের মতে পুরুষের মত তাকেও হত্যা করা হবে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন।

হযরত যুহরীর (রঃ) মতে মুসলমান যাদুকরকে হত্যা করা হবে,কিন্তু মুশরিক যাদুকরকে হত্যা করা হবে না। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি কোন যিম্মীর যাদুর ফলে কেউ মারা যায় তবে যিম্মীকেও মেরে ফেলা হবে। তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, তাকে প্রথমে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা ভালই, নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে। আবার তাঁর হতে এও বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণ করলেও তাকে হত্যা করা হবে।

যে যাদুকরের যাদুতে শিরকী শব্দ আছে, চারজন ইমামই তাকে কাফির বলেছেন। ইমাম মা'লিক (রঃ) বলেন যে, যাদুকরের উপর প্রভুত্ব লাভ করার পর যদি সে তাওবা করে তবে তার তাওবা গৃহীত হবে না। যেমন যিন্দীক সম্প্রদায়। তবে যদি তার উপর প্রভুত্ব লাভের পূর্বেই তারা তাওবা করে তা হলে তা গৃহীত হবে। আর যদি তার যাদুতে কেউ মারা যায় তবে তো তাকে হত্যা করা হবেই। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যদি সে বলেঃ 'আমি মেরে ফেলার জন্যে যাদু করিনি।' তবে ভুল করে হত্যার অপরাধে তার নিকট হতে জরিমানা আদায় করা হবে। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) যাদুকরের দ্বারা যাদু উঠিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে। হযরত আ'মের শা'বীও এটাকে কোন দোষ মনে করেন না। কিন্তু খাজা হাসান বসরী (রঃ) এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আরয করেনঃ 'আপনি যাদু তুলিয়ে নেন না কেন?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি লোকের উপর মন্দ খুলিয়ে নিতে ভয় করি।'

## যাদুর চিকিৎসা

হযরত অহাব (রঃ) বলেন যে, কুলের সাতটি পাতা পাটায় বেটে পানিতে মিশাতে হবে। অতঃপর আয়াতুল কুরসী পড়ে ওর উপর ফুঁ দিতে হবে এবং যাদুকৃত ব্যক্তিকে তিন ঢোক পানি পান করাতে হবে এবং অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। এ আমল বিশেষভাবে ঐ ব্যক্তির জন্যে খুবই মঙ্গলজনক যাকে তার স্ত্রী থেকে বিরত রাখা হয়েছে। যাদু ক্রিয়া নষ্ট করার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হচ্ছে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এ সূরাগুলো। হাদীস শরীফে আছে যে, এই সূরাগুলোর চেয়ে বড় রক্ষাকবচ আর কিছু নেই। এরকমই আয়াতুল কুরসীও শয়তানকে দূর করার জন্য বড়ই ফলদায়ক।

---

١٠٤- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১০৪। হে মুমিনগণ! তোমরা 'রায়েনা' বলো না বরং 'উনযুরনা' বলো এবং শুনে নাও; আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

١٠٥- مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১০৫। তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক এটা মুশরিকরা এবং কাফিরেরা মোটেই পছন্দ করে না, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁর করুণার জন্যে নির্দিষ্ট করে নেন, এবং আল্লাহ মহা করুণাময়।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর মুমিন বান্দাগণকে কাফিরদের কথা বার্তা এবং তাদের কাজের সাদৃশ্য হতে বিরত রাখছেন। ইয়াহূদীরা কতকগুলো শব্দ জিহবা বাঁকা করে বলতো এবং ওটা দ্বারা খারাপ অর্থ নিতো। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলতেনঃ 'আমার কথা শোনা' তখন তারা বলতোঃ رَاعِنَا এবং এর ভাবার্থ নিতো رَعُوْنَتْ অর্থাৎ অবাধ্যতা। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "ইয়াহূদীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা কথাকে প্রকৃত শব্দ হতে সরিয়ে দেয় এবং বলে আমরা শুনি, কিন্তু মানি না। তারা ধর্মকে বিদ্রূপ করার জন্যে জিহ্বাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে رَاعِنَا বলে। যদি তারা বলতো আমরা শুনলাম এবং মানলাম, আমাদের কথা শুনুন এবং আমাদের প্রতি মনোযোগ দিন, তবে এটাই তাদের জন্যে উত্তম ও উচিত হতো, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, তাদের মধ্যে ঈমান খুব কমই রয়েছে।"

হাদীসসমূহে এটাও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এরা যখন সালাম করতো তখন اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলতো। আর سَامٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। সুতরাং তোমরা তার উত্তরে وَ عَلَيْكُمْ বল। তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ কবুল হবে কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাদের দু'আ কবুল হবে না।" মোটকথা, কথা ও কাজে তাদের সাথে সাদৃশ্য নিষিদ্ধ।

মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে হযরত আবূ ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তরবারীর সঙ্গে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমার আহার্য আমার বর্শার ছায়ার নীচে রেখেছেন এবং লাঞ্ছনা ও হীনতা ঐ ব্যক্তির জন্যে–যে আমার নির্দেশের উল্টো করে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের (অমুসলিমের ) সঙ্গে সাদৃশ্য আনয়ন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' সুনান-ই-আবি দাউদের মধ্যেও এই পরের হাদীসটি বর্ণিত আছে।

এই আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, কাফিরদের কথা, কাজ, পোশাক, ঈদ ও ইবাদতের সহিত সাদৃশ্য স্থাপন করা চরমভাবে নিষিদ্ধ। শরীয়তে ওর ওপর শাস্তির ধমক রয়েছে এবং চরমভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ 'যখন তোমরা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শুনতে পাও তখন কান লাগিয়ে দাও এবং ওর প্রতি মনঃসংযোগ কর, হয়তো কোন ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া হবে কিংবা কোন মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা হবে।' হযরত খাইসুমা (রঃ) বলেনঃ 'তাওরাতে বানী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করে বলেছেনঃ يَاَيُّهَا الْمَسَاكِيْنُ, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) এর

উম্মতকে সম্মানজনক সম্বোধন করে يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا বলেছেন।' رَاعِنَا -এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দাও।' হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ "এর অর্থ হচ্ছে 'বিপরীত'। অর্থাৎ 'বিপরীত' এ কথা বলো না।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে–'আপনি আমাদের কথা শুনুন এবং আমরা আপনার কথা শুনি' আনসারগণও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে এ কথাই বলতে আরম্ভ করেছিলেন, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, رَاعِنْ বলা হয় বিদ্রুপ ও উপহাসকে। অর্থাৎ 'তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথাকে ও ইসলামকে বিদ্রূপ করো না। আবূ সাখর (রঃ) বলেনঃ "যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) চলতে থাকেন তখন কারও কিছু বলার থাকলে বলতো–'আমার দিকে কান লাগিয়ে দিন।' এ বেয়াদবীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একথা বলতে নিষেধ করেন এবং স্বীয় নবীর (সঃ) সম্মান করার শিক্ষা দেন।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, রিফাআ' বিন ইয়াযীদ নামক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে কথা বলার সময় একথাটি বলতো। মুসলমানরা এ কথাটি সম্মানজনক মনে করে এটাই নবী (সঃ)কে বলতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এটা নিষেধ করেন। যেমন সূরা-ই-নিসার মধ্যেও আছে। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ কথাটিকে খারাপ জেনেছেন এবং মুসলমানদেরকে এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা আঙ্গুরকে 'করম' এবং গোলামকে 'আব্দ' বলো না ইত্যাদি।' এখন আল্লাহ তা'আলা মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকদের হিংসা ও বিদ্বেষ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বলেছেন যে, তারা যে একজন পূর্ণাঙ্গ নবীর (সঃ) মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত লাভ করেছে এজন্যে তারা জ্বলে পুড়ে মরছে। তাদের এটা জানা উচিত যে, এটাতো আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তার উপরই অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

১০৬। আমি কোন আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকে বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা তদনুরূপ আনয়ন করি; তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান?

١٠٦- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১০৭। তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই, এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই?

١٠٧- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

**‘নস্খ’ এর মূলতত্ত্বঃ**

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ‘নসখ্’ এর অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সরিয়ে দেয়া, যা লিখার সময় (কখনও) অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) ছাত্র হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ বিন কা‘ব কারযীও (রঃ) এ রকমই বর্ণনা করেছেন। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ভুলিয়ে দেয়া। আতা‘ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ ছেড়ে দেয়া। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ উঠিয়ে নেয়া। যেমন নিম্নের আয়াতটি ঃ

اَلشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهَا اَلْبَتَّةَ

‘ব্যভিচারী বৃদ্ধ ব্যভিচারিণী বৃদ্ধাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা কর।’ আরও একটি আয়াতঃ

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى لَهَا ثَالِثًا

অর্থাৎ ‘যদি বানী আদমের জন্যে স্বর্ণের দুইটি উপত্যকা হয় তবে সে অবশ্যই তৃতীয়টি অনুসন্ধান করবে।’

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে থাকেন। যেমন হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, জায়েযকে নাজায়েয এবং নাজায়েযকে জায়েয ইত্যাদি নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা, বাধা ও অনুমতি এবং বৈধ ও অবৈধ কাজে ‘নসখ্’ হয়ে থাকে। তবে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে বা যে ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রদবদল এবং নাসিখ্ ও মানসূখ হয় না। ‘নসখ্’ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নকল করা। যেমন একটি পুস্তক থেকে আর একটি পুস্তক নকল করা হয়। এরকমই এখানেও যেহেতু একটি নির্দেশের পরিবর্তে আর একটি নির্দেশ দেয়া হয় এ জন্যে একে নসখ্ বলে। ওটা হয় নির্দেশের পরিবর্তন হোক বা শব্দের পরিবর্তন হোক।

## 'নসখ্' এর মূলতত্ত্বের উপর মূলনীতির পণ্ডিতগণের অভিমত

এ জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ধর্মীয় মূলনীতির পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ হিসেবে সবগুলো প্রায় একই। 'নসখ্' এর অর্থ হচ্ছে–কোন শরঈ নির্দেশ পরবর্তী দলীলের ভিত্তিতে সরে যাওয়া। কখনও সহজের পরিবর্তে কঠিন এবং কখনও কঠিনের পরিবর্তে সহজ হয়, আবার কখনও বা কোন পরিবর্তনই হয় না। তাবরানীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস আছে যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে একটি সূরা মুখস্থ করেছিলেন। সূরাটি তাঁরা পড়তেই থাকেন। একদা রাত্রির নামাযে সূরাটি তাঁরা পড়ার ইচ্ছে করেন কিন্তু কোনক্রমেই স্মরণ করতে পারেন না। হতবুদ্ধি হয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং ওটা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে বলেনঃ 'এটা মানসূখ হয়ে গেছে এবং এর পরিবর্তে উত্তম দেয়া হয়েছে। তোমাদের অন্তর হতে ওটা বের করে নেয়া হয়েছে। দুঃখ করো না, নিশ্চিন্ত থাক।'

হযরত যুহরী (রঃ) نُوْنٌ خَفِيْفَةٌ পেশ এর সঙ্গে পড়তেন। এর একজন বর্ণনাকারী সুলাইমান বিন রাকিম দুর্বল। আবু বকর আম্বারীও (রঃ) অন্য সনদে মারফু'রূপে এটাকে বর্ণনা করেছেন, যেমন কুরতুবীর (রঃ) বর্ণনায় রয়েছে। نُنْسِهَا কে نَنْسَاهَا ও পড়া হয়েছে। نَنْسَاهَا-এর অর্থ হচ্ছে পিছনে সরিয়ে দেয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীরে বর্ণনা করেনঃ 'অর্থাৎ আমি ওকে ছেড়ে দেই, মানসূখ করি না।' হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) ছাত্র বলেনঃ 'অর্থাৎ আমি ওর শব্দ ঠিক রেখে হুকুম পরিবর্তন করে দেই।' আব্দ বিন উমাইর (রঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং আতা' (রঃ) হতে বর্ণিত আছে 'অর্থাৎ আমি ওকে পিছনে সরিয়ে দেই।' 'আতিয়া আওফী (রঃ) বলেনঃ 'অর্থাৎ মানসূখ করি না।' সুদ্দী (রঃ) এবং রাবী' বিন আনাসও (রঃ) এটাই বলেন। যহ্হাক (রঃ) বলেনঃ 'অর্থাৎ নাসিখকে মানসূখের পিছনে রাখি।' আবুল আলিয়া (রঃ) বলেনঃ 'অর্থাৎ আমার নিকট ওটা টেনে নেই।' হযরত উমার (রাঃ) খুৎবায় نَنْسَاهَا পড়েছেন এবং ওর অর্থ 'পিছনে হওয়া' বর্ণনা করেছেন। نُنْسِهَا পড়লে ওর ভাবার্থ হবে 'আমি ওটা ভুলিয়ে দেই।' আল্লাহ তা'আলা যে হুকুম উঠিয়ে নিতে ইচ্ছে করতেন ওটা নবী (সঃ) কে ভুলিয়ে দিতেন। এভাবেই ঐ আয়াতটি উঠে যেতো।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) نُنْسِهَا পড়তেন। এতে তাঁকে হযরত কাসিম বিন আবদুল্লাহ (রঃ) বলেন যে, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) তো

একে نَنْسَأْهَا পড়তেন। তখন তিনি বলেন যে, সাঈদের (রঃ) উপর কিংবা তাঁর বংশের উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে অতি সত্বরই পড়িয়ে দিবো, অতঃপর তুমি ভুলবে না।' (৮৭ঃ ৬) আরও বলেছেনঃ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ অর্থাৎ 'যখন তুমি ভুলে যাবে তখন তোমার প্রভুকে স্মরণ কর।' (১৮ঃ ২৪)

হযরত উমারের (রাঃ) ঘোষণা রয়েছেঃ 'হযরত আলী (রাঃ) উত্তম ফায়সালাকারী এবং হযরত উবাই (রাঃ) সবচেয়ে বেশী কুরআনের পাঠক। আমরা হযরত উবাই (রাঃ)-এর কথা ছেড়ে দেই। কেননা, তিনি বলেন, 'আমি যা আল্লাহ্র রাসূলের (সঃ) মুখে শুনেছি তা ছাড়বো না, অথচ আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমি যা মানসূখ করি বা ভুলিয়ে দেই, তা হতে উত্তম বা তারই মত আনয়ন করি।' (সহীহ বুখারী ও মুসনাদ-ই-আহমাদ)

'তা হতে উত্তম হয়' অর্থাৎ বান্দাদের জন্যে সহজ ও তাদের আরাম হিসেবে, কিংবা 'তারই মত হয়'। কিন্তু আল্লাহ পাকের দূরদর্শিতা তার পরেরটাতেই রয়েছে। সৃষ্টজীবের হেরফেরকারী এবং সৃষ্টি ও হুকুমের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে যেভাবে চান সেভাবেই গঠন করেন। তিনি যাকে চান ভাগ্যবান করেন এবং যাকে চান হতভাগ্য করেন। যাকে চান সুস্থতা প্রদান করেন এবং যাকে চান রোগাক্রান্ত করেন। যাকে চান ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যাকে চান দুর্ভাগা করেন। বান্দাদের মধ্যে তিনি যে হুকুম জারী করতে চান তাই জারী করেন। যা চান হারাম করেন, যা চান হালাল করেন, যা চান অনুমতি দেন এবং যা চান নিষেধ করেন। তিনি ব্যাপক বিচারপতি। তিনি যা চান সেই আহকামই জারী করেন,তাঁর হুকুম কেউ অগ্রাহ্য করতে পারেনা। তিনি যা চান তাই করেন। কেউই তাঁকে বাধা দান করতে পারে না। তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, তারা নবী ও রাসূলদের কিরূপ অনুসারী হয়। তিনি কোন যৌক্তিকতার কারণে নির্দেশ দেন, আর কোন যৌক্তিকতার কারণে ঐ হুকুমকেই সরিয়ে দেন। তখন পরীক্ষা হয়ে যায়। ভাল লোকেরা তখনও আনুগত্যে প্রস্তুত ছিল এবং এখনও আছে কিন্তু যাদের অন্তর খারাপ, তারা তখন সমালোচনা শুরু করে দেয় এবং নাক মুখ চড়িয়ে থাকে। অথচ সমস্ত সৃষ্টজীবের সৃষ্টিকর্তার সমস্ত কথাই মেনে নেয়া উচিত এবং সর্বাবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণ করা উচিত। তিনি যা বলেন তাই সত্য জেনে পালন করা এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এস্থলেও ইয়াহূদীদের কথাকে চরমভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং তাদের কুফরীর বর্ণনা রয়েছে। তারা 'নসখ'কে স্বীকার করতো না। কেউ কেউ বলেন

যে, বিবেক অনুসারেও এতে অসুবিধে রয়েছে। আবার কেউ কেউ শরীয়তের দৃষ্টিতে একে অসুবিধাজনক মনে করে থাকেন। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা ইয়াহূদীদের কথার প্রতিবাদেই বলা হয়েছে। তারা ইঞ্জীল ও কুরআনকে মানতো না। কারণ এই যে, এ দুটির মধ্যে তাওরাতের কতকগুলো হুকুম পরিবর্তন করা হয়েছে। আর এই একই কারণে তারা এই নবীগণকেও স্বীকার করতো না। এটা শুধু অবাধ্যতা ও অহংকারই বটে। নচেৎ বিবেক হিসেবে তা 'নসখ' অসম্ভব নয়। কেননা, মহান আল্লাহ স্বীয় কার্যে সর্বাধিকারী। তিনি যা চান ও যখন চান সৃষ্টি করে থাকেন। যা চান, যেভাবে চান সে ভাবে রাখেন। এভাবেই যা চান এবং যখন চান হুকুম করে দেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, তাঁর হুকুমের উপর কারও হুকুম বের হতে পারে না। এভাবেই শরীয়তের ভিত্তিতেও এটা প্রমাণিত বিষয়। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ ও শরীয়তসমূহে এটা বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানেরা পরস্পর ভাই বোন হতো। কিন্তু তাদের মধ্যে বিয়ে বৈধ ছিল। অতঃপর পরবর্তী যুগে এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) যখন নৌকায় উঠছেন তখন সমুদয় প্রাণীর গোশত বৈধ রাখা হয়েছে। কিন্তু পরে কতকগুলোর গোশত অবৈধ ঘোষণা করা হয়। দুই বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করা হযরত ইসরাঈল (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের জন্যে বৈধ ছিল। অতঃপর তাওরাতে এবং তার পরেও অবৈধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে তাঁর পুত্র ইসমাঈলের (আঃ) কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই এই হুকুম মানসূখ করে দেয়া হয়। বানী ইসরাঈলকে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, যারা বাছুর পূজা করেছিল তাদেরকে যেন তারা হত্যা করে; অথচ অনেক বাকি থাকতেই এ হুকুম উঠিয়ে নেয়া হয়। এরকম আরও বহু ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বয়ং ইয়াহূদীরাও ওটা স্বীকার করে। কিন্তু তথাপিও তারা কুরআন মাজীদকে ও শেষ নবীকে (সঃ) এ বলে মানছে না যে, আল্লাহর কালামের পরিবর্তন অপরিহার্য হচ্ছে এবং এটা অসম্ভব। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নস্খের বৈধতা বর্ণনা করতঃ ঐ অভিশপ্ত দলের দাবী খণ্ডন করেছেন। সূরা-ই-আলে-ইমরানের মধ্যেও—যার প্রারম্ভে বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে, 'নসখ' সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'প্রত্যেক খাদ্য বানী ইসরাঈলের উপর হালাল ছিল, কিন্তু ইসরাঈল (আঃ) তার উপর যে জিনিস হারাম করে নিয়েছিল (ওটা তাদের উপর ও হারাম করা হয়েছে)। এর বিস্তারিত তাফসীর ইনশাআল্লাহ ওর স্থানে

আসবে। সব মুসলমানই এতে একমত যে, আল্লাহর আহকামের মধ্যে 'নসখ' হওয়া বৈধ, বরং সংঘটিত হয়েও গেছে এবং ওতেই আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ নৈপূণ্য প্রকাশ পেয়েছে। মুফাস্সির আবূ মুসলিম ইস্পাহানী লিখেছেন যে, কুরআনের মধ্যে 'নসখ' সংঘটিত হয়নি। কিন্তু তাঁর এই কথা দুর্বল। কুরআন মাজীদের যেখানে যেখানে 'নসখ' বিদ্যমান রয়েছে ওর উত্তর দিতে গিয়ে যদিও তিনি বহু পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু সবই বিফল হয়েছে। যে স্ত্রী লোকের স্বামী মারা যায় তার অন্যত্র বিয়ে সিদ্ধ হওয়ার জন্যে পূর্বে সময়কাল ছিল এক বছর। কিন্তু পরে এর জন্যে সময় করা হয়েছে চার মাস দশ দিন। এ দু'টো আয়াতই কুরআন পাকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

পূর্বে কিবলাহ ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। কিন্তু পরে পবিত্র কা'বাকে কিবলাহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটি স্পষ্ট এবং প্রথম আয়াতটিও আনুষঙ্গিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে মুসলমানদের উপর এই নির্দেশ ছিল যে,তারা এক একজন মুসলমান দশ জন কাফিরের মুকাবিলা করবে এবং পিছনে সরে আসবে না; কিন্তু পরে এ হুকুম মানসূখ হয়ে গিয়ে একজন মুসলমানকে দু'জন কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দুটি আয়াতই আল্লাহ তা'আলার কালামে বিদ্যমান রয়েছে।

পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে আলাপ করার আগে কিছু সাদকা করার নির্দেশ ছিল। পরে এটা মানসূখ করে দেয়া হয়। আর এ দু'টি আয়াতই কুরআন কারীমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

---

১০৮। তোমরা কি চাও যে, তোমাদের রাসূলের নিটক আবেদন করবে যেমন ইতিপূর্বে মূসার নিকট (হঠকারিতা বশতঃ এইরূপ বহু নিরর্থক) আবেদন করা হয়েছিল? আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করে নিশ্চয় সে সঠিক পথ হতে দূরে সরে পড়ে।

১০৮- اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـــئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

## অধিক আবেদন ও জিজ্ঞাসাবাদ হতে নিষেধাজ্ঞা

এ পবিত্র আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে কোন ঘটনা ঘটার পূর্বে তাঁর রাসূল (সঃ) কে বাজে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। এ অধিক প্রশ্নের অভ্যাস খুবই জঘন্য। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'হে মুমিনগণ! ঐ সব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যে, যদি ওটা প্রকাশ করে দেয়া হয় তবে তোমাদের খারাপ লাগবে এবং যদি কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার যুগে এসব প্রশ্ন করতে থাকো তবে এসব বিষয় প্রকাশ করে দেয়া হবে। কোন জিনিস ঘটে যাওয়ার পূর্বে ওটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ ভয় রয়েছে যে, প্রশ্ন করার দরুন না জানি ওটা হারাম হয়ে যায়।'

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি, যে এমন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করে যা হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে যায়।'

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর কাছে অপর কোন লোককে পায় তবে সে কি করবে? যদি জনগণকে সংবাদ দেয় তবে তো বড় লজ্জার কথা হবে, আর যদি চুপ থাকে তবে ওটাও নির্লজ্জের মত কাজ হবে। এ প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খুবই খারাপ মনে হলো। ঘটনাক্রমে ঐ লোকটিরই এ ঘটনা ঘটে গেল এবং লি'আনের হুকুম নাযিল হয়ে গেল।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাজে কথা, সম্পদ নষ্ট করা এবং বেশী প্রশ্ন করা হতে নিষেধ করেছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি যতক্ষণ কিছু না বলি ততক্ষণ তোমরাও কিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করো না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোককে এই বদঅভ্যাসই ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা খুব বেশী প্রশ্ন করতো এবং তাদের নবীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতো। আমি যদি তোমাদেরকে কিছু নির্দেশ দেই তবে সাধ্যানুসারে তা পালন কর।' এ কথা তিনি ঐ সময় বলেছিলেন যখন তিনি জনগণকে বলেছিলেনঃ 'তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলা হজ্ব ফরয করেছেন।' তখন কেউ বলেছিলঃ ' হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) প্রতি বছরই কি? তিনি নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিল; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি। সে তৃতীয় বার এ প্রশ্নই করলে তিনি বলেছিলেনঃ 'প্রতি বছর নয়; কিন্তু যদি আমি 'হাঁ' করে দিতাম তবে ওটা প্রতি বছরই ফরয হয়ে যেতো। অতঃপর তোমরা ওটা পালন করতে পারতে না।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ 'যখন থেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হতে বিরত রাখা হয় তখন থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে কোন প্রশ্ন করতে খুবই ভয়

করতাম। আমরা ইচ্ছে পোষণ করতাম যে, কোন গ্রাম্য অশিক্ষিত বেদুঈন জিজ্ঞেস করলে আমরা শুনতে পেতাম।'

হযরত বারা' বিন আযিব (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করতাম, বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যেতো, কিন্তু আমি ভয়ে জিজ্ঞেস করতে সাহস করতাম না, আশা পোষণ করতাম যে, যদি কোন বেদুঈন এসে প্রশ্ন করতো তবে আমরাও শুনতে পেতাম।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) হতে উত্তম দল আর নেই। তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে শুধুমাত্র বারোটি প্রশ্ন করেছিলেন। ঐ সব প্রশ্ন ও উত্তর কুরআন পাকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন মদ্য ইত্যাদির প্রশ্ন, হারাম মাসগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন, পিতৃহীন বালকদের সম্পর্কে প্রশ্ন ইত্যাদি।'

এখানে أَمْ শব্দটি হয়তো বা بَلْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিংবা স্বীয় মূল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্নের ব্যাপারে, যা এখানে অস্বীকৃতি সূচক। এ নির্দেশ মুমিন ও কাফির সবারই জন্যে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালত সবার জন্যেই ছিল। কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে আছেঃ 'আহলে কিতাব তোমার নিকট আবেদন করে যে, তুমি তাদের উপর কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করবে, মূসার (আঃ) নিকট তো এর চেয়ে বড় আবেদন জানানো হয়েছিল, (তা হচ্ছে) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে চাই, ঐ অত্যাচারের কারণে তাদেরকে একটা ভয়ানক শব্দের দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়।'

রাফে' বিন হুরাইমালা এবং জাহার বিন ইয়াযীদ বলেছিলঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন আসমানী কিতাব আমাদের উপর অবতীর্ণ করুন যা আমরা আমাদের শহরে প্রচার করবো, তাহলে আমরা মানবো।'

এতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বানী ইসরাঈলের পাপ মোচন যেমনভাবে হয়েছিল ঐভাবেই যদি আমাদের পাপ মোচন হতো তবে কতই না ভাল হতো! এটা শুনা মাত্রই তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহ! আমরা এটা চাইনে।' অতঃপর বলেনঃ 'বানী ইসরাঈল যেখানে কোন পাপ কার্য করতো তা ওর দরজার উপর লিখিত পাওয়া যেতো এবং সঙ্গে সঙ্গে ওটা মোচনেরও মাধ্যম লিখে দেয়া হতো। এখন হয় তারা দুনিয়ার লাঞ্ছনা মঞ্জুর করতঃ কাফ্ফারা আদায় করবে এবং গোপন পাপ প্রকাশ করবে, কিংবা কাফ্ফারা আদায় না করে পারলৌকিক শাস্তি মঞ্জুর করবে। কিন্তু তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'যার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হয়ে যায় কিংবা সে স্বীয় নাফসের উপর অত্যাচার করে বসে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।' এরকমই এক নামায অন্য নামায পর্যন্ত ক্ষমার কারণ হয়ে যায়, আবার এক জুম'আ দ্বিতীয় জুম'আ পর্যন্ত পাপ

কার্যের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। জেনে রেখো, যে ব্যক্তি খারাপ কাজের ইচ্ছে করে কিন্তু তা করে বসে না, ওর পাপ লিখা হয় না; আর যদি করে বসে তবে এটাই পাপ লিখা হয়। আর যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছে করে কিন্তু করে না ফেলে, তবে ওর জন্যে একটি পুণ্য লিখা হয় এবং যদি করে ফেলে তবে ওর জন্যে দশটি পুণ্য লিখা হয়। আচ্ছা তা হলে বলতো, তোমরা ভাল হলে, না বানী ইসরাঈল ভাল হলো? না, না, বানী ইসরাঈল অপেক্ষা তোমাদের উপর বহু সহজ করা হয়েছে। এতো দয়া ও মেহেরবানীর পরেও যদি তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও তবে বুঝতে হবে যে, তোমরা নিজে নিজেই ধ্বংস হয়েছো।' সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলেছিলোঃ 'সাফা পাহাড়টি যদি সোনার হয়ে যায় তবে আমরা ঈমান আনবো।' তিনি বলেনঃ 'তা হলে তোমাদের পরিণাম মায়েদাহ্ (আসমানী আহার্য)-এর জন্যে আবেদনকারীদের মতই হয়ে যাবে।' তখন তারা এ আবেদন প্রত্যাহার করে। ভাবার্থ এই যে, অহংকার, অবাধ্যতা এবং দুষ্টামির সাথে নবীগণকে প্রশ্ন করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ।

যে ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে এবং সহজের পরিবর্তে কঠিনকে গ্রহণ করে নেয়, সে সরল পথ থেকে সরে গিয়ে মুর্খতা ও ভ্রান্তির পথে পড়ে যায়। অনুরূপভাবে বিনা প্রয়োজনে যারা প্রশ্ন করে তাদের অবস্থাও তাই। কুরআন পাকের মধ্যে এক জায়গায় আছেঃ 'তোমরা কি ঐ লোকদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ্র নিয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলিয়ে নেয় এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে? সে দোযখে প্রবেশ করবে এবং ওটা অত্যন্ত জঘন্য স্থান।'

---

**১০৯। কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছে করে; কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাকো; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি ক্ষমতাবান।**

١٠٩- وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১১০। আর তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর; এবং তোমরা স্ব-স্ব জীবনের জন্যে যে সৎকর্ম অগ্রে প্রেরণ করেছো; তা আল্লাহর নিকট প্রাপ্ত হবে; তোমরা যা করছো নিশ্চয় আল্লাহ তার পরিদর্শক।

١١٠- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

## শান-ই-নুযূল

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুহাই বিন আখতাব এবং ইয়াসির বিন আখতাব এই দু'জন ইয়াহূদী মুসলমানদের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী হিংসা পোষণ করতো। তারা জনগণকে ইসলাম থেকে সরিয়ে রাখতো। তাদের সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কা'ব বিন আশরাফ ইয়াহূদীও এ কাজেই লিপ্ত থাকতো।

ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি কা'ব বিন আশরাফের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয় । সে কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুর্নাম করতো। যদিও তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান ছিল এবং সে মুহাম্মদ (সঃ)-এর গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিল ও তাঁকে ভালভাবেই চিনতো, আবার যদিও সে এও স্বচক্ষে দেখছিল যে, কুরআন মাজীদ তাদের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং এও লক্ষ্য করছিল যে, একজন নিরক্ষর লোক এ কিতাব পাঠ করছেন, যা সরাসরি মু'জিযা তথাপি তিনি যে আরবে প্রেরিত হয়েছিলেন শুধুমাত্র এ কারণেই হিংসার বশবর্তী হয়ে সে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও কুরআন পাককে অস্বীকার করেছিল এবং জনগণকে পথভ্রষ্ট করতে আরম্ভ করেছিল। সেই সময় গভীর পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ঐ সব ইয়াহূদীকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে এবং আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ 'তোমাদেরকে মুশরিক ও কিতাবীদের বহু অপছন্দনীয় কথা শুনতে হবে।'

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অনুমতি প্রদান করেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) এ আয়াতের উপর আমল করতঃ মুশরিক ও আহলে কিতাবকে ক্ষমা করতেন এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য

করতেন। অতঃপর অন্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তার ফলে পূর্বের নির্দেশ উঠে যায়। এখন তাঁদেরকে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। আর বদর প্রান্তরে যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেই মুশরিকরা ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দের মৃত দেহে ময়দান ভর্তি হয়ে যায়।

এখন মু'মিনদেরকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যে, যদি তারা নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত সঠিকভাবে পালন করে তবে তাদের পরকালের শাস্তির রক্ষাকবচ ছাড়াও দুনিয়াতেও মুশরিক ও কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার কারণ হয়ে যাবে। এরপর মুমিনদেরকে বলা হচ্ছে যে, তাদের ভাল কাজের প্রতিদান উভয় জগতেই দেয়া হবে। তাঁর নিকট ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয়, ভাল ও মন্দ কোন কাজই গোপন থাকে না। মুমিনদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে রক্ষার জন্যেই মহান আল্লাহ এটা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা مُبْصِرٌ-এর পরিবর্তে بَصِيرٌ বলেছেন, যেমন مُبْدِعٌ-এর পরিবর্তে بَدِيعٌ এবং مُؤْلِمٌ-এর পরিবর্তে اَلِيْمٌ বলেছেন। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) কর্তৃক সংকলিত হাদীসসমূহের একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতে سَمِيعٌ بَصِيرٌ পড়তেন এবং বলতেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকেই দেখে থাকেন।'

১১১। এবং তারা বলে— যারা ইয়াহূদী বা খ্রীষ্টান হয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না, এটাই তাঁদের বাসনা; তুমি বল— যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

১১১- وَقَالُوا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১১২। অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, ফলতঃ তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন আশংকা নেই ও তারা সন্তপ্ত হবে না।

১১২- بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ ع

১১৩। আর ইয়াহূদীগণ বলে যে, খ্রীষ্টানেরা কোন বিষয়ের উপর নেই এবং খৃষ্টানেরা বলে যে, ইয়াহূদীরাও কোন বিষয়ের উপর নেই; অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে। এরূপ যারা জানে না, তারাও ওদের কথার অনুরূপ কথা বলে থাকে; অতএব যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল, উত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের মধ্যে তদ্বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন।

١١٣- وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُونَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

## ইয়াহূদীদের প্রতারণা, আমিত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার উপর ভীষণ সতর্কতা

এখানে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের অহংকার ও আত্মম্ভরিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেও কিছুই মনে করতো না এবং স্পষ্টভাবে বলতো যে, তারা ছাড়া অন্য কেউ বেহেশ্‌তে যাবে না। সূরা মায়েদায় তাদের নিম্নরূপ একটা উক্তিও বর্ণিত হয়েছেঃ 'আমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তান এবং তাঁর প্রিয়।' তাদের এ কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছেঃ 'তা হলে কিয়ামতের দিন তোমাদের উপর শাস্তি হবে কেন?' অনুরূপভাবে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উক্তি নিম্নরূপও ছিলঃ 'আমরা কয়েকটা দিন দোযখে অবস্থান করবো।' তাদের একথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তাদের এই দাবীও দলীল বিহীন। এভাবেই এখানেও তিনি তাদের একটা দাবী খণ্ডন করতঃ বলেনঃ 'দলীল উপস্থিত কর দেখি?' তাদের অপারগতা সাব্যস্ত করে পুনরায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 'হাঁ, যে কেউই আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে ইখলাসের সাথে সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে, সে পূর্ণভাবে তার প্রতিদান লাভ করবে।' যেমন তিনি আর এক জায়গায় বলেছেনঃ 'তারা যদি ঝগড়া করে তবে তাদেরকে বলে দাও– আমি এবং আমার অনুসারীগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি।'

মোট কথা, অন্তরের বিশুদ্ধতা ও সুন্নাতের অনুসরন প্রত্যেক আমল গ্রহণ যোগ্য হওয়ার জন্যে শর্ত। তাহলে أَسْلَمَ وَجْهَهُ-এর ভাবার্থ হচ্ছে 'অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং وَهُوَ مُحْسِنٌ-এর ভাবার্থ হচ্ছে সুন্নাতের অনুসরণ। শুধু মাত্র বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই আমলকে গ্রহণযোগ্য করতে পারে না যে পর্যন্ত না সে সুন্নাতের প্রতি অনুগত থাকে। হাদীস শরীফে উল্লিখিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা গ্রহণীয় নয়' (সহীহ মুসলিম)। সুতরাং 'সংসার ত্যাগ' কাজটি বিশুদ্ধ অন্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সুন্নাতের উল্টো বলে গ্রহণীয় নয়। তদ্রূপ আমল সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا۔

অর্থাৎ 'তারা যা আমল করেছিল আমি তা সবই অগ্রাহ্য করেছি।' (২৫ঃ২৩) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'কাফিরদের আমল বালুর চকে চকে মরীচিকার মত, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে থাকে, কিন্তু যখন তার কাছে যায় তখন কিছুই পায় না।' অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'কিয়ামতের দিন বহু মুখমণ্ডলের উপর অপমানের কালিমা নেমে আসবে, তারা কাজ করতেও কষ্ট উঠাতে থাকবে এবং জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করবে, আর তাদেরকে গরম পানি পান করতে দেয়া হবে।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে এর ভাবার্থ নিয়েছেন ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের আলেম ও আবেদগণ। এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, বাহ্যতঃ কোন কাজ সুন্নাতের অনুরূপ হলেও ঐ আমলে অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না থাকার কারণে উক্ত আমলও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। কপট ও মুনাফিকদের অবস্থাও এরূপই। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 'মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেয়, তিনিও তাদেরকে ধোঁকা দেন; যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়, তারা মানুষকে দেখাবার জন্যেই শুধু আমল করে থাকে।' তিনি আরো বলেনঃ 'ঐ সব নামাযীর জন্যে ধ্বংস ও বিধ্বস্তি রয়েছে যারা নামাযে উদাসীন থাকে এবং যারা শুধু লোক দেখানোর জন্যে নামায পড়ে, আর যাকাত দেয়া হতে বিরত থাকে।' অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ 'সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ লাভের আকাংখা রাখে সে যেন সৎকাজ করতে থাকে এবং স্বীয় প্রভুর ইবাদতে অন্য কাউকেও অংশীদার না করে'। আরও বলেছেনঃ 'তাদেরকে তাদের প্রভু পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং ভয় ও সন্ত্রাস হতে রক্ষা করবেন। পরকালে তাদের কোন ভয় নেই এবং দুনিয়া ত্যাগ করতে তাদের কোন দুঃখ নেই।'

অতঃপর আল্লাহ পাক ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতার বর্ণনা দেন। নাজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধিরা যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর

নিকট আগমন করে তখন ইয়াহূদী পণ্ডিতেরাও আসে। অতঃপর তারা একদল অপর দলকে পথভ্রষ্ট আখ্যায় আখ্যায়িত করে। অথচ উভয় দলই আহ্লে কিতাব। তাওরাতের মধ্যে ইঞ্জীলের এবং ইঞ্জীলের মধ্যে তাওরাতের সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাদের এসব কথা একেবারেই বাজে ও ভিত্তিহীন।

পূর্ববর্তী ইয়াহূদী ও খৃষ্টানেরা সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু পরে তারা বিদআত ও ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়ায় ধর্ম তাদের হতে ছিনিয়ে নেওয়া হয়; অতঃপর ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান কেউই আর সঠিক পথের উপর ছিল না তার পরে মহান আল্লাহ বলেনঃ 'মূর্খ ও নিরক্ষরেরাও এরূপ কথাই বলে।' এতেও ইঙ্গিত তাদের দিকেই রয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের পূর্বেকার লোক। কেউ কেউ আবার 'আরবের লোক' ভাবার্থ নিয়েছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এর দ্বারা সাধারণ ভাবার্থ নিয়েছেন, যার মধ্যে সবাই জড়িত রয়েছে আর এটাই সঠিক। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আল্লাহ পাক তাদের মতবিরোধের ফায়সালা কিয়ামতের দিন করবেন, যেদিন কোন অত্যাচার ও বল প্রয়োগ থাকবে না।' অন্য স্থানেও এ বিষয়টি আনা হয়েছে। সূরা-ই-হাজ্জ-এর মধ্যে এরশাদ হচ্ছেঃ 'আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন মুমিন, ইয়াহূদী, সাবেঈ, খ্রীষ্টান, মাজূস এবং মুশরিকদের মধ্যে ফায়সালা করবেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী আছেন।'

আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– আমাদের প্রভু আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ন্যায় সঙ্গতভাবে ফায়সালা করবেন, তিনি বড় ফায়সালাকারী ও সর্বজ্ঞাত।'

---

১১৪। এবং যে কেউ আল্লাহ্র মসজিদসমূহের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছে এবং তা উৎসন্ন করতে চেষ্টিত হয়েছে–তার অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় যে, তারা শংকিত হওয়া ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ করে; তাদের জন্যে ইহলোকের দুর্গতি এবং তাদের জন্যে পরলোকে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

١١٤- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

এ আয়াতের তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এর দ্বারা খ্রীষ্টানকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় উক্তিতে ভাবার্থ হচ্ছে মুশরিক। খ্রীষ্টানেরাও বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে অপবিত্র জিনিস নিক্ষেপ করতো এবং জনগণকে তার ভিতরে নামায পড়তে বাধা প্রদান করতো। বাখতে নসর যখন বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ চালায় তখন খ্রীষ্টানেরা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল।

## বাখতে নসরের ইতিহাস এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর তার ভয়াবহ আক্রমণ

বাখতে নসর ছিল বাবেলের অধিবাসী এবং জাতিতে সে মাজূস ছিল। বানী ইসরাঈলের প্রতি হিংসা বশতঃ এবং তারা হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়াকে (আঃ) হত্যা করেছিল বলে খ্রীষ্টানেরাও তার সাথে যোগ দিয়েছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর মুশরিকরাও রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে কা'বা শরীফে যেতে বাধা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'যি তাওয়া' নামক স্থানে কুরবানী করতে হয়েছিল। মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখান হতে ফিরে এসেছিলেন। অথচ ওটা একটা নিরাপদ স্থান ছিল। পিতা-ভ্রাতার হত্যাকারীকেও কেউ তথায় স্পর্শ করতো না। তাদেরও এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওটাকে ধ্বংস করা এবং আল্লাহর যিক্র হতে ও হজ্জ এবং উমরাব্রত পালনকারী মুসলিম দলকে বাধা দেয়া। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এটাই উক্তি। ইবনে জারীর (রাঃ) প্রথম উক্তিকেই সঠিক বলেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মুশরিকরা (রঃ) কা'বা শরীফ ধ্বংস করার চেষ্টা করতো না, বরং খ্রীষ্টানেরাই বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় উক্তিটিই সঠিক। ইবনে যায়েদ (রঃ) ও হযরত আব্বাসেরও (রাঃ) এটাই উক্তি।

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যখন খ্রীষ্টানেরা ইয়াহূদীদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে বাধা দেয় তখন ইয়াহূদীরাও বে-দ্বীন হয়ে পড়ছিল। তাদের উপর তো হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত ঈসার (আঃ) বদ-দু'আ ছিল। তারা অবাধ্য ও সীমা অতিক্রমকারী হয়ে গিয়েছিল। বরং খ্রীষ্টানেরাই হযরত ঈসার (আঃ) ধর্মের উপর ছিল।

এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াত দ্বারা মক্কার মুশরিকদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তা ছাড়া এ ভাবার্থ নেওয়ার এটাও একটা কারণ যে, উপরে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের নিন্দের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আরবের মুশকিরদের বদ অভ্যাসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে এবং তার সহচরবৃন্দকে (রাঃ) মক্কা থেকে বের করে দেয় এবং হজ্জব্রত ও উমরাব্রত পালন করতে বাধা দেয়।

## বায়তুল্লাহ শরীফের বিধ্বস্তির একটা নতুন বর্ণনাক্রমিক তালিকা

ইমাম ইবনে জারীরের (রঃ) 'মক্কার মুশরিকেরা বায়তুল্লাহর বিধ্বস্তির চেষ্টা করেনি' এই উক্তির উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সহচরবৃন্দকে (রাঃ) মক্কা হতে বিতাড়িত করা এবং পবিত্র কা'বার মধ্যে মূর্তি স্থাপন করার চাইতে বড় ধ্বংস আর কি হতে পারে? স্বয়ং কুরআন পাকে ঘোষিত হচ্ছেঃ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ 'তারা মসজিদ-ই-হারাম হতে বাধা প্রদান করে।' (৮ঃ৩৪) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এসব লোক মাসজিদ-ই-হারাম হতে বাধা দিয়ে থাকে।' অন্যত্র বলেনঃ 'মুশরিকদের দ্বারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহ আবাদ হতে পারে না, তারা নিজেরাই তাদের কুফরীর উপর সাক্ষী, তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে, তারা চিরকালের জন্যে দোযখী।' মসজিদসমূহের আবাদ ঐ সব লোক দ্বারা হয়ে থাকে, যারা আল্লাহ্র উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে ও শুধুমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় করে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।'

আল্লাহ পাক আর এক জায়গায় বলেনঃ 'ঐ সব লোক কুফরীও করেছে এবং তোমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) মসজিদ-ই-হারাম হতে বাধাও দিয়েছে, কুরবানীর পশুগুলোকে যবাহ হওয়ার স্থান পর্যন্ত পৌঁছুতেও দেয়নি, আমি ঐসব নর ও নারীর প্রতি যদি লক্ষ্য না করতাম যারা দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার কারণে মক্কা হতে বের হতে পারে না, তবে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, কিন্তু এই নিষ্পাপ মুসলমানেরা নিষ্পেষিত হয়ে যাবে বলে আমি সরাসরি এ হুকুম দেইনি; কিন্তু যদি এ কাফিরেরা তাদের দুষ্টামি থেকে বিরত না হয় তবে ঐ সময় দূরে নেই যখন আমার বেদনাদায়ক শাস্তি তাদের প্রতি নিপতিত হবে।' সুতরাং ঐ সব মুসলমানকে যখন মসজিদসমূহে প্রবেশ হতে বিরত রাখা হয়েছে, যাদের দ্বারা মসজিদসমূহ আবাদ হয়ে থাকে, তখন মসজিদগুলো ধ্বংস করতে আর বাকি রাখলো কি? মসজিদের আবাদ শুধুমাত্র বাহ্যিক রং ও চাকচিক্যের দ্বারা হয় না; বরং ওর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যিক্র হওয়া, শরীয়তের কার্যাবলী চালু থাকা, শির্ক ও বাহ্যিক ময়লা হতে পবিত্র রাখাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মসজিদকে আবাদ করা।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন যে, মসজিদের মধ্যে নির্ভীকভাবে প্রবেশ করা মুশরিকদের জন্যে মোটেই শোভা পায় না। ভাবার্থ এই যে, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা মুশরিকদেরকে নির্ভীক চিত্তে আল্লাহর ঘরে (কা'বা শরীফে) প্রবেশ করতে দেবে না, আমি যখন তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবো তখন

তোমাদেরকে এ কাজই করতে হবে।' অতঃপর মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেনঃ 'এ বছরের পরে যেন কোনও মুশরিক হজ্জ করতে না আসে এবং কেউই যেন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ উলঙ্গ হয়ে না করে। যে সব লোকের মধ্যে সন্ধির সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে তা ঠিকই থাকবে।' প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশ নিম্নের এই আয়াতেরই সত্যতা প্রমাণ করছে ও তার উপর আমল করছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا -

অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র,সুতরাং তারা যেন এ বছরের পর হতে আর 'মাসজিদ-ই হারাম'-এর নিকটবর্তী না হয়।' (৯ঃ ২৮) অন্য অর্থও বর্ণনা করা হয়েছেঃ 'মুশরিকদের জন্যে তো এটাই উচিত ছিল যে, তারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মসজিদে প্রবেশ করে, কিন্তু এটা না করে তারা সম্পূর্ণ উল্টো করছে অর্থাৎ তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করছে।' এর ভাবার্থ এও হতে পারেঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি অতি সত্বরই মুমিনদেরকে মুশরিকদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং তার ফলে এই মুশরিকরা মসজিদের দিকে মুখ করতেও থর থর করে কাঁপতে থাকবে– আর হলোও তাই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন যে, আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম থাকতে পারে না এবং ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তথা হতে বের করে দেয়া হবে। এই উম্মতের ঐ মহান ব্যক্তিগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ উপদেশ কার্যে পরিণত করে দেখিয়ে দেন। এর দ্বারা মসজিদসমূহের মর্যাদাও সাব্যস্ত হলো। বিশেষ করে ঐ স্থানের মসজিদের মর্যাদা সাব্যস্ত হলো যেখানে দানব ও মানব সবারই জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।

ঐ কাফিরদের উপর দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও অপমানও এসে গেল এবং যেমন তারা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছিল, ঠিক তেমনই তাদের উপর পুর্ণ প্রতিশোধ নেয়া হলো। তাদেরকেও বাধা দেয়া হলো, আর পরকালের শাস্তি তো অবশিষ্ট থাকলই। কেননা, তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে, মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের নিকট প্রার্থনা করা শুরু করে দিয়েছে, উলঙ্গ হয়ে তারা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেছে ইত্যাদি।

আর যদি এর ভাবার্থ খ্রীষ্টানদেরকে নেয়া হয় তবে এটা স্পষ্ট কথা যে, তারাও বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে আতংক সৃষ্টিকারীরূপে এসেছে, বিশেষ করে ঐ পাথরের তারা অমর্যাদা করেছে যেই দিকে ইয়াহূদীরা নামায পড়তো।

এভাবেই ইয়াহূদীরাও অমর্যাদা করেছে এবং খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা অনেক বেশী করেছে। কাজেই অপমান ও লাঞ্ছনাও তাদের উপর খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা বেশী এসেছে। দুনিয়ার অপমানের অর্থ হচ্ছে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগের অপমান এবং মুসলমানদেরকে জিযিয়া কর দিতে বাধ্য হওয়ার অপমানও বটে। হাদীসে একটি দু'আ এসেছেঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাদের সমস্ত কাজের পরিণাম ভাল করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার অপমান ও আখেরাতের শাস্তি হতে মুক্তি দান করুন।' এ হাদীসটি হাসান। এটা মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসের মধ্যে এটা নেই। এর একজন বর্ণনাকারী হযরত বাশার বিন ইরতাত একজন সাহাবী। এই সাহাবী (রাঃ) হতে এই একটি হাদীস বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ঐ হাদীসটি বর্ণিত আছে যার মধ্যে রয়েছে যে, যুদ্ধে হাত কাটা হয় না।

**১১৫। আল্লাহরই জন্যে পূর্ব ও পশ্চিম; অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্র চেহারা বিরাজমান; কেননা আল্লাহ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী-পূর্ণ জ্ঞানবান।**

١١٥- وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

## অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এবং তাঁর সাহাবীবর্গকে (রাঃ) সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, যাঁদেরকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ও তাঁর মসজিদে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখা হয়েছে। মক্কায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তখন কা'বা শরীফও সামনে থাকতো। মদীনায় আগমনের পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই তাঁরা নামায পড়েন। কিন্তু পরে আল্লাহ পাক কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন।

## কুরআন মাজীদে সর্বপ্রথম রহিতকৃত (মানসূখ) হুকুম

ইমাম আবূ আবীদ কাসিম বিন সালাম (রঃ) স্বীয় পুস্তক 'নাসিখ ওয়াল মানসূখ' এর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মানসূখ হুকুম হচ্ছে এই কিবলাহ্ই অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতটিই। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকেন। অতঃপর নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ঃ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ 'যেখান হতেই তুমি বাইরে যাবে, স্বীয় মুখ মণ্ডল মাসজিদ-ই-হারামের দিকে রাখবে।' (২ঃ ১৪৯) তখন তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়তে শুরু করেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকলে ইয়াহূদীরা খুবই খুশী হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরে যখন এই হুকুম মানসূখ হয়ে যায় এবং তাঁর আকাংখা ও প্রার্থনা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়ার জন্যে আদিষ্ট হন তখন ঐ ইয়াহূদীরাই তাঁকে বিদ্রূপ করে বলতে থাকে যে, কিবলাহ্ পরিবর্তিত হলো কেন? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ইয়াহূদীদেরকে যেন বলা হচ্ছে যে, এ প্রতিবাদ কেন? যে দিকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হবে সে দিকেই ফিরে যেতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে 'পূর্ব ও পশ্চিম যেখানেই থাকো না কেন মুখ কা'বা শরীফের দিকে কর।' কয়েকজন মনীষীর বর্ণনা আছে যে, এ আয়াতটি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ভাবার্থ এই যে, পূর্ব ও পশ্চিম যে দিকেই চাও মুখ ফিরিয়ে নাও, সব দিকই আল্লাহ তা'আলার এবং সব দিকেই তিনি বিদ্যমান রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হতে কোন জায়গা শূন্য নেই। যেমন তিনি বলেনঃ

وَ لَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا

অর্থাৎ 'অল্প বেশী যাই হোক না কেন, যেখানেই হোক না কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন।' (৫৮ঃ ৭) অতঃপর এই নির্দেশ উঠে গিয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা ফরয হয়ে যায়।

এ উক্তির মধ্যে রয়েছে যেঃ 'আল্লাহ তা'আলা হতে কোন জায়গা শূন্য নেই' এর ভাবার্থ যদি আল্লাহ তা'আলার 'ইল্‌ম' বা অবগতি হয় তবে তো অর্থ

সঠিকই হবে যে, 'কোন স্থানই আল্লাহ্ পাকের ইল্‌ম হতে শূন্য নেই।' আর যদি এর ভাবার্থ হয় 'আল্লাহ আ'আলার সত্তা' তবে এটা সঠিক হবে না। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্য হতে কোন জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন তা থেকে তাঁর পবিত্র সত্তা বহু উর্ধে। এ আয়াতটির ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ নির্দেশ হচ্ছে সফরে দিক ভুলে যাওয়ার সময় ও ভয়ের সময়ের জন্যে। অর্থাৎ এ অবস্থায় নফল নামায যে কোন দিকে মুখ করে পড়লেই চলবে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর উষ্ট্রীর মুখ যে দিকেই থাকতো তিনি সেই দিকেই ফিরে নামায পড়ে নিতেন এবং বলতেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিয়ম এটাই ছিল।' সুতরাং এ আয়াতের ভাবার্থ এটাও হতে পারে। আয়াতের উল্লেখ ছাড়াই এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, জামে'উত তিরমিযী, সুনান-ই- নাসাঈ, মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম, তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই ইত্যাদির মধ্যেও বর্ণিত আছে এবং মূল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) কে যখন ভয়ের সময়ের নামায পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হতো তখন ভয়ের নামাযের বর্ণনা করতেন এবং বলতেনঃ 'এর চেয়েও বেশী ভয় হলে পায়ে চলা অবস্থায় এবং আরোহণের অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নিও–মুখ কিবলার দিকে হোক আর নাই হোক।'

হযরত নাফে' (রঃ) বর্ণনা করেনঃ 'আমার ধারণায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) ওটা মারফু' রূপে বর্ণনা করতেন।' ইমাম শাফিঈর (রঃ) প্রসিদ্ধ উক্তি এবং ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) উক্তি রয়েছে যে, সফরে সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া জায়েয, সেই সফর নিরাপদেরই হোক বা ভীতি পূর্ণই হোক বা যুদ্ধেরই হোক। ইমাম মালিক (রঃ) এবং তাঁর দল এর উল্টো বলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং আবূ সাঈদ ইসতাখারী (রঃ) সফর ছাড়া অন্য সময়েও নফল নামায সওয়ারীর উপর পড়া জায়েয বলে থাকেন। হযরত আনাসও (রাঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারীও (রঃ) এটা পছন্দ করেছেন। এমনকি তিনি তো পায়ে চলা অবস্থায়ও এটা বৈধ বলেছেন। কোন মুফাস্সিরের মতে এ আয়াতটি ঐ সব লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা কিবলাহ্ সম্পর্কে অবহিত ছিল না এবং নিজ নিজ ধারণা মতে বিভিন্ন দিকে মুখ করে নামায পড়েছিল। এ আয়াতের দ্বারা তাদের নামাযকে সিদ্ধ বলা হয়েছে।

হযরত রাবেআহ্ (রাঃ) বলেন–'আমরা এক সফরে নবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক মনযিলে আমরা অবতরণ করি। রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। জনগণ পাথর নিয়ে নিয়ে প্রতীক রূপে কিবলাহ্র দিকে রেখে নামায পড়তে আরম্ভ করে

দেন। সকাল হলে দেখা যায় যে, কিবলাহ্র দিকে মুখ করে নামায আদায় হয়নি। আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।' এ হাদীসটি জামে'উত তিরমিযীর মধ্যে রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান বলেছেন। এর দু'জন বর্ণনাকারী দুর্বল।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, সেই সময় মেঘে অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা নামায পড়ে নিজ নিজ সামনে রেখা টেনে দেই যেন সকালের আলোতে জানা যায় যে, নামায কিবলাহ্র দিকে হয়েছে কি হয় নি। সকালে জানা যায় যে, আমরা কিবলাহ ভুল করেছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ঐ নামায পুনর্বার আদায় করার নির্দেশ দেননি। সেই সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ বর্ণনাতেও দু'জন বর্ণনাকারী দুর্বল। এ বর্ণনাটি দারকুতনীর হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। একটি বর্ণনায় আছে যে,তাঁদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছিলেন না। সনদ হিসেব এটাও দুর্বল। এরূপ নামায পুনরায় পড়তে হবে কিনা এ ব্যাপারে আলেমগণের দু'টি উক্তি রয়েছে। সঠিক উক্তি এটাই যে, এ নামায দ্বিতীয় বার পড়তে হবে না। আর এ উক্তিরই সমর্থনে ঐ হাদীসগুলো এসেছে, যে গুলো উপরে বর্ণিত হলো।

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিলেন নাজ্জাসী। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সাহাবীগণকে (রাঃ) বলেনঃ 'তোমরা তাঁর গায়েবী জানাযার নামায আদায় কর।' তখন কেউ কেউ বলেন যে, তিনি তো মুসলমান ছিলেন না; বরং খ্রীষ্টান ছিলেন। সেই সময় নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ 'কোন কোন আহলে কিতাব আল্লাহ্র উপর' ঐ কিতাবের উপর যা তোমাদের উপর (মুসলমানদের) অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমাদের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল (এ সবের উপর) ঈমান এনে থাকে ও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে থাকে।' তখন তাঁরা বলেনঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! তিনি তো কিবলাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়তেন না।' তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু হাদীসের সংজ্ঞা হিসেবে এ বর্ণনাটি গরীব। এর অর্থ এটাও বলা হয়েছে যে, নাজ্জাসী বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, কারণ তিনি জানতেন না যে, ওটা মানসূখ হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়েছিলেন। গায়েবী জানাযার নামায পড়া যে উচিত এটা তার একটি দলীল। কিন্তু যারা এটা স্বীকার করেন না তাঁরা এটাকে বিশিষ্ট মনে করে থাকেন এবং এর তিনটি ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রথম এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর জানাযা দেখতে পেয়েছিলেন, কারণ ভূমিকে তাঁর জন্যে গুটিয়ে দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়

এই যে, তথায় নাজ্জাসীর জন্যে জানাযা পড়ার কোন লোক ছিল না বলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর গায়েবী জানাযার নামায পড়েছিলেন। ইবনে আরাবী (রঃ) এই উত্তরই পছন্দ করেছেন। কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, একজন বাদশাহ্ মুসলমান হবে আর তাঁর পাশে তাঁর কওমের কোন লোক মুসলমান থাকবে না, এটা অসম্ভব কথা। ইবনে আরাবী (রঃ) এর উত্তরে বলেন যে, শরীয়তে জানাযার নামাযের যে ব্যবস্থা রয়েছে এটা হয়তো তারা জানতো না। এ উত্তর খুবই চমৎকার। তৃতীয় এই যে, তাঁর গায়েবী জানাযার নামায পড়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের আগ্রহ উৎপাদন করা এবং অন্যান্য বাদশাহ্দেরকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মদীনা, সিরিয়া এবং ইরাকবাসীদের কিবলাহ্ হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান। এ বর্ণনাটি জামে'উত তিরমিযীর মধ্যেও অন্য শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এর একজন বর্ণনাকারী আবূ মা'শারের স্মরণ শক্তি সম্পর্কে কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সমালোচনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) অন্য একটি সনদেও এ হাদীসটি নকল করেছেন এবং একে হাসান সহীহ বলেছেন। হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ), হযরত আলী বিন আবি তালিব (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ 'যখন তুমি পশ্চিমকে তোমার ডান দিকে ও পূর্বকে বাম দিকে করবে, তখন তোমার সামনের দিকই কিবলাহ্ হয়ে যাবে।' হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও উপরের মতই আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে কিবলাহ্।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক যেন বলেছেনঃ "প্রার্থনা জানানোর সময় তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল যে দিকেই করবে সে দিকেই আমাকে পাবে এবং আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করবো।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ "যখন তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবো" (৪০ঃ ৬০) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন জনগণ বলেনঃ "আমরা কোন্ দিকে প্রার্থনা করবো?" তাঁদের এ কথার উত্তরে فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ...... الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি পরিবেষ্টনকারী ও পূর্ণ জ্ঞানবান, যাঁর দা,ন দয়া এবং অনুগ্রহ সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে রেখেছে, তিনি সমস্ত কিছু জানেনও বটে। কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।'

১১৬। এবং তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন! তিনি পরম পবিত্র; বরং যা কিছু গগনে ও ভূমণ্ডলে রয়েছে তা তাঁরই জন্যে; সবই তাঁর আজ্ঞাধীন।

١١٦- وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

১১৭। তিনি গগন ও ভূবনের আবিষ্কর্তা এবং যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদন করতে ইচ্ছে করেন, তখন তার জন্যে শুধু মাত্র 'হও' বলেন, আর তাতেই তা হয়ে যায়।

١١٧- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

## মহান আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি নেই একথার যথার্থতার উপর কতকগুলো দলীল

এ আয়াত দ্বারা এবং এর সঙ্গীয় আয়াতগুলো দ্বারা খ্রীষ্টান, ইয়াহূদী ও মুশরিকদের কথাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তানাদি সাব্যস্ত করেছিল। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সমুদয় বস্তুর তিনি মালিক তো বটেই, ওগুলোর সৃষ্টিকর্তা, আহার দাতা, তাদের ভাগ্য নির্ধারণকারী, তাদেরকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আনয়নকারী, তাদের মধ্যে হেরফেরকারী একমাত্র তিনিই। তাহলে তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সন্তান কিরূপে হতে পারে? হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র হতে পারেন না, যেমন ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানেরা ধারণা করতো। ফেরেশ্‌তাগণও আল্লাহ তা'আলার কন্যা হতে পারে না, যেমন আরবের মুশরিকরা মনে করতো। কেননা, পরস্পর সমান সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বস্তু থেকে সন্তান হতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলা তো তুলনা বিহীন। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। তিনিই তো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তাঁর সন্তান হবে কি রূপে? তাঁর কোন সহধর্মিনীও নেই। তিনিই প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই প্রত্যেক জিনিসের পরিচয় অবগত আছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তারা বলে– আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তোমরা এটা একটা গুরুতর বিষয় উদ্ভাবন করেছো, যদ্দরুণ অসম্ভব নয় যে, আকাশ ফেটে যাবে এবং যমীন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে উড়ে যাবে, আর পর্বত ভেঙ্গে

পড়বে—এজন্যে যে, তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তানের সম্বন্ধ আরোপ করেছে, অথচ আল্লাহ্র শান এ নয় যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করেন। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যত কিছুই আছে, সমস্তই আল্লাহর সম্মুখে দাসরূপে উপস্থিত হবে। তিনি সকলকে বেষ্টন করে আছেন এবং সকলকে গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তারা সবাই তাঁর সমীপে একা একা উপস্থিত হবে।' সুতরাং দাস সন্তান হতে পারে না। মনিব ও সন্তান এ দুটো বিপরীত মুখী ও পরস্পর বিরোধী। অন্য স্থানে একটি পূর্ণ সূরায় আল্লাহ তা'আলা একে নাকচ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ* اَللّٰهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ* وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ*

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তাদেরকে তুমি বলে দাও যে, তিনি (আল্লাহ্) এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান-সন্তুতি নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।' এই আয়াতসমূহে এবং এরকম আরও বহু আয়াতে সেই বিশ্ব প্রভু স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন, তিনি যে তুলনা ও নযীর বিহীন এবং অংশীদার বিহীন তা সাব্যস্ত করেছেন, আর মুশরিকদের এ জঘন্য বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি তো সবারই সৃষ্টিকর্তা ও সবারই প্রভু। সুতরাং তাঁর সন্তান-সন্ততি ও ছেলে-মেয়ে হবে কোত্থেকে?

সূরা বাকারার এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীর একটি হাদীস-ই-কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে, অথচ এটা তাদের জন্য উচিত ছিল না, তারা আমাকে গালি দেয় তাদের জন্যে এটা শোভনীয় ছিল না। তাদের মিথ্যা প্রতিপাদন তো এটাই যে, তাদের ধারণায় আমি তাদেরকে মেরে ফেলার পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই; এবং তাদের গালি দেয়া এই যে, তারা আমার সন্তান গ্রহণ করা সাব্যস্ত করে, অথচ আমার স্ত্রী ও সন্তানাদি হওয়া থেকে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র ও তা হতে বহু উর্ধে।' এই হাদীসটিই অন্য সনদে এবং অন্যান্য কিতাবেও শব্দের বিভিন্নতার সাথে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মন্দ কথা শ্রবণ করে বেশী ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন এবং নিরাপদে রাখছেন।' অতঃপর তিনি বলেনঃ 'প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অনুগত, তাঁকে খাঁটি অন্তরে মেনে থাকে, কিয়ামতের দিন সবই তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবে, দুনিয়ার সবাই তাঁর উপাসানায়রত আছে। যাকে তিনি বলেন এ

রকম হও, এভাবে নির্মিত হও তা ঐ রকমই হয়ে যায় এবং ঐভাবেই নির্মিত হয়। এরকমই প্রত্যেকে তাঁর সামনে বিনীত ও বাধ্য। কাফিরদের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের ছায়া আল্লাহ তা'আলার সামনে ঝুঁকেই থাকে। কুরআন মাজীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 'আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহকে সিজদাহ করে থাকে, সকাল সন্ধ্যায় তাদের ছায়া ঝুঁকে থাকে।' একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কুরআন কারীমের মধ্যে যেখানেই (قُنُوْتٌ) শব্দ রয়েছে সেখানেই ভাবার্থ হচ্ছে আনুগত্য। কিন্তু এর মারফু' হওয়া সঠিক নয়। সম্ভবত এটা কোন সাহাবী (রাঃ) বা অন্য কারও কথা হবে। এ সনদে অন্যান্য আয়াতের তাফসীরও মারফু' রূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এটা দুর্বল। কোন ব্যক্তি যেন এতে প্রতারণায় না পড়ে।

## পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিল না

এরপর আল্লাহ পাক বলেন যে, পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিল না, প্রথম বারই তিনি এই দুই এর সৃষ্টিকর্তা। بِدْعَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'নতুন সৃষ্টি করা।' হাদীসে রয়েছেঃ 'প্রত্যেক নব-সৃষ্টি হচ্ছে বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।' এতো হলো শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত । কখনো কখনো بِدْعَةٌ শব্দের প্রয়োগ শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থেই হয়ে থাকে। তখন শরীয়তের 'বিদআত' বুঝায় না। হযরত উমার (রাঃ) জনগণকে তারাবীর নামাযে একত্রিত করে বলেনঃ "এটা ভাল বিদআত।" بَدِيْعٌ শব্দটি مُبْدِعٌ শব্দ হতে ফিরানো হয়েছে। যেমন مُؤْلِمٌ হতে اَلِيْمٌ এবং مُسْمِعٌ হতে سَمِيْعٌ ইত্যাদি। مُبْدِعٌ-এর অর্থ হচ্ছে নতুন সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ বিনা দৃষ্টান্তে বিনা নমুনায় এবং পূর্বের সৃষ্টি ছাড়াই সৃষ্টিকারী।

বিদআত পন্থীদেরকে 'বিদআতী' বলার কারণও এই যে, তারাও আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের মধ্যে ঐ কাজ বা নিয়ম আবিষ্কার করে যা তার পূর্বে শরীয়তের মধ্যে ছিল না। অনুরূপভাবে কোন নতুন কথা উদ্ভাবনকারীকে আরবের লোকেরা مُبْدِعٌ বলে থাকে। ইমাম ইবনে জারীরের (রঃ) মতে এর ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ সন্তানাদি হতে পবিত্র। তিনি গগন ও ভুবনের সমস্ত জিনিসের মালিক । প্রত্যেক জিনিসই তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য বহন করে। সব কিছুই তাঁর অনুগত। সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা, স্থপয়িতা, মূল

ও নমুনা ছাড়াই ঐ সবকে অস্তিত্বে আনয়নকারী একমাত্র সেই বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তা'আলাই। স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) এর সাক্ষী ও বর্ণনাকারী। যে প্রভু এসব জিনিস বিনা মূলে ও নমুনায় সৃষ্টি করেছেন। তিনিই হযরত ঈসা (আঃ) কে পিতা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করেছেন। সেই আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি এতো বেশী যে, তিনি যে জিনিসকে যে প্রকারের সৃষ্টি ও নির্মাণ করতে চান তাকে বলেন– 'এভাবে হও এবং এরকম হও' আর তেমনই সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ـ

অর্থাৎ 'যখন তিনি কোন জিনিসের (সৃষ্টি করার) ইচ্ছে করেন, তখন তাঁর রীতি এই যে, ঐ বস্তুকে বলেন– 'হও' আর তেমনই হয়ে যায়।' (৩৬ঃ ৮২) অন্য জায়গায় বলেনঃ

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنٰهُ أَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ـ

অর্থাৎ "যখন আমি কোন বস্তু (সৃষ্টির) ইচ্ছে করি তখন আমার কথা এই যে, আমি তাকে বলি– 'হও' আর তেমনই হয়ে যায়।" (১৬ঃ ৪০)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

অর্থাৎ "চোখের উঁকি দেয়ার মত আমার একটি আদেশ মাত্র।" (৫৪ঃ ৫০) কবি বলেনঃ

إِذَا مَا أَرَادَ اللّٰهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا * يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

অর্থাৎ "যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুর (সৃষ্টির) ইচ্ছে করেন তখন তাকে বলেন– 'হও' তেমনই হয়ে যায়।"

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) কেও আল্লাহ তা'আলা كُنْ শব্দের দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। এক জায়গায় আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেনঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় ঈসার (আঃ) আশ্চর্যজনক অবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট আদমের (আঃ) আশ্চর্যজনক অবস্থার ন্যায়, তাকে তিনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেন, তৎপর তাকে (তার কাল্‌বকে) বলেন–'হও' তখনই সে (সজীব) হয়ে যায়।" (৩ঃ ৫৯)

১১৮। এবং মুর্খেরা বলে—আল্লাহ আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না— অথবা কেন আমাদের জন্যে কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় না? এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও এদের অনুরূপ কথা বলতো; তাদের সবারই অন্তর পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ; নিশ্চয় আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি।

١١٨- وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

## এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাফে' বিন হুরাইমালা নামক একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলেঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি যদি সত্যই আল্লাহর (রাসূল) হন তবে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আমাদেরকে বলেন না কেন? তাহলে স্বয়ং আমরা তাঁর কথা শুনতে পাই" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, একথা খ্রীষ্টানেরা বলেছিল। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে সঠিক বলেছেন। কেননা, এ আলোচনা তাদের সম্পর্কেই; কিন্তু এ উক্তিও খুব বেশী নির্ভরযোগ্য নয়। কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, তারা বলেছিলঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার নবুওয়াতের সংবাদ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দেন না কেন?' বাহ্যতঃ এটাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। অন্যান্য কয়েকজন মুফাস্সির বলেন যে, একথা আরবের কাফিরেরা বলেছিল। তারপরে যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এরকম উক্তি তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছিল" এর দ্বারা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় আছেঃ

অর্থাৎ "যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে— আমরা মানবো না, যে পর্যন্ত না আমাদেরকে ঐ জিনিস দেয়া হয় যা রাসূলগণকে (আঃ) দেয়া হয়েছে।" অন্যত্র বলেছেনঃ "তারা বলে— আমরা কখনও আপনার উপর ঈমান আনবো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্যে ঝরণা প্রবাহিত করেন।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা

রাখে না তারা বলে আমাদের উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন কিংবা আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাই না কেন?" অন্যত্র রয়েছেঃ "তাদের প্রত্যেকেই চাচ্ছে যে,তাদেরকে কোন কিতাব দেয়া হোক।" এ সব আয়াত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, আরবের মুশরিকরা শুধুমাত্র অহংকার ও অবাধ্যতার বশবর্তী হয়েই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসব জিনিস চেয়েছিল। এভাবে এ দাবীও মুশরিকদেরই ছিল।

তাদের পূর্বে আহলে কিতাবও এরকম বাজে প্রার্থনা জানিয়েছিল। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ "আহলে কিতাব তোমার নিকট চাচ্ছে যে, তুমি তাদের উপর আকাশ হতে কোন কিতাব অবতীর্ণ করবে, তারা তো মূসার (আঃ) নিকট এর চেয়ে বড় প্রার্থনা জানিয়েছিল, তারা তাঁকে বলেছিল–'আল্লাহ্কে আমাদের সামনে এনে দেখাও।' আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ "যখন তোমরা বলেছিলে (বানী ইসরাঈল)– হে মূসা (আঃ)! আমরা তোমার উপর ঈমান আনবো না যে পর্যন্ত না তুমি তোমার প্রভুকে আমাদের সামনে এনে দেখাবে"।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এদের অন্তর ও ওদের অন্তর সাদৃশ্য পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ এই মুশরিকদের অন্তর পূর্বযুগের কাফিরদের মত হয়ে গেছে।' অপর এক জায়গায় আছেঃ 'পূর্বযুগের লোকেরাও তাদের নবীগণকে যাদুকর ও পাগল বলেছিল এবং এরাও তাদের অনুকরণ করছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছি যেগুলো দ্বারা রাসূলের (সঃ) সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অন্য কোন জিনিস চাওয়ার প্রয়োজন বাকী নেই। ঈমান আনয়নের জন্যে এই নিদর্শনগুলোই যথেষ্ট। তবে যাদের অন্তরের উপর মোহর লাগানো রয়েছে তাদের জন্যে কোন আয়াতই ফলদায়ক হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'যাদের উপর তোমার প্রভুর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে,তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন এসে যায়,যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে নেয়।'

---

১১৯। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি এবং তুমি দোযখবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে না।

١١٩- إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ○

## একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

হাদীস শরীফে আছে যে, সুসংবাদ জান্নাতের এবং ভয় প্রদর্শন দোযখ হতে। لَا تُسْئَلُ-এর আর একটি পঠন مَاتُسْئَلُ-ও রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) পঠনে لَنْ تُسْئَلَ-ও এসেছে। অর্থাৎ '(হে নবী সঃ)! তুমি কাফিরদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ অর্থাৎ '(হে নবী সঃ)! তোমার দায়িত্ব শুধুমাত্র পৌঁছিয়ে দেয়া এবং হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার।'(১৩ঃ ৪০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেনঃ

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ-لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ-

অর্থাৎ 'তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি শুধু উপদেষ্টা মাত্র। তুমি তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী নও।' (৮৮ঃ ২১-২২) আল্লাহপাক আর এক জায়গায় বলেনঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَ مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ *

অর্থাৎ 'তারা যা কিছু বলছে, আমি খুব অবগত আছি, তুমি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নও। অতএব তুমি কুরআনের মাধ্যমে ঐ লোকদেরকে উপদেশ দিতে থাক যারা আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে চলে।' (৫০ঃ ৪৫)

এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে। এর একটি পঠন وَلَا تُسْئَلْ ও এসেছে। অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তুমি ঐ দোযখবাসীদের সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করো না।'

মুহাম্মদ বিন কা'বুল কারাযী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যদি আমি আমার পিতা-মাতার অবস্থা জানতে পারতাম! যদি আমি আমার পিতা-মাতার অবস্থা জানতে পারতাম! যদি আমি আমার পিতা-মাতার অবস্থা জানতে পারতাম! যদি আমি আমার পিতা মাতার অবস্থা জানতে পারতাম!' তখন এ নির্দেশনামা অবতীর্ণ হয়। অতঃপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পিতা-মাতার কথা উল্লেখ করেননি। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) মূসা বিন উবাইদার (রঃ) বর্ণনায় এটা এনেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সম্বন্ধে সমালোচনা রয়েছে।

কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, যাদের অবস্থা এরূপ খারাপ ও জঘন্য তাদের সম্বন্ধে যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলাকে কিছুই জিজ্ঞেস না করেন।'

'তায্‌কিরাহ্' নামক কিতাবে কুরতুবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জনক জননীকে জীবিত করা হয় এবং তাঁরা তাঁর উপর ঈমান আনেন। সহীহ মুসলিমের যে হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ 'আমার পিতা ও তোমার পিতা দোযখে রয়েছে এর উত্তরও তথায় রয়েছে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিতা-মাতাকে জীবিত করার হাদীসটি ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস ইত্যাদির মধ্যে নেই এবং এর ইসনাদও দুর্বল।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের একটি মুরসাল হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) একদা জিজ্ঞেস করেন– 'আমার বাপ-মায়ের কবর কোথায় আছে?' সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা খণ্ডন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাঁর পিতা-মাতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা অসম্ভব। প্রথম কিরআতটিই সঠিক। কিন্তু আমরা ইমাম জারীরের (রঃ) উপর বিস্মিত হচ্ছি যে, কি করে তিনি এটাকে অসম্ভব বললেন! সম্ভবতঃ এ ঘটনা ঐ সময়ের হবে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পিতা-মাতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং এর পরিণাম সম্বন্ধে তিনি হয়তো অবহিত ছিলেন না। অতঃপর তিনি যখন তাদের অবস্থা জেনে নেন তখন তিনি এ কাজ হতে বিরত থাকেন এবং তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং স্পষ্টভাবে বলে দেন যে, তারা দু'জনই জাহান্নামী। যেমন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রাঃ) কে হযরত আতা' বিন ইয়াসার (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'তাওরাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গুণাবলী ও প্রশংসা কি রয়েছে?' তখন তিনি বলেনঃ 'হাঁ! তাঁর যে গুণাবলী কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছে, ঐগুলোই তাওরাতের মধ্যেও রয়েছে। তাওরাতের মধ্যে আছে –'হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা, ভয় প্রদর্শক এবং মুর্খদের রক্ষক করে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' (ভরসাকারী) রেখেছি। তুমি কর্কশ ভাষীও নও তোমার হৃদয় কঠোরও নয়। তুমি দুশ্চরিত্রও নও। তুমি বাজারে গঞ্জে গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীও নও। তিনি মন্দের বিনিময়ে মন্দ করেন না, বরং ক্ষমা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া হতে উঠাবেন না যে পর্যন্ত তিনি বক্র ধর্মকে তাঁর দ্বারা সোজা না করেন, মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে স্বীকার করে না নেয়, অন্ধ চক্ষু খুলে না যায়, তাদের বধির কর্ণ শুনতে না থাকে এবং মরিচা ধরা অন্তর পরিষ্কার হয়ে না যায়।'

সহীহ বুখারী শরীফের كِتَابُ الْبُيُوْعِ-এর মধ্যেও হাদীসটি রয়েছে এবং كِتَابُ التَّفْسِيْرِ-এর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর মধ্যে এ বর্ণনার পরে এটুকু বেশী রয়েছেঃ 'আমি আবার হযরত কা'ব (রাঃ)কেও এ প্রশ্নই করেছি এবং তিনিও ঠিক এ উত্তরই দিয়েছেন।'

১২০। এবং ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানগণ তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না; তুমি বল– আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সুপথ; এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান উপনীত হয়েছে তৎপর যদি তুমিও তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ হতে তোমার জন্যে কোনই অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

١٢٠- وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১২১। আমি তাদেরকে যে ধর্ম গ্রন্থ দান করেছি তা যারা সত্যভাবে বুঝবার মত পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে; এবং যে কেউ এটা অবিশ্বাস করে ফলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

١٢١- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ ع

## রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সান্ত্বনা প্রদান

উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলেছেনঃ 'হে নবী (সঃ) এ সব ইয়াহূদী ও নাসারা কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সুতরাং তুমিও তাদের পরিত্যাগ কর এবং তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির পিছনে লেগে যাও। তাদের প্রতি রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দাও। সত্য ধর্ম ওটাই যা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রদান করেছেন। ওটাকে আঁকড়ে ধরে থাক।'

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অন্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকবে এবং বিজয় লাভ করবে। অবশেষে কিয়ামত সংঘটিত হবে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সঃ) ধমকের সুরে বলেনঃ "হে নবী (স)! কখনও তুমি তাদের সন্তুষ্টির জন্যে ও তাদের সাথে সন্ধির উদ্দেশ্যে স্বীয় ধর্মকে দুর্বল করে দিও না,

তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাদেরকে মেনে নিও না।" এ আয়াত থেকে ধর্মশাস্ত্রবিদগণ এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কুফরী একটিই ধর্ম। ওটা ইয়াহূদী ধর্মই হোক বা খ্রীষ্টান ধর্মই হোক অথবা অন্য কোন ধর্মই হোক না কেন। কেননা مِلَّتْ শব্দটিকে এখানে এক বচনেই এনেছেন। যেমন এক জায়গায় আছেঃ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ অর্থাৎ "তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্যে আমার ধর্ম।"

এই দলীলের উপর এই ধর্মীয় নীতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে যে, মুসলমান ও কাফির পরস্পর উত্তরাধিকারী হতে পারে না এবং কাফিরেরা পরস্পর একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারে। তারা দু'জন একই শ্রেণীর কাফিরই হোক বা বিভিন্ন শ্রেণীর কাফিরই হোক না কেন। ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) এটাই মাযহাব। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলেরও (রঃ) একটি বর্ণনায় এই উক্তি রয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) এবং ইমাম মালিকের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, দুই বিভিন্ন মাযহাবের কাফির একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। একটি বিশুদ্ধ হাদীসেও এটাই রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা সত্যভাবে বুঝবার মত করে পাঠ করে'। কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বুঝান হয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহচরবৃন্দকে (রাঃ) বুঝান হয়েছে। হযরত উমার (রাঃ) বলেন যে, সত্য ভাবে পাঠ করার অর্থ হচ্ছে জান্নাতের বর্ণনার সময় জান্নাতের প্রার্থনা এবং জাহান্নামের বর্ণনার সময় জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা। হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, স্পষ্ট আয়াতগুলোর উপর আমল করা ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনা এবং কঠিন বিষয়গুলো আলেমদের কাছে পেশ করাই হচ্ছে তিলাওয়াতের হক আদায় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এর ভাবার্থ 'সত্যের অনুসরণ'ও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তিলাওয়াতের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য। যেমন وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰـهَا (৯১ঃ ২) এর মধ্যে। একটি মারফূ' হাদীসেও এর এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ সঠিক হলেও এর কোন কোন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন যে, কুরআন মাজীদের অনুসরণকারী জান্নাতের উদ্যানে অবতরণকারী।

## রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পাঠের নিয়ম

হযরত উমারের (রাঃ) তাফসীর অনুসারে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রহমতের বর্ণনাযুক্ত কোন আয়াত পাঠ করতেন তখন থেমে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট রহমত চাইতেন আর যখন কোন শাস্তির আয়াত পড়তেন তখন থেমে গিয়ে তাঁর নিকট তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ঐ সব লোকেই বিশ্বাস স্থাপন করছে', অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্যে যারা নিজেদের কিতাব বুঝে পাঠ করে তারা কুরআন মাজীদের উপর ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ 'যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর এবং তাদের প্রভুর পক্ষ হতে তাদের উপর অবতারিত কিতাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে তারা তাদের উপর হতে এবং পায়ের নীচে হতে আহার্য পেতো।'

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেনঃ 'হে আহ্লে কিতাব! যে পর্যন্ত তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে এবং তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের উপর অবতারিত কিতাবকে প্রতিষ্ঠিত না করো সে পর্যন্ত তোমরা কোন কিছুর উপরই নও।' অর্থাৎ তোমাদের অবশ্য কর্তব্য এই যে, তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন কারীমের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ওগুলোর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবগুলোকেই সত্য বলে বিশ্বাস করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর গুণাবলীর বর্ণনা, তাঁর অনুসরণের নির্দেশ এবং তাঁকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার বর্ণনা ইত্যাদি সব কিছুই ঐ সব কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যারা নিরক্ষর নবীর (সঃ) আনুগত্য স্বীকার করে, যাঁর বর্ণনা ও সত্যতা তারা তাদের কিতাব 'তাওরাত' ও 'ইঞ্জীল'-এর মধ্যেও লিখিত দেখতে পায়।' আর এক স্থানে তিনি বলেনঃ 'হে নবী সঃ! তুমি বল তোমরা এর উপর (কুরআন কারীমের উপর) বিশ্বাস স্থাপন কর কিংবা নাই কর (কোন ক্ষতি নাই); এর পূর্বে যাদেরকে ইল্ম দান করা হয়েছে, যখন এ কুরআন মজীদ তাদের সামনে পঠিত হতে থাকে, তখন তারা চিবুকের উপর সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে-আমাদের প্রভু পবিত্র! নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে থাকে।' অন্যত্র ঘোষিত হয়েছেঃ "যাদেরকে আমি এর পূর্বে কিতাব দিয়েছি তারা এর উপরও ঈমান এনে থাকে। যখন তাদের উপর এ কিতাব পাঠ করা হয় তখন তারা তাদের ঈমানের স্বীকারোক্তি করতঃ বলে আমরা এর উপর ঈমান এনেছি, এটা আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সত্য, আমরা এর পূর্ব হতেই মুসলমান ছিলাম। এদেরকেই দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, ভাল দ্বারা মন্দকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং আমার প্রদত্ত আহার্য হতে দান করেছিল।'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ 'কিতাব প্রাপ্তদেরকে বলে দাও-তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করছো? যদি তারা মেনে নেয় তবে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়েছে, আর যদি না মানে তবে তোমার দায়িত্ব শুধুমাত্র পৌঁছিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন।' এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেছেন যে,

একে অমান্যকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন বলেছেনঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ অর্থাৎ 'যে কেউই এর সাথে কুফরী করবে তার প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।' (১১ঃ ১৭) বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যাঁর আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ! এই উম্মতের মধ্যে যে কেউই ইয়াহূদীই হোক বা খ্রীষ্টানই হোক আমার কথা শুনার পরেও আমার উপর ঈমান আনে না সে দোযখে প্রবেশ করবে।'

১২২- يٰبَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১২২। হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি এবং নিশ্চয় আমি পৃথিবীর উপর তোমাদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি- তোমরা তা স্মরণ কর।

১২৩- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

১২৩। আর তোমরা ঐ দিবসের ভয় কর- যে দিন কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তি হতে কিছু মাত্র উপকৃত হবে না এবং কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও অনুরোধ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

এরূপ আয়াত পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র গুরুত্ব আরোপের জন্যেই বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে সেই নিরক্ষর নবীর (সঃ) আনুগত্যের উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যার গুণাবলীর বিবরণ তারা তাদের কিতাবে পেয়েছে। তাঁর নাম ও কার্যাবলীর বর্ণনাও তাতে রয়েছে। এমনকি তাঁর উম্মতের বর্ণনাও তাতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং তাদেরকে তা গোপন করা হতে এবং অন্যান্য নিয়ামতের কথা ভুলে যাওয়া হতে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করতে বলা হচ্ছে এবং আরবের বংশ পরম্পরায় যিনি তাদের চাচাতো ভাই হচ্ছেন, তাঁকে যে শেষ নবী করে পাঠান হয়েছে, এজন্যে তারা যেন তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করতঃ তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না করে এবং তাঁর বিরোধিতা না করে তাদেরকে এরই উপদেশ দেয়া হচ্ছে।

١٢٤- وَاِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○

১২৪। এবং যখন তোমার প্রতিপালক ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব মণ্ডলীর নেতা করবো; সে বলেছিল আমার বংশধরগণ হতেও; তিনি বলেছিলেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না।

## একত্ববাদের সবচেয়ে বড় আহবায়ক

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে, যিনি তাওহীদের ব্যাপারে পৃথিবীর ইমাম পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যিনি বহু কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে অটলতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে (সঃ) বলেনঃ ' হে নবী (সঃ)! যেসব মুশরিক ও আহলে কিতাব হযরত ইবরাহীমে (আঃ)-এর ধর্মের উপর থাকার দাবী করছে তাদেরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আল্লাহ্র আদেশ পালন ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঘটনাবলী শুনিয়ে দাও তো, তা হলে তারা বুঝতে পারবে যে, একমুখী ধর্ম ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শের উপর কারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তারা না তুমি ও তোমার সহচরবৃন্দ?' কুরআন মাজীদের মধ্যে এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى অর্থাৎ 'ইবরাহীম সেই যে পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে।' (৫৩ঃ ৩৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 'ইবরাহীম জনগণের নেতা, আল্লাহ তা'আলার অনুগত, খাঁটি অন্তঃকরণ বিশিষ্ট এবং কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল। তাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করতঃ সঠিক পথে চালিত করেছেন। ইহকালেও আমি তাকে পুণ্য প্রদান করবো এবং পরকালেও সে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ ওয়াহী করেছি যে, তুমিও সরলপন্থী ইবরহীমের অনুসরণ কর, যে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

কুরআন কারীমের অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছেঃ 'ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, খ্রীষ্টানও ছিল না। কিন্তু সে সুদৃঢ় মুসলমান ছিল এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্গত

ছিল না। নিশ্চয় ঐ সব লোক ইবরাহীমের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী যারা তার অনুসরণ করেছিল, আর এই নবী (মুহাম্মদ সঃ) এবং এই মু'মিনগণ এবং আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।' اِبْتِلَاءٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আয্‌মায়েশ বা পরীক্ষা।

## হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা, كَلِمَاتٌ শব্দের তাফসীর এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর কৃতকার্যতার সংবাদ

كَلِمَات শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শরীয়ত' 'আদেশ' 'নিষেধ' ইত্যাদি। كَلِمَات শব্দের ভাবার্থ كَلِمَاتِ تَقْدِيرِيَّة ও হয়। যেমন হযরত মরিয়ম (আঃ) সম্বন্ধে ইরশাদ হচ্ছে وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا অর্থাৎ সে তার প্রভুর كَلِمَات-এর সত্যতা স্বীকার করে। (৬৬ঃ ১২) আবার كَلِمَات-এর ভাবার্থ كَلِمَات شَرْعِيَّة ও হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলার شَرْعِيْ كَلِمَات সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে পুরো হয়েছে।' (৬ঃ ১১৫) এই كَلِمَة গুলো হয়তো বা সত্য সংবাদ, অথবা সুবিচার সন্ধান। মোট কথা এই বাক্যগুলো পুরো করার প্রতিদান স্বরূপ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইমামতির পদ লাভ করেন। এ কালেমাগুলো সম্বন্ধে বহু উক্তি রয়েছে। যেমন হজ্বের নির্দেশাবলী, গোঁফ ছোট করা, কুলকুচা করা, নাক পরিষ্কার করা, মিসওয়াক করা, মাথার চুল মুণ্ডন করা বা বড় বড় করে রাখা, সিঁথি বের করা, নখ কাটা, নাভির নীচের চুল মুণ্ডন করা, খাৎনা করা, বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা, পায়খানা ও প্রস্রাবের পর শৌচ করা, জুমআর দিন গোসল করা, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ান, কংকর নিক্ষেপ করা এবং তাওয়াফে ইফাযা করা।

হযরত আবদুল্লাহ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে পুরো ইসলাম। এর তিনটি অংশ রয়েছে। দশটির বর্ণনা আছে সূরা-ই-বারাআতের মধ্যে اَلتَّائِبُوْنَ হতে مُؤْمِنِيْنَ পর্যন্ত। অর্থাৎ তাওবা করা, ইবাদত করা, প্রশংসা করা,আল্লাহর পথে দৌড়ান, রুকু করা, সিজদাহ করা, ভাল কাজের আদেশ করা, মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা, আল্লাহর সীমার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ঈমান আনা।

দশটির বর্ণনা রয়েছে সূরা-ই-মুমিনুন-এর قَدْ اَفْلَحَ হতে يُحَافِظُوْنَ পর্যন্ত এরই মধ্যে এবং সূরা-ই-মা'আরিজ এর মধ্যেও রয়েছে। অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করা, বাজে কথা ও কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যাকাত প্রদান করা, লজ্জা স্থানকে রক্ষা করা, অঙ্গীকার পুরো করা, নামাযের উপর সদা লেগে

থাকা ও তার হিফাযত করা, কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, শাস্তিকে ভয় করতে থাকা এবং সত্য সাক্ষ্যের উপর অটল থাকা।

দশটির বর্ণনা সূরা-ই- আহযাবের إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ হতে عَظِيْمًا পর্যন্ত এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা, ঈমান রাখা, কুরআন মাজীদ পাঠ করা, সত্য কথা বলা, ধৈর্য ধারণ করা, বিনয়ী হওয়া, রোযা রাখা, ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা,আল্লাহ তা'আলাকে সদা স্মরণ করা।

এই ত্রিশটি নির্দেশ যে পালন করবে সেই পুরোপুরি ইসলামের অনুসারী হবে এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা পাবে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর كَلِمَات-এর মধ্যে তাঁর স্বীয় গোত্র হতে পৃথক হওয়া, তদানীন্তন বাদশাহ্ হতে নির্ভয় হয়ে থাকা ও তাবলীগ করা, অতঃপর আল্লাহর পথে যে বিপদ এসেছে তাতে ধৈর্য ধারণ করা, তার পর দেশ ও ঘর বাড়ী আল্লাহ তা'আলার পথে ছেড়ে দিয়ে হিজরত করা, অতিথির সেবা করা, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের ও ধন মালের বিপদাপদ সহ্য করা এমনকি নিজের ছেলেকে নিজের হাতে আল্লাহ তা'আলার পথে কুরবানী করা। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই সমুদয় নির্দেশই পালন করেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র, ও তারকারাজির দ্বারাও তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। ইমামতি, আল্লাহ তা'আলার ঘর নির্মাণের নির্দেশ, হজ্বের নির্দেশাবলী, মাকামে ইবরাহীম, বায়তুল্লাহ শরীফে অবস্থানকারীদের আহার্য্য এবং মুহাম্মদ (সঃ)কে তাঁর ধর্মের উপর প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমেও তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেনঃ 'হে প্রিয়! তোমাকে আমি পরীক্ষা করছি, কি হয় তাই দেখছি।' তখন তিনি বলেনঃ 'হে আমার প্রভু! আমাকে জনগণের ইমাম বানিয়ে দিন। এই কা'বাকে মানুষের জন্যে পুণ্য ও মিলন কেন্দ্রে পরিণত করুন। এখানকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা দান করুন। আমাদেরকে মুসলমান ও অনুগত বান্দা করে নিন। আমার বংশধরের মধ্যে আপনার অনুগত একটি দল রাখুন। এখানকার অধিবাসীদেরকে ফলের আহার্য দান করুন।' এই সমুদয়ই আল্লাহ তা'আলা পুরো করেন এবং সবই তাঁকে দান করেন। শুধুমাত্র তাঁর একটি আশা আল্লাহ্ তা'আলা পুরো করেননি। তা হচ্ছে এই যে, তিনি আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমার সন্তানদেরকে ইমামতি দান করুন।' এর উত্তরে আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমার এ বিরাট দায়িত্ব অত্যাচারীদের উপর অর্পিত হতে পারে না।' كَلِمَات-এর ভাবার্থ এর সঙ্গীয় আয়াতসমূহও হতে পারে। 'মুআত্তা' ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে

যে, সর্বপ্রথম খাৎনার প্রচলনকারী, অতিথি সেবাকারী, নখ কর্তনের প্রথা চালুকারী, গোঁফ ছাঁটার নিয়ম প্রবর্তনকারী এবং সাদা চুল দর্শনকারী হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। সাদা চুল দেখে তিনি মহান আল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ 'হে প্রভু! এটা কি? আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেনঃ 'এ হচ্ছে সম্মান ও পদ মর্যাদা।' তখন তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহ! তাহলে এটা আরও বেশী করুন। সর্বপ্রথম মিম্বরের উপর ভাষণ দানকারী, দূত প্রেরণকারী, তরবারী চালনাকারী, মিসওয়াককারী, পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদনকারী এবং পায়জামা পরিধানকারীও হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

একটি দুর্বল এবং মাওযু হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'আমি যদি মিম্বর নির্মাণ করি তবে আমার পিতা হযরত ইবরাহীমও (আঃ) তো তা নির্মাণ করেছিলেন। আমি যদি হাতে ছড়ি রাখি তবে এটাও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরই সুন্নাত।'

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'দশটি কাজ হচ্ছে প্রকৃত ও ধর্মের মূলঃ (১) গোঁফ ছাঁটা, (২) শ্মশ্রু লম্বা করা, (৩) মেসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেয়া, (৫) নখ কাটা (৬) অঙ্গুলির পোরগুলো ধৌত করা, (৭) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা, (৮) নাভির নীচের লোম কেটে ফেলা, (৯) শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা; বর্ণনাকারী বলেনঃ 'দশমটি আমি ভুলে গিয়েছি। (১০) সম্ভবতঃ তা কুলকুচা করাই হবে।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- 'পাঁচটি কাজ প্রকৃতির অন্তর্গত। (১) খাৎনা করা, (২) নাভির নীচের লোম উঠিয়ে ফেলা, (৩) গোঁফ ছোট করা, (৪) নখ কর্তন করা এবং (৫) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা।'

একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্বন্ধে وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى অর্থাৎ 'সেই ইবরাহীম যে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে'(৫৭ঃ ৩৭) কেন বলেছেন তা তোমাদেরকে বলব কি? তার কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ্ সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করতেনঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ * وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ * يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ *

অর্থাৎ 'সন্ধ্যা ও সকালে আল্লাহরই পবিত্রতা ঘোষিত হয়। গগনে ও ভূমণ্ডলে সমুদয় প্রশংসা তাঁরই এবং রাত্রের ও যোহরের সময়ে প্রশংসা তাঁরই জন্যে। তিনি জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন, আর তিনি যমীন মরে যাওয়ার পর তাকে পুনর্জীবিত করেন এবং এইরূপেই তোমাদেরকেও বের করা হবে।' (৩০ঃ ১৭-১৯)

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে,তিনি প্রত্যহ চার রাকা'আত নামায পড়তেন। কিন্তু এ দু'টি হাদীসই দুর্বল এবং এগুলোর মধ্যে কোন কোন বর্ণনাকারী দুর্বল। এগুলো দুর্বল হওয়ার বহু কারণ রয়েছে বরং দুর্বলতার কথা উল্লেখ না করে এগুলোর বর্ণনা করাই জায়েয নয়। রচনারীতি দ্বারাও এগুলোর দুর্বলতা প্রমাণিত হচ্ছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর ইমামতির সুসংবাদ শুনা মাত্রই তাঁর সন্তানদের জন্যে এই প্রার্থনা জানান এবং তা গৃহীতও হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকে অবাধ্য হবে, তাদের উপর তাঁর অঙ্গীকার পৌঁছবে না এবং তাদেরকে ইমাম করা হবে না। সূরা-ই-আনকাবুতে এ আয়াতের ভাবার্থ পরিষ্কার হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ)-এর এ প্রার্থনা গৃহীত হয়। তথায় রয়েছেঃ

وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتَابَ

অর্থাৎ 'আমি তার সন্তানদের মধ্যে নবুওয়াতের ও কিতাবের ক্রমধারা চালু রেখেছি।' (২৯ঃ ২৭)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরে যত রাসূল (আঃ) এসেছেন সবাই তাঁর বংশধর ছিলেন এবং যত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সবই তাঁর সন্তানদের উপরই হয়েছে। এখানেও এ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকে অত্যাচারীও হবে।

মুজাহিদ (রঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করেনঃ 'আমি অত্যাচারীকে ইমাম নিযুক্ত করবো না।'

'যালিম' এর ভাবার্থ কেউ কেউ মুশরিকও নিয়েছেন। عَهْدٌ-এর ভাবার্থ নির্দেশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যালিমকে কোন কিছুর ওয়ালী ও নেতা নিযুক্ত করা উচিত নয়, যদিও সে হযরত ইবরাহীম (আঃ) -এর বংশধর হয়। তাঁর প্রার্থনা তাঁর সন্তানদের মধ্য হতে সৎ লোকদের ব্যাপারে গৃহীত হয়েছিল। এর অর্থ এটাও করা হয়েছে যে, যালিমের কাছে কোন অঙ্গীকার করলে তা পুরো করা হবে না, বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। আবার ভাবার্থ এও হতে

পারে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার মঙ্গলের অঙ্গীকার তার উপর প্রযোজ্য নয়। দুনিয়ায় সে সুখে শান্তিতে আছে তা থাক; কিন্তু পরকালে তার কোন অংশ নেই। عَهْد-এর অর্থ 'ধর্ম' করা হয়েছে। অর্থাৎ 'তোমার সমস্ত সন্তান ধর্মভীরু হবে না।' কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ -

অর্থাৎ তাদের উভয়ের (ইবরাহীম আঃ ও ইসহাক আঃ) বংশে কতক সৎ লোকও রয়েছে এবং কতক এমনও রয়েছে যে, তারা প্রকাশ্য ভাবে নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে। (৩৭ঃ ১১৩) عَهْدٌ-এর অর্থ আনুগত্যও নেয়া হয়েছে। আনুগত্য শুধুমাত্র ভাল কাজেই হয়ে থাকে। আবার عَهْدٌ-এর অর্থ 'নবুওয়াত'ও এসেছে। ইবনে খুরাইয মান্দাদুল মালিকী (রঃ) বলেন যে, অত্যাচারী ব্যক্তি খলীফা, বিচারক, মুফতী, সাক্ষী এবং বর্ণনাকারী হতে পারে না।

---

**১২৫। এবং যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও পূণ্যদাম করেছিলাম, এবং মাকামে ইবরাহীমকে প্রার্থনা-স্থল নির্ধারিণ করেছিলাম;**

١٢٥- وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط

---

ওটা প্রথম আল্লাহ্র ঘরঃ مَثَابَةً-এর ভাবার্থ হচ্ছে বার বার আগমন করা। হজ্বব্রত পালন করে বাড়ী ফিরে গেলেও অন্তর তার সাথে লেগেই থাকে। প্রত্যেক জায়গা হতে লোক দলে দলে এ ঘরের দিকে এসে থাকে। এটাই একত্রিত হবার স্থান, অর্থাৎ সবারই মিলন কেন্দ্র। এটা নিরাপদ জায়গা। এখানে অস্ত্র শস্ত্র উঠানো হয় না। অজ্ঞতার যুগেও এর আশে পাশে লুটতরাজ হতো বটে; কিন্তু এখানে নিরাপত্তা বিরাজ করতো। কাউকে কেউ গালিও দিত না। এ স্থান সদা বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ থেকেছে। সৎ আত্মাগুলো সদা এর দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। প্রতি বছর পরিদর্শন করলেও এর প্রতি লোকের আগ্রহ থেকেই যায়। এটা হযরত ইবরাহীমে (আঃ)-এর প্রার্থনারই ফল। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেনঃ

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি জনগণের অন্তর ওদিকে ঝুঁকিয়ে দিন।' (১৪ঃ ৩৭) এখানে কেউ তার ভ্রাতার হন্তাকে দেখলেও নীরব থাকে। সুরা-ই-মায়েদার মধ্যে রয়েছে যে, এটা মানুষের অবস্থান স্থল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)

বলেন যে, মানুষ যদি হজ্ব করা ছেড়ে দেয় তবে আকাশকে পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করা হবে। এ ঘরের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করলে এর প্রথম নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কথা স্মরণ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا

অর্থাৎ 'যখন আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে বায়তুল্লাহ শরীফের স্থান ঠিক করে দিলাম, (এবং বলেছিলাম) আমার সাথে কাউকেও অংশীদার স্থাপন করবে না।' (২২ঃ ২৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ- فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

অর্থাৎ–'আল্লাহ তা'আলার প্রথম ঘর রয়েছে মক্কায়, যা বরকতময় ও সারা বিশ্বের হিদায়াত স্বরূপ। তাতে কতকগুলো প্রকাশ্য নিদর্শন রয়েছে যেমন, মাকামে ইব্‌রাহীম (আঃ), যে কেউ তাতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।' (৩ঃ ৯৬) মাকামে ইবরাহীম বলতে সম্পূর্ণ বায়তুল্লাহ শরীফও বুঝায় বা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বিশিষ্ট স্থানও বুঝায়। আবার হজ্বের সমুদয় করণীয় কাজের স্থানকেও বুঝায়। যেমন–আরাফাত, মাশআরে হারাম, মিনা, পাথর নিক্ষেপ, সাফা-মারওয়ার তওয়াফ ইত্যাদি। মাকামে ইবরাহীম প্রকৃতপক্ষে ঐ পাথরটি যা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সহধর্মিনী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্নান কার্য সম্পাদনের জন্যে তাঁর পায়ের নীচে রেখেছিলেন। কিন্তু হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) বলেন যে, এটা ভুল কথা। প্রকৃত পক্ষে এটা ঐ প্রস্তর যার উপরে দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণ করতেন। হযরত জাবির (রাঃ)-এর একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, যখন নবী (সঃ) তওয়াফ করেন তখন হযরত উমার (রাঃ) মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) দিকে ইঙ্গিত করে বলেন 'এটাই কি আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মাকাম?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন– 'হাঁ'। তিনি বলেনঃ 'তাহলে আমরা এটাকে কিবলাহ্ বানিয়ে নেই না কেন?' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমারের (রাঃ) প্রশ্নের অল্প দিন পরেই এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটাই কি মাকামে ইবরাহীম যাকে কিবলাহ্ বানানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হাঁ' এটাই।'

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ 'তিনটি বিষয়ে আমি আমার প্রভুর আনুকূল্য স্বীকার করেছি, অথবা বলেন– তিনটি বিষয়ে আমার প্রভু আমার আনুকূল্য করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ যা চেয়েছিলেন তাই তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল। হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান করে নিতাম! তখন وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى (২ঃ ১২৫) অবতীর্ণ হয়। আমি বললাম–হে আল্লাহর রাসূল! সৎ ও অসৎ সবাই আপনার নিকট এসে থাকে, সুতরাং যদি আপনি মু'মিনদের জননীগণকে [নবী (সঃ)-এর সহধর্মিনীগণকে] পর্দার নির্দেশ দিতেন! তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। যখন আমি অবগত হই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোনও কোনও স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমি তখন তাঁদের নিকট গিয়ে বলি– যদি আপনারা বিরত না হন [রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দুঃখ দেয়া হতে] তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে (সঃ) আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন। তখন মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ

অর্থাৎ যদি মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে তবে অতি সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান করবেন।'(৬৬ঃ ৫)

এ হাদীসটির বহু ইসনাদ রয়েছে এবং বহু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। একটি বর্ণনায় বদরের বন্দীদের ব্যাপারেও হযরত উমারের (রাঃ) আনুকূল্যের কথা বর্ণিত আছে। তিনি বলেছিলেন যে, বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ না নিয়ে বরং তাদেরকে হত্যা করা হোক। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাও তাই ছিল। হযরত উমার (রাঃ) বলেন যে, 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল নামক মুনাফিক যখন মারা যায় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায আদায় করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন আমি বলি আপনি কি এই মুনাফিক কাফিরের জানাযার নামায আদায় করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ধমক দিলে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

অর্থাৎ 'তাদের মধ্যে যে মৃত্যু বরণ করেছে তুমি কখনও তার জন্যে নামায পড়বে না এবং তার সমাধি পার্শ্বে দাঁড়াবে না। (৯ঃ ৮৪)

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা শরীফ সদর্প পদক্ষেপে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন এবং চারবার স্বাভাবিক পদক্ষেপে প্রদক্ষিণ করেন। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমের (আঃ) পিছনে এসে দু'রাকায়াত নামায আদায় করেন এবং (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى) পাঠ করেন।' হযরত জাবিরের (রাঃ) হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাকামে ইব্রাহীমকে (আঃ) তাঁর ও বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে করেছিলেন। এ হাদীসসমূহের দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মাকামে ইব্রাহীমের (আঃ) ভাবার্থ ঐ পাথরটি যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণ করতেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর এনে দিতেন এবং তিনি কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে যেতেন। যেখানে প্রাচীর উঁচু করার প্রয়োজন হতো সেখানে পাথরটি সরিয়ে নিয়ে যেতেন।এভাবে কা'বার প্রাচীর গাঁথার কাজ সমাপ্ত করেন। এর পূর্ণ বিবরণ ইনশাআল্লাহ হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনায় আসবে। ঐ পাথরে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) পদদ্বয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছিল। আরবের অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তা দেখেছিল। আবূ তালিব তাঁর প্রশংসাসূচক কবিতায় বলেছিলেন ঃ

وَ مُوطِئُ اِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةً * عَلٰى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَنَا عِلِ

অর্থাৎ 'ঐ পাথরের উপর হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) পদদ্বয়ের চিহ্ন নতুন হয়ে রয়েছে, পদদ্বয় জুতো শূন্য ছিল।'

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেনঃ 'আমি মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) উপর হযরত খলীলুল্লাহর (আঃ) পায়ের অঙ্গুলির ও পায়ের পাতার চিহ্ন দেখেছিলাম। অতঃপর জনগণের স্পর্শের কারণে তা মুছে গেছে।' হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মাকামে ইবুরাহীমের (আঃ) দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে, তাকে স্পর্শ করার নির্দেশ নেই। এ উম্মতের লোকেরাও পূর্বের উম্মতের ন্যায় আল্লাহর নির্দেশ ছাড়াই কতকগুলো কাজ নিজেদের উপর ফরয্ করে নিয়েছে, যা পরিণামে তাদের ক্ষতির কারণ হবে। মানুষের স্পর্শের কারণেই ঐ পাথরের পদ চিহ্ন হারিয়ে গেছে।

এই মাকামে ইব্রাহীম পূর্বে কা'বার প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কা'বার দরজার দিকে 'হাজরে আসওয়াদ'র পার্শ্বে দরজা দিয়ে যেতে ডান দিকে একটি স্থায়ী জায়গায় বিদ্যমান ছিল যা আজও লোকের জানা আছে। খলীলুল্লাহ (আঃ) হয়তো বা ওটাকে এখানেই রেখেছিলেন কিংবা বাইতুল্লাহ বানানো অবস্থায় শেষ অংশ হয়তো এটাই নির্মাণ করে থাকবেন এবং পাথরটি এখানেই থেকে গেছে।

হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের যুগে ওটাকে পিছনে সরিয়ে দেন। এর প্রমাণ রূপে বহু বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর একবার বন্যার পানিতে এ পাথরটি এখান হতেও সরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় খলিফা পুনরায় একে পূর্বস্থানে রেখে দেন। হযরত সুফইয়ান (রঃ) বলেনঃ "আমার জানা নেই যে, এটাকে মূল স্থান হতে সরানো হয়েছে এবং এর পূর্বে কা'বার প্রাচীর হতে কত দূরে ছিল।" একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ পাথরটি তার মূল স্থান হতে সরিয়ে ওখানে রেখেছিলেন যেখানে এখন রয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি মুরসাল। সঠিক কথা এই যে, হযরত উমার (রাঃ) এটা পিছনে রেখেছিলেন।

وَعَـــهِـــدْنَآ اِلٰٓى اِبْـــرٰهٖـــمَ وَاِسْـمٰعِـيْـلَ اَنْ طَهِّـرَا بَـيْـتِـىَ لِلطَّآئِفِـــيْـنَ وَالْعٰكِفِـــيْـنَ وَالرُّكَّعِ السُّـــجُوْدِ ○

এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রেখো।

١٢٦- وَاِذْ قَـــالَ اِبْـرٰهٖـــمُ رَبِّ اجْـــعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّـمَـــرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَـفَـرَ فَـاُمَـتِّـعُـهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَـــذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْـمَصِـيْـرُ ○

১২৬। যখন ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানকে আপনি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে উপজীবিকার জন্যে ফল-শস্য প্রদান করুন, তিনি বলেছিলেন, যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে আমি অল্প দিন শান্তি দান করবো, তৎপরে তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো, ঐ গন্তব্য স্থান নিকৃষ্টতম।

১২৭। যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বার ভিত্তি উত্তোলন করছিলেন, (তখন বলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে এটা গ্রহণ করুন, নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, মহা জ্ঞানী।

١٢٧- وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥

১২৮। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হজ্জের আহকাম বলে দিন এবং আমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হউন, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।

١٢٨- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥

এখানে عَهْدٌ-এর অর্থ হচ্ছে নির্দেশ। অর্থাৎ 'আমি ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছি।' 'পবিত্র রেখো' অর্থাৎ কা'বা শরীফকে ময়লা, বিষ্ঠা এবং জঘন্য জিনিস হতে পবিত্র রেখো। عَهْدٌ-এর تَعْدِيَةٌ যদি اِلٰى দ্বারা হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে 'আমি ওয়াহী অবতীর্ণ করেছি এবং প্রথমেই বলে দিয়েছি যে, তোমরা উভয়ে 'বায়তুল্লাহ্‌কে প্রতিমা থেকে পবিত্র রাখবে, তথায় আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত হতে দেবে না, বাজে কাজ,অপ্রয়োজনীয় ও মিথ্যে কথা, শিরক , কুফর হাসি রহস্য ইত্যাদি হতে ওকে রক্ষা করবে।' طَائِف শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে প্রদক্ষিণকারী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে 'বাহির হতে আগমনকারী' । এ হিসেবে عَاكِفِيْن শব্দের অর্থ হবে 'মক্কার অধিবাসী।' হযরত সাবিত (রঃ) বলেনঃ 'আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর (রঃ) কে বলি যে, আমাদের কর্তব্য হবে বাদশাহ্‌কে এ পরামর্শ দেয়া, তিনি যেন জনগণকে বায়তুল্লাহ শরীফে শয়ন করতে নিষেধ করে দেন। কেননা,এমতাবস্থায় অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এরও সম্ভাবনা আছে যে, তারা পরস্পরে বাজে কথা বলতে আরম্ভ

করে দেয়।' তখন তিনি বলেনঃ 'এরূপ করো না। কেননা, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেনঃ هُمُ الْعَاكِفُوْنَ অর্থাৎ 'তারা ওরই অধিবাসী।' একটি হাদীসে রয়েছে যে,হযরত উমার ফারূকের (রাঃ) ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মসজিদে নববীতে (সঃ) শুয়ে থাকতেন, এবং তিনি যুবকও কুমার ছিলেন। رُكَّعِ السُّجُوْدِ দ্বারা নামাযীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এটা পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, তখনও মূর্তি পূজা চালু ছিল। বায়তুল্লাহর নামায উত্তম কি তওয়াফ উত্তম এ বিষয়ে ধর্ম শাস্ত্রবিদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিকের (রঃ) মতে বাইরের লোকদের জন্যে তওয়াফ উত্তম এবং জামহূরের মতে প্রত্যেকের জন্যে নামায উত্তম। তাফসীর এর ব্যাখ্যার জায়গা নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া এবং তাদের দাবী খণ্ডন করা যে, 'বায়তুল্লাহ' তো খাস করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্যেই নির্মিত হয়েছে। ওর মধ্যে অন্যদের পূজা করা এবং খাঁটি আল্লাহর পূজারীদেরকে ঐ ঘরে ইবাদত করা হতে বিরত রাখা সরাসরি অন্যায় ও অবিচারপূর্ণ কাজ। এজন্যেই কুরআন মাজীদে অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এরূপ অত্যাচারীদেরকে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।' এভাবে মুশরিকদের দাবীকে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করার সাথে সাথে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের দাবীও খণ্ডন করা হয়ে গেল। তারা যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব ও নবুওয়াতের সমর্থক, তারা যখন জানে ও স্বীকার করে যে, এই মর্যাদাপূর্ণ ঘর এসব পবিত্র হস্ত দ্বারাই নির্মিত হয়েছে, তারা যখন একথারও সমর্থক যে, এ ঘরটি শুধুমাত্র নামায, তওয়াফ, প্রার্থনা এবং আল্লাহর উপাসনার জন্যেই নির্মিত হয়েছে, হজ্ব, উমরাহ, ই'তিকাফ ইত্যাদির জন্যে বিশিষ্ট করা হয়েছে, তখন এই নবীগণের অনুসরণ দাবী সত্ত্বেও কেন তারা হজ্ব ও উমরা করা হতে বিরত রয়েছে? বায়তুল্লাহ শরীফে তারা উপস্থিত হয় না কেন? বরং স্বয়ং হযরত মূসাও (আঃ) তো এই ঘরের হজ্ব করেছেন, যেমন হাদীসে পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় আছে ঃ

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ -

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা মসজিদগুলো উঁচু করার অনুমতি দিয়েছেন। ওর মধ্যে তাঁর নামের যিক্র করা হবে, ওর মধ্যে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সৎ বান্দাগণ তাঁর নামের তাসবিহ্ পাঠ করে থাকে।' (২৪ঃ ৩৬) হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মসজিদসমূহ যে কাজের জন্যে তা ঐ জন্যেই নির্মিত হয়েছে।' আরও বহু হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মসজিদসমূহ পবিত্র রাখার নির্দেশ রয়েছে।

## বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ ও এর সর্বপ্রথম নির্মাতা

কেউ কেউ বলেন যে, কা'বা শরীফ ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ কথাটি নির্ভরযোগ্য নয়। কেউ কেউ বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম পাঁচটি পর্বত দ্বারা কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। পর্বত পাঁচটি হচ্ছেঃ (১) হেরা, (২) তুরে সাইনা, (৩) তূরে যীতা, (৪) জাবাল-ই-লেবানন এবং (৫) জুদী। কিন্তু একথাটিও সঠিক নয়। কেউ বলেন যে, হযরত শীষ (আঃ) সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন। কিন্তু এটাও আহলে কিতাবের কথা। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাকে হারাম বানিয়েছিলেন। আমি মদীনাকে হারাম করলাম। এর শিকার খাওয়া হবে না, এখানকার বৃক্ষ কর্তন করা হবে না, এখানে অস্ত্র শস্ত্র উঠানো নিষিদ্ধ।'

সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস রয়েছে যে, জনগণ টাটকা খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলতেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের খেজুরে, আমাদের শহরে এবং আমাদের ওজনে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (আঃ) আপনার বান্দা, আপনার দোস্ত এবং আপনার রাসূল ছিলেন। আমিও আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল। তিনি আপনার নিকট মক্কার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আমিও আপনার নিকট মদীনার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। যেমন তিনি মক্কার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, বরং এরকমই আরও একটি। অতঃপর কোন ছোট ছেলেকে ডেকে ঐ খেজুর তাকে দিয়ে দিতেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার আবূ তালহা (রাঃ) কে বলেন ঃ 'তোমাদের ছোট ছোট বালকদের মধ্যে একটি বালককে আমার খিদমতের জন্যে অনুসন্ধান কর। আবূ আলহা (রাঃ) আমাকেই নিয়ে যান। তখন আমি বিদেশে ও বাড়ীতে তাঁর খিদমতেই অবস্থান করতে থাকি। একদা তিনি বিদেশ হতে আসছিলেন। সম্মুখে উহুদ পর্বত দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেনঃ 'এ পর্বত আমাকে ভালবাসে এবং আমিও এ পর্বতকে ভালবাসি'। মদীনা চোখের সামনে পড়লে তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ! আমি এর দু'ধারের মধ্যবর্তী স্থানকে 'হারাম' রূপে নির্ধারণ করছি, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাকে 'হারাম' রূপে নির্ধারণ করেছিলেন। হে আল্লাহ! এর 'মুদ্দ', 'সা' এবং ওজনে বরকত দান করুন।'

হযরত আনাস (রাঃ) হতেই আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহ! মক্কায় আপনি যে বরকত দান করেছেন তার দ্বিগুণ বরকত মদীনায় দান করুন।' আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

(সঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে 'হারাম' বানিয়েছিলেন, আমিও মদীনাকে 'হারাম' বানালাম। এখানে কাউকেও হত্যা করা হবে না এবং চারা (পশুর খাদ্য ) ছাড়া বৃক্ষাদির পাতাও ঝরানো হবে না।" এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস রয়েছে যদ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মক্কার মত মদীনাও 'হারাম' শরীফ। এখানে এসব হাদীস বর্ণনা করায় আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কা শরীফের মর্যাদা ও এখানকার নিরাপত্তার বর্ণনা দেয়া। কেউ কেউতো বলেন যে, প্রথম হতেই এটা মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ স্থান। আবার কেউ কেউ বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল হতে এর মর্যাদা ও নিরাপত্তা সূচীত হয়। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেনঃ 'যখন হতে আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেন তখন থেকেই এই শহরকে মর্যাদাপূর্ণরূপে বানিয়েছেন। এখন কিয়ামত পর্যন্ত এর মর্যাদা অক্ষুণ্নই থাকবে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ কারও জন্যে বৈধ নয়। আমার জন্যেও শুধুমাত্র আজকের দিনে ক্ষণেকের জন্যে বৈধ ছিল। এর অবৈধতা রয়েই গেল। জেনে রেখো এর কাঁটা কাটা হবে না। এর শিকার তাড়া করা হবে না। এখানে কারও পতিত হারানো জিনিস উঠিয়ে নেয়া হবে না, কিন্তু যে ওটা (মালিকের নিকট ) পৌঁছিয়ে দেবে তার জন্যে জায়েয্। এর ঘাস কেটে নেয়া হবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি এ হাদীসটি খুৎবায় বর্ণনা করেছিলেন এবং হযরত আব্বাসের (রাঃ) প্রশ্নের কারণে তিনি 'ইয্খার' নামক ঘাস কাটার অনুমতি দিয়েছিলেন।

হযরত আমর বিন সাঈদ (রাঃ) যখন মক্কার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন সেই সময়ে হযরত ইবনে শুরাইহ্ আদভী (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আমীর! মক্কা বিজয়ের দিন অতি প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে খুৎবা দেন তা আমি নিজ কানে শুনেছি, মনে রেখেছি এবং সেই সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে স্বচক্ষে দেখেছি– আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলাই মক্কাকে হারাম করেছেন, মানুষ করেনি। কোন মু'মিনের জন্যে এখানে রক্ত প্রবাহিত করা এবং বৃক্ষাদি কেটে নেয়া বৈধ নয়। যদি কেউ আমার এই যুদ্ধকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে চায় তবে তাকে বলবে যে, আমার জন্যে শুধুমাত্র আজকের দিন এই মুহূর্তের জন্যেই যুদ্ধ বৈধ ছিল। অতঃপর পুনরায় এ শহরের মর্যাদা ফিরে এসেছে যেমন কাল ছিল। সাবধান! তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছ, তাদের নিকট অত্যবশ্যই এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবে যারা আজ এ সাধারণ জনসমাবেশে নেই।' কিন্তু আমার এ হাদীসটি শুনে পরিষ্কারভাবে উত্তর দেনঃ 'আমি তোমার চেয়ে এ হাদীসটি বেশী জানি। 'হারাম শরীফ' অবাধ্য রক্ত

পিপাসুকে এবং ধ্বংসকারীকে রক্ষা করে না।” (বুখারী ও মুসলিম)। কেউ যেন এ দুটো হাদীসকে পরস্পর বিরোধী মনে না করেন। এ দুটোর মধ্যে সাদৃশ্য এভাবে হবে যে, মক্কা প্রথম দিন হতেই মর্যাদাপূর্ণ তো ছিলই, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রচার করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো রাসূল তখন হতেই ছিলেন যখন হযরত আদম (আঃ) এর খামির প্রস্তুত হয়েছিল, বরং সেই সময় হতেই তাঁর নাম শেষ নবী রূপে লিখিত ছিল। কিন্তু তথাপিও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর নবুওয়াতের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেনঃ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তাদের মধ্যে হতেই একজন রাসূল তাদের মধ্যে প্রেরণ করুন। (২ঃ ১২৯) এ প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন এবং তকদীরে লিখিত ঐ কথা প্রকাশিত হয়। একটি হাদীসে রয়েছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলেন ঃ 'আপনার নবুওয়াতের সূত্রের কথা কিছু আলোচনা করুন।' তখন তিনি বলেন ঃ 'আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর মধ্য হতে যেন একটি নূর বেরিয়ে গেল যা সিরিয়ার প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করে দিলো এবং তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকলো।'

## মক্কা ও মদীনার মধ্যে বেশী উত্তম কোনটি?

জামহূরের মতে মদীনার চেয়ে মক্কা বেশী উত্তম। ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীদের মাযহাব অনুসারে মক্কা অপেক্ষা মদীনা বেশী উত্তম। এ দু'দলেরই প্রমাণাদি সত্বরই ইনশাআল্লাহ আমরা বর্ণনা করবো। হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছেনঃ “হে আল্লাহ! এই স্থানকে নিরাপদ শহর করে দিন।” অর্থাৎ এখানে অবস্থানকারীদেরকে ভীতি শূন্য রাখুন। আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে নেন। যেমন তিনি বলেনঃ (وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا) অর্থাৎ 'যে কেউ তার মধ্যে প্রবেশ করলো সে নিরাপদ হয়ে গেলো।' (৩ঃ ৯৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

অর্থাৎ 'তারা কি দেখে না যে, আমি 'হারাম'কে নিরাপত্তা দানকারী করেছি? ওর আশ পাশ হতে মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এখানে তারা পূর্ণ নিরপত্তা লাভ করছে।' (২৯ঃ ৬৭) এ প্রকারের আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় বহু হাদীসও উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা শরীফে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম। হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–আমি রাসূলুল্লাহ

(সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ 'মক্কায় অস্ত্র শস্ত্র উঠানো কারও জন্যে বৈধ নয়। (সহীহ মুসলিম)' তাঁর এ প্রার্থনা কা'বা শরীফ নির্মাণের পূর্বে ছিল, এ জন্যেই বলেছেন, 'হে আল্লাহ! এই স্থানকে নিরাপত্তা দানকারী শহর বানিয়ে দিন'। সূরা-ই- ইব্‌রাহীমের মধ্যে এ প্রার্থনাই এভাবে রয়েছেঃ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا (২ঃ ১২৬) সম্ভবতঃ এটা দ্বিতীয় বারের প্রার্থনা ছিল, যখন বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মিত হয়ে যায় ও শহর বসে যায় এবং হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর তিন বছরের ছোট ছিলেন। এজন্যেই এ প্রার্থনার শেষে তাঁর জন্ম লাভের জন্যেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। وَمَنْ كَفَرَ হতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার কথা। কেউ কেউ এটাকেও প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তখন ভাবার্থ হবে এইঃ 'কাফিরদেরকেও অল্প দিন শান্তিতে রাখুন, অতঃপর তাদেরকে শাস্তিতে জড়িত করে ফেলুন।' আর একে আল্লাহ তা'আলার কালাম বললে ভাবার্থ হবে এই যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যখন তাঁর সন্তানাদির জন্যে ইমামতির প্রার্থনা জানালেন এবং অত্যাচারীদের বঞ্চিত হওয়ার ঘোষণা শুনলেন ও বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পরে আগমনকারীদের মধ্যে অনেকে অবাধ্যও হবে, তখন তিনি ভয়ে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্যেই আহার্যের প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ইহলৌকিক সুখ সম্ভোগ কাফিরদেরকেও দেবেন। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلًّا نُّمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ـ

অর্থাৎ 'আমি তোমার প্রভুর দান এদেরকেও দেবো এবং ওদেরকেও দেবো, তোমার প্রভুর দান কারও জন্যে নিষিদ্ধ নয়।' (১৭ঃ ২০) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় তারা মুক্তি পায় না, তারা দুনিয়ায় কিছুদিন লাভবান হলেও আমার নিকট যখন তারা ফিরে আসবে তখন আমি তাদেরকে কুফরীর প্রতিফল স্বরূপ কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।'

অন্যস্থানে বলেনঃ "কাফিরদের কুফরী যেন তোমাকে দুঃখিত না করে, আমার নিকট তাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতঃপর যে কাজ তারা করেছে তার সংবাদ আমি তাদেরকে দেবো, নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ পূর্ণ অবগত আছেন। আমি তাদেরকে সামান্য সুখ দেয়ার পর ভীষণ শাস্তির মধ্যে জড়িয়ে ফেলবো।" অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "যদি এটা না হতো যে, (প্রায়) সমস্ত মানুষ একই পথাবলম্বী (কাফির) হয়ে যাবে, তাহলে যারা দয়াময় (আল্লাহ)-এর সাথে কুফ্‌রী করে, আমি তাদের জন্য তাদের গৃহসমূহের ছাদ

রৌপ্যের করে দিতাম এবং সিঁড়িগুলোও (রৌপ্যের করে দিতাম), যার উপর দিয়ে তারা আরোহণ করে; এবং তাদের গৃহের দরজাগুলো ও আসনগুলোও (রৌপ্যের করে দিতাম), যার উপর তারা হেলান দিয়ে বসে আর (এসব) স্বর্ণের ও (করে দিতাম), এবং এগুলো শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসের উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়, (শেষে সবই বিলীন হয়ে যাবে) এবং আখেরাত তোমার প্রভুর সমীপে মুত্তাকির জন্যে রয়েছে।' আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন ঃ 'অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে জড়িত করে ফেলবো এবং ওটা জঘন্য অবস্থান স্থল।' অর্থাৎ তাদেরকে অস্থায়ী জগতে সুখে শান্তিতে রাখার পর ভীষণ শাস্তির দিকে টেনে আনবো। এবং ওটা অত্যন্ত জঘন্য অবস্থান স্থল।' এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখছেন এবং অবকাশ দিচ্ছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। যেমন তিনি বলেছেন।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ 'বহু অত্যাচারী গ্রামবাসীকে আমি অবকাশ দিয়েছি, অতঃপর পাকড়াও করেছি, শেষে তো তাদেরকে আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (২২ঃ৪৮)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, কষ্টদায়ক কথা শুনে আল্লাহ অপেক্ষা বেশী ধৈর্য ধারণকারী আর কেউই নেই। তারা তাঁর সন্তানাদি সাব্যস্ত করছে অথচ তিনি তাদেরকে আহার্যও দিচ্ছেন এবং নিরাপত্তাও দান করেছেন। অন্য সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে ঢিল দেন, তৎপর হঠাৎ তাদেরকে ধরে ফেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন—

وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ـ

অর্থাৎ 'তোমার প্রভুর পাকড়াও এরকমই যে, যখন তিনি কোন অত্যাচারী গ্রামবাসীকে পাকড়াও করেন, তখন নিশ্চয়ই তার পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক।' (১১ঃ ১০২) এই বাক্যকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত করার পঠন খুবই বিরল এবং তা সপ্ত পাঠকের পঠনের বিপরীত। রচনা রীতিরও এটা উল্টো। কেননা قَالَ ক্রিয়া পদের ضَمِيْر টি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু এ বিরল পঠনে এর কর্তা ও উক্তিকারী হযরত ইবরাহীমই (আঃ) হচ্ছেন এবং এটা বাক্যরীতির সম্পূর্ণ উল্টো। قَوَاعِد শব্দটি قَاعِدَة-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে থামের নিম্নতল এবং ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা

তাঁর নবীকে (সঃ) বলেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি তোমার কওমকে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির সংবাদ দিয়ে দাও।' একটি কিরআতে وَ اِسْمَاعِيْلُ -এর পরে يَقُوْلَانِ ও রয়েছে। ওরই প্রমাণ রূপে পরে مُسْلِمِيْنَ শব্দটিও এসেছে।

## আন্তরিক প্রার্থনা

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) শুভ কাজে লিপ্ত রয়েছেন এবং তা গৃহীত হয় কি না এ ভয়ও তাঁদের রয়েছে। এ জন্যেই তাঁরা মহান আল্লাহ্র নিকট এটা কবুল করার প্রার্থনা জানাচ্ছেন। হযরত অহীব বিন অরদ (রঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে খুব ক্রন্দন করতেন এবং বলতেন : 'হায়! আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বন্ধু এবং গৃহীত নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র কাজ তাঁর হুকুমেই করছেন, তাঁর ঘর তাঁরই হুকুমে নির্মাণ করছেন, তথাপি ভয় করছেন যে, না জানি আল্লাহ্র নিকট এটা না মঞ্জুর হয়।' মহান আল্লাহ মু'মিনদের অবস্থা এরকমই বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ অর্থাৎ 'তারা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে এবং দান খয়রাত করে অথচ তাদের অন্তর আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত থাকে (এই ভয়ে যে, না-জানি আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয় কি না!)' (২৩ঃ ৬০) যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, যা হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, অতি সত্বরই তা নিজ স্থানে আসছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে, ভিত্তি উত্তোলন করতেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং প্রার্থনা করতেন হযরত ইসমাইল (আঃ)। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, উভয়ই উভয় কাজে অংশীদার ছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফের একটি বর্ণনা এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি হাদীসও এ ঘটনা সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, স্ত্রী লোকেরা কোমর বন্ধনী বাঁধার নিয়ম হযরত ইসমাঈলের (আঃ) মাতার নিকট হতেই শিখেছে। তিনি ওটা বেঁধে ছিলেন যাতে তাঁর পদচিহ্ন মিটিয়ে যায়, ফলে যেন হযরত শারিয়া (রাঃ) তাঁর পদচিহ্ন দেখতে না পান। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে এবং তাঁর কলিজার টুকরা একটি মাত্র সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে নিয়ে বের হন। সেই সময় এই প্রাণপ্রিয় শিশু দুধ পান করতো। এখন যেখানে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মিত রয়েছে সে সময় তথায় একটি পাহাড় ছিল এবং বিজন মরুভূমি রূপে পড়েছিল। তখন তথায় কেউই বাস করতো না। এখানে মা ও শিশুকে বসিয়ে তাঁদের পার্শ্বে সামান্য খেজুর ও এক মশক পানি রেখে যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) পিট ফিরিয়ে চলে যেতে আরম্ভ করেন, তখন হযরত হাজেরা (রাঃ) তাঁকে ডাক দিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহ্র বন্ধু! এরকম ভীতিপ্রদ বিজন মরুভূমির মধ্যে যেখানে

আমাদের কোন বন্ধু ও সাথী নেই, আমাদেরকে ফেলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) কোন উত্তর দেননি, এমনকি ঐ দিকে ফিরেও তাকাননি। হযরত হাজেরা (রাঃ) বারবার বলার পরেও যখন তিনি কোন ভ্রূক্ষেপ না করেন তখন তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর প্রিয়! আমাদেরকে আপনি কার নিকট সমর্পণ করে গেলেন?' হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট।' তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর দোস্ত! এটা কি আপনার উপর আল্লাহর নির্দেশ?' হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেন, 'হা, আমার উপর আল্লাহ তা'আলার এটাই নির্দেশ'। একথা শুনে হযরত হাজেরা (রাঃ) সান্ত্বনা লাভ করেন এবং বলেন ঃ 'তাহলে আপনি যান। আল্লাহ আমাদেরকে কখনও ধ্বংস করবেন না। তাঁরই উপর আমরা নির্ভর করছি এবং তিনিই আমাদের আশ্রয়স্থল।' হযরত হাজেরা (রাঃ) ফিরে আসেন এবং স্বীয় প্রাণের মণি, চক্ষের জ্যোতি, আল্লাহর নবীর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে ক্রোড়ে ধারণ করে ঐ জনহীন প্রান্তরে, সেই আল্লাহর জগতে বাধ্য ও নিরুপায় হয়ে বসে পড়েন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন 'সানিয়া' নামক স্থানে পৌঁছেন এবং অবগত হন যে, হযরত হাজেরা (রাঃ) পিছনে নেই এবং ওখান হতে এখান পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিশক্তি কাজ করবে না, তখন তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন ঃ 'হে আমার প্রভু! আমার সন্তানাদিকে আপনার পবিত্র ঘরের পার্শ্বে একটি অনাবাদী ভূমিতে ছেড়ে এসেছি। যেন তারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে, আপনি মানুষের অন্তর ওদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং ওদেরকে ফলের আহার্য দান করুন। সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তো প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলার নিদের্শ পালন করতঃ স্বীয় সহধর্মিনী ও ছেলেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে চলে যান, আর এদিকে হযরত হাজেরা (রাঃ) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে শিশুকে নিয়েই মনে তৃপ্তি লাভ করছিলেন। ঐ অল্প খেজুর ও সামান্য পানি শেষ হয়ে গেল। এখন কাছে না আছে এক গ্রাস আহার্য বা না আছে এক ঢোক পানি। নিজেও ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর এবং শিশুও ভুক ও তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। এমন কি সেই নিষ্পাপ নবী পুত্রের ফুলের ন্যায় চেহারা মলিন হতে থাকে। মা কখনও নিজের একাকিত্বের ও আশ্রয় হীনতার কথা চিন্তা করছিলেন, আবার কখনও নিজের একমাত্র অবুঝ শিশুর অবস্থা দুশ্চিন্তার সাথে লক্ষ্য করছিলেন এবং সহ্য করে চলছিলেন। এটা জানা ছিল যে, এরকম ভয়াবহ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মানুষের গমনাগমন অসম্ভব। বহু মাইল পর্যন্ত আবাদী ভূমির চিহ্নমাত্র নেই। খাবার তো দূরের কথা এক ফোঁটা পানিরও ব্যবস্থা হতে পারে না। তিনি উঠে চলে যান। নিকটবর্তী 'সাফা' পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করেন যে, কোন লোককে যেতে আসতে দেখা যায় কি না। কিন্তু দৃষ্টি নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। সুতরাং তিনি সেই পাহাড় হতে নেমে পড়েন এবং অঞ্চল উঁচু করে 'মারওয়া' পাহাড়ের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করেন। ওর উপর চড়েও চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কাউকে না দেখে পুনরায় সেখান হতে অবতরণ করেন। এভাবেই মধ্যবর্তী সামান্য অংশ দৌড়িয়ে অবশিষ্ট অংশ তাড়াতাড়ি অতিক্রম করেন। আবার সাফা পাহাড়ের উপর চড়েন। এভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেন, প্রত্যেক বার শিশুকে দেখেন যে, তার অবস্থা ক্রমে ক্রমেই মন্দের দিকে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'হাজীরা যে, 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে দৌড়িয়ে থাকেন তার সূচনা এখান থেকেই হয়।' সপ্তম বারে যখন হাজেরা (রাঃ) 'মারওয়ার' উপর আসেন তখন একটা শব্দ তাঁর কানে আসে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তিনি এই শব্দের দিকে মনোযোগ দেন। আবার শব্দ তাঁর কানে আসে এবং এবারে স্পষ্টভাবে শুনা যায়। সুতরাং তিনি শব্দের দিকে এগিয়ে যান এবং এখন যেখানে যম্‌যম্ কূপ রয়েছে তথায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে দেখতে পান। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনি কে?' তিনি উত্তর দেনঃ 'আমি হাজেরা, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ছেলের মা। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ 'হযরত ইবরাহীম (আঃ) আপনাকে এই নির্জন মরুপ্রান্তরে কার নিকট সপর্দ করেছেন?' তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট।' তখন ফেরেশতা বলেনঃ 'তা হলে তিনিই যথেষ্ট।' হযরত হাজেরা (রাঃ) বলেন, 'হে অদৃশ্য ব্যক্তি! শব্দ তো আমি শুনলাম। এটা আমার কোন কাজে আসবে তো?'

**যম্‌যম্ কূপঃ** হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটির উপর ঘর্ষণ করা মাত্রই তথায় মাটি হতে একটি ঝরণা বইতে থাকে। হযরত হাজেরা (রাঃ) তাঁর হাত দ্বারা পানি উঠিয়ে তাঁর মশক ভর্তি করে নেন। পানি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে এ চিন্তা করে ঝরণার চার দিকে মাটির বেষ্টনি দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের উপর সদয় হউন, যদি তিনি এভাবে পানি আটকিয়ে না রাখতেন তবে যম্‌যম্ কূপের আকার বিশিষ্ট হতো না, বরং প্রবাহিত নদীর রূপ ধারণ করতো। তখন হযরত হাজেরা (রাঃ) নিজেও পানি পান করেন এবং শিশুকেও পান করিয়ে দেন। অতঃপর শিশুকে দুধ পান করাতে থাকেন। ফেরেশতা তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ধ্বংস করবেন না। মহান আল্লাহ এখানে এ ছেলে ও তার পিতার দ্বারা তাঁর একটা ঘর নির্মাণ করাবেন।' হযরত হাজেরা (রাঃ) এখানেই বাস করতে থাকেন, যম্‌যম্ কূপের পানি পান করেন আর শিশুর মাধ্যমে মনোরঞ্জন লাভ করেন। বর্ষাকালে বন্যার পানিতে চার দিকে প্লাবিত হয়ে যেতো। কিন্তু এই জায়গাটি উচু ছিল বলে পানি এ দিক ওদিক দিয়ে বয়ে যেতো এবং এ স্থানটি নিরাপদ থাকতো।

## জনহীন উপত্যকায় 'জারহাম' গোত্রের আগমন

কিছুদিন পর ঘটনাক্রমে 'জারহাম' গোত্রের লোক 'কিদার' পথে যাচ্ছিল। তারা মক্কা শরীফের নিম্নাংশে অবতরণ করে। একটি পানিচর পক্ষীর প্রতি তাদের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ 'এটা পানির পাখি এবং এখানে পানি ছিল না আমরা কয়েকবার এখান দিয়ে যাতায়াত করেছি। এটাতো শুষ্ক জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর। এখানে পানি কোথায়?' তারা প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্যে লোক পাঠিয়ে দেয়। তারা ফিরে এসে সংবাদ দেয় যে, তথায় বহু পানি রয়েছে। তখন তারা সবাই চলে আসে এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের নিকট আরয করেঃ 'আপনি অনুমতি দিলে আমরাও এখানে অবস্থান করি। এটা পানির জায়গা।' তিনি বলেনঃ 'হা, ঠিক আছে। আপনারা সাগ্রহে অবস্থান করুন। কিন্তু পানির উপর অধিকার আমারই থাকবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'সঙ্গী সাথী জুটে যাক, হযরত হাজেরা (রাঃ) তো তাই চাচ্ছিলেন।' সুতরাং এই যাত্রী দল এখানেই বাস করতে থাকে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) বড় হন। ঐ সব লোকের সাথে তাঁর খুবই ভালবাসা হয়। অবশেষে তিনি যৌবন প্রাপ্ত হন এবং তাদের মধ্যে তাঁর বিয়েও অনুষ্ঠিত হয়। তাদের কাছে তিনি আরবী ভাষা শিখে নেন। হযরত হাজেরা (আঃ) এখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

## প্রিয় পুত্রের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ

মহান আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্রের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তথায় আগমন করেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর এ যাতায়াত বুরাকের (স্বর্গীয় বাহন) মাধ্যমে হতো। সিরিয়া হতে তিনি আসতেন এবং আবার ফিরে যেতেন। এখানে এসে তিনি দেখেন যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) বাড়িতে নেই। পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'সে কোথায় রয়েছে?' উত্তর আসেঃ 'তিনি পানাহারের খোঁজে বেরিয়েছেন। অর্থাৎ শিকারে গেছেন।' তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমাদের অবস্থা কি?' সে বলেঃ 'অবস্থা খারাপ, বড়ই দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার মধ্যে দিন যাপন করছি।' তিনি বলেনঃ 'তোমার স্বামী বাড়ী আসলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে যে,সে যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।' হযরত যাবীহুল্লাহ (আ) ফিরে এসে যেন তিনি কোন মানব আগমনের ইঙ্গিত পেয়েছেন, তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে কোন লোকের আগমন ঘটেছিল কি?' স্ত্রী বলে, 'হাঁ, এরূপ এরূপ আকৃতির একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, তিনি শিকারের অনসুন্ধানে বেরিয়েছেন। তার পরে জিজ্ঞেস করেন, 'দিন যাপন কিভাবে হচ্ছে?' আমি বলি যে, "আমরা অত্যন্ত

সংকীর্ণ ও কঠিন অবস্থায় দিন যাপন করছি।" হযরত ইসমাঈল (আঃ) বলেনঃ 'আমাকে কিছু বলতে বলেছেন কি?' স্ত্রী বলেঃ 'হাঁ, বলেছেন যে, যখন তোমার স্বামী আসবে তখন তাকে বলবে যে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।' হযরত ইসমাঈল (আঃ) তখন বলেনঃ 'হে আমার সহধর্মিনী! জেনে রেখো যে, উনি আমার আব্বা। তিনি যা বলে গেছেন তার ভাবার্থ এই যে, (যেহেতু তুমি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো) আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। যাও, আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' তাকে তালাক দিয়ে তিনি ঐ গোত্রেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

## দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের চেষ্টা

কিছুদিন পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে পুনরায় এখানে আসেন। ঘটনাক্রমে এবারও হযরত ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ্‌র (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, তিনি তাদের জন্যে আহার্যের অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। পুত্রবধূ বলেঃ 'আপনি বসুন যা কিছু হাজির রয়েছে তাই আহার করুন।' তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'বলতো তোমাদের দিন যাপন কিভাবে হচ্ছে এবং তোমাদের অবস্থা কিরূপ?' উত্তর আসেঃ 'আলহামদু লিল্লাহ! আমরা ভালই আছি এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সুখে-স্বচ্ছন্দে আমাদের দিন যাপন হচ্ছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' হযরত ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ' তোমাদের আহার্য কি?' উত্তর আসেঃ 'গোশত।' জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমরা পান কর কি?' উত্তর হয়ঃ 'পানি।' তিনি প্রার্থনা করেন, 'হে প্রভু! আপনি তাদের গোশ্‌ত ও পানিতে বরকত দিন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদি শস্য তাদের নিকট থাকতো এবং তারা এটা বলতো তবে হযরত ইবরাহীম খালীল (আঃ) তাদের জন্যে শস্যেরও বরকত চাইতেন। এখন এই প্রার্থনার বরকতে মক্কাবাসী শুধুমাত্র গোশত ও পানির উপরেই দিন যাপন করতে পারে, অন্য লোক পারে না।' হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তোমার স্বামীকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে যে,সে যেন তার চৌকাঠ ঠিক রাখে।' এর পরে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এসে সমস্ত সংবাদ অবগত হন। তিনি বলেনঃ 'উনি আমার সম্মানিত আব্বা ছিলেন। আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, আমি যেন তোমাকে পৃথক না করি (তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণী)। আবার কিছু দিন পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি লাভ করে এখানে আসেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) যম্‌যম্ কূপের পার্শ্বে একটি পাহাড়ের উপর তীর সোজা করছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) পিতাকে দেখা মাত্রই আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

## কা'বা শরীফের নতুন নির্মাণ

পিতা-পুত্রের মিলন হলে ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ 'হে ইসমাঈল! আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ হয়েছে।' তিনি বলেনঃ 'যে নির্দেশ হয়েছে তা পালন করুন আব্বা।' তিনি বলেনঃ 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমাকেও আমার সাথে থাকতে হবে।' তিনি আরয করেনঃ 'আমি হাযির আছি আব্বা!' তিনি বলেনঃ 'এ স্থানে আল্লাহ তা'আলার একটি ঘর নির্মাণ করতে হবে।' তিনি বলেনঃ 'খুব ভাল কথা, আব্বা!, এখন পিতা ও পুত্র মিলে বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং উঁচু করতে আরম্ভ করেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) পাথর এনে দিতেন এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) তা দিয়ে দেয়াল গাঁথতে থাকতেন। দেয়াল কিছুটা উঁচু হলে হযরত যাবিহুল্লাহ (আঃ) এই পাথরটি অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি নিয়ে আসেন। ঐ উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের পাথর রাখতেন এবং পিতা-পুত্র উভয়ে এই দু'আ করতেনঃ 'প্রভু হে! আপনি আমাদের এই নগণ্য খিদমত কবূল করুন, আপনি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।' এই বর্ণনাটি অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও রয়েছে। কোথাও বা সংক্ষিপ্তভাবে এবং কোথাও বা বিস্তারিতভাবে। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে এটাও রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হন তখন তিনি তাঁর মাথার উপরে মেঘের মত একটি জিনিস লক্ষ্য করেন। ওর মধ্য হতে শব্দ আসছিলঃ 'হে ইবরাহীম (আঃ)! যত দূর পর্যন্ত এই মেঘের ছায়া রয়েছে তত দূর পর্যন্ত স্থানের মাটি তুমি বায়তুল্লাহর মধ্যে নিয়ে নাও। কম বেশী যেন না হয়।' ঐ বর্ণনায় এও আছে যে,বায়তুল্লাহ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তথায় হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে ছেড়ে চলে আসেন। কিন্তু প্রথম বর্ণনাটিই সঠিক। আর এভাবেই সামঞ্জস্য হতে পারে যে, পূর্বে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু নির্মাণ করেছিলেন পরে, এবং নির্মাণ কার্যে পিতা-পুত্র উভয়েই অংশ নিয়েছিলেন। যেমন কুরআনের শব্দগুলোও এর সাক্ষ্য বহন করে। হযরত আলী (রাঃ) বায়তুল্লাহ নির্মাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন যে, ঐ ঘর কোথায় নির্মাণ করতে হবে এবং কত বড় করতে হবে ইত্যাদি। তখন 'সাকীনা' অবতীর্ণ হয় এবং তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, যেখানেই ওটা থেমে যাবে সেখানেই ঘর নির্মাণ করতে হবে। এবার ঘরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। 'হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছলে তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে বলেনঃ 'বৎস! কোন ভাল

পাথর খুঁজে নিয়ে এসো।' তিনি ভাল পাথর খুঁজে আনেন। এসে দেখেন যে,তাঁর আব্বা অন্য পাথর তথায় লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আব্বা! এটা কে এনেছে?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এ পাথর খানা আকাশ হতে নিয়ে এসেছেন।'

হযরত কা'বুল আহবার (রঃ) বলেন যে, এখন যেখানে বায়তুল্লাহ্ রয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তথায় পানির উপর বুদ্ধুদের সাথে ফেনা হয়েছিল, এখান হতেই পৃথিবী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, কা'বা ঘর নির্মাণের জন্য হযরত ইবরাহীম (আঃ) আরমেনিয়া হতে এসেছিলেন। হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) 'হাজরে আসওয়াদ' ভারত হতে এনেছিলেন। সেই সময় ওটা সাদা চকচকে 'ইয়াকুত' (মণি) ছিল। হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে মানুষের পাপপূর্ণ হস্ত স্পর্শের ফলে ওটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, এর ভিত্তি পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল। ওর উপরেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। মুসনাদে আবদুর রায্যাকের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) ভারতে অবতরণ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর দেহ দীর্ঘ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পর ফেরেশতাদের তসবীহ্, নামায দু'আ ইত্যাদি শুনতে পেতেন। যখন দেহ খাটো হয়ে যায় এবং ঐ সব ভাল শব্দ আসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তাঁকে মক্কার দিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি মক্কার দিকে যেতে থাকেন। যেখানে যেখানে তাঁর পদচিহ্ন পড়ে সেখানে সেখানে জনবসতি স্থাপিত হয়। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত হতে একটি ইয়াকুত অবতীর্ণ করেন এবং বায়তুল্লাহর স্থানে রেখে দেন, আর ঐ স্থানকেই স্বীয় ঘরের জায়গা হিসাবে নির্ধারণ করেন। হযরত আদম (আঃ) এখানে তওয়াফ করতে থাকেন এবং এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের যুগে এটা উঠে যায় এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে পুনরায় নির্মাণ করিয়ে নেন। হযরত আদম (আঃ) এ ঘরটিকে হেরা, তুর, যীতা, তূরে সাইনা এবং জুদী এই পাঁচটি পাহাড় দ্বারা নির্মাণ করেন। কিন্তু এই সমুদয় বর্ণনার মধ্যেই স্পষ্টভাবে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে,পৃথিবী সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে বায়তুল্লাহর নির্মাণ করা হয়েছিল। বায়তুল্লাহর চিহ্ন ঠিক করার জন্য হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেই সময় এখানে বন্য বৃক্ষাদি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বহু দূরে আমালিক সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। এখানে তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁর মাকে একটি কুঁড়ে ঘরে রেখে গিয়েছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, বায়তুল্লাহর চারটি স্তম্ভ আছে এবং সপ্তম জমি পর্যন্ত

তা নীচে গিয়েছে। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যুলকারনাইন যখন এখানে পৌঁছেন এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে বায়তুল্লাহ নির্মাণ করতে দেখেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনি এটা কি করছেন?' তিনি উত্তরে বললেনঃ 'মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে আমি তাঁর ঘর নির্মাণ করছি।' যুলকারনাইন জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এর প্রমাণ কি আছে?' হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ 'এই নেকড়ে বাঘগুলো সাক্ষ্য দিবে।' পাঁচটি নেকড়ে বাঘ বলেঃ 'আমার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এঁরা দুজন নির্দেশ প্রাপ্ত। যুলকারনাইন এতে খুশী হন এবং বলেনঃ 'আমি মেনে নিলাম।' 'আরযাকীর তারীখ-ই মক্কা' নামক পুস্তকে রয়েছে যে, যুলকারনাইন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেছেন।

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে যে, قَوَاعِدُ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ভিত্তি'। এটা قَاعِدَةٌ শব্দের বহুবচন। কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ (২৪ঃ ৬০)ও এসেছে। এরও এক বচন হচ্ছে قَاعِدَةٌ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ 'তুমি কি দেখছো না যে, তোমার গোত্র যখন বায়তুল্লাহ নির্মাণ করে, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তি হতে ছোট করে দেয়।' আমি বলিঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি ওটা বাড়িয়ে দিয়ে মূল ভিত্তির উপর করে দিন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'তোমার কওম যদি নতুন ইসলাম গ্রহণকারী না হতো এবং তাদের কুফরীর যুগ যদি নিকটে না থাকতো তবে আমি তাই করতাম।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এ হাদীসটি জানার পর বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কারণেই 'হাজরে আসওয়াদের' পার্শ্ববর্তী দুটি স্তম্ভকে স্পর্শ করতেন না। সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে আয়েশা! যদি তোমার কওমের অজ্ঞতার যুগ নিকটে না হতো তবে আমি অবশ্যই কা'বার ধনাগারকে আল্লাহর পথে দান করে দিতাম এবং দরজারকে ভূমির সাথে লাগিয়ে দিতাম এবং 'হাতীম'কে বায়তুল্লাহর মধ্যে ভরে দিতাম।'

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি এর দ্বিতীয় দরজাও করতাম, একটি আসবার জন্যে এবং অপরটি যাবার জন্যে।' ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁর খিলাফতের যুগে এরকমই করেছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'আমি একে ভেঙ্গে দিতাম এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর নির্মাণ করতাম।' আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি একটি পূর্বমুখী করতাম এবং একটি পশ্চিমমুখী করতাম এবং ৬ হাত 'হাতীম'কে এর মধ্যে ভরে দিতাম

যাকে কুরাইশরা এর বাইরের করে দিয়েছে। নবী (সঃ)-এর নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশরা নতুনভাবে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিল। এই নির্মাণ কার্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) শরীক ছিলেন। যখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর, সেই সময় কুরাইশরা কা'বা শরীফকে নতুনভাবে নির্মাণ করার ইচ্ছে করে। কারণ ছিল এই যে, এর দেয়াল ছিল খুব ছোট এবং ছাদও ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বায়তুল্লাহর ধনাগার চুরি হয়ে গিয়েছিল, যা ঐ ঘরের মধ্যে একটি গভীর গর্তে রক্ষিত ছিল। এই চোরাই মাল 'খাযায়েমা' গোত্রীয় বানী মালীহ্ বিন আমরের ক্রীতদাস 'দুয়ায়েক' নামক ব্যক্তির নিকট পাওয়া গিয়েছিল। সম্ভবতঃ চোরেরা ঐ মাল তার ওখানে রেখেছিল। যাহোক, এই চুরির অপরাধে দুয়ায়েকের হাত কেটে দেয়া হয়। তাছাড়া এই ঘর নির্মাণের ব্যাপারে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিরাট সুযোগ লাভ করেছিল। তা এই যে, রোম রাজ্যের বণিকদের একটি নৌকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জিদ্দার ধারে এসে লেগে যায়। ঐ নৌকায় বহু মূল্যবান কাঠ বোঝাই করা ছিল। এই কাঠগুলো কা'বা ঘরের ছাদের কাজে লাগতে পারে এই চিন্তা করে কুরাইশরা ঐ কাঠগুলো কিনে নেয় এবং কিবতী গোত্রের একজন ছুতারকে কা'বার ছাদ নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করে। এসব প্রস্তুতিতো চলছিল বটে কিন্তু বায়তুল্লাহকে ভেঙ্গে দিতে তারা ভয় পাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে এরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। বায়তুল্লাহর কোষাগারে একটি সাপ ছিল। যখনই কোন লোক ওর নিকটে যেতো তখনই সে হাঁ করে তার দিকে বাধিত হতো। এই সর্পটি প্রত্যহ ঐ গর্ত হতে বেরিয়ে বায়তুল্লাহর দেয়ালে এসে বসে থাকতো। একদা ঐ সাপটি ওখানে বসেই ছিল। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা একটা বিরাট পাখী পাঠিয়ে দেন। পাখীটি সাপটিকে ধরে নিয়ে উড়ে যায়। কুরাইশরা এবার বুঝতে পারলো যে, তাদের ইচ্ছা মহান আল্লাহর ইচ্ছার অনুরূপই হয়েছে। কারণ, কাঠও তারা পেয়ে গেছে, মিস্ত্রীও তাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে এবং সাপকেও আল্লাহ তা'আলা সরিয়ে দিয়েছেন। এবার তারা কা'বা শরীফকে ভেঙ্গে নতুনভাবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলে।

## কা'বা শরীফ নির্মাণ ও অদৃশ্য ইঙ্গিত

সর্বপ্রথম ইবনে অহাব নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফের একটি পাথর নামিয়ে নেয়, কিন্তু পাথরখানা তার হাত হতে উড়ে গিয়ে পুনরায় স্বস্থানে বসে যায়। সে সমস্ত কুরাইশকে সম্বোধন করে বলেঃ 'শুনে রেখো! আল্লাহর ঘর নির্মাণ কার্যে সবাই যেন নিজ নিজ উত্তম ও পবিত্র মালই খরচ করে। এতে ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত সম্পদ সূদের টাকা এবং অত্যাচারের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ লাগানো চলবে না।' কেউ কেউ বলেন যে, এ পরামর্শ দিয়েছিল ওলীদ বিন

মুগীরা নামক ব্যক্তি। এখন বায়তুল্লাহ নির্মাণের অংশ গোত্র সমূহের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দরজার অংশ নির্মাণ করবে বানু আবদ-ই-মানাফ ও জুহরা গোত্র, 'হাজরে আসওয়াদ' ও রুকনে ইয়ামানীর অংশ নির্মাণ করবে বানু মাখযূম গোত্র এবং কুরাইশের অন্যান্য গোত্রগুলোও তাদের সঙ্গে কাজ করবে, কা'বা শরীফের পিছনের অংশ নির্মাণ করবে বানু হামীহ্ ও 'সাহাম' গোত্র এবং 'হাতীমের' পার্শ্ববর্তী অংশ নির্মাণ করবে আবদুদ্দার বিন কুসাই, বানু আসাদ বিন আবদুল উয্যা ও বানু আদী বিন কা'ব। এটা নির্ধারণ করার পর পূর্ব নির্মিত ইমারত ভাঙ্গার জন্যে তারা অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রথমে ভাঙ্গতে কেউই সাহস করে না। অবশেষে ওলীদ বিন মুগীরা বলেঃ 'আমিই আরম্ভ করছি।' এ বলে সে কোদাল নিয়ে উপরে উঠে যায় এবং বলে 'হে আল্লাহ! আপনি খুবই ভাল জানেন যে, আমাদের ইচ্ছা খারাপ নয়, আমরা অপনার ঘর ধ্বংস করতে চাইনে বরং ওটাকে উন্নত করার চিন্তাতেই আছি।' একথা বলে সে দুটি স্তম্ভের দু'ধারের কিছু অংশ ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর কুরাইশরা বলেঃ 'এখন ছেড়ে দাও। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করি। যদি এ ব্যক্তির উপর কোন শাস্তি নেমে আসে তবে তো এ পাথর ঐ স্থানেই রেখে দেয়া হবে এবং আমাদেরকে একাজ হতে বিরত থাকতে হবে। আর যদি কোন শাস্তি না আসে তবে বুঝে নিতে হবে যে, এটা ভেঙ্গে দেয়া আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ নয়। সুতরাং আগামীকাল আমরা সবাই মিলে এ কাজে লেগে যাবো।' অতঃপর সকাল হয় এবং সবদিক দিয়েই মঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। তখন সবাই এসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব ইমারত ভেঙ্গে দেয়।' অবশেষে তারা পূর্ব ভিত্তি অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখানে সবুজ বর্ণের পাথর ছিল এবং যেন একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ ছিল। একটি লোক দু'টি পাথরকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে ওতে এতো জোরে কোদাল মারে যে, ওটা আন্দোলিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মক্কা ভূমি আন্দোলিত হয়ে উঠে। তখন জনগণ বুঝতে পারে যে, পাথরগুলোকে পৃথক করে ওর স্থানে অন্য পাথর লাগানো আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত নয়। কাজেই ওটা তাদের শক্তির বাইরের কাজ। সুতরাং তারা ঐ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ঐ পাথরগুলোকে ঐভাবেই রেখে দেয়। এর পর প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী পাথর সংগ্রহ করে এবং প্রাসাদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়।

অবশেষে তারা 'হাজরে আসওয়াদ' রাখার স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখন প্রত্যেক গোত্রই এই মর্যাদায় অংশ নিতে চায়। সুতরাং তারা পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করতে থাকে, এমনকি নিয়মিতভাবে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। 'বানু আব্দুদ্দার' এবং 'বানু আদী' রক্তপূর্ণ একটি পাত্রে হাত ডুবিয়ে শপথ করে বলেঃ

'আমরা সবাই কেটে গিয়ে মারা পড়বো এটাও ভাল তথাপি 'হাজরে আসওয়াদ' কাউকেও রাখতে দেব না।' এভাবেই চার পাঁচ দিন কেটে যায়। অতঃপর কুরাইশরা পরস্পর পরামর্শের জন্যে মসজিদে একত্রিত হয়। আবূ উমাইয়া বিন মুগীরা ছিল কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। সে সকলকে সম্বোধন করে বলে, 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা কোন একজনকে সালিশ নির্বাচিত কর এবং সে যা ফয়সালা করে তাই মেনে নাও। সালিশ নির্বাচনের ব্যাপারেও মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, সুতরাং তোমরা এ কাজ কর যে, এখানে সর্বপ্রথম যে সমজিদে প্রবেশ করবে সেই আমাদের সালিশ নির্বাচিত হবে।' এ প্রস্তাব সবাই সমর্থন করে। সর্বপ্রথম কে প্রবেশ করে এটা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষমান থাকে।

## 'হাজরে আসওয়াদ' ও আরবের আমীনের (সঃ) মধ্যস্থতা

সর্বপ্রথম যিনি আগমন করেন তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)। তাঁকে দেখা মাত্রই এসব লোক খুশী হয়ে যায় এবং বলেঃ 'তাঁর মধ্যস্থতা আমরা মেনে নিতে রাজী আছি। ইনি তো আমীন! ইনি তো মুহাম্মদ (সঃ)! অতঃপর তারা সবাই তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। তিনি বলেনঃ 'আপনারা একটি বড় ও মোটা চাদর নিয়ে আসুন।' তারা তা নিয়ে আসে। তিনি 'হাজরে আসওয়াদ' উঠিয়ে এনে স্বহস্তে ঐ চাদরে রেখে দেন এবং বলেনঃ 'প্রত্যেক গোত্রের নেতা এসে এই চাদরের কোণ ধরে নিন এবং এভাবেই আপনারা সবাই 'হাজরে আসওয়াদ' উঠাবার কাজে শরীক হয়ে যান।' একথা শুনে সমস্ত লোক আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় এবং সমস্ত গোত্রপ্রধান চাদরটি উত্তোলন করে। যখন ওটা রাখার স্থানে পৌঁছে তখন আল্লাহ্র নবী (সঃ) ওটা স্বহস্তে উঠিয়ে নিয়ে ওর স্থানে রেখে দেন। এভাবে সেই ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ নিমেষের মধ্যেই মিটে যায়। আর এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের (সঃ) হাতে তাঁর ঘরে ঐ বরকতময় পাথরটি স্থাপন করিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর ওয়াহী আসার পূর্বে কুরাইশরা তাঁকে 'আমীন' বলতো। এখন উপরের অংশ নির্মিত হয়। এভাবে মহান আল্লাহ্র ঘরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে কা'বা আঠারো হাত লম্বা ছিল। ইয়েমেন দেশীয় 'কবা' পর্দা তার উপর চড়ান হতো। পরে ওর উপর চাদর চড়ান হতে থাকে। সর্বপ্রথম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার উপর রেশমী পর্দা উত্তোলন করেন। কা'বা শরীফের এই ইমারতই থাকে। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের (রাঃ) খিলাফতের প্রাথমিক যুগে ষাট বছর পরে এখানে আগুনে লেগে যায়। এর ফলে কা'বা শরীফ পুড়ে যায়। এটা ছিল ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়ার রাজত্বের শেষ কাল এবং সে ইবনে যুবাইর (রাঃ) কে মক্কায় অবরোধ করে রেখেছিল।

## কা'বা শরীফের ইমারত এবং তার বিভিন্ন যুগের আবর্তন

এই সময়ে মক্কার খলীফা হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) স্বীয় খালা হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) নিকট যে হাদীসটি শুনেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মনের কথা অনুযায়ী বায়তুল্লাহকে ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর তিনি ওটা নির্মাণ করেন। 'হাতীম'কে ভিতরে ভরে নেন। পূর্ব ও পশ্চিমে দু'টি দরজা রাখেন। একটি ভিতরে আসার জন্য, অপরটি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। দরজা দু'টি মাটির সমান করে রাখেন। তাঁর শাসনামল পর্যন্ত কা'বা এরূপই থাকে। অবশেষে তিনি যালিম হাজ্জাজের হাতে শহীদ হন। তখন আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশক্রমে হাজ্জাজ কা'বা শরীফকে ভেঙ্গে পুনরায় পূর্বের মত করে নির্মাণ করেন। সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়ার যুগে যখন সিরিয়াবাসী মক্কা শরীফের উপর আক্রমণ করে এবং যা হবার তা হয়ে যায়, সেই সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফকে এরূপ অবস্থাতেই রেখে দেন। হজ্বের মৌসুমে জনগণ একত্রিত হয়। তারা সব কিছু স্বচক্ষে দেখে। এরপরে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করেনঃ কা'বা শরীফকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে কি নতুনভাবে নির্মাণ করবো, না কি ভাঙ্গা যা আছে তাকেই মেরামত করবো? তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'আমার মতে ভাঙ্গাকেই আপনি মেরামত করে দিন, বাকিগুলো পুরাতনই থাক।' তখন তিনি বলেনঃ 'আচ্ছা বলুন তো, যদি আমাদের কারও বাড়ি পুড়ে যেতো তবে কি সে নতুন বাড়ি নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতো? তাহলে মহাসম্মানিত প্রভুর ঘর সম্পর্কে এরূপ মত পেশ করেন কেন? আচ্ছা তিন দিন পর্যন্ত আমি ইস্তেখারা (লক্ষণ দেখে শুভ বিচার) করবো, তার পরে যা বুঝবো তাই করবো।' তিন দিন পরে তাঁর মত এই হলো যে, অবশিষ্ট দেয়ালও ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করা হবে। সুতরাং তিনি এই নির্দেশ দিয়ে দেন।

কিন্তু কা'বা শরীফ ভাঙ্গতে কেউই সাহস করছিল না। তারা ভয় করছিল যে, যে ব্যক্তি ভাঙ্গার জন্যে চড়বে তার উপর আল্লাহ্র শাস্তি অবতীর্ণ হবে। কিন্তু একজন সাহসী ব্যক্তি উপরে চড়ে গিয়ে একটি পাথর ভেঙ্গে দেয়। অন্যেরা যখন দেখে যে, তার কোন ক্ষতি হলো না তখন তারা সবাই ভাঙ্গতে আরম্ভ করে দেয় এবং ভূমি পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দেয়। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) চারদিকে স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে দেন এবং ওর উপর পর্দা করে দেন। এবারে বায়তুল্লাহ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেন, 'হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিটক হতে আমি শুনেছি তিনি বলেন যে,

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—'যদি লোকদের কুফরীর সময়টা নিকটে না হতো এবং আমার নিকট নির্মাণের খরচা থাকতো তবে আমি 'হাতীম' থেকে পাঁচ হাত পর্যন্ত বায়তুল্লাহর মধ্যে নিয়ে নিতাম এবং কা'বার দু'টি দরজা করতাম, একটা আসবার দরজা এবং অপরটি বের হওয়ার দরজা।' হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেনঃ 'এখন আর জনগণের কুফরীর যুগ নিকটে নেই, তাদের ব্যাপারে ভয় দূর হয়ে গেছে এবং কোষাগারও পূর্ণ রয়েছে, আমার নিকট যথেষ্ট অর্থ রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মনোবাসনা পূর্ণ না করার আমার আর কোন কারণ থাকতে পারে না।' সুতরাং তিনি পাঁচ হাত 'হাতীম' ভিতরে নিয়ে নেন। তখন হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ তা স্বচক্ষে দেখে নেয়। এরই উপর দেয়াল গাঁথা হয়। বায়তুল্লাহ শরীফের দৈর্ঘ্য ছিল আঠারো হাত। এখন আরও পাঁচ হাত বৃদ্ধি পায়, ফলে ছোট হয়ে যায়, এজন্যে দৈর্ঘ্যের আর দশ হাত বেড়ে যায়। দু'টি দরজা নির্মিত হয়। একটি ভিতরে আসবার এবং অপরটি বাইরে যাবার। হযরত ইবনে যুবাইরের (রাঃ) শাহাদাতের পর হাজ্জাজ আবদুল মালিকের নিকট পত্র লিখেন এবং তাঁর পরামর্শ চান যে, এখন কি করা যায়? এটাও লিখে পাঠান যে, ঠিক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর যে কা'বা শরীফ নির্মিত হয়েছে এটা মক্কা শরীফের সুবিচারকগণ স্বচক্ষে দেখেছেন।' কিন্তু আবদুল মালিক উত্তর দেনঃ 'দৈর্ঘ্য ঠিক রাখ কিন্তু 'হাতীম'কে বাইরে করে দাও এবং দ্বিতীয় দরজাটি বন্ধ করে দাও।' হাজ্জাজ আবদুল মালিকের এই নির্দেশক্রমে কা'বাকে ভেঙ্গে দিয়ে পূর্বের ভিত্তির উপরে নির্মাণ করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর ভিত্তিকে ঠিক রাখাই সুন্নাতের পন্থা ছিল। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাসনা তো এই ছিল। কিন্তু সেই সময় তাঁর এই ভয় ছিল যে, মানুষ হয়তো খারাপ ধারণা করে বসবে। কারণ তারা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আবদুল মালিক বিন মারওয়ান এ হাদীসটি জানতেন না। এজন্যেই তিনি ওটা ভাঙ্গিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি হাদীসটি জানতে পারেন তখন তিনি দুঃখ করে বলেনঃ 'হায়! যদি আমি ওটাকে না ভেঙ্গে পূর্বাবস্থাতেই রাখতাম।'

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত হারিস বিন উবায়দুল্লাহ (রাঃ) যখন আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের খিলাফত কালে তাঁর নিকট প্রতিনিধি রূপে গমন করেন তখন আবদুল মালিক তাঁকে বলেন, 'আমি ধারণা করি যে, আবূ হাবীব অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) এ হাদীসটি (তাঁর খালা) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে শুনেননি।' তখন হযরত হারিস বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ 'অবশ্যই তিনি শুনেছেন।' হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে

স্বয়ং আমিও শুনেছি।' আবদুল মালিক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কি শুনেছেন?' তিনি বলেনঃ 'আমি শুনেছি–তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ 'হে আয়েশা! তোমার 'কওম' বায়তুল্লাহকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। যদি তোমার সম্প্রদায়ের শির্কের যুগ নিকটে না হতো তবে নতুনভাবে আমি এর কমতি পূরণ করতাম। এসো, আমি তোমাকে এর প্রকৃত ভিত্তি দেখিয়ে দেই, হয়তো তোমার গোত্র আবার একে এর প্রকৃত ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারে। অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে প্রায় সাত হাত দেখিয়ে দেন এবং বলেনঃ 'আমি এর দু'টি দরজা নির্মাণ করতাম, একটি আগমনের ও অপরটি প্রস্থানের; এবং দরজা দু'টি মাটির সমান করে রাখতাম। একটি রাখতাম পূর্বমুখী এবং অপরটি রাখতাম পশ্চিমমুখী। তুমি কি জান যে, তোমার 'কওম' দরজাকে এত উঁচু করে রেখেছে কেন?' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'শুধুমাত্র নিজেদের মর্যাদা প্রকাশের জন্যে। যাকে চাইবে প্রবেশ করতে দেবে এবং যাকে চাইবে না প্রবেশ করতে দেবে না। যখন লোক ভিতরে যেতে চাইতো তখন তারা তাকে উপর হতে ধাক্কা দিতো ফলে সে পড়ে যেতো। আর যাকে তারা প্রবেশ করাবার ইচ্ছে করতো তাকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যেতো।' আবদুল মালিক তখন বলেনঃ ' হে হারিস! আপনি কি স্বয়ং এই হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে শুনেছেন?' তিনি বলেনঃ 'হাঁ' আমি স্বয়ং শুনেছি।' তখন আবদুল মালিক কিছুক্ষণ ধরে লাঠির উপর ভর দিয়ে চিন্তা করেন। অতঃপর বলেনঃ 'যদি আমি একে ঐ রকমই রেখে দিতাম!

সহীহ মুসলিমের আর একটি হাদীসে আছে যে, আবদুল মালিক বিন মারওয়ান একবার বায়তুল্লাহ তওয়াফ করার সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)কে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, তিনি এ হাদীসটির ব্যাপারে হযরত আয়েশার (রাঃ) উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন।' তখন হযরত হারিস (রাঃ) তাঁকে বাধা দেন এবং সাক্ষ্য দেন যে, তিনি সত্যবাদীই ছিলেন। আমিও হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এই হাদীসটি শুনেছি।' তখন আবদুল মালিক আফসোস করে বলেনঃ 'আমি পূর্ব হতে অবগত থাকলে কখনও ভাঙ্গতাম না।' কাযী আইয়ায্ এবং ইমাম নববী (রঃ) লিখেছেন যে, খলীফা হারুনুর রশীদ হযরত ইমাম মালিককে (রঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ 'আমি কা'বা শরীফকে পুনরায় ইবনে যুবাইর (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত আকারে নির্মাণ করে দেই এর কি আপনি অনুমতি দিচ্ছেন?' ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, 'আপনি এরূপ করবেন না। কারণ এর ফলে হয়তো পবিত্র কা'বা বাদশাহ্দের খেলনায় পরিণত হবে। তারা নিজেদের ইচ্ছামত ওটাকে ভাঙ্গতে থাকবে।' খলীফা হারুনুর রশীদ তখন তাঁর এই সংকল্প হতে বিরত থাকেন। এটাই সঠিকও মনে হচ্ছে যে, কা'বা শরীফকে বার বার ভেঙ্গে দেয়া উচিত নয়।

## কা'বা শরীফের ধ্বংসলীলা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কা'বাকে দু'টি ছোট পা (পায়ের গোছা) বিশিষ্ট একজন হাবশী ধ্বংস করবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, সেই কৃষ্ণবর্ণের (হাবশী) এক একটি পাথরকে পৃথক পৃথক করে দেবে, ওর আবরণ নিয়ে যাবে এবং ওর অর্থ সম্পদও ছিনিয়ে নেবে। সে বাঁকা হাত-পা বিশিষ্ট ও টেকো মাথাওয়ালা হবে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, সে কোদাল মেরে মেরে টুক্‌রো টুকরো করতে রয়েছে। খুব সম্ভব এই দুঃখজনক ঘটনা ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার পরে ঘটবে।' সহীহ বুখারী শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার পরও তোমরা বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব ও উমরাহ করবে।' হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁদের প্রার্থনায় বলেছেনঃ 'আমাদেরকে মুসলমান করে নিন। অর্থাৎ আমাদেরকে অকৃত্রিম, অনুগত, একত্ববাদী করে নিন এবং আমাদেরকে অংশীবাদী ও রিয়াকারী হতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে নম্র ও বিনয়ী করুন।' হযরত সালাম বিন মুতী (রঃ) বলেন যে, তাঁরা মুসলমান তো ছিলেনই, কিন্তু এখন ইসলামের উপর দৃঢ় ও অটল থাকার প্রার্থনা জানাচ্ছেন। এর উত্তরে মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন (قَدْ فَعَلْتُ) অর্থাৎ 'আমি তোমাদের এই প্রার্থনা কবূল করলাম।' আবার তাঁরা তাঁদের সন্তানাদির জন্যে এ দু'আই করছেন এবং তা কবূলও হচ্ছে। বানী ইসরাঈল ও আরব উভয়েই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদের মধ্যেও রয়েছেঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ -

অর্থাৎ 'মুসা (আঃ) এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল হক ও ইনসাফের উপর ছিল।' (৭ঃ ১৫৯) কিন্তু রচনা রীতি দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ প্রার্থনা আরবের জন্যই, যদিও সাধাণভাবে অন্যেরাও জড়িত রয়েছে। কেননা, এই প্রার্থনার পরে অন্য প্রার্থনায় রয়েছেঃ 'তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন' এই রাসূল দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে বুঝান হয়েছে। এ প্রার্থনাও গৃহীত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ

অর্থাৎ 'তিনিই এমন যিনি নিরক্ষরদের মধ্য তাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন।' (৬২ঃ ২) কিন্তু এর দ্বারা তাঁর রিসালাত কারও জন্য বিশিষ্ট হচ্ছে না বরং তাঁর রিসালাত সাধারণ। আরব অনারব সবার জন্যেই তিনি রাসূল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তুমি বল, হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদের সবারই নিকট রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি।' (৭ঃ ১৫৮) এ দুজন নবীর প্রার্থনার মত প্রত্যেক খোদা ভীরু লোকেরই প্রার্থনা হওয়া উচিত। যেমন পবিত্র কোরআন মুসলমানকে দু'আ শিখিয়ে দিচ্ছেঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তানবর্গ হতে চক্ষের শীতলতা (শান্তি) দান করুন এবং আমাদেরকে খোদা ভীরু লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।' (২৫ঃ ৭৪) এটাও আল্লাহ তা'আলার প্রেমের দলীল যে, মানুষ কামনা করবে তার মৃত্যুর পরে তার ছেলেরাও যেন আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনায় রত থাকে। অন্য জায়গায় প্রার্থনার শব্দ রয়েছেঃ وَاجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ অর্থাৎ 'আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা হতে রক্ষা করুন।' (১৪ঃ ৩৫) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মানুষ মরে যাওয়া মাত্র তার কার্যাবলী শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ অবশিষ্ট থাকে। (১) সাদকাহ্, (২) ইলম, যদ্দারা উপকার লাভ করা হয়, (৩) সৎ সন্তান, যারা প্রার্থনা করে (সহীহ মুসলিম)। তার পরে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে হজ্বের আহকাম শিখিয়ে দিন।' কা'বা শরীফের ইমারত পূর্ণ হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে নিয়ে 'সাফা' পর্বতে আসেন, অতঃপর মারওয়া পর্বতে যান এবং বলেন যে এগুলোই হচ্ছে আল্লাহর স্মৃতি নিদর্শন। অতঃপর তাঁকে মিনার দিকে নিয়ে যান। 'উকবাহ'র উপরে একটি গাছের পার্শ্বে শয়তানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে বলেনঃ 'তাকবীর' পাঠ করতঃ তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করুন।' ইবলিস এখান হতে পালিয়ে গিয়ে 'জামরা-ই-উকবা'র পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায়। এখানেও তিনি তাকে পাথর মারেন। এই কলুষ শয়তান নিরাশ হয়ে চলে যায়। হজ্বের আহকামের মধ্যে সে কিছু গোলমাল সৃষ্টি করতে চেয়েছিল কিন্তু সুযোগ পেলো না এবং সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেল। এখান হতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে 'মাশআরে হারাম' নিয়ে যান। অতঃপর আরাফাতে পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে তিনবার জিজ্ঞেস করেনঃ 'বলুন, বুঝেছেন' তিনি বলেনঃ 'হাঁ'। অন্য বর্ণনায় শয়তানকে তিন জায়গায় পাথর মারার কথা বর্ণিত আছে। প্রত্যেক হাজী শয়তানকে সাতটি করে পাথর মারেন।

১২৯। হে আমাদের প্রভু! সেই দলে তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদেরকে আপনার নিদর্শনাবলী পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করবেন ও তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ع

## শেষ নবী (সঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা

'হারাম' বাসীদের জন্যে এটা আর একটি দু'আ যে তাঁর সন্তানদের মধ্যে হতেই যেন একজন নবী তাদের মধ্যে আগমন করেন। এ প্রার্থনাও গৃহীত হয়। মুসনাদই আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি তখন থেকেই শেষ নবী যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির আকারে ছিলেন। আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক কথার সংবাদ দিচ্ছি। আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন।' নবীদের মায়েরা এরকমই স্বপ্ন দেখে থাকেন। হযরত আবু উমামা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নবুওয়াতের সূচনা কিরূপে হয়?' তিনি বলেনঃ 'আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা, আমার সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মা স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর মধ্য হতে যেন একটি আলো বেরিয়ে গেল যা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত করে দিল।' ভাবার্থ এই যে, দুনিয়ায় খ্যাতির মাধ্যম এই জিনিসগুলোই হয়। তাঁর সম্মানিতা মায়ের এ স্বপ্নের কথাও পূর্ব হতেই আরবে ছড়িয়ে ছিল। তারা বলতো যে, আমেনার গর্ভে কোন একজন মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন। বানী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে খুৎবা দেয়ার সময় পরিষ্কারভাবে তাঁর নামও বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেনঃ 'হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল (রূপে প্রেরিত হয়েছি), আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের আমি সত্যতা প্রমাণ করছি এবং আমার পরে আগমনকারী একজন নবীর সংবাদ তোমাদেরকে দিচ্ছি যাঁর নাম আহমদ (সঃ)।' এ হাদীসে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে নূর দ্বারা সিরয়ার প্রাসাদগুলো আলোকোজ্জ্বল হওয়া ঐ কথার দিকে ইঙ্গিত করছে যে, তথায় দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। বরং বর্ণনাসমূহ দ্বারা

সাব্যস্ত হয় যে, শেষ যুগে সিরিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হবে। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর দামেশকেই হযরত ঈসা (আঃ) 'মিনারার' উপর অবতীর্ণ হবেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধবাদিরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার হুকুম এসে যাবে। সহীহ বুখারীর মধ্যে 'ওটা সিরিয়ায় হবে' এটুকু বেশী আছে। আবুল আলীয়া হতে নকল করা হয়েছে যে, এই প্রার্থনার উত্তরে বলা হয়ঃ 'এটাও গৃহীত হলো এবং রাসূল শেষ যুগে প্রেরিত হবে।' 'কিতাব'-এর অর্থ হচ্ছে 'কুরআন' এবং 'হিকমত'-এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সুন্নাহ'। হযরত হাসান বসরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ) এবং আবূ মালিক প্রভৃতিও একথাই বলেন। 'হিকমত' দ্বারা ধর্ম বোধও বুঝানো হয়েছে। 'পবিত্র করা' অর্থাৎ আনুগত্য ও আন্তরিকতা শিক্ষা দেয়া, ভাল কাজ করানো, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা, অবাধ্যতা, হতে বিরত থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকা। আল্লাহ 'আযীয' অর্থাৎ যাঁকে কোন জিনিস অসমর্থ করতে পারে না, যিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর বিজয়ী। তিনি 'হাকীম' অর্থাৎ তাঁর কোন কথাও কাজ বিজ্ঞান এবং নৈপুণ্য হতে শূন্য নয়। তিনি প্রত্যেক জিনিসকেই তার আপন স্থানে জ্ঞান, ইনসাফ ও ইলমের সঙ্গে রেখেছেন।

**১৩০। এবং যে নিজেকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, নিশ্চয় সে পরকালে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।**

١٣٠- وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

**১৩১। যখন তার প্রভু তাকে বলেছিলেন, তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।**

١٣١- اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

**১৩২। আর ইবরাহীম ও ইয়াকুব স্বীয় সন্তানগণকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল হে আমার বংশধরগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না।**

١٣٢- وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

এই আয়াতসমূহেও মুশরিকদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করতো, অথচ তারা পূর্ণ মুশরিক ছিল। আর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তো একত্ববাদীদের ইমাম ছিলেন। তিনি তাওহীদকে শির্‌ক হতে পৃথককারী ছিলেন। সারা জীবনে চক্ষুর পলক পরিমাণও আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকেও শরীক করেননি। বরং তিনি প্রত্যেক অংশীবাদীকে প্রত্যেক প্রকারের শির্‌ককে এবং কৃত্রিম মাবুদকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই কারণেই তিনি স্বীয় সম্প্রদায় হতে পৃথক হয়ে যান, স্বদেশ ত্যাগ করেন, এমন কি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দেনঃ ' হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যে অংশী স্থির করছো আমি তা থেকে বিমুক্ত। নিশ্চয় আমি সুদৃঢ়ভাবে তাঁরই দিকে স্বীয় আনন স্থাপন করলাম যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' অন্য জায়গায় রয়েছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ 'আমি তোমাদের উপাস্যগণ হতে বিমুক্ত রয়েছি, আমি আমার সৃষ্টিকর্তারই বশ্য, তিনিই আমাকে সুপথ প্রদর্শন করবেন।'

অন্যস্থানে রয়েছেঃ 'হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার জন্যেও শুধুমাত্র একটি অঙ্গীকারের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান, ইবরাহীম বড়ই তওবাকারী ও সহিষ্ণু। অন্যত্র রয়েছেঃ 'ইবরাহীম খাঁটিও অনুগত বান্দা ছিল, কখনও মুশরিক ছিল না; প্রভুর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ছিল, সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পৃথিবীর উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরকালেও সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' এই আয়াতসমূহের ন্যায় এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচারকারী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর

ধর্মকে ত্যাগ করে থাকে। কেননা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াতের জন্যে মনোনীত করেছিলেন। এবং বাল্যকাল হতেই তাঁকে সত্য অনুধাবনের তওফীক দান করেছিলেন। 'খালীল'-এর ন্যায় সম্মানিত উপাদি একমাত্র তাঁকেই দান করেছিলেন। আখেরাতেও তিনি ভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভক্ত হবেন। তাঁর পথ ও ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে যারা ভ্রান্ত পথ ধারণ করে, তাদের মত নির্বোধ ও অত্যাচারী আর কে হতে পারে? এই আয়াতে ইয়াহূদীদের দাবীকেও খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, খ্রীষ্টানও ছিল না, মুশরিকও ছিল না, বরং একত্ববাদী মুসলমান এবং খাঁটি বান্দা ছিল। তার নিকটবর্তী তারাই যারা তাকে মানে এবং এই নবী (সঃ) ও মু'মিনগণ, আর আল্লাহ তা'আলাও মু'মিনদের অভিভাবক।'

'যখন তার প্রভু তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পন কর, তখন সে বলেছিল আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। এই একত্ববাদের মিল্লাতের উপদেশই হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) তাদের সন্তানগণকে দিয়েছিল।' هَا সর্বনামটির مَرْجَعْ হয়তো বা مِلَّتْ হবে কিংবা كَلِمَةْ হবে। مِلَّتْ -এর ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম এবং كَلِمَةْ -এর ভাবার্থ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ হবে। ইসলামের প্রতি তাঁদের প্রেম ও ভালবাসা কত বেশী ছিল যে, তাঁরা নিজেরাতো সারা জীবন তার উপর অটল ছিলেনই, আবার সন্তানদেরকেও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবার উপদেশ দিচ্ছেন। অন্য জায়গায় রয়েছে وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهِ অর্থাৎ 'আমি তা তাদের সন্তানদের মধ্যেও বাকী রেখেছি।' (৪৩ঃ ২৮) কোন কোন মনীষী (وَيَعْقُوْبُ) এরকমও পড়েছেন। তখন ওটার সংযোগ হবে بَنِيْهِ -এর সঙ্গে। তা হলে অর্থ হবেঃ 'ইবরাহীম (আঃ) তার সন্তানদেরকে এবং সন্তানদের সন্তান ইয়াকুব (আঃ) কে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছিল।' কুশাইরী (রঃ) বলেন যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ দাবী ভিত্তিহীন, এর উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। বরং স্পষ্টতঃ জানা যাচ্ছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবদ্দশাতেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কেননা, কুরআন পাকের আয়াতে রয়েছে فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ অর্থাৎ 'আমি তাকে (হযরত ইবরাহীম আঃ-এর স্ত্রী সারাকে) ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকুবের

সুসংবাদ দিয়েছি।' (১১ঃ ৭১) তাহলে যদি হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান না থাকতেন তবে তাঁর নাম নেয়ার কোন প্রয়োজন থাকতো না। সূরা-ই-'আনকাবুতের মধ্যেও রয়েছেঃ'আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ)কে দান করেছি এবং তার সন্তানদের মধ্যে আমি নবুওয়াত ও কিতাব দিয়েছি। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'আমি তাকে ইসহাককে দিয়েছি এবং অতিরিক্ত হিসেবে ইয়াকুবকে দান করেছি।' এই সব আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলেন। পূর্বের কিতাবসমূহেও রয়েছে যে, তিনি 'বায়তুল মুকাদ্দাসে' আগমন করবেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ 'আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন মস্জিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়?' তিনি বলেনঃ 'মসজিদ-ই- হারাম।' আমি বলি– 'তার পরে কোনটি?' তিনি বলেনঃ' বায়তুল মুকাদ্দাস।' আমি বলি, 'এদুটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?' তিনি বলেনঃ 'চল্লিশ বছর।' ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেন যে, এ ব্যবধান হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত সুলাইমান (আঃ) -এর মধ্যে। অথচ এটা সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। এই দুই নবীর মধ্যে হাজার বছরেরও বেশী ব্যবধান ছিল। বরং হাদীসটির ভাবার্থ অন্য কিছু হবে। হযরত সুলাইমান (আঃ) তো ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের মেরামতকারী, তিনি ওর নির্মাতা ছিলেন না। এরকমই হযরত ইয়াকুব (আঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন, যেমন অতিসত্ত্বরই এর আলোচনা আসছে। তাঁদের ওসিয়তের ভাবার্থ হচ্ছে এইঃ 'তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় সৎ কর্মশীল হও এবং ওর উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাক, যেন মৃত্যুও ওর উপরেই হয়।' সাধারণতঃ যে ইহলৌকিক জীবনে যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে মৃত্যু ওর উপরই হয়ে থাকে, এবং যার উপরে মৃত্যুবরণ করে ওর উপরেই কিয়ামতের দিন তার উত্থান হবে। মহান আল্লাহর বিধান এই যে, যে ব্যক্তি ভাল কাজের ইচ্ছে পোষণ করে, তিনি তাকে সেই কাজের তাওফীক প্রদান করে থাকেন এবং ঐ কাজ তার জন্য সহজ করে দেয়া হয় ও তাকে ওরই উপর অটল রাখা হয়। নিঃসন্দেহে এটাও হাদীসে এসেছে যে, মানুষ বেহেশ্তের কাজ করতে করতে বেহেশ্ত হতে মাত্র এক হাত দূরে থাকে। অতঃপর তার ভাগ্য তার উপর বিজয় লাভ করে। ফলে সে দুযখের কাজ করতঃ দুযখী হয়ে যায়। আবার কখনও এর বিপরীত হয়ে থাকে। কিন্তু এর ভাবার্থ এই যে, এই ভাল বা মন্দ বাহ্যিক হয়, প্রকৃত পক্ষে তা হয় না। কেননা, এই হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় আছেঃ সে বেহেশ্তের কাজ করে যা মানুষের নিকট প্রকাশ পায় এবং সে দুযখের কাজ করে যা লোকের নিকট

প্রকাশ পায়। কুরআন মাজীদ ঘোষণা করেঃ 'যে ব্যক্তি দান করেছে, ভয় করেছে এবং ভাল কথার সত্যতা স্বীকার করেছে আমি তাকে শান্তির উপকরণ (বেহেশ্‌ত) প্রদান করবো। আর যে কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া হয়েছে, আর ভাল কথাকে (সত্য ধর্মকে) অবিশ্বাস করেছে, আমি তাকে ক্লেশদায়ক বস্তু (জাহান্নাম)-এর জন্যে আসবাব প্রদান করবো।'

---

١٣٣- أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৩৩। যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? তখন সে নিজ পুত্রগণকে বলেছিল– আমার পরে তোমরা কোন জিনিসের আরাধনা করবে? তারা বলেছিল– আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য– সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের আরাধনা করবো, এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকবো।

١٣٤- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৩৪। ওটা একটা দল ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের জন্যে এবং তারা যা করে গেছে তজ্জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

---

আরবের মুশরিকরা ছিল হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর এবং বানী ইসরাঈলেরা কাফির ছিল এবং তারা ছিল হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর। তাদের উপর প্রমাণ উপস্থিত করতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) অন্তিমকালে স্বীয় সন্তানগণকে বলেছিলেনঃ 'আমার পরে তোমরা কার

'ইবাদত করবে?' তারা সবাই উত্তরে বলেছিলঃ 'আপনার ও আপনার মাননীয় মুরুব্বীগণের যিনি সত্য উপাস্য অর্থাৎ আল্লাহ্, আমরা তাঁরই ইবাদত করবো।' হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র এবং হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নাম বাপ দাদার আলোচনায় বহুল প্রচলন হিসেবে এসে গেছে। তিনি হচ্ছেন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর চাচা, এবং আরবে এটা প্রচলিত আছে যে, তারা চাচাকে বাপ বলে থাকে। এই আয়াতটিকে প্রমাণ রূপে দাঁড় করে দাদাকেও পিতার হুকুমে রেখে দাদার বিদ্যমানতায় মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা ও ভগ্নিকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রাঃ) ফায়সালা এটাই। যেমন সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশার (রাঃ) মাযহাব এটাই। হাসান বসরী (রঃ), তাউস (রঃ) এবং আতাও (রঃ) এই বলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আরও বহু গুরুজনেরও মাযহাব এটাই। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফেঈ (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনায় নকল করা হয়েছে যে, তাঁরা ভাই ও বোনদেরকেও উত্তরাধিকারী বলে থাকেন। হযরত উমর (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একটি দলেরও মাযহাব এই। কাযী আবূ ইউসুফ (রঃ) এবং মুহাম্মদ ইবনে হাসানও (রঃ) এটাই বলেন। এঁরা দু'জন হযরত ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) সুপথ গামী ছাত্র ছিলেন।

এ জিজ্ঞাস্য বিষয়কে পরিষ্কার করার জায়গায় এটা নয়। এবং তাফসীরের এটা আলোচ্য বিষয়ও নয়। ঐ সব ছেলে স্বীকার করে যে তারা একই উপাস্যের উপাসনা করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কাউকেও শরীক করবে না এবং তাঁর আনুগত্যে, তাঁর আদেশ পালনে এবং বিনয় ও নম্রতায় সদা নিমগ্ন থাকবে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁর অনুগত, তাঁরই নিকট তোমরা সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে।' আহকামের ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও সমস্ত নবীর ধর্ম এই ইসলামই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ -

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বে আমি যত নবী পাঠিয়েছি তাদের সবারই নিকট এই ওয়াহী করেছি যে, আমি ছাড়া কেউই উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা সবাই আমারই ইবাদত কর।' (২১ঃ ২৫) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং এ বিষয়ের উপর বহু হাদীসও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের একই ধর্ম।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ওটা একটা দল ছিল যা অতীত হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমাদের কোন উপকার হবে না। তাদের কৃতকর্ম তাদের জন্যে এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের জন্যে। তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।' এ জন্যেই হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'যার কাজ বিলম্বিত হবে তার বংশ তাকে ত্বরান্বিত করবে না।' অর্থাৎ যে সৎকার্যে বিলম্ব করবে তার বংশ মর্যাদা তার কোন উপকারে আসবে না।

**১৩৫। এবং তারা বলে যে, তোমরা ইয়াহূদী অথবা খ্রীষ্টান হও তবেই সুপথ প্রাপ্ত হবে, তুমি বল বরং আমরা ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্মে আছি এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।**

١٣٥- وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

এক চক্ষু বিশিষ্ট আবদুল্লাহ বিন সুরিয়া নামক একজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলেছিলঃ 'আমরাই সঠিক পথে রয়েছি। তোমরা আমাদের অনুসারী হও তবে তোমরাও সুপথ প্রাপ্ত হবে।' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীরাইতো ইবরাহীম (আঃ)-এর সুদৃঢ় ধর্মের অনুসারী। ইবরাহীম (আঃ) তো ছিলেন সঠিক ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি আল্লাহর অকৃত্রিম প্রেমিক, বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মনঃসংযোগকারী, ক্ষমতা থাকার সময় হজ্বকে অবশ্য কর্তব্যরূপে মান্যকারী, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী, সমস্ত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, 'আল্লাহ ছাড়া কেউই উপাস্য নেই' একথার সাক্ষ্যদানকারী মা, মেয়ে, খালা ও ফুফুকে হারাম জ্ঞানকারী এবং সমস্ত অবৈধ কাজ হতে দূরে অবস্থানকারী ছিলেন। বিভিন্ন মনীষী হানীফ' শব্দের এ সব অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১৩৬। তোমরা বল- আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা হযরত ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) কে যা প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রভু হতে যা প্রদত্ত হয়েছিল, তদ সমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

١٣٦- قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যা কিছু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর যেন তারা বিস্তারিতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যা তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ঐগুলোর উপরেও যেন সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনয়ন করে। ঐ পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে কারও কারও নামও নেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য নবীদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহ একথাও বলেছেন যে, তারা যেন নবীদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি না করে। অর্থাৎ তারা যেন কোন নবীকে মানবে এবং কোন কোন নবীকে মানবে না, এরূপ যেন না করে। এরকম অভ্যাস পূর্ববর্তী লোকদের ছিল যে, তারা কাউকে মানতো আবার কাউকে মানতো না। ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আঃ)কে মানতো না, খ্রীষ্টানেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে মানতো না এবং হিজাজে আরব হযরত মূসা (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই তিনজনকেই স্বীকার করতো না। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا অর্থাৎ 'ঐসব লোক নিশ্চিত রূপেই কাফির।' (৪ঃ ১৫১) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কিতাবিরা তাওরাতকে ইবরাণী ভাষায় পাঠ করতো। এবং আরবী ভাষায় ওর তাফসীর করে মুসলমানদেরকে শুনাতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা আহলে কিতাবের

সত্যতাও স্বীকার করো না এবং মিথ্যাও প্রতিপন্ন করো না, বরং বল যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর এবং তাঁর অবতারিত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকআতে নিম্নের এই আয়াতটি اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا (২ঃ ১৩৬)সম্পূর্ণ পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (৩ঃ ৫২)এই আয়াতটি পড়তেন। اَسْبَاطٌ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্রগণকে বলা হতো। তাঁরা ছিলেন বারোজন। প্রত্যেকের বংশে বহু লোকের জন্ম হয়। বানী ইসমাঈলকে قَبَائِل বলা হতো। এবং বানী ইসরাঈলকে اَسْبَاطٌ বলা হতো। ইমাম যামাখশারী (রঃ) 'তাফসীরে কাশ্শাফে' লিখেছেন যে, এরা ছিল হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পৌত্র, যারা তাঁর বারোটি পুত্রের সন্তানাদি ছিল। বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে যে, قَبَائِل -এর ভাবার্থ হচ্ছে 'বানী ইসরাঈল।' তাদের মধ্যেও নবী হয়েছিলেন, যাদের উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তি নকল করেন যা তিনি বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ তোমরা আল্লাহর ঐ নিয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে বাদশাহ ও নবী করেছেন।' অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا অর্থাৎ 'আমি তাদের বারোটি দল করে দিয়েছিলাম।' (৭ঃ ১৬০) পর্যায়ক্রমে আসাকে سِبْطٌ বলা হয়। এরাও পর্যায়ক্রমে এসেছিল। কেউ কেউ বলেন যে, এটা سِبْطٌ হতে নেয়া হয়েছে। গাছকে سَبْطٌ বলা হয়। অর্থাৎ এরা গাছের মত যার শাখা প্রশাখাগুলো ছড়িয়ে রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দশজন নবী ছাড়া সমস্ত নবীই বানী ইসরাঈলের মধ্য হতে হয়েছেন। ঐ দশজন নবী হচ্ছেঃ (১) হযরত নূহ (আঃ) (২) হযরত হূদ (আঃ) (৩) হযরত সালেহ্ (আঃ) (৪) হযরত শুয়াইব (আঃ) (৫) হযরত ইবরাহীম (আঃ) (৬) হযরত ইসহাক (আঃ) (৭) হযরত ইয়াকুব (আঃ) (৮) হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং (৯) হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)।[১] سِبْطٌ বলা হয় ঐ দল ও গোত্রকে যার মূল ব্যক্তি উপরে গিয়ে একই হয়ে যায়। তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর আমাদের ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমলের জন্যে শুধুমাত্র কোরআন ও হাদীসই যথেষ্ট। মুসনাদই ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, কিন্তু আমলের জন্যে কুরআনই যথেষ্ট।

১. মূল তাফসীরে দশম নবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

১৩৭- فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

**১৩৭। অনন্তর তোমরা যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তারাও যদি তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে নিশ্চয় তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি তারা ফিরে যায় তবে তারা শুধু বিরুদ্ধাচরণেই যাবে; অতএব অচিরেই আল্লাহ তাদের প্রতিকূলে তোমাকেই যথেষ্ট করবেন এবং তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।**

১৩৮- صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ○

**১৩৮। আমরা আল্লাহরই বর্ণে রঞ্জিত, আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম রঞ্জনকারী? এবং আমরা তাঁরই উপাসক।**

---

অর্থাৎ 'হে ঈমানদার সাহাবীবর্গ (রাঃ)! এই সব কাফিরও যদি তোমাদের মত যাবতীয় কিতাব ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তবে তারাও সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি দলীল ও প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনয়ন হতে বিরত থাকে তবে নিশ্চিত রূপে তারা ন্যায় ও সত্যের উল্টো পথে রয়েছে। সেই সময় হে নবী (সঃ)! তোমাকে তাদের উপর জয়যুক্ত করতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে তোমাদেরকেই যথেষ্ট করবেন।' হযরত নাফে' বিন আবূ নাঈম (রাঃ) বলেন যে, কোন একজন খলীফার নিকট হযরত উসমানের (রাঃ) কুরআন মাজীদ পাঠানো হয়। একথা শুনে যিয়াদ নামক এক ব্যক্তি নাফে' বিন আবূ নাঈমকে বলেনঃ 'জনসাধারণের মধ্যে একথা ছড়িয়ে রয়েছে যে, যখন হযরত উসমানকে (রাঃ) শহীদ করা হয় সেই সময় এই কালামুল্লাহ (কুরআন মাজীদ) তাঁর ক্রোড়ে বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর রক্ত ঠিক এই শব্দগুলোর উপর ছিল فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ একথা কি সত্য?' তখন হযরত নাফে' (রাঃ) বলেনঃ 'এটা সম্পূর্ণ রূপে সঠিক কথা। আমি স্বয়ং এই আয়াতের উপর হযরত উসমান যিন্নূরাইনের (রাঃ) রক্ত দেখেছিলাম।'

এখানে 'রং' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'ধর্ম'। অর্থাৎ 'আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।' কেউ কেউ বলেন যে, এটা مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ হতে بَدَل হয়েছে যা এর পূর্বে

أمَنَّا بِاللّٰهِ এবং مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ বিদ্যমান রয়েছে। সিবওয়াই (রঃ) বলেন যে, এটা -এর কারণে এর উপর نَصَبْ হয়েছে। যেমন وَعْدَ اللّٰهِ -এর উপর হয়েছে। একটি মারফূ' হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'বানী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রভুও কি রং করে থাকেন?' তখন হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।' আল্লাহ তা'আলা তখন হযরত মূসা (আঃ) কে ডাক দিয়ে বলেনঃ 'তারা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, 'তোমার প্রভু কি রং করেন?' তিনি বলেনঃ 'হাঁ'। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি সমুদয় রং আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন।' এই আয়াতেরও ভাবার্থ এটাই। কিন্তু হাদীসটি মাওকুফ হওয়াই সঠিক কথা এবং এটাও এর ইসনাদ বিশুদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভর করে।

---

١٣٩- قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۝

১৩৯। তুমি বল—তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিরোধ করছো? অথচ তিনিই আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদের জন্যে আমাদের কার্যসমূহ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কার্যসমূহ এবং আমরাই তাঁর জন্যে নির্মলতর।

١٤٠- اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ

১৪০। তোমরা কি বলছো যে, ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ) ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) ও তদীয় বংশধরগণ ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান ছিল? তুমি বল—তোমরাই সঠিক জ্ঞানী না আল্লাহ? এবং আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে

| | |
|---|---|
| সে অপেক্ষা কে বেশী অত্যাচারী? এবং তোমরা যা করছো তা হতে আল্লাহ্ অমনোযোগী নন। | شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ |
| ১৪১। ওটা একটি জামা'আত ছিল যা বিগত হয়েছে; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের জন্যে এবং তারা যা করে গেছে তদ্বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। | ١٤١- تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ ع |

বিশ্ব প্রভু স্বীয় নবী (সঃ)কে মুশরিকদের ঝগড়া বিদূরিত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সঃ)কে বলছেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি মুশরিকদেরকে বলঃ 'হে মুশরিকের দল! তোমরা আমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, অকৃত্রিমতা, আনুগত্য ইত্যাদির ব্যাপারে বিবাদ করছো কেন? তিনি তো শুধু আমাদের প্রভু নন বরং তোমাদেরও প্রভু। তিনি তো আমাদের ও তোমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনি আমাদের সবারই ব্যবস্থাপক। আমাদের কাজের প্রতিদান আমাদেরকে দেয়া হবে। আমরা তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের শির্কের প্রতি অসন্তুষ্ট।' কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে বলে দাও–আমার জন্যে আমার কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ, তোমরা আমার (সৎ) কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আমিও তোমাদের (অসৎ) কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট।' অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'এরা যদি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে তবে তাদেরকে বলে দাও–আমি ও আমার অনুসারীরা আমাদের মুখমণ্ডল আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দিলাম।' হযরত ইবরাহীম (আঃ)ও তাঁর গোত্রের লোককে এ কথাই বলেছিলেনঃ 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ঝগড়া করছো?' অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'হে নবী (সঃ!) তুমি কি তাকে দেখনি যে ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে তার প্রভুর ব্যাপারে ঝগড়া করছিল?' সুতরাং এখানে ঐ বিবাদীদেরকে বলা হচ্ছেঃ 'আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে। আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের হতে

পৃথক হয়ে গেলাম। আমরা একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পড়বো।' অতঃপর ঐ সব লোকের দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহূদীও ছিলেন না এবং খ্রীষ্টানও ছিলেন না। কাজেই হে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানের দল! তোমরা এসব কথা বানিয়ে বলছো কেন? বলা হচ্ছে যে, তোমাদের জ্ঞান কি আল্লাহ তা'আলার চেয়েও বেড়ে গেল? আল্লাহ তা'আলা তো পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছেনঃ

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ *

অর্থাৎ 'হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহূদীও ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না। বরং সুদৃঢ় মুসলমান ছিল এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' (৩ঃ ৬৭) আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যকে গোপন করে তাদের বড় অত্যাচার করা এই ছিল যে, তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন তা তারা পড়েছিল এবং জানতে পেরেছিল যে, ইসলামই প্রকৃত ধর্ম ও মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সত্য রাসূল। এটা জেনেও তারা তা গোপন করেছিল। ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) প্রভৃতি সবাই ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিলেন। কিন্তু তারা তা স্বীকার করেনি। শুধু তাই নয়, বরং এই কথাকেই তারা গোপন করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের কাজ তাঁর নিকট গোপন নেই। তাঁর 'ইলম' সব জিনিসকেই ঘিরে রয়েছে। তিনি প্রত্যেক ভাল ও মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

এই ধমক দেয়ার পর আল্লাহ্ বলেন যে, ঐ সব মহা মানব তো তাঁর নিকট পৌঁছে গেছে। এখন যদি তোমরা তাঁদের পদাংক অনুসরণ না কর, তবে তোমরা তাঁদের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের কোনই সম্মান নেই। আর তোমাদের অসৎ কাজের বোঝাও তাদেরকে বইতে হবে না। তোমরা যখন এক নবীকে অস্বীকার করছো তখন যেন সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করছো। বিশেষ করে তোমরা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর যুগে বাস করেও তাঁকে অস্বীকার করছো! যিনি হচ্ছেন সমস্ত নবীর নেতা। যাঁকে সমস্ত দানবও মানবের নিকট নবী করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং তাঁর রিসালাতকে মেনে নেয়া প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। তাঁর উপর ও অন্যান্য সমস্ত নবীর উপরও আল্লাহ্ তা'আলার দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

١٤٢- سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ
النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ
الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ
يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

১৪২। মানবমণ্ডলীর অন্তর্গত নির্বোধেরা অচিরেই বলবে যে, কিসে তাদেরকে সেই কেবলা হতে প্রত্যাবৃত্ত করলো–যার দিকে তারা ছিল? তুমি বলে দাও, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই জন্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ-প্রদর্শন করেন।

١٤٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً
وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَّتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ
عَلٰى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا
كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ
اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

১৪৩। এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যেন তোমরা মানবগণের জন্যে সাক্ষী হও এবং রাসূলও তোমাদের জন্যে সাক্ষী হয়; এবং তুমি যে কেবলার দিকে ছিলে–তা আমি এজন্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায় আমি তা জেনে নেবো এবং আল্লাহ যাদেরকে পথ-প্রদর্শন করেছেন তারা ছাড়া অপরের জন্যে এটা অবশ্যই কঠোরতর; এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন, নিশ্চয় আল্লাহ মানবগণের প্রতি স্নেহশীল করুণাময়।

বলা হয় যে, নির্বোধ লোক দ্বারা আরবের মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। একটি উক্তিতে ইয়াহূদীদের আলেমগণকে বুঝানো হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মুনাফিকেরা। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত বারা‘ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। কা’বা ঘর তাঁর কিবলাহ্ হোক এটাই তাঁর মনের বাসনা ছিল। এর হুকুম প্রাপ্তির পর তিনি ঐদিকে মুখ করে প্রথম আসরের নামায পড়েন। যেসব লোক তাঁর সাথে নামায পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি লোক মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তথায় লোক রুকুর অবস্থায় ছিলেন। ঐ লোকটি বলেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়েছি।’ একথা শুনামাত্রই ঐসব লোক ঐ অবস্থাতেই কা’বার দিকে ফিরে যান। কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বে যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু লোক শহীদও হয়েছিলেন। তাঁদের নামায সম্বন্ধে কি বলা যায় তা জনগণের জানা ছিল না। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না।’

সহীহ মুসলিমের মধ্যে এই বর্ণনাটি অন্যভাবে রয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন এবং অধিকাংশ সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে নির্দেশের অপেক্ষা করতেন। তখন قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ (২ঃ ৪৪) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কা’বা শরীফ কিবলাহ্ রূপে নির্ধারিত হয়। এই সময় মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলো লোক বলেনঃ ‘কিবলাহ্’ পরিবর্তনের পূর্বে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের অবস্থা যদি আমরা জানতে পারতাম! সেই সময় আল্লাহ তা‘আলা وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ (২ঃ ৪৩) আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আহলে কিতাবের মধ্যে কয়েকজন নির্বোধ এই কিবলাহ্ পরিবর্তনের উপর আপত্তি আরোপ করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় হিজরত করেন তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ্ করা তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল। এতে ইয়াহূদীরা খুবই খুশী হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ) -এর কিবলাহ্কে পছন্দ করতেন। সুতরাং কিবলাহ্ পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হলে ইয়াহূদীরা হিংসা বশতঃ বহু আপত্তি উত্থাপন করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ ‘পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।’ এই ব্যাপারে যথেষ্ট হাদীসও রয়েছে।

মোট কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় দুই 'রুকনের' মধ্যবর্তী সাখারা-ই-বায়তুল মুকাদ্দাসকে সামনে রেখে নামায পড়তেন। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করেন তখন ঐ দু'টোকে একত্রিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নামাযে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই নির্দেশ কুরআন কারীমের মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল কি অন্য কিছুর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, এটা তাঁর ইজতিহাদী বিষয় ছিল এবং মদীনায় আগমনের পরে কয়েক মাস পর্যন্ত তিনি ওর উপরই আমল করেন, যদিও তিনি আল্লাহ তা'আলার কিবলাহ পরিবর্তনের নির্দেশের প্রতি উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকতেন। অবশেষে তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হয় এবং সর্বপ্রথম তিনি ঐদিকে মুখ করে আসরের নামায পড়েন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, ওটা যুহরের নামায ছিল। হযরত আবূ সাঈদ বিন আলমুয়াল্লা (রাঃ) বলেন, 'আমি ও আমার সঙ্গী প্রথমে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়েছি এবং ওটা যুহরের নামায ছিল'। কোন কোন মুফাস্সিরের বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন নবী (সঃ)-এর উপর কিবলাহ পরিবর্তনের আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তিনি 'বানী সালমার' মসজিদে যুহরের নামায পড়ছিলেন। দু'রাক'আত পড়া শেষ করে ফেলেছিলেন, অবশিষ্ট দু'রাক'আত তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে পড়েন। এই কারণেই এই মসজিদের নাম হয়েছে 'মসজিদুল কিবলাতাইন' অর্থাৎ 'দুই কিবলার মসজিদ'। হযরত নুওয়াইলা বিনতে মুসলিম (রাঃ) বলেনঃ "আমরা যুহরের নামাযে ছিলাম এমন সময় আমরা এ সংবাদ পাই, আমরা নামাযের মধ্যেই ঘুরে যাই। পুরুষ লোকেরা স্ত্রীলোকদের জায়গায় এসে পড়ে এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষ লোকদের জায়গায় পৌঁছে যায়। তবে 'কুবা' বাসীর নিকট পরদিন ফজরের নামাযের সময় এ সংবাদ পৌঁছে।' বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মানুষ 'কুবা'র মসজিদে ফজরের নামায আদায় করছিল, হঠাৎ কোন আগন্তুক বলে যে, রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর কুরআন মাজীদের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে এবং কা'বা শরীফের দিকে মুখ করার নির্দেশ হয়ে গেছে। সুতরাং আমরাও সিরিয়ার দিক হতে মুখ সরিয়ে কা'বার দিকে মুখ করে নেই। এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, কোন 'নাসিখের' হুকুম তখনই অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে যখন তা জানা যায়, যদিও তা পূর্বেই পৌঁছে থাকে। কেননা এই মহোদয়গণকে আসর, মাগরিব ও এ'শার নামায আবার ফিরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

এখন অন্যায় পন্থী এবং দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিরা বলতে আরম্ভ করে যে, কখনও একে এবং কখনও ওকে কেবলাহ্ বানানোর কারণটা কি? তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় যে, হুকুম ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যেদিকেই মুখ কর না কেন, সব দিকেই তিনি রয়েছেন। মুখ এদিকে ও ঐদিকে করার মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত নেই। প্রকৃত পুণ্যের কারণ হচ্ছে ঈমানের দৃঢ়তা যা প্রত্যেক নির্দেশ মানতে বাধ্য করে থাকে। এর দ্বারা যেন মুসলমানদেরকে ভদ্রতা শিখানো হচ্ছে যে, তাদের কাজ তো শুধু আদেশ পালন। যে দিকেই তাদেরকে মুখ করতে বলা হয় সেদিকেই তারা মুখ করে থাকে। আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে তাঁর আদেশ পালন। যদি দিনে একশো বার ঘুরতে বলেন তবুও আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে ঘুরে যাবো। আমরা তাঁরই অনুগত এবং তাঁরই সেবক। তিনি যেদিকেই আমাদের ঘুরতে বলবেন, সেই দিকেই আমরা ঘুরে যাবো। মুহাম্মদ (সঃ)–এর উম্মতের উপরে এটাও একটা বড় অনুগ্রহ যে, তাদেরকে আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর কিবলাহ্র দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সেই অংশী বিহীন আল্লাহর নামের উপর নির্মাণ করা হয়েছে এবং যদ্দ্বারা সমুদয় ফযীলত লাভ হয়ে থাকে। মুসনাদে আহমাদের মধ্যে একটি মারফূ' 'হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এই ব্যাপারে আমাদের উপর ইয়াহূদীদের খুবই হিংসা রয়েছে যে, আমাদেরকে জুম'আর দিনের তাওফীক প্রদান করা হয়েছে এবং তারা তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর এর উপর যে, আমাদের কিবলাহ্ এইটি এবং তারা এর থেকে ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। আমাদের সজোরে 'আমীন' বলার উপরেও তাদের বড়ই হিংসা রয়েছে, যা আমরা ইমামের পিছনে বলে থাকি।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, হে উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ)! তোমাদেরকে এই পছন্দনীয় কিবলাহ্র দিকে ফিরাবার কারণ এই যে, তোমরা নিজেও পছন্দনীয় উম্মত। তোমরা কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের উপর সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াবে। কেননা তারা সবাই তোমাদের মর্যাদা স্বীকার করে। وَسَطًا –এর অর্থ এখানে ভাল ও উত্তম। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, কুরাইশ বংশ হিসেবে وَسَطُ عَرَبٍ অর্থাৎ আরবের মধ্যে উত্তম। এটাও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় গোত্রের মধ্যে وَسَط ছিলেন অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশ সম্পন্ন ছিলেন। صَلٰوةُ وُسْطٰى অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম নামায, যেটা আসরের নামায, এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। সমস্ত উম্মতের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীই (সঃ) সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে

তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ শরীয়তও দেয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ সরল ও সঠিক পথও দেয়া হয়েছে এবং অতি স্পষ্ট ধর্মও দেয়া হয়েছে। এই জন্যেই মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেনঃ هُوَ اجْتَبٰكُمْ অর্থাৎ 'সেই আল্লাহ তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের ধর্মে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের উপরে রয়েছ এবং তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান। এর পূর্বেও এবং এর মধ্যেও যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের উপর সাক্ষী হন, আর তোমরা সাক্ষী হও অন্যান্য উম্মতের উপর।' 'মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ) কে ডাকা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ 'তুমি কি আমার বার্তা আমার বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলে?' তিনি বলবেনঃ 'হে প্রভু! হাঁ, আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি।' অতঃপর তাঁর উম্মতকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ 'নূহ (আঃ) কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিল?' তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবে এবং বলবে আমাদের নিকট কোন ভয় প্রদর্শক আসেননি। তখন হযরত নূহ (আঃ)-কে বলা হবেঃ তোমার উম্মত তো অস্বীকার করছে সুতরাং তুমি সাক্ষী হাযির কর। তিনি বললেনঃ 'হাঁ, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর উম্মত আমার সাক্ষী'। وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ আয়াতটির ভাবার্থ এটাই। وَسَط শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আদল' ও 'ইনসাফ'। এখন তোমাদেরকে আহবান করা হবে এবং তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করবে, আর আমি তোমাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দেবো (সহীহ বুখারী, জামেউত্ তিরমিযী, সুনান-ই-নাসায়ী, সুনান ই ইবনে মাজাহ)।

মুসনাদে আহমাদের আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন নবী আসবেন এবং তাঁর সাথে তাঁর উম্মতের শুধু মাত্র দু'টি লোকই থাকবে কিংবা তার চেয়ে বেশী। তাঁর উম্মতকে আহবান করা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবেঃ 'এই নবী কি তোমাদের নিকট ধর্ম প্রচার করে ছিলেন?' তারা অস্বীকার করবে। নবীকে তখন জিজ্ঞেস করা হবেঃ তুমি 'তাবলীগ' করেছিলে কি? তিনি বলবেন 'হাঁ'। তাঁকে বলা হবেঃ 'তোমার সাক্ষী কে আছে?' তিনি বলবেন, 'মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর উম্মত।' অতঃপর মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর উম্মতকে ডাকা হবে। তাদেরকে এই প্রশ্নই করা হবে যে, এই নবী প্রচার কার্য চালিয়ে ছিলেন কি? তারা বলবেন 'হাঁ'। তখন তাদেরকে বলা হবেঃ 'তোমরা কি করে জানলে?' তারা উত্তর দেবেঃ আমাদের নিকট নবী আগমন করেছিলেন এবং তিনিই আমাদেরকে জানিয়ে ছিলেন যে, নবীগণ তাঁদের

উম্মতের নিকট প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا এই কথার ভাবার্থ।' মুসনাদে আহমাদের আরও একটি হাদীসে রয়েছে যে, وَسَطًا এর অর্থ হচ্ছে عَدْلًا অর্থাৎ 'যারা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।' 'তাফসীর ইবনে মিরদুওয়াই ও মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমি ও আমার উম্মত উঁচু টিলার উপর অবস্থান করবো এবং সমস্ত 'মাখলূকের মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবো এবং সকলকেই দেখতে থাকবো। সেই দিন সবাই এই আকাংখা পোষণ করবে যে, যদি তারাও আমাদের অন্তর্ভুক্ত হতো।

যে যে নবীকে তাঁদের 'কওম' অবিশ্বাস করেছিল, আমরা মহান আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করবো যে, এই সব নবী তাঁদের রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।' মুস্তাদরিক-ই-হাকিম নামক হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন 'বানী মাসলামা গোত্রের একটি লোকের জানাযায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপস্থিত হন। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পার্শ্বে ছিলাম। তাদের মধ্যে কোন একটি লোক বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটি খুবই সৎ, খোদাভীরু পুণ্যবান এবং খাঁটি মুসলমান ছিল। এভাবে সে তার অত্যন্ত প্রশংসা করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তুমি একথা কি করে বলছো?' লোকটি বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গুপ্ত ব্যাপারতো আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কিন্তু বাহ্যিক ব্যাপার তার এরূপই ছিল। নবী (সঃ) বলেনঃ 'এটা তার জন্যে ওয়াজিব হয়ে গেল।' অতঃপর তিনি বানু হারিসার একটি জানাযায় উপস্থিত হন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তাদের মধ্যে একজন লোক বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই লোকটি খুবই মন্দ ছিল। সে ছিল খুবই কর্কশ ভাষী এবং মন্দ চরিত্রের অধিকারী।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দুর্নাম শুনে বলেন, 'তুমি কিভাবে একথা বলছো?' সেই লোকটিও ঐ কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ তার জন্যে এটা ওয়াজিব হয়ে গেল।'

হযরত মুসআব বিন সাবিত (রাঃ) বলেনঃ এই হাদীসটি শুনে মুহাম্মদ বিন কা'ব (রঃ) আমাদেরকে বলেনঃ 'আল্লাহর রাসূল (সঃ) সত্যই বলেছেন।' অতঃপর তিনি وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا -এ আয়াতটি পাঠ করেন।' 'মুসনাদে আহমাদ' নামক হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, আবুল আসওয়াদ (রঃ) বলেনঃ 'আমি একবার মদীনায় আগমন করি। এখানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোক মরতে থাকে। আমি হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর পাশে বসেছিলাম। এমন

সময় একটি জানাযা যেতে থাকে। জনগণ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'তার জন্যে ওয়াজিব হয়ে গেল।' ইতিমধ্যে আর একটি জানাযা বের হয়। লোকেরা তার দুর্নাম করতে শুরু করে।' হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'তার জন্যে ওয়াজিব হয়ে গেল'। আমি বলিঃ হে আমিরুল মুমেনিন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল?' তিনি বলেনঃ 'আমি ঐ কথাই বললাম যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'চারজন লোক যে মুসলমানের ভাল কাজের সাক্ষ্য প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন।' আমরা বলি–'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়? তিনি বলেনঃ 'তিন জন দিলেও।' আমরা বলি যদি দুইজন দেয়?' তিনি বলেনঃ 'দুইজন দিলেও।' অতঃপর আমরা আর একজনের ব্যাপারে প্রশ্ন করিনি। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই–এর একটি হাদীসের মধ্যে রয়েছে, হযরত যুহাইর সাকাফী (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ 'অতি সত্বরই তোমরা তোমাদের ভাল ও মন্দ জেনে নেবে।' জনগণ বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিরূপে (জানবে)'? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'পৃথিবীর উপর তোমরা ভাল ও মন্দ প্রশংসা দ্বারা আল্লাহর সাক্ষীরূপে গণ্য হচ্ছো।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'প্রথম কিবলাহ্ শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক ছিল। অর্থাৎ প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ্ নির্ধারিত করে পরে কা'বা শরীফকে কিবলাহ্ রূপে নির্ধারণ করা শুধু এই জন্যই ছিল যে, এর দ্বারা সত্য অনুসারীর পরিচয় পাওয়া যায়। আর তাকেও চেনা যায় যে এর কারণে ধর্ম হতে ফিরে যায়। এটা বাস্তবিকই কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে ঈমানের দৃঢ়তা রয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সত্যানুসারী, যারা বিশ্বাস রাখে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা যা বলেন তা সত্য, যাদের এই বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করে থাকেন, তিনি বান্দাদের উপর যে নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছা করেন সেই নির্দেশই দিয়ে থাকেন এবং যে নির্দেশ উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করেন তা উঠিয়ে নেন, তাঁর প্রত্যেক কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ, তাদের জন্যে এই নির্দেশ পালন মোটেই কঠিন নয়। তবে যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তাদের কাছে কোন নতুন নির্দেশ এলেই তো তাদের নতুন ব্যথা উঠে পড়ে। কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে কেউ বলে–'এর দ্বারা কার ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে?' প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঈমানদারগণের ঈমান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং

তাদের মনের আনন্দও বৃদ্ধি পায়। আর রোগাক্রান্ত অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের অপবিত্রতার মধ্যে আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۚ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তুমি বল-ঈমানদারদের জন্যে এটা সুপথ প্রাপ্তি ও রোগ মুক্তির কারণ এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের কর্ণসমূহে বধিরতা ও চক্ষুসমূহে অন্ধত্ব রয়েছে।' (৪১ঃ ৪৪) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا*

অর্থাৎ 'আমি এমন কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্যে শিফা ও রহমত স্বরূপ, এবং এটা দ্বারা অত্যাচারীদের শুধু অনিষ্টই বর্ধিত হয়।' (১৭ঃ৮২) এ ঘটনাতেও সমস্ত মহান সাহাবী (রাঃ) স্থির ছিলেন। যেসব মুহাজির (রাঃ) ও আনসার (রাঃ) প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরা উভয় কিবলাহ্র দিকে মুখ করেই নামায পড়েছেন।

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা জানা গেছে যে, নির্দেশ পাওয়া মাত্রই নামাযের মধ্যেই তাঁরা কা'বার দিকে ফিরে গেছেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা রুকুর অবস্থায় ছিলেন এবং ঐ অবস্থাতেই কা'বার দিকে ফিরে যান। এর দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পাচ্ছে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 'আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না', অর্থাৎ তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে যেসব নামায আদায় করেছো, ওর পুণ্য থেকে আমি তোমাদেরকে বঞ্চিত করবো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বরং তাদের উচ্চমানের ঈমানদারী সাব্যস্ত হয়েছে। তাদেরকে দুই কিবলাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়ার পুণ্য দেয়া হবে। এর ভাবার্থ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সঃ)-কে এবং তাঁর সাথে তোমাদের ঘুরে যাওয়াকে নষ্ট করবেন না। এর পর বলা হচ্ছেঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ মানবগণের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু'। সহীহ হাদীসে রয়েছে, একটি বন্দিনী স্ত্রী লোকের শিশু তার থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এই স্ত্রী লোকটিকে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) দেখেন যে, সে উন্মাদিনির ন্যায় শিশুকে খুঁজতে রয়েছে। তাকে খুঁজে না পেয়ে সে বন্দীদের মধ্যে যে শিশুকেই দেখতে পায় তাকেই গলায় জড়িয়ে ধরে। অবশেষে সে তার শিশুকে পেয়ে যায়। ফলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং লাফিয়ে গিয়ে তাকে কোলে উঠিয়ে নেয়। অতঃপর তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে সোহাগ করতে থাকে এবং মুখে দুধ দেয়। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে (রাঃ) বলেন, আচ্ছা বলতো এই স্ত্রী লোকটি কি তার এই শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?' তাঁরা বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কখনই না।' তিনি তখন বলেনঃ আল্লাহর শপথ! এই মা তার শিশুর উপর যতটা স্নেহশীল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর এর চেয়ে বহু গুণে স্নেহশীল ও দয়ালু।'

---

১৪৪। নিশ্চয় আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল উত্তোলন অবলোকন করছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলাহ্ মুখীই করবো যা তুমি কামনা করছো; অতএব তুমি পবিত্রতম মসজিদের দিকে তোমার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নাও এবং তোমরা যেখানে আছ তোমাদের আনন সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর; এবং নিশ্চয়ই যাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই এটা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য; এবং তারা যা করছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।

١٤٤- قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে প্রথম 'নসখ' হচ্ছে কিবলাহ্র হুকুম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় হিজরত করেন। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ইয়াহূদী। আল্লাহ তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। ইয়াহূদীরা এতে খুবই খুশী হয়। তিনি কয়েক মাস পর্যন্ত ঐ দিকেই নামায পড়েন। কিন্তু স্বয়ং তাঁর মনের বাসনা ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কিবলাহ্। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাতেন। প্রায়ই তিনি আকাশের দিকে চক্ষু উত্তোলন করতেন। অবশেষে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে ইয়াহূদীরা বলতে থাকেঃ তিনি এই কিবলাহ্ হতে সরে গেলেন কেন?' এর উত্তরে বলা হয় যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ 'যে দিকেই তোমাদের মুখ হয়-আল্লাহ সেই দিকেই রয়েছেন'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, পূর্ব কিবলাহ ছিল পরীক্ষামূলক। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের পরে স্বীয় মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করতেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং 'মসজিদে হারামের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) ইমামতি করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) 'মসজিদে হারামে' 'মীযাবে'র সামনে বসে এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ 'মীযাব কা'বার দিকে রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এরও একটি উক্তি এই রয়েছে যে, ঠিক কা'বার দিকে মুখ করাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। তাঁর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, মুখ কা'বার দিকে হওয়াই যথেষ্ট। আবুল আলিয়া (রঃ) মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), প্রভৃতি মণীষীরও উক্তি এটাই। একটি হাদীসের মধ্যেও রয়েছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে কিবলাহ্ রয়েছে। ইবনে জুরাইজ-এর গ্রন্থে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মসজিদে হারামের' অধিবাসীদের কিবলাহ্ হচ্ছে বায়তুল্লাহ। 'হারাম' বাসীদের কিবলাহ হলো 'মসজিদ'। আর 'হারাম' কিবলাহ্ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী বাসীর। পূর্বেই থাক বা পশ্চিমেই থাক, আমার সমস্ত উম্মতের কিবলাহ্ এটাই। 'আবূ নাঈম' নামক পুস্তকে হযরত বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ষোল বা সতেরো মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়লেও বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে নামায পড়াই তিনি পছন্দ করতেন। সুতরাং মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে আসরের

নামায আদায় করেন। অতঃপর তাঁর সাথে নামায আদায়কারীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি অন্য একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ মসজিদে নামাযীরা সেই সময় রুকুতে ছিলেন। ঐ লোকটি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে মক্কা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি।' একথা শুনা মাত্রই তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে যান। আবদুর রাজ্জাকও কিছু হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে এটা বর্ণনা করেছেন। সুনানে নাসায়ীর মধ্যে হযরত আবূ সাঈদ বিন মুআল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে ফজরের সময় মসজিদে নব্বীতে (সঃ) যেতাম এবং তথায় কিছু নফল নামায আদায় করতাম। একদিন আমরা গিয়ে দেখি যে, নবী (সঃ) মিম্বারের উপর বসে আছেন। আমি বলি যে আজ নিশ্চয় কোন নতুন কথা হয়েছে। আমিও বসে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ এই আয়াতটি পাঠ করেন। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বলি আসুন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বক্তৃতা শেষ করার পূর্বেই এই নতুন নির্দেশকে কার্যে পরিণত করি এবং প্রথমেই আমরা আদেশ মান্যকারী হয়ে যাই। এই বলে আমরা একদিকে চলে যাই এবং সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বার হতে নেমে আসেন এবং কিবলাহ্র দিকে মুখ করে সর্বপ্রথম যুহরের নামায আদায় করেন। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই' গ্রন্থে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বার দিকে মুখ করে সর্বপ্রথম যে নামায আদায় করেন তা যুহরের নামায ছিল। আর এই নামাযই হচ্ছে 'সালাত-ই-ওসতা'। কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সর্বপ্রথম যে আসরের নামায আদায় করেন এটাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এজন্যেই কুবাবাসী পরের দিন ফজরের নামাযে এই সংবাদ পেয়েছিল। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই' গ্রন্থে হযরত নুওয়াইলা' বিনতে মুসলিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমরা বানু হারিসার মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যুহর বা আসরের নামায পড়ছিলাম। আমাদের দু'রাকআত নামায পড়া হয়ে গেছে, এমন সময় কে একজন এসে কিবলাহ পরিবর্তনের সংবাদ দেয়। ফলে, আমরা নামাযের মধ্যেই বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরে যাই এবং অবশিষ্ট দু'রাকাত ঐ দিকেই মুখ করে আদায় করি। নামাযের মধ্যে এইভাবে ফিরে যাওয়ার ফলে পুরুষ লোকেরা স্ত্রী লোকদের স্থানে এবং স্ত্রী লোকেরা পুরুষ লোকদের স্থানে এসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুশি হয়ে বলেনঃ 'এরাই হচ্ছে অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়নকারী।'

'তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই' গ্রন্থে হযরত উম্মারাহ্ বিন আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'রুকুর অবস্থায় আমরা কিবলাহ্ পরিবর্তনের সংবাদ পাই এবং আমরা পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু সবাই ঐ কিবলাহ্র দিকেই ফিরে যাই।' অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যেখানেই থাকনা কেন, নামাযের সময় তোমরা কা'বার দিকে মুখ কর।' তবে সফরে সোয়ারীর উপর যে ব্যক্তি নফল নামায পড়ে সে সোয়ারী যে দিকেই যাবে সে দিকেই মুখ করে নফল নামায আদায় করবে। তার মনের গতি কা'বার দিকে থাকলেই যথেষ্ট হবে। এই রকমই যে ব্যক্তি যুদ্ধের মাঠে নামায পড়ে সে যেভাবে পারে এবং যেই দিকে পড়া তার জন্যে সুবিধাজনক হয় সেই দিকেই পড়বে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কিবলাহ্র দিক ঠিক করতে পারছে না সে অনুমান করে যে দিকেই কিবলাহ হওয়ার ধারণা তার বেশী হবে সে দিকেই সে নামায আদায় করবে। অতঃপর যদি প্রকৃত পক্ষেই তার নামায কিবলাহ্র দিকে না হয়ে থাকে তবুও সে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা পেয়ে যাবে।

**জিজ্ঞাস্য বিষয়ঃ** মালেকীগণ এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, নামাযীকে নামাযের অবস্থায় তার দৃষ্টি সামনের দিকে রাখতে হবে, সিজদার জায়গায় নয়। যেমন ইমাম শাফেঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফারও (রঃ) এটাই মযহাব। কেননা আয়াতে রয়েছে, 'মসজিদে হারামের দিকে মুখ কর', কাজেই যদি সিজদার জায়গায় মুখ করা যায় তবে কিছু নত হতে হবে এবং এই কৃত্রিমতাপূর্ণ বিনয় ও নম্রতার উল্টো। কোন কোন মালেকিয়্যার এটাও উক্তি রয়েছে যে, দাঁড়ান অবস্থায় স্বীয় বক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কাযী শুরাইহ্ (রঃ) বলেন যে, দাঁড়ান অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখতে হবে। জমহূর উলামার এটাই উক্তি। কেননা এটাই হচ্ছে পূর্ণ বিনয় ও নম্রতা। অন্য একটি হাদীসেও এ বিষয়টি এসেছে। রুকুর অবস্থায় দৃষ্টি স্বীয় পায়ের স্থানে, সিজদার অবস্থায় নাকের স্থানে এবং اَلتَّحِيَّاتُ –এর সময় ক্রোড়ের প্রতি রাখতে হবে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, ইয়াহূদীরা কথা যতই বানিয়ে বলুক না কেন, তাদের মন বলে যে, কিবলাহ্র পরিবর্তন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়েছে এবং এটা সত্য। কেননা, এটা স্বয়ং তাদের কিতাবেও রয়েছে। কিন্তু এরা একমাত্র কুফর, অবাধ্যতা, অহংকার এবং হিংসার বশবর্তী হয়েই এটা গোপন করছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম হতে উদাসীন নন।

১৪৫। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর, তবুও তারা তোমার কিবলাহ্কে গ্রহণ করবে না; এবং তুমিও তাদের কিবলাহ গ্রহণ করতে পার না, আর তাদের কোন দলও অন্য দলের কিবলাহ্কে স্বীকার করে না, এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে এর পরেও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

١٤٥- وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

এখানে ইয়াহূদীদের কুফর, অবাধ্যতা, বিরোধিতা এবং দুষ্টামির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের নিকট সর্বপ্রকারের দলীল পেশ করা সত্ত্বেও তারা সত্যের অনুসরণ করছে না। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ * وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ *

অর্থাৎ 'যাদের উপর তোমার প্রভুর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন এসে গেলেও তারা ঈমান আনবে না, যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে নেয় (১০ঃ ৯৬)।' অতঃপর মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবীর (সঃ) অটলতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেমন তারা অসত্যের উপর স্থির ও অটল রয়েছে, তারা সেখান হতে সরতে চাচ্ছে না, তেমনি তাদেরও বুঝে নেয়া উচিত যে, তাঁর নবীও (সঃ) কখনও তাদের কথার উপরে আসতে পারেন না। তিনি তো তাঁরই আদেশের অনুসারী। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যা পছন্দ করেন তাই তাঁর নবী (সঃ) পালন করে থাকেন। তিনি কখনও তাদের মিথ্যা প্রবৃত্তির

অনুসরণ করবেন না। তাঁর দ্বারা এটা কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে যাওয়ার পর তাদের কিবলাহ্র দিকে মুখ করেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করতঃ প্রকৃতপক্ষে আলেমগণকেই যেন ধমক দিয়ে বলছেন যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর কারও পিছনে লেগে যাওয়া এবং নিজের অথবা অন্যদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা প্রকাশ্য অত্যাচারই বটে।

١٤٦- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

১৪৬। যাদেরকে আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এরূপ ভাবে চিনে, যেমন চিনে, তারা আপন পুত্রদেরকে এবং নিশ্চয় তাদের এক দল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে।

١٤٧- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○ ع

১৪৭। এই বাস্তব সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না

ইরশাদ হচ্ছে যে, আহলে কিতাবের আলেমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক আনীত কথাগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে এমনই জ্ঞাত রয়েছে যেমন জ্ঞাত রয়েছে পিতা ছেলেদের সম্বন্ধে। এটা একটা দৃষ্টান্ত ছিল যা আরবের লোকেরা পূর্ণ বিশ্বাসের সময় বলে থাকতো। একটি হাদীসে রয়েছে একটি লোকের সঙ্গে ছোট একটি শিশু ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এটা কি তোমার ছেলে?" সে বলেঃ 'হাঁ', হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও সাক্ষী থাকুন।' তিনি বলেনঃ 'সেও তোমার উপর গোপন নেই এবং তুমিও তার উপর গোপন নও।'

কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, হযরত উমার ফারূক (রাঃ) ইয়াহূদীদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হযরত আবদুল্লাহ বিন সালামকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনি কি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে এমনই চিনেন, যেমন চিনেন আপনার সন্তানদেরকে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'হাঁ', বরং তার চেয়েও বেশী চিনি। কেননা, আকাশের বিশ্বস্ত ফেরেশতা পৃথিবীর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হন এবং তিনি তাঁর সঠিক পরিচয় বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)

হযরত ঈসার (আঃ) নিকট আগমন করেন, অতঃপর বিশ্বপ্রভু তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং ঐ সবগুলোই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এর পরে তিনি যে সত্য নবী এতে আমাদের আর কি সন্দেহ থাকতে পারে। তাঁকে এক নজর দেখেই চিনতে পারবো না কেন? আমাদের বরং আমাদের ছেলেদের সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু তাঁর নবুওয়াত সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।'

মোট কথা এই যে, যেমন একটি বিরাট জনসভায় কোন লোক তার ছেলেকে অতি সহজেই চিনে থাকে ঠিক তেমনই আহ্লে কিতাবও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রই চিনে থাকে। কেননা তাঁদের কিতাবে নবী (সঃ) সম্বন্ধে যে গুণাবলী বর্ণিত আছে তা সবই তাঁর মধ্যে হুবহু বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সত্য জানা সত্ত্বেও তারা ওটা গোপন করছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ) ও মুসলমানদেরকে সত্যের উপর অটল ও স্থির থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা যেন সত্যের ব্যাপারে মোটেই সন্দেহ পোষণ না করে।

**১৪৮। প্রত্যেকের জন্যে এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে, ঐদিকেই সে মুখমণ্ডল প্রত্যাবর্তিত করে, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও; তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।**

١٤٨- وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক মযহাবধারীর এক একটি কিবলাহ্ রয়েছে, কিন্তু সত্য কিবলাহ্ ওটাই যার উপরে মুসলমানরা রয়েছে।' আবুল আলিয়া (রঃ) বলেনঃ 'ইয়াহূদীদেরও কিবলাহ্ রয়েছে, খ্রীষ্টানদেরও কিবলাহ রয়েছে এবং হে মুসলমানগণ! তোমাদেরও কিবলাহ রয়েছে, কিন্তু হেদায়াত বিশিষ্ট কিবলাহ ওটাই যার উপরে তোমরা (মুসলমানেরা) রয়েছ।' হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, যেসব সম্প্রদায় কা'বা শরীফকে কিবলাহ রূপে মেনে নিয়েছে, পুণ্যের কাজে তারা অগ্রগামী হয়ে থাকে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে আমের (রাঃ) وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلاَّهَا পড়েছেন। উল্লেখিত আয়াতটি নিম্নের আয়াতের সাথে মিল রয়েছে। যেমন- (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا) অর্থাৎ 'প্রত্যেকের জন্যেই আমি আপন আপন দ্বীন ও পথ করে দিয়েছি।' (৫ঃ ৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হলেও এবং তোমরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ ব্যাপক ক্ষমতার বলে তোমাদের সকলকেই একদিন একত্রিত করবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে ব্যাপক ক্ষমতাবান।

---

১৪৯। এবং তুমি যেখান হতেই বের হবে- তোমার আনন পবিত্রতম মসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর এবং নিশ্চয় এটাই তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য, এবং তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।

١٤٩- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

১৫০। আর তুমি যেখান হতেই নিষ্ক্রান্ত হও-তোমার মুখ পবিত্রতম মসজিদের দিকে ফিরাও, এবং তোমরাও যে যেখানে আছ তোমাদের মুখমণ্ডল তদ্দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর যেন তাদের অন্তর্গত অত্যাচারীগণ ব্যতীত অপরে তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে না পারে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর যেন আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি, এবং যেন তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও।

١٥٠- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۙ ○

এখন তিনবার নির্দেশ হচ্ছে যে, সারা জগতের মুসলমানকে নামাযের সময় 'মসজিদে হারামে'র দিকে মুখ করতে হবে। তিনবার বলে এই হুকুমের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কেননা, এই পরিবর্তনের নির্দেশ এই প্রথমবারই ঘটেছে। ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (রঃ)-এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম নির্দেশ তো ঐসব লোকদের জন্যে যারা কা'বা শরীফকে দেখতে পাচ্ছে। দ্বিতীয় নির্দেশ ওদের জন্যে যারা মক্কায় বাস করে বটে কিন্তু কা'বা তাদের সামনে নেই। তৃতীয় নির্দেশ মক্কার বাইরের লোকদের জন্য।

কুরতুবী (রঃ) একটা কারণ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম নির্দেশ মক্কাবাসীদের জন্যে, দ্বিতীয় নির্দেশ শহর বাসীদের জন্যে এবং তৃতীয় নির্দেশ মুসাফিরদের জন্যে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনটি নির্দেশের সম্পর্ক পূর্ব ও পরের রচনার সঙ্গে রয়েছে। প্রথম নির্দেশের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রার্থনা ও তা কবূল হওয়ার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় নির্দেশের মধ্যে এই কথার বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাহিদা আমাদের চাহিদারই অনুরূপ ছিল এবং সঠিক কাজও এটাই ছিল। তৃতীয় নির্দেশের মধ্যে ইয়াহূদীদের দলীলের উত্তর রয়েছে। কেননা তাদের গ্রন্থে প্রথম হতেই এটা বিদ্যমান ছিল যে, মুহাম্মদ (সঃ) -এর কিবলাহ হবে কা'বা শরীফ। সুতরাং এই নির্দেশের ফলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হয়। সাথে সাথে ঐ মুশরিকদের যুক্তিও শেষ হয়ে যায়। কেননা, তারা কা'বাকে বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করতো আর এখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মনোযোগও ওরই দিকে হয়ে গেল। ইমাম রাযী (রঃ) প্রভৃতি মণীষী এখানে এই হুকুমকে বার বার আনার হিকমত বেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যেন তোমাদের উপর আহলে কিতাবের যুক্তি ও বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকে।' তারা জানতো যে, এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কা'বার দিকে নামায পড়া। যখন তারা এই বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে না পাবে তখন তাদের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই কিবলাহ্র দিকে ফিরতে দেখে নিলো তখন তাদের কোন প্রকারের সন্দেহ না থাকারই কথা।

আর এটা একটা কারণ যে, যখন তারা মুসলমানদেরকে তাদের (ইয়াহূদীদের) কিবলাহ্র দিকে নামায পড়তে দেখবে তখন তারা একটা অজুহাত দেখাবার সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলমানেরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কিবলাহ্র দিকে নামায পড়বে তখন সেই সুযোগ তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। হযরত আবু আলিয়া (রঃ) বলেনঃ ইয়াহূদীদের এই যুক্তি ছিল যে, আজ মুসলমানেরা আমাদের কিবলাহর দিকে ফিরেছে, কাল তারা আমাদের ধর্মও মেনে নেবে। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার

নির্দেশক্রমে প্রকৃত কিবলাহ গ্রহণ করলেন, তাদের আশায় গুড়ে বালি পড়ে যায়।'

তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের মধ্যে যারা ঝগড়াটে ও অত্যাচারী রয়েছে তারা ব্যতীত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমালোচনা করে বলতো যে, এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ সঃ) মিল্লাতে ইবরাহীমের (আঃ) দাবী করছেন অথচ তাঁর কিবলাহ্র দিকে নামায পড়েন না, এখানে যেন তাদেরকেই উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, এই নবী (সঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুসারী। তিনি স্বীয় পূর্ণ বিজ্ঞতা অনুসারে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন, যা তিনি পালন করেন। অতঃপর তাঁকে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যা তিনি সাগ্রহে পালন করেন। সুতরাং তিনি সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাধীন। অতঃপর আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, তারা যেন ঐসব অত্যাচারীর সন্দেহের মধ্যে পতিত না হয়। তারা যেন ঐ বিদ্রোহীদের বিদ্রোহকে ভয় না করে। তারা যেন ঐ যালিমদের অর্থহীন সমালোচনার প্রতি মোটেই দৃকপাত না করে। বরং তারা যেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করে। কিবলাহ পরিবর্তন করার মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল বাতিল পন্থীদের মুখ বন্ধ করা এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দেয়া এবং কিবলাহ্র মত তাদের শরীয়তকেও পরিপূর্ণ করা। এর মধ্যে আর একটি রহস্য ছিল যে, যে কিবলাহ হতে পূর্ববর্তী উম্মতেরা ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল মুসলমানেরা ওটা থেকে সরে না পড়ে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই কিবলাহ বিশেষভাবে দান করে সমস্ত উম্মতের উপর তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করেন।

---

১৫১-كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

১৫১। আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা অবগত ছিলে না তা শিক্ষা দান করে।

১৫২। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করবো এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও ও অবিশ্বাসী হয়ো না।

١٥٢- فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِىْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ ۝

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিরাট দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দান হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদের মধ্যে আমাদেরই শ্রেণীভুক্ত এমন একজন নবী পাঠিয়েছেন যিনি আল্লাহ তা'আলার উজ্জ্বল গ্রন্থের নিদর্শনাবলী আমাদের সামনে পাঠ করে শুনাচ্ছেন, আমাদেরকে ঘৃণ্য অভ্যাস, আত্মার দুষ্টামি এবং বর্বরোচিত কাজ হতে বিরত রাখছেন। আর আমাদেরকে কুফরের অন্ধকার হতে বের করে ঈমানের আলোকের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আমাদের নিকট ঐ সব গুঢ় রহস্য প্রকাশ করে দিচ্ছেন যা আজ পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রকাশ পায়নি। সুতরাং তাঁরই কারণে ঐ সমুদয় লোক, যাদের উপর অজ্ঞতা ছেয়ে ছিল, বহু শতাব্দী ধরে যাদেরকে অন্ধকারে ঘিরে রেখেছিল, যাদের উপর দীর্ঘ দিন ধরে মঙ্গলের ছায়া পর্যন্ত পড়েনি, তারাই বড় বড় আল্লামা বনে গেছে। তারা জ্ঞানের গভীরতায়, কৃত্রিমতার স্বল্পতায়, অন্তরের পবিত্রতায় এবং কথার সত্যতায় তুলনা বিহীন খ্যাতি অর্জন করেছে। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ -

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে থাকেন এবং তাদেরকে পবিত্র করে থাকেন।' (৩ঃ ১৬৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ*

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ) তুমিও কি ওদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের পরিবর্তে কুফরী করেছে এবং স্বীয় গোত্রকে ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেছে?' (১৪ঃ ২৮) এখানে 'আল্লাহর নিয়ামত'-এর ভাবার্থে হযরত

মুহাম্মদ (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এজন্যেই এই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামতের বর্ণনা দিয়ে মু'মিনদেরকে তাঁর স্মরণের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَ لَا تَكْفُرُونَ -

অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো এবং তোমরা আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।' হযরত মূসা (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট আরয করছেনঃ 'হে আমার প্রভু! কিভাবে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো?' উত্তর হচ্ছেঃ 'আমাকে স্মরণ রেখো, ভুলে যেও না, আমাকে স্মরণ করাই হচ্ছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আমাকে ভুলে যাওয়াই আমার সঙ্গে কুফরী করা। হযরত হাসান বসরী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীর উক্তি এই যে, আল্লাহকে যে স্মরণ করে আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীকে তিনি আরও বেশী দান করেন এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন। পূর্বের মনীষীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহকে পূর্ণ ভয় করার অর্থ হচ্ছে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হচ্ছেনঃ "ব্যভিচারী, মদখোর, চোর এবং আত্মহত্যাকারীকেও কি আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করে থাকেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ 'হাঁ' অভিশাপের সাথে স্মরণ করেন।'

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, 'আমাকে স্মরণ কর' অর্থাৎ আমার জরুরী নির্দেশাবলী পালন কর। 'আমি তোমাকে স্মরণ করবো।' অর্থাৎ আমার নিয়ামতসমূহ তোমাকে দান করবো। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'আমি তোমাকে ক্ষমা করবো।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করার চাইতে আল্লাহর তোমাদেরকে স্মরণ করা অনেক বড়।' একটি কুদসী হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি এবং যে আমাকে কোন দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে ওর চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করি।'

মুসনাদে আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, ঐটি হচ্ছে ফেরেশতাদের দল। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা

বলেনঃ 'হে আদমের সন্তান! যদি তুমি আমার দিকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত স্থান অগ্রসর হও তবে আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হবো। যদি তুমি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হও তবে আমি তোমার দিকে দুই হাত অগ্রসর হবো, আর যদি তুমি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আস তবে আমি তোমার দিকে দৌড়িয়ে আসবো। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যেও এ হাদীসটি হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার দয়া এর চেয়েও অধিক নিকটে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ *

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রভু সাধারণভাবে সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে তোমাদেরকে আরো বেশী দেবো, আর যদি কৃতঘ্ন হও তবে জেনে রেখো যে, নিশ্চয় আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।' (১৪ঃ ৭) 'মুসনাদে আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত ইমরান বিন হোসাইন (রাঃ) একদা অতি মূল্যবান 'হুল্লা' অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে আসেন এবং বলেনঃ 'যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোন পুরস্কার দেন তখন তিনি ওর চিহ্ন তার নিকট দেখতে চান।'

১৫৩। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।

١٥٣- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৫৪। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অবগত নও।

١٥٤- وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

'শুকরের' পর 'সবর' বা ধৈর্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং সাথে সাথেই নামাযের বর্ণনা দিয়ে এইসব সৎ কার্যকে মুক্তি লাভের মাধ্যম করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষ যখন সুখে থাকে তখন সেটা

হচ্ছে তার জন্যে শুক্রের সময়। হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের অবস্থা কতই না উত্তম যে, প্রত্যেক কাজে তার জন্যে মঙ্গলই নিহিত রয়েছে। সে শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর ফলে সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। আর সে কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং এরও সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। এই আয়াতের মধ্যে এরও বর্ণনা রয়েছে যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম ধৈর্য ও নামায। যেমন এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ *

অর্থাৎ 'তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিশ্চয় ওটা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন কাজ।' (২ঃ ৪৫) হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে যে, 'যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোন কাজ কঠিন চিন্তার মধ্যে নিক্ষেপ করতো। তখন তিনি নামায আরম্ভ করে দিতেন।' 'সবর' দুই প্রকার। প্রথম সবর হচ্ছে নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার উপর 'সবর'। দ্বিতীয় হচ্ছে আনুগত্য ও পুণ্যের কাজ করার উপর 'সবর'। এ 'সবর' প্রথম 'সবর' হতে বড়। আরও এক প্রকারের ধৈর্য আছে, তা হচ্ছে বিপদ ও দুঃখের সময় ধৈর্য। এটাও ওয়াজিব। যেমন দোষ ও পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব।

হযরত আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, জীবনের উপর কঠিন হলেও, স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও এবং মনে না চাইলেও ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে লেগে থাকা হচ্ছে একটা 'সবর।' দ্বিতীয় 'সবর' হচ্ছে প্রকৃতির ও মনের চাহিদা মোতাবেক হলেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ হতে বিরত থাকা। ইমাম যায়নুল আবেদীন (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেনঃ 'ধৈর্যশীলগণ কোথায়? আপনারা উঠুন ও বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করুন।' একথা শুনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবেন এবং বেহেশতের দিকে অগ্রসর হবেন। ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করবেনঃ 'কোথায় যাচ্ছেন?' তাঁরা বলবেনঃ 'বেহেস্তে'। ফেরেশতাগণ বলবেনঃ 'এখনও তো হিসেব দেয়াই হয়নি?' তাঁরা বলবেনঃ 'হাঁ, হিসেব দেয়ার পূর্বেই।' ফেরেশতাগণ তখন জিজ্ঞেস করবেনঃ 'তাহলে আপনারা কি প্রকৃতির লোক?' উত্তরে তারা বলবেনঃ 'আমরা ধৈর্যশীল লোক। আমরা সদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে লেগে ছিলাম, তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ হতে বেঁচে থাকতাম। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা ওর উপর ধৈর্য ধারণ করেছি এবং অটল থেকেছি।' তখন ফেরেশতারা বলবেনঃ 'বেশ, ঠিক আছে। আপনাদের প্রতিদান অবশ্যই এটাই এবং আপনারা এরই

যোগ্য। যান, বেহেশতে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করুন।' কুরআন মাজীদে একথাই ঘোষিত হচ্ছেঃ

يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

অর্থাৎ 'ধৈর্যশীলগণকে তাদের পূর্ণ প্রতিদান বে হিসাব দেয়া হবে।' (৩৯ঃ১০)

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) বলেন যে, 'সবর'–এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দানকে স্বীকার করা, বিপদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকট পাওয়ার বিশ্বাস রেখে তার জন্যে পুণ্যের প্রার্থনা করা, প্রত্যেক ভয়, উদ্বেগ এবং কাঠিণ্যের স্থলে ধৈর্য্য ধারণ করা এবং পুণ্যের আশায় ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তিগণকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা এমন জীবন লাভ করেছে যা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। তারা 'বারযাখী' জীবন (মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবকাশ) লাভ করেছে এবং তথায় তারা আহার্য পাচ্ছে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, শহীদগণের আত্মাগুলো সবুজ রঙ্গের পাখীসমূহের দেহের ভিতরে রয়েছে এবং তারা বেহেস্তের মধ্যে যথেচ্ছা চরে ফিরে বেড়ায়, অতঃপর তারা ঐসব প্রদীপের উপর এসে বসে যা 'আরশের নীচে ঝুলানো রয়েছে। তাদের প্রভু একবার তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ 'এখন তোমরা কি চাও?' তারা উত্তরে বলেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আপনি তো আমাদেরকে ঐসব জিনিস দিয়ে রেখেছেন যা অন্য কাউকেও দেননি। সুতরাং এখন আর আমাদের কোন্ জিনিসের প্রয়োজন হবে?' তাদেরকে পুনরায় এই প্রশ্নই করা হয়। যখন তারা দেখে যে, ছাড়া হচ্ছে না তখন তারা বলেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আপনি পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা আপনার পথে আবার যুদ্ধ করে পুনরায় শাহাদাৎ বরণ করতঃ আপনার নিকট ফিরে আসবো। এর ফলে আমরা শাহাদাতের দ্বিগুণ মর্যাদা লাভ করবো।' প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভু তখন বলেনঃ 'এটা হতে পারে না। আমি তো এটা লিখেই দিয়েছি যে, কেউই মৃত্যুর পর দুনিয়ায় আর ফিরে যাবে না।'

'মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের রূহ একটি পাখী যা বেহেশতের গাছে অবস্থান করে এবং কিয়ামতের দিন সে নিজের দেহে ফিরে আসবে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মু'মিনের আত্মা তথায় জীবিত রয়েছে। কিন্তু শহীদগণের আত্মার এক বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

| | |
|---|---|
| ১৫৫। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন ও প্রাণ এবং ফল শস্যের অভাবের কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করবো; এবং ঐসব ধৈর্যশীলকে সুসংবাদ প্রদান কর। | ١٥٥- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ |
| ১৫৬। যাদের উপর কোন বিপদ নিপতিত হলে তারা বলে–নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। | ١٥٦- الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ |
| ১৫৭। এদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী। | ١٥٧- أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝ |

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অবশ্যই পরীক্ষা করে থাকেন। কখনও পরীক্ষা করেন উন্নতি ও মঙ্গলের দ্বারা, আবার কখনও পরীক্ষা করেন অবনতি ও অমঙ্গল দ্বারা । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ-

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করত ধর্মযোদ্ধা এবং ধৈর্যশীলগণকে জেনে নেবো।' (৪৭ঃ ৩১) অন্য জায়গায় রয়েছে-

فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ

অর্থাৎ 'তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন।' (১৬ঃ ১১২) এই সবের ভাবার্থ এই যে, সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা কিছু ধন-মালের ঘাটতি, কিছু প্রাণের হ্রাস অর্থাৎ নিজের ও অপরের, আত্মীয়-স্বজনের এবং বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু, কখনও ফল এবং উৎপাদিত শস্যের ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। এতে ধৈর্যধারণকারীদের তিনি উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং অসহিষ্ণু, তাড়াহুড়াকারী এবং নৈরাশ্যবাদীদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকেন। পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, خَوْفٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আহার্যের ক্ষুধা, মালের হ্রাসের অর্থ হচ্ছে যাকাত আদায়, প্রাণের হ্রাসের ভাবার্থ হচ্ছে রোগ এবং ফলের অর্থ হচ্ছে সন্তানাদি। কিন্তু এই তাফসীর চিন্তা ও বিবেচনাধীন। এখন বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট যে ধৈর্যশীলদের এই মর্যাদা রয়েছে তারা কি প্রকারের লোক? সুতরাং আল্লাহ পাক বলেন যে, এরা তারাই যারা সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় إِنَّا لِلَّهِ পড়ে থাকে এবং এই কথার দ্বারা নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকে যে, ওটা আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে রয়েছে। তাকে যা পৌঁছেছে তা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতেই পৌঁছেছে। তিনি ওর মধ্যে যথেচ্ছা হের ফের করতে পারেন। অতঃপর তাঁর কাছেই এর প্রতিদান রয়েছে যাঁর নিকটে তাঁকে একদিন ফিরে যেতেই হবে। বান্দার এই উক্তির কারণে তার উপর মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়, সে শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করে এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

আমীরুল মু'মেনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ 'সম্মানের দু'টি জিনিস صَلَوٰتٌ ও رَحْمَةٌ এবং একটি মধ্যবর্তী জিনিস রয়েছে অর্থাৎ 'হিদায়াত' এগুলো ধৈর্যশীলেরা লাভ করে থাকে।' 'মুসনাদ-ই-আহমাদে' রয়েছে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ 'একদা আমার স্বামী আবূ সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবার হতে আমার নিকট আসেন এবং অত্যন্ত খুশী মনে বলেনঃ 'আজ আমি এমন একটি হাদীস শুনেছি যা শুনে আমি খুবই খুশী হয়েছি'। ঐ হাদীসটি এই যে, যখন কোন মুসলমানের উপর কোন কষ্ট ও বিপদ পৌঁছে এবং সে পড়ে اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিদান দিন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন' তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই বিনিময় ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ 'আমি এই দু'আটি মুখস্থ করে নেই। অতঃপর হযরত আবূ সালমার (রাঃ) ইন্তেকাল হলে আমি إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করি এবং এই দু'আটিও পড়ে নেই। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, আবূ সালমা (রাঃ) অপেক্ষা আর ভাল লোক আমি কাকে পাবো? আমার 'ইদ্দত' অতিক্রান্ত হলে আমি একদিন আমার একটি চামড়া সংস্কার করতে থাকি।

এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আগমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চান। আমি চামড়াটি রেখে দিয়ে হাত ধুয়ে নেই এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে ভিতরে আসার প্রার্থনা জানাই। তাঁকে একটি নরম আসনে বসতে দেই। তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। আমি বলি-হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটাতো আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের কথা কিন্তু প্রথমতঃ আমিতো একজন লজ্জাবতী নারী। না জানি হয়তো আপনার স্বভাবের উল্টো কোন কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায় এবং এরই কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার শাস্তিই হয় নাকি! দ্বিতীয়তঃ আমি একজন বয়স্কা নারী। তৃতীয়তঃ আমার ছেলে মেয়ে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'দেখ! আল্লাহ তা'আলা তোমার এই অনর্থক লজ্জা দূর করে দেবেন। আর বয়স আমারও তো কম নয় এবং তোমার ছেলে মেয়ে যেন আমারই ছেলে মেয়ে।' আমি একথা শুনে বলি–'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।' অতঃপর আল্লাহর নবীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং এই দু'আর বরকতে আমার পূর্ব স্বামী অপেক্ষা উত্তম স্বামী অর্থাৎ স্বীয় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দান করেন। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে।

সহীহ মুসলিমের মধ্যেও এই হাদীসটি ভিন্ন শব্দে এসেছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন কোন মুসলমানকে বিপদে ঘিরে ফেলে, এর উপর যদি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, অতঃপর আবার তার স্মরণ হয় এবং সে পুনরায় 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করে তবে বিপদে ধৈর্য ধারণের সময় যে পুণ্য সে লাভ করে ছিল ঐ পুণ্য এখনও সে লাভ করবে।' সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে হযরত আবূ সিনান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমি আমার একটি শিশুকে সমাধিস্থ করি। আমি তার কবরেই রয়েছি এমন সময়ে হযরত আবূ তালহা খাওলানী (রাঃ) আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে নেন এবং বলেনঃ আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ দেবো না?' আমি বলি 'হা' তিনি বলেনঃ 'হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মরণের ফেরেশতা! তুমি আমার বান্দার ছেলে, তার চক্ষুর জ্যোতি এবং কলেজার টুকরোকে ছিনিয়ে নিয়েছো? ফেরেশতা বলেন, 'হাঁ'। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তখন সে কি বলেছে?' ফেরেশতা বলেনঃ 'সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করেছে।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তার জন্যে বেহেশতে একটি ঘর তৈরি কর এবং ওর নাম 'বায়তুল হামদ' বা প্রশংসার ঘর রেখে দাও।

১৫৮। নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের 'হজ্ব' অথবা উম্‌রা' করে তার জন্যে এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দূষণীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত।

١٥٨- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হযরত উরওয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'এ আয়াত দ্বারা এরূপ জানা যাচ্ছে যে, 'তাওয়াফ' না করায় কোন দোষ নেই।' তিনি বলেনঃ 'হে প্রিয় ভাগনে! তুমি সঠিক বুঝতে পারনি। তুমি যা বুঝেছ ভাবার্থ তাই হলে أَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا বলা হতো। বরং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, 'মাশআল' নামক স্থানে 'মানাত' নামে প্রতিমাটি অবস্থিত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার আনসারেরা তার পূজা করতো এবং যে তার উপাসনায় দাঁড়াতো সে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতদ্বয়ের তাওয়াফকে দূষণীয় মনে করতো। এখন ইসলাম গ্রহণের পর জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতদ্বয়ের তাওয়াফের দোষ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে বলা হয় যে, এই তাওয়াফে কোন দোষ নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'সাফা' ও 'মারওয়া'র তাওয়াফ করেন। এ জন্যেই এটা সুন্নাত রূপে পরিগণিত হয়। এখন এই তাওয়াফকে ত্যাগ করা কারও জন্যে উচিত নয় (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবূ বকর বিন আবদুর রহমান (রঃ) এই বর্ণনাটি শুনে বলেনঃ 'নিঃসন্দেহে এটা একটা ইল্‌মী আলোচনা। আমি তো এর পূর্বে এটা শ্রবণই করিনি। কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি বলেন যে, হযরত আনসার (রাঃ) বলেছিলেনঃ 'আমাদের প্রতি বায়তুল্লাহ শরীফকে তাওয়াফ করার নির্দেশ রয়েছে, 'সাফা ও 'মারওয়া'র তাওয়াফের নয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতটির শান-ই-নুযূল এ দুটো হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন 'আমরা 'সাফা' ও 'মারওয়া'র তাওয়াফকে অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ মনে করতাম এবং ইসলামের অবস্থায় এ থেকে বিরত থাকতাম। অবশেষে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)

হতে বর্ণিত আছে যে, এই দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থলে বহু প্রতিমা বিদ্যমান ছিল এবং শয়তানেরা সারা রাত ধরে ওর মধ্যে ঘুরাফিরা করতো। ইসলাম গ্রহণের পর জনসাধারণ এখানকার তাওয়াফ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 'আসাফ' মূর্তিটি ছিল 'সাফা' পাহাড়ের উপর এবং 'নায়েলা' মূর্তিটি ছিল 'মারওয়া' পাহাড়ের উপর। মুশরিকরা ঐ দু'টোকে স্পর্শ করতো ও চুম্বন দিতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানেরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। কিন্তু এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার ফলে এখানকার তাওয়াফ সাব্যস্ত হয়। 'সীরাত-ই-মুহাম্মদ বিন ইসহাক' নামক পুস্তকে রয়েছে যে, 'আসাফ' ও 'নায়েলা' একজন পুরুষ লোক ও অপরজন স্ত্রীলোক ছিল। এই অসৎ ও অসতী দু'জন কা'বা গৃহে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ তাদের দু'জনকে পাথরে পরিণত করেন। কুরাইশরা তাদেরকে কা'বার বাইরে রেখে দেয় যেন জনগণ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের পূজা আরম্ভ হয়ে যায় এবং তাদেরকে 'সাফা ও 'মারওয়া' পাহাড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের তাওয়াফ শুরু হয়ে যায়।

সহীহ মুসলিমের মধ্যে একটি সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ কার্য সমাপন করেন তখন তিনি 'রুকন'-কে ছেড়ে 'বাবুস্ সাফা' দিয়ে বের হন এবং ঐ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ 'আমিও ওটা থেকেই শুরু করবো যা থেকে আল্লাহ তা'আলা শুরু করেছেন।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেনঃ 'তোমরা তার থেকেই আরম্ভ কর যার থেকে আল্লাহ তা'আলা আরম্ভ করেছেন'। অর্থাৎ 'সাফা' থেকে চলতে আরম্ভ করে মারওয়া পর্যন্ত যাও। হযরত হাবীবা বিনতে আবী তাজবাত (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) দেখেছি, তিনি 'সাফা' 'মারওয়া' তাওয়াফ করছিলেন। জনমণ্ডলী তাঁর আগে আগে ছিল এবং তিনি তাদের পিছনে ছিলেন। তিনি কিছুটা দৌড়িয়ে চলছিলেন এবং এই কারণে তাঁর লুঙ্গি তাঁর জানুর মধ্যে এদিক ওদিক হচ্ছিল। আর তিনি পবিত্র মুখে উচ্চারণ করছিলেনঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা দৌড়িয়ে চল। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দৌড়ানো লিখে দিয়েছেন।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ)। এরকমই অর্থের আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। এই হাদীসটি ঐসব লোকের দলীল যাঁরা 'সাফা ও মারওয়া' দৌড়কে হজ্বের রুকন মনে করে থাকেন। যেমন হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের মযহাব এটাই। ইমাম আহমাদেরও (রঃ) এরকমই একটি বর্ণনা রয়েছে। ইমাম মালিকেরও (রঃ) প্রসিদ্ধ মযহাব এটাই। কেউ কেউ একে

ওয়াজিব বলেন বটে কিন্তু হজ্বের রুকন বলেন না। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক বা ভুলবশতঃ একে ছেড়ে দেয় তবে তাকে একটি জন্তু জবাহ করতে হবে। ইমাম আহমাদ (রঃ) হতে একটি বর্ণনা এরকমই বর্ণিত আছে। অন্য একটি দলও এটাই বলে থাকেন। অন্য একটি উক্তিতে একে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ইমাম সাওরী (রঃ) ইমাম শাবী (রঃ) এবং ইবনে সিরিন (রঃ) একথাই বলে থাকেন। হযরত আনাস (রাঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক (রঃ) ও 'আতাবিয়্যাহ' নামক পুস্তকে এটা বর্ণনা করেছেন। فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا এটিই তাঁর দলীল। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী অগ্রগণ্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং 'সাফা-মারওয়া' তাওয়াফ করেছেন এবং বলেছেন, 'হজ্বের আহকাম আমার নিকট হতে গ্রহণ কর।' তিনি তাঁর এই হজ্বে যা কিছু করেছেন তাই ওয়াজিব হয়ে গেছে–তা অবশ্য পালনীয়। কোন কাজ যদি কোন বিশেষ দলীলের মাধ্যমে করণীয় হতে উঠিয়ে দেয়া হয় তবে সেটা অন্য কথা। তা ছাড়া হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দৌড়ানো কাজ লিখে দিয়েছেন অর্থাৎ ফরজ করেছেন। মোট কথা এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, 'সাফা ও 'মারওয়া'র তাওয়াফও আল্লাহ তা'আলার 'শারঈ' আহকামের অন্তর্গত।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে হজ্বব্রত পালন করবার জন্যে এটা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে হযরত হাজেরার (আঃ) সাত বার প্রদক্ষিণই হচ্ছে 'সাফা' 'মারওয়া'য় দৌড়ানোর মূল উৎস। যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে তাঁর ছোট শিশুপুত্রসহ এখানে রেখে গিয়েছিলেন এবং তাঁর খানা-পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল ও শিশু ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়েছিল তখন হযরত হাজেরা (আঃ) অত্যন্ত উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনার সাথে এই পবিত্র পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্বীয় অঞ্চল ছড়িয়ে দিয়ে মহান আল্লাহর নিকট ভিক্ষা চাচ্ছিলেন। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট ও দুর্ভাবনা সব দূর করে দিয়েছিলেন। এখানে প্রদক্ষিণকারী হাজীগণেরও উচিত যে, তাঁরা যেন অত্যন্ত দারিদ্র ও বিনয়ের সাথে এখানে প্রদক্ষিণ করেন এবং মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের অভাব, প্রয়োজন এবং অসহায়তার কথা পেশ করেন ও মনের সংস্কার এবং সুপথ প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান, আর পাপ মোচনের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁদের দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা এবং অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত। তাঁদের কর্তব্য হবে এই যে, তাঁরা যেন স্থিরতা, পুণ্য, মুক্তি এবং মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করেন ও আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন যে, তিনি

যেন তাঁদেরকে অন্যায় ও পাপরূপ সংকীর্ণ পথ হতে সরিয়ে উৎকর্ষতা, ক্ষমা এবং পুণ্যের তাওফীক প্রদান করেন, যেমন তিনি হযরত হাজেরার (আঃ) অবস্থাকে এদিক হতে ওদিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে অর্থাৎ সাতবার প্রদক্ষিণের স্থলে আটবার বা নয়বার প্রদক্ষিণ করে কিংবা নফল হজ্ব এবং উমরার মধ্যে 'সাফা-মারওয়া'র তাওয়াফ করে। আবার কেউ কেউ একে সাধারণ রেখেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পুণ্যের কাজই অতিরিক্তভাবে করে। তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞাত অর্থাৎ আল্লাহ পাক অল্প কাজেই বড় পুণ্য দান করে থাকেন এবং প্রতিদানের সঠিক পরিমাণ তাঁর জানা আছে। তিনি কারও পুণ্য এতটুকুও কম করবেন না, আবার তিনি অনু পরিমাণ অত্যাচারও করবেন না। তবে তিনি পুণ্যের প্রতিদান বৃদ্ধি করে থাকেন, এবং নিজের নিকট হতে বিরাট প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। সুতরাং 'হামদ' ও 'শুকর' আল্লাহ পাকেরই জন্যে।

১৫৯। আমি যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, আমি ঐ গুলোকে সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাত কারীগণও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে।

١٥٩- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَٰتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَٰبِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ ۝

১৬০। কিন্তু যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, বস্তুতঃ আমি তাদের প্রতি ক্ষমা দানকারী এবং আমি তওবা কবূলকারী, করুণাময়।

١٦٠- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

১৬১। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মরেছে, নিশ্চয় তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাগণেরও মানব কুলের সবারই অভিসম্পাত।

١٦١- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

১৬২। তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি প্রশমিত হবে না এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া যাবে না।

١٦٢- خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ○

এখানে ঐসব লোককে ভীষণভাবে ধমক দেয়া হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কথাগুলো এবং শরীয়তের বিষয়গুলো গোপন করতো। কিতাবীরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রশংসা বিষয়ক কথাগুলো গোপন করে রাখতো। এ জন্যেই এরশাদ হচ্ছে যে, সত্যকে গোপনকারীরা অভিশপ্ত। যেমন প্রত্যেক জিনিস ঐ আলেমের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে যিনি জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ পাকের কথাগুলো প্রচার করে থাকেন। এমন কি পানির মৎসগুলো এবং বাতাসের পক্ষীগুলোও তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অনুরূপভাবে যারা সত্য কথা জেনে শুনে গোপন করে এবং বোকা ও বধির হওয়ার ভান করে তাদের প্রতি প্রত্যেক জিনিসই অভিশাপ দিয়ে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি শরীয়তের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।' হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ 'এই আয়াতটি না থাকলে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। হযরত বারা' বিন আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সঙ্গে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'কবরের মধ্যে কাফিরের কপালে এত জোরে হাতুড়ী মারা হয় যে, মানব ও দানব ছাড়া সমস্ত প্রাণী ওর শব্দ শুনতে পায় এবং ওরা সবাই তার প্রতি অভিশাপ দেয়। 'অভিসম্পাতকারীগণ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকেন' এ কথার অর্থ এটাই। অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর অভিশাপ তাদের উপর রয়েছে। হযরত আতা' (রঃ) বলেন لَاعِنُونَ শব্দের ভাবার্থে সমুদয়

জীবজন্তু এবং সমস্ত দানব ও মানবকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যে বছর ভূমি শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তখন চতুষ্পদ জন্তুরা বলে–'এটা বানী আদমের পাপেরই ফল, আল্লাহ তা'আলা বানী আদমের পাপীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।' কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, এর দ্বারা ফেরেশতা এবং মু'মিনগণকে বুঝানো হয়েছে।

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, আলেমের জন্যে প্রত্যেক জিনিসই ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে–এমন কি সমুদ্রের মাছও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে), এই আয়াতের মধ্যে রয়েছে যে, যারা 'ইলম'-কে গোপন করে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ, সমস্ত মানুষ ও প্রত্যেক অভিসম্পাতকারী অভিসম্পাত করে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাকশক্তিহীন (জীব) অভিসম্পাত দান করে থাকে। সেটা ভাষার মাধ্যমেই হউক অথবা ইঙ্গিত দ্বারাই হউক। কিয়ামতের দিনেও সমস্ত জিনিস তাকে অভিসম্পাত দিয়ে থাকবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐসব মানুষকে অভিশপ্তদের মধ্য হতে বের করে নেন যারা তাদের এই কাজ হতে বিরত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়। আর পূর্বে যা গোপন করেছিল এখন তা প্রকাশ করে দেয়। সেই 'তওবা' কবূলকারী দয়ালু আল্লাহ এইসব মানুষের তওবা কবূল করে নেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে সেও যদি খাঁটি অন্তরে তওবা করে তবে তার তওবাও গৃহীত হয়ে থাকে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, পূর্বের উম্মতদের মধ্যে যারা এই রকম বড় বড় পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়তো তাদের তওবা আল্লাহ তা'আলার দরবারে গৃহীত হতো না। কিন্তু তওবা ও দয়ার নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের উপর আল্লাহ পাকের এটা বিশেষ মেহেরবানী। অতঃপর ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা কুফরী ও অন্যায় করেছে এবং তওবা করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। এরা কুফরের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং এদের উপর বর্ষিত হয়েছে আল্লাহর-তাঁর ফেরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত। এই অভিশাপ তাদের উপর সংশ্লিষ্ট থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকবে। অবশেষে এই অভিশাপ তাদেরকে নরকের আগুনে নিয়ে যাবে। তারা চিরকাল সেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তাদের এই শাস্তি এতটুকুও হ্রাস করা হবে না এবং কখনও তা বন্ধ করা হবে না। বরং চিরকালব্যাপী তাদের উপর ভীষণ শাস্তি হতে থাকবে। আমরা করুণাময় আল্লাহর নিকট তাঁর এই শাস্তি হতে আশ্রয়

চাচ্ছি। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন কাফিরকে থামিয়ে রাখা হবে। অতঃপর তার উপর আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করবেন এবং তারপরে ফেরেশতাগণ ও মানুষ তাকে অভিশাপ দেবে। কাফিরদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণের ব্যাপারে কারও কোন মত বিরোধ নেই। হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এবং তাঁর পরের সম্মানিত ইমামগণ সবাই 'কুনূত' প্রভৃতির মাধ্যমে কাফিরদের উপর অভিশাপ দিতেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কাফিরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণের ব্যাপারে উলামা-ই-কিরামের একটি দল বলেন যে, এটা জায়েয় নয়। কেননা তার পরিণাম কারও জানা নেই। 'কুফরির অবস্থায় তার মৃত্যু হলো' এ কথাটি এ আয়াতের মধ্যে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিশাপ না দেয়ার (ব্যাপারে) আল্লাহ তা'আলার এই কথাটি দলীল রূপে পেশ করা যেতে পারে। আলেমদের অন্য একটি দলের মতে নির্দিষ্ট কাফিরের উপরও লা'নত বর্ষণ করা জায়েয। যেমন ধর্মশাস্ত্রবিদ হযরত আবূ বকর বিন আরবী মালিকী (রঃ) এই মত পোষণ করে থাকেন এবং এর দলীল রূপে তিনি একটি দুর্বল হাদীসও পেশ করে থাকেন। কোন নির্দিষ্ট কাফিরের উপর যে অভিসম্পাত বর্ষণ করা জায়েয নয় এর দলীল রূপে কেউ কেউ এই হাদীসটিও এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে একটি লোককে বার বার মাতাল অবস্থায় আনা হয় এবং বার বারই তার উপরে 'হদ্দ' লাগানো হয়। এই সময় এক ব্যক্তি মন্তব্য করেঃ 'তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। কেননা, সে বার বার মদ্যপান করতেছে'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ 'ওর উপর লা'নত বর্ষণ করো না। কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) সাথে ভালবাসা রাখে না, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা জায়েয।

১৬৩। এবং তোমাদের মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্ব প্রদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই।

١٦٣- وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

অর্থাৎ উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর মত কেউই নেই। তিনি একক। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউই নেই। তিনি দাতা ও দয়ালু। সূরা-ই-ফাতিহার

প্রারম্ভে এর তাফসীর হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার ইসমে আ'যম (বড় নাম) দু'টি আয়াতের মধ্যে রয়েছে। একটি এই আয়াতটি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিম্নের এই আয়াতটি الٓمٓ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (৩ঃ ১-২)এর পরে আল্লাহ তা'আলা একত্ববাদের প্রমাণস্বরূপ ঘোষণা করছেনঃ

١٦٤- اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১৬৪। নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে, দিবা ও রজনীর পরিবর্তনে, জাহাজসমূহের চলাচলে—যা মানুষের লাভজনক এবং সম্ভার নিয়ে সমুদ্রে চলাচল করে, মৃত্যুর পর পৃথিবীকে জীবিতকরণে, তাতে সর্বাধিক জীবজন্তু সঞ্চারিত করার জন্যে আকাশ হতে আল্লাহ কর্তৃক বৃষ্টি বর্ষণে, বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে সত্য সত্যই জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন—হে মানব জাতি! আমি যে একক উপাস্য তার একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে এই আকাশ, যার উচ্চতা, সূক্ষ্মতা ও প্রশস্ততা তোমরা অবলোকন করছো এবং যার গতিহীন ও গতিশীল উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজী তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। আমার একত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে পৃথিবীর সৃজন। এটা একটা ঘন মোটা বস্তু যা তোমাদের পায়ের নীচে বিছানো রয়েছে। যার উপরে রয়েছে উঁচু উঁচু শিখর বিশিষ্ট গগণচুম্বী পর্বতসমূহ। তার মধ্যে রয়েছে বড় বড় তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র। আর যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর সুন্দর লতা ও গুল্ম। যার মধ্যে নানা প্রকারের শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে।

যার উপরে তোমরা অবস্থান করছো এবং নিজেদের ইচ্ছামত আরামদায়ক ঘর বাড়ী তৈরী করে সুখ শান্তিতে বসবাস করছো এবং যদ্দ্বারা বহু প্রকারের উপকার লাভ করছো। আল্লাহর একত্বের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে দিন রাত্রির আগমন ও প্রস্থান। রাত যাচ্ছে দিন আসছে, আবার দিন যাচ্ছে রাত আসছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও হচ্ছে না। বরং প্রত্যেকটি আপন আপন নির্ধারিত নিয়মে চলছে। কোন সময় দিন বড় হয়, আবার কোন সময় রাত বড় হয়। কোন সময় দিনের কিছু অংশ রাত্রির মধ্যে যায় এবং কোন সময় রাত্রির কিছু অংশ দিনের মধ্যে আসে। তারপরে তোমরা নৌকাগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর যা তোমাদেরকে ও তোমাদের মাল আসবাবপত্র এবং বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে এদিক ওদিক চলাচল করছে। এর মাধ্যমে এই দেশবাসী ঐ দেশবাসীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও লেন দেন করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণাঙ্গ করুণা ও দয়ার মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। এবং এর ফলে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করে থাকেন আর এর দ্বারা জমি কর্ষণের ব্যবস্থা দান করতঃ ওর থেকে উৎপাদন করেন নানা প্রকারের শস্য। এরপর আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, ওদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, তাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন, তাদের জন্যে তৈরি করেছেন শু'বার, বসবার এবং চরবার জায়গা। বায়ুকে তিনি চালিত করেছেন পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে। কখনও ঠাণ্ডা, কখনও গরম এবং কখনও অল্প কখনও বেশী। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে মেঘমালাকে কাজে লাগিয়েছেন। ওগুলো এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছেন, প্রয়োজনের সময় বর্ষণ করছেন। এগুলো সবই হচ্ছে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ, যদ্দ্বারা জ্ঞানীরা স্বীয় প্রভুর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব অনুধাবন করতে পারে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবস ও যামিনী পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্যে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িত ভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি এটা বৃথা সৃষ্টি করেননি, আপনিই পবিত্রতম—অতএব আমাদেরকে নরকানল হতে রক্ষা করুন।'

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট এসে বলেঃ 'আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন যে, তিনি যেন 'সাফা' পাহাড়কে সোনার পাহাড় করে দেন, তাহলে আমরা ওটা দিয়ে ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করতঃ আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো এবং

আপনার সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করবো।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা দৃঢ় অঙ্গীকার করছো তো?' তারা বলে 'হাঁ' আমরা পাকা অঙ্গীকার করলাম।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন। ফলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেনঃ 'আপনার প্রার্থনা তো গৃহীত হয়েছে কিন্তু এইসব লোক যদি এর পরেও ঈমান না আনে তবে তাদের উপর আল্লাহর এমন শাস্তি আসবে যা ইতিপূর্বে আর কারও উপর আসেনি।' একথা শুনে তিনি কেঁপে উঠেন এবং আরজ করেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে এ অবস্থাতেই ছেড়ে দিন। আমি তাদেরকে আপনার দিকে আহ্বান করতে থাকবো। একদিন না একদিন তাদের মধ্যে কেউ ঈমান আনবে।' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, যদি তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার নিদর্শনাবলী দেখবার ইচ্ছে করে তবে এই নিদর্শনগুলো কি দেখার মত নয়? এই আয়াতের আর একটি শান-ই-নুযূল এও বর্ণিত আছে যে, যখন وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ - لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন মুশরিকরা বলে যে, "একজন আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের বন্দোবস্ত কিরূপে করবেন?" তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় যে, তিনি সেই আল্লাহ যিনি এত বড় ক্ষমতাবান। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আল্লাহ এক' একথা শুনে তারা দলীল চাইলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাঁর ক্ষমতার নিদর্শনাবলী তাদের নিকট প্রকাশ করা হয়।

---

১৬৫। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ আছে- যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে- আল্লাহর প্রতি তাদের প্রেম দৃঢ়তর এবং যারা অত্যাচার করেছে তারা যদি শাস্তি অবলোকন করতো- তবে বুঝতো যে, সমুদয় শক্তি আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

١٦٥- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝

١٦٦- اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ○

১৬৬। যারা অনুসৃত হয়েছে–তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

١٦٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ○

১৬৭। অনুসরণকারীরা বলবে, যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তবে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রূপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম; এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহ তৎপ্রতি দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা অগ্নি হতে উদ্ধার পাবে না।

এই আয়াতসমূহে মুশরিকদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা আল্লাহ তা'আলার অংশীদার স্থাপন করে থাকে এবং অন্যদেরকে তাঁর সদৃশ স্থির করে থাকে। অতঃপর তাদের সাথে এমন আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন করে যেমন ভালবাসা আল্লাহ তা'আলার সাথে স্থাপন করা উচিত ছিল। অথচ তিনিই প্রকৃত উপাস্য এবং তিনি এক। তিনি অংশীদার হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমি জিজ্ঞেস করি–হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বড় পাপ কি?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শিরক করা, অথচ সৃষ্টি তিনি একাই করেছেন।' অতঃপর আল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার প্রতি মু'মিনদের প্রেম দৃঢ়তর হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও সাথে তাদের এরূপ ভালবাসাও নেই এবং তারা আর কারও কাছে প্রার্থনাও করে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে তারা মস্তক অবনত করে

না–তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদারও করে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোককে শাস্তির সংবাদ দিচ্ছেন যারা শির্কের মাধ্যমে তাদের আত্মার উপর অত্যাচার করতেছে। যদি তারা শাস্তি অবলোকন করতো তবে তাদের অবশ্যই বিশ্বাস হতো যে, মহা ক্ষমতাবান তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। সমস্ত জিনিস তাঁর অধীনস্থ এবং তাঁরই আজ্ঞাধীন। তাঁর শাস্তিও খুব কঠিন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'সেই দিন তাঁর শাস্তির মত কেউ শাস্তিও দিতে পারে না এবং তাঁর পাকড়াও এর মত কেউ পাকড়াও করতে পারে না।'

দ্বিতীয় ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যদি ঐ দৃশ্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকতো তবে কখনও তারা 'শির্ক ও 'কুফর'কে আঁকড়ে থাকতো না। দুনিয়ায় যাদেরকে তারা তাদের নেতা মনে করে রেখেছিল, কিয়ামতের দিন ঐ নেতারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ বলবেনঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা এদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এরা আমাদের উপাসনা করতো না। হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং আপনিই আমাদের অভিভাবক। বরং এরা জ্বিনদের উপাসনা করতো। এদের অধিকাংশই ওদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল।' অনুরূপভাবে জ্বিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং পরিষ্কারভাবে তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا -

অর্থাৎ 'অতিসত্ত্বরই তারা তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে এবং তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে।' (১৯ঃ ৮২) হযরত ইবরাহীম (আঃ) কাফিরদের প্রতি যে উক্তি করেছিলেন কুরআন মাজীদে তা নকল করা হয়েছেঃ 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তির ভালবাসা তোমাদের অন্তরে স্থান দিয়েছো এবং তাদের পূজা অর্চনা শুরু করে দিয়েছো অথচ কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের উপাসনাকে অস্বীকার করে বসবে এবং তোমরা একে অপরের প্রতি লা'নত বর্ষণ করবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।' এভাবেই অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'অত্যাচারিরা তাদের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের পরিচালকদেরকে বলবে–'তোমরা না হলে আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম।' তারা তখন উত্তরে বলবে 'আমরা কি তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত হতে বিরত রেখেছিলাম? প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, তোমরা নিজেরাই পাপী ছিলে।' তারা বলবে–'তোমাদের রাত দিনের প্রতারণা,

তোমাদের কুফরীপূর্ণ নির্দেশাবলী এবং তোমাদের শির্কের শিক্ষা আমাদেরকে প্রতারিত করেছে'। এখন তারা শাস্তি দেখার পরে সবাই ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হবে এবং তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাদের গলদেশে গলাবন্ধ পরিয়ে দেয়া হবে।' অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'সেই শয়তানও বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে সত্য অঙ্গীকার করেছিলেন। আর আমি তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছি অতঃপর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি, তোমাদের উপর আমার কোন প্রভাবই ছিল না, বরং আমি তোমাদেরকে আহ্বান করেছি আর তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছো। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, বরং নিজেদেরকে তিরস্কার কর; না আমি তোমাদের সাহায্যকারী হতে পারি, না তোমরা আমার সাহায্যকারী হতে পার; আমি নিজেও তোমাদের এ কাজে অসন্তুষ্ট যে, তোমরা ইতিপূর্বে আমাকে (আল্লাহ্) অংশীদার সাব্যস্ত করতে; নিশ্চয়ই অত্যাচারিদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' তারপরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তারা শাস্তি দেখে নেবে এবং সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পলায়নেরও কোন জায়গা থাকবে না এবং মুক্তিরও কোন পথ চোখে পড়বে না। বন্ধুত্ব কেটে যাবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবে। বিনা প্রমাণে যারা তাদের পরিচালকদের কথামত চলতো, তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখতো এবং তাদের আনুগত্য স্বীকার করত, পূজা অর্চনা করতো, তারা যখন তাদের পরিচালক ও নেতাদেরকে দেখবে যে, তারা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন তারা অত্যন্ত দুঃখ ও নৈরাশ্যের সাথে বলবে—'যদি আমরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তবে আমরাও ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম যেমন এরা আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমরা এদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করতাম না, এদের কথা মানতাম না এবং এদেরকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করতাম না। বরং খাঁটি অন্তরে এক আল্লাহর ইবাদত করতাম।' অথচ প্রকৃতই যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তবুও তারা পূর্বে যা করেছিল তাই করবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ অর্থাৎ 'যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় তবে অবশ্যই-তারা ঐ কাজই করবে যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।' (৬ঃ ২৮) এজন্যেই বলা হয়েছেঃ 'তাদের কৃতকর্মসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন।' অর্থাৎ তাদের ভাল কর্ম যা কিছু ছিল সেগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ 'তাদের কৃতকর্মের অবস্থা ঐ ছাই এর মত যাকে ভীষণ ঝড়ের দিন বায়ু প্রবল বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়।' অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'যারা কাফির হয়েছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির

মরীচিকা–পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে, কিন্তু ওর নিকটে গিয়ে কিছুই পায় না।' তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা জাহান্নামের অগ্নি হতে উদ্ধার পাবে না। বরং তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

**১৬৮। হে মানবগণ! পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ-পবিত্র, তা হতে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।**

١٦٨- يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

**১৬৯। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জাননা এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।**

١٦٩- اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

উপরে যেহেতু তাওহীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কাজেই এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের আহার দাতাও তিনিই। তিনি বলেনঃ 'তোমরা আমার এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না যে, আমি তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলো বৈধ করে দিয়েছি যা তোমাদের কাছে খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তি দানকারী। ঐ খাদ্য তোমাদের শরীর, স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান বিবেকের কোন ক্ষতি করে না। আমি তোমাদেরকে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। কেউ কেউ যেমন শয়তানের পথে চলে কতকগুলো হালাল বস্তু তাদের উপর হারাম করে নিয়েছে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপই হবে। সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমি যে মাল-ধন আমার বান্দাদেরকে প্রদান করেছি তা তার জন্য বৈধ করেছি। আমি আমার বান্দাদের একত্ববাদী রূপে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তান তাদেরকে এই সুদৃঢ় ধর্ম হতে সরিয়ে ফেলেছে এবং আমার বৈধকৃত বস্তুকে তাদের উপর অবৈধ করে দিয়েছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সামনে এই আয়াতটি পঠিত হলে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমার

প্রার্থনা কবুল করেন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে সা'দ (রাঃ)! পবিত্র জিনিস এবং হালাল গ্রাস ভক্ষণ কর, তা হলেই আল্লাহ পাক তোমার প্রার্থনা ম ্র করবেন। যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মদ (সঃ)–এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যে হারাম গ্রাস মানুষ তার পেটের ভিতরে নিক্ষেপ করে,ওরই কুফল স্বরূপ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন ইবাদত গৃহীত হয় না। হারাম আহার্যের দ্বারা শরীরের যে গোশত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তা দোযখী।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে, 'শয়তান তোমাদের শত্রু। তোমরাও তাকে শত্রু মনে কর। তার ও তার অনুচরদের একমাত্র বাসনাই হচ্ছে তোমাদেরকে শাস্তির দিকে এগিয়ে দেয়া।' অন্য এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমরা কি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমাদের বন্ধু মনে করছো? অথচ প্রকৃতপক্ষে তো তারা তোমাদের শত্রু। অত্যাচারিদের জন্য জঘন্য প্রতিদান রয়েছে।' خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ এর ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যে কোন আদেশ অমান্যকরণ যাতে শয়তানের প্ররোচনা রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেনঃ একটি লোক 'নযর মানে যে, সে তার ছেলেকে যবাহ্ করবে। হযরত মাসরূকের (রঃ) নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি ফতওয়া দেন যে, সে যেন একটি মেষ যবাহ্ করে। এই নযর খুতওয়াত-ই- শয়তানের অন্তর্গত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদা ছাগীর খুর লবন দিয়ে খাচ্ছিলেন। তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি দূরে সরে গিয়ে উপবেশন করে। তিনি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ) লোকটিকে বলেনঃ 'এস খাও।' সে বলেঃ 'আমি খাবো না।' তিনি বলেনঃ 'তুমি কি রোযা রেখেছো?' সে বলেঃ 'না, কিন্তু আমি ওটা নিজের উপর হারাম করেছি।' তখন তিনি বলেনঃ 'এটা শয়তানের পথে চলা হচ্ছে। তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় কর ও ওটা খেয়ে নাও।'

হযরত আবূ রাফি' (রঃ) বলেনঃ 'একদা আমি আমার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হলে সে বলে–'তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে তালাক না দাও তবে আমি একদিন ইয়াহূদিয়্যাহ, একদিন নাসরানিয়্যাহ এবং আমার সমস্ত গোলাম আযাদ।' এখন আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারের (রাঃ) নিকট বিষয়টি জিজ্ঞেস করতে আসি যে, এখন কি করা যায়। তখন তিনি বলেন যে,এটা হচ্ছে শয়তানের পদাংক অনুসরণ। অতঃপর আমি হযরত যয়নাব বিনতে সালমার (রাঃ) নিকট গমন করি। সেই সময় গোটা মদীনা নগরীতে তাঁর মত সুশিক্ষিতা ও জ্ঞানবতী নারী আর একজনও ছিলেন না। আমি তাঁকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তাঁর কাছেও এই উত্তরই পাই। হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) এই ফতওয়া দেন।' হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) ফতওয়া এই যে, ক্রোধের অবস্থায় যে কসম

করা হয় এবং এই অবস্থায় যে নযর মানা হয় ওটা শয়তানের পদাংক অনুসরণ। কসমের কাফ্ফারার সমান কাফ্ফারা আদায় করে দিতে হবে। এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'শয়তান তোমাদেরকে অসৎ কাজ করতে প্ররোচিত করে। যেমন ব্যভিচার করতে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে এমন কথা বলতে প্ররোচিত করে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং প্রত্যেক কাফির ও বিদআতপন্থী এর অন্তর্ভুক্ত যারা অন্যায় কার্যের নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং অসৎ কার্যে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

১৭০। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর; তখন তারা বলে– বরং আমরা ওরই অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষ-গণকে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিল না। এবং তারা সুপথগামী ছিল না তবুও?

١٧٠- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

১৭১। আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়। যেমন কেউ আহবান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনে না; তারা বধির, মুক, অন্ধ; কাজেই তারা বুঝতে পারে না।

١٧١- وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকদেরকে যখন বলা হয় যে, তারা যেন আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ এবং নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতাকে পরিত্যাগ করে, তখন তারা বলে যে, তারা তাদের বড়দের পথ ধরে রয়েছে। তাদের পিতৃপুরুষ যাদের পূজা অর্চনা করতো তারাও তাদের উপাসনা করছে এবং করতে থাকবে। তাদের উত্তরেই কুরআন ঘোষণা করছে যে, তাদের পিতৃপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামী ছিল না। এই আয়াতটি ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন যে, যেমন

মাঠে বিচরণকারী জন্তুগুলো রাখালের কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, শুধুমাত্র শব্দই ওদের কানে পৌঁছে থাকে এবং ওরা কথার ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞাত থাকে, এইসব লোকের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে এরা যাদের পূজা করে থাকে এবং তাদের প্রয়োজন ও মনস্কামনা পূর্ণ করার প্রার্থনা জানিয়ে থাকে তারা না এদের কথা শুনতে পায়, না জানতে পারে, না দেখতে পায়। তাদের মধ্যে না আছে জীবন, না আছে কোন অনুভূতি। কাফিরদের এই দলটি সত্য কথা শুনা হতে বধির, বলা হতে বোবা, সত্য পথে চলা হতে অন্ধ এবং সত্যের অনুধাবন হতেও এরা বহু দূরে রয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'আমার আয়াতসমূহে অবিশ্বাসকারীরা বধির, বোবা, তারা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।'

---

١٧٢- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

১৭২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর- যদি তোমরা তাঁরই উপাসনা করে থাকো।

١٧٣- اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৭৩। তিনি শুধু তোমাদের জন্যে মৃত জীব, শোণিত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত- তদ্ব্যতীত অবৈধ করেননি; বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরুপায় কিন্তু উচ্ছৃংখল বা সীমালংঘন-কারী নয়, তার জন্যে পাপ নেই; এবং নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলছেন—'তোমরা পবিত্র ও উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ কর এবং আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' হালাল গ্রাস দু'আ ও ইবাদত গৃহীত হওয়ার কারণ এবং হারাম গ্রাস তা কবুল না হওয়ার কারণ। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করে থাকেন। তিনি নবীগণকে ও মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ 'হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল দ্রব্য ভক্ষণ কর এবং ভাল কাজ কর, নিশ্চয় তোমরা যা করছো আমি তা জানি।' অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 'হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি, সেই পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'একটি লোক দীর্ঘ সফরে রয়েছে। তার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত এবং সে ধূলো-বালিতে আচ্ছন্ন রয়েছে। সে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহকে ডাকছে। কিন্তু তার আহার্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য সবই হারাম। এই জন্যেই তার এই সময়ের প্রার্থনাও গৃহীত হয় না।' হালাল জিনিসের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হারাম জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে যে, যে হালাল প্রাণী আপনা আপনিই মরে গেছে এবং শরীয়তের বিধান অনুসারে যবাহ্ করা হয়নি তা হারাম। হয় ওকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলুক বা লাঠির আঘাতেই মরে যাক, বা কোথাও হতে পড়ে গিয়ে মারা যাক, বা অন্যান্য জন্তু তাকে শিং এর আঘাতে মেরে ফেলুক, এসবগুলোই মৃত এবং হারাম। কিন্তু পানির প্রাণীর ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। পানির প্রাণী নিজে নিজেই মরে গেলেও হালাল। এর পূর্ণ বর্ণনা أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (৫ঃ ৯৬) এই আয়াতের তাফসীরে দেয়া হবে। সাহাবীদের (রাঃ) 'আম্বার' নামক পানির প্রাণীটি মৃত অবস্থায় প্রাপ্তি, তাঁদের তা ভক্ষণ করা, পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছে যাওয়া এবং তাঁর একে জায়েয বলা ইত্যাদি সব কিছুই হাদীসের মধ্যে রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সমুদ্রের পানি হালাল এবং ওর মৃত প্রাণীও হালাল।' আরও একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'দুই মৃত ও দুই রক্ত হালাল। মাছ, ফড়িং, কলিজা ও প্লীহা।' 'সূরা-ই-মায়েদা'য় ইনশাআল্লাহ এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

**জিজ্ঞাস্যঃ** মৃত জন্তুর দুধ ও তার মধ্যস্থিত ডিম অপবিত্র। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। কেননা ওগুলো মৃতেরই এক একটি অংশ বিশেষ। ইমাম মালিক (রঃ)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ওটা পবিত্র তো বটে; কিন্তু মৃতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে অপবিত্র হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মৃতের দাঁতও প্রসিদ্ধ মায্হাবে ঐ গুরুজনদের নিকট অপবিত্র। তবে তাতে মতভেদও রয়েছে। সাহাবীগণের (রাঃ) 'মাজুসদের ' পনীর ভক্ষণ এখানে প্রতিবাদ রূপে আসতে পারে; কিন্তু কুরতুবী (রঃ) এর উত্তরে বলেছেন যে, দুধ খুবই কম হয়ে থাকে আর এরূপ তরল জাতীয় কোন অপবিত্র জিনিস অল্প পরিমাণে যদি অধিক পরিমাণ যুক্ত কোন পবিত্র জিনিসে পড়ে যায় তবে তাতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘি, পনীর এবং বন্য গর্দভ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ 'হালাল ঐ জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হালাল করেছেন এবং হারাম ঐ জিনিস যা তিনি স্বীয় কিতাবে হারাম করেছেন আর যেগুলোর বর্ণনা নেই সেগুলো ক্ষমার্হ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, শূকরের মাংসও হারাম। হয় তাকে যবাহ করা হোক বা নিজেই মরে যাক। শূকরের চর্বিরও এটাই নির্দেশ। কেননা, ওর অধিকাংশ মাংসই হয় এবং চর্বি মাংসের সাথেই থাকে। কাজেই মাংস যখন হারাম তখন চর্বিও হারাম। দ্বিতীয়তঃ এই জন্যেও যে, কিয়াসের দাবী এটাই। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যা আল্লাহ ছাড়া অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ওটাও হারাম। অজ্ঞতার যুগে কাফিরেরা তাদের বাতিল উপাস্যদের নামে পশু যবাহ্ করতো। আল্লাহ তা'আলা ওটাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন। একবার একজন স্ত্রীলোক কাপড়ের স্ত্রী-পুতুলের বিয়েতে একটি পশু যবাহ করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) ফতওয়া দেন যে, ওটা খাওয়া উচিত নয়। কেননা ওটা একটা ছবির জন্যে যবাহ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা রাঃ) জিজ্ঞাসিতা হন যে, আযমী বা অনারবরা তাদের ঈদে পশু যবাহ্ করে থাকে এবং তা হতে মুসলমানদের নিকটও হাদিয়া স্বরূপ কিছু পাঠিয়ে থাকে। তাদের ঐ গোশ্ত খাওয়া যায় কি না? তিনি বলেনঃ 'ঐ দিনের সম্মানার্থে যে জীব যবাহ্ করা হয় তোমরা তা খেয়ো না। তবে তাদের গাছের ফল খেতে পার।'

এর পরে আল্লাহ তা'আলা অভাব ও প্রয়োজনের সময় যখন খাওয়ার জন্যে অন্য কিছুই পাওয়া যায় না তখন ঐ হারাম বস্তুগুলোও খেয়ে নেয়া বৈধ করেছেন এবং বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যাবে এবং অবাধ্য-উচ্ছৃংখল ও সীমা অতিক্রমকারী না হবে তার জন্যে এই সব জিনিস খাওয়ায় কোন পাপ নেই।

আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময়। بَاغٍ ও عَادٍ শব্দ দু'টির তাফসীরে হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেনঃ 'এর ভাবার্থ হচ্ছে দস্যু, মুসলমান বাদশাহর উপর আক্রমণকারী, ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরোধী এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় ভ্রমণকারী। এদের জন্যে এই রকম নিরুপায় অবস্থাতেও হারাম বস্তু হারামই থাকবে। হযরত মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ) غَيْرَ بَاغٍ -এর তাফসীর এটাও করে থাকেন যে, সে ওকে হালাল মনে করে না এবং মনে ওর স্বাদ ও মজা গ্রহণের বাসনা রাখে না। ওকে মুখ রোচক রূপে ভাল করে রেঁধে খায় না। বরং যেন তেন করে শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই খেয়ে থাকে। আর যদি সঙ্গে বেঁধে নেয় তবে ততক্ষণ রাখতে পারে যতক্ষণ হালাল আহার্য প্রাপ্ত না হয়। যখনই হালাল আহার্য পেয়ে যাবে তখনই ওগুলোকে ফেলে দিতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওগুলো খুব পেট পুরে খাওয়া চলবে না। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তিকে ওটা খাওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় এবং তার স্বাধীন ক্ষমতা লোপ পায় তার জন্যেই এই হুকুম।

**জিজ্ঞাস্যঃ** একটি লোক ক্ষুধার জ্বালায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছে। এমন সময় সে একটি মৃত জীব দেখতে পেয়েছে এবং তার সম্মুখে অপরের একটি হালাল বস্তুও রয়েছে। যেখানে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতারও ভয় নেই এবং কোন কষ্টও নেই, এই অবস্থায় তাকে অপরের জিনিসটিই খেয়ে নিতে হবে, মৃত জীবটি খেতে হবে না। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তাকে ঐ জিনিসটির মূল্য আদায় করতে হবে কি হবে না বা ঐ জিনিসটি তার দায়িত্বে থাকবে কি থাকবে না? এই ব্যাপারে দু'টো উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি হচ্ছে দায়িত্বে থাকা এবং অপরটি হচ্ছে দায়িত্বে না থাকা। ইবনে মাজাহ্র মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে, হযরত আব্বাদ বিন শারজাবীল আনাযী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'এক বছর আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। আমি মদীনা গমন করি এবং একটি ক্ষেতে ঢুকে কিছু শিষ ভেঙ্গে নেই ও ছিলে খেতে আরম্ভ করি। আর কিছু শিষ চাদরে বেঁধে নিয়ে চলতে থাকি। ক্ষেতের মালিক দেখে আমাকে ধরে নেয় এবং মেরে পিটে আমার চাদর কেড়ে নেয়। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে আমার সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ লোকটিকে বলেনঃ 'না তুমি এই ক্ষুধার্তকে খেতে দিলে, না তার জন্যে অন্য কোন চেষ্টা করলে, না তুমি তাকে বুঝালে বা শেখালে! এই বেচারা তো ক্ষুধার্ত ও মূর্খ ছিল। যাও, তার কাপড় তাকে ফিরিয়ে দাও এবং এক ওয়াসাক বা অর্ধওয়াসাক (এক ওয়াসাকে প্রায় ৪মণ হয়) শস্য দিয়ে দাও।' গাছে লটকে থাকা খেজুর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ 'অভাবী লোক যদি এখানে কিছু

খায় কিন্তু বাড়ী নিয়ে না যায় তবে তার কোন অপরাধ নয়।' এও বর্ণিত আছে যে, তিন গ্রাসের চেয়ে যেন বেশী না খায়। মোট কথা, এই অবস্থায় আল্লাহ পাকের দয়া ও মেহেরবানীর কারণেই তার জন্যে এই হারামকে হালাল করা হয়েছে। হযরত মাসরূক (রঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যায় অথচ হারাম জিনিস ভক্ষণ বা পান করে না, অতঃপর মারা-যায় সে দোযখী। এর দ্বারা জানা গেল যে, এরূপ অবস্থায় এরকম জিনিস খাওয়া অবশ্য কর্তব্য, শুধু যে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা নয়; এটাই সঠিক কথা। যেমন রুগ্ন ব্যক্তির রোযা ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি।

---

১৭৪। নিশ্চয় আল্লাহ যা গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয় তারা স্ব স্ব উদরে অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করে না; এবং উত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে নির্মল করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৪- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৭৫। ওরাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতঃপর জাহান্নাম কিরূপে সহ্য করবে?

١٧٥- أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

১৭৬। এই জন্যেই আল্লাহ সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, এবং যারা গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরোধ করে, বাস্তবিকই তারাই বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী।

١٧٦- ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ○ ع

অর্থাৎ তাওরাতের মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কিত যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলো যেসব ইয়াহূদী তাদের রাজত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে গোপন করে এবং সাধারণ আরবদের নিকট হতে হাদিয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করতঃ এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে তাদের আখেরাতকে খারাপ করে থাকে তাদেরকে এখানে ভয় দেখানো হয়েছে। যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের সত্যতার আয়াতগুলো–যা তাওরাতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, জনগণের মধ্যে প্রকাশ পায় তবে তারা তাঁর আয়ত্তাধীনে এসে যাবে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে–এই ভয়ে তারা হিদায়াত ও মাগফিরাতকে ছেড়ে পথভ্রষ্টতা ও শাস্তির উপরেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। এই কারণেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংস তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। পরকালের লাঞ্ছনা ও অপমান তো প্রকাশমান। কিন্তু এই কালেও জনগণের নিকট তাদের প্রতারণা প্রকাশ পেয়ে গেছে। তাদের দুষ্ট আলেমরা যে আয়াতগুলো গোপন করতো সেগুলোও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অলৌকিক ঘটনাবলী এবং তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র মানুষকে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকারের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। হাত ছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে যে দলটি হতে তারা আল্লাহর কালামকে গোপন রাখতো শেষে ঐ দলটি তাদের হাত ছাড়া হয়েই যায়। ঐ দলের লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হয়ে ঐ সত্য গোপনকারীদের প্রাণনাশ করতে থাকে এবং নিয়মিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ তাদের এই গোপনীয়তার কথা কোরআন মাজীদের জায়গায় জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এখানেও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কথা গোপন করে তারা যে অর্থ উপার্জন করছে তা প্রকৃতপক্ষে আগুনের অঙ্গার দ্বারা তারা তাদের পেট পূর্ণ করছে। যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের মাল ভক্ষণ করে থাকে তাদের সম্বন্ধেও কুরআন কারীম ঘোষণা করেছে যে, তারাও অগ্নি দ্বারা তাদের পেট পূর্ণ করছে এবং কিয়ামতের দিন তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করবে। সহীহ হাদীসের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির পাত্রে পানাহার করে সে তার পেটের মধ্যে আগুন ভরে থাকে।'

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কথা পর্যন্ত বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, বরং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে জড়িত থাকবে। কেননা, তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ পাকের ক্রোধ ও অভিশাপ তাদের উপরে বর্ষিত হয়েছে এবং আজ তাদের উপর হতে

আল্লাহর করুণা দৃষ্টি অপসারিত হয়েছে। তারা আজ আর প্রশংসার যোগ্য হয়ে নেই বরং তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছে এবং তারা ওর মধ্যেই জড়িত থাকবে। হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে-রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ পাক কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (তারা হচ্ছে) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং অহংকারী ভিক্ষুক।' এর পরে আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা সুপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথকে গ্রহণ করেছে। তাদের উচিত ছিল তাওরাতের মধ্যে হুজুর (সঃ)-এর সম্বন্ধে যেসব সংবাদ রয়েছে তা অজ্ঞদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা ওগুলো গোপন করেছে এবং তারা নিজেরাও তাঁকে অস্বীকার করেছে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং ওগুলো প্রকাশ করলে তারা যে নিয়ামত ও ক্ষমা প্রাপ্তির অধিকারী হতো তার পরিবর্তে তারা কষ্ট ও শাস্তিকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

তারপরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তাদেরকে এমন বেদনাদায়ক ও বিস্ময়কর শাস্তি দেয়া হবে যা দেখে দর্শকবৃন্দ হতভম্ব হয়ে যাবে। এও অর্থ হবে যে, কোন্ জিনিস তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করতে উত্তেজিত করেছে যে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে? অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, এরা আল্লাহ তা'আলার কথাকে খেল-তামাশা মনে করেছে এবং আল্লাহর যে কিতাব সত্য প্রকাশ করার জন্যে ও অসত্য মিটিয়ে দেয়ার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিল তারা তার বিরোধিতা করেছে, প্রকাশ করার কথাকে গোপন করেছে। আল্লাহর নবীর (সঃ) শত্রুতা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী গোপন করেছে, এসব কারণেই তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই যারা এই কিতাব সম্বন্ধে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তারা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণে বহু দূর এগিয়ে গেছে।

১৭৭। তোমরা তোমাদের মুখ মণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত কর তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার-যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশ্তাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ

عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীনগণ, দরিদ্রগণ, পথিকগণ ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্যে ধন-সম্পদ দান করে, আর নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে যারা সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয় এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই ধর্মভীরু।

এই পবিত্র আয়াতে খাঁটি বিশ্বাস এবং সরল সঠিক পথের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। হযরত আবূ যার (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'ঈমান কি জিনিস?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন। তিনি পুনরায় এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি আবার প্রশ্ন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'পুণ্যের প্রতি ভালবাসা এবং পাপের সাথে শত্রুতার নাম হচ্ছে ঈমান (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীম)। কিন্তু এই বর্ণনাটির সনদ মুনকাতা'। মুজাহিদ (রঃ) এই হাদীসটি হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ হযরত আবূ যার (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত সাব্যস্ত হয় না।

এক ব্যক্তি হযরত আবূ যার (রাঃ) কে প্রশ্ন করেঃ 'ঈমান কি?' তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। লোকটি বলেঃ 'জনাব! আমি আপনাকে মঙ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করিনি, বরং আমার প্রশ্ন ঈমান সম্বন্ধে।' হযরত আবূ যার (রাঃ) তখন বলেনঃ 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ প্রশ্নই করেছিল। তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেছিলেন, ঐ লোকটিও তখন তোমার মতই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ মু'মিন যখন সৎ কাজ করে

তখন তার প্রাণ খুশি হয় এবং সে পুণ্যের আশা করে আর যখন পাপ করে তখন তার অন্তর চিন্তিত হয় এবং সে শাস্তিকে ভয় করতে থাকে (তাফসীর -ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। এ হাদীসটিও মুনকাতা'।

মু'মিনদেরকে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরে তাদেরকে কা'বা শরীফের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা কিতাবীদের উপর এবং কতকগুলো মু'মিনের উপর কঠিন ঠেকে। সুতরাং মহান আল্লাহ এর নিপুণতা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যে দিকে মুখ করার নির্দেশ দেবেন সেদিকেই তাদেরকে মুখ করতে হবে। প্রকৃত ধর্মভীরুতা, প্রকৃত পুণ্য এবং পূর্ণ ঈমান এটাই যে, দাস তার মনিবের সমুদয় আদেশ ও নিষেধ শিরোধার্য করে নেবে। যদি কেউ পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে যায় এবং ওটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ক্রমে না হয় তবে এর ফলে সে মু'মিন হবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন মাজীদের মধ্যে এক জায়গায় আছেঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের কোরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে ধর্ম ভীরুতা পৌঁছে থাকে।' (২২ঃ ৩৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 'তোমরা নামায পড়বে এবং অন্যান্য আমল করবে না এটা কোন পুণ্যের কাজ নয়।' এই নির্দেশ ঐ সময় ছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা হতে মদীনার দিকে ফিরে ছিলেন। কিন্তু তারপরে অন্যান্য ফরযসমূহ ও নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয় এবং ওগুলোর উপর আমল করা অবশ্য কর্তব্য রূপে গণ্য করা হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমকে বিশিষ্ট করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়াহূদীরা পশ্চিম দিকে এবং খ্রীষ্টানেরা পূর্ব দিকে মুখ করতো । সুতরাং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এটাতো শুধু ঈমানের বাক্য এবং প্রকৃত ঈমান হচ্ছে আমল। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ 'পুণ্য এই যে, আনুগত্যের মূল অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশ্যকরণীয় কার্যগুলো নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করা হয়।' সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের উপর আমল করেছে সে পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মন খুলে সে পুণ্য সংগ্রহ করেছে। মহান আল্লাহর সত্তার উপর তার ঈমান রয়েছে। সে জানে যে, প্রকৃত উপাস্য তিনিই। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এবং এঁরা যে আল্লাহর

বাণী তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন একথা তারা বিশ্বাস করে। তারা সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে এবং এটাও বিশ্বাস করে যে, পবিত্র কুরআন শেষ আসমানী কিতাব যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে এবং ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সৌভাগ্য যার সাথে জড়িত রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নবীর উপরও তাদের ঈমান রয়েছে– বিশেষ করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপরেও তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। মাল ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে থাকে। সহীহ হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'উত্তম দান এই যে, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যখন তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও মালের প্রতি তোমার ভালবাসা ও লোভ থাকে, তুমি ধনী হওয়ারও আশা রাখ এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ও ভয় কর।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

ইমাম হাকিম (রঃ) তাঁর 'তাফসীর-ই-মুস্তাদরিক' নামক হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ পাঠ করতঃ বলেনঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, তোমরা সুস্থ অবস্থায় ও মালের প্রতি চাহিদা থাকা অবস্থায় দারিদ্রকে ভয় করে এবং ধনী হওয়ার ইচ্ছা রেখে দান করবে।' (২ঃ ১৭৭) কিন্তু হাদীসটি 'মওকুফ' হওয়াই বেশী সঠিক কথা। প্রকৃতপক্ষে এটা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এরই উক্তি। কুরআন মাজীদেও সূরা-ই-দাহরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ـ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۤءً وَّلَا شُكُوْرًا ـ

অর্থাৎ তারা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি ভালবাসার জন্যে দরিদ্র, পিতৃহীন ও বন্দীকে আহার করিয়ে থাকে। (তারা বলে) আমরা তোমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আহার করাচ্ছি, আমরা তোমাদের নিকট এর প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাচ্ছি না।' (৭৬ঃ ৮-৯) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ

অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ভালবাসার জিনিস তোমরা (আল্লাহর পথে) খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।' (৩ঃ ৯২) অন্যস্থানে বলেছেনঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ 'তাদের অভাব ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যদেরকে তাদের জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।' (৫৯ঃ ৯) সুতরাং এরা বড় মর্যাদার অধিকারী। কেননা, প্রথম প্রকারের লোকেরাতো তাঁদের ভালবাসা ও পছন্দনীয় জিনিস অন্যদেরকে দান করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের লোকেরা এমন জিনিস অপরকে দিয়েছেন, যে জিনিসের তাঁরা নিজেরাই মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন অপেক্ষা অপরের প্রয়োজনকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ذَوِى الْقُرْبٰى আত্মীয়গণকে বলা হয়। দানের ব্যাপারে অন্যদের উপর এদের অগ্রাধিকার রয়েছে।

হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'মিসকীনকে দান করার পুণ্য একগুণ এবং আত্মীয় (মিসকীন)-কে দান করার পুণ্য দ্বিগুণ। একটি দানের পুণ্য এবং দ্বিতীয়টি আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখার পুণ্য। তোমাদের দান ও খয়রাতের এরাই বেশী হকদার।' কুরআন মাজীদের মধ্যে কয়েক জায়গায় তাদের সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। 'ইয়াতীম' এর অর্থ হচ্ছে ঐ ছোট ছেলে যার পিতা মারা গেছে। তার অন্য কেউ উপার্জনকারী নেই। তার নিজের উপার্জন করারও ক্ষমতা নেই। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর সে আর ইয়াতীম থাকে না। মিসকীন ওদেরকে বলা হয় যাদের নিকট এই পরিমাণ জিনিস নেই যা তাদের খাওয়া পরার ও বসবাসের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। তাদেরকেও দান করতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং তারা দারিদ্র, ক্ষুধা, সংকীর্ণতা এবং অবমাননাকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে ভিক্ষার জন্যে ঘুরে বেড়ায় এবং দু'একটি খেজুর বা দু' এক গ্রাস খাবার দিয়ে তাকে বিদায় করা হয়, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার কাছে এই পরিমাণ জিনিস নেই যদদ্বারা তার সমস্ত কাজ চলতে পারে এবং যে তার অবস্থা এমন করতে পারে না যদদ্বারা মানুষ তার অবস্থা জেনে তাকে কিছু দান করতে পারে।' 'ইবনুস্ সাবীল' মুসাফিরকে বলা হয়। এখানে ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে, যার নিকট সফরের খরচ নেই। তাকে এই পরিমাণ দেয়া হবে যেন সে অনায়াসে তার দেশে পৌঁছতে পারে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে সফরে বেরিয়েছে তাকেও যাতায়াতের খরচ দিতে হবে। অতিথিও এই নির্দেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অতিথিকেও 'ইবনুস্ সাবীলের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য মনীষীও এই মতই পোষণ করেছেন। 'সায়েলীন' ঐ সব লোককে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ করতঃ মানুষের নিকট ভিক্ষা করে থাকে। এদেরকেও সাদকা ও যাকাত থেকে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ভিক্ষুক ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে আসলেও তার হক রয়েছে।' (সুনান-ই-আবু দাউদ)। فِى الرِّقَابِ -এর ভাবার্থ হচ্ছে ক্রীত দাসদেরকে দাসত্ব হতে মুক্ত করা। এরা ঐ ক্রীতদাস যাদেরকে তাদের মনিবেরা বলে দিয়েছে যে, যদি তারা তাদেরকে এত এত অর্থ দিতে পারে তবে তারা মুক্ত হবে। এদেরকে সাহায্য করে মুক্ত করিয়ে নেয়া। এইসব প্রকারের এবং আরও অন্যান্য প্রকারের লোকদের পূর্ণ বর্ণনা اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ এই আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ দেয়া হবে। হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মালের মধ্যে যাকাত ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও কিছু হক রয়েছে।' অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পড়ে শুনান। এই হাদীসে আবূ হামযাহ মায়মুন আ'ওয়ার নামক একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা নামাযকে সময়মত পূর্ণ রুকু' সিজদাহ্, স্থিরতা এবং বিনয়ের সাথে আদায় করে থাকে। অর্থাৎ যে নিয়মে আদায় করার নির্দেশ শরীয়তে রয়েছে ঠিক সেই নিয়মেই আদায় করে থাকে। আর তারা যাকাতও প্রদান করে থাকে। কিংবা এই অর্থ যে, তারা নিজেদের আত্মাকে বাজে কথা এবং জঘন্য চরিত্র থেকে পবিত্র রাখে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا *

অর্থাৎ 'আত্মাকে পবিত্রকারী সফলকাম হয়েছে এবং তাকে দমনকারী বিফল মনোরথ হয়েছে।' (৯১ঃ ৯-১০) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক ঘোষণা করেনঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ * الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ 'মুশরিকদের জন্যে অকল্যাণ, যারা যাকাত আদায় করে না। (৪১ঃ ৬-৭) সুতরাং উপরোক্ত আয়াতসমূহে 'যাকাত' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'নফস'-কে পবিত্র করা। অর্থাৎ নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতা, শিরক এবং কুফর হতে পবিত্র করা। আবার এর অর্থ মালের যাকাতও হতে পারে। তাহলে তখন নফল

সাদকার অন্যান্য নির্দেশ বুঝতে হবে। যেমন উপরে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মালের মধ্যে যাকাত ছাড়া আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য হক রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অঙ্গীকার করলে যারা সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয়। যেমন, আল্লাহ পাক অন্য স্থানে বলেছেনঃ

اَلَّذِيْنَ يُوفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ

অর্থাৎ 'যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পুরো করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।' (১৩ঃ ২০) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হচ্ছে মুনাফিকদের অভ্যাস। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখলে তা আত্মসাৎ করে।' অন্য একটি হাদীসে আছেঃ 'ঝগড়ার সময় গালি উচ্চারণ করে।' তারপরে আল্লাহ পাক বলেন যে, যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধ কালে ধৈর্যধারণকারী। এই সব কষ্ট ও বিপদের সময় ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করুন'। তাঁরই উপর আমরা নির্ভর করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সব গুণবিশিষ্ট মানুষই সত্যপরায়ণ ও খাঁটি ঈমানদার। তাদের ভিতর ও বাহির, কথা ও কাজ একই রূপ। আর তারা ধর্মভীরুও বটে। কেননা, তারা সদা আনুগত্যের উপরেই রয়েছে এবং নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ হতে বহু দূরে সরে আছে।

**১৭৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! নিহতগণের সম্বন্ধে তোমাদের জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ হলো; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী; কিন্তু যদি কেউ তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তবে যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে তাগাদা করে এবং সদ্ভাবে তা পরিশোধ**

١٧٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

করে; এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা; অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

١٧٩- وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৭৯। হে জ্ঞানবান লোকেরা! প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্যে জীবন আছে–যেন তোমরা ধর্মভীরু হও।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন–'হে মুসলিমগণ! প্রতিশোধ গ্রহণের সময় ন্যায় পন্থা অবলম্বন করবে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি; দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারীকে হত্যা করবে। এই ব্যাপারে সীমালংঘন করবে না। যেমন সীমা লংঘন করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা। তারা আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, অজ্ঞতার যুগে বানূ নাযীর ও বানূ কুরাইযা নামক ইয়াহূদীদের দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বানূ নাযীর জয় যুক্ত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে এই প্রথা চালু হয় যে, যখন বানূ নাযীরের কোন লোক বানূ কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করতো তখন প্রতিশোধ রূপে বানূ নাযীরের ঐ লোকটিকে হত্যা করা হতো না। বরং রক্তপণ হিসেবে তার নিকট হতে এক ওয়াসাক (প্রায় চার মণ) খেজুর আদায় করা হতো। আর যখন বানূ কুরাইযার কোন লোক বানূ নাযীরের কোন লোককে হত্যা করতো তখন প্রতিশোধ রূপে তাকেও হত্যা করা হতো এবং রক্তপণ গ্রহণ করা হলে দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই ওয়াসাক খেজুর গ্রহণ করা হতো। সুতরাং মহান আল্লাহ অজ্ঞতা যুগের এই জঘন্য প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দেন।

ইমাম আবূ হাতিমের (রঃ) বর্ণনায় এই আয়াতের শান-ই-নুযূল এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আরবের দু'টি গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তারা পরস্পরে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীদার হয় এবং বলেঃ 'আমাদের দাসের

পরিবর্তে তাদের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক এবং আমাদের নারীর পরিবর্তে তাদের পুরুষকে হত্যা করা হোক। তাদের এই দাবী খণ্ডনে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই হুকুমটিও 'মানসূখ'। কুরআন মাজীদ ঘোষণা করেঃ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ অর্থাৎ প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ'। সুতরাং প্রত্যেক হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করা হবে। স্বাধীন দাসকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত, পুরুষ নারীকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত। সর্বাবস্থায় এই বিধানই চালু থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এরা পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করতো না। এই কারণেই اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং স্বাধীন লোক সবাই সমান। প্রাণের বদলে প্রাণ নেয়া হবে। হত্যাকারী পুরুষই হোক বা স্ত্রী হোক। অনুরূপভাবে নিহত লোকটি পুরুষই হোক বা স্ত্রীই হোক। যখনই কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করবে তখন তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। এরূপভাবে এই নির্দেশ দাস ও দাসীর মধ্যেও চালু থাকবে। যে কেউই প্রাণ নাশের ইচ্ছায় অন্যকে হত্যা করবে, প্রতিশোধ রূপে তাকেও হত্যা করা হবে। হত্যা ছাড়া জখম বা কোন অঙ্গ হানিরও এই নির্দেশই। হযরত ইমাম মালিক (রঃ) এই আয়াতটিকে (اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ) এই আয়াত দ্বারা মানসূখ বলেছেন।

**জিজ্ঞাস্যঃ** ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম সাওরী (রঃ), ইমাম আবূ লায়লা (রঃ) এবং ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, কোন আযাদ ব্যক্তি যদি কোন গোলামকে হত্যা করে তবে তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) হযরত হাকাম (রাঃ)-এরও এই মাযহাব। হযরত ইমাম বুখারী (রঃ), হযরত আলী বিন মাদীনী (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ)- এরও একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত সাওরী (রঃ)-এরও মাযহাব এটাই যে, যদি কোন মনিব তার গোলামকে হত্যা করে তবে তার পরিবর্তে মনিবকেও হত্যা করা হবে। এর দলীল রূপে তাঁরা এই হাদীসটি পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে আমরাও তাকে হত্যা করবো, যে তার গোলামের নাক কেটে নেবে আমরাও তার নাক কেটে নেবো এবং যে তার অণ্ডকোষ কেটে নেবে তারও এই প্রতিশোধ নেয়া হবে।' কিন্তু জমহূরের মাযহাব এই মনীষীদের উল্টো। তাঁদের মতে দাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না। কেননা, দাস এক প্রকারের মাল। সে ভুল বশতঃ নিহত হলে রক্তপণ দিতে হয় না, শুধুমাত্র তার মূল্য

আদায় করতে হয়। অনুরূপভাবে তার হাত, পা ইত্যাদির ক্ষতি হলে প্রতিশোধের নির্দেশ নেই। কাফিরের পরিবর্তে মুসলমানকে হত্যা করা হবে কিনা এ ব্যাপারে জমহূর উলামার মাযহাব তো এই যে, তাকে হত্যা করা হবে না। সহীহ বুখারী শরীফের এই হাদীসটি এর দলীল لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ অর্থাৎ 'কাফিরের পরিবর্তে মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।' এই হাদীসের উল্টো না কোন সহীহ্ হাদীস আছে, না এমন কোন ব্যাখ্যা হতে পারে যা এর উল্টো হয়। তথাপি শুধু ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, কাফিরের পরিবর্তে মুসলমানকে হত্যা করা হবে।

**জিজ্ঞাস্যঃ** হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত আত্তার (রঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে না। এর দলীল রূপে তাঁরা উপরোক্ত আয়াতটি পেশ করে থাকেন। কিন্তু 'জমহূর-ই-উলামা-ই-ইসলাম' এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা, 'সূরা-ই-মায়েদার এই আয়াতটি সাধারণ, যার মধ্যে اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া হাদীস শরীফের মধ্যেও রয়েছে اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَا دِمَاءُهُمْ অর্থাৎ মুসলমানদের রক্ত পরস্পর সমান। হযরত লায়েস (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে তবে তার পরিবর্তে তাকে (স্বামীকে) হত্যা করা হবে না।

**জিজ্ঞাস্যঃ** চার ইমাম এবং জমহূর-ই উম্মতের মাযহাব এই যে, কয়েকজন মিলে একজন মুসলমানকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে। হযরত উমার ফারূক (রাঃ)-এর যুগে সাতজন মিলে একটি লোককে হত্যা করে। তিনি সাতজনকেই হত্যা করে দেন এবং বলেন—যদি 'সুনআ' পল্লীর সমস্ত লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করতো তবে আমি প্রতিশোধ রূপে সকলকেই হত্যা করতাম।' কোন সাহাবীই তাঁর যুগে তাঁর এই ঘোষণার উল্টো করেননি। সুতরাং এই কথার উপর যেন 'ইজমা' হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে—তিনি বলেন যে, একজনের পরিবর্তে একটি দলকে হত্যা করা হবে না, বরং একজনের পরিবর্তে একজনকেই হত্যা করা হবে। হযরত মুআয (রাঃ), হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ), আবদুল মালিক বিন মারওয়ান, যুহরী (রঃ), ইবনে সীরীন (রঃ) এবং হাবীব বিন আবি সাবিত (রঃ) হতেও এই উক্তিটি বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির (রঃ) বলেন যে, এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক মত। একজন নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে একটি দলকে হত্যা

করার কোন দলীল নেই। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে সাব্যস্ত আছে যে, তিনি এই মাসআলাটি স্বীকার করতেন না। সুতরাং সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তখন এই মাসআলাটি বিবেচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী যদি হত্যাকারীর কোন অংশ ক্ষমা করে দেয় তবে সেটা অন্য কথা। অর্থাৎ সে হয়তো হত্যার পরিবর্তে রক্তপণ স্বীকার করে কিংবা হয়তো তার অংশের রক্তপণ ছেড়ে দেয় এবং স্পষ্টভাবে ক্ষমা করে দেয়। যদি সে রক্তপণের উপর সম্মত হয়ে যায় তবে সে যেন হত্যাকারীর উপর জোর জবরদস্তি না করে, বরং যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা আদায় করে। হত্যাকারীরও কর্তব্য এই যে, সে যেন তা সদ্ভাবে পরিশোধ করে, টাল-বাহানা যেন না করে।

**জিজ্ঞাস্যঃ** ইমাম মালিক (রঃ) এর প্রসিদ্ধ মাযহাব, ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর ছাত্রদের মাযহাব, ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর মাযহাব এবং একটি বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের 'কিসাস' ছেড়ে দিয়ে রক্তপণের উপর সম্মত হওয়া ঐ সময় জায়েয যখন স্বয়ং হত্যাকারীও তাতে সম্মত হয়। কিন্তু অন্যান্য মনীষীগণ বলেন যে, এতে হত্যাকারীর সম্মতির শর্ত নেই।

**জিজ্ঞাস্যঃ** পূর্ববর্তী একটি দল বলেন যে, নারীরা যদি 'কিসাসকে' ক্ষমা করে দিয়ে রক্তপণের উপর সম্মত হয়ে যায় তবে তার কোন মূল্য নেই। হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ), হযরত ইবনে শিবরামাহ (রঃ), হযরত লায়েস (রঃ) এবং হযরত আওযায়ী (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। কিন্তু অবশিষ্ট উলামা-ই-দ্বীন তাঁদের বিরোধী। এঁরা বলেন যে, যদি কোন নারীও রক্তপণের উপর সম্মত হয়ে যায় তবে কিসাস উঠে যাবে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় রক্তপণ গ্রহণ, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা। পূর্ববর্তী উম্মতদের এই সুযোগ ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈলের উপর 'কিসাস' (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) ফরয ছিল। 'কিসাস' ক্ষমা করে রক্তপণ গ্রহণের অনুমতি তাদের জন্যে ছিল না। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর (সঃ) উপর আল্লাহ তা'আলার এটাও বড় অনুগ্রহ যে, রক্তপণ গ্রহণও তাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। তাহলে এখানে তিনটি জিনিস হচ্ছে। (১) 'কিসাস', (২) রক্তপণ, (৩) ক্ষমা। পূর্ববর্তী

উম্মতদের মধ্যে শুধুমাত্র 'কিসাস' ও 'ক্ষমা' ছিল, কিন্তু 'দিয়্যাতের' বিধান ছিল না। কেউ কেউ বলেন যে, তাওরাতধারীদের জন্যে শুধু কিসাস ও ক্ষমার বিধান ছিল এবং ইঞ্জীলধারীদের জন্যে শুধু ক্ষমাই ছিল। তারপরে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ বা মেনে নেয়ার পরেও বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যেমন 'দিয়্যাত' গ্রহণ করার পরে আবার হত্যার জন্যে খড়্গ হস্ত হয়ে গেল ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'কোন লোকের যদি কেউ নিহত বা আহত হয় তবে তার তিনটির যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে। (১) সে প্রতিশোধ গ্রহণ করুক, (২) বা ক্ষমা করে দিক, (৩) অথবা রক্তপণ গ্রহণ করুক। আর যদি সে আরও কিছু করার ইচ্ছে করে তবে তাকে বাধা প্রদান কর। এই তিনটির মধ্যে একটি করার পরেও যে বাড়াবাড়ি করবে সে চিরদিনের জন্যে জাহান্নামী হয়ে যাবে (আহমাদ)'। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ করলো, অতঃপর হত্যাকারীকে হত্যা করে দিলো, এখন আমি তার নিকট হতে রক্তপণও নেবো না; বরং তাকে হত্যা করে দেবো।' অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—হে জ্ঞানীরা! তোমরা জেনে রেখো যে, 'কিসাসে'র মধ্যে মানব গোষ্ঠীর অমরত্ব রয়েছে। এর মধ্যে বড় দুরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং দু'জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তবে জানা যাবে যে, এটা জীবনেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা উচিত হবে না। নতুবা তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যার কাজ হতে বিরত থাকবে। তাহলে দু'ব্যক্তি মৃত্যু হতে বেঁচে যাচ্ছে। পূর্বের গ্রন্থসমূহের মধ্যেও তো আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, اَلْقَتْلُ اَنْفَى الْقَتْلِ অর্থাৎ হত্যা হত্যাকে বাধা দেয়, কিন্তু কুরআন পাকের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষালঙ্কারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছেঃ 'এটা তোমাদের বেঁচে থাকার কারণ। প্রথমতঃ তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়তঃ না কেউ কাউকে হত্যা করবে, না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করবে।' تَقْوٰى হচ্ছে প্রত্যেক পুণ্যের কাজ করা এবং প্রত্যেক পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার নাম।

١٨٠- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

১৮০। যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, তখন সে যদি ধন-সম্পত্তি ছেড়ে যায় তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যে বৈধভাবে অসিয়ত করা তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ হলো, ধর্মভীরুদের এটা অবশ্যকরণীয়।

١٨١- فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১৮১। অতঃপর যে ব্যক্তি শুনার পর তা পরিবর্তন করে, তবে এর পাপ তাদেরই হবে, যারা একে পরিবর্তন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

١٨٢- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ع ٢٢

১৮২। অনন্তর যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব বা পাপের আশংকা করে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার পাপ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

এই আয়াতে মা-বাপ ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে অসিয়ত করার নির্দেশ হচ্ছে। উত্তরাধিকার বিধানের পূর্বে এটা ওয়াজিব ছিল। সঠিক উক্তি এটাই। কিন্তু উত্তরাধিকারের নির্দেশাবলী এই অসিয়তের হুকুমকে মানসূখ করে দিয়েছে। প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তার জন্যে নির্ধারিত অংশ অসিয়ত ছাড়াই নিয়ে নিবে। 'সুনান' ইত্যাদির মধ্যে হযরত আমর বিন খারেজাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খুৎবার মধ্যে একথা বলতে শুনেছি-'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের জন্যে তার হক পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এখন কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত নেই।' হযরত ইবনে আব্বাস

(রাঃ) সূরা-ই-বাকারা পাঠ করেন। এই আয়াতে পৌঁছলে বলেনঃ 'এই আয়াতটি মানসূখ' (মুসনাদে আহমাদ)। তিনি এটাও বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বে বাপ-মার সাথে অন্য কেউ উত্তরাধিকারী ছিল না, অন্যদের জন্যে শুধু অসিয়ত করা হতো। অতঃপর উত্তরাধিকারের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং মালের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করার স্বাধীনতা দেয়া হয়। এই আয়াতের হুকুম মানসূখকারী হচ্ছে لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ এই আয়াতটি। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত আবূ মূসা (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত মুজাহীদ (রঃ), হযরত আতা' (রঃ), হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত মুহাম্মদ বিন সীরীন (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রঃ), হযরত রাবী' বিন আনাস (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ), হযরত মুক্বাতিল বিন হাইয়ান (রঃ), হযরত তাউস (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), হযরত শুরাইহ্ (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ) এবং হযরত যুহরী (রঃ) এরা সবাই এই আয়াতটিকে মানসূখ বলেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে কাবীর' এর মধ্যে আবূ মুসলিম ইস্পাহানী হতে এটা কিরূপে নকল করেছেন যে, এই আয়াতটি মানসূখ নয়। বরং 'মীরাসের' আয়াতটি তো এর তাফসীর। আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, তোমাদের উপর ঐ অসিয়ত ফরয করা হয়েছে যার বর্ণনা يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِىٓ اَوْلَادِكُمْ (৪ঃ ১১)এই আয়াতটির মধ্যে রয়েছে। অধিকাংশ মুফাস্সির এবং বিশ্বস্ত ফকীহগণের এটাই উক্তি। কেউ কেউ বলেন যে, অসিয়তের হুকুম উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে মানসূখ হয়েছে। কিন্তু যাদের 'মীরাস' নির্ধারিত নেই তাদের ব্যাপারে সাব্যস্ত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) হযরত মাসরূক (রঃ), হযরত তাউস (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ), হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার (রঃ) এবং হযরত আ'লা বিন যিয়াদ (রঃ) এরও মাযহাব এটাই। আমি বলি যে, হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত রাবী' বিন আনাস (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ) এবং হযরত মুকাতিল বিন হাইয়ান (রঃ)ও এই কথাই বলেন। কিন্তু এই মনীষীদের এই কথার উপর ভিত্তি করে পূর্বের ফকীহগণের পরিভাষায় এই আয়াতটি মানসূখ হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে না। কেননা, মীরাসের আয়াত দ্বারা ওরা তো এই হুকুম হতে বিশিষ্ট হয়ে গেছে, যাদের অংশ স্বয়ং শরীয়ত নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং ওরাও-যারা এর পূর্বে এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, আত্মীয় সাধারণ। তাদের উত্তরাধিকার নির্ধারিত থাক আর নাই থাক। তাহলে এখন

অসিয়ত ওদের জন্যে রইলো যারা উত্তরাধিকারী নয়; এবং যারা উত্তরাধিকারী তাদের জন্যে রইলো না। এই কথাটি এবং অন্যান্য কয়েকজন মনীষীর এই উক্তি যে, 'অসিয়তের নির্দেশ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল এবং ওটাও নিষ্প্রয়োজন ছিল'। এই দু'টোর ভাবার্থ প্রায় একই হয়ে গেল। কিন্তু যাঁরা অসিয়তের এই হুকুমকে ওয়াজিব বলে থাকেন এবং রচনার বাক রীতি দ্বারাও বাহ্যত এটাই বুঝা যাচ্ছে, তাদের নিকট তো এই আয়াতটি মানসূখ হওয়াই সাব্যস্ত হবে, যেমন অধিকাংশ মুফাস্সির এবং বিশ্বস্ত ফকীহগণের উক্তি রয়েছে। অতএব, পিতা মাতা ও মীরাস প্রাপক আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে অসিয়ত করা সর্বসম্মতিক্রমেই মানসূখ, এমনকি নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে হক দিয়ে ফেলেছেন, এখন উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত নেই। মীরাসের আয়াতের হুকুমটি পৃথক এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ওটা ফরয। যেসব উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাদের উপর হতে এই আয়াতের নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে উঠে গেছে। এখন বাকি থাকলো ঐ আত্মীয়গণ যাদের জন্যে কোন উত্তরাধিকার নির্ধারিত নেই। তাদের জন্যে মালের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করা মুস্তাহাব। এর আংশিক হুকুম তো এই আয়াত দ্বারাও বের হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ হাদীস শরীফে এর হুকুম পরিষ্কারভাবে রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তির নিকট কিছু জিনিস রয়েছে এবং সে অসিয়ত করতে ইচ্ছে করে তার জন্যে উচিত নয় যে, সে অসিয়ত লিখে না দিয়ে দু'টি রাত্রিও অতিবাহিত করে।' হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত উমার ফারূকের পুত্র বলেনঃ 'এই নির্দেশ শুনার পর বিনা অসিয়তে আমি একটি রাত্রিও কাটাইনি।' আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার করা এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করা সম্বন্ধে বহু আয়াত এবং হাদীস এসেছে। একটি হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার পথে যে অর্থ ব্যয় করবে, আমি ওরই কারণে তোমাকে পবিত্র করবো এবং তোমার মৃত্যুর পরেও আমার সৎ বান্দাদের দু'আর কারণ করে দেবো।' خَيْرًا -এর ভাবার্থ হচ্ছে এখানে মাল। অধিকাংশ বড় বড় মুফাস্সির এই তাফসীরই করেছেন।

কোন কোন মুফাস্সিরের উক্তি এই যে, মাল অল্পই হোক বা অধিকই হোক ওর জন্যে শরীয়তে অসিয়তের নির্দেশ রয়েছে। যেমন অল্প ও বেশী উভয় মালেই মীরাস রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, অসিয়তের হুকুম শুধুমাত্র বেশী মালে

রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,একজন কুরায়েশী মারা যায় এবং সে তিন চারশো স্বর্ণ মুদ্রা রেখে যায়। সে কোন অসিয়ত করেনি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, এই মাল অসিয়তের যোগ্যই নয়। আল্লাহ তা'আলা তো إِن تَرَكَ خَيْرًا বলেছেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর গোত্রের এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যান। তাকে কেউ অসিয়ত করতে বললে হযরত আলী (রাঃ) তাকে বলেনঃ 'অসিয়ত তো خَيْرٌ অর্থাৎ অধিক মালে হয়ে থাকে। তুমি তো অল্প মাল ছেড়ে যাচ্ছো। তুমি এ মাল তোমার সন্তানদের জন্য রেখে যাও।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ষাটটি স্বর্ণমুদ্রা ছেড়ে যায়নি সে خَيْرٌ ছেড়ে যায়নি। অর্থাৎ অসিয়ত করা তার দায়িত্বে নেই। তাউস (রঃ) আশিটি স্বর্ণ মুদ্রার কথা বলেছেন। কাতাদাহ (রঃ) এক হাজারের কথা বলে থাকেন। مَعْرُوْفٌ -এর অর্থ হচ্ছে নম্রতা এবং অনুগ্রহ। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, অসিয়ত করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। অসিয়তের ব্যাপারে উত্তম পন্থা অবলম্বন করা উচিত, অন্যায় পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। যেন উত্তরাধিকারীদের কোন ক্ষতি না হয়। মাত্রাধিক্য ও বাজে খরচ মোটেই শোভনীয় নয়। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ধনী লোক এবং আমার উত্তরাধিকারিণী শুধুমাত্র একটি মেয়ে। সুতরাং আপনি আমাকে দুইতৃতীয়াংশ মাল অসিয়ত করার অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না।' তিনি বলেনঃ 'অর্ধেকের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না।' তিনি বলেনঃ 'এক তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'বেশ এক তৃতীয়াংশ মাল অসিয়ত কর, তবে এটাও বেশী। তোমার উত্তরাধিকারিণীকে তুমি যে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের সামনে হাত পাতবে এর চেয়ে বরং তাদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাওয়াই উত্তম।' সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'মানুষ যদি এক তৃতীয়াংশকে ছেড়ে এক চতুর্থাংশের উপর আসতো! কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক তৃতীয়াংশের অনুমতি প্রদান করতঃ এটাও বলেছেন যে, এক তৃতীয়াংশও বেশী।' মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত হানযালা (রাঃ)-এর দাদা হানীফা (রাঃ) তাঁর বাড়ীতে প্রতিপালিত একটি পিতৃহীন ছেলের জন্যে একশোটি উট অসিয়ত করেন। তাঁর সন্তানদের নিকট এটা কঠিন ঠেকে। ব্যাপারটা তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর হানীফা (রাঃ) বলেনঃ 'আমি আমার একটি ইয়াতীমের জন্যে একশোটি উট অসিয়ত করেছি।' তখন নবী

(সঃ) বলেন ঃ 'না, না, না। সাদকায় পাঁচটি দাও, নচেৎ দশটি। তা না হলে পনেরটি, তা না হলে বিশটি' না হলে পঁচিশটি' না হলে ত্রিশটি তা না হলে পঁয়ত্রিশটি। তুমি যদি আরও বেশী কর তবে চল্লিশটি। দীর্ঘতার সাথে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি অসিয়তকে পরিবর্তন করবে, তাতে কম-বেশী করবে কিংবা তা গোপন করবে, এর পাপের বোঝা সেই পরিবর্তনকারীকেই বইতে হবে। অসিয়তকারীর প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাব্যস্ত হয়েই গেছে। আল্লাহ পাক অসিয়তকারীর অসিয়তের বিশুদ্ধতার কথাও জানেন এবং পরিবর্তনকারীর পরিবর্তনও জানেন। কোন কথা ও রহস্য তাঁর নিকট গোপন থাকে না। جَنَفٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভুল। যেমন, কোন উত্তরাধিকারীকে কোনও প্রকারে বেশী দেয়ায়ে দেয়া। যেমন বলে যে, অমুক জিনিস অমুকের হাতে এত এত দামে বেচে দেওয়া হোক ইত্যাদি। এটা হয় ভুল বশতঃই হোক বা অত্যধিক ভালবাসার কারণে অনিচ্ছা বশতঃই হোক বা পাপের উপরেই হোক। এরূপ স্থলে অসিয়তকারী যার নিকট অসিয়তের কথা প্রকাশ করে গেল, সে যদি কিছু রদবদল করে তবে কোন পাপ হবে না। অসিয়তকে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী চালু করা উচিত, যেন মৃত ব্যক্তিও আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচতে পারে, হকদারগণও তাদের হক পেয়ে যায় এবং অসিয়তও শরীয়ত অনুযায়ী পুরো হয়। এই অবস্থায় পরিবর্তনকারীর কোন পাপ হবে না।' মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'জীবনে অত্যাচার করে সাদকা প্রদানকারীর সাদকা ঐ ভাবেই অগ্রাহ্য করা হয়, যেভাবে মৃত্যুর সময় ভুলকারীর অসিয়ত অগ্রাহ্য করা হয়।' তাফসীর-ই-ইবনে 'মিরদুওয়াই' গ্রন্থেও এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবি হাতিম বলেন যে, এই হাদীসের বর্ণনাকারী, ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ এতে ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা উরওয়ার কথা। ওলীদ বিন মুসলিম এটা আওযায়ী হতে বর্ণনা করেছেন এবং উরওয়ার পরে সনদ গ্রহণ করা হয়নি। ইবনে মিরদুওয়াইও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, অসিয়তে কম বেশী করা কবীরা গুনাহ্। কিন্তু এই হাদীসটির মারফু' হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। এই ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা মুসনাদে আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মানুষ সত্তর বছর পর্যন্ত ভাল লোকের কাজের মত কাজ করতে থাকে, কিন্তু অসিয়তের ব্যাপারে অত্যাচার করে, কাজেই পরিণাম খারাপ কাজের উপর হওয়ায় সে জাহান্নামী হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে মানুষ সত্তর বছর ধরে অসৎ কাজ করতে থাকে কিন্তু অসিয়তের ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসাফ করে, কাজেই তার শেষ আমল ভাল হওয়ায় সে বেহেশতী হয়ে যায়।' অতঃপর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'যদি তোমরা চাও তবে কুরআন পাকের এই আয়াতটি পাঠ করে নাও تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا অর্থাৎ 'এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তা অতিক্রম করো না।

১৮৩। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও রোযাকে অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করা হলো যেন তোমরা সংযমশীল হতে পারো।

١٨٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ○

১৮৪। ওটা গণিত কয়েক দিবস কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ পীড়িত বা প্রবাসী হয়, তার জন্যে অপর কোন দিবস হতে গণনা করবে; আর যারা ওতে অক্ষম তারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে ভোজ্য দান করবে; অতএব যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার জন্যে কল্যাণ এবং তোমরা যদি বুঝে থাকো তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।

١٨٤- اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তারা যেন রোযাব্রত পালন করে। রোযার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালনের খাঁটি নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকা। এর

উপকারিতা এই যে, এর ফলে মানবাত্মা পাপ ও কালিমা থেকে সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার ও পবিত্র হয়ে যায়। এর সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই রোযার হুকুম শুধুমাত্র তাদের উপরেই হচ্ছে না বরং তাদের পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতিও রোযার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য এটাও যে, উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ) যেন এই কর্তব্য পালনে পূর্বের উম্মতদের পিছনে না পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'প্রত্যেকের জন্যে একটা পন্থা ও রাস্তা রয়েছে, আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকেই একই উম্মত করে দিতেন; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন, তোমাদের উচিত যে তোমরা পুণ্যের কাজে অগ্রগামী থাকবে।' এই বর্ণনাই এখানেও হচ্ছে যে এই রোযা তোমাদের উপর ঐ রকমই ফরয, যেমন ফরয ছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। রোযার দ্বারা শরীরের পবিত্রতা লাভ হয় এবং শয়তানের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হে যুবকবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ রয়েছে সে বিয়ে করবে, আর যার ক্ষমতা নেই সে রোযা রাখবে, এটাই তার জন্যে অণ্ডকোষ কর্তিত হওয়া। অতঃপর রোযার জন্যে দিনের সংখ্যা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এটা কয়েকটি দিন মাত্র যাতে কারও উপর ভারী না হয় এবং কেউ আদায়ে অসমর্থ না হয়ে পড়ে; বরং আগ্রহের সাথে তা পালন করে। প্রথমে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার নির্দেশ ছিল। অতঃপর রমযানের রোযার নির্দেশ হয় এবং পূর্বের নির্দেশ উঠে যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ আসছে। হযরত মু'আয (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আতা' (রাঃ), হযরত কাতাদাহ (রাঃ)-এবং হযরত যহ্হাক (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে প্রতি মাসে তিনটি রোযার নির্দেশ ছিল, যা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর উম্মতের জন্যে পরিবর্তিত হয় এবং তাদের উপর এই বরকতময় মাসে রোযা ফরয করা হয়।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও পূর্ণ একমাস রোযা ফরয ছিল। একটি 'মারফূ' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'রমযানের রোযা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয ছিল।' হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ 'পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে, এ'শার নামায আদায় করার পর যখন তারা শুয়ে যেত তখন তাদের উপর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেতো। 'পূর্ববর্তী' হতে ভাবার্থ হচ্ছে আহলে কিতাব। এর

পরে বলা হচ্ছে–'রামযান মাসে যে ব্যক্তি রুগ্ন হয়ে পড়ে ঐ অবস্থায় তাকে কষ্ট করে রোযা করতে হবে না। পরে যখন সে সুস্থ হবে তখন তা আদায় করে নেবে। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে ব্যক্তি সুস্থ থাকতো এবং মুসাফিরও হতো না তার জন্যেও এই অনুমতি ছিল যে, হয় সে রোযা রাখবে বা রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে ভোজ্য দান করবে এবং একজনের বেশী মিসকীনকে খাওয়ানো উত্তম ছিল। কিন্তু মিসকীনকে ভোজ্য দান অপেক্ষা রোযা রাখাই বেশী মঙ্গলজনক কাজ ছিল। হযরত ইবনে মাসঊদ (রঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত তাউস (রঃ), হযরত মুকাতিল (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ এটাই বলে থাকেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)' বলেনঃ 'নামায ও রোযা তিনটি অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। নামাযের তিনটি অবস্থা হচ্ছেঃ (১) মদীনায় এসে ষোল সতেরো মাস ধরে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা; অতঃপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে মক্কা শরীফের দিকে মুখ করা হয়। (২) পূর্বে নামাযের জন্যে একে অপরকে ডাকতেন এবং একত্রিত হতেন; অবশেষে এতে তাঁরা অসমর্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আবদ-ই-রব্বিহী (রাঃ) নামক একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখার মতই আমি স্বপ্ন দেখেছি; কিন্তু যদি বলি যে, আমি নিদ্রিত ছিলাম না তবে আমার সত্য কথাই বলা হবে। (স্বপ্ন) এই যে, সবুজ রঙ্গের হুল্লা (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত এক ব্যক্তি কিবলার দিকে মুখ করে বলছেন–اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দু'বার। এভাবে তিনি আযান শেষ করেন। ক্ষণেক বিরতির পর তিনি পূর্বের কথাগুলো আবার উচ্চারণ করেন কিন্তু এবারে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ কথাটি দু'বার অতিরিক্ত বলেন। 'তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন–'বেলালকে (রাঃ) এটা শিখিয়ে দাও। সে আযান দেবে।' সুতরাং সর্বপ্রথম হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমারও (রাঃ) এসে এই স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেই হযরত যায়েদ (রাঃ) এসে গিয়েছিলেন। (৩) পূর্বে প্রচলন এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়াচ্ছেন, তাঁর কয়েক রাক'আত পড়া হয়ে গেছে এমন সময় কেউ আসছেন। কয় রাক'আত পড়া হয়েছে এটা তিনি ইঙ্গিতে কাউকে জিজ্ঞেস করছেন। তিনি বলছেন–'এক

রাক'আত বা দু'রাক'আত। তিনি তখন ঐ রাক'আতগুলো পড়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হচ্ছেন। একদা হযরত মু'আয (রাঃ) আসছেন এবং বলছেন–'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যে অবস্থাতেই পাবো সেই অবস্থাতেই তাঁর সাথে মিলিত হয়ে যাবো এবং যে নামায ছুটে গেছে তা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সালাম ফেরাবার পর পড়ে নেবো। সুতরাং তিনি তাই করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সালাম ফেরানোর পর তাঁর ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মু'আয (রাঃ) তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা বের করেছেন। তোমরাও এখন হতে এরূপই করবে। এই তো হলো নামাযের তিনটি পরিবর্তন।

রোযার তিনটি পরিবর্তন এইঃ (১) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতেন এবং আশূরার রোযা রাখতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ অবতীর্ণ করে রমযানের রোযা ফরয করেন।

(২) প্রথমতঃ এই নির্দেশ ছিল যে, যে চাইবে রোযা রাখবে এবং যে চাইবে রোযার পরিবর্তে মিসকীনকে ভোজ্য দান করবে। অতঃপর فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ঐ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন তাতে রোযা পালন করে।' সুতরাং যে ব্যক্তি বাড়ীতে অবস্থানকারী হয় এবং মুসাফির না হয়, সুস্থ হয় রুগ্ন না হয়, তার উপর রোযা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তবে রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্যে অবকাশ থাকে। আর এমন বৃদ্ধ, যে রোযা রাখার ক্ষমতাই রাখে না সে 'ফিদইয়াহ' দেয়ার অনুমতি লাভ করে।

(৩) পূর্বে রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার আগে আগে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল বটে; কিন্তু ঘুমিয়ে যাবার পর রাত্রির মধ্যেই জেগে উঠলেও পানাহার ও সহবাস তার জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর একদা 'সরমা' নামক একজন আনসারী (রাঃ) সারাদিন কাজ কর্ম করে ক্লান্ত অবস্থায় রাত্রে বাড়ী ফিরে আসেন এবং এ'শার নামায আদায় করেই তাঁর ঘুম চলে আসে। পরদিন কিছু পানাহার ছাড়া তিনি রোযা রাখেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'ব্যাপার কি?' তখন তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। এদিকে তাঁর ব্যাপারে তো এই ঘটনা ঘটে আর ওদিকে হযরত উমার (রাঃ) ঘুমিয়ে যাওয়ার পর জেগে উঠে স্ত্রী সহবাস করে বসেন এবং রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে এই দোষ স্বীকার করেন । ফলে اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ হতে ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ (২ঃ ১৮৭) পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মাগরিব থেকে নিয়ে সুবহে সাদেক পর্যন্ত রমযানের রাত্রে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দেয়া হয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পূর্বে আশূরার রোযা রাখা হতো। যখন রমযানের রোযা ফরয করে দেয়া হয় তখন আর আশূরার রোযা বাধ্যতামূলক থাকে না; বরং যিনি ইচ্ছা করতেন, রাখতেন এবং যিনি চাইতেন না, রাখতেন না।

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ (২ঃ ১৭৪)-এর ভাবার্থ হযরত মু'আয (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইচ্ছে করলে কেউ রোযা রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। বরং মিসকীনকে ভোজ্য দান করতেন। হযরত সালমা বিন আকও'য়া (রাঃ) হতে সহীহ বুখারী শরীফে একটি বর্ণনা এসেছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে ব্যক্তি ইচ্ছে করতো রোযা ছেড়ে দিয়ে 'ফিদইয়া' দিয়ে দিতো। অতঃপর তার পরবর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এটা 'মানসূখ' (রহিত) হয়ে যায়। হযরত উমার (রাঃ) ও এটাকে মানসূখ বলেছেন। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, এটা মানসূখ নয় বরং এর ভাবার্থ হচ্ছে বৃদ্ধ পুরুষ বা বৃদ্ধা নারী, যারা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না। ইবনে আবি লাইলা (রঃ) বলেনঃ 'আমি আতা' (রঃ)-এর নিকট রমযান মাসে আগমন করি। দেখি যে, তিনি খানা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বলেনঃ 'হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি আছে যে, এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতটিকে মানসূখ করে দিয়েছে। এখন এই হুকুম শুধুমাত্র শক্তিহীন, অচল বৃদ্ধদের জন্যে রয়েছে।' মোট কথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজ আবাসে আছে এবং সুস্থ ও সবল অবস্থায় রয়েছে তার জন্যে এই নির্দেশ নয়। বরং তাকে রোযাই রাখতে হবে। হাঁ, তবে খুবই বয়স্ক, বৃদ্ধ এবং দুর্বল লোক যাদের রোযা রাখার ক্ষমতা নেই, তারা রোযাও রাখবে না এবং তাদের উপর রোযা কাযাও জরুরী নয়। কিন্তু যদি সে ধনী হয় তবে তাকে কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে কি হবে না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর একটি উক্তি তো এই যে, যেহেতু তার রোযা করার শক্তি নেই, সুতরাং সে নাবালক ছেলের মতই। তার উপর যেমন কাফ্ফারা নেই

তেমনই এর উপরও নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কাউকেও ক্ষমতার অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তার দায়িত্বে কাফ্ফারা রয়েছে। অধিকাংশ আলেমেরও সিদ্ধান্ত এটাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষীগণের তাফসীর হতেও এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে। হযরত ইমাম বুখারী (রঃ)-এর এটাই পছন্দনীয় মত। তিনি বলেন যে, খুব বেশী বয়স্ক বৃদ্ধ যার রোযা রাখার শক্তি নেই সে 'ফিদইয়া'ই দিয়ে দেবে। যেমন হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) শেষ বয়সে অত্যন্ত বার্ধক্য অবস্থায় দু'বছর ধরে রোযা রাখেননি এবং প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে একটি মিসকীনকে গোশ্ত-রুটি আহার করাতেন।

'মুসনাদ-ই-আবূ ইয়ালা' গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন হযরত আনাস (রাঃ) রোযা রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়েন তখন রুটি ও গোশত তৈরি করে ত্রিশ জন মিসকীনকে আহার করিয়ে দেন। অনুরূপভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকেরা যখন তাদের নিজেদের ও সন্তানদের জীবনের ভয় করবে এদের ব্যাপারেও ভীষণ মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তারা রোযা রাখবে না, বরং 'ফিদইয়া' দেবে এবং যখন ভয় দূর হয়ে যাবে তখন রোযাও কাযা করে নেবে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, শুধু ফিদইয়া যথেষ্ট, কাযা করার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ আবার বলেন যে; রোযাই রাখবে, 'ফিদইয়া' বা কাযা নয়। আমি (ইবনে কাসীর) এই মাসআলাটি স্বীয় পুস্তক 'কিতাবুস্ সিয়াম' এর মধ্যে বিস্তারিতভাবে লিখেছি।

---

**১৮৫। রমযান মাস-যার মধ্যে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শক এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে, সে যেন রোযা রাখে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা প্রবাসী তার জন্যে অপর কোন দিন হতে গণনা করবে;**

١٨٥- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ

| | |
|---|---|
| عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ | তোমাদের পক্ষে যা সুসাধ্য আল্লাহ তাই ইচ্ছে করেন ও তোমাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য তা ইচ্ছে করেন না এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা আল্লাহকে মহিমান্বিত কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। |

এখানে রমযান মাসের সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই পবিত্র মাসেই কুরআন কারীম অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর 'সহীফা' রমযানের প্রথম রাত্রে, 'তাওরাত' ৬ তারিখে, 'ইঞ্জীল' ১৩ তারিখে এবং কুরআন কারীম ২৪ তারিখে অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, 'যাবুর' ১২ তারিখে এবং 'ইঞ্জীল' ১৮ তারিখে অবতীর্ণ হয়। পূর্বে সমস্ত 'সহীফা' এবং 'তাওরাত,' 'ইঞ্জীল' ও 'যাবুর' যে যে নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, একবারই অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু 'কুরআন কারীম' 'বায়তুল ইয্যাহ' হতে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তো একবারই অবতীর্ণ হয়। অতঃপর মাঝে মাঝে প্রয়োজন হিসেবে পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এবং اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ এবং اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এর ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ কুরআন কারীমকে একই সাথে প্রথম আকাশের উপরে রমযান মাসের 'কদরের' রাত্রে অবতীর্ণ করা হয় এবং ঐ রাতকে لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ অর্থাৎ বরকতময় রাতও বলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী হতে এটাই বর্ণিত আছে। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, কুরআন মাজীদ তো বিভিন্ন বছর অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে রমযান মাসে ও 'কদরের' রাত্রে অবতীর্ণ হওয়ার ভাবার্থ কি? তখন তিনি উত্তরে এই ভাবার্থই বর্ণনা করেন (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই প্রভৃতি)। তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, অর্ধ রমযানে কুরআনে কারীম দুনিয়ার

আকাশে অবতীর্ণ হয় এবং 'বায়তুল ইয্যায়' রাখা হয়। অতঃপর প্রয়োজন মত ঘটনাবলী ও প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হতে থাকে এবং বিশ বছরে পূর্ণ হয়। অনেকগুলো আয়াত কাফিরদের কথার উত্তরেও অবতীর্ণ হয়। তাদের একটা প্রতিবাদ এও ছিল যে, কুরআন কারীম সম্পূর্ণটা একই সাথে অবতীর্ণ হয় না কেন? ওরই উত্তরে বলা হয় لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا অর্থাৎ 'যেন আমি এর দ্বারা তোমার অন্তরকে দৃঢ় রাখি এবং ওটা আমি স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছি।' (২৫ঃ ৩২)

অতঃপর কুরআন মাজীদের প্রশংসায় বলা হচ্ছে যে, এটা বিশ্ব মানবের জন্যে পথ প্রদর্শক এবং এতে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী রয়েছে। ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে সঠিক পথে পৌঁছতে পারেন। এটা সত্য ও মিথ্যা, হারাম ও হালালের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী। সুপথ ও কুপথ এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী। পূর্ববর্তী কোন একজন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, শুধু রমযান বলা মাকরূহ, شَهْرُ رَمَضَانَ অর্থাৎ রমযানের মাস বলা উচিত। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা 'রমযান' বলো না। এটা আল্লাহ তা'আলার নাম। তোমরা شَهْرُ رَمَضَانَ অর্থাৎ 'রমযানের মাস' বলতে থাকো।' হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব (রঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ বিন সাবিতের (রঃ) মাহযাব এর উল্টো। 'রামযান' না বলা সম্বন্ধে একটি মারফূ' হাদীসও রয়েছে। কিন্তু সনদ হিসেবে এটা একেবারেই ভিত্তিহীন।

ইমাম বুখারীও (রঃ) এর খণ্ডনে 'অধ্যায়' রচনা করে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটিতে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস রেখে ও সৎ নিয়্যাতে রমযানের রোযা রাখে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। মোট কথা এই আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রমযানের চন্দ্র উদয়ের সময় যে ব্যক্তি বাড়ীতে অবস্থান করবে, মুসাফির হবে না এবং সুস্থ ও সবল থাকবে, তাকে বাধ্যতামূলকভাবেই রোযা রাখতে হবে। পূর্বে এদের জন্যে রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি ছিল; কিন্তু এখন আর অনুমতি রইল না। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্যে রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতির কথা বর্ণনা করেন। এদের জন্যে বলা হচ্ছে যে, এরা এই সময় রোযা রাখবে না এবং পরে আদায় করে নেবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শরীরে কোন কষ্ট রয়েছে যার ফলে তার পক্ষে রোযা রাখা কষ্টকর হচ্ছে কিংবা সফরে রয়েছে সে রোযা ছেড়ে দেবে এবং

এভাবে যে কয়টি রোযা ছুটে যাবে তা পরে আদায় করে নেবে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, এরূপ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণা প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের নির্দেশাবলী সহজ করে দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে কষ্ট হতে রক্ষা করেছেন।

এখানে এই আয়াতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত গুটি কয়েক জিজ্ঞাস্য বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হচ্ছেঃ (১) পূর্ববর্তী মনীষীগণের একটি দলের ধারণা এই যে, কোন লোক বাড়ীতে অবস্থানরত অবস্থায় রমযানের চাঁদ উদয়ের ফলে রমযানের মাস এসে পড়ে অতঃপর মাসের মধ্যেই তাকে সফরে যেতে হয় এই সফরে রোযা ছেড়ে দেয়া তার জন্যে জায়েয নয়। কেননা এরূপ লোকদের জন্যে রোযা রাখার পরিষ্কার নির্দেশ কুরআন পাকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। হাঁ, তবে ঐ লোকদের সফরের অবস্থায় রোযা ছেড়ে দেয়া জায়েয, যারা সফরে রয়েছে এমতাবস্থায় রমযান মাস এসে পড়েছে। কিন্তু এই উক্তিটি অসহায়। আবূ মুহাম্মদ বিন হাযাম স্বীয় পুস্তক 'মুহাল্লীর' মধ্যে সাহাবা (রাঃ) এবং তাবেঈগণের (রঃ) একটি দলের এই মাযহাবই নকল করেছেন। কিন্তু এতে সমালোচনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানুল মুবারক মাসে মক্কা বিজয় অভিযানে রোযার অবস্থায় রওয়ানা হন। 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছে রোযা ছেড়ে দেন এবং সাহাবীগণকেও রোযা ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

(২) সাহাবী (রাঃ) এবং তাবেঈগণের একটি দল বলেছেন যে, সফরের অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব। কেননা, কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছেঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ 'তার জন্যে অপর দিন হতে গণনা করবে।' কিন্তু সঠিক উক্তি হচ্ছে জমহূরের মাযহাব। তা হচ্ছে এই যে, তার জন্যে স্বাধীনতা রয়েছে, সে রাখতেও পারে, নাও রাখতে পারে। কেননা, রমযান মাসে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সফরে বের হতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রোযা রাখতেন আবার কেউ কেউ রাখতেন না। এমতাবস্থায় রোযাদারগণ বে-রোযাদারগণের উপর এবং বে-রোযাদারগণ রোযাদারগণের উপর কোনরূপ দোষারোপ করতেন না। সুতরাং যদি রোযা ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব হতো তবে রোযাদারগণকে অবশ্যই রোযা রাখতে নিষেধ করা হতো। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সফরের অবস্থায় রোযা রাখা সাব্যস্ত আছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'রমযানুল মুবারক মাসে কঠিন গরমের দিনে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে

এক সফরে ছিলাম। কঠিন গরমের কারণে আমরা মাথায় হাত রেখে রেখে চলছিলাম। আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ছাড়া আর কেউই রোযাদার ছিলেন না।

(৩) ইমাম শাফিঈ (রঃ) সহ আলেমগণের একটি দলের ধারণা এই যে, সফরে রোযা না রাখা অপেক্ষা রোযা রাখাই উত্তম। কেননা, সফরের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোযা রাখা সাব্যস্ত আছে। অন্য একটি দলের ধারণা এই যে, রোযা না রাখাই উত্তম। কেননা, এর দ্বারা 'রুখসাতের' (অবকাশের) উপর আমল করা হয়। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, সফরে রোযা রাখা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে দেয় সে উত্তম কাজ করে এবং যে ভেঙ্গে দেয় না তার উপরে কোন পাপ নেই।' অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে অবকাশ দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর।'

তৃতীয় দলের উক্তি এই যে, রোযা রাখা ও না রাখা দুটোই সমান। তাঁদের দলীল হচ্ছে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত নিম্নের এই হাদীসটিঃ হযরত হামযা বিন আমর আসলামী (রাঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি প্রায়ই রোযা রেখে থাকি। সুতরাং সফরেও কি আমার রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'ইচ্ছে হলে রাখো, না হলে ছেড়ে দাও' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।' কোন কোন লোকের উক্তি এই যে, যদি রোযা রাখা কঠিন হয় তবে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে দেখেন যে, তাকে ছায়া করা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'ব্যাপার কি?' জনগণ বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি রোযাদার'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'সফরে রোযা রাখা পুণ্য কাজ নয় (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। এটা স্মরণীয় বিষয় যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সফরের অবস্থাতেও রোযা ছেড়ে দেয়া মাকরূহ মনে করে, তার জন্যে রোযা ছেড়ে দেয়া জরুরী এবং রোযা রাখা হারাম। মুসনাদ-ই-আহমাদ ইত্যাদির মধ্যে হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত জাবির (রাঃ) প্রভৃতি মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবকাশকে গ্রহণ করে না, আরাফাতের পর্বত সমান তার পাপ হবে।

(৪) চতুর্থ জিজ্ঞাস্য হলোঃ কাযা রোযাসমূহ ক্রমাগত রাখাই কি জরুরী না পৃথক পৃথকভাবে রাখলেও কোন দোষ নেই? কতকগুলো লোকের মাযহাব এই

যে, কাযা রোযাকে 'হালী' রোযার মতই পুরো করতে হবে। একের পরে এক এভাবে ক্রমাগত রোযা রেখে যেতে হবে। অন্য মাযহাব এই যে, ক্রমাগত রোযা রাখা ওয়াজিব নয়। এক সাথেও রাখতে পারে আবার পৃথক পৃথকভাবে অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছেড়ে ছেড়েও রাখতে পারে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদেরও এই উক্তিই রয়েছে এবং দলীল প্রমাণাদি দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে। রমযান মাসে ক্রমাগতভাবে এজন্যেই (রোযা) রাখতে হয় যে, ওটা সম্পূর্ণ রোযারই মাস। আর রমযানের মাস শেষ হওয়ার পর ওটা শুধুমাত্র গণনা করে পুরো করতে হয়। তা যে কোন দিনেই হতে পারে। এ জন্যেই তো কাযার নির্দেশের পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের যে সহজ পন্থা বাতলিয়েছেন, তাঁর এই নিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন। 'মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে একটি হাদীসে রয়েছে হযরত আবূ উরওয়া (রাঃ) বলেনঃ 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম এমন সময়ে তিনি আগমন করেন এবং তাঁর মাথা হতে পানির  ফোটা টপটপ করে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যে, সবে মাত্র তিনি অযু বা গোসল করে আসলেন। নামায সমাপনান্তে জনগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেঃ হুজুর (সঃ)! অমুক কাজে কোন ক্ষতি আছে কি এবং অমুক কাজে কোন ক্ষতি আছে কি? অবশেষে তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর দ্বীন সহজের মধ্যেই রয়েছে। এটাই তিনবার বলেন।'

'মুসনাদ-ই-আহমাদ' এরই আর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা সহজ কর,কঠিন করো না এবং সান্ত্বনা দান কর, ঘৃণার উদ্রেক করো না।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মু'আয (রাঃ) ও হযরত আবূ মূসাকে (রাঃ) ইয়ামন পাঠাবার সময় বলেনঃ 'তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ প্রদান করবে, ঘৃণা করবে না, পরস্পর এক মতের উপর থাকবে, মতভেদ সৃষ্টি করবে না।' সুনান ও মুসনাদ সমূহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি  সুদৃঢ় এবং নরম ও সহজ বিশিষ্ট ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।' হযরত মুহ্জিন বিন আদরা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযের অবস্থায় দেখেন। তিনি তাকে কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা যুক্ত দৃষ্টির সাথে লক্ষ্য করতে থাকেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'তুমি কি মনে কর যে, সে সত্য অন্তঃকরণ নিয়ে নামায পড়ছে?' বর্ণনাকারী বলেন 'আমি বলিঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সমস্ত মদীনাবাসী অপেক্ষা সে বেশী নামাযী।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ' তাকে শুনায়োনা, না

জানি এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।' তারপরে তিনি বলেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের উপর সহজের ইচ্ছা করেছেন, তিনি তাদের উপর কঠিনের ইচ্ছে করেননি।' সুতরাং আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, রুগ্ন, মুসাফির প্রভৃতিকে অবকাশ দেয়া এবং তাদেরকে অপারগ মনে করার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তাঁর বান্দাদের প্রতি ওটাই যা তাদের জন্যে সহজ সাধ্য এবং তাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য তার ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা পোষণ করেন না। আর 'কাযার' নির্দেশ হচ্ছে গণনা পুরো করার জন্যে। সুতরাং তাঁর এই দয়া, নিয়ামত এবং সুপথ প্রদর্শনের জন্যে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা তাঁর বান্দাদের উচিত। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা হজ্বব্রত সম্পর্কে বলেছেনঃ

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ অর্থাৎ 'যখন তোমরা হজ্বের নির্দেশাবলী পুরো করে ফেলো তখন তোমরা আল্লাহর যিক্র করতে থাকো।' (২ঃ ২০০)

অন্য জায়গায় তিনি জুম'আর নামাযের সম্বন্ধে বলেছেনঃ 'যখন নামায পুরো হয়ে যায় তখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় ও খাদ্য অনুসন্ধান কর এবং খুব বেশী করে আল্লাহর যিক্র করতে থাকো; যেন তোমরা মুক্তি পেয়ে যাও।' অন্য স্থানে রয়েছেঃ

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ অর্থাৎ 'তুমি সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং অস্তমিত হওয়ার পূর্বে তোমার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা কর।' (৫০ঃ৩৯) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণীয় পন্থা এই যে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আল্লাহ তা'আলার হামদ, তাসবীহ এবং তাকবীর পাঠ করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নামাযের সমাপ্তি শুধুমাত্র তাঁর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির মাধ্যমেই জানতে পারতাম। এই আয়াতটি এই বিষয়ের দলীল যে, 'ঈদুল ফিৎরেও তাকবীর পাঠ করা উচিত।

দাউদ বিন আলী ইসবাহানী যাহেরীর (রঃ) মাযহাব এই যে, এই ঈদে তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব। কেননা, এই বিষয়ে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ) অর্থাৎ 'যেন তোমরা তাকবীর পাঠ কর।' ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব এর সম্পূর্ণ উল্টো। তাঁর মাযহাব অনুসারে এই ঈদে তাকবীর পাঠ 'মাসনূন' নয়। অবশিষ্ট মনীষীবৃন্দ এটাকে 'মুসতাহাব' বলে থাকেন, যদিও কোন কোন শাখার ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন করতঃ তাঁর ফরযগুলো আদায় করে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত থেকে এবং তাঁর সীমারেখার হিফাযত করে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।

**১৮৬। এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও-নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে-তা হলেই তারা সিদ্ধ মনোরথ হতে পারবে।**

١٨٦- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

একজন পল্লীবাসী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের প্রভু কি নিকটে আছেন, না দূরে আছেন? যদি নিকটে থাকেন তবে চুপে চুপে ডাকবো আর যদি দূরে থাকেন তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকবো।' এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব হয়ে যান। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (মুসনাদ -ই-ইবনে আবি হাতিম)। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সাহাবীদের (রাঃ) 'আমাদের প্রভু কোথায় রয়েছেন' এই প্রশ্নের উত্তরে এটা অবতীর্ণ হয় (ইবনে জারীর)। হযরত আতা' (রঃ) বলেন যে, যখন أُدْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ (৪০ঃ ৬০) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' তখন জনগণ জিজ্ঞেস করে, 'আমরা কোন্ সময় প্রার্থনা করবো?' তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (ইবনে জুরাইজ)। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা প্রত্যেকে উঁচু স্থানে উঠার সময় এবং উপত্যকায় অবতরণের সময়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি করতে করতে যাচ্ছিলাম। নবী (সঃ) আমাদের নিকট এসে বলেনঃ 'হে জনমণ্ডলী! নিজেদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তোমরা কোন কম শ্রবণকারী ও দূরে অবস্থানকারীকে ডাকছো না। যাঁকে তোমরা

ডাকতে রয়েছো তিনি তোমাদের যানবাহনের স্কন্ধ অপেক্ষাও নিকটে রয়েছেন। হে আবদুল্লাহ বিন কায়েস! তোমাকে কি আমি বেহেশ্তের কোষাগারসমূহের সংবাদ দেবো না? তা হচ্ছে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এই কলেমাটি (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমার বান্দা আমার উপর যেরূপ বিশ্বাস রাখে আমিও তার সাথে ঐরূপ ব্যবহার করে থাকি। যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা জানায়, আমি তার সঙ্গেই থাকি' (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।' হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিক্রে তার ওষ্ঠ নড়ে উঠে, তখন আমি তার সাথেই থাকি' (ইমাম আহমাদ (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন)।' এই বিষয়ের আয়াত কুরআন পাকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ঘোষণা হচ্ছে–

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ 'যারা খোদাভীরু ও সৎ কর্মশীল নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।' (৩০ ১২৮) হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা বলেন اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى অর্থাৎ 'আমি তোমাদের দু'জনের সাথে রয়েছি, আমি শুনছি ও দেখছি।' উদ্দেশ্য এই যে, মহান আল্লাহ প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা ব্যর্থ করেন না। এরকমও হয় না যে, তিনি বান্দাদের প্রার্থনা হতে উদাসীন থাকেন বা শুনেন না। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা করার জন্যে তাঁর বান্দাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাদের প্রার্থনা ব্যর্থ না করার অঙ্গীকার করেছেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ 'বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে হাত উঁচু করে প্রার্থনা জানায় তখন সেই দয়ালু আল্লাহ তার হাত দু'খানা শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন প্রার্থনা করে যার মধ্যে পাপও নেই এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতাও নেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি দান করে থাকেন। হয়তো বা তার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ কবূল করে নিয়ে তার প্রার্থিত উদ্দেশ্য পুরো করেন, কিংবা তা জমা করে রেখে দেন, এবং পরকালে দান করেন বা ওরই কারণে এমন কোন বিপদ কাটিয়ে দেন, যে বিপদ তার প্রতি আপতিত হতো।' একথা শুনে জনসাধারণ

বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা যখন প্রার্থনা খুব বেশী করে করবো?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই বেশী রয়েছে (মুসনাদ-ই-আহমাদ)। হযরত ওবাদাহ্ বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ভূ-পৃষ্ঠের যে মুসলমান মহা সম্মানিত ও মর্যাদাবান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানায় তা আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করে থাকেন, হয় সে তার প্রার্থিত উদ্দেশ্য লাভ করে অথবা ঐ রকমই তার কোন বিপদ কেটে যায় যে পর্যন্ত না কোন পাপের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতার কাজে সে প্রর্থনা করে। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।'

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি প্রার্থনায় তাড়াতাড়ি করে, তার প্রার্থনা অবশ্যই কবূল হয়। তাড়াতাড়ি করার অর্থ এই যে, সে বলতে আরম্ভ করে-'আমি সদা প্রার্থনা করতে রয়েছি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কবুল করছেন না (তাফসীর-ই-মুআত্তা মালিক)। সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনায় এটাও আছে যে,প্রতিদান স্বরূপ তাকে বেহেশ্ত দান করা হয়। সহীহ মুসলিমের মধ্যে এও রয়েছে যে, কবূল না হওয়ার ধারণা করে নৈরাশ্যের সাথে সে প্রার্থনা করা পরিত্যাগ করে, এটাই হচ্ছে তাড়াতাড়ি করা। হযরত আবূ জাফর তাবারীর (রঃ) তাফসীরে এই উক্তিটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'অন্তর বরতনসমূহের ন্যায়, একে অপর হতে বেশী পর্যবেক্ষণকারী হয়ে থাকে। হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে তো কবূল হওয়ার বিশ্বাস রেখে কর। জেনে রেখো যে, উদাসীনদের প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন না (তাফসীরে মুসনাদ-ই-আহমদ)।' হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহকে (সঃ) এই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আয়েশার (রাঃ) এই প্রশ্নের উত্তর কি হবে?' তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেনঃ 'আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন–'এর উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে সৎ কার্যাবলী সম্পাদনকারী হয় এবং খাঁটি নিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে আমাকে ডেকে থাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার প্রয়োজন পুরো করে থাকি।' (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। এই হাদীসটি ইসনাদ হিসাবে গরীব (দুর্বল বা অসহায়)।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কবূলের অঙ্গীকার করেছেন। আমি হাজির হয়েছি, হে আমার মা'বুদ আমি হাজির হয়েছি,

আমি হাজির আছি। হে অংশীদার বিহীন আল্লাহ! আমি উপস্থিত রয়েছি। হামদ, নিয়ামত এবং রাজ্য আপনারই জন্যে। আপনার কোন অংশীদার নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনি অতুলনীয়। আপনি এক ও পবিত্র। আপনি স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে দূরে রয়েছেন। না আপনার কেউ সঙ্গী রয়েছে। না আপনার কেউ সমকক্ষ রয়েছে, না আপনার মত কেউ রয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার সাক্ষ্য সত্য (তাফসীর -ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে– 'হে ইবনে আদম! একটি জিনিস তো তোমার আর একটি জিনিস আমার এবং একটি জিনিস তোমার ও আমার মধ্যস্থলে রয়েছে। খাঁটি আমার হক তো এটাই যে, তুমি শুধুমাত্র আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে আর কাউকেও অংশীদার করবে না। তোমার জন্যে নির্দিষ্ট এই যে, তোমার প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান আমি তোমাকে অবশ্যই দেবো। তোমার কোন পুণ্যই আমি নষ্ট করবো না। মধ্যবর্তী জিনিসটি এই যে, তুমি প্রার্থনা করবে আর আমি কবূল করবো। তোমার একটি কাজ হচ্ছে প্রার্থনা করা আর আমার একটি কাজ হচ্ছে তা কবূল করা (তাফসীর-ই-বায্যার)। প্রার্থনার এই আয়াতটিকে রোযার নির্দেশাবলীর আয়াতসমূহের মধ্যস্থলে আনয়নের নিপুণতা এই যে, যেন রোযা শেষ করার প্রার্থনার প্রতি মানুষের আগ্রহ জন্মে এবং তারা যেন প্রত্যহ ইফতারের সময় অত্যধিক দু'আ করতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'রোযাদার ইফতারের সময় যে দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করে থাকেন।' হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) ইফতারের সময় স্বীয় পরিবারের লোককে এবং শিশুদেরকে ডেকে নিতেন ও তাদের সকলকে নিয়ে প্রার্থনা করতেন (সুনান-ই-আবূ দাউদ, তায়ালেসী)। সুনান-ই-ইবনে মাজাহর মধ্যেও এই বর্ণনাটি রয়েছে এবং ওর মধ্যে সাহাবীদের (রাঃ) নিম্নের এই দু'আটি নকল করা হয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَاغْفِرْلِىْ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনার যে দয়া প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে রয়েছে তা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!' অন্য হাদীসে রয়েছে যে, তিন ব্যক্তির প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় না। (১)ন্যায় বিচারক বাদশাহ্ (২) রোযাদার ব্যক্তি যে পর্যন্ত না সে

ইফতার করে এবং (৩) অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার মর্যাদা উচ্চ করিবেন। অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ দু'আর কারণে আকাশসমূহের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'আমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ! বিলম্বে হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) জামে'উত তিরমিযী, সুনান-ই-নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ)।

---

١٨٧- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْئَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي

১৮৭। রোযার রজনীতে আপন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে; তারা তোমাদের জন্যে আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্যে আবরণ, তোমরা যে নিজেদের ক্ষতি করছিলে, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন, এ জন্যে তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হলেন এবং তোমাদের (ভার) লাঘব করে দিলেন; অতএব এক্ষণে তোমরা (রোযার রাত্রেও) তাদের সাথে সম্মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর এবং প্রত্যুষে কৃষ্ণ সূত্র হতে শুভ্র সূত্র প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা ভোজন ও পান কর; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর; তোমরা মসজিদে ইতেকাফ করবার সময় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে

الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

**সম্মিলিত হবে না; এটাই আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তার নিকটেও যাবে না; এভাবে আল্লাহ মানব মণ্ডলীর জন্যে তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন-যেন তারা সংযত হয়।**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রোযার ইফতারের পরে এ'শা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল। আর যদি কেউ ওর পূর্বেই শুয়ে যেতো তবে নিদ্রা আসলেই তার জন্যে ঐসব হারাম হয়ে যেতো। এর ফলে সাহাবীগণ (রাঃ) কষ্ট অনুভব করছিলেন। ফলে এই 'রুখসাতে'র আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা সহজেই নির্দেশ পেয়ে যান। رَفَثٌ -এর অর্থ এখানে 'স্ত্রী সহবাস'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), আতা' (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), তাউস (রঃ), সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রঃ), আমর বিন দীনার (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), যুহরী (রঃ), যহ্হাক (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), আতা' খুরাসানী (রঃ) এবং মুকাতিল বিন হিব্বানও (রঃ) এটাই বলেছেন। لِبَاسٌ -এর ভাবার্থ হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা। হযরত রাবী' বিন আনাস (রঃ) এর অর্থ 'লেপ' নিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এত গাঢ় যার জন্যে রোযার রাত্রেও তাদেরকে মিলনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণের হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ইফতারের পূর্বে কেউ ঘুমিয়ে পড়ার পর রাত্রির মধ্যেই জেগে উঠলেও সে পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস করতে পারতো না। কারণ তখন এই নির্দেশই ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ ক'রে এই নির্দেশ উঠিয়ে নেন। এখন রোযাদার ব্যক্তি মাগরিব থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতে পারবে। হযরত কায়েস বিন সুরমা (রাঃ) সারাদিন জমিতে কাজ করে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন- কিছু খাবার আছে কি? স্ত্রী বলেন-'কিছুই নেই। আমি যাচ্ছি এবং কোথাও হতে নিয়ে আসছি।' তিনি যান, আর এদিকে তাঁকে ঘুমে পেয়ে বসে। স্ত্রী ফিরে এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, এখন এই রাত্রি এবং পরবর্তী সারাদিন কিভাবে কাটবে? অতঃপর দিনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হলে হযরত কায়েস (রাঃ) ক্ষুধার জ্বালায় চেতনা হারিয়ে

ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে এর আলোচনা হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হয়ে যান।

একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে, সাহাবীগণ (রাঃ) সারা রমযানে স্ত্রীদের নিকট যেতেন না। কিন্তু কতক সাহাবী (রাঃ) ভুল করে বসতেন। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এই ভুল কয়েকজন মনীষীর হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে হযরত উমার বিন খাত্তাবও (রাঃ) ছিলেন একজন। যিনি এ'শা নামাযের পর স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি নবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। ফলে এই রহমতের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) এসে যখন এই ঘটনাটি বর্ননা করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'হে উমার (রাঃ)! তোমার ব্যাপারে তো এটা আশা করা যায়নি।' সেই সময়েই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত কায়েস (রাঃ) এ'শা'র নামাযের পরে ঘুম হতে চেতনা লাভ করে পানাহার করে ফেলেছিলেন। সকালে তিনি নবী (সঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে এই দোষ স্বীকার করেছিলেন। একটি বর্ণনা এও রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) যখন স্ত্রীর সাথে মিলনের ইচ্ছে করেন তখন তাঁর পত্নী বলেন 'আমার ঘুম এসে গিয়েছিল।' কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) ওটাকে ভাল মনে করেছিলেন। সে রাত্রে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে বসেছিলেন এবং অনেক রাত্রে বাড়ি পৌঁছে ছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত কাব বিন মালিকও (রাঃ) এরূপ দোষই করেছিলেন।

مَا كَتَبَ اللّٰهُ -এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সন্তানাদি।' কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সহবাস।' আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা 'কদরের' রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে। কাতাদাহ (ঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে এই 'রুখসাত।' এসব উক্তির এভাবে সাদৃশ্য দান করা যেতে পারে যে, সাধারণ ভাবে ভাবার্থ সবগুলোই হবে। সহবাসের অনুমতির পর পানাহারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, সুবেহ সাদেক পর্যন্ত এর অনুমতি রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেনঃ 'পূর্বে مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই কতকগুলো লোক তাদের পায়ে সাদা ও কালো সূতো বেঁধে নেয় এবং যে পর্যন্ত না সাদা ও কালোর মধ্যে প্রভেদ করা যেতো সে পর্যন্ত তারা পাহানার করতো। অতঃপর এই শব্দটি অবতীর্ণ হয়। ফলে জানা যায় যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে রাত ও

দিন। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, হযরত আদী বিন হাতিম (রাঃ) বলেনঃ 'আমিও আমার বালিশের নীচে সাদা ও কালো দু'টি সুতো রেখেছিলাম এবং যে পর্যন্ত এই দুই রং এর মধ্যে পার্থক্য না করা যেতো সেই পর্যন্ত পানাহার করতে থাকতাম। সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করি তখন তিনি বলেনঃ 'তোমার বালিশ তো খুব লম্বা চওড়া'। এর ভাবার্থ তো হচ্ছে রাত্রির কৃষ্ণতা হতে সকালের শুভ্রতা প্রকাশ পাওয়া।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যেও এই হাদীসটি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, আয়াতের মধ্যে যে দু'টি সুতোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ তো হচ্ছে দিনের শুভ্রতা ও রাত্রির কৃষ্ণতা। সুতরাং যদি ঐ লোকটির বালিশের নীচে ঐ দু'টো সুতো এসে যায় তবে বালিশের দৈর্ঘ্য যেন পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যেও বর্ণনামূলকভাবে এই তাফসীরটি এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় এই শব্দও এসেছে যে, 'তাহলে তো তুমি বড়ই লম্বা চওড়া স্কন্ধ বিশিষ্ট।' কেউ কেউ এর অর্থ 'স্থূল বুদ্ধি'ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই অর্থটি ভুল। বরং উভয় বাক্যের ভাবার্থ একই। কেননা, বালিশ যখন এত বড় তখন স্কন্ধও এত বড় হবে। হযরত আদির (রাঃ) এই প্রকারের প্রশ্ন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই রকম উত্তরের ব্যাখ্যা এটাই। আয়াতের এই শব্দগুলো দ্বারা রোযায় সাহরী খাওয়া মুসতাহাব হওয়াও সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার রুখসাতের উপর আমল করা তাঁর নিকট পছন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা সাহরী খাবে, তাতে বরকত রয়েছে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেছেনঃ 'আমাদের এবং আহলে কিতাবের মধ্যে পার্থক্যই সাহরী খাওয়া (সহীহ মুসলিম)।' আরও বলেছেনঃ 'সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।' সুতরাং তোমরা ওটা পরিত্যাগ করো না।' যদি কিছুই না থাকে তবে এক ঢোক পানিই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ সাহরী ভোজনকারীদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। (মুসনাদ-ই- আহমদ)। এই প্রকারের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সাহরী বিলম্বে খাওয়া উচিত, যেন সাহরীর খাওয়ার ক্ষণেক পরেই সুবহে সাদেক হয়ে যায়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ 'আমরা সাহ্রী খাওয়া মাত্রই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতাম। আযান ও সাহ্রীর মধ্যে শুধু মাত্র এটুকুই ব্যবধান থাকতো যে, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ে নেয়া যায় (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে পর্যন্ত আমার উম্মত ইফতারে তাড়াতাড়ি এবং সাহরীতে বিলম্ব করবে সে পর্যন্ত তারা মঙ্গলে থাকবে (মুসনাদ -ই-আহমাদ)।

হাদীস দ্বারা এটাও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নাম বরকতময় খাদ্য রেখেছেন। মুসনাদ-ই-আহমাদ ইত্যাদির হাদীসে রয়েছে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে সাহরী খেয়েছি এমন সময়ে যে, যেন সূর্য উদিতই হয়ে যাবে।' কিন্তু এই হাদীসের বর্ণনাকারী একজনই এবং তিনি হচ্ছেন আসেম বিন আবূ নাজুদ। এর ভাবার্থ হচ্ছে দিন নিকটবর্তী হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ অর্থাৎ 'ঐ স্ত্রী লোকগুলো যখন তাদের সময়ে পৌঁছে যায়।' ভাবার্থ এই যে, যখন তাদের ইদ্দতের সময় শেষের কাছাকাছি হয়। এই ভাবার্থ এই হাদীসেরও যে, তাঁরা সাহরী খেয়েছিলেন এবং সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁদের নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস ছিল না। বরং এমন সময় ছিল যে, কেউ বলছিলেন, 'সুবহে সাদিক হয়ে গেছে এবং কেউ বলেছিলেন হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অধিকাংশ সাহাবীর (রাঃ) বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং শেষ সময় পর্যন্ত খেতে থাকা সাব্যস্ত আছে। যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত হুযাইফা (রাঃ), হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)। তাবেঈদেরও একটি বিরাট দল হতে সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার একেবারে নিকটবর্তী সময়েই সাহরী খাওয়া বর্ণিত আছে। যেমন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন (রঃ), আবূ মুসলিম (রঃ), ইব্রাহীম নাখঈ (রঃ), আবূ য্যুহা ও আবূ ওয়াইল প্রভৃতি হযরত ইবনে মাসঊদের (রাঃ) ছাত্রগণ, আতা' (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), হাকিম বিন উয়াইনা (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ), আবুশ্‌শাশা (রঃ) এবং জাবির বিন যায়েদ (রঃ), হযরত আ'মাশ (রঃ) এবং হযরত জাবির বিন রুশদেরও (রঃ) এটাই মাযহাব। আল্লাহ তা'আলা এঁদের সবারই উপর শান্তি বর্ষণ করুন। এঁদের ইসনাদসমূহ আমি আমার একটি পৃথক পুস্তক 'কিতাবুস্ সিয়ামের' মধ্যে বর্ণনা করেছি।

ইবনে জারীর (রঃ) স্বীয় তাফসীরের মধ্যে কতকগুলো লোক হতে এটাও নকল করেছেন যে, সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার বৈধ, যেমন সূর্য অস্তমিত হওয়া মাত্রই ইফতার করা বৈধ। কিন্তু কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই এই উক্তিটি গ্রহণ করতে পারেন না। কেননা, এটি কুরআন কারীমের স্পষ্ট কথার সম্পূর্ণ উল্টো। কুরআন মাজীদের মধ্যে خَيْطٌ শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ হযরত বেলালের (রাঃ)

আযান শুনে তোমরা সাহরী খাওয়া হতে বিরত হবে না। কেননা তিনি রাত্রি থাকতেই আযান দিয়ে থাকেন। তোমরা খেতে ও পান করতে থাকো যে পর্যন্ত না হযরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম আযান দেন। ফজর প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দেন না।' মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ওটা ফজর নয় যা আকাশের দিগন্তে লম্বভাবে ছড়িয়ে পড়ে । ফজর হলো লাল রং বিশিষ্ট এবং দিগন্তে প্রকাশমান। জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যেও এই বর্ণনাটি রয়েছে। তাতে রয়েছেঃ 'সেই প্রথম ফজরকে দেখে নাও যা প্রকাশিত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। সেই সময় পানাহার থেকে বিরত হয়ো না বরং খেতে ও পান করতেই থাকো। যে পর্যন্ত না দিগন্তে লালিমা প্রকাশ পায়।

অন্য একটি হাদীসে সুবহে কাযিব এবং বেলাল (রাঃ)-এর আযানকে এক সাথেও বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায় সুবহে কাযিবকে সকালের থামের মত সাদা বলেছেন। অতঃপর একটি বর্ণনায় যে প্রথম আযানের মুয়ায্যিন ছিলেন হযরত বেলাল (রাঃ) তার কারণ বলেছেন এই যে, ঐ আযান ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগাবার জন্যে এবং (তাহাজ্জুদের নামাযে) দণ্ডায়মান ব্যক্তিদেরকে ফিরাবার জন্যে দেয়া হয়। ফজর এরূপ এরূপভাবে হয় না যতক্ষণ না এরূপ হয় (অর্থাৎ আকাশের উর্দ্ধ দিকে উঠে যায় না, বরং দিগন্ত রেখার মত প্রকাশমান হয়)। একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, ফজর দু'টো। এক তো হচ্ছে নেকড়ে বাঘের লেজের মত। ওর দ্বারা রোযাদারের উপর কিছুই হারাম হয় না। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ফজর যা দিগন্তে প্রকাশ পায়। ওটা হচ্ছে ফজরের নামাযের সময় এবং রোযাদারকে পানাহার থেকে বিরত রাখার সময়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে শুভ্রতা আকাশের নীচ হতে উপরের দিকে উঠে যায় তার সাথে নামাযের বৈধতা এবং রোযার অবৈধতার কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ঐ ফজর যা পর্বত শিখরে দেদীপ্যমান হয় সেটা পানাহার হারাম করে থাকে। হযরত আতা' (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আকাশে লম্বভাবে উড্ডীয়মান আলোক না রোযাদারের উপর পানাহার হারাম করে থাকে, না তার দ্বারা নামাযের সময় হয়েছে বলে বুঝা যেতে পারে, না তার দ্বারা হজ্ব ছুটে যায়। কিন্তু যে সকাল পর্বতরাজির শিখরসমূহে ছড়িয়ে পড়ে এটা ঐ সকাল যা রোযাদারের উপর সব কিছুই হারাম করে থাকে। আর নামাযীর জন্যে নামায হালাল করে দেয় এবং হজ্ব ফওত হয়ে যায়। এই দু'টি বর্ণনার সনদ বিশুদ্ধ এবং পূর্ববর্তী বহু মনীষী হতে নকল করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করুন।

**জিজ্ঞাস্যঃ** যেহেতু আল্লাহ তা'আলা রোযাদারের জন্যে স্ত্রী সহবাস ও পানাহারের শেষ সময় সুবহে সাদেক নির্ধারণ করেছেন, কাজেই এর দ্বারা এই মাসআলার উপর দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, সকালে যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় উঠলো অতঃপর গোসল করে নিয়ে তার রোযা পুরো করে নিলো, তার উপর কোন দোষ নেই। চার ইমাম এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুরুজনদের এটাই মাযহাব। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রে সহবাস করে সকালে অপবিত্র অবস্থায় উঠতেন, অতঃপর গোসল করতেন এবং রোযাদার থাকতেন। তাঁর এই অপবিত্রতা স্বপ্নদোষের কারণে হতো না। হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, এর পরে তিনি রোযা ছেড়েও দিতেন না এবং কাযাও করতেন না।

সহীহ মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ফজরের নামাযের সময় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপবিত্র থাকি, আমি রোযা রাখতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'এরূপ ঘটনা স্বয়ং আমারও ঘটে থাকে এবং আমি রোযা রেখে থাকি।' লোকটি বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো আপনার মত নই।' আপনার তো পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।' তখন তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি তো আশা রাখি যে, তোমাদের সবারই অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলাকে বেশী ভয় আমিই করি এবং তোমাদের সবারই অপেক্ষা খোদাভীরুতার কথা আমিই বেশী জানি।' মুসনাদ-ই -আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যখন ফজরের আযান হয়ে যায় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অপবিত্র থাকে সে যেন ঐদিন রোযা না রাখে।' এই হাদীসটির ইসনাদ খুবই উত্তম এবং এটা ইমাম বুখারী (রাঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর রয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ বুখারীর ও মুসলিমের মধ্যেও হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ফযল বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন এবং তিনি নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেন। সুনানে নাসাঈর মধ্যেও এই হাদীসটি হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে এবং ফযল বিন রাবী' হতে বর্ণনা করেছেন এবং মারফূ' করেননি। এ জন্যেই কোন কোন আলেমের উক্তি এই যে, এই হাদীসটির মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কেননা এটা মারফূ' নয়।

অন্যান্য কতকগুলো আলেমের মাযহাব এটাই। আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত সালিম (রাঃ), হযরত আতা' (রঃ), হযরত হিসাম বিন উরওয়া (রঃ) এবং হযরত হাসান বসরী ও (রঃ) এ কথাই বলেন। কেউ কেউ বলেন যে, যদি কেউ নাপাক অবস্থায় শুয়ে যায় এবং জেগে উঠে দেখে যে, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে তবে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীসের ভাবার্থ এটাই। আর যদি সে ইচ্ছাপূর্বক গোসল না করে এবং সকাল হয়ে যায় তবে তার রোযা হবে না। হযরত উরওয়া (রঃ), তাউস (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) এ কথাই বলেন। কেউ কেউ বলেন যে, যদি ফরয রোযা হয় তবে পূর্ণ করে নেবে এবং পরে আবার অবশ্যই কাযা করতে হবে। আর যদি নফল রোযা হয় তবে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম নাখঈও (রঃ) এটাই বলেন। খাজা হাসান বসরী (রঃ) হতেও একটি বর্ণনায় এটাই রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই যার দ্বারা মানসূখ সাব্যস্ত হতে পারে। হযরত ইবনে হাযাম (রঃ) বলেন যে, ওর 'নাসিখ' হচ্ছে কুরআন কারীমের এই আয়াতটিই। কিন্তু এটাও খুব দূরের কথা। কেননা, এই আয়াতটি পরে হওয়ার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বরং এদিক দিয়ে তো বাহ্যতঃ এই হাদীসটি এই আয়াতটির পরের বলে মনে হচ্ছে। কোন কোন লোক বলেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটির মধ্যেকার না বাচক لا শব্দটি হচ্ছে কামাল বা পূর্ণতার জন্যে। অর্থাৎ ঐ লোকটির পূর্ণ রোযা হয় না। কেননা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা রোযার বৈধতা স্পষ্ট রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটাই সঠিক পন্থাও বটে এবং সমুদয় উক্তির মধ্যে এই উক্তিটিই উত্তম। তাছাড়া এটা বলাতে দু'টি বর্ণনার মধ্যে সাদৃশ্যও এসে যাচ্ছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।' এর দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সূর্য অস্তমিত হওয়া মাত্রই ইফতার করা উচিত। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন এদিক দিয়ে রাত্রি আগমন করে এবং ওদিক দিয়ে দিন বিদায় নেয় তখন যেন রোযাদার ইফতার করে।' সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত সাহল বিন সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে পর্যন্ত মানুষ ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে সে পর্যন্ত মঙ্গল থাকবে।' মুসনাদ-ই-

আহমাদের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'আমার নিকট ঐ বান্দাগণ সবচেয়ে প্রিয় যারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করে।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) এই হাদীসটিকে 'হাসান গরীব' বলেছেন। তাফসীর-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত বাশীর বিন খাসাসিয়্যাহর (রাঃ) সহধর্মিনী হযরত লাইলা (রাঃ) বলেনঃ 'আমি ইফতার ছাড়াই দু'টি রোযাকে মিলিত করতে ইচ্ছে করি। তখন আমার স্বামী আমাকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটা হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ এটা খ্রীষ্টানদের কাজ। তোমরা তো রোযা এভাবেই রাখবে যেভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (তা হচ্ছে এই যে,) তোমরা রাত্রে ইফতার করে নাও। এক রোযাকে অন্য রোযার সাথে মিলানো নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে আরও বহু হাদীস রয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা রোযাকে রোযার সাথে মিলিত করো না।' তখন জনগণ বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! স্বয়ং আপনি তো মিলিয়ে থাকেন।' তিনি বলেনঃ 'আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রি অতিবাহিত করি, আমার প্রভু আমাকে আহার করিয়ে ও পানি পান করিয়ে থাকেন।' কিন্তু লোক তবুও ঐ কাজ হতে বিরত হয় না। তখন তিনি তাদের সাথে দু'দিন ও দু'রাতের রোযা বরাবর রাখতে থাকেন। অতঃপর চাঁদ দেখা দেয় তখন তিনি বলেনঃ 'যদি চাঁদ উদিত না হতো তবে আমি এভাবেই রোযাকে মিলিয়ে যেতাম।' যেন তিনি তাদের অপারগতা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও এই হাদীসটি রয়েছে এবং এভাবেই রোযাকে ইফতার করা ছাড়াই এবং রাত্রে কিছু না খেয়েই অন্য রোযার সাথে মিলিয়ে নে'য়ার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও মারফু' হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, এটা উম্মতের জন্যে নিষিদ্ধ; কিন্তু তিনি স্বয়ং তাদের হতে বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর এর উপরে ক্ষমতা ছিল এবং এর উপরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্য করা হতো। এটাও মনে রাখা উচিত যে, তিনি (নবী- সঃ) যে বলেছেন–'আমার প্রভু আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন' এর ভাবার্থ প্রকৃত খাওয়ানো ও পান করানো নয়। কেননা এরূপ হলে তো এক রোযার সাথে অন্য রোযাকে মিলানো হচ্ছে না। কাজেই এটা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক সাহায্য। যেমন একজন আরব কবির নিম্নের এই কবিতার মধ্যে রয়েছেঃ

لَهَا اَحَادِيْثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلُهَا * عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنِ الزَّادِ

অর্থাৎ 'তোমার কথা ও তোমার আলোচনা তার নিকট এত চিত্তাকর্ষক যে তাকে পানাহার থেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়ে রাখে।' হাঁ, তবে কোন ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় সাহরী পর্যন্ত বিরত থাকে তবে এটা জায়েয।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিতে রয়েছেঃ 'মিলিত কারো না, যদি একান্তভাবে করতেই চাও তবে সাহরী পর্যন্ত কর।' জনগণ বলেঃ 'আপনি তো মিলিয়ে থাকেন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি তোমাদের মত নই। আমাকে তো রাত্রেই আহারদাতা আহার করিয়ে থাকেন এবং পানীয় দাতা পান করিয়ে থাকেন।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একজন সাহাবীয়্যাহ স্ত্রীলোক নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। সেই সময় তিনি সাহরী খাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'এসো তুমিও খেয়ে নাও।' স্ত্রী লোকটি বলেনঃ 'আমি রোযা অবস্থায় রয়েছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তুমি কিরূপে রোযা রেখে থাকো?' সে তখন বর্ণনা করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তুমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর মত এক সাহরীর সময় থেকে নিয়ে দ্বিতীয় সাহরীর সময় পর্যন্ত মিলিত রোযা রাখো না কেন?' (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)।

মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সাহরী হতে দ্বিতীয় সাহরী পর্যন্ত মিলিত রোযা রাখতেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) প্রভৃতি পূর্বের মনীষীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ক্রমাগত কয়েকদিন পর্যন্ত কিছু না খেয়েই রোযা রাখতেন। কেউ কেউ বলেন যে, ওটা উপাসনা হিসেবে ছিল না, বরং আত্মাকে দমন ও আধ্যাত্মিক সাধনা হিসেবে ছিল। আবার এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাঁদের ধারণায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই নিষেধ ছিল দয়া ও স্নেহ হিসেবে, অবৈধ বলে দেয়া হিসেবে নয়। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনসাধারণের প্রতি দয়া পরবশ হয়েই এর থেকে নিষেধ করেছিলেন।' সুতরাং ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁর পুত্র আমের (রাঃ) এবং তাঁর পদাংক অনুসরণকারীগণ তাঁদের আত্মায় শক্তি লাভ করতেন এবং রোযার উপর রোযা রেখে যেতেন। এটাও বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁরা ইফতার করতেন তখন সর্ব প্রথম ঘি ও তিক্ত আঠা খেতেন, যাতে প্রথমেই খাদ্য পৌঁছে যাওয়ার ফলে নাড়ি জ্বলে না যায়। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) ক্রমাগত সাতদিন ধরে রোযা রেখে যেতেন এবং এর মধ্যকালে দিনে বা রাতে কিছুই খেতেন না। অথচ সপ্তম দিনে তাঁকে খুবই সুস্থ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রূপে দেখা যেতো।

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা দিনের রোযা ফরয করে দিয়েছেন। এখন বাকি রইলো রাত্রি; তবে যে চাইবে খাবে এবং যার ইচ্ছে না হয় সে খাবে না।' অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–ই'তিকাফের অবস্থায় তোমরা প্রেমালাপ করো না। হযরত ইবনে 'আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদে ই'তেকাফে বসেছে, হয় রমযান মাসেই হোক বা অন্য কোন মাসেই হোক, ই'তিকাফ পুরো না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে দিবস ও রজনীতে স্ত্রী সহবাস হারাম। হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, পূর্বে মানুষ ই'তেকাফের অবস্থাতেও স্ত্রী সহবাস করতো। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মসজিদে ই'তেকাফের অবস্থায় অবস্থানের সময় এটা হারাম করে দেয়া হয়। মুজাহিদ (রঃ) এবং কাতাদাহ (রঃ) এ কথাই বলেন। সুতরাং আলেমগণের সর্বসম্মত ফতওয়া এই যে, যদি ই'তেকাফকারী খুবই প্রয়োজন বশতঃ বাড়ীতে যায়, যেমন প্রশ্রাব-পায়খানার জন্যে বা খাদ্য খাবার জন্যে, তবে ঐ কার্য শেষ করার পরেই তাকে মসজিদে চলে আসতে হবে। তথায় অবস্থান জায়েয নয়। স্ত্রীকে চুম্বন-আলিঙ্গন ইত্যাদিও বৈধ নয়। ই'তেকাফ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়াও জায়েয নয়। তবে হাঁটতে হাঁটতে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে নেয় সেটা অন্য কথা। ই'তেকাফের আরও অনেক আহকাম রয়েছে। কতকগুলো আহকামের মধ্যে মতভেদও রয়েছে। এগুলো আমি আমার পৃথক পুস্তক 'কিতাবুস সিয়াম'র শেষে বর্ণনা করেছি। এই জন্য অধিকাংশ গ্রন্থকারও নিজ নিজ পুস্তকে রোযার পর পরই ই'তেকাফের নির্দেশাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। এতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ই'তেকাফ রোযার অবস্থায় করা কিংবা রমযানের শেষ ভাগে করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করতেন, যে পর্যন্ত না তিনি এই নশ্বর জগৎ হতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর পরলোক গমনের পর তাঁর সহধর্মিণীগণ উম্মাহাতুল মু'মেনীন (রাঃ) ই'তেকাফ করতেন।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত সুফিয়া বিন্তে হাই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ই'তেকাফের অবস্থায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। একদা রাত্রে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর সাথে সাথে যান। কেননা, তাঁর বাড়ী মসজিদে নববী (সঃ) হতে দূরে অবস্থিত ছিল। পথে দু'জন আনসারী সাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁর সহধর্মীণীকে

দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা থামো এবং জেনে রেখো যে, এটা আমার স্ত্রী সুফিয়া বিনতে হাই (রাঃ)।' তখন তাঁরা বলেনঃ 'সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা অন্য কোন ধারণা কি করতে পারি)!' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার ধারণা হলো যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে দেয় কি না!' হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) তাঁর এই নিজস্ব ঘটনা হতে তাঁর উম্মতবর্গকে শিক্ষা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তারা যেন অপবাদের স্থান থেকে দূরে থাকে। নতুবা এটা অসম্ভব কথা যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মহান সাহাবীবর্গ তাঁর সম্বন্ধে কোন কু-ধারণা অন্তরে পোষণ করতে পারেন এবং এটাও অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা রাখতে পারেন।

উল্লিখিত আয়াতে مُبَاشِرَت এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে মিলন এবং তার কারণসমূহ। যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি। নচেৎ কোন জিনিস লেন-দেন ইত্যাদি সব কিছুই জায়েয। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) ই'তিকাফের অবস্থায় আমার দিকে মাথা নোয়ায়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথায় চিরুনী করে দিতাম। অথচ আমি মাসিক বা ঋতুর অবস্থায় থাকতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন পুরো করার উদ্দেশ্য ছাড়া বাড়ীতে আসতেন না।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'ই'তিকাফের অবস্থায় আমি তো চলতে চলতেই বাড়ীর রুগীকে পরিদর্শন করে থাকি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এই হচ্ছে আমার বর্ণনাকৃত কথা, ফরযকৃত নির্দেশাবলী এবং নির্ধারিত সীমা। যেমন রোযার নির্দেশাবলী ও তার জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ, তার মধ্যে যা কিছু বৈধ এবং যা কিছু অবৈধ ইত্যাদি। মোটকথা এই সব হচ্ছে আমার সীমারেখা। সাবধান! তোমরা তার নিকটেও যাবে না এবং তা অতিক্রম করবে না। কেউ কেউ বলেন যে, এই সীমা হচ্ছে ই'তিকাফের অবস্থায় স্ত্রী-মিলন হতে দূরে থাকা। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এই আয়াতগুলোর মধ্যে চারটি নির্দেশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং তা পাঠ করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—'যে ভাবে আমি রোযা ও তার নির্দেশাবলী, তার জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ এবং তার ব্যখ্যা বর্ণনা করেছি, অনুরূপভাবে অন্যান্য নির্দেশাবলীও আমি আমার বান্দা ও রাসূল (সঃ)- এর মাধ্যমে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্যে বর্ণনা করেছি যেন তারা জানতে পারে যে, হিদায়াত কি এবং আনুগত্য

কাকে বলে এবং এর ফলে যেন তারা খোদাভীরু হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

هُوَالَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ *

অর্থাৎ 'তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁর বান্দার উপর উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করেছেন যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু।' (৫৭ঃ৯)

১৮৮- وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْـــوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْـــوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ع

**১৮৮। এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পত্তি অন্যায়রূপে গ্রাস করো না এবং তা বিচারকের নিকট এ জন্যে উপস্থাপিত করো না– যাতে তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের ধনের অংশ অন্যায়ভাবে উদরসাৎ করতে পারো।**

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আয়াতটি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যার নিকট অপরের ধন-সম্পদ রয়েছে এবং ঐ হকদার ব্যক্তির নিকট কোন প্রমাণ নেই। তখন ঐ লোকটি অস্বীকার করতঃ বিচারকের নিকট গিয়ে নিজেকে মুক্তরূপে সাব্যস্ত করছে, অথচ সে জানছে যে, ঐ দাবীদারের মাল তার নিকট রয়েছে। সুতরাং সে হারাম খাচ্ছে এবং নিজেকে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) হযরত ইকরামা (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত সুদ্দী (র)ঃ, হযরত মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ), এবং হযরত আবদুর রহমান বিন জায়েদ বিন আসলামও (রঃ) এই কথাই বলেন যে, ঐ ব্যক্তি যে অত্যাচারী এটা সে নিজে জানা সত্ত্বেও তার বিবাদ করা মোটেই উচিত নয়। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি একজন মানুষ।

লোক আমার নিকট বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ একজন অপরজন অপেক্ষা বেশি যুক্তিবাদী। তার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি হয়তো তারই স্বপক্ষে ফায়সালা করে থাকি (অথচ ফায়সালা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত)। তবে জেনে রেখো, যে ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ফায়সালা করার ফলে কোন মুসলমানের হক আমি তাকে দিয়ে দেই, ওটা হচ্ছে আগুনের টুকরো। সুতরাং হয় সে ওটা উঠিয়ে নেবে, না হয় ছেড়ে দেবে।' আমি বলি যে, এই আয়াত এবং এই হাদীস এই বিষয়ের উপর দলীল যে, বিচারকের বিচার কোন মামলার মূলকে শরীয়তের নিকট পরিবর্তন করে না। প্রকৃত পক্ষে যা হারাম তা কাযীর ফায়সালায় হালাল হয়ে যায় না এবং যা হালাল তা হারাম হয় না।

কাযীর ফায়সালা শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর হয়ে থাকে, অভ্যন্তরে তা পূর্ণ হয় না। কাযী সাহেবের ফায়সালা যদি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে মিলে যায় তবে তো ভালই, নচেৎ কাযী সাহেব তো প্রতিদান পেয়ে যাবেন; কিন্তু ঐ মীমাংসার উপর ভিত্তি করে হককে না হক এবং না হককে হকে পরিণতকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট অপরাধী বলে বিবেচিত হবে এবং তার উপর ঐ শাস্তি আপতিত হবে–যার উপর উপরোক্ত আয়াতটি সাক্ষী রয়েছে। যেখানে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেদের দাবীর অসারতা জেনে শুনে জনগণের মাল ভক্ষণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়ে এবং মিথ্যা সাক্ষী ঠিক করে অবৈধ পন্থার মাধ্যমে বিচারকগণকে ভুল বুঝিয়ে দিয়ে নিজেদের দাবীকে সাব্যস্ত করো না।' হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেনঃ 'হে জন মণ্ডলী! জেনে রেখো যে, বিচারকের মীমাংসা তোমার জন্য হারামকে হালাল এবং অন্যায়কে ন্যায় করতে পারে না। কাযী তো নিজের বিবেকের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া তিনি তো মানুষ, সুতরাং তাঁর দ্বারা ভুল হওয়াও সম্ভব এবং তাঁর ভুল থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব। তাহলে জেনে নাও যে, কাযীর ফায়সালা যদি সত্য ঘটনার উল্টো হয় তাহলে শুধুমাত্র কাযীর মীমাংসা বলেই ওকে বৈধ মাল মনে করো না। এই বিবাদ থেকেই গেল। কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ দু'জনকেই একত্রিত করবেন এবং অন্যায়কারীদের উপর হকদারদেরকে বিজয়ী করে তাদের হক অন্যায়কারীদের নিকট হতে আদায় করিয়ে দেবেন এবং দুনিয়ায় যে মীমাংসা করা হয়েছিল তার বিপরীত মীমাংসা করে তার পুণ্যসমূহ হতে হকদারকে ওর বিনিময় দেয়াইয়ে দেবেন।

১৮৯। তারা তোমাকে নব চন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বল—এগুলো হচ্ছে জনসমাজের উপকারের জন্যে এবং হজ্বের জন্যে সময় নিরূপক; আর (ঐ হজ্বের চাঁদে) তোমরা যে পশ্চাৎদিক দিয়ে গৃহে সমাগত হও— এটা পুণ্য কর্ম নয়, বরং পুণ্যের কাজ হল যে কোন ব্যক্তি সংযমশীলতা অবলম্বন করলো; এবং তোমরা গৃহসমূহে ওগুলোর দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তোমরাও সুফল প্রাপ্ত হবে।

١٨٩- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে চন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, ফলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, এর দ্বারা ঋণ ইত্যাদির অঙ্গীকারের সময়কাল, স্ত্রীলোকদের ইদ্দতের এবং হজ্বের সময় জানা যায়। মুসলমানদের রোযা-ইফতারের সম্পর্কও এর সঙ্গে। মুসনাদ-ই-আবদুর রাযযাকের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা মানুষের সময় নিরূপণের জন্যে চাঁদ তৈরী করেছেন। ওটা দেখে রোযা রাখ, ওটা দেখে ঈদ পর্ব উদযাপন কর। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও তবে পূর্ণ ত্রিশ দিন গণনা করে নাও।' এই বর্ণনাটিকে ইমাম হাকীম (রঃ) সঠিক বলেছেন। এই হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) হতে একটি মাওকুফ বর্ণনায় এই বিষয়টি এসেছে। সম্মুখে বেড়ে বলা হচ্ছে—ঘরের পিছন দিয়ে আগমনে পুণ্য নেই। বরং খোদাভীরুতার মধ্যেই পুণ্য রয়েছে। তোমরা গৃহের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হাদীস রয়েছে—'অজ্ঞতার যুগে প্রথা ছিল যে, মানুষ ইহরামের অবস্থায় থাকলে বাড়ীতে পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করতো।

ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আবু দাউদ ও তায়ালেসীর হাদীস গ্রন্থেও এই বর্ণনাটি রয়েছে। মদীনার আনসারদের সাধারণ প্রথা এই ছিল যে, সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তারা বাড়ীতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো না। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতার যুগের কুরাইশরা নিজেদের জন্যে এটাও একটা স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেছিল যে, তারা নিজেদের নাম 'হুমুস' রেখেছিল। ইহ্‌রামের অবস্থায় এরা সোজা পথে গৃহে প্রবেশ করতে পারতো; কিন্তু বাকি লোকেরা এভাবে যেতো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বাগানে অবস্থান করছিলেন। ওখান থেকে তিনি ওটার দরজা দিয়ে বের হন। হযরত কুতবাহা বিন আমর (রাঃ) নামক তাঁর একজন আনসারী সাহাবীও তাঁর সাথে ঐ দরজা দিয়েই বের হন। তখন জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ) -কে বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ইনিতো একজন ব্যবসায়ী মানুষ। ইনি আপনার সাথে আপনার মতই দরজা দিয়ে বের হলেন কেন?' তখন হযরত কুতবাহ্ বিন আমের (রাঃ) উত্তর দেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে যা করতে দেখেছি তাই করেছি। আমি স্বীকার করি যে, তিনি 'হুমুসের' অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমিও তো তাঁর ধর্মের উপরে রয়েছি।' তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেনঃ 'অজ্ঞতার যুগে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল যে, যখন তারা সফরের উদ্দেশ্যে বের হতো তখন যদি কোন কারণবশতঃ সফরকে অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে ফিরে আসতো তবে তারা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতো না, বরং পিছনের দিক দিয়ে আসতো। এই আয়াত দ্বারা তাদেরকে ঐ কুপ্রথা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। মুহাম্মদ বিন কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ই'তিফাকের অবস্থাতেও এই প্রথাই ছিল। ইসলাম তা উঠিয়ে দিয়েছে। আতা' (রঃ) বলেন যে,মদীনাবাসীর ঈদসমূহেও এই প্রথাই চালু ছিল। ইসলাম তা বিলুপ্ত করেছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে বিরত থাকা, অন্তরে তাঁর ভয় রাখা, এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন কাজে আসবে যেদিন প্রত্যেকে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে এবং তাদেরকে পূর্ণভাবে প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

**১৯০। এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করো না;**

١٩٠- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا

تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না।

١٩١- وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৯১। তাদেরকে যেখানেই পাও-হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে যেখান হতে বহিষ্কৃত করেছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান হতে বহিষ্কৃত কর এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি গুরুতর এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মজিদের নিকট যুদ্ধ করো না-যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্যে এটাই প্রতিফল।

١٩٢- فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯২। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

١٩٣- وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯৩। অশান্তি দূরীভূত হয়ে আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই।

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, মদীনা শরীফে জিহাদের হুকুম এটাই প্রথম অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুধুমাত্র ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতেন যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতো। যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতো না তিনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন না। অবশেষে সূরা-ই-বারাআত অবতীর্ণ হয়। আবদুর রহমান বিন যায়েদ আসলাম (রঃ) একথা পর্যন্ত বলেন যে, এই আয়াতটি রহিত। এটাকে রহিত করার আয়াত হচ্ছে فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (৯ঃ ৫) এই আয়াতটি। অর্থাৎ 'মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর।' কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়। কেননা এটা তো শুধু মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে উত্তেজিত করা যে, তারা তাদের শত্রুদের সাথে জিহাদ করছে না কেন যারা তাদের ও তাদের ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু? ঐ মুশরিকরা যেমন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করছে তেমনই মুসলমানদেরও উচিত তাদের সাথে যুদ্ধ করা। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً অর্থাৎ 'তোমরা সমবেতভাবে মুশরিকদের সাথে সংগ্রাম কর যেমন তোমাদের সাথে তারা সমবেত ভাবে যুদ্ধ করে।' (৯ঃ ৩৬) এখানেও বলা হয়েছেঃ 'তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে সেখান হতে বের করে দাও যেখান হতে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে।' ভাবার্থ এই যে, হে মুসলমানগণ! তাদের উদ্দেশ্য যেমন তোমাদেরকে হত্যা করা ও নির্বাসন দেয়া তেমনই এর প্রতিশোধ হিসেবে তোমাদেরও এরূপ উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন না। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করো না। নাক, কান ইত্যাদি কেটো না, বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি করো না এবং শিশুদেরকে হত্যা করো না। ঐ বুড়োদেরকেও হত্যা করো না যাদের যুদ্ধ করার যোগ্যতা নেই এবং যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। সংসার ত্যাগীদেরকেও হত্যা করো না। বিনা কারণে তাদের বৃক্ষাদি কেটে ফেলো না এবং তাদের জীব-জন্তুগুলো ধ্বংস করো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত উমার বিন আবদুল আযীয (রঃ), হযরত মুকাতিল বিন হিব্বান (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এই আয়াতের তাফসীরে একথাই বলেছেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ 'আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, চুক্তি ভঙ্গ হতে বিরত

থাকবে, নাক কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেবে না, শিশুদেরকে ও সংসার বিরাগীদেরকে হত্যা করবে না যারা উপাসনা গৃহে পড়ে থাকে।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার নামে বেরিয়ে যাও, বাড়াবাড়ি করো না, প্রতারণা করো না শত্রুদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কেটো না, দরবেশদেরকে হত্যা করো না।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে,একবার এক যুদ্ধে একটি স্ত্রী লোককে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করেন এবং স্ত্রী লোক ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। মুসনাদ-ই আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক, দুই, তিন, পাঁচ, সাত, নয় এবং এগারোটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। একটি প্রকাশ করেন এবং অন্যগুলো ছেড়ে দেন। তিনি বলেনঃ 'কতকগুলো লোক দুর্বল ও দরিদ্র ছিল। শক্তিশালী ও ধনবান শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। আল্লাহ তা'আলা ঐ দুর্বলদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে ঐ শক্তিশালীদের উপর জয়যুক্ত করেন।

এখন এই লোকগুলো তাদের উপর অত্যাচারও বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয়। ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রাগান্বিত হবেন। এই হাদীসটির ইসনাদ বিশুদ্ধ। ভাবার্থ এই যে, এই দুর্বল সম্প্রদায় যখন বিজয়ী হয়ে যায় তখন তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে গ্রাহ্য না করে অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। এই সম্বন্ধে বহু হাদীস রয়েছে। এর দ্বারা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেলো যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যাচার ও সীমা অতিক্রমকে ভালবাসেন না এবং এই প্রকার লোকের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন। যেহেতু জিহাদের নির্দেশাবলীর মধ্যে বাহ্যত হত্যা ও রক্তারক্তি রয়েছে, এজন্যেই তিনি বলেন যে, এদিকে যদি খুনাখুনি ও কাটাকাটি থাকে তবে ঐদিকে রয়েছে শিরক ও কুফর এবং সেই মালিকের পথ থেকে তাঁর সৃষ্ঠজীবকে বিরত রাখা এবং এটা হচ্ছে সরাসরি অশান্তি সৃষ্টি করা, আর হত্যা অপেক্ষা অশান্তি সৃষ্টিই হচ্ছে বেশী গুরুতর। আবূ মালিক (রঃ) বলেন–'তোমাদের এইসব পাপ কর্ম হত্যা অপেক্ষাও বেশী বিশ্রী।'

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ 'আল্লাহ তা'আলার ঘরের মধ্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করো না।' যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এটা মর্যাদা সম্পন্ন শহর। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত

এটা সম্মানিত শহর হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকবে। শুধু সামান্য সময়ের জন্যে ওটাকে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে হালাল করেছিলেন। কিন্তু এটা আজ এসময়েও মহা সম্মানিতই রয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্তএর এই সম্মান অবশিষ্ট থাকবে। এর বৃক্ষরাজি কাটা হবে না, এর কাঁটাসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবে না। যদি কোন ব্যক্তি এর মধ্যে যুদ্ধকে বৈধ বলে এবং আমার যুদ্ধকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে তবে তাকে বলে দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর রাসূলের (সঃ) জন্যে অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমাদের জন্যে কোন অনুমতি নেই।' তাঁর এই নির্দেশের ভাবার্থ হচ্ছে মক্কা বিজয়ের দিন। কতকগুলো আলেম কিন্তু একথাও বলেন যে, মক্কা বিজয় সন্ধির মাধ্যমে হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তার দরজা বন্ধ করে দেবে সে নিরাপদ, যে মসজিদে চলে যাবে সেও নিরাপদ, যে আবূ সুফইয়ানের গৃহে চলে যাবে সেও নিরাপদ। এর পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা যদি এখানে (বায়তুল্লাহ শরীফে) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে এ অত্যাচার দূর হতে পারে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়ায় স্বীয় সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট যুদ্ধের বায়'আত গ্রহণ করেন, যখন কুরাইশরা এবং তাদের সঙ্গীরা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বৃক্ষের নীচে সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট বায়'আত নিয়েছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ এই যুদ্ধ প্রতিহত করেন। এই নিয়ামতের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা নিম্নের এই আয়াতে দিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ-

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ যিনি মক্কার অভ্যন্তরে তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করার পরে তাদের হাতগুলোকে তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাতগুলোকে তাদের হতে বিরত রাখেন।' (৪৮ঃ ২৪)

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যদি এই কাফেররা বায়তুল্লাহ শরীফে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। যদিও তারা মুসলমানদেরকে 'হারাম' শরীফে হত্যা করেছে তবুও আল্লাহ তা'আলা এত বড় পাপকেও ক্ষমা করে দেবেন। যেহেতু

তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তার পরে নির্দেশ হচ্ছে—ঐ মুশরিকদের সাথে জিহাদ চালু রাখতে। যাতে এই শিরকের অশান্তি দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীন জয়যুক্ত হয়ে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয় ও সমস্ত ধর্মের উপর প্রভুত্ব লাভ করে। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছ, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখাবার জন্যে যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার জন্যে ও জেদের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে এবং এক ব্যক্তি শুধু মানুষকে দেখাবার জন্যে জিহাদ করে, তবে এদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কে? তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদকারী শুধু ঐ ব্যক্তি যে এই জন্যেই যুদ্ধ করে যে,যেন তাঁর কথা সুউচ্চ হয়।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি যে পর্যন্ত না তারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে। যখন তারা এটা বলবে তখন তারা ইসলামের হক ছাড়া তাদের রক্ত ও সম্পদ আমা হতে বাঁচিয়ে নেবে এবং তাদের (ভিতরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।' এর পরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যদি এই কাফিরেরা শিরক ও কুফর হতে এবং তোমাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে তবে তোমরা তাদের থেকে বিরত থাক। এর পর যে যুদ্ধ করবে সে অত্যাচারী হবে এবং অত্যাচারীদেরকে অত্যাচারের প্রতিদান দেয়া অবশ্য কর্তব্য। হযরত মুজাহিদের (রঃ) 'যে যুদ্ধ করে শুধু তার সাথেই যুদ্ধ করতে হবে'—এই উক্তির ভাবার্থ এটাই। কিংবা ভাবার্থ এও হতে পারে যে,যদি তারা এসব কাজ হতে বিরত থাকে তবে তো তারা যুলুম ও শির্ক থেকে বিরত থাকলো। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ করার আর কোন কারণ নেই। এখানে عُدْوَانَ শব্দটি শক্তি প্রয়োগের অর্থে এসেছে। তবে এটা শক্তি প্রয়োগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে এটা শক্তি প্রয়োগ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ 'যারা তোমাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে তবে তোমরাও তাদের সঙ্গে সেই পরিমাণ বাড়াবাড়ি কর যেই পরিমাণ বাড়াবাড়ি তারা তোমাদের উপর করেছে।' (২ঃ ১৯৪)

অন্য জায়গায় আছে جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا অর্থাৎ 'অন্যায়ের বিনিময় হচ্ছে ঐ পরিমাণই অন্যায়।' (৪২ঃ ৪০) অন্য স্থানে আল্লাহ বলেনঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ

অর্থাৎ 'যদি তোমরা শাস্তি প্রদান কর তবে সেই পরিমাণই শাস্তি প্রদান কর, যে পরিমাণ শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।' (১৬ঃ ১২৬) সুতরাং এই তিন জায়গায় বাড়াবাড়ি, অন্যায় এবং শাস্তির কথা বিনিময় হিসেবে বলা হয়েছে, নচেৎ প্রকৃতপক্ষে ওটা বাড়াবাড়ি, অন্যায় এবং শাস্তি নয়। হযরত ইকরামা (রাঃ) এবং হযরত কাতাদার (রঃ) উক্তি এই যে, প্রকৃত অত্যাচারী ঐ ব্যক্তি যে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এই কালেমাকে অস্বীকার করে। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে যে, যখন হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর উপর জনগণ আক্রমণ চালিয়েছিল সেই সময় দুই ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারের (রাঃ) নিকট আগমন করে বলেনঃ 'মানুষতো কাটাকাটি মারামরি করতে রয়েছে। আপনি হযরত উমারের (রাঃ) পুত্র এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবী। আপনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন না কেন?' তিনি বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমান ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন।' তারা বলেনঃ 'এই নির্দেশ কি আল্লাহ তা'আলার নয় যে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত অশান্তি অবশিষ্ট থাকে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'আমরা তো যুদ্ধ করতে থেকেছি, শেষ পর্যন্ত অশান্তি দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ধর্ম জয়যুক্ত হয়েছে। এখন তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে যেন আবার অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য ধর্মগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কোন একজন লোক তাঁকে বলেনঃ 'হে আবূ আব্দির রহমান! আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছেন কেন? আপনি এই পন্থা গ্রহণ করেছেন যে,হজ্বের পর হজ্ব করে চলেছেন, প্রতি দ্বিতীয় বছরে হজ্ব করে থাকেন, অথচ হজ্বের ফযীলত আপনার নিকট গোপনীয় নয়।' তখন তিনি বলেনঃ ' হে ভ্রাতুষ্পুত্র! জেনে রেখো যে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি (১) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সঃ) উপর ঈমান আনয়ন করা (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠিত করা (৩) রমযানের রোযা রাখা (৪) যাকাত প্রদান করা (৫) বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করা।'

তখন লোকটি বলেনঃ 'আপনি কি কুরআন পাকের এই নির্দেশ শুনেননি 'মুসলমানদের দু'টি দল যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের

মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। অতঃপর এর পরেও যদি একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তবে তোমরা বিদ্রোহী দলটির সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা পুনরায় আল্লাহর বাধ্য হয়ে যায়।' অন্য জায়গায় রয়েছে 'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না অশান্তি দূরীভূত হয়।'

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে আমরা এর উপর আমল করেছি। তখন ইসলাম দুর্বল ছিল এবং মুসলমানদের সংখ্যা অল্প ছিল। যে ইসলাম গ্রহণ করতো তার উপর অশান্তি এসে পড়তো। তাকে হয় হত্যা করা হতো না হয় কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। অবশেষে এই পবিত্র ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে এবং অনুসারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে ও অশান্তি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে।' লোকটি তখন বলেন, 'আচ্ছা তাহলে বলুন যে, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?' তিনি বলেনঃ 'হযরত উসমানকে (রাঃ) তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন. যদিও তোমরা এটা পছন্দ কর না। আর হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর আপন চাচাতো ভাই ও তাঁর জামাতা ছিলেন, অতঃপর অঙ্গুলির ইশারায় বলেন এই হচ্ছে তাঁর বাড়ী যা তোমাদের সামনে রয়েছে।'

| | |
|---|---|
| **১৯৪। নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান, অতঃপর যে কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তবে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে, তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, আল্লাহ সংযমশীলদের সঙ্গী।** | ١٩٤- اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○ |

ষষ্ঠ হিজরীর যীলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণ (রাঃ) সমভিব্যাহারে উমরা (ছোট হজ্ব) করার জন্যে মক্কা শরীফের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু মুশরিকরা তাঁদেরকে 'হুদায়বিয়া' প্রান্তরে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। অবশেষে এই শর্তের উপর তাদের সাথে সন্ধি হয় যে, তাঁরা আগামী বছর উমরা করবেন

এবং এ বছর ফিরে যাবেন। যুকা'দাহ্ও নিষিদ্ধ মাস ছিল বলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, নিষিদ্ধ মাসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধ করতেন না। তবে যদি তাঁর উপর কেউ আক্রমণ করতো তাহলে সেটা অন্য কথা। এমনকি যুদ্ধ করতে করতে নিষিদ্ধ মাস এসে পড়লে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিতেন। হুদায়বিয়ার প্রান্তরেও যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, হযরত উসমান (রাঃ)-কে মুশরিকরা শহীদ করে ফেলেছে যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণী নিয়ে মক্কায় গিয়েছিলেন; তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর চৌদ্দশো সাহাবী (রাঃ)-এর নিকট একটি বৃক্ষের নীচে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর যখন তিনি জানতে পারেন যে, ওটা ভুল সংবাদ তখন তিনি তাঁর ইচ্ছা স্থগিত রাখেন এবং সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর পরে যা ঘটবার তা ঘটেছিল। অনুরূপভাবে 'হাওয়াযিন' গোত্রের সাথে হুনায়েনের যুদ্ধ হতে যখন তিনি অবকাশ লাভ করেন তখন মুশরিকরা তায়েফে গিয়ে দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে অবরোধ করেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ স্থায়ী হয়। অবশেষে কয়েকজন সাহাবীর (রাঃ) শাহাদাতের পর এই অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার দিকে ফিরে যান। 'জা'আররানা' নামক স্থান হতে তিনি উমরাহর ইহরাম বাঁধেন। এখানে যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্য বন্টন করেন। তাঁর এই উমরাহ যুকা'দাহ মাসে সংঘটিত হয়। এটা ছিল হিজরী অষ্টম সনের ঘটনা। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যারা তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে তোমরাও তাদের প্রতি ঐ পরিমাণই অত্যাচার কর। অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারেও ন্যায়ের প্রতি খেয়াল রেখো। এখানেও অত্যাচারের বিনিময় অত্যাচার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন অন্যান্য জায়গায় শাস্তির বিনিময়কেও 'শাস্তি' শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অন্যায়ের বিনিময়কে অন্যায় দ্বারাই বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়, যেখানে মুসলমানদের কোন মর্যাদা বা সম্মান ছিল না। সেখানে তাঁদের প্রতি জিহাদেরও নির্দেশ ছিল না। অতঃপর এই আয়াতটি মদীনা শরীফের জিহাদ সম্পর্কীয় নির্দেশের দ্বারা রহিত হয়। কিন্তু ইবনে জারীর (রঃ) এটা অগ্রাহ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, এই আয়াতটি মাদানী যা উমরাহ পুরো করার পর অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত মুজাহিদেরও (রঃ) উক্তি এটাই। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার কর ও তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, এরূপ লোকের উপরেই ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ তা'আলার সহায়তা ও সাহায্য রয়েছে।

১৯৫। এবং তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না। এবং হিতসাধন করতে থাকো, নিশ্চয় আল্লাহ হিতসাধনকারীদেরকে ভালবাসেন।

١٩٥- وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয়কারীদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (সহীহ বুখারী)। মনীষীগণও এই আয়াতের তাফসীরে একথাই বলেছেন। হযরত আবু ইমরান (রঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাজিরগণের একব্যক্তি কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্য বাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চালান এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তখন কতকগুলো লোক পরস্পর বলাবলি করে, দেখ! এই ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে।' হযরত আবু আইউব (রঃ) একথা শুনে বলেনঃ 'এই আয়াতের সঠিক ভাবার্থ আমরাই ভাল জানি। জেনে রেখো যে, এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহচর্যে থেকেছি, তাঁর সাথে যুদ্ধ জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছি এবং সদা তাঁর সাহায্যের কাজেই থেকেছি। অবশেষে ইসলাম বিজয়ীর বেশে প্রকাশিত হয় এবং মুসলমানেরা জয় লাভ করে। তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্রিত হয়ে এই পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীর (সঃ) সাহচর্যের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর সেবার কার্যে নিযুক্ত থেকেছি এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি। এখন আল্লাহর ফযলে ইসলাম বিস্তারলাভ করেছে, মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এতদিন ধরে না আমরা আমাদের সন্তানাদির খবরা-খবর নিতে পেরেছি, না মাল-ধন, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার দেখাশুনা করতে পেরেছি। সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া উচিত। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেন নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল। (সুনান-ই-আবূ দাউদ, তিরমিযী, সুনান-ই-নাসায়ী

ইত্যাদি)। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধের সময় মিশরীয়দের নেতা ছিলেন হযরত উকবা বিন আমের এবং সিরীয়দের নেতা ছিলেন হযরত ইয়াযীদ বিন ফুযালাহ বিন উবাইদ। হযরত বারা' বিন আযীব (রাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেনঃ 'যদি আমি একাকী শত্রু সারির মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং তথায় শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ি ও নিহত হয়ে যাই তবে কি এই আয়াত অনুসারে আমি নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংসকারীরূপে পরিগণিত হবো?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'না না; আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

অর্থাৎ '(হে নবী সঃ!) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তুমি শুধু তোমার জীবনেরই মালিক; সুতরাং শুধুমাত্র তোমার জীবনকেই কষ্ট দেয়া হবে।' বরং ঐ আয়াতটি তো তাদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করা হতে বিরত রয়েছিল (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই ইত্যাদি)।

জামেউত্ তিরমিযীর অন্য একটি বর্ণনায় এটুকু বেশীও রয়েছে যে, মানুষের পাপের উপর পাপ কাজ করে যাওয়া এবং তওবা না করাই হচ্ছে নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করা। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, মুসলমানগণ দামেস্ক অবরোধ করেন। 'ইয্দিশনাওআহ্' নামক গোত্রের এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখিয়ে শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে চলে যায়। জনগণ তাকে খারাপ মনে করে এবং হযরত আমর বিন আল আসের (রাঃ) নিকট অভিযোগ পেশ করে। হযরত আমর (রাঃ) তাকে ডেকে নেন এবং বলেনঃ 'কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছে—'নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন 'যুদ্ধের মধ্যে এইরূপ বীরত্ব দেখানো জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা নয় বরং আল্লাহর পথে মাল খরচ না করাই হচ্ছে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হওয়া। হযরত যহ্হাক বিন আবূ জাবিরাহ (রঃ)বলেন যে, আনসারগণ নিজেদের ধন-মাল আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করতে থাকতেন। কিন্তু এই বছর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তাঁরা খরচ হতে বিরত থাকেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে কার্পণ্য করা। হযরত নু'মান বিন বাশীর (রঃ) বলেন যে, পাপীদের আল্লাহর দয়া হতে নিরাশ হওয়াই হচ্ছে ধ্বংস হওয়া। আর মুফাস্সিরগণও বলেন যে, পাপ করার পর ক্ষমা হতে নিরাশ হয়ে গিয়ে পুনরায় পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়াই হচ্ছে স্বীয় হস্তগুলোকে ধ্বংস করা।

تهلكه শব্দের ভাবার্থ আল্লাহর শাস্তিও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত কারাযী (রঃ) প্রভৃতি মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যুদ্ধে যেতো এবং সাথে কোন খরচ নিয়ে যেতো না। তখন হয় তারা ক্ষুধায় মারা যাবে না হয় তাদের বোঝা অন্যদের ঘাড়ে চেপে বসবে। তাই এই আয়াতে তাদেরকে বলা হচ্ছে—আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা হতে তাঁর পথে খরচ কর এবং তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। যে ক্ষুধা পিপাসায় বা পায়ে হেঁটে হেঁটে মরে যাবে।' এর সাথে সাথে যাদের কাছে কিছু রয়েছে তাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তোমরা মানুষের হিতসাধন করতে থাকো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন। তোমরা পুণ্যের প্রত্যেক কাজে খরচ করতে থাকো। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় আল্লাহর পথে খরচ করা হতে বিরত থেকো না, এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ধ্বংস টেনে আনবে। সুতরাং হিতসাধন করা হচ্ছে বড় রকমের আনুগত্য যার নির্দেশ এখানে হচ্ছে যে, হিতসাধনকারীগণ আল্লাহ তা'আলার বন্ধু।

১৯৬। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরাহ সম্পূর্ণ কর; কিন্তু তোমরা যদি বাধা প্রাপ্ত হও তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই উৎসর্গ কর এবং কুরবানীর জন্তুগুলো স্বস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করো না; কিন্তু কেউ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় বা তার মস্তক যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, তবে সে রোযা, কিংবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে, অতঃপর যখন তোমরা শান্তিতে থাকো, তখন যে ব্যক্তি হজ্বের সাথে উমরাহরও ফলভোগ কামনা

١٩٦- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

করে তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই উৎসর্গ করবে, কিন্তু কেউ যদি তা প্রাপ্ত না হয় তবে হজ্বের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হও তখন সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখবে; এটা তারই জন্যে–যার পরিজন পবিত্রতম মসজিদে উপস্থিত না থাকে এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখো যে আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

পূর্বে যেহেতু রোযার বর্ণনা হয়েছিল অতঃপর জিহাদের বর্ণনা হয়েছে এখানে হজ্বের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং নির্দেশ দেয়া হচ্ছে–'তোমরা হজ্ব ও উমরাহকে পূর্ণ কর।' বাহ্যিক শব্দ দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হজ্ব ও উমরাহ আরম্ভ করার পর সে গুলো পূর্ণ করা উচিত। সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, হজ্বব্রত ও উমরাহ ব্রত আরম্ভ করার পর ওগুলো পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য যদিও উমরাহব্রত ওয়াজিব ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দু'টি উক্তি রয়েছে, যেগুলো আমি 'কিতাবুল আহ্কামের' মধ্যে পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন- 'পূর্ণ করার অর্থ এই যে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধবে।' হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন, এগুলো পূর্ণ করার অর্থ এই যে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধবে। তোমাদের এই সফর হবে হজ্ব ও উমরাহর উদ্দেশ্যে। 'মীকাতে' (যেখান হতে ইহরাম বাঁধতে হয়) পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে 'লাব্বায়েক' পাঠ আরম্ভ করবে। তোমাদের অভিপ্রায় ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন ইহলৌকিক কার্য সাধনের জন্যে হবে না। তোমরা হয়তো বেরিয়েছো নিজের কাজে মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তোমাদের খেয়াল হলো যে, এসো আমরা হজ্ব ও উমরাহব্রত পালন করে নেই। এভাবেও হজ্ব ও উমরাহ আদায় হয়ে যাবে বটে কিন্তু পূর্ণ হবে না। পূর্ণ করা এই যে, শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই বাড়ী হতে বের হবে।' হযরত মাকহূল (রঃ) বলেন যে, ওগুলো পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে ওগুলো 'মীকাত' হতে আরম্ভ করা।

হযরত উমার (রাঃ) বলেন যে, ওগুলো পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে ওদু'টো পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা এবং উমরাহকে হজ্বের মাসে আদায় না করা । কেননা কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছেঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলো নির্দিষ্ট।' (২ঃ ১৯৭) হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ (রঃ) বলেন যে, হজ্বের মাস গুলোতে উমরাহ পালন করা পূর্ণ হওয়া নয়। তিনি জিজ্ঞাসিত হন যে, মুহাররম মাসে উমরাহ করা কিরূপ? তিনি উত্তরে বলেনঃ 'মানুষ ওকেতো পূর্ণই বলতেন।' কিন্তু এই উক্তিটি সমালোচনার যোগ্য। কেননা,এটা প্রমাণিত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চারটি উমরাহ করেন এবং চারটিই করেন যু'কাদা মাসে। প্রথমটি হচ্ছে 'উমরাতুল হুদায়বিয়া' হিজরী ৬ষ্ঠ সনের যু'কাদা মাসে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'উমরাতুল কাযা' হিজরী সপ্তম সনের যু'কাদা মাসে। তৃতীয়টি হচ্ছে 'উমরাতুল জা'আররানা' হিজরী অষ্টম সনের যু'কাদা মাসে এবং চতুর্থটি হচ্ছে ঐ উমরাহ যা তিনি হিজরী দশম সনে বিদায় হজ্বের সাথে যু'কাদা মাসে আদায় করেন। এই চারটি উমরাহ ছাড়া হিজরতের পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আর কোন উমরাহ পালন করেননি। হাঁ, তবে তিনি হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ 'রমযান মাসে উমরাহ করা আমার সাথে হজ্ব করার সমান (পুণ্য)। একথা তিনি তাঁকে এজন্যেই বলেছিলেন যে, তাঁর সাথে হজ্বে যাওয়ার তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) যানবাহনের অভাবে তাঁকে সাথে নিতে পারেননি। যেমন সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে এই ঘটনাটি পূর্ণভাবে নকল করা হয়েছে। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) তো পরিষ্কারভাবে বলেন যে, এটা হযরত উম্মে হানীর (রাঃ) জন্যে বিশিষ্ট ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হজ্ব ও উমরাহর ইহ্রাম বাঁধার পর ওদু'টো পূর্ণ না করেই ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। হজ্ব ঐ সময় পূর্ণ হয় কুরবানীর দিন (দশই জিলহজ্বে) যখন 'জামারা-ই-উকবাকে' পাথর মারা হয়, বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা হয় এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ান হয়। এখন হজ্ব পূর্ণ হয়ে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হজ্ব 'আরাফার' নাম এবং উমরাহ হচ্ছে তাওয়াফের নাম। হযরত আবদুল্লাহর (রঃ) কিরআত হচ্ছে নিম্নরূপঃ-

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ অর্থাৎ 'তোমরা হজ্ব ও উমরাহকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর।' সুতরাং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত গেলেই উমরাহ পূর্ণ হয়ে যায়। হযরত সাঈদ বিন যুবাইরের (রঃ) নিকট এটা আলোচিত হলে তিনি বলেন 'হযরত

ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কিরআতও এটাই ছিল।' হযরত শা'বীর (রঃ) পঠনে 'ওয়াল উমরাতু' রয়েছে। তিনি বলেন যে, উমরাহ ওয়াজিব নয়। তবে তিনি এর বিপরীতও বর্ণনা করেছেন। বহু হাদীসে কয়েকটি সনদসহ হযরত আনাস (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীদের (রাঃ) একটি দল হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্ব ও উমরাহ এ দু'টোকেই একত্রিত করেছেন এবং বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) বলেছেনঃ 'যার নিকট কুরবানীর জন্তু রয়েছে সে যেন হজ্ব ও উমরাহর একই সাথে ইহরাম বাঁধে।' অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত উমরাহ হজ্বের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছে। আবূ মুহাম্মদ বিন আবি হাতীম (রঃ) স্বীয় কিতাবের মধ্যে একটি বর্ণনা এনেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তার নিকট হতে যাফরানের সুগন্ধি আসছিল। সে জুব্বা পরিহিত ছিল। সে জিজ্ঞেস করে 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ইহরামের ব্যাপারে নির্দেশ কি?' তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'প্রশ্নকারী কোথায়?' সে বলে–'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি বিদ্যমান রয়েছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেন, 'যাফরানযুক্ত কাপড় খুলে ফেলো এবং শরীরকে খুব ভাল করে ঘর্ষণ করে গোসল করে এসো ও যা তুমি তোমার হজ্বের জন্যে করে থাকো তাই উমরাহর জন্যেও কর।' এই হাদীসটি গরীব। কোন কোন বর্ণনায় গোসল করার ও এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ নেই। একটি বর্ণনায় তার নাম লায়লা বিন উমাইয়া (রাঃ) এসেছে। অন্য বর্ণনায় সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রাঃ) রয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে–'তোমরা যদি বাধা প্রাপ্ত হও তবে যা সহজ প্রাপ্য হয় তাই উৎসর্গ কর। মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন যে,এই আয়াতটি হিজরী ষষ্ঠ সনে হুদায়বিয়ার প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়, যখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মক্কা যেতে বাধা দিয়েছিল এবং ঐ সম্বন্ধেই পূর্ণ একটি সূরা আল ফাত্হ্ অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) অনুমতি লাভ করেন যে, তাঁরা যেন সেখানেই তাঁদের কুরবানীর জন্তুগুলো যবাহ্ করে দেন। ফলে সত্তরটি উষ্ট্র যবাহ্ করা হয়, মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং ইহরাম ভেঙ্গে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশ শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) প্রথমে কিছুটা সংকোচবোধ করেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন যে, সম্ভবতঃ এই নির্দেশকে রহিতকারী কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং বাইরে এসে মস্তক মুণ্ডন করেন, তাঁর দেখাদেখি সবাই এ কাজে অগ্রসর হন। কতকগুলো লোক মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কতকগুলো লোক চুল ছেঁটে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মস্তক

মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা করুণা বর্ষণ করুন।' জনগণ বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যাঁরা চুল ছেঁটেছেন তাঁদের জন্যেও প্রার্থনা করুন।' তিনি পুনরায় মুণ্ডনকারীদের জন্যে ও প্রার্থনা করেন। তৃতীয়বারে চুল ছোটকারীদের জন্যেও তিনি প্রার্থনা করেন। এক একটি উষ্ট্রে সাতজন করে লোক অংশীদার ছিলেন। সাহাবীদের (রাঃ) মোট সংখ্যা ছিল চৌদ্দশো। তাঁরা হুদায়বিয়া প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন যা 'হারাম' শরীফের সীমা বহির্ভূত ছিল। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, ওটা 'হারাম' শরীফের সীমান্তে অবস্থিত ছিল।

আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, যারা শত্রু কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হবে শুধু তাদের জন্যেই কি এই নির্দেশ, না যারা রোগের কারণে বাধ্য হয়ে পড়েছে তাদের জন্যেও এই অনুমতি রয়েছে যে, তারা ঐ জায়গাতেই ইহরাম ভেঙ্গে দেবে, মস্তক মুণ্ডন করবে এবং কুরবানী করবে? হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে তো শুধুমাত্র প্রথম প্রকারের লোকদের জন্যেই এই অনুমতি রয়েছে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), তাউস (রঃ), যুহরী (রঃ) এবং যায়েদ বিন আসলামও (রঃ) এ কথাই বলেন। কিন্তু মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তির হাত পা ভেঙ্গে গেছে কিংবা সে রুগ্ন হয়ে পড়েছে বা খোঁড়া হয়ে গেছে সে ব্যক্তি হালাল হয়ে গেছে। সে আগামী বছর হজ্ব করে নেবে। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেনঃ 'আমি এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবূ হুরাইরার (রাঃ) নিকটও বর্ণনা করেছি। তাঁরাও বলেছেন—'এটা সত্য।' সুনান-ই-আরবা'আর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ), আলকামা (রাঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), আতা' (রঃ) এবং মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, রুগ্ন হয়ে পড়া এবং খোঁড়া হয়ে যাওয়াও এ রকমই ওজর। হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টকেই এ রকমই ওজর বলে থাকেন।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত যুবাইর বিন আবদুল্লাহর (রাঃ) কন্যা যবাআহ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন,—'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার হজ্ব করবার ইচ্ছে হয়; কিন্তু আমি রুগ্ন থাকি।' রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ 'হজ্বে চলে যাও এবং শর্ত কর যে, (তোমার) ইহরাম সমাপনের ওটাই স্থান যেখানে তুমি রোগের কারণে থেমে যেতে বাধ্য হয়ে পড়বে। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন আলেম

বলেন যে, হজ্ব শর্ত করা জায়েয। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন, 'যদি এই হাদীসটি সঠিক হয় তবে আমারও উক্তি তাই।' ইমাম বায়হাকী (রঃ) ও হাফিযদের মধ্যে অন্যান্যগণ বলেন যে, এই হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-'যা সহজ প্রাপ্য হয় তাই কুরবানী করবে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'উষ্ট্র-উষ্ট্রী, বলদ-গাভী, ছাগ-ছাগী এবং ভেড়া-ভেড়ী এই আট প্রকারের মধ্য হতে ইচ্ছে মত যবাহ করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে শুধু ছাগীও বর্ণিত আছে এবং আরও বহু মুফাস্সিরও এটাই বলেছেন। ইমাম চতুষ্টয়েরও এটাই মাযহাব। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উমার (রাঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন যে, এর ভাবার্থ শুধুমাত্র উষ্ট্র ও গাভী। খুব সম্ভব তাঁদের দলীল হুদায়বিয়ার ঘটনাই হবে। তথায় কোন সাহাবী হতে ছাগ-ছাগী যবাহ করা বর্ণিত হয়নি। তাঁরা একমাত্র গরু ও উটই কুরবানী দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তাঁরা বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমরা সাত জন করে মানুষ এক একটি গরু ও উটে শরীক হয়ে যাবো।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, যার যে জন্তু যবাহ করার ক্ষমতা রয়েছে সে তাই যবাহ করবে। যদি ধনী হয় তবে উট, যদি এর চেয়ে কম ক্ষমতাবান হয় তবে গরু, এর চেয়েও কম ক্ষমতা রাখলে ছাগল যবাহ করবে। হযরত উরওয়া (রঃ) বলেন যে, এটা মূল্যের আধিক্য ও স্বল্পতার উপর নির্ভর করে। জমহূরের কথা মত ছাগ-ছাগী দেয়াই যথেষ্ট। তাঁদের দলীল হচ্ছে এই যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে সহজ লভ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কমপক্ষে ঐ জিনিষ যাকে কুরবানী বলা যেতে পারে। আর কুরবানীর জন্তু হচ্ছে উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া। যেমন জ্ঞানের সমুদ্র কুরআন পাকের ব্যাখ্যাতা এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিতৃব্য পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার ছাগলের কুরবানী দিয়েছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'যে পর্যন্ত কুরবানীর জন্তু তার স্বস্থানে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করো না। এর সংযোগ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ -এর সঙ্গে রয়েছে, فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ -এর সঙ্গে নয়। ইবনে জারিরের (রঃ) এখানে ত্রুটি হয়ে গেছে। কারণ এই যে, হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে ও

তাঁর সহচরবৃন্দকে যখন হারাম শরীফে যেতে বাধা প্রদান করা হয়, তখন তাঁরা সবাই হারামের বাইরেই মস্তক মুণ্ডন এবং কুরবানীও করেন কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার সময় এটা জায়েয নয়। যে পর্যন্ত না কুরবানীর প্রাণী যবাহ্র স্থানে পৌঁছে যায় এবং হাজীগণ তাঁদের হজ্ব ও উমরাহর যাবতীয় কার্য হতে অবকাশ লাভ করেন–যদি তাঁরা একই সাথে দু'টোরই ইহরাম বেঁধে থাকেন। কিংবা ঐ দু'টোর একটি কার্য হতে অবকাশ লাভ করেন, যদি তারা শুধুমাত্র হজ্বেরই ইহরাম বেঁধে থাকেন বা 'হজ্বে তামাত্তোর নিয়্যাত করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন,–'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবাই তো ইহরাম ভেঙ্গে দিয়েছে; কিন্তু আপনি যে ইহরামের অবস্থাতেই রয়েছেন?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'হাঁ, আমি আমার মাথাকে আঠা যুক্ত করেছি এবং আমার কুরবানীর প্রাণীর গলদেশে চিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছি। সুতরাং যে পর্যন্ত না এটা যবাহ্ করার স্থানে পৌঁছে যায় সে পর্যন্ত আমি ইহরাম ভেঙ্গে দেবো না।'

এরপরে নির্দেশ হচ্ছে যে, রুগ্ন ও মস্তক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি 'ফিদিয়া' দেবে। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মা'কাল (রঃ) বলেনঃ 'আমি কুফার মসজিদে হযরত কা'ব বিন আজরার (রাঃ) পাশে বসে ছিলাম। তাঁকে আমি এই আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, 'আমাকে রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সময় আমার মুখের উপর উকুন বয়ে চলছিল। আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমার অবস্থা যে এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আমি তা ধারণাই করিনি। তুমি কি একটি ছাগী যবাহ্ করারও ক্ষমতা রাখো না?' আমি বলি–আমি তো দরিদ্র লোক। তিনি বলেনঃ 'যাও মস্তক মুণ্ডন কর এবং তিনটি রোযা রাখ বা ছ'জন মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় সোয়া সের সোয়া ছটাক) করে খাদ্য দিয়ে দাও।'

' সুতরাং এই আয়াতটি আমারই সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং নির্দেশ হিসেবে এ রকম প্রত্যেক ওজরযুক্ত লোকের জন্যেই প্রযোজ্য।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত কা'ব বিন আজরা (রাঃ) বলেনঃ 'আমি হাঁড়ির নীচে জ্বাল দিচ্ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় আমার মুখের উপর দিয়ে উকুন বয়ে চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এ অবস্থায় দেখে এ মাসআলাটি আমাকে বলে দেন।' অন্য আর একটি বর্ণনায় রয়েছে,

হযরত কা'ব বিন আজরা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে হুদায়বিয়ায় ছিলাম। সে সময় আমরা ইহরামের অবস্থায় ছিলাম এবং মুশরিকরা অমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল। আমার মাথায় বড় বড় চুল ছিল যাতে অত্যধিক উকুন হয়ে গিয়েছিল। উকুনগুলো আমার মুখের উপর দিয়ে বয়ে চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় আমাকে বলেন–'উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, না তোমার মাথাকে? অতঃপর তিনি মস্তক মুণ্ডনের নির্দেশ দেন।' তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর বর্ণনায় রয়েছে, 'অতঃপর আমি মস্তক মুণ্ডন করি ও একটি ছাগী কুরবানী দেই।'

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন نُسُكٌ অর্থাৎ কুরবানী হচ্ছে একটি ছাগী। আর রোযা রাখলে তিন দিন এবং সাদকা করলে এক ফরক (পায়মান বা পরিমাপ যন্ত্র) মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা।' হযরত আলী (রাঃ), মুহাম্মদ বিন কা'ব (রঃ), আলকামা (রঃ), ইবরাহীম (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), আতা' (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং রাবী' বিন আনাসেরও (রঃ) ফতওয়া এটাই। তাফসীর-ই-ইবনে আবি হাতিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত কা'ব বিন আজরাকে (রঃ) তিনটি মাসআলা জানিয়ে দিয়ে বলেছিলেনঃ 'এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটির উপর তুমি আমল করলেই যথেষ্ট হবে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেখানে أو শব্দ দিয়ে দু-তিনটি রূপ বর্ণনা করা হয় সেখানে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার থাকে। হযরত মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), আতা' (রঃ), তাঊস (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), হামিদ আ'রাজ (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ আলেমেরও এটাই মাযহাব যে, ইচ্ছে করলে এক ফরক অর্থাৎ তিন সা' (সাড়ে সাত সের) ছ'জন মিসকীনের মধ্যে বন্টন করতে হবে এবং কুরবানী করলে একটি ছাগী কুরবানী করতে হবে। এই তিনটির মধ্যে যেটি ইচ্ছে হয় পালন করতে হবে।

পরম করুণাময় আল্লাহ এখানে যেহেতু অবকাশ দিতেই চান এজন্যেই সর্বপ্রথম রোযার বর্ণনা দিয়েছেন, যা সর্বাপেক্ষা সহজ। অতঃপর সাদকার কথা বলেছেন এবং সর্বশেষে কুরবানীর বর্ণনা দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহর (সঃ) যেহেতু সর্বোত্তমের উপর আমল করবার ইচ্ছা, তাই তিনি সর্বপ্রথম ছাগল কুরবানীর বর্ণনা দিয়েছেন, অতঃপর ছ'জন মিসকীনকে খাওয়ানোর কথা বলেছেন এবং সর্বশেষে তিনটি রোযার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং শৃংখলা হিসেবে

দু'টোরই অবস্থান অতি চমৎকার। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ 'তার উপর খাদ্যের নির্দেশ দেয়া হবে। যদি তার কাছে তা বিদ্যমান থাকে তবে তা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করবে। নচেৎ রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ছাগলের মূল্য নির্ণয় করবে এবং তা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করবে, অতঃপর তা সাদকা করে দেবে। নতুবা অর্ধ সা' এর পরিবর্তে একটা রোযা রাখবে। হযরত হাসান বসরীর (রঃ) মতে যখন মুহরিমের মস্তকে কোন রোগ হয় তখন সে মস্তক মুণ্ডন করবে এবং নিম্নলিখিত তিনটির মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা ফিদ্ইয়াহ্ আদায় করবেঃ (১) রোযা দশদিন। (২) দশজন মিসকীনকে আহার করান, প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মাকুক' খেজুর ও এক 'মাকুক' গম দিতে হবে। (৩) একটি ছাগল কুরবানী করা। হযরত ইকরামাও (রঃ) দশ মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর কথাই বলেন। কিন্তু এই উক্তিটি সঠিক নয়। কেননা, মারফু' হাদীসে এসেছে যে, রোযা তিনটি, ছ'জন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো ও একটি ছাগল কুরবানী করা। এই তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। বলা হচ্ছে যে, ছাগল কুরবানী করবে বা তিনটি রোযা রাখবে অথবা ছ'জন মিসকীনকে আহার করাবে। হাঁ, এই শৃংখলা রয়েছে ইহরামের অবস্থায় শিকারকারীর জন্যেও। যেমন কুরআন কারীমের শব্দ রয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্রবিদগণের ইজমা'ও রয়েছে। কিন্তু এখানে শৃংখলার প্রয়োজন নেই। বরং ইচ্ছাধীন রাখা হয়েছে। তাউস (রঃ) বলেন যে, এই কুরবানী ও সাদকা মক্কাতেই করতে হবে। তবে রোযা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই করতে পারে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ইবনে জা'ফরের (রাঃ) গোলাম হযরত আবূ আসমা (রাঃ) বলেনঃ 'হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ)হজ্বে বের হন। তাঁর সাথে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হুসাইন (রাঃ) ছিলেন। আমি ইবনে জা'ফরের সঙ্গে ছিলাম। অমরা দেখি যে, একটি লোক ঘুমিয়ে রয়েছেন এবং তাঁর উষ্ট্রী তাঁর শিয়রে বাঁধা রয়েছে। আমি তাঁকে জাগিয়ে দেখি যে, তিনি হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)। হযরত ইবনে জা'ফর (রাঃ) তাঁকে উঠিয়ে নেন। অবশেষে আমরা 'সাকিয়া' নামক স্থানে পৌছি। তথায় আমরা বিশ দিন পর্যন্ত তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকি। একদা হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'অবস্থা কেমন?' হযরত হুসাইন (রাঃ) তাঁর মস্তকের প্রতি ইঙ্গিত করেন। হযরত আলী (রাঃ তাঁকে মস্তক মুণ্ডনের নির্দেশ দেন। অতঃপর উট যবাহ্ করেন।' তাহলে যদি তাঁর এই উট কুরবানী করা ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্যে হয়ে থাকে তবে তো ভাল কথা। আর যদি এটা ফিদইয়ার জন্যে হয়ে থাকে তবে এটা স্পষ্ট কথা যে, এই কুরবানী মক্কার বাইরে করা হয়েছিল।

এরপরে ইরশাদ হচ্ছে যে,যে ব্যক্তি হজ্বে তামাত্তু করে সেও কুরবানী করবে, সে হজ্ব ও উমরাহ্‌র ইহরাম এক সাথে বেঁধে থাকুক অথবা প্রথমে উমরাহ্‌র ইহরাম বেঁধে ওর কার্যাবলী শেষ করার পর হজ্বের ইহরাম বেঁধে থাকুক। শেষেরটাই প্রকৃত 'তামাত্তু' এবং ধর্মশাস্ত্রবিদদের উক্তিতে এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তবে সাধারণ 'তামাত্তু' বলতে দু'টোকেই বুঝায়। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনাকারী তো বলেন যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ও (সঃ) হজ্বে তামাত্তু করেছিলেন। অন্যান্যগণ বলেন যে, তিনি হজ্ব ও উমরাহ্‌র ইহরাম এক সাথে বেঁধে ছিলেন। তাঁরা সবাই বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল। সুতরাং আয়াতটিতে এই নির্দেশ রয়েছে যে, হজ্বে তামাত্তুকারী যে কুরবানীর উপর সক্ষম হবে তাই করবে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে একটি ছাগল কুরবানী করা। গরুর কুরবানীও করতে পারে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহও (সঃ) তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছিলেন, তাঁরা সবাই হজ্বে তামাত্তু করেছিলেন।' (তাফসীর -ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। এর দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে তামাত্তুর ব্যবস্থা শরীয়তে রয়েছে।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, 'কুরআন মাজীদে তামাত্তুর আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সাথে হজ্বে তামাত্তু করেছি। অতঃপর কুরআন কারীমেও এর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং রাসূলুল্লাহও (সঃ) এটা হতে বাধা দান করেননি। জনগণ নিজেদের মতানুসারে এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।' ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা হযরত উমার (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের মতে ইমাম বুখারীর এই কথা সম্পূর্ণরূপেই সঠিক। হযরত উমার (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে যে, তিনি জনগণকে এটা হতে বাধা দিতেন এবং বলতেন, 'আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কিতাবকে গ্রহণ করি তবে ওর মধ্যে হজ্ব ও উমরাহকে পুরো করার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা হজ্ব ও উমরাহ্‌কে আল্লাহর জন্যে পুরো কর।' (২ঃ ১৯৬) তবে এটা মনে রাখা দরকার যে, হযরত উমারের (রাঃ) এই বাধা প্রদান হারাম হিসেবে ছিল না। বরং এ জন্যেই ছিল যে, যেন মানুষ খুব বেশী করে হজ্ব ও উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করে।

এরপরে বলা হচ্ছে—যে ব্যক্তি প্রাপ্ত না হয় সে হজ্বের মধ্যে তিনটি রোযা রাখবে এবং হজ্বব্রত সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তনের সময় আর সাতটি রোযা রাখবে।

সুতরাং পূর্ণ দশটি রোযা হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরবানীর উপর সক্ষম না হবে সে রোযা রাখবে। তিনটি রোযা হজ্বের দিনগুলোতে রাখবে। আলেমদের মতে এই রোযাগুলো আরাফার দিনের অর্থাৎ ৯ই জিল হজ্ব তারিখের পূর্ববর্তী দিনগুলোতে রাখাই উত্তম। হযরত আতা' (রঃ)-এর উক্তি এটাই। কিংবা ইহ্‌রাম বাঁধা মাত্রই রাখবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীর উক্তি এটাই। কেননা, কুরআন মাজীদে فِى الْحَجِّ শব্দ রয়েছে। হযরত তাউস (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি মনীষী এটাও বলেন যে, শাওয়াল মাসের প্রথম দিকেই এই রোযাগুলো রাখা বৈধ। হযরত শা'বী (রঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন যে, এই রোযাগুলোর মধ্যে যদি আরাফার দিনের রোযা সংযোজিত করে শেষ করে তবুও চলবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও নকল করা হয়েছে যে, আরাফার দিনের পূর্বে যদি দু'দিনের দু'টো রোযা রাখে এবং তৃতীয় দিন আরাফার দিন হয় তবে এও জায়েয হবে। হযরত ইবনে উমারও (রাঃ) একথাই বলেন। হযরত আলীরও (রাঃ) উক্তি এটাই।

যদি কোন ব্যক্তির এই তিনটি রোযা বা দু'একটি রোযা ছুটে যায় এবং 'আইয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ ঈদুল আয্‌হার পরবর্তী তিনদিন এসে পড়ে তবে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উমারের (রাঃ) উক্তি এই যে, এই ব্যক্তি এ দিনগুলোতেও এই রোযাগুলো রাখতে পারে (সহীহ বুখারী)। ইমাম শাফিঈরও (রাঃ) প্রথম উক্তি এটাই। হযরত আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। তাদের দলীল এই যে, الْحَجِّ শব্দটি সাধারণ। সুতরাং এই দিনগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সহীহ মুসলিমের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, 'আইয়্যামে তাশরীক' হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তা'আলার যিকির করার দিন।

অতঃপর সাতটি রোযা রাখতে হবে হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তনের পর। এর ভাবার্থ এক তো এই যে, ফিরে যখন স্বীয় অবস্থান স্থলে পৌঁছে যাবে। সুতরাং ফিরবার সময় পথেও এই রোযাগুলো রাখতে পারে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও হযরত আতা' (রাঃ) একথাই বলেন। কিংবা এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বদেশে পৌঁছে যাওয়া। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এটাই বলেন। আরও বহু তাবেঈনের মাযহাব এটাই। এমনকি হযরত ইবনে জাবিরের (রঃ) মতে এর উপরে ইজমা' হয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফের একটি সুদীর্ঘ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, 'হাজ্বাতুল

বিদা'য় রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমরার সাথে হজ্বে তামাত্তু' করেন এবং 'যুলহুলায়ফায়' কুরবানী দেন। তিনি কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়েছিলেন। তিনি উমরাহ করেন অতঃপর হজ্ব করেন। জনগণও তাঁর সাথে হজ্বে তামাত্তু করেন। কতকগুলো লোক কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়েছিলেন; কিন্তু কতকগুলো লোকের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল না। মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেন, যাদের নিকট কুরবানীর জন্তু রয়েছে তারা হজ্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইহরামের অবস্থাতেই থাকবে। আর যাদের কাছে কুরবানীর জন্তু নেই তারা বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতঃ সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়িয়ে ইহরাম ভেঙ্গে দেবে। মস্তক মুন্ডন করবে অথবা ছেঁটে দেবে। অতঃপর হজ্বের ইহরাম বেঁধে নেবে। কুরবানী দেয়ার ক্ষমতা না থাকলে হজ্বের মধ্যে তিনটি রোযা রাখবে এবং সাতটি রোযা স্বদেশে ফিরে গিয়ে রাখবে।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এই সাতটি রোযা স্বদেশে ফিরে গিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর বলা হচ্ছে–'এই পূর্ণ দশ দিন।' এই কথাটি জোর দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে, 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কানে শুনেছি এবং হাতে লিখেছি।'

কুরআন মাজীদের মধ্যেও রয়েছে ঃ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ অর্থাৎ না কোন পাখী যা তার দু'পাখার সাহায্যে উড়ে থাকে।' (৬ঃ ৩৮) অন্য স্থানে রয়েছে وَلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ অর্থাৎ '(হে নবী সঃ) তুমি তোমার ডান হাত দ্বারা লিখ না।' (২৯ঃ ৪৮) আর এক জায়গায় রয়েছে–'আমি মূসার (আঃ) সঙ্গে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করেছি এবং আরও দশ দিয়ে তা পূর্ণ করেছি। অতঃপর তার প্রভুর নির্দিষ্ট চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হলো।' অতএব এসব জায়গায় যেমন শুধু জোর দেয়ার জন্যেই এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তেমনই এই বাক্যটিও জোর দেয়ার জন্যেই আনা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে পূর্ণ করার নির্দেশ। كَامِلَةٌ শব্দটির ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা কুরবানীর পরিবর্তে যথেষ্ট। এরপরে বলা হচ্ছে যে, এই নির্দেশ ঐসব লোকের জন্যে যাদের পরিবার পরিজন 'মসজিদে হারামে' অবস্থানকারী না হয়। হারামবাসী যে হজ্বে তামাত্তু করতে পারে না এর উপর তো ইজমা' রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একথাই বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন– 'হে মক্কাবাসী! তোমরা হজ্বে তামাত্তু করতে পার না। তামাত্তু বিদেশী লোকদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। তোমাদেরকে তো সামান্য দূর যেতে হয়। অল্প দূর

গিয়েই তোমরা উমরাহ্র ইহরাম বেঁধে থাকো।' হযরত তাউসেরও (রঃ) ব্যাখ্যা এটাই। কিন্তু হযরত আতা' (রঃ) বলেন যে, যারা মীকাতের (ইহরাম বাঁধার স্থানসমূহ) মধ্যে রয়েছে তাদের জন্যেও এই নির্দেশ। তাদের জন্যেও তামাত্তু জায়েয নয়। মাকহুলও (রাঃ) একথাই বলেন। তাহলে আরাফা, মুয্দালাফা, আরনা' এবং রাজী'র অধিবাসীদের জন্যেও এই নির্দেশ। যুহরী (রঃ) বলেন যে, যারা মক্কা শরীফ হতে একদিনের পথের বা তার চেয়ে কম পথের ব্যবধানের উপর রয়েছে, তারা হজ্বে তামাত্তু করতে পারে, অন্যেরা পারে না। হযরত আতা' (রঃ) দু'দিনের কথাও বলেছেন।

ইমাম শাফিঈর (রঃ) মাযহাব এই যে, হারামের অধিবাসী এবং যারা এরূপ দূরবর্তী জায়গায় রয়েছে যেখানে মক্কাবাসীদের জন্যে নামায কসর করা জায়েয নয় এদের সবারই জন্যেই এই নির্দেশ। কেননা, এদেরকেও মক্কার অধিবাসীই বলা হবে। এদের ছাড়া অন্যান্য সবাই মুসাফির। সুতরাং তাদের সবারই জন্যে হজ্বের মধ্যে তামাত্তু করা জায়েয। অতঃপর বলা হচ্ছে—'আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং যেসব কাজের উপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন তা থেকে বিরত থাক। জেনে রেখো যে, তাঁর অবাধ্যদেরকে তিনি কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন।

---

**১৯৭। হজ্বের মাসগুলো সুবিদিত; অতএব কেউ যদি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হজ্বের সংকল্প করে, তবে সে হজ্বের মধ্যে সহবাস, দুষ্কার্য ও কলহ করতে পারবে না, এবং তোমরা যে কোন সৎকর্ম কর না কেন, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন; আর তোমরা (নিজেদের) পাথেয় সঞ্চয় করে নাও; বস্তুতঃ নিশ্চিত উৎকৃষ্টতম পাথেয় হচ্ছে আত্মসংযম; এবং হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।**

١٩٧- اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ○

আরবী ভাষাবিদগণ বলেন যে, প্রথম বাক্যটির ভাবার্থ হচ্ছে—হজ্ব হলো ঐ মাসগুলোর হজ্ব যা সুবিদিত ও নির্দিষ্ট। সুতরাং হজ্বের মাসগুলোতে ইহরাম বাঁধা অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধা হতে বেশী পূর্ণতা প্রদানকারী। তবে অন্যান্য মাসের ইহরামও সঠিক। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (রাঃ), ইমাম সাওরী (রঃ) ও ইমাম লায়েস (রঃ) বলেন যে, বছরের যে কোন মাসে ইহরাম বাঁধা যেতে পারে। তাঁদের দলীল يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ এই আয়াতটি। অর্থাৎ '(হে নবী সঃ!) তারা তোমাকে নব চন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল—এগুলো হচ্ছে জনসমাজের উপকারের জন্যে ও হজ্বের জন্যে সময় নিরূপক। (২ঃ ১৮৯) তাঁদের দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে এই যে, হজ্ব ও উমরাহ এ দু'টোকেই نُسُكٌ বলা হয়েছে, আর উমরাহর ইহরাম প্রত্যেক মাসেই বাঁধা যায়; সুতরাং হজ্বের ইহরামও প্রত্যেক মাসেই বাঁধা যাবে। তবে হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, হজ্বের ইহরাম শুধুমাত্র হজ্বের মাসগুলোতেই বাঁধতে হবে এবং অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধলে তা সঠিক হবে না। কিন্তু ওর দ্বারা উমরাহও হতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে তাঁর দু'টি উক্তি রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত জাবির (রাঃ), হযরত আতা' (রঃ) এবং হযরত মুজাহিদেরও (রঃ) এটাই মাযহাব যে, হজ্বের ইহরাম হজ্বের মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে বাঁধা সঠিক নয়। তাদের দলীল হচ্ছে اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ এই আয়াতটি। আরবী ভাষাবিদগণের আর একটি দলের মতে আয়াতটির এই শব্দগুলোর ভাবার্থ এই যে, হজ্বের সময় হচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, এই মাসগুলোর পূর্বে ইহরাম বাঁধা ঠিক হবে না। যেমন নামাযের সময়ের পূর্বে কেউ নামায পড়ে নিলে নামায ঠিক হয় না। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন, 'আমাকে মুসলিম বিন খালিদ সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ইবনে জুরাইজের নিকট হতে শুনেছেন, তাঁকে উমার বিন আতা' বলেছেন, তাঁর কাছে ইকরামা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 'কোন ব্যক্তির জন্যে এটা উচিত নয় যে, সে হজ্বের মাসগুলো ছাড়া অন্য মাসে হজ্বের ইহরাম বাঁধে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলো সুবিদিত।' এই বর্ণনাটির আরও বহু সনদ রয়েছে। একটি সনদে আছে যে, এটাই সুন্নাত।

সহীহ ইবনে খুজাইমার মধ্যেও এই বর্ণনাটি নকল করা হয়েছে। 'উসূলে'র গ্রন্থসমূহেও এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টির এভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে, এটা সাহাবীর (রাঃ) উক্তি এবং তিনি সেই সাহাবী যিনি কুরআন কারীমের ব্যাখ্যাতা। সুতরাং এ উক্তি যেন রাসূলুল্লাহরই (সঃ) উক্তি। তাছাড়া তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর একটি মারফু' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- 'হজ্বের মাস ছাড়া অন্য মাসে ইহরাম বাঁধা কারও জন্যে উচিত নয়।' এর ইসনাদও উত্তম। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ), তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হজ্বের মাসগুলোর পূর্বে হজ্বের ইহরাম বাঁধা যেতে পারে কি? তিনি উত্তরে বলেন, 'না।' হাদীসটি মাওকুফ হওয়াই সঠিক কথা। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) 'সুন্নাত এটাই'-এই উক্তি দ্বারা সাহাবীর (রাঃ) এই ফতওয়ার গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে।

اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ -এর ভাবার্থ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার বর্ণনা করেন, 'শাওয়াল, যুল'কা'দা এবং যিলহজ্ব মাসের দশদিন (সহীহ বুখারী)।' এই বর্ণনাটি তাফসীর-ই-ইবনে জারীর এবং তাফসীর-ই-মুস্তাদরিক-ই-হাকিম এর মধ্যেও রয়েছে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। হযরত আতা' (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইবরাহিম নাখঈ (রঃ), হযরত শা'বী (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত ইবনে সীরীন (রঃ), হযরত মাকহূল (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত যহ্হাক বিন মাযাহিম (রঃ), হযরত রাবী' বিন আনাস (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত যহ্হাক বিন মাযাহিম (রঃ) এবং হযরত মুকাতিল বিন হিব্বানও (রঃ) এ কথাই বলেন। হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) এবং আবূ সাউরেরও (রঃ) মাযহাব এটাই। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেন। اَشْهُرٌ শব্দটি বহুবচন। এর ব্যবহার পূর্ণ দু'মাস এবং তৃতীয় মাসের কিছু অংশের উপরেও হতে পারে। যেমন বলা হয়-'আমি এই বছর বা আজকে তাকে দেখেছি।' সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সারা বছর ধরে বা সারা দিন ধরে তো তাকে দেখেনি। বরং দেখার সময় অল্পই হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়ই এ কথাই বলা হয়ে থাকে। এই নিয়মে এখানেও তৃতীয় মাসের উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের মধ্যেও فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ (২ঃ ২০৩) রয়েছে। অর্থাৎ 'যে দু'দিনে

তাড়াতাড়ি করে।' অথচ ঐ তাড়াতাড়ি দেড় দিনের হয়ে থাকে। কিন্তু গণনায় দু'দিন বলা হয়েছে।' ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈর (রঃ) প্রথম উক্তি এটাও রয়েছে যে, শাওয়াল, যুল'কা'দা এবং যুলহাজ্জির পুরো মাসই। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইবনে শিহাব (রঃ) আতা' (রঃ), জাবির বিন আবদুল্লাহ (রঃ), তাউস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), উরওয়াহ্ (রঃ), রাবী' (রঃ )এবং কাতাদা (রঃ) হতে এটাই বর্ণিত রয়েছে। একটি মারফু' হাদীসেও এটা এসেছে। কিন্তু ওটা মাওযূ। কেননা, এর বর্ণনাকারী হচ্ছে হুসাইন বিন মুখারিক, যার উপরে এই দুর্নাম রয়েছে যে, সে হাদীস বানিয়ে থাকে। সুতরাং হাদীসটির মারফু' হওয়া সাব্যস্ত হয় না। ইমাম মালিকের (রঃ) এই উক্তিকে মেনে নেয়ার পর এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যুল-হাজ্ব মাসে উমরা করা ঠিক হবে না। এটা ভাবার্থ নয় যে, দশই যুলহাজ্বের পরেও হজ্ব হতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হজ্বের মাসগুলোতে উমরা করা ঠিক নয়। ইবনে জারীরও (রঃ) এ উক্তিগুলির এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন যে, হজ্বের সময় তো মিনার দিন (দশই যিল হজ্ব) অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই শেষ হয়ে যায়। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন-'আমার জানা মতে এমন কোন আলেম নেই যিনি হজ্বের মাসগুলো ছাড়া অন্যান্য মাসে উমরাহ করাকে এই মাসগুলোর মধ্যে উমরাহ করা অপেক্ষা উত্তম মনে করতে সন্দেহ করে থাকেনঃ কাসিম বিন মুহাম্মদ (রঃ) কে ইবনে আউন হজ্বের মাসগুলিতে উমরাহ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন-'মনীষীগণ একে পূর্ণ উমরাহ মনে করতেন না।' হযরত উমার (রাঃ) এবং উসমানও (রাঃ) হজ্বের মাসগুলো ছাড়া অন্যান্য মাসে উমরাহ করাকে পছন্দ করতেন। এমনকি তাঁরা হজ্বের মাসগুলোতে উমরাহ করতে নিষেধ করতেন। (পূর্ব আয়াতটির তাফসীরে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুল'কা'দা মাসে চারটি উমরাহ আদায় করেছেন। অথচ যুল'কা'দা মাসও হচ্ছে হজ্বের মাস। সুতরাং হজ্বের মাসগুলোতে উমরাহ করা জায়েয প্রমাণিত হলো, এ সম্পর্কে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন-অনুবাদক)

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 'যে ব্যক্তি এই মাসগুলোতে হজ্বের সংকল্প করে অর্থাৎ হজ্বের ইহরাম বাঁধে।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হজ্বের ইহরাম বাঁধা ও তা পুরো করা অবশ্য কর্তব্য। 'ফরয' শব্দের এখানে অর্থ হচ্ছে সংকল্প করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ওদেরকে বুঝান হয়েছে যারা

হজ্ব ও উমরাহর ইহরাম বেঁধেছে। আতা' (রঃ) বলেন যে, এখানে 'ফরয' এর ভাবার্থ হচ্ছে ইহরাম। ইবরাহীম (রঃ) ও যহ্হাক (রঃ)-এরও উক্তি এটাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইহরাম বেঁধে 'লাব্বায়েক' পাঠের পর কোন স্থানে থেমে যাওয়া উচিত নয়। অন্যান্য মনীষীদেরও এটাই উক্তি। কোন কোন মনীষী বলেন যে, 'ফরয' শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে 'লাব্বায়েক' পাঠ। رَفَثٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে সহবাস। যেমন কুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاءِ كُمْ

অর্থাৎ 'রোযার রাত্রে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য হালাল করা হলো।' (২ঃ১৮৭) ইহরামের অবস্থায় সহবাস এবং ওর পূর্ববর্তী সমস্ত কার্যই হারাম। যেমন প্রেমালাপ করা, চুম্বন দেয়া এবং স্ত্রীদের বিদ্যমানতায় এসব কথা আলোচনা করা। কেউ কেউ পুরুষদের মজলিসেও এসব কথা আলোচনা করাকে رَفَثٌ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। একদা তিনি ইহরামের অবস্থায় এই ধরনেরই একটি কবিতা পাঠ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, স্ত্রী লোকদের সামনে এই প্রকারের কথা বললে رَفَثٌ হয়ে থাকে। رَفَثٌ -এর নিম্নতম পর্যায় এই যে, সহবাস প্রভৃতির আলোচনা করা, কটু কথা বলা, ইশারা ইঙ্গিতে সহবাস করা, নিজ স্ত্রীকে বলা যে ইহরাম ভেঙ্গে গেলেই সহবাস করা হবে, আলিঙ্গন করা, চুম্বন দেয়া ইত্যাদি সব কিছুই رَفَثٌ -এর অন্তর্গত। ইহরামের অবস্থায় এসব করা হারাম। বিভিন্ন ব্যাখ্যাতার বিভিন্ন উক্তির সমষ্টি এই।

فُسُوقٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাধ্য হওয়া, শিকার করা, গালি দেয়া ইত্যাদি। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে যে, মুসলমানকে গালি দেয়া হলো ফিস্‌ক এবং তাকে হত্যা করা হলো কুফর। আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জন্তু যবাহ করাও হচ্ছে ফিস্‌ক। যেমন কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছেঃ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ অর্থাৎ 'অথবা ফিস্‌ক যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাহ করা হয়েছে।' (৬ঃ ১৪৫) খারাপ উপাধি দ্বারা ডাক দেয়াও ফিস্‌ক। যেমন কুরআন পাকে ঘোষিত হয়েছে وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ অর্থাৎ 'তোমরা অন্যকে কলংক যুক্ত উপাধিতে সম্বোধন করো না।' (৪৯ঃ ১১) সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক অবাধ্যতাই ফিস্‌কের অন্তর্গত। এটা সর্বদাই অবৈধ বটে; কিন্তু সম্মানিত মাসগুলিতে এর অবৈধতা আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'য়ালা

বলেনঃ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা এই সম্মানিত মাসগুলোতে তোমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করো না।' (৯ঃ ৩৬) অনুরূপভাবে হারাম শরীফের মধ্যে এর অবৈধতা বৃদ্ধি পায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ وَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ 'হারামের মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহীতার ইচ্ছে করবে, তাকে আমি বেদনাদায়ক শাস্তি দেবো।' (২২ঃ ২৫)

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে 'ফিস্ক' এর ভাবার্থ হচ্ছে ঐ কাজ যা ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন শিকার করা, মস্তক মুণ্ডন করা বা ছেঁটে দেয়া এবং নখ কাটা ইত্যাদি। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। কিন্তু সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে ওটাই যা আমরা বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ প্রত্যেক পাপের কাজ হতে বিরত রাখা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে–যে ব্যক্তি এই বায়তুল্লাহর হজ্ব করে সে যেন 'রাফাস' এবং 'ফিস্ক' না করে, তবে সে পাপ হতে এমনই মুক্ত হয়ে যাবে যেমন তার জন্মের দিন ছিল।'

এর পরে ইরশাদ হচ্ছে–হজ্বে কলহ নেই।' অর্থাৎ হজ্বের সময় এবং হজ্বের আরকান ইত্যাদির মধ্যে তোমরা কলহ করো না। এর পূর্ণ বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন যে, হজ্বের মাসগুলো নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং তাতে কম-বেশী করা চলবে না এবং পূর্বেও পরেও করা চলবে না। মুশরিকরা এরূপ করে থাকতো। কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় এর নিন্দে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরাইশরা 'মাশআর-ই-হারামের পাশে মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং আরবের বাকি লোক আরাফায় অবস্থান করতো। অতঃপর তারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়তো এবং একে অপরকে বলতো, 'আমরা সঠিক পথের উপর এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পথের উপর রয়েছি।' এখানে এটা হতে নিষেধ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর (সঃ) মাধ্যমে হজ্বের সময়, আরকান ও আহকাম এবং অবস্থানের স্থান ইত্যাদি সব কিছু বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এখন আর কেউ অপরের উপর কোন গৌরব প্রকাশ করতে পারবে না বা হজ্বের দিন পরিবর্তন করতে পারবে না। কাজেই সকলকেই এখন কলহ-বিবাদ হতে বিরত থাকতে হবে। ভাবার্থ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা হজ্বের সফরে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না, একে অপরকে রাগান্বিত করো না এবং কেউ কাউকেও গালি দিয়ো না।

বহু মুফাস্সিরের এই উক্তিও রয়েছে, আবার অনেকের পূর্বের উক্তিও রয়েছে। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, 'কারও নিজের দাসকে শাসন গর্জন করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মারতে পারে না।' কিন্তু আমি বলি যে, যদি নিজের ক্রীতদাসকে মেরেও দেয় তবুও কোন দোষ নেই। এর প্রমাণ মুসনাদ-ই -আহমাদের নিম্নের এই হাদীসটি–হযরত আবূ বকরের (রাঃ) কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হজ্বের সফরে ছিলাম। আমরা 'আরায' নামক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পাশে বসেছিলেন এবং আমি আমার জনক হযরত আবূ বকরের (রাঃ) নিকটে বসেছিলাম। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উটের আসবাবপত্র হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পরিচারকের নিকট ছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তার অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ পর সে এসে পড়ে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'উট কোথায়?' সে বলে, 'গত রাত্রে উটটি হারিয়ে গেছে।' হযরত আবূ বকর (রাঃ) এতে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন 'একটি মাত্র উট তুমি দেখতে পারলে না, হারিয়ে দিলে?' একথা বলে তিনি তাকে প্রহার করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মুচকি হেসে বলেন, 'তোমরা দেখ, তিনি ইহরামের অবস্থায় কি কাজ করছেন?' এই হাদীসটি সুনান-ই-আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্র মধ্যেও রয়েছে। পূর্ববর্তী কোন একজন মনীষী হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এই প্রহার ছিল হজ্ব শেষ হওয়ার পর। কিন্তু এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহর (সঃ) 'দেখ, তিনি ইহরামের অবস্থায় কি করছেন!'-একথা বলার মধ্যে খুবই সূক্ষ্ম অস্বীকৃতি রয়েছে এবং এর মধ্যে এইভাব নিহিত রয়েছে যে, তাকে ছেড়ে দেয়াই উত্তম ছিল।

তাফসীর-ই-মুসনাদ-ই-আবদ বিন হামীদের মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় হজ্ব পূর্ণ করলো যে, কোন মুসলমান তার হাতের দ্বারা এবং মুখের দ্বারা কষ্ট পেলো না, তার পূর্বের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে গেলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তোমরা যে কোন সৎকার্য কর না কেন আল্লাহ তা অবগত আছেন।' উপরে যেহেতু অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বাধা দেয়া হয়েছে, কাজেই এখানে পুণ্যের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন প্রতিটি সৎকার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তোমরা হজ্বের সফরে নিজেদের সাথে পাথেয় নিয়ে যাও। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জনগণ পাথেয় ছাড়াই হজ্বের সফরে বেরিয়ে পড়তো। পরে তারা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়াতো। এজন্যেই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পাথেয় সাথে নিয়ে যায়। হযরত ইকরামা (রাঃ) এবং হযরত উয়াইনাও (রঃ) একথাই বলেন। সহীহ্ বুখারী, সুনান -ই-নাসাঈ প্রভৃতির মধ্যেও এই বর্ণনাগুলো রয়েছে। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, ইয়ামনবাসীরা এরূপ করতো এবং বলতো–'আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল।' হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যখন তারা ইহরাম বাঁধতো তখন তাদের কাছে যে পাথেয় থাকতো তা তারা ফেলে দিতো এবং পুনরায় নতুনভাবে পাথেয় গ্রহণ করতো। এজন্যেই তাদের উপর এই নির্দেশ হয় যে, তারা যেন এরূপ না করে এবং আটা, ছাতু ইত্যাদি খাদ্য যেন পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যান্য আরও বহু বিশ্বস্ত মুফাসসিরও এরকমই বলেছেন। এমনকি হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তো একথাও বলেছেন যে, সফরে উত্তম পাথেয় রাখার মধ্যেই মানুষের মর্যাদা নিহিত রয়েছে। সাথীদের প্রতি মন খুলে খরচ করারও তিনি শর্ত আরোপ করতেন। ইহলৌকিক পাথেয়ের বর্ণনার সাথে আল্লাহ তা'আলা পারলৌকিক পাথেয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ বান্দা যেন তার কবর রূপ সফরে আল্লাহ তা'আলার ভয়কে পাথেয় হিসেবে সাথে নিয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে পোষাকের বর্ণনা দিয়ে বলেন وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ অর্থাৎ 'এবং খোদা -ভীরুতার পোষাকই হচ্ছে উত্তম।' (৭ঃ ২৬) অর্থাৎ বান্দা যেন বিনয়, নম্রতা, আনুগত্য এবং খোদা-ভীরুতার গোপনীয় পোষাক হতে শূন্য না থাকে। এমনকি এই গোপনীয় পোষাক বাহ্যিক পোষাক হতে বহু গুণে শ্রেয়।

একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পাথেয় গ্রহণ করে তা আখেরাতে তার উপকারে আসবে (তাবরানীর হাদীস)। এ নির্দেশ শুনে একজন দরিদ্র সাহাবী (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার নিকট তো কিছুই নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'এতটুকু তো রয়েছে যে, তোমাকে কারও কাছে ভিক্ষে করতে হয় না এবং উত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।' (তাফসীর ই- ইবনে-আবি হাতিম)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।' অর্থাৎ আমার শাস্তি ও পাকড়াওকে ভয় করতঃ তোমরা আমার নির্দেশকে অমান্য করো না তা হলেই মুক্তি পেয়ে যাবে এবং এটাই হবে জ্ঞানের পরিচায়ক।

১৯৮। তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নেই; অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তিত হও তখন পবিত্র স্মৃতি-স্থানের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর; এবং তিনি তোমাদেরকে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তদ্রূপ তাঁকে স্মরণ করো; এবং নিশ্চয় তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্গত ছিলে।

১৯৮- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে উকায, মুজিন্না এবং যুলমাজায্ নামে বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হজ্বের সময় সাহাবীগণ (রাঃ) ঐ বাজারগুলোতে ব্যবসা করার ব্যাপারে পাপ হয়ে যাবার ভয় করেন। ফলে তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা করলে কোন পাপ নেই। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, এই বিষয়টি সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, হজ্বের সময় ইহরামের পূর্বে অথবা ইহরামের পর হাজীদের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কিরআতে مِنْ رَّبِّكُمْ -এর পর فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ কথাটিও রয়েছে। হযরত ইবেন যুবাইর (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। অন্যান্য মুফাস্সিরগণও এর তাফসীর এরকমই করেছেন। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি লোক হজ্ব করতে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে ব্যবসাও করছে তার ব্যাপারে নির্দেশ কি? তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করে শুনান (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)।

মুসনাদ-ই-আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ উমামা তায়মী (রঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'হজ্বে আমরা জন্তু ভাড়ার উপর দিয়ে থাকি, আমাদেরও হজ্ব হয়ে যাবে কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'তোমরা কি

বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ কর না?' তোমরা কি আরাফায় অবস্থান কর না?' শয়তানকে কি তোমরা পাথর মার না? তোমরা কি মস্তক মুণ্ডন কর না?' তিনি বলেন, 'এইসব কাজতো আমরা করি।' তখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'তাহলে জেনে রেখো যে, একটি লোক এই প্রশ্নই নবী (সঃ)-কেও করেছিল এবং ওরই উত্তরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ এই আয়াতটি নিয়ে অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোকটিকে ডাক দিয়ে বলেন, 'তুমি হাজী। তোমার হজ্ব হয়ে গেছে।' মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাকের মধ্যেও এই বর্ণনাটি রয়েছে। 'তাফসীর' আব্দ বিন হামীদ' এর মধ্যে এটা আছে। কোন কোন বর্ণনায় শব্দেরও কিছু কম বেশী রয়েছে।

একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, 'তোমরা কি ইহরাম বাঁধ না?' আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনারা কি হজ্বের দিনেও ব্যবসা করতেন?' তিনি উত্তর দেন, 'ব্যবসায়ের মৌসুমই বা আর কোনটা ছিল?' عَرَفَاتٍ শব্দটিকে مُنْصَرِفٌ পড়া হয়েছে অথচ غَيْرِ مُنْصَرِفٌ হওয়ার দু'টি سَبَبْ ওর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ عَلَمِيَّتْ এবং تَانِيْثْ । কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটা বহুবচন। যেমন- مُسْلِمَاتٍ ও مُؤْمِنَاتٍ শব্দদ্বয়। এটা বিশেষ এক জায়গার নাম রাখা হয়েছে। এজন্যে মূলের প্রতি লক্ষ্য রেখেও مُنْصَرِفٌ পড়া হয়েছে।

عَرَفَةٌ ঐ জায়গার নাম যেখানে অবস্থান করা হজ্বের একটি কাজ। মুসনাদ-ই-আহমাদ ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবদুর রহমান বিন মুআম্মারুদ্দায়লী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'হজ্ব হচ্ছে আ'রাফায়।' একথা তিনি তিন বার বলেন। অতঃপর বলেন, 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই আরাফায় পৌঁছে গেল সে হজ্ব পেয়ে গেল। আর 'মিনা'র হচ্ছে তিন দিন। যে ব্যক্তি দু'দিনে তাড়াতাড়ি করলো তারও কোন পাপ নেই এবং যে বিলম্ব করলো তারও কোন পাপ নেই।' আরাফায় অবস্থানের সময় হচ্ছে নয়ই যিলহজ্ব তারিখে পশ্চিমে সূর্য হেলে যাওয়া থেকে নিয়ে দশই যিলহজ্ব তারিখের ফজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা, নবী (সঃ) বিদায় হজ্বে যুহরের নামাযের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমার নিকট হতে তোমরা তোমাদের হজ্বের নিয়মাবলী শিখে নাও।'

হযরত ইমাম মালিক (রঃ) ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ইমাম শাফিঈর (রঃ) এটাই মাযহাব যে, দশ তারিখের ফজরের পূর্বে যে ব্যক্তি আরাফায় পৌঁছে গেল

সে হজ্ব পেয়ে গেল। হযরত আহমাদ (রঃ) বলেন যে, ৯ই যিলহজ্ব তারিখের প্রথম থেকেই হচ্ছে আরাফায় অবস্থানের সময়। তাঁর দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যার মধ্যে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুযদালিফায় নামাযের জন্যে অগ্রসর হন তখন একজন লোক তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি 'তাই' পাহাড় হতে আসছি। আমার আরোহণের পশুটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ফলে আমি বড়ই বিপদে পড়ে যাই। আল্লাহর শপথ। আমি প্রত্যেক পাহাড়ের উপরেই থেমেছি, আমার হজ্ব হয়েছে কি?' তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি এখানে আমাদের এই নামাযে পৌঁছে যাবে এবং চলার সময় পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করবে, আর এর পূর্বে সে আরাফাতেও অবস্থান করে থাকবে, রাতেই হোক বা দিনেই হোক, তবে তার হজ্ব পুরো হয়ে যাবে। ফরযিয়ত হতে সে অবকাশ লাভ করবে। (মুসনাদ-ই-আহমাদ ও সুনান-ই)। ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে সঠিক বলেছেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) নিকট আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁকে হজ্ব করিয়ে দেন। আরাফাতে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন عَرَفْتَ 'আপনি চিনতে পেরেছেন কি?' হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেন, আর্‌রাফতু অর্থাৎ' আমি নিচতে পেরেছি।' কেননা, এর পূর্বে আমি এখানে এসেছিলাম।' এজন্যেই এ স্থানের নাম 'আরাফা' হয়ে গেছে। হযরত আতা' (রঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং হযরত আবু মুজিলযির (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। আরাফাতের নাম 'মাশআরুল হারাম', 'মাশআরুল আকসা' এবং 'ইলাল'ও বটে। ঐ পাহাড়কেও আরাফাত বলে যার মধ্য স্থলে 'জাবালুর রহমত' রয়েছে।

আবূ তালিবের একটি বিখ্যাত কাসীদার মধ্যে এই অর্থের কবিতা রয়েছে। অজ্ঞতা-যুগের অধিবাসীরাও আরাফায় অবস্থান করতো। যখন রোদ পর্বত চূড়ায় এরূপভাবে অবশিষ্ট থাকতো যেরূপভাবে মানুষের মাথায় পাগড়ী থাকে, তখন তারা তথা হতে চলে যেতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্যাস্তের পর সেখান হতে প্রস্থান করেন। অতঃপর তিনি মুযদালিফায় পৌঁছে তথায় শিবির স্থাপন করেন এবং প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতেই একেবারে সময়ের প্রথমভাগে রাত্রির অন্ধকার ও দিবালোকের মিলিত সময়ে এখানে তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। ফজরের সময়ের শেষ ভাগে তিনি এখান হতে যাত্রা করেন। হযরত মাসূর বিন

মুখার্‌রামা (রাঃ) বলেন, 'নবী (সঃ) আরাফায় আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন এবং অভ্যাস মত আল্লাহর প্রশংসা কীর্তনের পর أَمَّا بَعْدُ বলে বলেন ঃ 'আজকের দিনই বড় হজ্ব। মুশরিক ও প্রতিমা পূজকেরা এখান হতে সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই প্রস্থান করতো, যে সময় মানুষের মাথায় পাগড়ী থাকার ন্যায় পর্বত শিখরে রৌদ্র অবশিষ্ট থাকতো। কিন্তু আমরা সূর্যাস্তের পর এখান হতে বিদায় গ্রহণ করবো।'

'মাশআরে হারাম' হতে তারা সূর্যোদয়ের পর রওয়ানা দিতো। তখন রোদ এতটুকু উপরে উঠতো যে,ঐ রোদ পর্বতের চূড়ায় এমনই প্রকাশ পেতো যেমন মানুষের মাথায় পাগড়ী প্রকাশ পায়। কিন্তু আমরা সুর্যোদয়ের পূর্বেই সেখান হতে যাত্রা করবো। আমাদের পদ্ধতি মুশরিকদের পদ্ধতির উল্টো।' (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই ও তাফসীর-ই-মুস্তাদরিক-ই-হাকিম)। ইমাম হাকিম (রঃ) এটাকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের (রঃ) শর্তের উপর সঠিক বলেছেন। এর দ্বারা এও সাব্যস্ত হলো যে, হযরত মাসূর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে এটা শুনেছেন। এ লোকদের কথা ঠিন নয় যাঁরা বলেন যে, হযরত মাসূর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে দেখেছেন; কিন্তু তাঁর নিকট হতে কিছুই শুনেননি। হযরত মারুর বিন সাভীদ (রঃ) বলেন–'আমি হযরত উমার (রাঃ)-কে আরাফাত হতে ফিরতে দেখেছি। ঐ দৃশ্য যেন আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। তাঁর মাথার অগ্রভাগে চুল ছিল না। তিনি স্বীয় উষ্ট্রের উপর আসীন ছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমার প্রত্যাবর্তনকে সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল পেয়েছি।'

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বিদায় হজ্বের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেন। যখন সূর্য লুপ্ত হয় এবং কিঞ্চিৎ হলদে বর্ণ প্রকাশ পায় তখন তিনি নিজের সওয়ারীর উপর হযরত উসামা বিন জায়েদ (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নেন। অতঃপর তিনি উষ্ট্রীর লাগাম টেনে ধরেন, ফলে উষ্ট্রীর মাথা গদির নিকটে পৌঁছে যায়। ডান হাতের ইশারায় তিনি জনগণকে বলতে বলতে যানঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা ধীরে-সুস্থে ও আরাম-আয়েশের সাথে চল। যখনই তিনি কোন পাহাড়ের সম্মুখীন হন তখন তিনি লাগাম কিছুটা ঢিল দেন যাতে পশুটি সহজে উপরে উঠতে পারে। মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি এক আযান ও দুই ইকামতের মাধ্যমে মাগরিব ও ইশার নামায

আদায় করেন। মাগরিব ও ইশার ফরয নামাজের মধ্যবর্তী সময় কোন সুন্নাত ও নফল নামায পড়েননি। অতঃপর শুয়ে পড়েন। সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়ার পর আযান ও ইকামতের মাধ্যমে ফজরের নামায আদায় করেন। তারপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করে 'মাশআরে হারামে' আসেন এবং কিবলামুখী হয়ে প্রার্থনায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতঃ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ব বর্ণনা করতে থাকেন। তারপর তিনি খুবই সকালে ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি এখান হতে রওয়ানা হয়ে যান। হযরত উসামা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখান হতে যাওয়ার সময় কেমন তালে চলেন'? তিনি উত্তরে বলেনঃ 'মধ্যম গতিতে তিনি সওয়ারী চালনা করেন। তবে রাস্তা প্রশস্ত দেখলে কিছু দ্রুত গতিতেও চালাতেন। (সহীহ বুখারীও সহীহ মুসলিম)।

অতঃপর বলা হচ্ছে–'আরাফা' হতে প্রত্যাবর্তিত হয়ে 'মাশআরে হারামে' আল্লাহকে স্মরণ কর।' অর্থাৎ এখানে দুই নামাযকে একত্রিত কর। হযরত আমর বিন মায়মুন (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)-কে 'মাশআরে হারাম' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি নীরব থাকেন। যাত্রীদল মুযদালিফায় অবতরণ করলে তিনি বলেনঃ 'প্রশ্নকারী কোথায়? এটাই হচ্ছে 'মাশআরে হারাম।' তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, মুযদালিফার প্রত্যেকটি জায়গাই হচ্ছে 'মাশআরে হারাম'। তিনি জনগণকে দেখতে পান যে, তারা 'কাযাহ' নামক স্থানে ভীড় করছে। তখন তিনি বলেনঃ "এই লোকগুলো এখানে ভীড় করছে কেন? এখানকার সব জায়গাইতো মাশআরুল হারাম।" আরও বহু তাফসীরকারক এটাই বলেছেন যে, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী প্রত্যেক স্থানই মাশআরুল হারাম। হযরত আতা' (রঃ) জিজ্ঞাসিত হনঃ 'মুযদালিফা কোথায়?' উত্তরে তিনি বলেনঃ 'আরাফা হতে রওয়ানা হয়ে আরাফা প্রান্তরের দুই প্রান্ত ছেড়ে গেলেই মুযদালিফা আরম্ভ হয়ে যায়। 'মুহাস্সার' নামক উপত্যকা পর্যন্ত এর শেষ সীমা। এর মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করা যায়। তবে আমি 'কাযাহে'র উপর থেমে যাওয়াই পছন্দ করি যাতে পথের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়। مَشَاعِرُ বলা হয় বাহ্যিক চিহ্নগুলোকে। মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত বলে তাকে 'মাশআরে হারাম' বলা হয়।

পূর্ববর্তী সাধু পুরুষদের একটি দলের এবং ইমাম শাফিঈর (রঃ) কোন কোন সহচর যেমন কাফফাল ও ইবনে খুযাইমার ধারণা এই যে,এখানে অবস্থান করা

হজ্বের একটি রুকন বিশেষ। এখানে থামা ছাড়া হজ্ব শুদ্ধ হয় না। কেননা, হযরত উরওয়া বিন মাযরাস (রঃ) হতে এই অর্থেরই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এই অবস্থানকে ওয়াজিব বলেছেন। হযরত ইমাম শাফিঈর (রঃ) বর্ণনায় এও রয়েছে যে,যদি কেউ এখানে না থামে তবে একটি কুরবানী করতে হবে। তাঁর দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে এটা মুস্তাহাব। সুতরাং না থামলেও কোন দোষ নেই। কাজেই এই তিনটি উক্তি হলো। এখানে এর আলোচনা খুব লম্বা করা আমরা উচিত মনে করি না।

একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে,আরাফাতের সমস্ত প্রান্তরই অবস্থান স্থল। আরাফাত হতে উঠো এবং মুযদালিফার প্রত্যেক সীমাও থামার জায়গা। তবে মুহাস্সার উপত্যকাটি নয়। মুসনাদ-ই-আহমাদের এই হাদীসের মধ্যে এর পরে রয়েছে যে, মক্কা শরীফের সমস্ত গলিই কুরবানীর জায়গা এবং 'আইয়্যামে তাশরীকের' (১১,১২ ও ১৩ই যিলহজ্ব) সমস্ত দিনই হচ্ছে কুরবানীর দিন। কিন্তু এই হাদীসটিও মুনকাতা'। কেননা, সুলাইমান বিন মূসা রাশদাক যুবাইর বিন মুতইমকে (রাঃ) পায়নি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর। কেননা, তিনি তোমাদেরকে সুপথ দেখিয়েছেন। হজ্বের আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই সুন্নাতকে প্রকাশিত করেছেন। অথচ তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অর্থাৎ এই সুপথ প্রদর্শনের পূর্বে কিংবা এই কুরআন পাকের পূর্বে অথবা এই রাসূল (সঃ)-এর পূর্বে প্রকৃতপক্ষে এই তিনটারই পূর্বে দুনিয়া ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

---

**১৯৯। অতঃপর যেখান হতে লোক প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।**

١٩٩- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

---

ثُمَّ শব্দটি এখানে خَبَرٌ -এর উপর خَبَرٌ -এর সংযোগ স্থাপনের জন্যে এসেছে, যেন শৃংখলা বজায় থাকে। আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে যেন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে

যে, তারা এখান থেকে মুযদালিফায় যাবে, যেন 'মাশআরে হারামের' নিকট আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে পারে। এটাও তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা সমস্ত লোকের সাথে আরাফাতে অবস্থান করবে, যেমন সর্বসাধারণ এখানে অবস্থান করতো। তবে অবশ্যই কুরাইশরা তাদের গৌরব ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্যে এই অবস্থান করে থাকতো। তারা 'হারাম শরীফে'র সীমা হতে বাইরে যেতো না এবং 'হারামে'র শেষ সীমায় অবস্থান করতো এবং বলতোঃ 'আমরা আল্লাহর ভক্ত এবং তাঁরই শহরের আমরা নেতা ও তাঁরই ঘরের খাদেম।'

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, কুরাইশ ও তাদের মতানুসারী লোকেরা মুযদালিফাতেই থেমে যেতো এবং নিজেদের নাম حُمْس রাখতো। অবশিষ্ট সমস্ত আরববাসী আরাফায় গিয়ে অবস্থান করতো এবং ওখান হতে ফিরে আসতো। এজন্যেই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, সর্বসাধারণ যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করতো, তোমরা সেখান হতে প্রত্যাবর্তন কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রাঃ), হযরত আতা' (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটাই বলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)ও এই তাফসীরই পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর উপর 'ইজমা' রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত যুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) বলেনঃ 'আমার উট আরাফায় হারিয়ে যায়, আমি উটটি খুঁজতে বের হই। তথায় আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অবস্থানরত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি বলি– 'এটা কেমন কথা যে, ইনি হচ্ছে حُمُس অথচ 'হারাম' শরীফের বাইরে এসে অবস্থান করছেন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে إِفَاضَة শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা হতে মিনায় যাওয়া। আর اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'ইমাম'। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, যদি এর বিপরীত ইজমা হওয়ার প্রমাণ না থাকতো তবে এই উক্তিটির প্রাধান্য হতো।

অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যার নির্দেশ সাধারণতঃ ইবাদতের পরে দেয়া হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয নামায সমাপ্ত করার পর তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন (সহীহ মুসলিম)। তিনি জনসাধারণকে 'সুবহানাল্লাহি'

'আল হামদুলিল্লাহি' এবং 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশ বার করে পড়ার নির্দেশ দিতেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এটাও বর্ণিত আছে যে, আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্ব) সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উম্মতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই ইরশাদও বর্ণিত হয়েছে যে, সমুদয় ক্ষমা প্রার্থনার নেতা হচ্ছে নিম্নের এই প্রার্থনাটিঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার দাস। আমি সাধ্যানুসারে আপনার আহাদ ও অঙ্গীকারের উপর রয়েছি। আমি যে অন্যায় করেছি তা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর যে আপনার নিয়ামত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার পাপকেও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এই দু'আটি রাত্রে পড়ে নেবে, যদি সে সেই রাত্রেই মারা যায় তবে সে অবশ্যই বেহেশতী হবে। আর যে ব্যক্তি এটা দিনে পড়বে, যদি ঐ দিনেই সে মৃত্যুবরণ করে তবে অবশ্যই সে জান্নাতী হবে (সহীহ বুখারী)। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে কোন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পাঠ করবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আপনি বলুনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার জীবনের উপরে বড়ই অত্যাচার করেছি এবং আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার নিকট হতে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।'

২০০। অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের (হজ্বের) অনুষ্ঠান গুলো সম্পন্ন করে ফেলো তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে স্মরণ করতে, তদ্রূপ আল্লাহকে স্মরণ কর– বরং তদপেক্ষা দৃঢ়তর ভাবে স্মরণ কর; কিন্তু মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেউ কেউ এরূপ আছে যারা বলে থাকে–হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন; এবং তাদের জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই।

٢٠٠- فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

২০১। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকে–হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং দোযখাগ্নির শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

٢٠١- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

২০২। তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্যে তারই অংশ রয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

٢٠٢- اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন–'হজ্ব সমাপনের পর খুব বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রথম বাক্যের একটি অর্থ তো এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিশু যেমন তার পিতা-মাতাকে স্মরণ করে ঐরূপ তোমরাও আল্লাহ তা'আলাকে

স্মরণ কর। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা হজ্বের সময় অবস্থানের স্থানে অবস্থান করতো। অতঃপর কেউ বলতো—'আমার পিতা একজন বড় অতিথি সেবক ছিলেন। তিনি সাধারণের কাজ করে দিতেন। তিনি দানশীলতা ও বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন ইত্যাদি। কাজেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এই সব বাজে কথা পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা কর।' অধিকাংশ মুফাস্সির এটাই বর্ণনা করেছেন। মোটকথা এই যে, তোমরা খুব বেশী আল্লাহর যিক্র কর। এজন্যেই تَمِيْز বা প্রভেদের উপর ভিত্তি করে اَوْاَشَدَّ-এর উপর 'যবর' দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে তোমরা তোমাদের বড়দের জন্যে গৌরববোধ করে থাকো সেইভাবেই আল্লাহকে স্মরণ কর। اَوْ দ্বারা এখানে خَبَر-এর সাদৃশ্য নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً اَوْ يَزِيْدُوْنَ خَشْيَةً اَوْ اَشَدُّ এবং اَوْ اَدْنٰى-এর মধ্যে خَبَرٌ -এর সাদৃশ্য প্রকাশের জন্যে او। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমুদয় স্থানে اَوْ শব্দটি কখনই সন্দেহের জন্যে নয়, বরং যার সংবাদ দেয়া হয়েছে তারই বিশ্লেষণের জন্যে। অর্থাৎ ঐ যিক্র এতটাই হবে বা তার চেয়েও বেশী হবে।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—'আল্লাহর যিক্র খুব বেশী করতঃ প্রার্থনা করতে থাক। কেননা, এটা হচ্ছে প্রার্থনা কবুলের সময়।' সাথে সাথে ঐ সব লোকের অমঙ্গল কামনা করা হচ্ছে যারা আল্লাহর নিকট শুধু দুনিয়া লাভের জন্যেই প্রার্থনা জানিয়ে থাকে এবং আখেরাতের দিকে ভ্রুক্ষেপই করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের জন্যে পরকালে কোনই অংশ নেই। হযরত আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা রয়েছে যে, কতকগুলো পল্লীবাসী এখানে অবস্থান করে শুধুমাত্র এই প্রার্থনা করতো, 'হে আল্লাহ! এই বছর ভালভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করুন যেন ফসল ভাল জন্মে এবং বহু সন্তান দান করুন ইত্যাদি।' কিন্তু মু'মিনদের প্রার্থনা উভয় জগতের মঙ্গলের জন্যেই হতো। এজন্যেই তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রার্থনার মধ্যে ইহজগত ও পরজগতের সমুদয় মঙ্গল একত্রিত করা হয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল হতে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। কেননা, দুনিয়ার মঙ্গলের মধ্যে নিরাপত্তা, শান্তি, সুস্থতা, পরিবার পরিজন, খাদ্য, শিক্ষা, যানবাহন, দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী এবং সম্মান ইত্যাদি সব কিছুই এসে গেল। আর আখেরাতের মঙ্গলের মধ্যে হিসাব সহজ হওয়া, ভয় সন্ত্রাস হতে মুক্তি পাওয়া, আমলনামা ডান হাতে পাওয়া এবং সম্মানের সাথে বেহেস্তে প্রবেশ করা ইত্যাদি সব কিছুই এসে গেল। এর পরে দোযখের শাস্তি হতে মুক্তি চাওয়া। এর ভাবার্থ এই যে, এরূপ কারণসমূহ আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত করে দেবেন। যেমন

যারা অবৈধ কাজ করে থাকে তা থেকে তারা বিরত থাকবে এবং পাপ কার্য পরিত্যাগ করবে ইত্যাদি। কাসিম (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর, যিক্‌রকারী জিহ্বা এবং ধৈর্যধারণকারী দেহ লাভ করেছে সে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল পেয়ে গেছে এবং দোযখের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করেছে।

সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই দু'আটিকে খুব বেশী পড়তেন। এই হাদীসে رَبَّنَا শব্দের পূর্বে اَللّٰهُمَّ শব্দটিও রয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন দু'আটি খুব বেশী পড়তেন?' উত্তরে তিনি এই দু'আটির কথাই বলেন (তাফসীর-ই-আহমাদ) হযরত আনাস (রাঃ) নিজেও যখন কোন দু'আ করতেন তখন তিনি এই দু''আটি ছাড়তেন না। হযরত সাবিত (রাঃ) একদা বলেন, 'জনাব! আপনার এই ভাইটি চায় যে, আপনারা তার জন্যে দু'আ করেন। তখন তিনি এই দু'আটি পড়েন।' অতঃপর কিছুক্ষণ বসে আলাপ আলোচনার পর তিনি চলে যাবার সময় আবার দু'আর প্রার্থনা জানালে তিনি বলেন, তুমি কি খণ্ড করতে চাচ্ছ? এই দু'আর মধ্যে তো সমস্ত মঙ্গল এসে গেছে (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি মুসলমান রুগ্ন ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে যান। তাঁকে তিনি দেখেন যে, একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেছেন এবং শুধু মাত্র অস্থির কাঠামো অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন প্রার্থনা জানাচ্ছিলে কি? তিনি বলেন 'হাঁ, আমি এই প্রার্থনা করছিলাম। 'হে আল্লাহ! আপনি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দিতে চান সেই শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন 'সুবহানাল্লাহ্! কারও মধ্যে ঐ শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে কি? তুমি رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ এই দু'আটি পড়নি কেন?' সুতরাং রুগ্ন ব্যক্তি তখন থেকে ঐ দু'আটিই পড়তে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন (তাফসীর-ই-আহমাদ)। 'রুকনে বানী হামাজ এবং 'রুকনে আস্ওয়াদের' মধ্যবর্তী স্থানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই দু'আটি পড়তেন (সুনান-ই-ইবনে মাজাহ ইত্যাদি।) কিন্তু এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি বলেন, 'যখন আমি 'রুকনের' পার্শ্ব দিয়ে গমন করি তখন দেখি যে, তথায় ফেরেশ্তা রয়েছেন এবং 'আমীন' বলছেন। তোমরা যখনই ওখান দিয়ে যাবে এই দু'আটি পড়বে (তাফসীর-ই-ইবনে-মিরদুওয়াই।)

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে, 'আমি একটি যাত্রী দলের সেবার কার্যে এই পারিশ্রমিকের উপর নিযুক্ত হয়েছি যে, তারা আমাকে তাদের সোয়ারীর উপর উঠিয়ে নেবে এবং হজ্বের সময় তারা আমাকে হজ্ব করবার অবকাশ দেবে ও অন্যান্য দিনে আমি তাদের সেবার কার্যে নিয়োজিত থাকবো। তাহলে বলুন, এভাবে আমার হজ্ব আদায় হবে কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ হ্যাঁ, বরং তুমি তো ঐ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে কুরআন মাজীদের মধ্যে أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا অর্থাৎ 'তারা যা অর্জন করেছে তাদের জন্যে তারই অংশ রয়েছে'—এই আয়াতটি ঘোষিত হয়েছে (মুস্তাদরিক-ই-হাকিম)।'

২০৩। এবং নির্ধারিত দিবসসমূহে আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর কেউ যদি দু'দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াতাড়ি করে তবে তার জন্যে কোন পাপ নেই, পক্ষান্তরে কেউ যদি দু'দিন বিলম্ব করে তবে তার জন্যেও পাপ নেই এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই সন্নিধানে সমবেত করা হবে।

٢٠٣- وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ দ্বারা أَيَّامِ تَشْرِيق (১১ই, ১২ই, ও ১৩ই যিলহজ্ব) কে বুঝানো হয়েছে এবং أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ দ্বারা যিলহজ্ব মাসের দশদিন অর্থ নেয়া হয়েছে। আইয়্যামে তাশরীকে ফরয নামাযের পর اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়্যামে তাশরীক আমাদের জন্যে অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে খুশীর দিন এবং এই দিনগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন (তাফসীর-ই আহমাদ)"। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'আইয়্যামে তাশরীক হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন (আহমাদ)। ইতিপূর্বে এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে

যে, আরাফার সমস্ত জায়গাই হচ্ছে অবস্থানের জায়গা এবং আইয়্যামে তাশরীক সবই হচ্ছে কুরবানীর দিন। এই হাদীসটিও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মিনার দিন হচ্ছে তিনটি। দু'দিনে তাড়াতাড়িকারী বা বিলম্বকারীর জন্যে কোন পাপ নেই। ইবনে জারিরের একটি হাদীসে রয়েছে যে, আইয়্যামে তাশরীক হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার দিন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন হাযাফাকে (রাঃ) এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন মিনার চতুর্দিকে ঘুরে ঘোষণা করেনঃ 'এই দিনগুলোতে কেউ যেন রোযা না রাখে। এই দিনগুলো হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।' অন্য একটি মুরসাল হাদীসের মধ্যে এটুকু বেশী আছে ঃ 'কিন্তু যার উপর কুরবানীর পরিবর্তে রোযা রয়েছে তার জন্য এটা অতিরিক্ত পুণ্য।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ঘোষণাকারী ছিলেন হযরত বাশার বিন সাহীম (রাঃ)। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে আনসার ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেনঃ 'হে জনমণ্ডলী! এই দিনগুলো রোযা রাখার দিন নয়, বরং এগুলো হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ হচ্ছে اَيَّامِ تَشْرِيْق এবং এ হচ্ছে চার দিন। দশই যিলহজ্ব ও তার পরবর্তী তিন দিন। অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্ব হতে ১৩ই যিলহজ্ব পর্যন্ত। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ), হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ), আতা' (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), আবূ মালিক (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), ইয়াহ্ইয়া বিন আবি কাসীর (রঃ), হাসান বস্‌রী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), যুহরী (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), যহ্হাক (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ), আতা' খুরাসানী (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটাই বলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'এ হচ্ছে তিন দিন ১০, ১১, ও ১২ই যিলহজ্ব। এই তিন দিনের মধ্যে যে দিন চাও কুরবানী কর। কিন্তু উত্তম হচ্ছে প্রথম দিন।' কিন্তু পূর্ব উক্তিটিই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের শব্দ দ্বারাও এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা বলা হয়েছে যে, দু'দিনের তাড়াতাড়ি ও বিলম্ব ক্ষমার্হ। কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈদের পরে তিন দিন হওয়াই উচিত এবং এই দিনগুলোতে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার সময় হচ্ছে কুরবানীর পশু

যবাহ্ করার সময়। পূর্বে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এ ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর (রঃ) মাযহাবই প্রাধান্য প্রাপ্ত। তা হলো এই যে, কুরবানীর সময় হচ্ছে ঈদের দিন হতে নিয়ে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত। 'আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর' এর ভাবার্থ নামায শেষের নির্দিষ্ট যিক্রগুলোও হতে পারে এবং সাধারণভাবে আল্লাহর যিক্রও ভাবার্থ হতে পারে। এর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এই সময় হচ্ছে আরাফার দিনের (৯ই যিলহজ্ব) সকাল থেকে নিয়ে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনের (১৩ই যিলহজ্ব) আসরের নামায পর্যন্ত। এ ব্যাপারে দারেকুতনির মধ্যে একটি মারফূ' হাদীসও রয়েছে। কিন্তু এর মারফূ' হওয়া সঠিক নয়।

হযরত উমার (রাঃ) তাঁর তাঁবুর মধ্যে তাকবীর পাঠ করতেন এবং তাঁর তাকবীর ধ্বনি শুনে বাজারে অবস্থানকারীরাও তাকবীর পাঠ করতো, ফলে মিনা প্রান্তর তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠতো। অনুরূপভাবে ভাবার্থ এও হতে পারে যে, শয়তানদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর যিক্র করতে হবে। তা হবে আইয়্যামে তাশরিকের প্রত্যেক দিনেই। সুনানে আবূ দাউদ প্রভৃতি হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ায় দৌড়ান, শয়তানদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ ইত্যাদি সমস্ত কাজই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যিক্র প্রতিষ্ঠার জন্যে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা হজ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করেন এবং পরে মানুষ এসব পবিত্র ভূমি ছেড়ে নিজ নিজ শহরে ও গ্রামে ফিরে যাবে, এজন্যে ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং বিশ্বাস রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁরই সম্মুখে একত্রিত করা হবে। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার তিনিই তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর তাঁরই সম্মুখে তোমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। সুতরাং তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, তাঁকে ভয় করতে থাকো।'

**২০৪। এবং মানব মণ্ডলীর মধ্যে এমনও আছে—পার্থিব জীবন সংক্রান্ত যার কথা তোমাকে চমৎকৃত করে তুলে, আর সে নিজের অন্তরস্থ (সততা) সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী করে থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সে হচ্ছে কঠোর শত্রুতা পরায়ণ ব্যক্তি।**

٢٠٤- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِي قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

٢٠٥- وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

২০৫। যখন সে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন সে পৃথিবীতে প্রধাবিত হয়ে অশান্তি উৎপাদন করে এবং শস্য ক্ষেত্র ও জীবজন্তু বিনাশ করে এবং আল্লাহ অশান্তি ভালবাসেন না।

٢٠٦- وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

২০৬। যখন তাকে বলা হয়-তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন প্রতিপত্তির অহমিকা তাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করে দেয়, অতএব জাহান্নামই তার জন্যে যথেষ্ট, এবং নিশ্চয় ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।

٢٠٧- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ○

২০৭। পক্ষান্তরে কোন কোন লোক এরূপ আছে-যে আল্লাহর পরিতুষ্টি সাধনের জন্যে আত্মবিক্রয় করে এবং আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত বান্দার প্রতি স্নেহপরায়ণ।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতগুলো আখনাস বিন শারীক সাকাফীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এই লোকটি মুনাফিক ছিল। প্রকাশ্যে সে মুসলমান ছিল বটে কিন্তু ভিতরে সে মুসলমানদের বিরোধী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আয়াতগুলো ঐ মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা হযরত যুবাইর (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্নাম করেছিল, যাঁদেরকে 'রাজী' নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। এই শহীদগণের প্রশংসায় শেষের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবং পূর্বের আয়াতগুলো মুনাফিকদের নিন্দে করে অবতীর্ণ হয়। কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতগুলো সাধারণ। প্রথম তিনটি আয়াত সমস্ত মুনাফিকের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং চুতর্থ আয়াতটি সমুদয় মুসলমানের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়। কাতাদাহ (রঃ) প্রভৃতি মনীষীর উক্তি এটাই এবং এটাই সঠিক। হযরত নাওফ বাককালী

(রঃ) যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলেরও পণ্ডিত ছিলেন, বলেনঃ "আমি এই উম্মতের কতকগুলো লোকের মন্দ-গুণ আল্লাহ তা'আলার অবতারিত গ্রন্থের মধ্যেই পাচ্ছি। বর্ণিত আছে যে, কতকগুলো লোক প্রতারণা করে দুনিয়া কামাচ্ছে। তাদের কথা তো মধুর চাইতেও মিষ্ট কিন্তু তাদের অন্তর নিম অপেক্ষাও তিক্ত। মানুষকে দেখানোর জন্যে তারা ছাগলের চামড়া পরিধান করে, কিন্তু তাদের অন্তর নেকড়ে বাঘের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার উপর সে বীরত্ব প্রকাশ করে এবং আমার সাথে প্রতারণা করে থাকে। আমার সত্তার শপথ! আমি তার প্রতি এমন পরীক্ষা পাঠাবো যে, সহিষ্ণু লোকেরাও হতভম্ব হয়ে পড়বে।"

কুরতুবী (রঃ) বলেন, 'আমি খুব চিন্তা ও গবেষণা করে বুঝতে পারলাম যে, এগুলো মুনাফিকদের বিশেষণ। কুরআন পাকের মধ্যেও এটা বিদ্যমান রয়েছে।' অতঃপর তিনি وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ (২ঃ ২০৪) এই আয়াতগুলো পাঠ করেন। হযরত সাঈদ (রঃ) যখন অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথাটি বর্ণনা করেন তখন হযরত মুহাম্মদ বিন কা'বও (রাঃ) বলেছিলেন, 'এটা কুরআন মাজীদের মধ্যেও রয়েছে।' এবং তিনিও এই আয়াতগুলো পাঠ করেন। সাঈদ (রঃ) বলেন, 'এই আয়াতগুলো কাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমি জানি। শান-ই-নযুল হিসেবে আয়াতগুলো যে সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়ে থাকনা কেন, হুকুম হিসেবে সাধারণ।'

ইবনে মাহীসানের (রাঃ) কিরাতে 'ইয়াশহাদু আল্লাহু' রয়েছে। তখন অর্থ হবে-তারা মুখে যা কিছুই বলুক না কেন, তাদের অন্তরের কথা আল্লাহ খুবই ভাল জানেন।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ *

অর্থাৎ '(হে মুহাম্মদ (সঃ)!) যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে-আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।' (৬৩ঃ ১) কিন্তু জমহূরের পঠনে 'ইয়ুশহিদুল্লাহ' রয়েছে। তখন অর্থ হবে 'তারা জনসাধারণের সামনে নিজেদের মনের দুষ্টামি গোপন করলেও আল্লাহর সামনে তাদের অন্তরের কুফরী প্রকাশমান'। যেমন

অন্য জায়গায় রয়েছেঃ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ অর্থাৎ 'তারা মানুষ হতে গোপন করছে বটে কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করতে পারবে না।' (৪ঃ ১০৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই অর্থ বর্ণনা করেন, 'মানুষের সামনে তারা ইসলাম প্রকাশ করে এবং আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা মুখে যা বলছে তাই তাদের অন্তরেও রয়েছে।' আয়াতের সঠিক অর্থ এটাই বটে। আবদুর রহমান বিন যায়েদ (রঃ) এবং মুজাহিদ (রঃ) হতেও এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। اَلَدُّ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'খুবই বাঁকা'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে وَتُنْذِرَبِهٖ قَوْمًا لُدًّا অর্থাৎ 'এর দ্বারা তুমি যেন বাঁকা সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন কর।' (২০ঃ ৯৭) মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা প্রমাণ স্থাপনে মিথ্যা বলে থাকে, সত্য হতে সরে যায়, সরল ও সঠিক কথা ছেড়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং গালি দিয়ে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, মুনাফিকদের অবস্থা তিনটি। (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে। (৩) ঝগড়া করলে গালি দেয়।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি মন্দ ঐ ব্যক্তি যে অত্যন্ত ঝগড়াটে। এর কয়েকটি সনদ রয়েছে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—এরা যেমন কটু ও কর্কশ ভাষী তেমনই এদের কার্যাবলীও অতি জঘন্য। তাদের কাজ তাদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আকীদা বা বিশ্বাস একেবারেই অসৎ। এখানে سَعٰى শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ইচ্ছে করা'। যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছে فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা জুম'আর নামাযের ইচ্ছে কর।' (৬২ঃ ৯) এখানে سَعْىٌ শব্দটির অর্থ দৌড়ান নয়। কেননা নামাযের জন্যে দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে রয়েছে, 'যখন তোমরা নামাযের জন্যে আগমন কর তখন আরাম ও স্বস্তির সাথে এসো।' কাজেই অর্থ এই যে, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বুকে অশান্তি উৎপাদন করা এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তু বিনষ্ট করা।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে এই অর্থও বর্ণিত আছে যে, ঐ মুনাফিকদের শঠতা ও অন্যায় কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, ফলে শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের বিবাদ ও অশান্তি উৎপাদনকারীদেরকে মোটেই ভালবাসেন না। এই দুষ্ট ও

অসদাচরণকারীদেরকে যখন উপদেশের মাধ্যমে বুঝানো হয়, তখন তারা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং বিরোধিতার উত্তেজনায় পাপ কার্যে আরও বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে, এবং যখন তাদের সামনে আমার প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ পাঠ করা হয় তখন তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির চিহ্ন লক্ষ্য করে থাকো। এবং পাঠকদের উপর তারা লাফিয়ে পড়ে; জেনে রেখো যে, কাফিরদের জন্যে আমার নির্দেশ হচ্ছে দোযখাগ্নি এবং সেটা অত্যন্ত জঘন্য স্থান।' এখানেও বলা হচ্ছে যে, তাদের জন্যে দোযখই যথেষ্ট এবং নিশ্চয় ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।

মুনাফিকদের জঘন্য চরিত্রের বর্ণনা দেয়ার পর এখন মুমিনদের প্রশংসা করা হচ্ছে। এই আয়াতটি হযরত সুহাইব বিন সিনানের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মদীনায় হিজরত করতে চাইলে মক্কার কাফিরেরা তাঁকে বলে, 'আমরা তোমাকে মাল নিয়ে মদীনা যেতে দেবো না। তুমি মাল-ধন ছেড়ে গেলে যেতে পারো।' তিনি সমস্ত মাল পৃথক করে নেন এবং কাফিরেরা তাঁর ঐ মাল অধিকার করে নেয়। সুতরাং তিনি ঐসব সম্পদ ছেড়ে দিয়েই মদীনায় হিজরত করেন। এই কারণেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত উমার (রাঃ) ও সাহাবা-ই-কিরামের একটি বিরাট দল তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে 'হুররা' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলেনঃ 'আপনি বড়ই উত্তম ও লাভজনক ব্যবসা করেছেন।' একথা শুনে তিনি বলেনঃ 'আপনাদের ব্যবসায়েও যেন আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। আচ্ছা বলুন তো, এই মুবারকবাদের কারণ কি?' ঐ মহান ব্যক্তিগণ বলেনঃ 'আপনার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।' যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছেন তখন তিনিও তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করেন।

মক্কার কুরাইশরা তাঁকে বলেছিলোঃ তুমি যখন মক্কায় আগমন কর তখন তোমার নিকট কিছুই ছিল না। তোমার নিকট যে মাল-ধন রয়েছে তা সবই তুমি এখানেই উপার্জন করেছ। সুতরাং এই মাল আমরা তোমাকে মদীনায় নিয়ে যেতে দেবো না।' অতএব তিনি মাল ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন নিয়েই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, যখন তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন এবং কাফিরেরা তা জানতে পারে তখন তারা সবাই এসে তাঁকে ঘিরে নেয়। তিনি তূণ হতে তীর বের করে নিয়ে

বলেনঃ 'হে মক্কাবাসী! আমি যে কেমন তীরন্দাজ তা তোমরা ভাল করেই জান। আমার একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে বিদীর্ণ করতে থাকবো। এর পরে চলবে তরবারির যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও আমি তোমাদের কারও চেয়ে কম নই। যখন তরবারীও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে তখন তোমরা কাছে এসে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। তোমরা যদি এটা স্বীকার করে নাও তবে ভাল কথা। নচেৎ আমি তোমাদেরকে আমার সমুদয় সম্পদ দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা সবই নিয়ে নাও এবং আমাকে মদীনা যেতে দাও।' তারা মাল নিতে সম্মত হয়ে যায়, এভাবেই তিনি হিজরত করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছার পূর্বেই ওয়াহীর মাধ্যমে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। দেখা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে মুবারকবাদ দেন। অধিকাংশ মুফাস্সিরের এও উক্তি রয়েছে যে, এই আয়াতটি সাধারণ প্রত্যেক মুজাহিদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। যেমন অন্যস্থানে রয়েছে ঃ

'আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের বিনিময়ে মু'মিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা হত্যা করে এবং নিহতও হয়। আল্লাহর এই সত্য অঙ্গীকার তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশী সত্য অঙ্গীকারকারী আর কে হতে পারে? হে ইমানদারগণ! তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ে ও আদান-প্রদানে সন্তুষ্ট হয়ে যাও, এটাই বড় কৃতকার্যতা'। হযরত হিশাম বিন আমের (রাঃ) যখন কাফিরদের দু'টি ব্যূহ ভেদ করে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং একাকীই তাদের উপর আক্রমণ চালান তখন কতকগুলো মুসলমান তাঁর এই আক্রমণকে শরীয়ত বিরোধী মনে করেন। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীগণ এর প্রতিবাদ করেন এবং مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ (২ঃ ২০৭) এই আয়াতটি পাঠ করে শুনান।

---

٢٠٨- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২০৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদ রেখাগুলো অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯। অনন্তর স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদি তোমাদের নিকট সমাগত হওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হয়ে যাও, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

٢٠٩- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণকে ও তাঁর নবীর (সঃ) সত্যতা স্বীকারকারীগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলে। এবং সমস্ত নিষিদ্ধ জিনিস হতে বিরত থাকে ও পূর্ণ শরীয়তের উপর আমল করে। سِلْم শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলাম। ভাবার্থ আনুগত্য ও সততাও হতে পারে। كَآفَّة শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সব কিছু' ও 'পরিপূর্ণ।' হযরত ইকরামার (রাঃ) উক্তি এই যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ), হযরত আ'সাদ বিন উবাইদ (রাঃ), হযরত সালাবা' (রাঃ) প্রভৃতি মহাপুরুষ যাঁরা ইয়াহূদী হতে মুসলমান হয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তাঁদেরকে যেন শনিবারের দিন উৎসবের দিন হিসেবে পালন করার ও রাত্রে তাওরাতের উপর আমল করার অনুমতি দেয়া হয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাঁদেরকে বলা হয়–ইসলামের নির্দেশাবলীর উপরেই আমল করতে হবে। কিন্তু এখানে হযরত আবদুল্লাহ বিন সালামের (রাঃ) নাম ঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, তিনি উচ্চ স্তরের পণ্ডিত ছিলেন এবং পূর্ণ মুসলমান ছিলেন। তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে, শনিবারের মর্যাদা রহিত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে শুক্রবার ইসলামের উৎসবের দিন হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং এটা অসম্ভব কথা যে, এরূপ অভিলাষের উপর তিনি অন্যদের সাথে হাত মেলাবেন। কোন কোন তাফসীরকারক كَآفَّة শব্দটিকে حَال বলেছেন। অর্থাৎ 'তোমরা সবাই ইসলামের মধ্যে প্রবেশ কর।' কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিকতর সঠিক। অর্থাৎ 'তোমরা সাধ্যানুসারে ইসলামের প্রত্যেক নির্দেশ মেনে চল।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আহলে কিতাব ইসলাম গ্রহণের পরেও তাওরাতের কতকগুলো নির্দেশ মেনে চলতো। তাদেরকেই বলা হচ্ছে–দ্বীনে মুহাম্মদীর (সঃ) মধ্যে পুরোপুরি এসে যাও। ওর কোন আমলই পরিত্যাগ করো না। তাওরাতের উপর শুধু ঈমান রাখাই যথেষ্ট।

অতঃপর বলা হচ্ছে—'তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য স্বীকার কর, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে তো শুধুমাত্র পাপ ও অন্যায় কার্যেরই নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়ার কথা বলে থাকে। তার ও তার দলের ইচ্ছে এটাই যে,তোমরা দোযখবাসী হয়ে যাও। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'। এর পরে বলা হচ্ছে—প্রমাণাদি জেনে নেয়ার পরেও যদি তোমরা সত্য হতে সরে পড় তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত। না তাঁর থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে, না তাঁর উপর কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তিনি তাঁর নির্দেশাবলী চালু করার ব্যাপারে মহা বিজ্ঞানময়। পাকড়াও করার কাজে তিনি মহান পরাক্রমশালী এবং নির্দেশ জারী করার কার্যে তিনি মহা বিজ্ঞানময়। তিনি কাফিরদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী এবং তাদের ওজর ও প্রমাণ কর্তন করার ব্যাপারে তিনি নৈপুণ্যের অধিকারী।

---

**২১০। তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ তা'আলা শুভ্র মেঘমালার ছত্র তলে ফেরেস্তাগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নিকট সমাগত হবেন ও সমস্ত কার্যের নিষ্পত্তি করবেন, এবং আল্লাহরই নিকট সমস্ত কার্য প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।**

۲۱۰- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝ ع

---

এই আয়াতে মহান আল্লাহ কাফিরদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন যে, তারা কি কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে দিন সত্যের সঙ্গে ফায়সালা হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফলভোগ করবে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে, 'যে দিন পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে এবং স্বয়ং তোমার প্রভু এসে যাবেন, ফেরেস্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, দোযখকেও সামনে এনে দাঁড় করানো হবে, সেদিন এসব লোক শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করবে, কিন্তু তাতে আর কি উপকার হবে?' অন্যস্থানে রয়েছে, 'তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট ফেরেস্তারা এসে যাবে বা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এসে যাবেন কিংবা তাঁর কতকগুলো নিদর্শন এসে যাবে? যদি এটা হয়েই যায় তবে না ঈমান কোন কাজ দেবে, না সৎ কার্যাবলী সম্পাদনের সময় থাকবে।'

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এখানে একটি দীর্ঘ হাদীস এনেছেন যার মধ্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)। মুসনাদ ইত্যাদির মধ্যে এই হাদীসটি রয়েছে। এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যখন মানুষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে তখন তারা নবীদের (আঃ) নিকট সুপারিশের প্রার্থনা জানাবে। হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে এক একজন নবীর কাছে তারা যাবে এবং প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার জবাব পেয়ে ফিরে আসবে। অবশেষে তারা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছবে। তিনি উত্তর দেবেন, 'আমি প্রস্তুত আছি। আমিই তার অধিকারী।' অতঃপর তিনি যাবেন এবং আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যাবেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবেন যে, তিনি যেন বান্দাদের ফায়সালার জন্যে আগমন করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন এবং মেঘমালার ছত্রতলে সমাগত হবেন। দুনিয়ার আকাশও ফেটে যাবে এবং তাঁর সমস্ত ফেরেস্তা এসে যাবেন। অতঃপর দ্বিতীয় আকাশটিও ফেটে যাবে এবং ওর ফেরেস্তাগণও এসে যাবেন। এভাবে সাতটি আকাশই ফেটে যাবে এবং সেগুলোর ফেরেস্তাগণ এসে যাবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলার আরশ নেমে আসবে এবং সম্মানিত ফেরেস্তাগণ অবতরণ করবেন এবং স্বয়ং মহা শক্তিশালী আল্লাহ আগমন করবেন। সমস্ত ফেরেস্তা তাসবীহ পাঠে লিপ্ত হয়ে পড়বেন। সেই সময় তাঁরা নিম্নলিখিত তাসবীহ্ পাঠ করবেন ঃ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ - سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَبَرُوْتِ -
سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ - سُبْحَانَ الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوْتُ -
سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ - سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ - سُبْحَانَ رَبِّنَا الْاَعْلٰى -
سُبْحَانَ ذِى السُّلْطَانِ وَالْعَظَمَةِ - سُبْحَانَهٗ اَبَدًا اَبَدًا -

অর্থাৎ 'সাম্রাজ্য ও আত্মার অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সম্মান ও অসীম ক্ষমতার অধিকারীর প্রশংসা কীর্তন করছি। সেই চিরঞ্জীবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁরই গুণগান করছি যিনি সৃষ্টজীবসমূহের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন এবং তিনি নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হন না। ফেরেস্তাগণ ও আত্মার প্রভুর তাসবীহ পাঠ করছি। আমাদের বড় প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সাম্রাজ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীর আমরা গুণকীর্তন করছি। সদা-সর্বদা তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'

হাফিয ইবনে আবূ বকর মিরদুওয়াই (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে অনেক হাদীস এনেছেন সেগুলোর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। ওগুলোর মধ্যে একটি এই যে,রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে ঐ দিন একত্রিত করবেন যার সময় নির্ধারিত রয়েছে। তাদের দৃষ্টিগুলো আকাশের দিকে থাকবে। প্রত্যেকেই ফায়সালার জন্যে অপেক্ষমান থাকবে। আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার ছত্রতলে আরশ হতে কুরসীর উপর অবতরণ করবেন।' মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, যে সময় তিনি অবতরণ করবেন সেই সময় তাঁর মধ্যে ও তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে সত্তর হাজার আবরণ থাকবে। আবরণগুলো হবে আলো, অন্ধকার ও পানির আবরণ। পানি অন্ধাকারের মধ্যে এমন শব্দ করবে যার ফলে অন্তর কেঁপে উঠবে।

হযরত যুহাইর বিন মুহাম্মদ (রঃ) বলেন যে, ঐ মেঘপুঞ্জের ছায়াতল মণি দ্বারা জড়ান থাকবে এবং তা হবে মুক্তা ও পান্না বিশিষ্ট। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই মেঘমালা সাধারণ মেঘমালা নয়। রবং এটা ঐ মেঘমালা যা তীহ উপত্যকায় বানী ইসরাঈলের মস্তকোপরি বিরাজমান ছিল। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, ফেরেস্তাগণও মেঘপুঞ্জের ছায়াতলে আসবেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাতে চাবেন তাতেই আসবেন। কোন কোন পঠনে এও আছে-

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ وَالْمَلٰئِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

অর্থাৎ 'তারা কি এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ তাদের নিকট আগমন করবেন এবং ফেরেস্তাগণ মেঘমালার ছায়াতলে আসবে?' অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيلًا-

অর্থাৎ 'সেইদিন আকাশ মেঘসহ ফেটে যাবে এবং ফেরেস্তাগণ অবতরণ করবেন।' (২৫ঃ ২৫)

**২১১। ইসরাঈল-বংশীয়গণকে জিজ্ঞেস কর যে, আমি কত স্পষ্ট প্রমাণই না তাদেরকে প্রদান করেছি। এবং যে কেউ তার নিকট আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ আসার পর তা পরিবর্তন করে, তবে জেনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।**

٢١١- سَلْ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২১২। যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী-দেরকে উপহাস করে থাকে, এবং যারা ধর্মভীরু তাদেরকে উত্থান দিবসে সমুন্নত করা হবে; এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।

٢١٢- زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা দেখ, বানী ইসরাঈলকে আমি বহু মু'জিযা প্রদর্শন করেছি। হযরত মূসার (আঃ) হাতের লাঠি, তাঁর হাতের ঔজ্জ্বল্য, তাদের সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, কঠিন গরমের সময় তাদের উপর মেঘের ছায়া দান করা, তাদের উপর 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করা, ইত্যাদি। যার দ্বারা আমার যা ইচ্ছে করা এবং সব কিছুরই উপর ক্ষমতাবান হওয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এর দ্বারা আমার নবী হযরত মূসার (আঃ) নবুয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তবু বানী ইসরাঈল আমার নিয়ামতের উপর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর উপরই স্থির থেকেছে। কাজেই তারা আমার কঠিন শাস্তি হতে কিরূপে রক্ষা পাবে? কুরাইশ কাফিরদের সম্বন্ধেও এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ *

অর্থাৎ 'তুমি কি ঐ লোকদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের ঘরে নিক্ষেপ করেছে? অর্থাৎ জাহান্নাম, যা অতি জঘন্য অবস্থান স্থল।' (১৪ঃ ২৮-২৯) অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এই কাফিরেরা শুধুমাত্র ইহলৌকিক জগতের উপরই সন্তুষ্ট রয়েছে। সম্পদ জমা করা এবং আল্লাহর পথে খরচ করতে কার্পণ্য করাই তাদের স্বভাব। বরং যেসব মু'মিন এই নশ্বর জগত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে তাদেরকে

এরা উপহাস করে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবানতো এই মু'মিনরাই। কিয়ামতের দিন এই মু'মিনদের মর্যাদা দেখে এই কাফিরদের চক্ষু খুলে যাবে। সেদিন নিজেদের দুর্ভাগ্য ও মু'মিনদের সৌভাগ্য লক্ষ্য করে তারা অনুধাবন করতে পারবে যে, কারা উচ্চ পদস্থ ও কারা নিম্ন পদস্থ।

ইহকালে আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-মাল দেয়ার ইচ্ছে করেন তাকে তিনি অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকেন। আবার তিনি যাকে ইচ্ছে করেন এখানেও দেন এবং পরকালেও দেবেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, (আল্লাহ তা'আলা বলেন) 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার পথে খরচ কর আমি তোমাকে দিতেই থাকবো।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) কে বলেন, 'হে বেলাল (রাঃ)! তুমি আল্লাহর পথে খরচ করতে থাকো এবং আরশের অধিকারী হতে সঙ্কীর্ণতার ভয় করো না।' কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছে –

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

অর্থাৎ 'তোমরা যা কিছু খরচ করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতিদান দেবেন।' (৩৪ঃ ৩৯) সহীহ হাদীসে রয়েছে, 'সকালে দু'জন ফেরেস্তা অবতরণ করেন। একজন প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! আপনার পথে ব্যয়কারীকে আপনি বরকত দান করুন।' অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণের মাল ধ্বংস করে দিন।'

অন্য হাদীসে রয়েছে, 'মানুষ বলে–'আমার মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মাল তো ঐগুলোই যা তুমি খেয়ে ধ্বংস করেছো আর যা তুমি দান করে বাকী রেখেছো। অন্য যত কিছু রয়েছে সেগুলো সবই তুমি অন্যদের জন্যে ছেড়ে এখান হতে বিদায় গ্রহণ করবে।' মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'দুনিয়া তারই ঘর যার কোন ঘর নেই, দুনিয়া তারই মাল যার কোন মাল নেই এবং দুনিয়া শুধু ঐ ব্যক্তি সংগ্রহ করে থাকে যার বিবেক নেই।'

---

| | |
|---|---|
| ২১৩। মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদ বাহক ও ভয় প্রদর্শকরূপে নবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং তিনি তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ | ٢١٣- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ |

بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

করলেন যেন (ঐ কিতাব) তাদের মতভেদের বিষয়গুলো সম্বন্ধে মীমাংসা করে দেয়, অথচ যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট সমাগত হওয়ার পর, পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ বশতঃ তারা সেই কিতাবকে নিয়ে মতভেদ ঘটিয়ে বসলো, অতঃপর আল্লাহ তদীয় ইচ্ছাক্রমে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে তদ্বিষয়ে সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করলেন, এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথপ্রদর্শন করে থাকেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে দশটি যুগ ছিল। ঐ যুগসমূহের লোকেরা সত্য শরীয়তের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে (আঃ) প্রেরণ করেন। তাঁর কিরআতও নিম্নরূপঃ

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

অর্থাৎ 'মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করে।' (১০ঃ ১৯) হযরত উবাই বিন কা'বেরও (রাঃ) পঠন এটাই। কাতাদাহও (রঃ) এর তাফসীর এরকমই করেছেন যে, যখন তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রথম রাসূল অর্থাৎ হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। হযরত মুজাহিদও (রঃ) এটাই বলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, প্রথমে সবাই কাফির ছিল। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অর্থ হিসেবেও এবং সনদ হিসেবেও অধিকতর সঠিক। সুতরাং ঐ নবীগণ (আঃ) মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। তাঁদের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থও ছিল, যেন জনগণের প্রত্যেক

মতভেদের মীমাংসা ইলাহী কানুন দ্বারা হতে পারে। কিন্তু ঐ প্রমাণাদির পরেও শুধুমাত্র পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ, গোঁড়ামি, একগুঁয়েমি এবং প্রবৃত্তির কারণেই তারা একমত হতে পারেনি। কিন্তু মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং তাঁরা মতবিরোধের চক্র হতে বেরিয়ে সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমরা দুনিয়ায় আগমন হিসেবে সর্বশেষ বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন বেহেশতে প্রবেশ লাভ হিসেবে আমরা সর্ব প্রথম হবো। আহলে কিতাবকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে দেয়া হয়েছে পরে। কিন্তু তারা মতভেদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। জুম'আ সম্বন্ধেও এদের মধ্যে মতবিরোধ রয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই সৌভাগ্য লাভ হয় যে, এই দিক দিয়েও সমস্ত আহলে কিতাব আমাদের পিছনে পড়ে যায়। শুক্রবার আমাদের, শনিবার ইয়াহূদীদের এবং রবিবার খ্রীষ্টানদের।'

হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) বলেন যে, জুম'আ ছাড়াও কিবলার ব্যাপারেও এটা ঘটেছে। খ্রীষ্টানেরা পূর্ব দিককে কিবলা বানিয়েছে, ইয়াহূদীরা কিবলা করেছে বায়তুল মুকাদ্দাসকে, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীগণ কা'বাকে তাদের কিবলা রূপে নির্ধারিত করেছে। অনুরূপভাবে নামাযেও মুসলমানেরা অগ্রে রয়েছে। আহ্লে কিতাবের কারও নামাযে রুকু আছে কিন্তু সিজদা নেই, আবার কারও সিজদা আছে কিন্তু রুকু নেই। আবার কেউ কেউ নামাযে কথা-বার্তা বলে থাকে, আবার কেউ কেউ নামাযে চলা-ফেরা করে থাকে। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের নামায নীরবতা ও স্থিরতার সাথে পালিত হয়। এরা নামাযের মধ্যে না কথা বলবে, না চলা-ফেরা করবে। এরকমই রোযার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এতেও মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত সুপথ প্রদর্শিত হয়েছে। পূর্বে উম্মতবর্গের কেউ কেউ তো দিনের কিছু অংশে রোযা রাখতো, কোন দল কোন কোন প্রকারের খাদ্য পরিত্যাগ করতো। কিন্তু আমাদের রোযা সব দিক দিয়েই পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং এর মধ্যে আমাদেরকে সত্য পথ সম্বন্ধে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্বন্ধে ইয়াহূদীরা বলেছিল যে, তিনি ইয়াহূদী ছিলেন এবং খ্রীষ্টানেরা বলেছিল যে, তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন পুরোপুরি মুসলমান ছিলেন। সুতরাং এই ব্যাপারেও আমরা সুপথ প্রদর্শিত হয়েছি। এবং হযরত ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ) সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ)-কেও ইয়াহূদীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং তাঁর সম্মানিতা মাতা সম্পর্কে জঘন্য কথা উচ্চারণ করেছিল। খ্রীষ্টানেরা তাঁকে আল্লাহ ও আল্লাহর পুত্র বলেছিল। কিন্তু মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা এই দু'টো হতেই রক্ষা করেছেন। তারা তাঁকে আল্লাহর রূহ, আল্লাহর কালেমা এবং সত্য নবী বলে স্বীকার করেছে। হযরত রাবী' বিন আনাস (রাঃ) বলেন, 'আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, যেমনভাবে প্রথমে সমস্ত লোক আল্লাহর উপাসনাকারী ছিল এবং তারা সৎ কার্য সম্পাদন করতো ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতো। অতঃপর মধ্যভাগে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। তেমনিভাবে শেষ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা মতানৈক্য হতে সরিয়ে প্রথম দলের ন্যায় সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন। এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের উপরে সাক্ষী হবে। এমনকি হযরত নূহ (আঃ)-এর উম্মতের উপরেও এরা সাক্ষ্য দান করবে। হযরত হূদের(আঃ) কওম, হযরত তালুতের (আঃ) কওম, হযরত সালেহের (আঃ) কওম, হযরত শুয়াইবের (আঃ) কওম এবং ফিরআউনের বংশধরদের মীমাংসাও এদের সাক্ষ্যের মাধ্যমেই হবে। এরা বলবে যে, এই নবীগণ (আঃ) প্রচার করেছিলেন এবং এই উম্মতেরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

হযরত উবাই বিন কা'বের পঠনে وَلِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ রয়েছে। অর্থাৎ 'যেন তারা কিয়ামতের দিন জনগণের উপর সাক্ষী হয় এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথপ্রদর্শন করে থাকেন।' আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন, 'এই আয়াতে যেন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে,সন্দেহ হতে, ভ্রান্তি হতে এবং বিবাদ হতে বেঁচে থাকা উচিত। এই হিদায়াত আল্লাহ তা'আলার ইলম এবং তাঁর পথপ্রদর্শনের মাধ্যমেই হয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথের জ্ঞান দান করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রে যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যে উঠতেন তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَاءِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিলের প্রভু! হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে প্রকাশ্য ও গুপ্তের জ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের

পারস্পরিক মতভেদের মীমাংসা করে থাকেন। আমার প্রার্থনা এই যে, যেসব ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে যা সঠিক আমাকে অপনি তারই জ্ঞান দান করুন। আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথপ্রদর্শন করে থাকেন।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের প্রার্থনাটিও নকল করা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ وَلَا تَجْعَلْهُ مُتَلَبِّسًا عَلَيْنَا فَنَضِلَّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! যা সত্য তা আমাদেরকে সত্য রূপে প্রদর্শন করুন এবং তার অনুসরণ করার আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে আমাদেরকে প্রদর্শন করুন এবং আমাদেরকে ওটা হতে বাঁচবার তাওফীক দিন। আমাদের উপর সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করবেন না। যার কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সৎ ও খোদাভীরু লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।'

**২১৪। তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরাই বেহেশ্তে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।**

٢١٤- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

ভাবার্থ এই যে,পরীক্ষার পূর্বে বেহেশ্তে প্রবেশের আশা করা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতেরই পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। তাদেরকেও রোগ ও বিপদাপদ স্পর্শ করেছিল। بَاْسَاۤءُ শব্দটির অর্থ দারিদ্র এবং ضَرَّاۤءُ শব্দটির অর্থ রোগও ধরা

হয়েছে। তাদেরকে শত্রুর ভয় এমন আতংকিত করে তুলেছিল যে, তারা কম্পিত হয়েছিল। ঐ সমুদয় পরীক্ষায় তারা সফলতা লাভ করেছিল। ফলে তারা বেহেশতের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, একদা হযরত খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আমাদের সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করেন না?' তিনি বলেন, এখনই ভীত হয়ে পড়লে? জেনে রেখো যে, পূর্ববর্তী একত্ববাদীদের মস্তোকোপরি করাত রেখে তাদেরকে পা পর্যন্ত ফেঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হতো, কিন্তু তথাপি তারা তাওহীদ ও সুন্নাত হতে সরে পড়তো না। লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের দেহের গোশ্ত আঁচড়া হতো, তথাপি তারা আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করতো না। আল্লাহর শপথ! আমার এই দ্বীনকে আল্লাহ এমন পরিপূর্ণ করবেন যে, একজন অশ্বারোহী 'সুনআ' হতে 'হাযারা মাওত' পর্যন্ত নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না। তবে অন্তরে এই ধারণা হওয়া অন্য কথা যে, হয়তো তার বকরীর উপরে বাঘ এসে পড়বে। কিন্তু আফসোস! তোমরা তাড়াতাড়ি করছো।

কুরআন মাজীদের মধ্যে ঠিক এই ভাবটিই অন্য জায়গায় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

الٓـمّٓ * اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ *

অর্থাৎ 'মানুষেরা কি মনে করছে যে, তারা 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আর অবশ্যই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম, সুতরাং অবশ্যই আল্লাহ সত্যবাদীদেরকেও জেনে নেবেন এবং নিশ্চয় যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকেও আল্লাহ জানবেন।' (২৯ঃ ১-৩) এভাবেই 'পরিখার যুদ্ধে' সাহাবা-ই-কিরামেরও পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। যেমন, স্বয়ং পবিত্র কুরআনই এর চিত্র এঁকেছে।

ঘোষণা হচ্ছে, 'যখন তারা (কাফিরেরা) তোমাদের উপরের দিক হতে এবং তোমাদের নিম্ন দিক হতেও তোমাদের উপর চড়াও করেছিল এবং যখন (ভয়ে-বিস্ময়ে) চক্ষুসমূহ বিস্ফারিতই রয়ে গিয়েছিল এবং অন্তরসমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা পোষণ করছিলে। তথায় মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা

বলেছিল–আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলতো আমাদেরকে শুধু প্রবঞ্চনামূলক ওয়াদাই দিয়েছেন।'

রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন হযরত আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-কে তাঁর কুফরীর অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই নবুওয়াতের দাবীদারের (মুহাম্মদ সঃ) সাথে আপনাদের কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি'? আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, 'হাঁ'। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?' তিনি বলেন, 'কখনও আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম এবং কখনও তিনি।' হিরাক্লিয়াস বলেন, 'এভাবেই নবীদের (আঃ) পরীক্ষা হয়ে আসছে। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ্য বিজয় তাঁদেরই হয়ে থাকে।' مَثَلُ শব্দটির অর্থ এখানে রীতি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে– وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ 'পূর্ববর্তীদের রীতি অতীত হয়েছে। পূর্ব যুগের মু'মিনগণ তাঁদের নবীদের (আঃ) সাথে এরকমই কঠিন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই সঠিক ও সংকীর্ণ অবস্থা হতে মুক্তি চেয়েছিলেন। উত্তরে তাঁদেরকে বলা হয়েছিল যে, সাহায্য অতি নিকটবর্তী। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে– فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ 'নিশ্চয় কাঠিন্যের সাথে সহজতা রয়েছে।' (৯৪ঃ ৫) একটি হাদীসে রয়েছে যে, বান্দা যখন নিরাশ হতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হয়ে বলেন–আমার সাহায্য তো এসেই যাচ্ছে, অথচ তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই দ্রুততা এবং তাঁর দয়া নিকটবর্তী হওয়ার উপর হেসে থাকেন।

---

**২১৫। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বল– তোমরা ধন-সম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের ও পথিকবৃন্দের জন্যে করো এবং তোমরা যে সব সৎকর্ম কর নিশ্চয় আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত।**

٢١٥- يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি হচ্ছে নফল দান সম্বন্ধে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যাকাত এই আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। কিন্তু এই উক্তিটি বিবেচ্য বিষয়। আয়াতটির ভাবার্থ এই যে—হে নবী (সঃ)! মানুষ তোমাকে খরচ করার পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও—তারা যেন ঐসব লোকের জন্যে খরচ করে যাদের বর্ণনা আয়াতটির মধ্যে রয়েছে। হাদীসে রয়েছে, 'তোমরা মাতার সাথে, পিতার সাথে, ভগ্নীর সাথে, ভ্রাতার সাথে, অতঃপর নিকটতম আত্মীয়দের সাথে আদান প্রদান কর।' এই হাদীসটি বর্ণনা করতঃ হযরত মায়মুন বিন মাহরান (রাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন অতঃপর বলেন, 'এগুলোই হচ্ছে খরচ করার স্থান। ঢোল-তবলা, ছবি এবং দেয়ালে কাপড় পরানো, এগুলো খরচের স্থান নয়।' অতঃপর বলা হচ্ছে—তোমরা যেসব সৎকার্য সম্পাদন করছো। আল্লাহ তা'আলা তা অবগত আছেন এবং তিনি তার জন্যে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তিনি অনু পরিমাণও অন্যায় করবেন না।

---

**২১৬। জিহাদকে তোমাদের জন্যে পরিহার্য কর্তব্যরূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছো যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছো যা তোমাদের জন্যে বাস্তবিকই অনিষ্টকর, এবং আল্লাহই (তোমাদের ইষ্ট এবং অনিষ্ট) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও।**

٢١٦- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ع

---

দ্বীন ইসলামকে রক্ষার জন্যে ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয হওয়ার নির্দেশ এই আয়াতে দেয়া হয়েছে। যুহরী (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক লোকের উপরেই জিহাদ ফরয। সে স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করুক বা বাড়ীতে

বসেই থাক। যারা বাড়ীতে অবস্থান করবে তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হলে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনবোধে তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগদানের আহ্বান জানান হলে তাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধের মাঠে যোগদান করতে হবে। সহীহ্ হাদীসে রয়েছে, 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে না জিহাদে অংশগ্রহণ করলো, না মনে জিহাদের কথা বললো, সে অজ্ঞতা যুগের মৃত্যুবরণ করলো।' অন্য হাদীসে রয়েছে, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই।' তবে রয়েছে জিহাদ ও নিয়্যাত। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্যে ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা তার জন্যে বেরিয়ে পড়বে।' মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে–এই জিহাদের নির্দেশ তোমাদের নিকট কঠিন মনে হতে পারে। কেননা, এতে কষ্ট ও বিপদ রয়েছে এবং তোমরা নিহত হয়ে যেতেও পার কিংবা আহত হতে পার। তা ছাড়া সফরের কষ্ট, শত্রুদের আক্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু জেনে রেখো যে, যা তোমরা নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করছো তাই হয়তো তোমাদের জন্যে উত্তম। কেননা, এতেই তোমাদের বিজয় এবং শত্রুদের ধ্বংস রয়েছে। তাদের ধন-মাল, তাদের সাম্রাজ্য এমন কি তাদের সন্তানাদি পর্যন্ত তোমাদের পায়ের উপর নিক্ষিপ্ত হবে। আবার এও হতে পারে যে, তোমরা যে জিনিসকে তোমাদের জন্যে ভাল মনে করছো তাই তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর। সাধারণতঃ এরূপ হয়ে থাকে যে, মানুষ একটা জিনিস চায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন মঙ্গল ও কল্যাণ নেই। অনুরূপভাবে তোমরা জিহাদ না করাকে মঙ্গল মনে করছো কিন্তু ওটা তোমাদের জন্য চরম ক্ষতিকর। কেননা,এর ফলে শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে এবং দুনিয়ায় তোমাদের জন্যে পা রাখারও জায়গা থাকবে না। সব কাজের পরিণামের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনিই জানেন যে, পরিণাম হিসেবে তোমাদের জন্যে কোন্ কাজটি ভাল ও কোন্ কাজটি মন্দ। তিনি তোমাদেরকে ঐ কাজেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন যার মধ্যে তোমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশসমূহ মনেপ্রাণে স্বীকার করে নাও। তাঁর প্রত্যেক নির্দেশকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে চল। ওরই মধ্যে তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

٢١٧- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ
الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ
كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق
وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج
وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا
يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى
يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ
اسْتَطَاعُوْا ط وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ
عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২১৭। তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাস, তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল—ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়, আর আল্লাহর পথ ও পবিত্র মসজিদ হতে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও তার মধ্য হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহর নিকট গুরুতর অপরাধ; এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি গুরুতর এবং যদি তারা সক্ষম হয়, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত প্রতিনিবৃত্ত হবে না; আর তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফির অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার ইহকাল সংক্রান্ত ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

٢١٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا
اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২১৮। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করেছে ও ধর্মযুদ্ধ করেছে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশী এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং হযরত আবূ উবাইদা বিন জাররাহ্ (রাঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি বিদায়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিচ্ছেদের দুঃখে ভীষণ ক্রন্দন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ফিরিয়ে নেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাঁকে একখানা পত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে পৌঁছার পূর্বে এই পত্র পড়বে না। তথায় পৌঁছে যখন এর বিষয়বস্তু দেখবে তখন সঙ্গীদের কাউকেও তোমার সাথে যাবার জন্যে বাধ্য করবে না।' অতএব হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই যাত্রা শুরু করেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে তিনি নবীজীর (সঃ) নির্দেশনামা পাঠ করতঃ 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন এবং বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশনামা পড়েছি এবং তাঁর নির্দেশ পালনে আমি প্রস্তুত রয়েছি।' অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং ঘটনাটি বর্ণনা করেন। সুতরাং দুই ব্যক্তি ফিরে যান, কিন্তু অন্যান্য সবাই তাঁর সাথে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ইবনুল হাযরামী নামক কাফিরকে দেখতে পান। ঐ দিনটি জমাদিউল উখরার শেষ দিন ছিল কি রজবের প্রথম দিন ছিল এটা তাঁদের জানা ছিল না। সুতরাং তাঁরা ঐ সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ চালান এবং ইবনুল হাযরামী মারা যায়। মুসলমানদের ঐ দলটি তথা হতে ফিরে আসেন। তখন মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেঃ 'দেখ! তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করেছে এবং হত্যাও করেছে।' এ ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে,এই দলে ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ), হযরত আবূ হুযাইফা বিন উৎবা বিন রাবী'আ (রাঃ), হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত উৎবা বিন গায্ওয়ান সালমা (রাঃ), হযরত সাহীল বিন বায়যা' (রাঃ), হযরত আমের বিন ফাহীরাহ (রাঃ) এবং হযরত ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ ইয়ারবুঈ (রাঃ)। 'বাতনে নাখলা' পৌঁছে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি শাহাদাত লাভের প্রত্যাশী একমাত্র সেই সম্মুখে অগ্রসর হবে। এখান হতে প্রত্যাবর্তনকারীগণ ছিলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও হযরত উৎবা (রাঃ)। তাঁদের এই বাহিনীর সাথে না যাওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাঁদের উট হারিয়ে গিয়েছিল। উট খোঁজ করার জন্যেই তাঁরা রয়ে গিয়েছিলেন। মুশরিকদের মধ্যে হাকাম বিন কাইসান, উসমান বিন আবদুল্লাহ প্রভৃতি ছিল। হযরত ওয়াকিদের (রাঃ) হাতে

আমর নিহত হয় এবং এই ক্ষুদ্র বাহিনী যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্যনিয়ে ফিরে আসে। এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ লব্ধ মাল যা মুসলমান সাহাবীগণ (রাঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই প্রাণ উৎসর্গকারী দলটি দু'জন বন্দী ও গাণীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসেন মক্কার মুশরিকরা তখন প্রতিবাদ স্বরূপ বলে ঃ 'মুহাম্মদের (সঃ) দাবীতো এই যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী, কিন্তু সম্মানিত মাসগুলোর কোন সম্মান করেন না, বরং রজব মাসে যুদ্ধ ও হত্যা করে থাকেন।' মুসলমানগণ বলেন ঃ 'আমরা রজব মাসে তো হত্যা করিনি বরং জমাদিউল উখরা মাসে যুদ্ধ হয়েছে।'

প্রকৃত ব্যাপার এ যে, ওটা ছিল রজবের প্রথম রাত্রি এবং জমাদিউল উখরার শেষ রাত্রি। রজব মাস আরম্ভ হওয়া মাত্রই মুসলমানদের তরবারী কোষ বদ্ধ হয়েছিল। মুশরিকদের এ প্রতিবাদের উত্তরে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এই মাসগুলোতে যুদ্ধ হারাম বটে। কিন্তু হে মুশরিকরা! তোমাদের মন্দ কার্যাবলী তো মন্দ হিসেবে এর চেয়েও বেড়ে গেছে। তোমরা আমাকে অস্বীকার করছো। তোমরা আমার নবী (সঃ)-কে ও তাঁর সহচরদেরকে আমার মসজিদ হতে প্রতিরোধ করছো। তোমরা তাদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করেছো। সুতরাং তোমাদের এই অসৎ কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর যে, ওগুলো কত জঘন্য কাজ!' এই নিষিদ্ধ মাসগুলোতেই মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফ হতে বাধা দিয়েছিল এবং তাঁরা বাধ্য হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। পরবর্তী বছর নিষিদ্ধ মাসগুলোতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর (সঃ) হাতে মক্কা বিজয় করিয়ে দেন এবং তথায় মুসলমানদের পূর্ণ আধিপত্য লাভ হয়। তখন তারা প্রতিবাদ করলে এই আয়াতগুলো দ্বারা তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। আমর বিন হাযরামীকে যে হত্যা করা হয়েছিল, সে তায়েফ হতে মক্কা আসছিল। রজবের চন্দ্র উদিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সাহাবীদের (রাঃ) তা জানা ছিল না। তাঁরা ঐ রাত্রিকে জমাদিউল উখরার রাত্রি মনে করেছিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে আট জন লোক ছিলেন। সাতজন তো তাঁরাই যাঁদের নাম উপরে বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম ছিলেন হযরত রাবাব আসাদী (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এঁদেরকে 'প্রথম বদর যুদ্ধ' হতে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রেরণ করেছিলেন। এরা সবাই ছিলেন মুহাজির সাহাবী (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে আনসারী একজনও ছিলেন না। দু'দিন চলার পর তাঁরা নবীজী (সঃ)-এর পত্রখানা পাঠ করেছিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, 'আমার এই নির্দেশনামা পড়ে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখলা' নামক স্থানে

পৌঁছে তথায় অবস্থান করবে এবং কুরাইশ যাত্রীদলের অপেক্ষা করবে। তাদের খবরা-খবর জেনে আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। যখন এই মহান ব্যক্তিবর্গ এখান হতে গমন করেন তখন তাঁরা সবাই গিয়েছিলেন। দু'জন সাহাবী যাঁরা উট খুঁজতে গিয়ে রয়ে গিয়েছিলেন, এখান হতে তাঁরাও সঙ্গেই গিয়েছিলেন। কিন্তু 'ফারাগের' উপরে 'মা'দানে' পৌঁছে 'নাজরানে' তাদেরকে উটের খোঁজে রয়ে যেতে হয়। কুরাইশদের এই যাত্রীদলের সাথে 'যায়তুন' প্রভৃতি ব্যবসায়ের মাল ছিল। মুশরিকদের মধ্যে উপরোল্লিখিত লোক ছাড়াও নাওফিস বিন আবদুল্লাহ প্রভৃতিও ছিল।

মুসলমানগণ প্রথমে তাদেরকে দেখেতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাঁরা এই চিন্তা করেন যে, যদি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় তবে এই রাত্রির পরইতো নিষিদ্ধ মাস পড়ে যাবে, কাজেই তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না। সুতরাং পরামর্শক্রমে তাঁরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেন। হযরত ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ তামীমী (রাঃ) আমর বিন হাযরামীকে লক্ষ্য করে এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করেন যে, তার ফায়সালাই হয়ে যায়। উসমান ও আবদুল্লাহকে বন্দী করে নেয়া হয় এবং গাণীমতের মাল নিয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। পথেই সেনাপতি বলে দিয়েছিলেন যে, এই মালের এক পঞ্চমাংশ তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যেই থাকবে। সুতরাং এই অংশটি তাঁরা পৃথক করে রেখে দেন এবং বাকী অংশ সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে বন্টন করে দেন। যুদ্ধ লব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ যে বের করে দিতে হবে এই নির্দেশ তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়নি। যখন তাঁরা নবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন তখন তিনি এই ঘটনা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'নিষিদ্ধ মাসগুলোতে যুদ্ধ করতে আমি তোমাদেরকে কখন বলেছিলাম?' না তিনি সেই যাত্রী দলের কোন মাল গ্রহণ করলেন, না বন্দীদেরকে স্বীয় অধিকারে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই কথায় ও কাজে তাঁরা খুবই লজ্জিত হলেন এবং নিজেদের পাপ কার্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলমানও তাঁদের সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। আর ওদিকে কুরাইশরা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করলো যে, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সহচরগণ নিষিদ্ধ মাসগুলোর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে বিরত হন না। অপর পক্ষে ইয়াহূদীরা একটা কুলক্ষণ বের করে। আমর বিন হাযরামী নিহত হয়েছিল বলে ইয়াহূদীরা বলে عُمِرَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ 'দীর্ঘ দিন ধরে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকবে।' আমরের পিতার

নাম ছিল হাযরামী। এজন্যেই তারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে বলে حَضَرَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ 'যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়ে গেছে।' হত্যাকারীর নাম ওয়াকিদ (রাঃ), কাজেই তারা বলে وَقَدَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ 'যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে।' কিন্তু মহান আল্লাহ এর বিপরীত করে দেন এবং পরিণাম সবই মুশরিকদের প্রতিকূলে হয়। তাদের প্রতিবাদের উত্তরে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, যুদ্ধ যদি নিষিদ্ধ মাসে হয়েই থাকে তবে তোমাদের কার্যাবলী এর চেয়েও জঘন্য। তোমাদের অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলমানদেরকে আল্লাহর দ্বীন হতে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করনি। এটা হত্যা অপেক্ষাও বেশী মারাত্মক। তোমরা এসব কাজ হতে না বিরত হচ্ছো, না তাওবা করছো, না লজ্জিত হচ্ছো। এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ এই দুঃখ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত হন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাত্রীদলকে ও বন্দীদেরকে নিজের অধিকারে নিয়ে নেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট দূত পাঠিয়ে বলে, 'মুক্তিপণ নিয়ে এই বন্দীদেরকে ছেড়ে দিন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) দূতকে বলেন, 'আমার দু'জন সাহাবী হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং হযরত উৎবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) যখন এসে যাবেন তখন তোমরা এসো। আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাঁদেরকে কষ্ট দেবে। অতএব তাঁরা উভয়ে এসে গেলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করে দেন। হযরত হাকাম বিন কাসইয়ান (রাঃ) তো মুসলমান হয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতেই রয়ে যান। 'বি'রে মাউনা' যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। উসমান বিন আবদুল্লাহ মক্কায় ফিরে যায় এবং তথায় কুফরের অবস্থাতেই মারা যায়। এই আয়াত শুনে ঐ বিজেতাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অসন্তুষ্টি, সাহাবীগণের (রাঃ) সমালোচনা ও কাফিরদের বিদ্রূপের কারণে তাঁদের অন্তরে যে দুঃখ ছিল, সবই দূর হয়ে যায়। কিন্তু এখন তাঁদের এই চিন্তা হয় যে, এ যুদ্ধের ফলে তাঁরা পারলৌকিক পুণ্য লাভ করবেন কি-না এবং গাযীদের মধ্যে তাঁদেরকে গণ্য করা হবে কি-না! এ সম্বন্ধে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে শেষের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বড় বড় আশা প্রদান করেন। মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যকার যুদ্ধে সর্বপ্রথম ইবনুল হাযরামীই মারা যায়। কাফিরদের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'নিষিদ্ধ

মাসগুলোর মধ্যে হত্যা করা কি বৈধ?' তখন يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটাই ছিল সর্বপ্রথম গাণীমতের মাল যা মুসলমানগণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশই (রাঃ) সর্ব প্রথম যুদ্ধ লব্ধ মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করেন এবং এটাই ইসলামে চালু হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশও এই রকমই অবতীর্ণ হয়। এ দু'জন বন্দীও ছিল ইসলামের প্রথম বন্দী।

---

২১৯। মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বল–এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, কিন্তু ও দু'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর; তারা তোমাকে (আরও) জিজ্ঞেস করছে, তারা কি (পরিমাণ) ব্যয় করবে? তুমি বল যা তোমাদের উদ্বৃত্ত; এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ।

٢١٩- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ○

২২০। পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে তারা তোমাকে পিতৃহীনদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল–তাদের হিতসাধন করাই উত্তম; এবং যদি তোমরা তাদেরকে সম্মিলিত করে নাও তবে তারা তোমাদের ভ্রাতা, আর কে অনিষ্টকারী, কে হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং

٢٢٠- فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

| | |
|---|---|
| **যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তিনি তোমাদেরকে বিপদে ফেলতেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।** | وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ |

যখন মদ্য হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন।' তখন সূরা-ই-বাকারার এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত উমার (রাঃ)-কে ডাকা হয়। এবং তাঁকে এই আয়াতটি পাঠ করে শুনানো হয়। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) পুনরায় এই দোয়াই করেন ঃ 'হে আল্লাহ! এটা আপনি আমাদের জন্যে আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করুন।' তখন সূরা-ই- নিসা'র يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।' (৪ঃ ৪৩) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেক নামাযের সময় ঘোষিত হতে থাকে যে নেশাগ্রস্ত মানুষ যেন নামাযের নিকটও না আসে। হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে তাঁকে এই আয়াতটিও পাঠ করে শুনানো হয়। হযরত উমার (রাঃ) পুনরায় এই প্রার্থনাই করেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্যে এটা আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করুন!' এবার সূরা মায়েদা'র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন হযরত উমার (রাঃ)-কে এই আয়াতটিও পাঠ করে শুনানো হয় এবং তাঁর কানে আয়াতটির فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ অর্থাৎ 'তোমরা কি বিরত হবে না?' (৫ঃ ৯১) এই শেষ কথাটি পৌঁছে তখন তিনি বলেন ঃ اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا অর্থাৎ 'আমরা বিরত থাকলাম, আমরা দূরে থাকলাম।' (মুসনাদ-ই-আহমদ, সুনান-ই-আবূ দাঊদ, জামেউত্ তিরমিযী, সুনান-ই-নাসাঈ ইত্যাদি)

'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম, ও তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যেও এই বর্ণনাটি রয়েছে। কিন্তু এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছে আবূ মাইসারা, যাঁর নাম আমর বিন শারাহ বিল হামদানী কুফী। হযরত আবূ যারআ' (রঃ) বলেন যে, তাঁর এই হাদীসটি হযরত উমার (রাঃ) হতে শ্রবণ করা প্রমাণিত হয়। ইমাম আলী বিন মাদীনী (রঃ) বলেন যে,এর ইসনাদ উত্তম ও সঠিক। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে সঠিক বলেছেন। 'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীম' গ্রন্থে হযরত উমারের (রাঃ) اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا উক্তির পরে এই কথাগুলোও রয়েছে ঃ মদ্য মাল ধ্বংস করে থাকে এবং জ্ঞান লোপ করে দেয়।' এই বর্ণনাটি এবং

এর সঙ্গে মুসনাদ-ই আহমাদের হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্যান্য বর্ণনাগুলো সূরা মায়েদার মদ্য হারাম সম্বন্ধীয় আয়াতটির তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে।

হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলেনঃ خَمْرٌ অর্থাৎ মদ্য ঐ জিনিসের প্রত্যেকটিকে বলা হয় যা জ্ঞান লোপ করে দেয়। ইনশাআল্লাহ এরও পূর্ণ বর্ণনা সূরা মায়েদায় আসবে। مَيْسِرٌ বলা হয় জুয়া খেলাকে। এগুলোর পাপ হচ্ছে পারলৌকিক এবং লাভ হচ্ছে ইহলৌকিক। যেমন,এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হযম হয়, মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায়, এক প্রকারের আনন্দ লাভ হয় ইত্যাদি। যেমন হযরত হাসান বিন সাবিত (রাঃ) অজ্ঞতাযুগের একটি কবিতার মধ্যে বলেছেন ঃ 'মদ্য পান করে আমরা বাদশাহ ও বীর পুরুষ হয়ে থাকি।' অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়েও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এরকমই জুয়া খেলাতে বিজয় লাভের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি ও অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে স্যাথে ধর্মও ধ্বংস হয়ে থাকে। এই আয়াতের মধ্যে মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বাভাষ থাকলেও স্পষ্টভাবে হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি। তাই হযরত উমার (রাঃ) চাচ্ছিলেন যে, স্পষ্ট ভাষায় মদ্য হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হোক। কাজেই সূরা মায়েদার আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয় ঃ 'মদ্য পান, জুয়া খেলা, পাশা খেলা এবং তীরের সাহায্যে পূর্ব লক্ষণ গ্রহণ করা সমস্তই হারাম ও শয়তানী কাজ। 'হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা মুক্তি পেতে চাও তবে এসব কাজ হতে বিরত থাক। শয়তানের আকাংখা এই যে, সে মদ্য ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা উৎপাদন করে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্র ও নামায হতে বিরত রাখে, সুতরাং তোমরা এসব হতে বিরত হবে কি?' ইবনে উমার (রাঃ), শা'বী (রঃ), মুজাহিদ(রঃ) কাতাদাহ (রঃ) রাবী' বিন আনাস (রাঃ) ও আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) বলেন যে, মদ্যের ব্যাপারে প্রথম সূরা-ই-বাকারার এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় সুরা-ই-নিসার আয়াতটি। সর্বশেষে সূরা-ই-মায়েদার আয়াতটি অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা মদ্যকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেন। 'কুলিল আ'ফওয়া' এর একটি পঠন 'কুলিল আ'ফউ'ও রয়েছে এবং উভয় পঠনই বিশুদ্ধ। দু'টোর অর্থ প্রায় একই। হযরত মুআ'য বিন জাবাল (রাঃ) এবং হযরত সালাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের গোলামও রয়েছে এবং সন্তানাদিও রয়েছে, আমরা ধনী

বটে, আমরা আল্লাহর পথে কিছু দান করবো কি?' এর উত্তরে বলা হয় قُلِ الْعَفْوَ। অর্থাৎ–(হে নবীজি সঃ) তুমি বল–যা তোমাদের উদ্বৃত্ত।' (২ঃ ২১৯) অর্থাৎ সন্তানাদির জন্যে খরচ করার পরে যা অতিরিক্ত হয় তাই খরচ কর। বহু সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রাঃ) হতে এর তাফসীর এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত তাঊস (রাঃ) বলেন ঃ 'প্রত্যেক জিনিস হতেই কিছু কিছু করে আল্লাহর পথে দিতে থাক।' রাবী' (রাঃ) বলেন ঃ 'ভাল ও উত্তম মাল আল্লাহর পথে দান কর।' সমস্ত উক্তির সারমর্ম এই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ 'তোমরা এরূপ করো না যে,সবই দিয়ে ফেলবে, অতঃপর নিজেই ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিবে।'

সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছেঃ 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার কাছে একটি স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমার কাজে লাগিয়ে দাও।' লোকটি বলেঃ 'আমার নিকট আরও একটি রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমার স্ত্রীর জন্যে খরচ কর।' সে বলে, 'আরও একটি আছে।' তিনি বলেনঃ 'তোমার ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে লাগিয়ে দাও।' সে বলেঃ 'আমার নিকট আরও একটি রয়েছে।' তিনি বলেন, 'তা হলে এখন তুমি খুব চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পার।' সহীহ মুসলিম শরীফের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে বলেনঃ 'প্রথমে তুমি তোমার জীবন থেকে আরম্ভ কর। প্রথমে ওরই উপরে সাদকা কর। বাঁচলে ছেলেমেয়ের উপর খরচ কর। এর পরে বাঁচলে নিজের আত্মীয়-স্বজনের উপর সাদকা কর। এর পরেও যদি বাঁচে তবে অন্যান্য অভাবগ্রস্তদের উপর সাদকা কর।'

ঐ কিতাবেরই আরও একটি হাদীসে রয়েছেঃ সবচেয়ে উত্তম দান হচ্ছে ওটাই যে, মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুপাতে রেখে অবশিষ্ট জিনিস আল্লাহর পথে দান করে দেয়। উপরের হাত নীচের হাত হতে উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দাও যাদের খরচ বহন তোমার দায়িত্বে রয়েছে।' অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'হে আদম সন্তান! তোমার হাতে তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা রয়েছে তা আল্লাহর পথে দিয়ে দেয়াই তোমার জন্যে মঙ্গলকর এবং তা বন্ধ রাখা তোমার জন্যে ক্ষতিকর। হাঁ, তবে নিজের প্রয়োজন অনুপাতে খরচ করাতে তোমার প্রতি কোন ভর্ৎসনা নেই।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি উক্তি এও বর্ণিত আছে যে, এই হুকুমটি যাকাতের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যাকাতের আয়াত যেন এই আয়াতেরই তাফসীর এবং এর স্পষ্ট বর্ণনা, সঠিক উক্তি এটাই।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–'যেমন আমি এই নির্দেশাবলী স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাবে বর্ণনা করেছি তদ্রূপ অবশিষ্ট নির্দেশাবলীও আমি পরিষ্কারও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবো। বেহেশ্তের অঙ্গীকার ও দোযখ হতে ভয় প্রদর্শনের কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে, যেন তোমরা এই নশ্বর জগত হতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পারলৌকিক জগতের প্রতি আগ্রহী হতে পার, যা অনন্তকালের জন্যে স্থায়ী হবে।' হযরত হাসান বসরী (রঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ "আল্লাহর শপথ! যে চিন্তা ও গবেষণা করবে সে অবশ্যই জানতে পারবে যে, ইহজগতের ঘর হচ্ছে বিপদের ঘর এবং পরিণামে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর পরজগতই হচ্ছে প্রতিদানের ঘর এবং তা চিরস্থায়ী থাকবে।"

হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন ঃ "দুনিয়ার উপর আখেরাতের যে কি মর্যাদা রয়েছে তা একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কারভাবে জানতে পারা যাবে। সুতরাং জ্ঞানীদের উচিত যে, তারা যেন পরকালের পুণ্য সংগ্রহ করার কাজে সদা সচেষ্ট থাকে।

অতঃপর পিতৃহীনদের সম্পর্কে নির্দশাবলী অবতীর্ণ হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে এই নির্দেশ ছিল (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ) অর্থাৎ 'উৎকৃষ্ট পন্থা ব্যতিরেকে পিতৃহীনদের মালের নিকটে যেও না।' (৬ঃ ১৫২) আরও বলেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا *

অর্থাৎ 'নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটের মধ্যে আগুন ভক্ষণ করছে এবং তারা অতি সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (৪ঃ ১০) এই আয়াতগুলো শ্রবণ করে পিতৃহীনদের অভিভাবকগণ ইয়াতীমদের আহার্য ও পানীয় হতে নিজেদের আহার্য ও পানীয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেন। তখন ঐ পিতৃহীনদের জন্যে রান্নাকৃত খাদ্য বেঁচে গেলে হয় ওরাই তা অন্য সময় খেয়ে নিতো না হয় নষ্ট হয়ে যেতো। এর ফলে একদিকে যেমন ইয়াতীমদের ক্ষতি হতে থাকে, অপরদিকে তেমনই তাদের অভিভাবকগণ অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। সুতরাং তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে এই

সম্বন্ধে আরজ করেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সৎ নিয়তে ও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়।

সুনান-ই-আবূ দাউদ, সুনান-ই-নাসাঈ ইত্যাদির মধ্যে এই বর্ণনাটি বিদ্যমান রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের একটি দল এর শান-ই-নযুল এটাই বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "ইয়াতীমদের খাদ্য ও পানি পৃথক করা ছাড়া খুঁটিনাটিভাবে তাদের মাল দেখাশুনা করা খুবই কঠিন।"

إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ -এর ভাবার্থ এই পৃথক করণই বটে। কিন্তু وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ বলে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। কেননা, তারাও তো ধর্মীয় ভাই। তবে নিয়্যাত সৎ হওয়া উচিত। ইয়াতীমদের ক্ষতি করার যদি উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটাও আল্লাহ পাকের নিকট অজানা নেই। আর যদি ইয়াতীমদের মঙ্গলের ও তাদের মাল রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটাও আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন।'

অতঃপর বলা হচ্ছে—আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে জড়িত করতে চান না। পিতৃহীনদের আহার্য ও পানি পৃথক করণের ফলে তোমরা যে অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছিলে আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দিলেন। এখন একই হাঁড়িতে রান্নাবান্না করা এবং মিলিতভাবে কাজ করা তোমাদের জন্যে মহান আল্লাহ বৈধ করলেন। এমনকি পিতৃহীনের অভিভাবক যদি দরিদ্র হয় তবে ন্যায়ভাবে সে নিজের কাজে ইয়াতীমের মাল খরচ করতে পারে। আর যদি কোন ধনী অভিভাবক প্রয়োজন বশতঃ ইয়াতীমের মাল নিজের কাজে লাগিয়ে থাকে তবে সে পরে তা আদায় করে দেবে। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলো সূরা-ই-নিসা'র তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে।

---

**২২১। এবং অংশীবাদিনীগণ বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না এবং নিশ্চয় বিশ্বাসিনী দাসী অংশীবাদিনী মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে**

٢٢١- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى
يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰٓئِكَ
يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا
اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَ
يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ ○ ع (٢٧ ع ١١)

তোমাদেরকে মোহিত করে ফেলে; এবং অংশীবাদীগণ বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলমান নারীদিগের) বিবাহ প্রদান করো না এবং নিশ্চয় অংশীবাদী তোমাদের মনঃপুত হলেও বিশ্বাসী দাস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; এরাই দোযখাগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন ও মানবমণ্ডলীর জন্যে স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন–যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

এখানে অংশীবাদিনী মহিলাদেরকে বিয়ে করার অবৈধতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতটি সাধারণ বলে প্রত্যেক মুশরিকা মহিলাকে বিয়ে করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হলেও অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ “তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খোদাভীরু মহিলাগণকেও মোহর দিয়ে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে বৈধ-যারা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকে।” হযরত ইবনে আব্বাসেরও (রাঃ) উক্তি এটাই যে, ঐ মুশরিকা মহিলাগণ হতে কিতাবীদের মহিলাগণ বিশিষ্টা। মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), মাকহুল (রঃ), হাসান বিন সাবিত (রঃ), যহ্হাক (রঃ) কাতাদাহ্ (রঃ), যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) এবং রাবী‘ বিন আনাসেরও (রঃ) উক্তি এটাই। কেউ কেউ বলেন যে, এই আয়াতটি শুধুমাত্র মূর্তিপূজক মুশরিকা নারীদের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কয়েক প্রকারের নারীকে বিয়ে করার নিষিদ্ধতা ঘোষণা করেছেন। হিজরতকারিনী ও বিশ্বাসিনী নারীদেরকে ছাড়া অন্যান্য ঐসমস্ত মেয়েকে বিয়ে করার অবৈধতা ঘোষণা করেছেন যারা অন্য ধর্মের অনুসারিনী।

কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছেঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ঈমানের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে।' (৫ঃ ৫) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) একজন ইয়াহূদী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। এবং হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) একজন খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। এমনকি তিনি যেন তাঁদেরকে চাবুক মারতে উদ্যত হন। ঐ দুই মহান ব্যক্তি তখন বলেনঃ "হে আমিরুল মু'মেনীন! আপনি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমরা তাদেরকে তালাক দিচ্ছি।" তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেন ঃ "তালাক দেয়া যদি হালাল হয় তবে বিয়েও হালাল হওয়া উচিত। আমি তাদেরকে তোমাদের নিকট হতে ছিনিয়ে নেবো এবং অত্যন্ত অপমানের সাথে তাদেরকে পৃথক করে দেবো।" কিন্তু এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব এবং হযরত উমার (রাঃ) হতে সম্পূর্ণরূপেই গরীব।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) কিতাবী মহিলাদেরকে বিয়ে করার বৈধতার উপর ইজমা' নকল করেছেন এবং হযরত উমারের (রাঃ) এই হাদীস সম্বন্ধে লিখেছেন যে, এটা শুধু রাজনৈতিক যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ছিল যেন মানুষ মুসলিম নারীগণের প্রতি অনাগ্রহী না হয় কিংবা অন্য কোন দূরদর্শিতা এই নির্দেশের মধ্যে নিহিত ছিল। যেহেতু একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) যখন এই নির্দেশনামা প্রাপ্ত হন তখন তিনি উত্তরে লিখেন ঃ 'আপনি কি এটাকে হারাম বলেন?' মুসলমানদের খলীফা হযরত উমার ফারূক (রাঃ), বলেনঃ "আমি হারাম তো বলি না। কিন্তু আমার ভয় যে, তোমরা মুসলমান নারীদেরকে বিয়ে কর না কেন?" এই বর্ণনাটির ইসনাদও বিশুদ্ধ। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলেছেনঃ "মুসলমান পুরুষ খ্রীস্টান মহিলাকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু মুসলমান মহিলার সাথে খ্রষ্টান পুরুষের বিয়ে হতে পারে না।" এই বর্ণনাটির সনদ প্রথম বর্ণনাটি হতে সঠিকতর।

'তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে একটি মারফূ' হাদীস ইসনাদসহ বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আমরা আহলে কিতাবের নারীদেরকে বিয়ে করতে পারি কিন্তু আমাদের নারীদেরকে আহলে কিতাবের পুরুষ লোকেরা বিয়ে করতে পারে না।" কিন্তু এর সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও উম্মতের ইজমা' এর উপরেই রয়েছে। ইবনে আবি হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার

ফারূক (রাঃ) আহলে কিতাবের বিয়েকে অপছন্দ করতঃ এই আয়াতটি পাঠ করেন। ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত উমারের (রাঃ) এই উক্তিও নকল করেছেনঃ 'কোন মহিলা বলে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তার প্রভু, এই শিরক অপেক্ষা বড় শিরক আমি জানি না।' হযরত ইমাম আহমাদকে (রঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "এর দ্বারা আরবের ঐ মুশরিক মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মূর্তি পূজা করতো।"

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–বিশ্বাসিনী মহিলা অংশীবাদিনী মহিলা হতে উত্তম। এই ঘোষণাটি হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণের একটি দাসী ছিল। একদা ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি তাকে একটি চড় বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তার ধ্যান ধারণা কি।" তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে রোযা রাখে, নামায পড়ে, ভালভাবে অযু করে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আপনার প্রেরিতত্ত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "হে আবূ আব্দিল্লাহ! তবে তো সে মুসলমান।" তিনি তখন বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। আমি তাকে মুক্ত করে দেবো। শুধু তাই নয়, আমি তাকে বিয়েও করে নেবো।" সুতরাং তিনি তাই করেন। এতে কতকগুলো মুসলমান তাঁকে বিদ্রূপ করেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন যে, মুশরিক মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেবেন এবং নিজেদের নারীদের বিয়েও মুশরিকদের সাথে দেবেন। তাহলে বংশ মর্যাদা বজায় থাকবে। তখন এই ঘোষণা দেয়া হয় যে, মুশরিকা আযাদ মহিলা হতে মুসলমান দাসী বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবে মুশরিক আযাদ পুরুষ হতে মুসলমান দাস বহুগুণে উত্তম।

'তাফসীর-ই-আবদ বিন হামীদ গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নারীদের শুধুমাত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে বিয়ে করো না। হতে পারে যে, তাদের সৌন্দর্য তাদের মধ্যে অহংকার উৎপাদন করবে। নারীদেরকে তাদের সম্পদের উপরে বিয়ে করো না। তাদের সম্পদ তাদেরকে অবাধ্য করে তুলবে এ সম্ভাবনা রয়েছে। বিয়ে করলে ধর্মপরায়ণতা দেখ। কালো-কুৎসিতা দাসীও যদি ধর্মপরায়ণা হয় তবে সে বহুগুণে উত্তম।" কিন্তু এই হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে আফরেকী দুর্বল। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "চারটি জিনিস দেখে নারীদেরকে বিয়ে করা হয়। প্রথম মাল, দ্বিতীয় বংশ, তৃতীয় সৌন্দর্য এবং চতুর্থ ধর্মপরায়ণতা। তোমরা ধর্মপরায়ণতাই অনুসন্ধান কর।" সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই একটা সম্পদ বিশেষ। দুনিয়ার সম্পদসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে সতী নারী।"

অতঃপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ 'মুশরিক পুরুষদের সাথে মুসলমান নারীদের বিয়ে দিও না।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ অর্থাৎ 'কাফির মহিলারা মুসলমান পুরুষদের জন্যে বৈধ নয় এবং মুসলমান পুরুষেরা কাফির মহিলাদের জন্যে বৈধ নয়।' (৬০ঃ ১০) এর পরে বলা হয়েছে–মু'মিন পুরুষ যদি কাফ্রী ও ক্রীতদাসও হয় তথাপি সে স্বাধীন কাফির নেতা হতে উত্তম। ঐসব লোকের সাথে মেলামেশা, তাদের সাহচর্য, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া শিক্ষা দেয়। এর পরিণাম হচ্ছে দোযখে অবস্থান। আর আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের অনুসরণ, তাঁর নির্দেশ পালন বেহেশ্তের পথে চালিত করে এবং পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে। মানুষকে উপদেশ ও শিক্ষা দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

---

**২২২। এবং তারা তোমাকে (স্ত্রীলোকদের) ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ওটা হচ্ছে অশুচি, অতএব ঋতুকালে স্ত্রী লোকদেরকে অন্তরাল কর, এবং উত্তমরূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না; অনন্তর যখন তারা পবিত্র হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থীগণকে ভালবাসেন এবং শুদ্ধাচারীগণকেও ভালবেসে থাকেন।**

٢٢٢- وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط
قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ
يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○

২২৩। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্যে ক্ষেত্র স্বরূপ; অতএব তোমরা যখন ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেত্রে গমণ কর এবং স্বীয় জীবনের জন্যে পূর্বেই প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, তোমরা তাঁকে সন্দর্শন করবে এবং বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ প্রদান কর।

٢٢٣- نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ مُّلٰقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, ইয়াহূদীরা ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকদেরকে তাদের সাথে খেতেও দিতো না এবং তাদের পার্শ্বে রাখতো না। সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তারই উত্তরে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, সহবাস ছাড়া অন্যান্য সবকিছু বৈধ। একথা শুনে ইয়াহূদীরা বলেঃ "আমাদের বিরুদ্ধাচরণই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য।" হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ) এবং হযরত ইবাদ বিন বাশার (রাঃ) ইয়াহূদীদের এই কথা নকল করে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে তাহলে সহবাস করারও অনুমতি দিন।' এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখমণ্ডল (এর-রং) পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) ধারণা করেন যে, তিনি তাঁদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর এই মহান ব্যক্তিদ্বয় যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট কোন এক ব্যক্তি উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দুধ নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের পিছনে লোক পাঠিয়ে তাঁদেরকে ডেকে পাঠান এবং ঐ দুধ তাদেরকে পান করান। তখন জানা যায় যে ঐ ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে (সহীহ মুসলিম)।

সুতরাং 'ঋতুর অবস্থায় স্ত্রীদের হতে পৃথক থাকো'-এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সহবাস করো না।' কারণ, এ ছাড়া অন্যান্য সবকিছুই বৈধ। অধিকাংশ আলেমের মাযহাব এই যে, সহবাস বৈধ নয় বটে, কিন্তু প্রেমালাপ করা বৈধ। হাদীসসমূহেও রয়েছে যে, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও সহধর্মিণীদের সাথে মেলামেশা করতেন, কিন্তু তাঁরা গুপ্ত স্থান কাপড়ে বেঁধে রাখতেন (সুনান-ই-আবূ দাঊদ)।

হযরত আম্মারার ফুফু (রাঃ) হযরত আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'যদি স্ত্রী হায়েযের অবস্থায় থাকে এবং স্বামী-স্ত্রীর একই বিছানা হয় তবে তারা কি করবে?' অর্থাৎ এই অবস্থায় তার স্বামী তার পাশে শুতে পারে কি-না?' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাড়িতে এসেই তাঁর নামাযের জায়গায় চলে যান এবং নামাযে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তিনি শীত অনুভব করে আমাকে বলেন ঃ 'এখানে এসো।' আমি বলি ঃ 'আমি ঋতুবতী।' তিনি আমাকে আমার জানুর উপর হতে কাপড় সরাতে বলেন। অতঃপর তিনি আমার উরু ও গণ্ড দেশের উপর বক্ষ রেখে শুয়ে পড়েন। আমিও তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ি। ফলে ঠাণ্ডা কিছু প্রশমিত হয় এবং সেই গরমে তিনি ঘুমিয়ে যান।'

হযরত মাসরূক (রঃ) একদা হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং বলেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلٰى اَهْلِهٖ অর্থাৎ নবী (সঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'মারহাবা, মারহাবা! অতঃপর তাঁকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। হযরত মাসরূক (রঃ) বলেন ঃ 'আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি কিন্তু লজ্জাবোধ করছি।' তিনি বলেন ঃ 'আমি তোমার মা এবং তুমি আমার ছেলে (সুতরাং যা জিজ্ঞেস করতে চাও কর)।' তিনি বলেন ঃ '(আচ্ছা বলুন তো) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর কি করা কর্তব্য?' তিনি বলেন 'লজ্জা স্থান ছাড়া সবই জায়েয (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)।' অন্য সনদেও বিভিন্ন শব্দে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এ উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং ইকরামা (রঃ)-এর ফতওয়া এটাই। ভাবার্থ এই যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে উঠা-বসা, খাওয়া ও পান করা ইত্যাদি সবই সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,তিনি বলেনঃ 'আমি ঋতুর অবস্থায় নবী (সঃ)-এর মস্তক ধৌত করতাম, তিনি আমার ক্রোড়ে হেলান দিয়ে শুয়ে কুরআন মাজীদ পাঠ করতেন। আমি হাড় চুষতাম এবং তিনিও ওখানেই মুখ দিয়ে চুষতেন। আমি পানি পান করে তাঁকে গ্লাস দিতাম এবং তিনিও ওখানেই মুখ দিয়ে ঐ গ্লাস হতেই ঐ পানিই পান করতেন। সেই সময় আমি ঋতুবতী থাকতাম।' সুনান-ই- আবূ দাউদের মধ্যে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ)

বলেনঃ 'আমার ঋতুর অবস্থায় আমি ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) একই বিছানায় শয়ন করতাম। তাঁর কাপড়ের কোন জায়গা খারাপ হয়ে গেলে তিনি শুধু ঐটুকু জায়গাই ধুয়ে ফেলতেন, শরীরের কোন জায়গায় কিছু লেগে গেলে ঐ জায়গাটুকুও ধুয়ে ফেলতেন এবং ঐ কাপড়েই নামায পড়তেন।' তবে সুনানে আবূ দাউদের একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি ঋতুর অবস্থায় বিছানা হতে নেমে গিয়ে মাদুরের উপরে চলে আসতাম। আমি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আসতেন না।' তাহলে এই বর্ণনাটির ভাবার্থ এই যে, তিনি সতর্কতামূলকভাবে এর থেকে বেঁচে থাকতেন, নিষিদ্ধতার জন্যে নয়।

কোন কোন মনীষী এ কথাও বলেন যে, কাপড় বাঁধানো অবস্থায় উপকার গ্রহণ করেছেন। হযরত হারিস হেলালিয়াহর (রাঃ) কন্যা মায়মুনা (রাঃ) বলেনঃ 'নবী (সঃ) যখন তাঁর কোন সহধর্মিণীর সাথে মিলনের ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁকে কাপড় বেঁধে দেয়ার নির্দেশ দিতেন (সহীহ বুখারী)। এই রকমই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে এই হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আমার স্ত্রীর ঋতুর অবস্থায় তার সাথে আমার কোন কিছু বৈধ আছে কি?' তিনি বলেন ঃ 'কাপড়ের উপরের সব কিছুই বৈধ (সুনান-ই-আবূ দাউদ ইত্যাদি)।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এটা হতে বেঁচে থাকাও উত্তম। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রাঃ) এবং হযরত শুরাইহের (রাঃ) মাযহাবও এটাই। এই ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর (রাঃ) দু'টি উক্তি রয়েছে, তন্মধ্যে এটাও একটি। অধিকাংশ ইরাকী প্রভৃতি মনীষীরও এটাই মাযহাব। তাঁরা বলেন যে, সহবাস যে হারাম এটাতো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কাজেই এর আশপাশ হতেও বেঁচে থাকা উচিত যাতে হারামের মধ্যে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। ঋতুর অবস্থায় সহবাসের নিষিদ্ধতা এবং যে ব্যক্তি এই কার্যে পতিত হবে তার পাপী হওয়া, এটা তো নিশ্চিত কথা। তাকে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

কিন্তু তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে কি-না এ বিষয়ে আলেমদের দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে। মুসনাদ-ই-আহমাদ ও সুনানের মধ্যে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস

করে সে যেন একটি স্বর্ণ মুদ্রা বা অর্ধ স্বর্ণ মুদ্রা দান করে।' জামেউত্ তিরমিযী শরীফের মধ্যে রয়েছে যে, যদি রক্ত লাল হয় তবে একটা স্বর্ণ মুদ্রা আর যদি রক্ত হলদে বর্ণের হয় তবে অর্ধস্বর্ণ মুদ্রা। মুসনাদ-ই-আহমদের মধ্যে রয়েছে যে, যদি রক্ত শেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং এখন পর্যন্ত স্ত্রী গোসল না করে থাকে, এই অবস্থায় যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তবে অর্ধ দীনার, নচেৎ এক দীনার। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, কাফ্ফারা কিছুই নেই। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেই চলবে। ইমাম শাফিঈও (রঃ) এ কথাই বলেন। অধিকতর সঠিক মাযহাবও এটাই এবং জমহূর ওলামাও এই মতই পোষণ করেন। যে হাদীসগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে সেই সম্পর্কে এঁদের কথা এ যে, এগুলোর মারফূ' হওয়া সঠিক কথা নয়, রবং সঠিক কথা এ যে, এগুলো মাওকুফ হাদীস। বর্ণনা হিসেবে এগুলো মারফূ' ও মাওকুফ উভয় রূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসশাস্ত্রবিদের মতে সঠিক কথা এই যে, এগুলো মাওকুফ হাদীস। 'তাদের নিকটে যেও না' এটা তাফসীর হচ্ছে এ নির্দেশের যে, ঋতুর অবস্থায় স্ত্রীগণ হতে তোমরা পৃথক থাকবে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ঋতু শেষ হয়ে গেলে তাদের নিকট যাওয়া বৈধ।

হযরত ইমাম আবূ আবদিল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেন'ঃ 'পবিত্রতা বলে দিচ্ছে যে, এখন তার নিকটে যাওয়া জায়েয।' হযরত মায়মুনা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমাদের মধ্যে যখন কেউ ঋতুবতী হতেন তখন তিনি কাপড় বেঁধে দিতেন এবং নবী (সঃ)-এর সাথে তাঁর চাদরে শুয়ে যেতেন।' এর দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে যে, নিকটে যাওয়া হতে নিষেধ করার অর্থ সহবাস হতে নিষেধ করা। এ ছাড়া তার সাথে শয়ন, উপবেশন ইত্যাদি সবই বৈধ।

এরপরে ইরশাদ হচ্ছে–তারা যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সহবাস কর। ইমাম ইবনে হাযাম (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক হায়েযের পবিত্রতার উপর সহবাস করা ওয়াজিব। তার দলীল হচ্ছে فَأْتُوهُنَّ অর্থাৎ 'তাদের নিকটে এসো' এই শব্দটি। কিন্তু এটা কোন শক্ত দলীল নয়। এটা শুধু অবৈধতা সরিয়ে দেয়ার ঘোষণা। এছাড়া অন্য কোন দলীল তাঁর কাছে নেই। 'উসুল' শাস্ত্রের আলেমগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, 'আমর' অর্থাৎ নির্দেশ সাধারণভাবে অবশ্যকরণীয়রূপে এসে থাকে। তাঁদের পক্ষে ইমাম ইবনে হাযামের কথার উত্তর দেয়া খুব কঠিন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এই নির্দেশ শুধু অনুমতির জন্য। এর পূর্বে নিষিদ্ধতার কথা এসেছে বলে এটা এরই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে,

এখানে 'আমর' অবশ্য করণীয়ের জন্যে নয়। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়। দলীল দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে তা এই যে, এরূপ স্থলে অর্থাৎ পূর্বে নিষিদ্ধ এবং পরে নির্দেশ, এ অবস্থায় নির্দেশ স্বীয় মূলের উপরেই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ যা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যেমন ছিল এখন তেমনই হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যদি কাজটি ওয়াজিব থেকে থাকে তবে এখনও ওয়াজিবই থাকবে। যেমন কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছে ঃ فَاِذَا انسَلَخَ الاَشهُرُ الحُرُمُ فَاقتُلُوا المُشرِكِينَ অর্থাৎ 'যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর।' (৯ঃ ৫) আর যদি নিষিদ্ধতার পূর্বে তা বৈধ থেকে থাকে তবে তা বৈধই থাকবে। যেমন কুরআন পাকের وَاِذَا حَلَلتُم فَاصطَادُوا অর্থাৎ 'যখন তোমরা ইহরাম খুলে দেবে তখন তোমরা শিকার কর।' (৫ঃ ২) অন্য স্থানে রয়েছেঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانتَشِرُوا فِى الاَرضِ

অর্থাৎ 'যখন নামায পুরো করা হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়।' (৬২ঃ ১০) ঐ আলেমদের এই সিদ্ধান্ত ঐ বিভিন্ন উক্তিগুলোকে একত্রিত করে দেয় যা 'আমরে'র অবশ্যকরণীয় ইত্যাদি সম্বন্ধে রয়েছে। ইমাম গায্যালী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী কতকগুলো ইমাম এটাও পছন্দ করেছেন। এটাই সঠিকও বটে। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টিও স্মরণীয় যে, যখন হায়েযের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, ওর পরেও স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস হালাল হবে না যে পর্যন্ত না সে গোসল করবে। হাঁ, তবে যদি তার কোন ওজর থাকে এবং গোসলের পরিবর্তে যদি তার জন্যে তায়াম্মুম করা যায়েয হয় তবে তায়াম্মুমের পর তার কাছে স্বামী আসতে পারে। এতে সমস্ত আলেমের মতৈক্য রয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানিফা' (রঃ) এ সমস্ত আলেমের বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, যদি হায়েয শেষ সময়কাল অর্থাৎ দশ দিন পর্যন্ত থেকে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে গোসল না করলেও তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একবার তো يَطهُرنَ শব্দ রয়েছে; এর ভাবার্থ হচ্ছে হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়া এবং 'তাত্বাহ্হারনা' শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে গোসল করা। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ) হযরত লায়েস বিন সা'দ (রঃ) প্রভৃতি মহান ব্যক্তিও এটাই বলেন।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-তোমরা ঐ জায়গা দিয়ে এসো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যার নির্দেশ দিচ্ছেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে সম্মুখের স্থান। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি অনেক মুফাস্সিরও এই অর্থই বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে শিশুদের জন্মগ্রহণের জায়গা। এছাড়া অন্য স্থান অর্থাৎ পায়খানার স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ। এই রকম কাজ যারা করে তারা সীমা অতিক্রমকারী। সাহাবা (রাঃ) এবং তাবেঈন (রঃ) হতে এর ভাবার্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ 'হায়েযের অবস্থায় যে স্থান হতে তোমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছিল এখন ঐ স্থান তোমাদের জন্যে হালাল হয়ে গেল। এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, পায়খানার জায়গায় সহবাস করা হারাম। এর বিস্তারিত বর্ণনাও ইনশাআল্লাহ আসছে। 'পবিত্রতার অবস্থায় এসো যখন সে হায়েয হতে বেরিয়ে আসে'এ অর্থও নেয়া হয়েছে। এজন্যেই এর পরবর্তী বাক্যে পাপ কার্য হতে প্রত্যাবর্তনকারী ও হায়েযের অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে দূরে অবস্থানকারীকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। অনুরূপভাবে (প্রস্রাবের স্থান ছাড়া) অন্য স্থান হতে যারা বিরত থাকে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ভালবাসেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-তোমাদের স্ত্রীগুলো তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ। অর্থাৎ সন্তান বের হওয়ার স্থানে তোমরা যেভাবেই চাও তোমাদের ক্ষেত্রে এসো। নিয়ম ও পদ্ধতি পৃথক হলেও স্থান একই। অর্থাৎ সম্মুখে করে অথবা তার বিপরীত। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে ঃ 'ইয়াহূদীরা বলতো যে, স্ত্রীর সঙ্গে সম্মুখের দিক দিয়ে সহবাস না করে যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে যায় তবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট সন্তান জন্মলাভ করবে।' তাদের এ কথার খণ্ডনে এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, স্বামীর এই ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। 'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীম' গ্রন্থে রয়েছে যে, ইয়াহূদীরা এই কথাটিই মুসলমানদেরকেও বলেছিল। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সম্মুখের দিক দিয়ে আসতে পারে এবং পিছনের দিক দিয়েও আসতে পারে। কিন্তু স্থান একটিই হবে।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেঃ 'আমরা আমাদের স্ত্রীদের নিকট কিরূপে আসবো এবং কিরূপে ছাড়বো?' তিনি উত্তরে বলেন, 'তারা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ, যেভাবেই চাও এসো। হাঁ, তবে তাদের মুখের উপরে মেরো না, তাদেরকে খুব মন্দ বলো না, ক্রোধ বশতঃ তাদের হতে পৃথক হয়ে যেয়ো না। একই ঘরে অবস্থান কর (আহমাদ ও

সুনান)।' 'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীমের মধ্যে রয়েছে যে, হামীর গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে,'আমার স্ত্রীদের সাথে আমার খুব ভালবাসা রয়েছে। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে যে নির্দেশাবলী রয়েছে তা আমাকে বলে দিন।'তখন এই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, কয়েকজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এটা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাহাবীর (রঃ) 'মুশকিলুল হাদীস' গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে উল্টোভাবে সহবাস করেছিল। এতে মানুষ তার সমালোচনা করলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

'তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন সাবেতাহ (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান বিন আবূ বকরের (রাঃ) কন্যা হযরত হাফসার (রাঃ) নিকটে এসে বলেন, 'আমি একটি জিজ্ঞাস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু লজ্জাবোধ করছি।' তিনি বলেন, 'হে ভ্রাতুষ্পুত্র! লজ্জা করো না, যা জিজ্ঞেস করতে চাও জিজ্ঞেস কর।' তিনি বলেন, আচ্ছা বলুন তো, স্ত্রীদের সাথে পিছনের দিক দিয়ে সহবাস করা বৈধ কি?' তিনি বলেন, 'হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, আনসারগণ (রাঃ) স্ত্রীদেরকে উল্টো করে শোয়ায়ে দিতেন এবং ইয়াহূদীরা বলতো যে, এভাবে সহবাস করলে সন্তান টেরা হয়ে থাকে। অতঃপর যখন মুহাজিরগণ (রাঃ) মদীনায় আগমন করেন এবং এখানকার স্ত্রী লোকদের সাথে তাদের বিয়ে হয়, তখন তাঁরাও এরূপ করতে চাইলে একজন স্ত্রীলোক তাঁর স্বামীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আপনার কথা মানতে পারি না। সুতরাং তিনি নবীর (সঃ) দরবারে উপস্থিত হন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখনই এসে যাবেন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) আগমন করলে ঐ আনসারিয়া স্ত্রী লোকটি তো লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে না পেরে ফিরে যান। কিন্তু হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'আনসারিয়া স্ত্রী লোকটিকে ডেকে পাঠাও।' তিনি তাঁকে ডেকে আনলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এই আয়াতটি পাঠ করে শুনান এবং বলেন, 'স্থান একটিই হবে।'

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, একদা হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, ' হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।' তিনি বলেন, ব্যাপার কি?' হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'রাত্রে আমি

আমার সোয়ারী উল্টো করেছি।' তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সেই সময়ই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তিনি বলেন, 'তুমি সম্মুখের দিক হতে বা পিছনের দিক হতে এসো, তোমার দু'টোরই অধিকার রয়েছে। কিন্তু ঋতুর অবস্থায় এসো না। পায়খানার জায়গায় এসো না। আনসারীর ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি কিছু বিস্তারিতভাবেও বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে এও রয়েছে যে,হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)-কে আল্লাহ ক্ষমা করুন,তিনি কিছু সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছেন। কথা এই যে, আনসারদের দল প্রথমে মূর্তি পূজক ছিলেন এবং ইয়াহূদীরা আহলে কিতাব ছিল। মূর্তি পূজকেরা কিতাবীদের মর্যাদা ও বিদ্যার কথা স্বীকার করতো। ইয়াহূদীরা একই প্রকারে তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতো। আনসারদেরও এই অভ্যাসই ছিল। পক্ষান্তরে মক্কাবাসীরা কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসারী ছিল না। তারা যথেচ্ছা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতো।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কাবাসী মুহাজিরগণ (রাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মক্কা হতে আগত একজন মুহাজির পুরুষ মদীনার একজন আনসারিয়াহ্ মহিলাকে বিয়ে করেন এবং মনোমত পন্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। মহিলাটি অস্বীকার করে বসেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, 'আমি ঐ একই নিয়ম ছাড়া অনুমতি দেবো না। কথা বাড়তে বাড়তে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর এই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। সুতরাং সামনে বা পিছনে যেভাবে ইচ্ছা সহবাসের অধিকার রয়েছে, তবে স্থান একটিই হবে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, 'আমি হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেছি। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে শুনিয়েছি। এক একটি আয়াতের তাফসীর ও ভাবার্থ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। এই আয়াতে পৌঁছে যখন আমি তাঁকে এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করি তখন তিনি এটাই বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছেঃ হযরত ইবনে উমারের (রাঃ) সন্দেহ ছিল এই যে, কতকগুলো বর্ণনায় রয়েছেঃ 'তিনি কুরআন মাজীদ পাঠের সময় কাউকেও বলতেন না। কিন্তু একদিন পাঠের সময় যখন এই আয়াতে পৌঁছেন তখন তিনি হযরত নাফে' (রঃ) নামক তাঁর একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেন, 'এই আয়াতটি কি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তা তুমি জান কি?' তিনি বলেন, 'না'। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এটা স্ত্রী লোকদের অন্য জায়গায় সহবাস সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।'

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি (ইবনে উমার রাঃ) বলেন, 'একটি লোক তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক দিয়ে সহবাস করেছিল। ফলে এই আয়াতটি ঐ কাজের অনুমতি প্রদান হিসেবে অবতীর্ণ হয়।' কিন্তু প্রথমতঃ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এতে কিছুটা ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এর অর্থও এই হতে পারে যে, পিছনের দিক দিয়ে সম্মুখের স্থানে করেছিলেন এবং উপরের বর্ণনাগুলোও সনদ হিসেবে সহীহ নয়। বরং ঐ হযরত নাফে' (রঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে,তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি কি একথা বলেন যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) গুহ্যদ্বারে সহবাস জায়েয বলেছেন?' তিনি বলেন, 'মানুষ মিথ্যা বলে থাকে।' অতঃপর তিনি ঐ আনসারিয়াহ মহিলা ও মুহাজির পুরুষটির ঘটনাটাই বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তো এই আয়াতের এই ভাবার্থ বর্ণনা করতেন।' এই বর্ণনার ইসনাদও সম্পূর্ণরূপেই সঠিক এবং এর বিপরীত সনদ সঠিক নয়। ভাবার্থও অন্যরূপ হতে পারে। স্বয়ং হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। ঐ বর্ণনাগুলো ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই বর্ণিত হচ্ছে। ওগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'না এটা মুবাহ্, না হালাল, বরং হারাম। যদিও বৈধতার উক্তির সম্বন্ধ মদীনার কোন কোন ফকীহ্ প্রভৃতি মনীষীর দিকে লাগানো হয়েছে এবং কেউ কেউ তো ইমাম মালিকের (রঃ) দিকেও সম্বন্ধ লাগিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক এটা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা কখনও ইমাম মালিকের (রঃ) কথা নয়। বহু সহীহ্ হাদীস দ্বারা এ কাজের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে।

একটি বর্ণনায় রয়েছে–'হে জনমণ্ডলী! তোমরা লজ্জাবোধ কর। আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করো না'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কার্য হতে মানুষকে নিষেধ করেছেন (মুসনাদ-ই-আহমাদ) আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোন স্ত্রী বা পুরুষের সঙ্গে একাজ করে, তার দিকে আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। (জামেউত্ তিরমিযী) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তুমি কি কুফরী করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছো।' এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলেন, أَنَّى شِئْتُمْ -এর এই অর্থ বুঝেছি এবং এর উপর আমল করেছি।' তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন, 'ভাবার্থ এই যে, দাঁড়িয়ে কর অথবা পেটের ভরে শোয়া অবস্থায় কর, কিন্তু জায়গা একটিই হবে।' অন্য এইটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে সে ছোট 'লূতী' (হযরত লূত

আঃ -এর সম্প্রদায়ভুক্ত)−মুসনাদ-ই-আহমাদ। হযরত আবূদ দারদা (রাঃ) বলেন যে, এটা কাফিরদের কাজ। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাঃ) হতেও এটা নকল করা হয়েছে এবং অধিকতর এটাই সঠিক।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'সাত প্রকার লোক রয়েছে যাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। এবং তাদেরকে বলে দেবেনঃ 'দোযখীদের সাথে দোযখে চলে যাও।' (১) ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী (২) হস্ত মৈথুনকারী (৩) চতুষ্পদ জন্তুর সাথে এই কার্যকারী (৪) স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাসকারী (৫) স্ত্রী ও তার মেয়েকে বিয়েকারী। (৬) প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারকারী এবং (৭) প্রতিবেশীকে এমনভাবে শাসন গর্জনকারী যে, শেষ পর্যন্ত সে তাকে অভিশাপ দেয়।' কিন্তু এর সনদের মধ্যে লাহীআ'হ এবং তার শিক্ষক দু'জনই দুর্বল। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য পথে সহবাস করে তাকে আল্লাহ দয়ার দৃষ্টিতে দেখেন না। মুসনাদ-ই-আহমাদ এবং সুনানের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা অন্য পথে সহবাস করে কিংবা যাদুকরের নিকট গমন করে এবং তাকে সত্যবাদী মনে করে সে ঐ জিনিসকে অস্বীকার করলো যা মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, ইমাম বুখারী (রঃ) এই হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।

জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, গুহ্যদ্বারে সহবাস করাকে হযরত আবূ সালমাও (রাঃ) হারাম বলতেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ 'লোকদের স্ত্রীদের সাথে এই কাজ করা কুফরী (সুনান-ই-নাসাঈ)। এই অর্থের একটি মারফূ' হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীসটির মাওকুফ হওয়াই অধিকরত সঠিক কথা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এই স্থানটি হারাম। হযরত ইবনে মাসউদও (রাঃ) এই কথাই বলেন। হযরত আলী (রাঃ) এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ 'সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বর্বর। তুমি আল্লাহর কালাম শুননি'? কুরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যখন লুতের (আঃ) কওমকে বলা হলো−তোমরা কি এমন নির্লজ্জতার কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কেউ কোনদিন করেনি?' সুতরাং বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ হতে এবং সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) হতে বহু বর্ণনা ও সনদ দ্বারা এই কার্যের নিষিদ্ধতা বর্ণিত আছে। এই কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমারও (রাঃ) এই কাজকে অবৈধই বলেছেন। যেহেতু 'দারেমী'র মধ্যে রয়েছে যে,

একবার তিনি এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেনঃ 'মুসলমানও এই কাজ করতে পারে?' এর ইসনাদ সঠিক এবং এর দ্বারা এই কার্যের অবৈধতাও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং অশুদ্ধ ও বিভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট বর্ণনাগুলোর পিছনে পড়ে এরূপ একজন মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীর (রাঃ) দিকে এরূপ জঘন্য মাসআলার সম্বন্ধ লাগানো মোটেই ঠিক নয়। এই প্রকারের বর্ণনাগুলো পাওয়া গেলেও ঐগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। এখন রইলেন ইমাম মালিক (রঃ)। তাঁর দিকেও এই কার্যের বৈধতার সম্বন্ধ লাগানো উচিত হবে না।

হযরত মুআ'ম্মার বিন ঈসা (রঃ) বলেন যে, হযরত ইমাম মালিক (রঃ) এই কার্যকে হারাম বলতেন। ইসরাঈল বিন রাওহ্ (রঃ) একদা তাঁকে এই প্রশ্নই করলে তিনি বলেন, 'তুমি কি নির্বোধ? বীজ বপন তো ক্ষেত্রেই করতে হয়। সাবধান! লজ্জা স্থান ছাড়া অন্য জায়গা হতে বেঁচে থাকবে।' প্রশ্নকারী বলেন, 'জনাব! জনগণ তো একথাই বলে থাকে যে, আপনি এই কাজকে বৈধ বলেন।' তখন তিনি বলেন, 'তারা মিথ্যাবাদী। আমার উপর তারা অপবাদ দিচ্ছে।' সুতরাং ইমাম মালিক (রঃ) হতেও এর অবৈধতা সাব্যস্ত হচ্ছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) এবং তাঁদের সমস্ত ছাত্র ও সহচর যেমন সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), আবূ সালমা (রঃ) ইকরামা (র), তাউস (রঃ), আতা' (রঃ) সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ সবাই এই কাজকে অবৈধ বলেছেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ কার্যকে কুফরী পর্যন্ত বলেছেন। এর অবৈধতায় জমহূর উলামারও ইজমা রয়েছে। যদিও কতকগুলো লোক মদ্বীনার ফকীহগণ হতে এমন কি ইমাম মালিক (রঃ) হতেও এর বৈধতা নকল করেছেন কিন্তু এগুলো সঠিক নয়।

আবদুর রহমান বিন কাসিম (রঃ) বলেন, 'কোন ধর্মভীরু লোককে আমি এর অবৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে দেখিনি।' অতঃপর তিনি نِسَآءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ পাঠ করে বলেন, 'স্বয়ং حَرْثٌ অর্থাৎ ক্ষেত্র শব্দটিই এর অবৈধতা প্রকাশ করার জন্যে যথেষ্ট। কেননা, অন্য জায়গা ক্ষেত্র নয়। ক্ষেত্রে যাবার পদ্ধতির স্বাধীনতা রয়েছে বটে কিন্তু ক্ষেত্র পরিবর্তনের স্বাধীনতা নেই। ইমাম মালিক (রঃ) হতে এটা বৈধ হওয়ার বর্ণনাসমূহ নকল করা হলেও সেগুলোর ইসনাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বলতা রয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম শাফিঈ (রঃ) হতেও লোকেরা একটি বর্ণনা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তিনি তাঁর ছয়খানা গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় এটাকে হারাম লিখেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-নিজেদের জন্যে তোমরা অগ্রেই কিছু পাঠিয়ে দাও। অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বিরত থাক এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন কর, যেন পুণ্য অগ্রে চলে যায়। আল্লাহকে ভয় কর এবং বিশ্বাস রেখো যে, তাঁর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতে হবে ও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমাদের হিসাব নেবেন। ঈমানদারগণ সদা আনন্দিত থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'ভাবার্থ এও হতে পারে যে, সহবাসের ইচ্ছে করলে নিম্নের দুআটি পাঠ করবে। بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَا رَزَقْتَنَا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'যদি এই সহবাস দ্বারা শুক্র ধরে যায় তবে শয়তান ঐ সন্তানের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।'

---

২২৪। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন হিত সাধন ও ভয় প্রদর্শনে তোমরা স্বীয় শপথসমূহের জন্যে আল্লাহকে যেন তার অন্তরায় রূপে গ্রহণ করো না; বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

٢٢٤- وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৫। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শপথসমূহের অসারতার জন্যে তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐসব শপথ সম্বন্ধে ধরবেন যেগুলো তোমাদের মনের সংকল্প অনুসারে সাধিত হয়েছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

٢٢٥- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

---

আল্লাহ তা'আলা বলেন-তোমরা আল্লাহ্র শপথ করে পুণ্যের কাজ ও আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখা পরিত্যাগ করো না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তারা যেন আত্মীয়দেরকে, দরিদ্রদেরকে এবং আল্লহর পথে হিজরতকারীদেরকে না দেয়ার শপথ না করে,

তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করার অভ্যাস করে, তোমাদের নিজেদের কি এই ইচ্ছে নেই যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন? এরূপ শপথ যদি কেউ করে বসে তবে সে যেন কসম ভেঙ্গে দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করে।' সহীহ বুখারীর মধ্যে হাদীস রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'আমরা সর্বশেষে আগমনকারী, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সবারই আগে গমনকারী।' তিনি বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই রকম শপথ করে বসে এবং কাফ্ফারা আদায় না করে তার উপরেই স্থির থাকে সে বড় পাপী।' এই হাদীসটি আরও বহু সনদে অনেক কিতাবে বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীর এটাই বলেছেন। হযরত মাসরূক (রঃ) প্রভৃতি বহু তাফসীরকারক হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ঐ জমহূর উলামার এই উক্তির সমর্থন এই হাদীস দ্বারাও পাওয়া যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহর কসম, যদি আমি কোন শপথ করি এবং তা ভেঙ্গে দেয়াতে মঙ্গল বুঝতে পারি তবে আমি অবশ্যই তা ভেঙ্গে দেবো এবং কাফ্ফারা আদায় করবো।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা হযরত আবদুর রহমান বিন সামরাকে (রাঃ) বলেনঃ 'হে আবদুর রহমান! সর্দারী, নেতৃত্ব এবং ইমামতির অনুসন্ধান করো না। যদি না চেয়েও তোমাকে তা দেয়া হয় তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে আর যদি তুমি চেয়ে নাও তবে তোমাকে তার নিকট সমর্পণ করা হবে। যদি তুমি কোন শপথ করে বসো এবং তার বিপক্ষে মঙ্গল দেখতে পাও তবে স্বীয় শপথের কাফ্ফারা আদায় করে ঐ সৎ কাজটি করে নাও' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। সহীহ মুসলিমের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে বসে, অতঃপর ওটা ছাড়া মঙ্গল চোখে পড়ে তবে কাফ্ফারা আদায় করতঃ কসম ভেঙ্গে দিয়ে ঐ সৎ কাজটি তার করা উচিত।

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, ওটা ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে ওর কাফ্ফারা। সুনান-ই-আবূ দাউদের মধ্যে রয়েছে, 'নযর' ও 'কসম' ঐ জিনিসে নেই যা মানুষের অধিকারে নেই। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার কার্যেও নেই এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কাজেও নেই। যে ব্যক্তি এমন কার্যে শপথ করে যাতে পুণ্য নেই, তবে সে যেন শপথ ভেঙ্গে দিয়ে পুণ্যের কাজই করে। ঐ শপথকে ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে ওর কাফ্ফারা। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ)

বলেনঃ "সমস্ত বিশুদ্ধ হাদীসে এই শব্দ রয়েছে যে, এরূপ শপথের কাফ্ফারা দেবে।" একটি দুর্বল হাদীসে রয়েছে যে, এই শপথকে পুরো করা হচ্ছে এই যে, তা ভেঙ্গে দেবে ও ওটা হতে প্রত্যাবর্তন করবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), মাসরূক (রঃ) এবং শা'বীও (রঃ) এই মতেরই সমর্থক যে, এরূপ লোকের দায়িত্বে কোন কাফ্ফারা নেই।

অতঃপর বলা হচ্ছে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব শপথ তোমাদের মুখ দিয়ে অভ্যাসগতভাবে বেরিয়ে যায়, আল্লাহ সেই জন্যে তোমাদেরকে দোষী করবেন না। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'লাত' ও 'উয্যা'র শপথ করে বসে সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নেয়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই ইরশাদ ঐ লোকদের উপর হয়েছিল যারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং অজ্ঞতা যুগের শপথসমূহ তাদের মুখের উপরেই ছিল। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, যদি অভ্যাসগতভাবে কখনও তাদের মুখ দিয়ে এরূপ শিরকের কালেমা বেরিয়েও যায় তবে যেন তারা তৎক্ষণাৎ কালেমা-ই-তাওহীদ পাঠ করে নেয় তাহলে এর বিনিময় হয়ে যাবে। এর পরে বলা হচ্ছে—যদি ঐসব শপথ মনের সংকল্প অনুসারে করা হয় তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ধরবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা অন্যান্য বর্ণনায় মাওকুফ রূপে এসেছে, তা এই যে, অর্থহীন শপথ ঐগুলো যেগুলো মানুষ তাদের ঘর-বাড়ী ও সন্তানাদির ব্যাপারে করে থাকে। যেমন হাঁ, আল্লাহর শপথ বা না, আল্লাহর শপথ! মোটকথা, অভ্যাস হিসেবেই মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বেরিয়ে যায়, এতে মনের সংকল্প মোটেই থাকে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে যে, এগুলো ঐ শপথ যেগুলো হাসতে হাসতে মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এগুলোর জন্যে কাফ্ফারা নেই। হাঁ, তবে যে শপথ মনের সংকল্পের সাথে হয় তার উল্টো করলে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তিনি ছাড়া আরও অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈও (রঃ) এই আয়াতের এই তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। এও বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কোন কার্যের ব্যাপারে নিজের সঠিকতার উপর ভরসা করে শপথ করে বসে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি তা তদ্রূপ না হয় তবে সেই শপথ বাজে হবে। এই অর্থটিও অন্যান্য বহু মনীষী হতে বর্ণিত আছে। একটি হাসান ও মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন এক সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন যারা তীর নিক্ষেপ করছিল এবং তাঁর সাথে একজন সাহাবীও (রাঃ) ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কখনও বলছিলঃ "আল্লাহর শপথ! তার তীর ঠিক লক্ষ্য স্থলেই

লাগবে।" আবার কখনও বলছিলঃ "খোদার শপথ! তার এই তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।" তখন নবীর (সঃ) সাথীটি তাঁকে বলেনঃ 'লোকটি কসম ভঙ্গকারী হয়ে গেল।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'এগুলো বাজে শপথ, সুতরাং তার উপরে কাফ্ফারা নেই এবং এর জন্যে তার কোন শাস্তিও হবে না।' কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এগুলো হচ্ছে ঐ শপথ যে শপথ করার পরে মানুষের তা খেয়াল থাকে না। কিংবা কোন লোক নিজের জন্যে কোন একটি কাজ না করার উপর কোন বদ দোয়া বিশিষ্ট কথা মুখ দিয়ে বের করে থাকে, ওগুলোও বাজে অথবা ক্রোধের অবস্থায় হঠাৎ মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, বা হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করে নেয়। এই অবস্থায় তার উচিত যে সে যেন এগুলোর উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী বজায় রাখে।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারী দুই ভাই এর মধ্যে মীরাসের কিছু মাল ছিল। একজন অপরজনকে বলেনঃ 'আমাদের মধ্যে এই মাল বন্টন করা হোক।' তখন অপর জন বলেনঃ 'যদি তুমি এই মাল বন্টন করতে বল তবে আমার সমস্ত মাল কা'বা শরীফের ধন।' হযরত উমার (রাঃ) এই ঘটনাটি শুনে বলেনঃ 'কা'বা শরীফ এরূপ ধনের মুখাপেক্ষী নয়। তুমি তোমার শপথ ভেঙ্গে দাও এবং কাফ্ফারা আদায় কর এবং তোমার ভাই এর সাথে কথা বল। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছিঃ 'আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নতায় এবং যে জিনিসের উপর অধিকার নেই তাতে না আছে শপথ বা না আছে 'নযর'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—তোমরা মনের সংকল্পের সাথে যে শপথ করবে তার জন্যে তোমাদেরকে ধরা হবে। অর্থাৎ মিথ্যা জানা সত্ত্বেও যদি তুমি শপথ করে নাও তবে এই জন্যে আল্লাহ পাক তোমাকে পাকড়াও করবেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ অর্থাৎ 'তোমাদের শক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন।' (৫ঃ ৮৯) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ক্ষমাকারী এবং তিনি অত্যন্ত সহনশীল।

---

২২৬। যারা স্বীয় পত্নীগণ হতে পৃথক থাকবার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে; অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

٢٢٦- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২২৭। পক্ষান্তরে যদি তারা তালাক দিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

٢٢٧- وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

যদি কোন লোক কিছুদিন পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ গ্রহণ করে তবে এরূপ শপথকে اِيْلَاء বলা হয়। এর দু'টি রূপ রয়েছে। এই সময় চার মাসের কম হবে বা বেশী হবে। যদি কম হয় তবে চার মাস পুরো করবে এবং এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীও ধৈর্যধারণ করবে। এর মধ্যে সে স্বামীর নিকট আবেদন জানাতে পারবে না। এই চার মাস পুরো হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সঃ) এক মাসের জন্যে শপথ করেছিলেন এবং পূর্ণ ঊনত্রিশ দিন পৃথক থাকেন এবং বলেন, 'মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।' আর যদি চার মাসের বেশী সময়ের জন্যে শপথ করে তবে চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর স্বামীর নিকট আবেদন জানাবার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে যে, হয় মিলিত হবে, না হয় তালাক দেবে। শাসনকর্তা স্বামীকে এ দু' এর মধ্যে একটি করতে বাধ্য করবেন যেন স্ত্রী কষ্ট না পায়। এখানে এই বর্ণনাই হচ্ছে যে, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে (اِيْلَاء) করবে, অর্থাৎ তাদের সাথে সহবাস না করার শপথ করবে তাদের জন্যে চার মাস সময় রয়েছে। চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদেরকে বাধ্য করা হবে যে, হয় তারা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবে না হয় তালাক দেবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, (اِيْلَاء) স্ত্রীদের জন্যেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, দাসীদের জন্যে নয়। এটাই জমহূর উলামার মাযহাব। স্বামীর জন্যে উচিত নয় যে, চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও স্ত্রী হতে পৃথক থাকবে। এখন যদি তারা ফিরে আসে, অর্থাৎ সহবাস করে তবে তার পক্ষ থেকে স্ত্রীর যে কষ্ট হয়েছে আল্লাহ তাআ'লা তা ক্ষমা করে দেবেন। এতে ঐ আলেমদের জন্যে দলীল রয়েছে যাঁরা বলেন যে, এই অবস্থায় স্বামীর উপর কোন কাফ্ফারা নেই। ইমাম শাফিঈরও (রঃ) প্রথম উক্তি এটাই। এর সমর্থনে ঐ হাদীসও রয়েছে যা পূর্বের আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, তা এই যে, শপথকারী শপথ ভেঙ্গে দেয়ার মধ্যেই যদি মঙ্গল বুঝতে পারে তবে তা ভেঙ্গে দেবে এবং এটাই তার কাফ্ফারা। কিন্তু আলেমদের অন্য একটি দলের মাযহাব এই যে, ঐ শপথের কাফ্ফারা দিতে হবে। এর হাদীসগুলোও উপরে বর্ণিত হয়েছে। জমহূরের মাযহাবও এটাই।

অতঃপর ঘোষণা হচ্ছে-চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি সে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করে;এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, চার মাস অতিবাহিত হলেই তালাক হয়ে যায় না। পরবর্তী জমহূরের এটাই মাযহাব। তবে অন্য একটি দল এও বলেন যে, চার মাস অতিবাহিত হলেই তালাক হয়ে যাবে। হযরত উমার (রাঃ) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এবং কোন কোন তাবিঈ (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। অতঃপর কেউ বলেন যে, এটা 'তালাক-ই-রাজঈ' হবে আবার কেউ বলেন যে, তালাক-ই-বায়েন হবে। যাঁরা তালাক হয়ে যাওয়ার মত পোষণ করেন তাঁরা বলেন যে, এর পরে স্ত্রীকে 'ইদ্দত'ও পালন করতে হবে। তবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আবুশ্ শা'শা' (রাঃ) বলেন যে, যদি এই চার মাসের মধ্যে ঐ স্ত্রী লোকটির তিনটি হায়েয্ এসে গিয়ে থাকে তবে তার উপর 'ইদ্দত'ও নেই। ইমাম শাফিঈরও (রঃ) এটাই উক্তি। কিন্তু পরবর্তী জমহূর উলামার ঘোষণা এই যে, ঐ সময় অতিবাহিত হলেই তালাক হয়ে যাবে। এমন কি তখন শপথকারীকে বাধ্য করা হবে যে, হয় সে শপথ ভেঙ্গে দেবে, না হয় তালাক দিয়ে দেবে। মুআত্তা-ই-ইমাম মালিকের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারীর মধ্যেও এই বর্ণনাটি বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) স্বীয় সনদে হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার (রঃ) হতে বর্ণনা করেনঃ 'আমি দশজনের বেশী সাহাবী (রাঃ) হতে শুনেছি, তাঁরা বলেছেন যে, চার মাসের পরে শপথকারীকে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর তাকে বলা হবেঃ "তুমি মিলিত হও অথবা তালাক দাও।" সুতরাং কমপক্ষে তেরোজন সাহাবী (রাঃ) হলেন। হযরত আলী (রাঃ) হতেও এটাই নকল করা হয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ এটাই আমাদের মাযহাব, এটাই হযরত উমার (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত উসমান বিন যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ), এবং দশের উপরে অন্যান্য সাহাবা-ই-কিরাম হতে বর্ণিত আছে। দারেকুতনীর হাদীসের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবূ সালিহ (রঃ) বলেনঃ 'আমি বারোজন সাহাবীকে (রাঃ) এই মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেছি। সবাই এই উত্তরই দিয়েছেন।'

হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ), উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ইবনে উমার

(রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) এটাই বলেন। তাবেঈগণের (রঃ) মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), হযরত উমার বিন আবদুল আযীয (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত তাঊস (রঃ), হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব (রঃ) এবং হযরত কাসিম (রঃ)-এরও উক্তি এটাই। হযরত ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) এবং তাঁদের সঙ্গীদেরও এটাই মাযহাব। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এই উক্তিকেই পছন্দ করেন। লায়েস (রঃ), ইসহাক বিন রাওইয়াহ (রঃ), আবূ উবাইদ (রঃ), আবূ সাউর (রঃ), দাউদ (রঃ), প্রভৃতি মনীষীও এটাই বলেন। এই মনীষীগণ বলেন যে, যদি চার মাসের পরে সে ফিরে না আসে তবে তাকে তালাক দেয়াতে বাধ্য করা হবে। যদি তালাক না দেয় তবে শাসনকর্তা তার পক্ষ থেকে তালাক দেবেন এবং এটা হবে তালাক-ই-রাজঈ। ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

শুধুমাত্র ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয় যে পর্যন্ত না ইদ্দতের মধ্যে সহবাস করে। কিন্তু এই উক্তিটি অত্যন্ত গরীব। এখানে যে চার মাস বিলম্বের অনুমতি দেয়া হয়েছে এই ব্যাপারে মুআত্তা-ই-মালিকের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন দীনারের বর্ণনায় হযরত উমারের (রাঃ) একটি ঘটনা ধর্মশাস্ত্রবিদগণ সাধারণতঃ বর্ণনা করে থাকেন। তা হচ্ছে এই যে, হযরত উমার ফারূক (রাঃ) সাধারণতঃ রাত্রি বেলায় মদীনার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। একদা রাত্রে বের হয়ে তিনি শুনতে পান যে, একটি স্ত্রী লোক সফরে গমনকৃত তার স্বামীর স্মরণে একটি কবিতা পাঠ করছে—যার অর্থ হচ্ছেঃ "হায়! এই কৃষ্ণ ও সুদীর্ঘ রাত্রিসমূহে আমার স্বামী নেই। তিনি থাকলে তাঁর সাথে হাসি ও রং তামাশা করতাম। আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর ভয় আমার না থাকতো তবে অবশ্যই এই সময়ে চৌকির পায়া নড়ে উঠতো।" হযরত উমার (রাঃ) স্বীয় কন্যা উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসার (রাঃ) নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'স্ত্রী তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কতদিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারে।' তিনি বলেনঃ "ছ-মাস বা চার মাস।" তিনি বলেন, 'এখন থেকে আমি নির্দেশ জারী করবো যে, কোন মুসলমান সৈন্য যেন সফরে এর চেয়ে অধিক দিন অবস্থান না করে।' কোন কোন বর্ণনায় কিছু বেশীও রয়েছে এবং এর অনেক সনদ রয়েছে এবং এই ঘটনাটি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

২২৮। এবং তালাক প্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত আত্ম সম্বরণ করে থাকবে; এবং যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তবে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবে না; এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে তবে তাদের স্বামীই তাদেরকে প্রতিগ্রহণ করতে সমধিক স্বত্ববান; আর নারীদের উপর তাদের যেরূপ স্বত্ব আছে, নারীদেরও তদনুরূপ ন্যায় সঙ্গত স্বত্ব আছে; এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

٢٢٨- وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ ع

যে সাবালিকা নারীদের সাথে তাদের স্বামীদের মিলন ঘটেছে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে,তারা যেন তালাকপ্রাপ্তির পরে তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতঃপর ইচ্ছে করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। তবে ইমাম চতুষ্টয় এটা হতে দাসীদেরকে পৃথক করেছেন। তাঁদের মতে দাসীদের দুই ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, এসব ব্যাপারে দাসীরা আযাদ মেয়েদের অর্ধেকের উপর রয়েছে। কিন্তু ঋতুর মেয়াদের অর্ধেক ঠিক হয় না বলে তাদেরকে দুই ঋতু অপেক্ষা করতে হবে। একটি হাদীসে রয়েছে যে, দাসীদের তালাকও দু'টি এবং 'ইদ্দত'ও দুই ঋতু (তাফসীরে ইবনে জারীর)। কিন্তু এর বর্ণনাকারী হযরত মুযাহির দুর্বল। এই হাদীসটি জামেউত্ তিরমিযী, সুনান-ই-আবূ দাউদ এবং সুনান-ই-ইবনে মাজাহর মধ্যেও রয়েছে। ইমাম হাফিয দারেকুতনী (রঃ) বলেনঃ'সঠিক কথা এই যে, এটা হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদের নিজের উক্তি। কিন্তু হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে এই বর্ণনাটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে।

কিন্তু সে সম্বন্ধেও ইমাম দারেকুতনী (রঃ) বলেন যে, এটা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারের (রাঃ) নিজের উক্তি। অনুরূপভাবে স্বয়ং মুসলমানদের খলীফা হযরত উমার ফারূক (রাঃ) হতে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। এই জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না। তবে পূর্ববর্তী কয়েকজন মনীষী হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, 'ইদ্দতে'র ব্যাপারে আযাদ ও দাসী সমান। কেননা আয়াতটির মধ্যে সাধারণ হিসেবে দুটিই জড়িত আছে। তাছাড়া এটা স্বভাবজাত ব্যাপার। দাসী ও আযাদ এ ব্যাপারে সমান। মুহাম্মদ বিন সীরীনেরও এটাই উক্তি। কিন্তু এটা দুর্বল।

'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীমে'র একটি দুর্বল সনদ বিশিষ্ট বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াতটি ইয়াযিদ বিন সাকানের কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) নামক একজন আনসারীয়া নারীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে তালাকের 'ইদ্দত' ছিল না। সর্বপ্রথম 'ইদ্দতের' নির্দেশ এই স্ত্রী লোকটির তালাকের পরেই অবতীর্ণ হয়। قُرُوْءٌ শব্দটির অর্থের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের মধ্যে বরাবরই মতভেদ চলে আসছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে طُهْرٌ অর্থাৎ পবিত্রতা। এটাই হযরত আয়েশার (রাঃ) অভিমত। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী হযরত আবদুর রহমানের (রাঃ) কন্যা হযরত হাফসাকে (রাঃ) তাঁর তিন 'তোহর' অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৃতীয় ঋতু আরম্ভ হওয়ার সময় স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হযরত উরওয়া (রাঃ) যখন এটা বর্ণনা করেন তখন হযরত আয়েশার (রাঃ) দ্বিতীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী হযরত উমরা (রাঃ) এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং বলেন, 'জনগণ হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট আপত্তি উঠালে তিনি বলেন, اَقْرَاءٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে, طُهْرٌ অর্থাৎ পবিত্রতা' (মুআত্তা-ই-মালিক)।' এমনকি মুআত্তার মধ্যে হযরত আবূ বকর বিন আবদুর রহমানের (রাঃ) এই উক্তিটিও বর্ণিত আছে ঃ 'আমি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রবিদদেরকে قُرُوْءٌ শব্দের তাফসীর طُهْرٌ বা পবিত্রতাই করতে শুনেছি।' হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারও (রাঃ) এটাই বলেন যে, তৃতীয় ঋতু আরম্ভ হলেই স্ত্রী তার স্বামী হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং স্বামীও তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। (মু'আত্তা)।

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন ঃ 'আমাদের নিকটেও এটাই সঠিক মত।' ইবনে আব্বাস (রাঃ), যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ), সালিহা (রঃ) কাসিম (রঃ), উরওয়া (রঃ), সুলাইমান বিন ইয়াসার (রঃ), আবূ বকর বিন আবদুর রহমান (রাঃ),

আবান বিন উসমান (রঃ), আতা' ইবনে আবূ রাবাহ্ (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), যুহরী (রঃ) এবং অবশিষ্ট সাতজন ফকীহরও এটাই উক্তি। এটাই ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈর (রঃ) মাযহাব। দাউদ (রঃ) এবং আবূ সাউরও (রঃ) এটাই বলেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) হতেও এরূপ একটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। ঐ মনীষীগণ এর দলীল নিম্নের আয়াত হতেও গ্রহণ করেছেনঃ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ 'তাদেরকে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রদান কর।' (৬৫ঃ ১) অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীদেরকে طُهْرٌ-এর মধ্যে পবিত্রতার অবস্থায় তালাক দাও।

যে তুহুরে তালাক দেয়া হয় ওটাও গণনার মধ্যে ধরা হয়। কাজেই জানা যাচ্ছে যে, উপরের আয়াতেও قُرُوْءٌ শব্দের ভাবার্থ তুহুর বা পবিত্রতাই নেয়া হয়েছে। আরব কবিদের কবিতাতেও قُرُوْءٌ শব্দটি তুহুর বা পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। قُرُوْءٌ শব্দ সম্বন্ধে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ওর অর্থ হচ্ছে 'ঋতু'। তাহলে ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ -এর অর্থ হবে তিন ঋতু। সুতরাং স্ত্রী যে পর্যন্ত না তৃতীয় ঋতু হতে পবিত্র হবে সে পর্যন্ত সে ইদ্দতের মধ্যেই থাকবে। এর প্রথম দলীল হচ্ছে হযরত উমার ফারূকের (রাঃ) এই ফায়সালাটিঃ তাঁর নিকট একজন তালাকপ্রাপ্তা নারী এসে বলে ঃ আমার স্বামী আমাকে একটি বা দু'টি তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট সে সময় আগমন করেন যখন আমি কাপড় ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলাম (অর্থাৎ তৃতীয় ঋতু হতে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম)। তাহলে বলুন, এখন নির্দেশ কি? (অর্থাৎ 'রাজ'আত' হবে কি হবে না?) তিনি বলেন, 'আমার ধারণা তো এই যে, 'রাজ'আত' হয়ে গেছে।'

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এটা সমর্থন করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমার ফারূক (রাঃ), হযরত উসমান রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবূ দ্দারদা' (রাঃ), হযরত উবাদা বিন সামিত (রাঃ), হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হযরত মু'য়ায (রাঃ), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা), হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। সাইদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), আলকামা (রঃ), আসওয়াদ (রঃ), ইবরাহীম (রঃ), আতা' (রঃ), তাউস (রঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), ইকরামা (রঃ), মুহাম্মদ বিন সীরিন (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), শা'বী (রঃ), রাবী' (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ), সুদ্দী (রঃ), মাকহূল (রঃ), যহ্হাক (রঃ), এবং

আতা' খোরাসানীও (রঃ) এটাই বলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরদেরও এটাই মাযহাব।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) হতেও অধিকতর সঠিক বর্ণনায় এটাই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বড় বড় সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত। সাউর (রঃ), আওযায়ী (রঃ), ইবনে আবী লাইলা (রঃ), ইবনে শিবরামাহ (রঃ), হাসান বিন সালিহ (রঃ), আবূ উবাইদ (রঃ) এবং ইসহাক বিন রাহুয়াহ (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। একটি হাদীসেও রয়েছে যে, নবী (সঃ) হযরত ফাতিমা বিনতে আবী জায়েশ (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'তোমরা اَقْرَاء-এর দিনে নামায ছেড়ে দাও।' সুতরাং জানা গেল যে, قُرُوْءٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঋতু। কিন্তু এই হাদীসের মুনযির নামক একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত। তার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। তবে ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন ঃ 'আভিধানিক অর্থে قَرْءٌ প্রত্যেক ঐ জিনিসের যাওয়া-আসার সময়কে বুঝায় যার যাওয়া-আসার সময় নির্ধারিত রয়েছে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই শব্দটির দু'টো অর্থ হবে। ঋতুও হবে এবং পবিত্রতাও হবে। কয়েকজন 'উসূল' শাস্ত্রবিদের এটাই মাযহাব। আসমাঈও (রঃ) বলেন যে, قَرْءٌ 'সময়'কে বলা হয়। আবূ উমার বিন আলা (রঃ), বলেন ঃ আরবে ঋতু ও পবিত্রতা উভয়কেই قَرْءٌ বলে। আবূ উমার বিন আবদুল বার্‌র (রঃ), বলেন, 'আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং ধর্ম শাস্ত্রবিদদের এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধই নেই। তবে এই আয়াতের অর্থ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে একদল গেছেন এদিকে এবং অন্যদল গেছেন ওদিকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—তাদের গর্ভে যা রয়েছে তা গোপন করা বৈধ নয়। অর্থাৎ গর্ভবতী হলেও প্রকাশ করতে হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তাদের আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস থাকে। এর দ্বারা স্ত্রীদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, তারা যেন মিথ্যা কথা না বলে। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সংবাদ প্রদানে তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা, এর উপরে কোন বাহ্যিক সাক্ষ্য উপস্থিত করা যেতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, 'ইদ্দত' হতে তাড়াতাড়ি বের হওয়ার জন্যে ঋতু না হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা 'ঋতু হয়ে গেছে' একথা না বলে। কিংবা 'ইদ্দত'কে বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে ঋতু হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা 'ঋতু হয়নি' এ কথা না বলে।

এর পরে বলা হচ্ছে—যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, 'ইদ্দতে'র মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যদি 'তালাক-ই-রাজঈ' হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক তালাক এবং দুই তালাকের পরে স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারে। এখন বাকী থাকলো তালাক-ই-বায়েন; অর্থাৎ যদি তিন তালাক হয়ে যায় তবে কি হবে? এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তালাক-ই-বায়েন ছিলই না। বরং সে সময় পর্যন্ত শত তালাক দিলেও 'তালাক-ই-রাজঈ' থাকতো। ইসলামের নির্দেশাবলীর মধ্যে তালাক-ই-বায়েন এসেছে যে, যদি তিন তালাক হয়ে যায় তবে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—স্ত্রীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে তেমনই পুরুষদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই অপরের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সহীহ মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত জাবীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা স্ত্রী লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর কালেমা দ্বারা তাদের লজ্জা স্থানকে বৈধ করে নিয়েছো। স্ত্রীদের উপর তোমাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দেবে না যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট। যদি তারা এই কাজ করে তবে তোমরা তাদেরকে প্রহার কর। কিন্তু এমন প্রহার করো না যে, বাইরে তা প্রকাশ পায়। তোমাদের উপর তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের সামর্থ অনুসারে খাওয়াবে ও পরাবে।'

একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি অধিকার রয়েছে?' তিনি উত্তরে বলেন, 'যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে। তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে। তাকে তার মুখের উপর মেরো না। তাকে গালি দিও না এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিও না বরং বাড়ীতেই রাখ। এই আয়াতটিই পাঠ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, 'আমি পছন্দ করি যে, আমার স্ত্রীকে খুশী করার জন্যে আমি নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেই, যেমন আমার স্ত্রী আমাকে খুশী করবার জন্যে নিজেকে সুন্দর সাজে সাজিয়ে থাকে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—স্ত্রীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অর্থাৎ দৈহিক, চারিত্রিক মর্যাদা,

হুকুম, আনুগত্য, খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব দিক দিয়েই স্ত্রীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মোট কথা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মর্যাদা হিসেবে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–'পুরুষরা নারীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং এ হেতু যে, তারা স্বীয় ধনসম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে।' এরপরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অবাধ্যদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে মহাপরাক্রান্ত এবং স্বীয় নির্দেশাবলীর ব্যাপারে মহাবিজ্ঞ।

২২৯। তালাক দুইবার; অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিহিতভাবে রাখতে হবে। অথবা সৎভাবে পরিত্যাগ করতে হবে; এবং যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমা স্থির রাখতে পারবে না। তবে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছো তা হতে কিছু প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের জন্যে বৈধ নয়; অনন্তর তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, সে অবস্থায় স্ত্রী নিজের মুক্তি লাভের কিছু বিনিময় দিলে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই; এগুলোই হচ্ছে আল্লাহর সীমাসমূহ অতএব তা অতিক্রম করো না এবং যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে। বস্তুতঃ তারাই অত্যাচারী।

٢٢٩- اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْــًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

**২৩০। অনন্তর যদি সে তালাক প্রদান করে তবে এর পরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্যে বৈধ হবে না, তৎপর সে তাকে তালাক প্রদান করলে যদি উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমাসমূহ স্থির রাখতে পারবে, তখন যদি তারা পরস্পর প্রত্যাবর্তিত হয় তবে উভয়ের পক্ষে কোনই দোষ নেই এবং এগুলোই আল্লাহর সীমাসমূহ, তিনি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে এগুলো ব্যক্ত করে থাকেন।**

٢٣- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

ইসলামের পূর্বে প্রথা ছিল এই যে, স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতো। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছিল। স্বামী তাদেরকে তালাক দিতো এবং ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার নিকটবর্তী হতেই ফিরিয়ে নিতো। পুনরায় তালাক দিতো। কাজেই স্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এভাবে মাত্র দু'টি তালাক দিতে পারবে। তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অধিকার থাকবে না। 'সুনান-ই-আবূ দাউদের মধ্যে এই অধ্যায় রয়েছে যে, তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে গেছে।

অতঃপর এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটাই বলেন। 'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীম' গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে–'আমি তোমাকে রাখবোও না এবং ছেড়েও দেবো না।' স্ত্রী বলে ঃ 'কিরূপে?' সে বলে ঃ 'তোমাকে তালাক দেবো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় হলেই ফিরিয়ে নেবো। আবার তালাক দেবো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই পুনরায় ফিরিয়ে নেবো। এরূপ করতেই থাকবো।' ঐ স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এই দুঃখের কথা বর্ণনা করে। তখন এই

পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর ঐলোকগুলো তালাকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করে এবং শুধ্রে যায়। তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার স্বামীর কোন অধিকার থাকলো না এবং তাদেরকে বলা হলো দুই তালাক পর্যন্ত তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, সংশোধনের উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নেবে যদি তারা ইদ্দতের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের এও অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদের ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দেবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নেবে না, যেন তারা নতুনভাবে বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়। আর যদি তৃতীয় তালাক দেবারই ইচ্ছে কর তবে সৎভাবে তালাক দেবে। তাদের কোন হক নষ্ট করবে না, তাদের উপর অত্যাচার করবে না এবং তাদের কোন ক্ষতি করবে না।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই আয়াতে দুই তালাকের কথাতো বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায় রয়েছে?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ 'অথবা সৎভাবে পরিত্যাগ করতে হবে' এর মধ্যে রয়েছে।' (২ঃ ২২৯) 'যখন তৃতীয় তালাক দেয়ার ইচ্ছে করবে তখন স্ত্রীকে তালাক গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তার জীবন সংকটময় করা এবং তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা স্বামীর জন্যে একেবারে হারাম। যেমন কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'স্ত্রীদেরকে সংকটময় অবস্থায় নিক্ষেপ করো না এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদেরকে প্রদত্ত্ব বস্তু হতে কিছু গ্রহণ করবে।' তবে স্ত্রী যদি খুশী মনে কিছু দিয়ে তালাক প্রার্থনা করে তবে সেটা অন্য কথা। যেমন অন্যস্থানে রয়েছে

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

অর্থাৎ 'যদি তারা খুশী মনে তোমাদের জন্যে কিছু ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা বেশ তৃপ্তির সাথে ভক্ষণ কর।' (৪ঃ ৪) আর যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য বেড়ে যায় এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে ও তার হক আদায় না করে, এরূপ অবস্থায় যদি সে তার স্বামীকে কিছু প্রদান করতঃ তালাক গ্রহণ করে তবে তার দেয়ায় এবং এর নেয়ায় কোন পাপ নেই। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, যদি স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট 'খোলা' তালাক প্রার্থনা করে তবে সে অত্যন্ত পাপীনী হবে।

জামেউত্ তিরমিযী প্রভৃতির হাদীসে রয়েছে যে, যে স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তার উপর বেহেশ্তের সুগন্ধিও হারাম। আর

একটি বর্ণনায় রয়েছে—'অথচ বেহেশতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও এসে থাকে।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের একটা বিরাট দলের ঘোষণা এই যে, 'খোলা' শুধুমাত্র ঐ অবস্থায় রয়েছে যখন অবাধ্যতা ও দুষ্টামি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে। ঐ সময় স্বামী মুক্তিপণ নিয়ে ঐ স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে পারে। যেমন কুরআন পাকের এই আয়াতটির মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় 'খোলা' বৈধ নয়। এমন কি হযরত ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে এবং তার হক কিছু নষ্ট করে স্বামী তাকে বাধ্য করতঃ তার নিকট হতে কিছু গ্রহণ করে তবে তা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, মতানৈক্যের সময় যখন কিছু গ্রহণ করা বৈধ তখন মতৈক্যের সময় বৈধ হওয়ায় কোন অসুবিধার কারণ থাকতে পারে না।

বাকর বিন আব্দুল্লাহ (রঃ) বলেন যে, কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াতটি দ্বারা 'খোলা' রহিত হয়ে গেছে। وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا অর্থাৎ 'তোমরা যদি তাদের কাউকে ধনভাণ্ডারও দিয়ে থাকো তথাপি তা হতে কিছু গ্রহণ করো না (৪ঃ ২০)।' কিন্তু এই উক্তিটি দুর্বল ও বর্জনীয়। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, 'মুআত্তা-ই-ইমাম মালিকের' মধ্যে রয়েছেঃ 'হাবীবা বিনতে সাহল আনসারিয়া' (রাঃ) হযরত সাবিত বিন কায়েস বিন শামাসের (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযের জন্য অন্ধকার থাকতেই বের হন। দরজার উপর হযরত হাবীবা বিনতে সাহলকে (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কে তুমি'? তিনি বলেনঃ 'আমি সাহলের কন্যা হাবীবা'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন 'খবর কি'? তিনি বলেনঃ 'আমি সাবিত বিন কায়েসের (রাঃ) স্ত্রী রূপে থাকতে পারি না।' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব হয়ে যান। অতঃপর তার স্বামী হযরত সাবিত বিন কায়েস (রাঃ) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'হাবীবা বিনতে সাহল (রাঃ) কিছু বলেছে।' হযরত হাবীবা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাবিত (রাঃ)-কে বলেন, 'ঐগুলো গ্রহণ কর।' হযরত সাবিত বিন কায়েস (রাঃ) তখন সেগুলো গ্রহণ করেন এবং হযরত হাবীবা (রাঃ) মুক্ত হয়ে যান।' অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাবীবা বিনতে সাহল (রাঃ) হযরত

সাবিত বিন কায়েস বিন শামাসের (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। হযরত সাবিত (রাঃ) তাঁকে প্রহার করেন, ফলে তাঁর কোন একটি হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ফজরের পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাবিত (রাঃ)-কে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, 'তোমার স্ত্রীর কিছু মাল গ্রহণ কর এবং তাকে পৃথক করে দাও।' হযরত সাবিত (রাঃ) বলেন 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা আমার জন্যে বৈধ হবে কি?' তিনি বলেন 'হাঁ'। হযরত সাবিত (রাঃ) বলেন, 'আমি তাকে দু'টি বাগান দিয়েছি এবং ও দু'টো তার মালিকানাধীনেই রয়েছে।' তখন নবী (সঃ) বলেন, তুমি ঐ দু'টো গ্রহণ করে তাকে পৃথক করে দাও।' তিনি তাই করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত সাবিত (রাঃ) এই কথাও বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে চরিত্র ও ধর্মভীরুতার ব্যাপারে দোষারোপ করছি না, কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে কুফরকে অপছন্দ করি।' অতঃপর মাল নিয়ে হযরত সাবিত (রাঃ) তাকে তালাক দিয়ে দেন। কোন কোন বর্ণনায় তাঁর নাম জামিলাও এসেছে। কোন বর্ণনায় এও রয়েছে যে, তিনি বলেন, 'এখন আমার ক্রোধ সম্বরণের শক্তি নেই।' একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাবিত (রাঃ)-কে বলেন, 'যা দিয়েছো, তাই নাও, বেশী নিও না।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত হাবীবা (রাঃ) বলেছিলেন, 'তিনি দেখতেও সুন্দর নন।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাই এর ভগ্নী ছিলেন ও ইসলামে এটাই সর্বপ্রথম 'খোলা' ছিল।

হযরত হাবীবা (রাঃ) এর একটি কারণ এও বর্ণনা করেছেন, 'একদা আমি তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে দেখতে পাই যে, আমার স্বামী কয়েকজন লোকের সাথে আসছেন। এদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা কালো, বেঁটে ও কুৎসিৎ। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 'তাকে তার বাগান ফিরিয়ে দাও।' এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত হাবীবা (রাঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি বললে আমি আরও কিছু দিতে প্রস্তুত রয়েছি। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত হাবীবা (রাঃ) এই কথাও বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর ভয় না থাকলে আমি তাঁর মুখে থুথু দিতাম'। জমহূরে মাযহাব এই যে, 'খোলা' তালাকে স্বামী তার প্রদত্ত মাল হতে বেশী নিলেও বৈধ হবে। কেননা, কুরআন মাজীদে فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ অর্থাৎ 'সে মুক্তি লাভের জন্যে যা কিছু বিনিময় দেয়' বলা হয়েছে। (২ঃ ২২৯)

একজন স্ত্রীলোক স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হয়ে হযরত উমারের (রাঃ) নিকট আগমন করে। হযরত উমার (রাঃ) তাকে আবর্জনাযুক্ত একটি ঘরে বন্দী করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে কয়েদখানা হতে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'অবস্থা কিরূপ?' সে বলে, 'আমার জীবনে আমি এই একটি রাত্রি আরামে কাটিয়েছি' তখন তিনি তার স্বামীকে বলেন, 'তার কানের বিনিময়ে হলেও তার সাথে খোলা করে নাও।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাকে তিন দিন পর্যন্ত কয়েদখানায় রাখা হয়েছিল। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, 'একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও তুমি তা গ্রহণ করতঃ তাকে পৃথক করে দাও।' হযরত উসমান (রাঃ) বলেন—চুলের গুচ্ছ ছাড়া সব কিছু নিয়েই খোলা তালাক হতে পারে।

রাবী' বিনতে মুআওয়াজ বিন আফরা (রাঃ) বলেন, 'আমার স্বামী বিদ্যমান থাকলেও আমার সাথে আদান-প্রদানে ত্রুটি করতেন এবং বিদেশে চলে গেলে তো সম্পূর্ণ রূপেই বঞ্চিত করতেন। একদিন ঝগড়ার সময় আমি বলে ফেলি—আমার অধিকারে যা কিছু রয়েছে সবই নিয়ে নিন এবং আমাকে খোলা তালাক প্রদান করুন। তিনি বলেন ঠিক আছে, এটাই ফয়সালা হয়ে গেল। কিন্তু আমার চাচা মুয়ায বিন আফরা (রাঃ) এই ঘটনাটি হযরত উসমানের (রাঃ) নিকট বর্ণনা করেন। হযরত উসমানও (রাঃ) ওটাই ঠিক রাখেন এবং বলেন, চুলের খোঁপা ছাড়া সব কিছু নিয়ে নাও।' কোন কোন বর্ণনায় এও রয়েছে যে, ওর চেয়ে ছোট জিনিসও। মোট কথা সব কিছুই নিয়ে নাও। এসব ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীর নিকট যা কিছু রয়েছে সব দিয়েই সে 'খোলা' করিয়ে নিতে পারে এবং স্বামী তার প্রদত্ত মাল হতে বেশী নিয়েও 'খোলা' করতে পারে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), ইকরামা (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), কাবীসা বিন যাবীব (রঃ), হাসান বিন সালিহ (রঃ) এবং উসমানও (রঃ) এটাই বলেন। ইমাম মালিক (রঃ), লায়েস (রঃ) এবং আবূ সাউরেরও (রঃ) মাযহাব এটাই। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেন।

ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) সহচরদের উক্তি এটাই যে, যদি অন্যায় ও ত্রুটি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয় তবে স্বামী তাকে যা দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেয়া তার জন্যে বৈধ। কিন্তু তার চেয়ে বেশী নেয়া জায়েয নয়। আর বাড়াবাড়ি যদি পুরুষের পক্ষ হতে হয় তবে তার জন্যে কিছুই নেয়া বৈধ নয়। ইমাম আহমাদ (রঃ),

উবাইদ (রঃ), ইসহাক (রঃ) এবং রাহুইয়াহ (রঃ) বলেন যে, স্বামীর জন্যে তার প্রদত্ত বস্তু হতে অতিরিক্ত নেয়া কোন ক্রমেই বৈধ নয়। সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), আতা' (রঃ), আমর বিন শুয়াইব (রঃ), যুহরী (রঃ), তাঊস (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), শা'বী (রঃ), হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান (রঃ) এবং রাবী' বিন আনাসেরও (রঃ) এটাই মাযহাব। মুআম্মার (রঃ) এবং হাকিম (রঃ) বলেন যে, হযরত আলীরও (রাঃ) ফায়সালা এটাই। আওযায়ীর (রঃ) ঘোষণা এই যে, কাযীগণ স্বামীর প্রদত্ত বস্তু হতে বেশী গ্রহণ করা তার জন্যে বৈধ মনে করেন না। এই মাযহাবের দলীল ঐ হাদীসটিও যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, 'তোমার বাগান নিয়ে নাও কিন্তু বেশী নিও না।'

'মুসনাদ-ই-আবদ বিন হামীদ' নামক গ্রন্থেও একটি মারফূ' হাদীস রয়েছে যে, নবী (সঃ) খোলা গ্রহণ কারিণী স্ত্রীকে প্রদত্ত বস্তু হতে বেশী গ্রহণ করাকে খারাপ মনে করেছেন। ঐ অবস্থায় 'যা কিছু মুক্তির বিনিময়ে সে দেবে' কুরআন মাজীদের এই কথার অর্থ হবে এই যে, প্রদত্ত বস্তু হতে যা কিছু দেবে। কেননা, এর পূর্বে ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছুই গ্রহণ করো না। রাবী'র (রঃ) পঠনে بِهٖ শব্দের পরে مِنْهُ শব্দটিও রয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে—এগুলো আল্লাহর সীমাসমূহ। তোমরা এই সীমাগুলো অতিক্রম করো না, নতুবা পাপী হয়ে যাবে।

**পরিচ্ছেদঃ** কোন কোন মনীষী খোলাকে তালাকের মধ্যে গণ্য করেন না। তাঁরা বলেন যে, যদি এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'তালাক দিয়ে দেয়, অতঃপর ঐ স্ত্রী 'খোলা' করিয়ে নেয় তবে ঐ স্বামী ইচ্ছে করলে পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে। তাঁরা দলীল রূপে এই আয়াতটিকেই এনে থাকেন। এটা হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। হযরত ইকরামাও (রঃ) বলেন যে, এটা তালাক নয়। দেখা যাচ্ছে যে, আয়াতটির প্রথমে তালাকের বর্ণনা রয়েছে। প্রথমে দু'তালাকের, শেষে তৃতীয় তালাকের এবং মধ্যে খোলার কথা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, খোলা তালাক নয়। এবং এটা দ্বারা বিয়ে বাতিল করা হয়। আমীরুল মু'মেনীন হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), তাঊস (রঃ), ইকরামা (রঃ), আহমাদ (রঃ), ইসহাক বিন রাহুইয়াহ্ (রঃ), আবূ সাউর (রঃ) এবং দাঊদ বিন আলী যাহিরীরও (রঃ) মাযহাব এটাই। এটাই ইমাম শাফিঈরও (রঃ) পূর্ব উক্তি। আয়াতটিরও প্রকাশ্য শব্দ এটাই।

অন্যান্য কয়েকজন মনীষী বলেন যে, খোলা হচ্ছে তালাক-ই-বায়েন এবং একাধিক তালাকের নিয়্যাত করলেও তা বিশ্বাসযোগ্য। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উম্মে বাকর আসলামিয়া (রাঃ) নাম্নী একটি স্ত্রীলোক তাঁর স্বামী হযরত আবদুল্লাহ বিন খালিদ (রাঃ) হতে খোলা গ্রহণ করেন এবং হযরত উসমান (রাঃ) ওটাকে এক তালাক হওয়ার ফতওয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে এটা বলে দেন যে, যদি কিছু নাম নিয়ে থাকে তবে যা নাম নিয়েছে তাই হবে। কিন্তু এই বর্ণনাটি দুর্বল। হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযতর শুরাইহ (রঃ), হযরত শা'বী (রঃ), হযরত ইবরাহীম (রঃ), হযরত জাবির বিন যায়েদ (রঃ), হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), তাঁর সাথী ইমাম সাওরী (রঃ), আওযায়ী (রঃ) এবং আবূ উসমান বাত্তীরও (রঃ) এটাই উক্তি যে, খোলা তালাকই বটে। ইমাম শাফিঈর (রঃ) নতুন উক্তি এটাই। তবে হানাফীগণ বলেন যে, খোলা প্রদানকারী যদি দু'তালাকের নিয়্যাত করে তবে দু'টোই হয়ে যাবে। আর যদি কোনই শব্দ উচ্চারণ না করে এবং সাধারণ খোলা হয় তবে একটি তালাক-ই-বায়েন হবে। যদি তিনটির নিয়ত করে তবে তিনটিই হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈর (রঃ) অন্য একটি উক্তিও রয়েছে যে, যদি তালাকের শব্দ না থাকে এবং কোন দলীল প্রমাণও না হয় তবে কোন কিছুই হবে না।

**জিজ্ঞাস্যঃ** ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইসহাক বিন রাহুইয়াহ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, তালাকের ইদ্দত হচ্ছে খোলার ইদ্দত। হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), সুলাইমান বিন ইয়াসার (রঃ), উরওয়া (রঃ), সালেম (রঃ), আবূ সালমা (রঃ), উমার বিন আবদুল আযীয (রঃ), ইবনে শিহাব (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) শাবী' (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), আবূ আইয়ায্ (রঃ), খালাস বিন আমর (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), সুফইয়ান সাওরী (রঃ), আওযায়ী (রঃ), লায়েস বিন সা'দ (রঃ) এবং আবূ উবাইদাহ (রঃ) -এরও এটাই উক্তি।

ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, অধিকাংশ আলেম এদিকেই গিয়েছেন। তাঁরা বলেন, যেহেতু খোলাও তালাক, সুতরাং ওর ইদ্দত তালাকের ইদ্দতের মতই। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ওর ইদ্দত শুধুমাত্র একটি ঋতু। হযরত উসমান

(রাঃ)-এর এটাই ফায়সালা। ইবনে উমার (রাঃ) তিন ঋতুর ফতওয়া দিতেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতেন, 'হযরত উসমান (রাঃ) আমাদের অপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের চেয়ে বড় আলেম।' হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে একটি ঋতুর ইদ্দতও বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরামা (রঃ), আব্বান বিন উসমান (রঃ) এবং ঐ সমস্ত লোক যাঁদের নাম উপরে বর্ণিত হয়েছে, তাঁদেরও সবারই এই উক্তি হওয়াই বাঞ্ছণীয়।

সুনানে আবূ দাউদ এবং জামেউত্ তিরমিযীর হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাবিত বিন কায়েসের (রাঃ) স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় এক হায়েয ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। জামেউত্ তিরযিমীর মধ্যে রয়েছে যে, রাবী' বিনতে মুআওয়ায (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খোলার পর একটি ঋতুই ইদ্দত রূপে পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) খোলা গ্রহণকারী স্ত্রীলোকটিকে বলেছিলেন ঃ তোমার উপরে কোন ইদ্দতই নেই। তবে যদি খোলা গ্রহণের পূর্বক্ষণেই স্বামীর সাথে মিলিত হয়ে থাকো তবে একটি ঋতু আসা পর্যন্ত তার নিকটেই অবস্থান কর। মরইয়াম মুগালাবার (রাঃ) সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যা ফায়সালা ছিল হযরত উসমান (রাঃ) তারই অনুসরণ করেন।

**জিজ্ঞাস্যঃ** জমহূর উলামা এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মতে খোলা গ্রহণকারী স্ত্রীকে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার নেই। কেননা, সে মাল দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেছে। আবদ বিন উবাই, আওফা, মাহানুল হানাফী, সাঈদ এবং যুহরীর (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সহায় হউন) উক্তি এই যে, স্বামী তার নিকট হতে যা গ্রহণ করেছে তা তাকে ফিরিয়ে দিলে স্ত্রীকে রাজ'আত করতে পারবে। স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াও ফিরিয়ে নিতে পারবে। সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, যদি খোলার মধ্যে তালাকের শব্দ না থাকে তবে ওটা শুধু বিচ্ছেদ। সুতরাং ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার নেই। আর যদি তালাকের নাম নেয় তবে অবশ্যই ফিরিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। দাউদ যাহেরীও (রঃ) এ কথাই বলেন। তবে সবাই এর উপর এক মত যে, যদি দু'জনই সম্মত থাকে তবে ইদ্দতের মধ্যে নতুনভাবে বিয়ে করতে পারবে। ইবনে আবদুল বার্র (রাঃ) একটি দলের এই উক্তিও বর্ণনা করেন যে, ইদ্দতের মধ্যে যখন অন্য কেউ তাকে বিয়ে করতে পারবে না, তেমনই স্বামীও পারবে না। কিন্তু এই উক্তিটি বিরল ও বর্জনীয়।

**জিজ্ঞাস্যঃ** ঐ স্ত্রীর উপর ইদ্দতের মধ্যেই দ্বিতীয় তালাক পড়তে পারে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম এই যে, ইদ্দতের মধ্যে

দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। কেননা, স্ত্রীটি নিজের অধিকারিণী এবং সে তার স্বামী হতে পৃথক হয়ে গেছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রাঃ), ইকরামা (রঃ), জাবির বিন যায়েদ (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ), ইসহাক (রঃ) এবং আবূ সাউরের (রঃ) উক্তি এটাই। দ্বিতীয় হচ্ছে ইমাম মালিকের (রঃ) উক্তি। তা এই যে, খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যদি নীরব না থেকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তালাক হয়ে যাবে, নচেৎ হবে না। এই দৃষ্টান্ত হচ্ছে যা হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত আছে। তৃতীয় উক্তি এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), তাঁর সহচর ইমাম সাওরী (রঃ), আওযায়ী (রঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), শুরাইহ্ (রাঃ), তাঊস (রঃ), ইবরাহীম (রঃ), যুহ্রী (রঃ), হাকীম (রঃ), হাকাম (রঃ) এবং হাম্মাদেরও (রঃ) উক্তি এটাই। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এবং আবূ দ্দারদা (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত হলেও তা প্রমাণিত নয়।

এর পরে বলা হচ্ছে—'এগুলো আল্লাহর সীমাসমূহ।' সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা আল্লাহর সীমাগুলো অতিক্রম করো না, তাঁর ফরযসমূহ বিনষ্ট করো না, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অসম্মান করো না, শরীয়তে যেসব বিষয়ের উল্লেখ নেই, তোমরাও সেগুলো সম্পর্কে নীরব থাকবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা ভুল-ক্রটি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।' এই আয়াত দ্বারা ঐসব মনীষীগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যাঁরা বলেন যে, একই সময়ে তিন তালাক দেয়াই হারাম। ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীদের এটাই মাযহাব। তাঁদের মতে সুন্নাত পন্থা এই যে, তালাক একটি একটি করে দিতে হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ 'তালাক দু'বার।' 'এগুলো আল্লাহর সীমা, অতএব সেগুলো অতিক্রম করো না।' আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে সুনানে নাসাঈর মধ্যে বর্ণিত নিম্নের হাদীস দ্বারা জোরদার করা হয়েছে।

হাদীসটি এই যে, কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেনঃ 'আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহর কিতাবের সাথে খেল-তামাশা শুরু হয়ে গেল?' শেষ পর্যন্ত একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কি তাকে হত্যা করবো না?' কিন্তু এর সনদের মধ্যে ইনকিতা' (বর্ণনাকারীদের যোগসূত্র ছিন্ন) রয়েছে।

তার পরে বলা হচ্ছে–যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'তালাক দেয়ার পরে তৃতীয় তালাক দিয়ে ফেলবে তখন সে তার উপর হারাম হয়ে যাবে। যে পর্যন্ত না অন্য কেউ নিয়মিতভাবে তাকে বিয়ে করতঃ সহবাস করার পর তালাক দেবে। বিয়ে না করে যদি তাকে দাসী করে নিয়ে তার সাথে সহবাসও করে তথাপি সে তার পূর্ব স্বামীর জন্যে হালাল হবে না। অনুরূপভাবে যদি নিয়মিত বিয়েও হয় কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করে থাকে তাহলেও পূর্ব স্বামীর জন্যে সে হালাল হবে না। অধিকাংশ ফকীহগণের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াবের (রঃ) মতে দ্বিতীয় বিয়ের পর দ্বিতীয় স্বামী সহবাস না করেই তালাক দিলেও সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সাঈদ বিন মুসাইয়াবের (রঃ) উক্তি রূপে প্রমাণিত হয়।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'একটি লোক একটি স্ত্রী লোককে বিয়ে করলো এবং সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা হলো, সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল। এখন কি তাকে বিয়ে করা তার পূর্ব স্বামীর জন্যে হালাল হবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'না, না। যে পর্যন্ত না তারা একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করে। মুসনাদ-ই-আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ ইত্যাদি।' এই বর্ণনাটি স্বয়ং ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা কিরূপে সম্ভব যে তিনি বর্ণনাও করবেন আবার নিজে বিরোধিতাও করবেন–তাও আবার বিনা দলীলে।

একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন, 'একটি লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলো। অতঃপর সে অন্যের সাথে বিবাহিতা হলো। এরপর দরজা বন্ধ করে ও পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে যৌন মিলন না করেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিল। এখন কি স্ত্রীটি তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'না, যে পর্যন্ত না সে মধুর স্বাদ গ্রহণ করে' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত রিফা'আ কারাযী (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেন। হযরত আবদুর রহমান বিন যুবাইরের (রাঃ) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করেন, "তিনি (আমার স্বামী আবদুর রহমান বিন যুবাইর) স্ত্রীর আকাংখা পূরণের যোগ্য নন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেন, 'সম্ভবত তুমি রিফা'আর (তার পূর্ব স্বামী) নিকট ফিরে যেতে চাও। এটা হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তার মধুর স্বাদ

গ্রহণ করবে এবং সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।' এই হাদীসগুলোর বহু সনদ রয়েছে এবং বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

(পরিচ্ছেদ)–এটা মনে রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ভাবার্থ হচ্ছে ঐ স্ত্রীর প্রতি দ্বিতীয় স্বামীর আগ্রহ থাকতে হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে তাকে স্ত্রী রূপে রাখার উদ্দেশ্যে হতে হবে। শুধুমাত্র প্রথম স্বামীর জন্যে তাকে হালাল করার জন্যে নয়। এমনকি ইমাম মালিকের মতে এও শর্ত রয়েছে যে, এই সহবাস বৈধ পন্থায় হতে হবে। যেমন স্ত্রী যেন রোযার অবস্থায়, ইহরামের অবস্থায়, ইতেকাফের অবস্থায় এবং হায়েয ও নিফালের অবস্থায় না থাকে। অনুরূপভাবে স্বামীও যেন রোযা, ইহরাম ও ইতেকাকের অবস্থায় না থাকে। যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন উল্লিখিত কোন এক অবস্থায় থাকে এবং এই অবস্থায় সহবাসও হয়ে যায় তথাপিও সে তার পূর্ব মুসলমান স্বামীর জন্যে হালাল হবে না। কেননা, ইমাম মালিকের মতে কাফিরদের পরস্পরের বিয়ে বাতিল।

ইমাম হাসান বসরী (রঃ) তো এই শর্তও আরোপ করেন যে, বীর্যও নির্গত হতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 'যে পর্যন্ত না সে তোমার এবং তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে এই কথার দ্বারা এটাই বুঝা যাচ্ছে। হাসান বসরী (রঃ) যদি এই হাদীসটিকে সামনে রেখেই এই শর্ত আরোপ করে থাকেন তবে স্ত্রীর ব্যাপারেও এই শর্ত হওয়া উচিত। কিন্তু হাদীসের عُسَيْلَة শব্দটির ভাবার্থ বীর্য নয়। কেননা, মুসনাদ-ই-আহমাদ ও সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, عُسَيْلَة শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সহবাস। যদি এই বিয়ের দ্বারা প্রথম স্বামীর জন্যে ঐ স্ত্রীকে হালাল করাই দ্বিতীয় স্বামীর উদ্দেশ্য হয় তবে এইরূপ লোক যে নিন্দনীয় এমনকি অভিশপ্ত তা হাদীসসমূহে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, যে স্ত্রী লোক উলকী করে এবং যে স্ত্রী লোক উলকী করিয়ে নেয়, যে স্ত্রী লোক চুল মিলিয়ে দেয় এবং যে মিলিয়ে নেয়, যে 'হালালা' করে এবং যার জন্যে 'হালালা' করা হয়, যে সুদ প্রদান করে এবং যে সুদ গ্রহণ করে এদের উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) অভিশাপ দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, সাহাবীদের (রাঃ) আমল এর উপরেই রয়েছে। হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উমারের (রাঃ) এটাই মাযহাব। তাবেঈ ধর্ম শাস্ত্রবিদগণও এটাই বলেন। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাসেরও (রাঃ) এটাই উক্তি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সুদের সাক্ষ্যদানকারী এবং লিখকের প্রতিও অভিসম্পাত। যারা যাকাত প্রদান করে না এবং যারা যাকাত গ্রহণে বাড়াবাড়ি

করে তাদের উপরও অভিসম্পাত। হিযরতের পর ধর্মত্যাগীদের উপরও অভিসম্পাত। বিলাপ করাও নিষিদ্ধ।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ধার করা ষাঁড় কে তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো?' জনগণ বলেন, 'হ্যাঁ বলুন।' তিনি বলেন, 'যে 'হালালা' করে অর্থাৎ যে তালাক প্রাপ্তা নারীকে এজন্যে বিয়ে করে যেন সে তার পূর্ব স্বামীর জন্যে হালাল হয়ে যায়।' যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তার উপরও আল্লাহর লা'নত এবং যে ব্যক্তি নিজের জন্যে এটা করিয়ে নেয় সেও অভিশপ্ত (সুনানে ইবনে মাজাহ)।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ বিয়ে সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, 'এটা বিয়েই নয় যাতে উদ্দেশ্য থাকে এক এবং বাহ্যিক হয় অন্য এবং যাতে আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে খেল-তামাশা করা হয়। বিয়ে তো শুধুমাত্র ওটাই যা আগ্রহের সাথে হয়ে থাকে।'

মুসতাদরিক-ই-হাকিমের মধ্যে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'একটি লোক তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়। এর পর তার ভাই তাকে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করে যে, সে যেন তার ভাই এর জন্যে হালাল হয়ে যায়। এই বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'কখনও নয়। আমরা এটাকে নবী (সঃ)-এর যুগে ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য করতাম। বিয়ে ওটাই যাতে আগ্রহ থাকে।' এ হাদীসটি মাওকুফ হলেও এর শেষের বাক্যটি একে মারফু'র পর্যায়ে এনে দিয়েছে। এমন কি অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমীরুল মু'মেনীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলেছেন ঃ 'যদি কেউ এই কাজ করে বা করায় তবে আমি উভয়কে ব্যভিচারের শাস্তি দেবো অর্থাৎ রজম করে দেবো। হযরত উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফতকালে এরূপ বিয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করেন। এ রকমই হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি বহু সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

তারপর ঘোষণা হচ্ছে–দ্বিতীয় স্বামী যদি বিয়ে ও সহবাসের পর তালাক দিয়ে দেয় তবে পূর্ব স্বামী পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করলে কোন পাপ নেই, যদি তারা সদ্ভাবে বসবাস করে এবং এটাও জেনে নেয় যে, ঐ দ্বিতীয় বিয়ে শুধু প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ছিল না, বরং প্রকৃতই ছিল। এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান যা তিনি জ্ঞানীদের জন্যে প্রকাশ করে দিয়েছেন। ইমামগণের এই বিষয়েও মতবিরোধ রয়েছে যে, একটি লোক তার স্ত্রীকে একটি বা দু'টি তালাক দিয়েছিল। অতঃপর তাকে ছেড়েই থাকলো। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীটির ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলো। দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসও করলো। অতঃপর সে তাকে তালাক দিয়ে দিল এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেল। তখন তার পূর্ব

স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই স্বামী কি তিন তালাকের মধ্যে যে একটি বা দু'টি তালাক বাকি রয়েছে শুধু ওরই অধিকারী হবে, না পূর্বের তিন তালাক গণনার মধ্যে হবে না, বরং সে নতুনভাবে তিন তালাকের মালিক হবে ? প্রথমটি হচ্ছে ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ), এবং সাহাবীগণের একটি দলের মাযহাব। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরদের মাযহাব। এঁদের দলীল এই যে, এভাবে তৃতীয় তালাকই যখন গণনায় আসছে না তখন প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক কিভাবে আসতে পারে?

---

২৩১। এবং তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও আর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে নিয়মিতভাবে রাখতে পার অথবা নিয়মিতভাবে পরিত্যাগ করতে পারো; এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে সীমালংঘন করবে; আর যে ব্যক্তি এরূপ করে সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অবিচার করে থাকে; এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপাচ্ছলে গ্রহণ করো না আর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের জন্যে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে যা অবতীর্ণ করেছেন তা স্মরণ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

٢٣١- وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَّلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع

পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে,যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে এই তালাক প্রদানের পর যখন ইদ্দত শেষ হতে চলবে তখন হয় তাদেরকে সৎভাবে ফিরিয়ে নেবে অর্থাৎ ফিরিয়ে নেয়ার উপর সাক্ষী রাখবে এবং সদ্ভাবে বসবাস করার নিয়্যাত করবে অথবা সদ্ভাবে পরিত্যাগ করবে। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর কোন ঝগড়া-বিবাদ, মতবিরোধ এবং শত্রুতা না করেই বিদায় করে দেবে। অজ্ঞতাযুগের জঘন্য প্রথাকে ইসলাম উঠিয়ে দিয়েছে। তা এই যে, তারা স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হলেই ফিরিয়ে নিতো। আবার তালাক দিতো এবং পুনরায় ফিরিয়ে নিতো। এভাবে তারা স্ত্রীদের জীবন ধ্বংস করে দিতো। মহান আল্লাহ এটাকে বাধা দিয়ে ঘোষণা করেন যে, যারা এরূপ করে তারা অত্যাচারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলীকে বিদ্রূপ করো না। একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) আশআরী গোত্রের উপর অসন্তুষ্ট হন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এই লোকগুলো কেন বলে আমি তালাক দিয়েছি ও ফিরিয়ে নিয়েছি? জেনে রেখো যে এগুলো তালাক নয়। স্ত্রীদেরকে তাদের ইদ্দত অনুযায়ী তালাক প্রদান কর।' ভাবার্থ এই বলা হয়েছে যে, সেটি ঐ ব্যক্তি যে বিনা কারণে তালাক দেয় এবং স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ও তার ইদ্দত দীর্ঘ করার জন্যে তাকে ফিরিয়ে নিতেই থাকে। এও বলা হয়েছে যে, এটা ঐ ব্যক্তি যে তালাক দেয় বা আযাদ করে কিংবা বিয়ে করে অতঃপর বলে আমি তো হাসি -রহস্য করে এটা করেছি। এরূপ অবস্থায় এ তিনটি কাজ প্রকৃতপক্ষেই সংঘটিত হয়ে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একটি লোক তার স্ত্রীকে তালাক দেয় অতঃপর বলে, 'আমি তো রহস্য করেছিলাম।' তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, এটা তালাক হয়ে গেছে। (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)।

হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, মানুষ তালাক দিতো, আযাদ করতো এবং বিয়ে করতো আর বলতো—আমি হাসি—তামাশা করে এটা করেছিলাম। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেন, 'যে তালাক দেয়, গোলাম আযাদ করে, বিয়ে করে বা করিয়ে দেয়, তা অন্তরের সাথেই করুক বা হাসি-তামাশা করেই করুক সবই সংঘটিত হয়ে যাবে। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীম)। এই হাদীসটি মুরসাল এবং 'মাওকুফ'। কয়েকটি সনদে এটা বর্ণিত আছে। সুনানে আবূ দাউদ, জামেউত তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ্য়ে হাদীস রয়েছে যে, তিনটি জিনিস রয়েছে যা মনের ইচ্ছার সাথেই হোক বা

হাসি-রহস্য করেই হোক-সংঘটিত হয়ে যায়। ঐ তিনটি হচ্ছে বিয়ে, তালাক ও রাজ'আত। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গরীব বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, হিদায়াত ও দলীল অবতীর্ণ করেছেন, কিতাব ও সুন্নাত শিখিয়েছেন, নির্দেশও দিয়েছেন এবং নিষেধও করেছেন ইত্যাদি। তোমরা যে কাজ কর এবং যে কাজ হতে বিরত থাক সব সময়েই আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় খুব ভালভাবেই জানেন।

**২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দাও, তৎপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না; তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে; তোমাদের জন্যে এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম (ব্যবস্থা); এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নও।**

٢٣٢- وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

এই আয়াতে স্ত্রী লোকদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীদেরকে বলা হচ্ছে যে, যখন কোন স্ত্রী লোক তালাকপাপ্তা হয় এবং ইদ্দতও অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মত হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে ইচ্ছে করে তবে যেন তারা তাদেরকে বাধা না দেয়। এই আয়াতটি এই বিষয়েও দলীল যে, স্ত্রী

লোকেরা নিজেই বিয়ে করতে পারে না এবং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে এই হাদীসটি এনেছেন ঃ 'এক স্ত্রী লোক অন্য স্ত্রী লোকের বিয়ে দিতে পারে না এবং সে নিজেও নিজের বিয়ে দিতে পারে না। এই স্ত্রী লোকেরা ব্যভিচারিণী যারা নিজেদের বিয়ে নিজেরাই দিয়ে দেয়।' অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ পথ প্রদর্শক অভিভাবক ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয় না। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়েও মতবিরোধ রয়েছে বটে কিন্তু তাফসীরে এটা বর্ণনা করার স্থান নয়। আমরা 'কিতাবুল আহকামে' এর বর্ণনা দিয়েছি।

এই আয়াতটি হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রাঃ) এবং তাঁর ভগ্নী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারী শরীফে এই আয়াতের তাফসীরে রয়েছে যে, হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, 'আমার নিকট আমার ভগ্নীর বিয়ের প্রস্তাব আসলে আমি তার বিয়ে দিয়ে দেই। তার স্বামী কিছুদিন পর তাকে তালাক দেয়। ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় সে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করে। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে হযরত মা'কাল (রাঃ) 'আল্লাহর শপথ আমি তোমার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দেবো না এ শপথ সত্ত্বেও বলেন, আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি।' অতঃপর তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে ডেকে পাঠিয়ে পুনরায় তার সাথে তাঁর বোনের বিয়ে দিয়ে দেন। এবং নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন। তাঁর ভগ্নীর নাম ছিল জামীল বিনতে ইয়াসার (রাঃ) এবং তাঁর স্বামীর নাম ছিল আবুল বাদাহ (রাঃ)। কেউ কেউ তাঁর নাম ফাতিমা বিনতে ইয়াসার বলেছেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁর চাচাতো বোনের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু প্রথম কথাটিই সঠিকতর।

অতঃপর বলা হচ্ছে—এসব উপদেশ ঐসব লোকের জন্যে যাদের শরীয়তের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে এবং আল্লাহ ও কিয়ামতের ভয় রয়েছে। তাদের উচিত যে, তারা যেন তাদের অধীনস্থ নারীদেরকে এরূপ অবস্থায় বিয়ে হতে বিরত না রাখে। তারা যেন শরীয়তের অনুসরণ করতঃ এরূপ নারীদেরকে তাদের স্বামীদের বিয়েতে সমর্পণ করে এবং শরীয়তের পরিপন্থী নিজেদের মর্যাদাবোধ ও জেদকে শরীয়তের পদানত করে দেয়। এটাই তাদের জন্যে উত্তম। এর যুক্তি সঙ্গতার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে তোমাদের নেই। অর্থাৎ কোন কাজ করলে মঙ্গল আছে এবং কোন কাজ ছেড়ে দিলে মঙ্গল আছে এর প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।

২৩৩। এবং যে কেউ স্তন্যপানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছে করে, তার জন্যে জননীগণ পূর্ণ দু'বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে, আর সন্তানের জনকগণ বিহিত ভাবে প্রসূতিদের খোরাক ও তাদের পোষাক দিতে বাধ্য; কাউকেও তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেয়া যায় না, নিজ সন্তানের কারণে জননীকে এবং নিজ সন্তানের কারণে জনককে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না এবং উত্তরাধিকারীগণের প্রতিও তত্তুল্য বিধান, কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে স্তন্য ত্যাগ করাতে ইচ্ছে করে, তবে উভয়ের কোন দোষ নেই; আর তোমরা যদি নিজ সন্তানদেরকে স্তন্য পানের জন্যে সমর্পণ করতঃ বিহিতভাবে কিছু প্রদান কর তাহলেও তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, তোমরা যা করছো আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

٢٣٣- وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা শিশুর জননীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, শিশুদেরকে দুধ পান করানোর পূর্ণ সময় হচ্ছে দু'বছর। এর পরে দুধ পান করলে তা ধর্তব্য নয় এবং এ সময়ে দুটি শিশু একত্রে দুধ পান করলে তারা তাদের পরস্পরের দুধ ভাই বা দুধ বোন হওয়া সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হবে না। অধিকাংশ ইমামের এটাই মাযহাব। জামেউত্ তিরমিযী শরীফের মধ্যে এই অধ্যায় রয়েছে ঃ 'যে দুধ পান দ্বারা নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয় তা এই দু'বছরের পূর্বেই।'

অতঃপর হাদীস আনা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'ঐ দুধ পান দ্বারাই নিষিদ্ধতা (পরস্পরের বিয়ের নিষিদ্ধতা) সাব্যস্ত হয়ে থাকে যে দুগ্ধ পাকস্থলীকে পূর্ণ করে দেয় এবং দুধ ছাড়ার পূর্বে হয়।' এই হাদীসটি হাসান সহীহ। অধিকাংশ জ্ঞানী, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) প্রভৃতির এর উপরই আমল হয়েছে যে, দু'বছরের পূর্বের দুধ পানই বিয়ে হারাম করে থাকে। এর পরের সময়ের দুগ্ধ পান বিয়ে হারাম করে না। এই হাদীসের বর্ণনাকারী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তের উপরে রয়েছে। হাদীসের মধ্যে فِى الثَّدِى শব্দটির অর্থও হচ্ছে দুগ্ধ পানের সময় অর্থাৎ দু'বছর পূর্বের সময়। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শিশু পুত্র হযরত ইবরাহীমের (রাঃ) মৃত্যু হয়েছিল সেই সময় তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমার পুত্র দুগ্ধ পানের যুগে মারা গেল, তার জন্য দুগ্ধদানকারী বেহেশ্তে নির্দিষ্ট রয়েছে।' হযরত ইবরাহীম (রাঃ)-এর বয়স ছিল তখন এক বছর দশ মাস। দারেকুতনীর মধ্যে দু'বছরের পরের দুগ্ধ পান ধর্তব্য না হওয়ার একটি হাদীস রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) বলেন যে, এই সময়ের পরে কিছুই নেই। সুনানে আবূ দাঊদ ও তায়ালেসীর বর্ণনায় রয়েছে যে, দুধ ছুটে যাওয়ার পর দুধ পান কোন ধর্তব্য বিষয় নয় এবং সাবালক হওয়ার পর পিতৃহীনতার হুকুম প্রযোজ্য নয়। স্বয়ং কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ فِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ অর্থাৎ 'দুধ ছাড়ার সময় হচ্ছে দু'বছর।' (৩১ঃ ১৪) অন্য জায়গায় রয়েছে- وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا অর্থাৎ 'তাকে বহন করা ও তার দুধ ছাড়ার সময় হচ্ছে ত্রিশ মাস।' দু বছরের পরে দুগ্ধ পানের দ্বারা যে বিয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না এটা হচ্ছে নিম্নলিখিত মনীষীদের উক্তি ঃ 'হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত জাবির (রাঃ), হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত উম্মে সালমা (রাঃ), হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), হযরত আতা' (রঃ), এবং জমহূর উলামা।

ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ), ইমাম ইসহাক (রঃ), ইমাম সাওরী (রঃ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এবং ইমাম মালিকেরও (রঃ) এই মাযহাব। তবে ইমাম মালিক (রঃ) হতে একটি বর্ণনায় দু'বছর দু'মাস এবং আর একটি বর্ণনায় দু'বছর তিন মাসও বর্ণিত আছে। বিখ্যাত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) দুধ পানের 'সময়' দু'বছর ছ'মাস বলেছেন। ইমাম যুফার (রঃ) তিন বছর বলছেন। ইমাম আওযায়ী (রঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যদি কোন শিশু দু'বছরের পূর্বেই দুধ ছেড়ে দেয় অতঃপর সে যদি এর পরে অন্য স্ত্রীলোকের দুধ পান করে তবুও অবৈধতা সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এটা এখন খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল।

ইমাম আওযায়ী (রঃ) হতে একটি বর্ণনা এও রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ 'দুধ ছাড়িয়ে দেয়ার পর দুগ্ধ পান আর নেই' এ উক্তির দু'টি ভাবার্থ হতে পরে। অর্থাৎ দু'বছরের পরে অথবা এর পূর্বে যখনই দুধ ছাড়ুক না কেন। যেমন, ইমাম মালিকের (রঃ) উক্তি। হাঁ, তবে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (হযরত আয়েশা (রাঃ) দু'বছরের পরেও এমন কি বড় মানুষের দুধ পানকেও বিয়ে অবৈধকারী মনে করতেন। আতা' (রঃ) ও লায়েসেরও (রঃ) উক্তি এটাই। হযরত আয়েশা (রাঃ) যেখানে কোন পুরুষ লোকের যাতায়াত দরকার মনে করতেন সেখানে নির্দেশ দিতেন যে, স্ত্রীলোকেরা যেন তাকে তাদের দুধ পান করিয়ে দেয়।

নিম্নের হাদীসটি তিনি দলীল রূপে পেশ করেন ঃ 'হযরত আবূ হুযাইফার (রাঃ) গোলাম হযরত সালেমকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দেন যে, সে যেন আবূ হুযাইফার (রাঃ) স্ত্রীর দুগ্ধ পান করে নেয়। অথচ সে বয়স্ক লোক ছিল এবং এই দুগ্ধ পানের কারণে সে বরাবরই হযরত আবূ হুযাইফার (রাঃ) বাড়ীতে যাতায়াত করতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণ এটা অস্বীকার করতেন এবং বলতেন যে, এটা সালেমের (রাঃ) জন্যে বিশিষ্ট ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে এই নির্দেশ নয়, এটাই জমহূরেরও মাযহাব। এটাই মাযহাব হচ্ছে ইমাম চুতষ্টয়ের, সমস্ত ধর্মশাস্ত্রবিদগণের, বড় বড় সাহাবা-ই-কিরামের এবং উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) ছাড়া সমস্ত নবী সহধর্মিণীগণের।

তাঁদের দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'তোমাদের ভাই কোন্টি তা দেখে নাও। দুধ পান সাব্যস্ত সেই সময় হয় যখন দুধ, ক্ষুধা নিবারণ করে থাকে।' দুগ্ধ পান সম্পর্কীয় অন্যান্য মাসআলা وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ (৪ঃ ২৩) এই আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে। অতঃপর ঘোষণা হচ্ছে যে, শিশুদের জননীগণের ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব তাদের জনকদের উপর রয়েছে। তারা তা শহরে প্রচলিত প্রথা হিসেবে আদায় করবে। কম বা বেশী না দিয়ে সাধ্যানুসারে তারা শিশুর জননীদের খরচ বহন করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'সচ্ছল ব্যক্তি তার স্বচ্ছলতা অনুপাতে এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার দারিদ্রতা অনুপাতে খরচ করবে। আল্লাহ তা'আলা কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। সত্বরই আল্লাহ কঠিনের পরে সহজ করবেন।' যহ্হাক (রঃ) বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং তার সাথে তার শিশুও থাকবে তখন ঐ শিশুর দুগ্ধ পানেরকাল পর্যন্ত শিশুর মায়ের খরচ বহন করা তার স্বামীর উপর ওয়াজিব।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—মা যেন তার শিশুকে দুগ্ধ পান করাতে অস্বীকার করতঃ শিশুর পিতাকে সংকটময় অবস্থায় নিক্ষেপ না করে বরং যেন শিশুকে দুগ্ধ পান করাতে থাকে। কেননা, এটা তার জীবন-যাপনের উপায়ও বটে। অতঃপর যখন শিশুর দুগ্ধের প্রয়োজন মিটে যাবে তখন তাকে তার পিতার নিকট ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু তখনও যেন পিতার ক্ষতি করার ইচ্ছে না থাকে। অনুরূপভাবে পিতাও যেন বলপূর্বক শিশুকে তার মায়ের নিকট হতে ছিনিয়ে না নেয়। কেননা, এতে তার মায়ের কষ্ট হবে। উত্তরাধিকারীদেরও উচিত যে, তারা যেন শিশুর মায়ের খরচ কমিয়ে না দেয় এবং তারা যেন তার প্রাপ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তার ক্ষতি না করে।

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের যাঁরা এই উক্তির সমর্থক যে, আত্মীয়দের মধ্যে একে অপরের খরচ বহন করা ওয়াজিব, তাঁরা এই আয়াতটিকে দলীলরূপে গ্রহণ করে থাকেন। হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এবং পূর্ববর্তী জমহূর মনীষীগণ হতে এটাই বর্ণিত আছে। হযরত সুমরা' (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারাও এটা প্রমাণিত হচ্ছে। হাদীসটি হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি তার 'মুহরিম' আত্মীয়ের মালিক হয়ে যাবে সেই আত্মীয়টি মুক্ত হয়ে যাবে।' এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, দু'বছরের পরে শিশুকে দুগ্ধ পান করানো তার জন্যে ক্ষতিকর। সেই ক্ষতি দৈহিকই হোক বা মানসিকই হোক।

হযরত আলকামা (রাঃ) একটি স্ত্রী লোককে দেখেন যে, সে দু'বছরের চেয়ে বড় তার এক শিশুকে দুধ পান করাচ্ছে। তখন তিনি তাকে নিষেধ করেন। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে যদি দু'বছরের পূর্বেই দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় তবে তাদের কোন পাপ নেই। তবে যদি এতে কোন একজন অসম্মত থাকে তবে এই কাজ ঠিক হবে না। কেননা এতে শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুণা যে, তিনি বাপ-মাকে এমন কাজ হতে বিরত রাখলেন যা শিশুর ধ্বংসের কারণ এবং তাদেরকে এমন কাজ করার নির্দেশ দিলেন যাতে একদিকে শিশুকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হলো, অপরদিকে বাপ মায়ের পক্ষেও তা হিতকর হলো। সূরা-ই-তালাকের মধ্যে রয়েছে ঃ 'যদি স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শিশুদেরকে দুগ্ধ পান করায় তবে তোমরা তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান কর এবং এই ব্যাপারে পরস্পরে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখো এবং তোমরা যদি পরস্পর সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হও তবে অন্যের দ্বারা দুধপান করিয়ে নাও।'

এখানেও বলা হচ্ছে যে, যদি জনক-জননী পরস্পর সম্মত হয়ে কোন ওজর বশতঃ অন্য কারও দ্বারা দুধ পান করাতে আরম্ভ করে এবং পূর্বের পারিশ্রমিক পূর্ণভাবে জননীকে প্রদান করে তাহলেও উভয়ের কোন পাপ নেই। তখন অন্য কোন ধাত্রীর সাথে পারিশ্রমিকের চুক্তি করতঃ দুধপান করিয়ে নেবে। তোমরা প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চল এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের কথা ও কাজ আল্লাহ ভাল ভাবেই জানেন।

---

**২৩৪। এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারা (বিধবাগণ) চার মাস ও দশ দিন প্রতীক্ষা করবে; অতঃপর যখন তারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয় তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে যা করবে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ সম্যক খবর রাখেন।**

٢٣٤- وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

এই আয়াতে নির্দেশ হচ্ছে যে, স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের মৃত্যুর পর যেন চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে। তাদের সাথে সহবাস হয়ে থাক আর নাই থাক। এর উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে। এর একটি দলীল হচ্ছে এই আয়াতটি। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ-ই-আহমাদ ও সুনানের মধ্যে রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযীও (রঃ) ওটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হাদীসটি এই যে,হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ জিজ্ঞাসিত হন ঃ 'একটি লোক একটি স্ত্রী লোককে বিয়ে করেছিল এবং তার সাথে সহবাস করেনি। তার জন্যে কোন মোহরও ধার্য ছিল না। এই অবস্থায় লোকটি মারা যায়। তাহলে বলুন এর ফতওয়া কি হবে?' তারা কয়েকবার তাঁর নিকট যাতায়াত করলে তিনি বলেন, 'আমি নিজের মতানুসারে ফতওয়া দিচ্ছি। যদি আমার ফতওয়া ঠিক হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে মনে করবে। আর যদি ভুল হয় তবে জানবে যে এটা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আমার ফতওয়া এই যে, ঐ স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে। এটা তার মৃত স্বামীর আর্থিক অবস্থার অনুপাতে হবে। এতে কম বেশী করা চলবে না। আর স্ত্রীকে পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে মীরাসও পাবে।' একথা শুনে হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার আশযায়ী (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'বারূ বিনতে ওয়াসিক (রাঃ)-এর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ফায়সালাই করেছিলেন।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) একথা শুনে অত্যন্ত খুশী হন।'

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আশজার' বহু লোক এটা বর্ণনা করেছেন। তবে স্বামীর মৃত্যুর সময় যে গর্ভবতী থাকবে তার জন্যে এই ইদ্দত নয়। তার ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব পর্যন্ত । কুরআন পাকে রয়েছে –

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

অর্থাৎ 'গর্ভবতীদের ইদ্দত হচ্ছে তাদের সন্তান প্রসব করন পর্যন্ত' (৬৫ঃ ৪)। তবে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, গর্ভবতীর ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব করার পরে আরও চার মাস দশ দিন। সবচেয়ে বিলম্বের ইদ্দত হচ্ছে গর্ভবতীর ইদ্দত। এই উক্তিটি তো বেশ উত্তম এবং এর দ্বারা দু'টি আয়াতের মধ্যে সুন্দরভাবে ভারসাম্যও রক্ষা হয়।

কিন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে এর বিপরীত স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে যে, হযরত সীব'আ আসলামিয়াহ্ (রাঃ)-এর স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, স্বামীর ইন্তেকালের কয়েকদিন পরেই

তিনি সন্তান প্রসব করেন। নেফাস হতে পবিত্র হয়ে ভাল পোশাক পরিধান করেন। হযরত আবুস্ সানা বিল বিন বা'লাবাক্ক(রাঃ) এটা দেখে তাঁকে বলেন, 'তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পার না।' একথা শুনে হযরত সাবী'আ (রাঃ) নীরব হয়ে যান এবং সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেন, 'সন্তান প্রসবের পর থেকেই তুমি ইদ্দত হতে বেরিয়ে গেছো। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পার।' এও বর্ণিত আছে যে, এই হাদীসটি জানার পর হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) তাঁর উক্তি হতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর দ্বারাও এটা জোরদার হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) ছাত্র ও সঙ্গী এই হাদীস দ্বারাই ফতওয়া প্রদান করতেন।

দাসীদের ইদ্দতকাল হচ্ছে আযাদ স্ত্রীদের অর্ধেক অর্থাৎ দু'মাস ও পাঁচদিন। এটাই জমহূরের মাযহাব। দাসীদের শারঈ শাস্তি যেমন আযাদ স্ত্রীদের অর্ধেক তেমনই তার ইদ্দতকালও অর্ধেক। মুহাম্মদ বিন সিরীন এবং কতকগুলো উলামা-ই-যাহেরিয়াহ আযাদ ও দাসীর ইদ্দতকাল সমান বলে থাকেন। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) প্রভৃতি বলেন : এই ইদ্দতকাল রাখার মধ্যে দুরদর্শিতা এই রয়েছে যে, যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে থাকে তবে এ সময়ের মধ্যে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে যাবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফু' হাদীসে রয়েছে : 'মানব সৃষ্টির অবস্থা এই যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে মায়ের গর্ভাশয়ে বীর্যের আকারে থাকে। তার পরে জমাট রক্ত হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশ্‌ত পিণ্ড আকারে থাকে। তার পরে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। উক্ত ফেরেশতা ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে আত্মা ভরে দেন। তাহলে মোট একশো বিশ দিন হয়। আর একশো বিশ দিনে চার মাস হয়। সতর্কতার জন্যে আর দশ দিন রেখে দিয়েছেন। কেননা, কোন কোন মাস ঊনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। ফুঁ দিয়ে যখন আত্মা ভরে দেয়া হয় তখন সন্তানের গতি অনুভূত হতে থাকে এবং গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ জন্যেই ইদ্দতকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রাঃ) বলেন : 'দশ দিন রাখার কারণ এই যে, এই দশ দিনের মধ্যেই আত্মাকে দেহের ভিতরে ফুঁ দিয়ে ভরে দেয়া হয়। হযরত

রাবী বিন আনাসও (রঃ) একথাই বলেন। হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যে দাসীর সন্তান জন্মলাভ করে তার ইদ্দতকালও আযাদ স্ত্রীদের সমানই বটে। কেননা, এখন সে শয্যা পেতে বসেছে এবং এটা এই জন্যেও যে, মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে, হযরত আমর বিন আস (রাঃ) বলেন ঃ "হে জনমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাতের মধ্যে মিশ্রণ এনো না। জেনে রেখো যে, যে দাসীদের সন্তানাদি রয়েছে তাদের মনিবেরা মারা গেলে তাদের ইদ্দতকাল হবে চার মাস ও দশ দিন।'

এই হাদীসটি সুনান-ই-আবূ দাউদের মধ্যে অন্যভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রঃ) এই হাদীসটিকে মুন্‌কার বলেছেন। কেননা, এর একজন বর্ণনাকারী কাবীসা এই বর্ণনাটি তার শিক্ষক উমার হতে শুনেনি। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), ইবনে সীরীন (রঃ), আবূ আইয়াম (রঃ), যুহরী (রঃ), এবং হযরত উমার বিন আবদুল আযীযেরও (রঃ) এটাই উক্তি। আমীরুল মু'মেনীন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ানও এই নির্দেশই দিতেন। আওযাঈ (রঃ), ইবনে রাহুইয়াহ (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও (রঃ) একটি বর্ণনায় এটাই বলেছেন। কিন্তু তাউস (রঃ) ও কাতাদাহ (রঃ) তার ইদ্দতকালও অর্ধেক অর্থাৎ দু'মাস পাঁচ দিন বলেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচর হাসান বিন সালেহ বিন হাই (রঃ) বলেন যে, তাকে ইদ্দতকালরূপে তিন ঋতু পালন করতে হবে। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ, আতা' (রঃ), ও ইবরাহীম নাখঈরও (রঃ) এটাই উক্তি। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে যে, তার ইদ্দতকাল একটি ঋতু মাত্র। ইবনে উমার (রাঃ), শা'বী (রঃ), লায়েস (রঃ), আবু উবাইদ (রঃ), আবূ সাউর (রঃ), মাকহুল (রঃ) এবং জমহূরের এটাই মাযহাব। হযরত লায়েস (রঃ) বলেন যে, যদি ঋতুর অবস্থায় ঐ দাসীর মনিবের মৃত্যু ঘটে তবে ঐ ঋতু শেষ হলেই তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি তার ঋতু না আসে তবে তার ইদ্দতকাল হচ্ছে তিন মাস। ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও জমহূর বলেনঃ 'এক মাস এবং তিন দিন আমাদের নিকট বেশী পছন্দনীয়।'

পরবর্তী ইরশাদে জানা যাচ্ছে যে, ইদ্দতকালে মৃত স্বামীর জন্যে শোক করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে স্ত্রী লোক আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর

বিশ্বাস করে তার পক্ষে কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশী বিলাপ করা বৈধ নয়, হাঁ, তবে স্বামীর জন্যে চার মাস দশদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করবে।' হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি স্ত্রী লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চক্ষু দুঃখ প্রকাশ করছে। আমি তার চোখে সুরমা লাগিয়ে দেবো কি?' রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না।' দু' তিনবার সে এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) একই উত্তর দেন। অবশেষে তিনি বলেন ঃ 'এটাতো মাত্র চার মাস দশদিন। অজ্ঞতার যুগে তো তোমরা বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করতে।'

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ 'পূর্বে কোন স্ত্রী লোকের ঋতু হলে তাকে কুঁড়ে ঘরে রেখে দেয়া হতো। সে জঘন্যতম কাপড় পরতো এবং সুগন্ধি জাত দ্রব্য হতে দূরে থাকতো। সারাবছর ধরে এরকম নিকৃষ্ট অবস্থায় কাটাতো। এক বছর পরে বের হতো এবং উটের বিষ্ঠা নিয়ে নিক্ষেপ করতো। অতঃপর কোন প্রাণী যেমন গাধা, ছাগল অথবা পাখির শরীরের সাথে নিজের শরীরকে ঘর্ষণ করতো। কোন কোন সময়ে সে মরেই যেত।' এই তো ছিল অজ্ঞতা যুগের প্রথা। সুতরাং এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াতটিকে রহিতকারী। ঐ আয়াতটির মধ্যে রয়েছে যে, এই প্রকারের স্ত্রী লোকেরা এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি মনীষী একথাই বলেন। কিন্তু এটা বিবেচনার বিষয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ সত্ত্বরই আসছে।

ভাবার্থ এই যে, এই সময়ে বিধবা স্ত্রী লোকদের জন্যে সৌন্দর্য, সুগন্ধি, উত্তম কাপড় এবং অলংকার নিষিদ্ধ। আর এই শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব। তবে একটি উক্তি এও রয়েছে যে, তালাক-ই-রাজঈর ইদ্দতের মধ্যে এটা ওয়াজিব নয়। যখন তালাক-ই-বায়েন হবে তখন ওয়াজিব হওয়া ও না হওয়া এই দু'টি উক্তি রয়েছে। মৃত স্বামীদের স্ত্রীদের সবারই উপর এই শোক প্রকাশ ওয়াজিব। তারা সাবালিকাই হোক বা নাবালিকাই হোক অথবা বৃদ্ধাই হোক। তারা আযাদই হোক বা দাসীই হোক। মুসলমানই হোক বা কাফেরই হোক। কেননা, এই আয়াতের মধ্যে সাধারণ নির্দেশ রয়েছে। হাঁ, তবে ইমাম সাউরী (রঃ) এবং আবু হানীফা (রঃ) অবিশ্বাসকারিণীদের শোক প্রকাশের সমর্থক নন। এটাই আশহাব (রঃ) এবং ইবনে নাফে'রও উক্তি। তাঁদের দলীল ঐ হাদীসটি যার মধ্যে রয়েছে ঃ 'যে স্ত্রী লোক আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্যে কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশী বিলাপ করা বৈধ নয়। হাঁ, তবে স্বামীর জন্যে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করবে।'

সুতরাং জানা গেল যে এটাও একটা ইবাদতের নির্দেশ। ইমাম সাউরী (রঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) নাবালিকা মেয়ের জন্যেও এ কথাই বলে থাকেন। কেননা, তাদের প্রতিও ইবাদতের নির্দেশ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরগণ মুসলমান দাসীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কিন্তু এসব জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলোর মীমাংসা করার স্থান এটা নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইদ্দতকাল পালনের পর যদি স্ত্রী লোকেরা সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিতা হয় বা বিয়ে করে তবে তাদের অভিভাবকদের কোন পাপ নেই। এগুলো তাদের জন্যে বৈধ। হাসান বসরী (রঃ) যুহরী (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে।

**২৩৫। এবং তোমরা স্ত্রী লোকদের প্রস্তাব সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে যা ব্যক্ত কর অথবা নিজেদের মনে গোপনে যা পোষণ করে থাক তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা তাদের বিষয় আলোচনা করবে, কিন্তু গুপ্তভাবে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করো না, বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বল, এবং নির্ধারিত সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সংকল্প করো না; এবং এটাও জেনে রেখো যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত, অতএব তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।**

٢٣٥- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا
عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ
اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ
لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ
تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَلَا
تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى
يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ
اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ ع

ভাবার্থ এই যে, স্পষ্টভাবে না বলে কেউ যদি কোন স্ত্রী লোককে তার ইদ্দতের মধ্যে কোন উত্তম পন্থায় বিয়ের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে তবে কোন পাপ নেই। যেমন তাকে বলে ঃ 'আমি বিয়ে করতে চাই। আমি এরূপ এরূপ স্ত্রী লোককে পছন্দ করি। আমি চাই যে, আল্লাহ যেন আমার জোড়া মিলিয়ে দেন। ইনশাআল্লাহ আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোন স্ত্রী লোককে বিয়ে করার ইচ্ছে করবো না। আমি কোন সতী ও ধর্মভীরু স্ত্রী লোককে বিয়ে করতে চাই। অনুরূপভাবে তালাক-ই-বায়েন প্রাপ্তা নারীকেও তার ইদ্দতের মধ্যে এরূপ অস্পষ্ট শব্দগুলো বলা বৈধ। যেমন হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) নাম্নী স্ত্রী লোকটিকে যখন তাঁর স্বামী হযরত আবূ আমর বিন হাফস (রাঃ) তৃতীয় তালাক দিয়ে দেন সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন ঃ 'যখন তোমার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে তখন আমাকে সংবাদ দেবে এবং তুমি ইদ্দতকাল ইবনে উম্মে মাকতুমের ওখানে অতিবাহিত করবে।'

ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিয়ে হযরত উসামা বিন যায়েদের (রাঃ) সঙ্গে দিয়ে দেন যাঁর তিনি ঘটকালি করেছিলেন। হাঁ, তবে যে স্ত্রীকে তালাক-ই-রাজঈ দেয়া হয়েছে তাকে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারও অস্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার অধিকার নেই। তোমরা তোমাদের অন্তরে যা গোপন করে রেখেছো এর ভাবার্থ এই যে, তোমরা কোন স্ত্রী লোককে বিয়ে করার আকাংখা যে তোমাদের অন্তরে পোষণ করছো এতে তোমাদের কোন পাপ নেই। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'তোমার প্রভু তাদের অন্তরের গোপন কথাও জানেন এবং তিনি প্রকাশ্য কথাও জানেন।' আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ 'আমি তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানি।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল ভাবেই জানেন যে, তাঁর বান্দাগণ তাদের আকাংখিতা নারীদেরকে অন্তরে স্মরণ করবে। তাই, তিনি সংকীর্ণতা সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন গোপনে ঐ নারীদের কাছে অঙ্গীকার না নিয়ে বসে। অর্থাৎ তারা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে এবং যেন এই কথা না বলে ঃ 'আমি তোমার প্রতি আসক্ত। সুতরাং তুমিও অঙ্গীকার কর যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকেও স্বামীরূপে গ্রহণ করবে না।' ইদ্দতের মধ্যে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। কিংবা ইদ্দতের মধ্যে গোপনে বিয়ে করে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তা প্রকাশ করাও বৈধ নয়। সুতরাং এই উক্তিগুলো এই আয়াতের সাধারণ নির্দেশের মধ্যে আসতে পারে।

তাই ইরশাদ হচ্ছে-'বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বলবে। যেমন অভিভাবকদেরকে বলবে ঃ তাড়াতাড়ি করবেন না। ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হলে আমাকে অবহিত করবেন' ইত্যাদি। যে পর্যন্ত ইদ্দতকাল শেষ না হবে সে পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। আলেমদের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে শুদ্ধ নয়। যদি কেউ ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করে নেয় এবং সহবাসও হয়ে যায় তথাপি তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে। এখন সেই স্ত্রী তার জন্যে চিরকালের মত হারাম হয়ে যাবে না-কি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আবার তাকে বিয়ে করতে পারে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জমহূরের মতে তাকে আবার বিয়ে করতে পারে। কিন্তু ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, সে চিরকালের জন্যে হারাম হয়ে যাবে। এর দলীল এই যে, হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলেন ঃ 'ইদ্দতের মধ্যে যে স্ত্রীর বিয়ে হয় এবং স্বামীর সাথে তার মিলন না ঘটে, এরূপ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়া হবে। যখন এই স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর ইদ্দতকাল শেষ করে ফেলবে তখন এই লোকটিও অন্যান্য লোকের মতই তাকে বিয়ের পয়গাম দিতে পারবে। কিন্তু যদি দু'জনের মধ্যে মিলন ঘটে যায় তবুও তাদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে। অতঃপর এই স্ত্রী লোকটি তার পূর্ব স্বামীর ইদ্দতকাল শেষ করার পর দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালন করবে। এর পরে দ্বিতীয় স্বামী আর কখনও তাকে বিয়ে করতে পারবে না।'

এই ফায়সালা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, যেহেতু সে তাড়াহুড়া করতঃ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলো না। সেহেতু তাকে এই শাস্তি দেয়া হলো যে, ঐ স্ত্রী তার জন্যে চিরদিনের তরে হারাম হয়ে গেল। যেমন হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হয়। ইমাম শাফিঈও (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ) হতে এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, ইমাম মালিকের (রঃ) প্রথম উক্তি এটাই ছিল বটে, কিন্তু পরে তিনি এটা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এখন তাঁর নতুন উক্তি এই যে, দ্বিতীয় স্বামী ঐ স্ত্রীকেও বিয়ে করতে পারে। কেননা, হযরত আলীর (রাঃ) ফতওয়া এটাই। হযরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি সনদ হিসেবে মুনকাতা। বরং হযরত মাসরূক (রঃ) বলেন যে, হযরত উমার (রাঃ) এটা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং বলেছেন ঃ 'মোহর আদায় করতঃ ইদ্দত শেষ হওয়ার পর এরা পরস্পর ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের কথা অবগত আছেন। সুতরাং তোমরা এর প্রতি লক্ষ্য রেখে

তাঁকে সদা ভয় করে চল। স্ত্রীদের সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত চিন্তাও যেন স্থান না পায়। তোমাদের অন্তরকে সদা পরিষ্কার রাখো। কু-ধারণা হতে অন্তরকে পবিত্র রাখো। খোদা ভীতির নির্দেশের সাথে সাথে মহান আল্লাহ স্বীয় দয়া ও করুণার প্রতি লোভ দেখিয়ে বলেছেন যে, বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পাপসমূহ ক্ষমাকারী এবং তিনি সহিষ্ণু।

---

٢٣٦- لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ○

**২৩৬। যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করে তালাক প্রদান কর তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দেবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার অবস্থানুসারে বিহিত সংস্থান (করে দেবে), সৎকর্মশীল লোকদের উপর এই কর্তব্য।**

---

বিবাহ বন্ধনের পর সহবাসের পূর্বে ও তালাক দেয়ার বৈধতার কথা বলা হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), তাউস (রঃ), ইবরাহীম (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এখানে مَسٌّ শব্দের অর্থ বিবাহ। সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া, এমন কি মোহর নির্ধারিত না থাকলেও তালাক দেয়া বৈধ। তবে এতে স্ত্রীদের খুবই মনঃকষ্ট হবে বলে স্বামীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের অবস্থা অনুপাতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে কিছু অর্থ সাহায্য করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওর সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে গোলাম ও নীচে হচ্ছে চাঁদী এবং সর্বনিম্ন হচ্ছে কাপড়। অর্থাৎ ধনী হলে গোলাম ইত্যাদি তাকে প্রদান করবে। আর যদি গরীব হয় তবে কমপক্ষে তিন খানা কাপড় দেবে। হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, তার জন্যে মধ্যম শ্রেণীর উপকারী বস্তু হবে জামা, দোপাট্টা, লেপ এবং চাদর।

শুরাইহ (রঃ) বলেন যে, পাঁচশো দিরহাম প্রদান করবে। ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন যে, গোলাম দেবে বা খাদ্য অথবা কাপড় দেবে। হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দশ হাজার দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, এই প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদের তুলনায় এটা অতি নগণ্য। ইমাম আবূ হানীফার উক্তি এই যে, যদি এই উপকারী বস্তুর পরিমাণ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তবে তার বংশের নারীদের যে মোহর রয়েছে তার অর্ধেক প্রদান করবে। হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ 'কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। বরং কমপক্ষে যে জিনিসকে 'মাতআ' অর্থাৎ উপকারের বস্তু বা আসবাবপত্র বলা হয় ওটাই যথেষ্ট হবে। আমার মতে ঐ কাপড়কে 'মাতআ' বলা হবে যে কাপড়ে নামায পড়া জায়েয হয়ে থাকে।'

ইমাম শাফিঈর (রঃ) প্রথম উক্তি ছিল এইঃ 'এর সঠিক পরিমাণ আমার জানা নেই। কিন্তু আমার নিকট পছন্দনীয় এই যে, কমপক্ষে ত্রিশ দিরহাম দিতে হবে।' এটা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু আসবাবপত্র দেয়া উচিত, না শুধুমাত্র সহবাস করা হয়নি এরূপ নারীদেরকেই দিতে হবে এ সম্বন্ধে বহু উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ তো সবারই জন্যে বলে থাকেন। কেননা কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছে وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ 'তালাকপ্রাপ্তাদের বিহিতের সঙ্গে 'মাতআ' রয়েছে (২ঃ ২৪১।' এই আয়াতটি সাধারণ। সুতরাং প্রত্যেকের জন্যেই এটা সাব্যস্ত হচ্ছে। অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতটিও তাঁদের দলীল ঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও– তোমরা যদি ইহলৌকিক জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা কর তবে এসো, আমি তোমাদেরকে কিছু আসবাব দেই এবং বিহিতভাবে পরিত্যাগ করি।' সুতরাং এই সমুদয় সতী সাধ্বী নারী তাঁরাই ছিলেন যাঁদের মোহর নির্ধারিত ছিল এবং যাঁরা মহানবী (সঃ)-এর সহধর্মিণী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), আবুল আলিয়া (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এরও উক্তি এটাই। এটাই ইমাম শাফিঈরও (রঃ) একটি উক্তি। কেউ কেউ তো বলেন যে, এটাই তাঁর নতুন ও সঠিক উক্তি। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে আসবাব দেয়া কর্তব্য যার সাথে নির্জন ঘরে অবস্থান করা হয়েছে, যদিও তার জন্যে মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا*

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপনকারিণী নারীদেরকে বিয়ে কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর, তখন তোমাদের পক্ষ হতে তাদের কোন ইদ্দত নেই যা তারা অতিবাহিত করবে, তোমরা তাদেরকে কিছু আসবাবপত্র দিয়ে দাও এবং বিহিতভাবে পরিত্যাগ কর।' (৩৩ঃ ৪৯)

সাঈদ বিন মুসাইয়াবের (রঃ) উক্তি এই যে, সূরা-ই-আহযাবের এই আয়াতটি সূরা-ই-বাকারার এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। হযরত সালাহ বিন সা'দ (রাঃ) এবং হযরত আবূ উসায়েদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমাইমাহ বিনতে শুরাহবিল (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। তিনি বিদায় নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তিনি যেন সেটাকে খারাপ মনে করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উসায়েদ (রাঃ)-কে বলেন ঃ 'তাকে দু'খানা নীল কাপড় দিয়ে বিদায় করে দাও।' তৃতীয় উক্তি এই যে, শুধুমাত্র সেই অবস্থায় স্ত্রীকে 'মাতআ' দিতে হবে যখন তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হবে এবং মোহর নির্ধারিত না থাকবে। আর যদি সহবাস হয়ে যায়, 'মোহর-ই-মিসাল' অর্থাৎ তার বংশের স্ত্রী লোকদের জন্যে যে মোহর ধার্য রয়েছে ওটাই দিতে হবে। এটা ঐ সময় যখন মোহর ধার্য করা থাকবে না। আর যদি ধার্য হয়ে থাকে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তবে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। কিন্তু যদি সহবাস হয়ে গিয়ে থাকে তবে পুরো মোহরই দিতে হবে। আর এটাই 'মাতআ'র বিনিময় হয়ে যাবে। হাঁ, ঐ বিপদগ্রস্তা স্ত্রীর জন্যে 'মাতআ' রয়েছে যার সাথে সহবাসও হয়নি এবং মোহরও ধার্য করা হয়নি– এমন অবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং মুজাহিদের (রঃ) উক্তি এটাই। তবে কোন কোন আলেম প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু দেয়া মুস্তাহাব বলে থাকেন। কিন্তু যাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হবে এবং মোহর ধার্য করা থাকবে না তাদেরকে তো অবশ্যই দিতে হবে। ইতিপূর্বে সূরা-ই-আহযাবের যে আয়াতটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এটাই। এজন্যেই এখানে এই নির্দিষ্ট অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে, ধনী তার অবস্থা অনুপাতে প্রদান করবে এবং গরীবও তার অবস্থা অনুপাতে প্রদান করবে। হযরত শা'বী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এই 'মাতআ' অর্থাৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করে না দেবে তাকে কি আল্লাহ তা'আলার নিকট দায়ী

থাকতে হবে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'নিজের ক্ষমতা অনুসারে দিতে হবে। আল্লাহর শপথ! এই ব্যাপারে কাউকেও দায়ী থাকতে হবে না। যদি এটা ওয়াজিব হতো তবে বিচারকগণ অবশ্যই এরূপ লোককে বন্দী করতেন।'

---

٢٣٧- وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

২৩৭। আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক, তবে যা নির্ধারিত করেছিলে তার অর্ধেক; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে কিংবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন সে ক্ষমা করে অথবা তোমরা ক্ষমা কর তবে এটা ধর্ম প্রাণতার অতি নিকটবর্তী; এবং পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলে যেও না; তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

---

এই পবিত্র আয়াতের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ব আয়াতে যে সব নারীর জন্যে 'মাতআ' নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তারা শুধুমাত্র ঐসব নারী যাদের বর্ণনা ঐ আয়াতে ছিল। কেননা, এই আয়াতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, সহবাসের পূর্বে যখন তালাক দেয়া হবে এবং মোহর নির্দিষ্ট থাকবে, তখন তাদেরকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। যদি এখানেও এই অর্ধেক মোহর ছাড়া কোন 'মাতআ' ওয়াজিব হতো তবে অবশ্যই তা বর্ণনা করা হতো। কেননা, দু'টি আয়াতের দু'টি অবস্থাকে একের পর এক বর্ণনা করা হচ্ছে। এই আয়াতে বর্ণিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে অর্ধমোহরের উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে। কিন্তু তিনজনের মতে পূর্ণ মোহর ঐ সময় দিতে হবে যখন 'খালওয়াত' হবে। অর্থাৎ যখন স্বামী-স্ত্রী কোন নির্জন ঘরে একত্রিত হয়েছে। এই অবস্থায় সহবাস না

হলেও পূর্ণ মোহরই দিতে হবে। ইমাম শাফিঈরও (রঃ) প্রথম উক্তি এটাই। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এই অবস্থাতেও শুধু অর্ধ মোহরই দিতে হবে।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন ঃ 'আমিও এটাই বলি এবং আল্লাহর কিতাবের প্রকাশ্য শব্দ দ্বারাও এটাই বুঝা যায়।' ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন ঃ 'এই বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী লায়েস বিন আবি সালেমের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় বটে, কিন্তু ইবনে আবি তালহা (রঃ) হতে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এই বর্ণনাটি বর্ণিত আছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা তাঁরই উক্তি।'

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন—এই অবস্থায় যদি স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় তাদের অর্ধেক মোহর মাফ করে দেয় তবে এটা অন্য কথা। এই স্বামীর সবই মাফ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'সায়্যেবা' (যার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে) স্ত্রী যদি নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তবে এ অধিকার তার রয়েছে।' এটাই বহু তাবেঈ তাফসীরকারীর উক্তি। মুহাম্মদ বিন কা'ব কারাযী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ স্ত্রীদের মাফ করে দেয়া নয়, বরং পুরুষদের মাফ করে দেয়া। অর্থাৎ পুরুষ তাদের অর্ধেক অংশ ছেড়ে দিয়ে যদি পূর্ণ মোহরই দিয়ে দেয় তবে তারও এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু এ উক্তিটি খুবই বিরল। এই উক্তি আর কারও নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—বা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করবে যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে। একটি হাদীসে রয়েছে যে, এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'এর দ্বারা কি স্ত্রীদের অভিভাবকগণকে বুঝানো হয়েছে?' তিনি বলেন ঃ 'না, বরং এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে।' আরও বহু মুফাস্সির হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফিঈর (রঃ) নতুন উক্তি এটাই। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) প্রভৃতি মনীষীরও মাযহাব। কেননা, প্রকৃতপক্ষে বিয়ে ঠিক রাখা বা ভেঙ্গে দেয়া ইত্যাদি সবকাজই স্বামীর অধিকারে রয়েছে। তা ছাড়া অভিভাবক যার অভিভাবকত্ব করছে তার সম্পদ কাউকে প্রদান করা যেমন তার জন্যে বৈধ নয়, অনুরূপভাবে তার মোহর মাফ করে দেয়ারও তার অধিকার নেই। এব্যাপারে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা স্ত্রীর পিতা, ভ্রাতা এবং ঐসব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের অনুমতি ছাড়া তার বিয়ে হতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ), আলকামা (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ), আতা' (রঃ) তাউস (রঃ), যুহরী (রঃ), রাবী'আ (রঃ), যায়েদ বিন আসলাম (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), ইকরামা (রঃ) এবং মুহাম্মদ বিন সিরীন (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈরও (রঃ) পূর্ব উক্তি এটাই। তাঁদের দলীল এই যে, ওলীই তো তাকে ঐ হকের হকদার করেছে। সুতরাং ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যদিও অন্য মালে হেরফের করার তার অধিকার নেই। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করার অধিকার স্ত্রীকে দিয়েছেন। সে যদি কার্পণ্য ও মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে তবে তার অভিভাবক ক্ষমা করতে পারে যদিও স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়। হযরত শুরাইহ্ও (রঃ) এই কথাই বলেন। কিন্তু শা'বী (রঃ) যখন অস্বীকার করেন তখন তিনি ঐ উক্তি হতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন যে, সেটার ভাবার্থ স্বামী। এমন কি তিনি ঐ কথার উপর মুবাহালা করতেও প্রস্তুত ছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—'তোমাদের ক্ষমা করে দেয়াই ধর্মপ্রাণতার অতি নিকটবর্তী।' এর দ্বারা স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে উত্তম সেই যে নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দেয় অর্থাৎ হয় স্ত্রীই তার অর্ধেক প্রাপ্যও তার স্বামীকে ছেড়ে দেবে অথবা স্বামী তার স্ত্রীর প্রাপ্য অর্ধেক মোহরের পরিবর্তে পূর্ণ মোহরই দিয়ে দেবে। অতঃপর বলা হচ্ছে—'তোমরা পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলে যেও না।' অর্থাৎ তাকে অকর্মণ্যরূপে ছেড়ে দিও না, বরং তার কার্যের সংস্থান করে দাও।

'তাফসীরে ইবনে মিরদুওয়াই'—এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "জনগণের উপর এমন এক দংশনকারী যুগ আসবে যে, মু'মিনও তার হাতের জিনিস দাঁত দিয়ে ধরে নেবে এবং পরস্পরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা রয়েছে— 'তোমরা পরস্পরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। নিকৃষ্টতম ঐ সমুদয় লোক যারা মুসলমানের অসহায়তা ও অভাবের সময় তার জিনিস সস্তা মূল্যে কিনে নেয়।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তোমার কাছে মঙ্গল কিছু থাকলে তোমার ভাইকেও সেই মঙ্গল পৌঁছাও এবং তার ধ্বংসের কাজে অংশ নিও না। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। না তাকে কষ্ট দেবে, না তাকে মঙ্গল হতে বঞ্চিত করবে।

হযরত আউন (রাঃ) হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন এবং ক্রন্দন করতে থাকতেন। এমনকি তাঁর চোখের অশ্রুতে দাড়ি সিক্ত হয়ে যেতো। তিনি বলতেন ঃ 'যখন আমি ধনীদের স্পর্শে থাকি তখন সদা মনে দুঃখ অনুভব করি। কেননা, যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সে দিকেই সবাইকে আমার চাইতে উত্তম

পোষাকে, ভাল সুগন্ধিতে এবং চমৎকার সোয়ারীতে দেখতে পাই। তবে গরীবদের মজলিসে মনে বড় আনন্দ পাই।' আল্লাহ পাকও ঐ কথাই বলেন যে, তোমরা একে অপরের উপকারের কথা ভুলে যেও না। কারও কাছে কোন ভিক্ষুক আসলে তাকে কিছু দিতে না পারলেও অন্ততঃ তার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করবে। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর কাছে তোমাদের কাজও তোমাদের অবস্থা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং অতি সত্ত্বরই তিনি প্রত্যেক অমঙ্গলকারীকে তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

---

২৩৮। তোমরা নামাযসমূহ ও মধ্যবর্তী নামাযকে সংরক্ষণ কর এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও।

٢٣٨- حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

২৩৯। তবে তোমরা যদি আশংকা কর, সে অবস্থায় পদব্রজে বা যানবাহনাদির উপর (নামায সমাপন করে নেবে), পরে যখন নিরাপদ হও তখন তোমাদের অবিদিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন সেরূপে আল্লাহকে ধ্যান কর।

٢٣٩- فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

---

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে–'তোমরা নামাযসমূহের সময়ের হিফাযত কর,তাঁর সীমাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং সময়ের প্রথম অংশে নামায আদায় করতে থাকো।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ আমল উত্তম?' তিনি বলেনঃ 'নামাযকে সময়মত আদায় করা।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেনঃ 'তার পরে কোনটি?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ 'তার পরে কোন্টি?' তিনি বলেনঃ 'পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ 'যদি আমি আরও কিছু জিজ্ঞেস করতাম তবে তিনি আরও উত্তর দিতেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।'

হযরত উম্মে ফারওয়াহ (রাঃ) যিনি বায়আত গ্রহণকারিণীদের অন্যতম ছিলেন, বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমি শুনেছি, তিনি আমলসমূহের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ঐ প্রসঙ্গেই তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে নামাযকে সময়ের প্রথম অংশে আদায় করার জন্যে তাড়াতাড়ি করা (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।' এই হাদীসের একজন বর্ণনাকরী উমরীকে ইমাম তিরমিযী (রঃ) নির্ভরযোগ্য বলেন না। অতঃপর মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। صَلٰوةِ وُسْطٰى কোন্ নামাযের নাম এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীর উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ফজরের নামায।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা ফজরের নামায পড়ছিলেন। সেই নামাযে তিনি হাত উঠিয়ে কুনুতও পড়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ 'এটা ঐ মধ্যবর্তী নামায যাতে কুনুত পড়ার নির্দেশ রয়েছে।' দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে যে, এটা ছিল বসরার মসজিদের ঘটনা এবং তথায় তিনি রুকুর পূর্বে কুনুত পড়েছিলেন। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেনঃ 'একদা বসরার মসজিদে আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন কায়েসের (রঃ) পিছনে ফজরের নামায আদায় করি। অতঃপর একজন সাহাবীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করিঃ 'মধ্যবর্তী নামায কোনটি?' তখন তিনি বলেনঃ 'এই ফজরের নামাযই।'

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, বহু সাহাবা-ই-কেরাম এই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই এই উত্তরই দিয়েছিলেন। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহও (রাঃ) একথাই বলেন এবং আরও বহু সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রঃ)-এরও এটাই মাযহাব। ইমাম শাফিঈও (রঃ) এ কথাই বলেন। কেননা, তাঁদের মতে ফজরের নামাযেই কুনুত রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মাগরিবের নামায। কেননা, এর পূর্বে চার রাকআত বিশিষ্ট নামায রয়েছে এবং পরেও রয়েছে। সফরে এগুলোর কসর পড়তে হয় কিন্তু মাগরিব পুরোই পড়তে হয়। আর একটি কারণ এই যে, এর পরে রাত্রির দু'টি নামায রয়েছে অর্থাৎ এশা ও ফজর। এই দুই নামাযে কিরআত উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হয়। আবার এই নামাযের পূর্বে দিনের বেলায় দু'টি নামায রয়েছে। অর্থাৎ যুহর ও আসর। এই দুই নামাযে কিরআত ধীরে ধীরে পড়তে হয়। কেউ কেউ বলেন যে, এই নামায হচ্ছে যুহরের নামায। একদা কতকগুলো লোক হযরত যায়েদ বিন সাবিতের (রঃ) সভায় উপবিষ্ট ছিলেন। তথায় এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি নিয়ে

আলোচনা চলছিল। জনগণ হযরত উসামার (রাঃ) নিকট এর ফায়সালা নেয়ার জন্যে লোক পাঠালে তিনি বলেনঃ 'এটা যুহরের নামায যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সময়ের প্রথমাংশে আদায় করতেন ( তায়ালেসীর হাদীস)।

হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ 'সাহাবীগণের (রাঃ) উপর এর চেয়ে ভারী নামায আর একটিও ছিল না। এ জন্যেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বেও দু'টি নামায রয়েছে এবং পরেও দু'টি রয়েছে।' হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) হতেই এও বর্ণিত আছে যে,কুরাইশদের প্রেরিত দু'টি লোক তাঁকে এই প্রশ্নই করেছিলেন এবং তিনি উত্তরে 'আসর' বলেছিলেন। পুনরায় আর দু'টি লোক তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেল তিনি 'যুহর' বলেছিলেন। অতঃপর ঐ দু'জন লোক হযরত উসামাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি 'যুহর' বলেছিলেন। তিনি এটাই বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই নামাযকে সূর্য পশ্চিম দিকে একটু হেলে গেলেই আদায় করতেন। খুব কষ্ট করে দু'এক সারির লোক উপস্থিত হতেন। কেউ ঘুমিয়ে থাকতেন এবং কেউ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'হয় জনগণ এই অভ্যাস থেকে বিরত থাকবে না হয় আমি তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেবো।' কিন্তু এর বর্ণনাকারী যীরকান সাহাবীর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি। তবে হযরত যায়েদ (রাঃ) হতে অন্যান্য বর্ণনা দ্বারাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি মধ্যবর্তী নামাযের ভাবার্থ যুহরই বলতেন। একটি মারফূ' হাদীসেও এটা রয়েছে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রভৃতি হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হতেও এটারই একটি বর্ণনা রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে আসরের নামায। অধিকাংশ উলামা, সাহাবা প্রভৃতি মনীষীর এটাই উক্তি। জমহূর তাবেঈনেরও উক্তি এটাই।

হাফিয আবূ মুহাম্মদ আব্দুল মু'মিন জিমইয়াতী (রঃ) এ সম্বন্ধে একটি পৃথক পুস্তিকা রচনা করেছেন যার নাম তিনি كَشْفُ الْغِطَا فِىْ تَبْيِيْنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى দিয়েছেন। ওর মধ্যে এই ফায়সালাই রয়েছে যে, صَلٰوةِ وُسْطٰى হচ্ছে আসরের নামায। হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ), হযরত সুমরা বিন জুনদব (রাঃ), হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), হযরত উম্মে সালমা (রাঃ),

হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রভৃতি উঁচু পর্যায়ের আদম সন্তানেরও উক্তি এটাই। তাঁরা এটা বর্ণনাও করেছেন। বহু তাবেঈ (রাঃ) হতেও এটা নকল করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এরও এটাই মাযহাব। ইমাম আবূ হানীফারও (রঃ) সহীহ মাযহাব এটাই। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইবনে হাবীব মালিকীও (রঃ) এই কথাই বলেন।

এই উক্তির দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দকের যুদ্ধে বলেছিলেন "আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অন্তর ও তাদের ঘরগুলো আগুন দ্বারা পূর্ণ করুন। তারা صَلٰوةِ وُسْطٰى অর্থাৎ আসরের নামায হতে বিরত রেখেছে (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।" হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা এর ভাবার্থ নিতাম ফজর অথবা আসরের নামায। অবশেষে খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে আমি একথা শুনতে পাই। সমাধিগুলোকেও আগুন দিয়ে ভরে দেয়ার কথা এসেছে।' মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন যে, এটা আসরের নামায। এই হাদীসটির বহু পন্থা রয়েছে এবং বহু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরাইরাকে (রাঃ) এর সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যেও একবার মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তখন আবূ হাশিম বিন উৎবা (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ী চলে যান এবং অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং তাঁর নিকটে জেনে বাইরে এসে আমাদেরকে বলেন যে, এটা আসরের নামায (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)।

একবার আবদুল আযীয বিন মারওয়ানের (রঃ) মজলিসেও এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি সম্বন্ধে কথা উঠে। তিনি তখন বলেনঃ "যাও, অমুক সাহাবীর (রাঃ) নিকট গিয়ে এটা জিজ্ঞেস করে এসো।" একথা শুনে এক ব্যক্তি বলেনঃ "এটা আমার নিকট শুনুন। আমার বাল্যাবস্থায় হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ) এই মাসআলাটিই জিজ্ঞেস করার জন্যে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি ধরে বলেনঃ 'দেখ, এটা ফজরের নামায। তারপরে ওর পার্শ্বেকার অঙ্গুলি ধরে বলেন, এটা যুহরের নামায। অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে বলেন, এটা মাগরিবের নামায। অতঃপর শাহাদাত অঙ্গুলি ধরে বলেন, এটা হলো এশার নামায। এরপর আমাকে বলেন–'এখন আমাকে বলতো তোমার কোন্ অঙ্গুলিটি অবশিষ্ট

রয়েছে? আমি বলি—'মধ্যকারটি'। তারপরে বলেন— আচ্ছা, এখন কোন্ নামায অবশিষ্ট রয়েছে? আমি বলি— 'আসরের নামায।' তখন তিনি বলেন— "এটাই হচ্ছে (صَلٰوةِ وُسْطٰى) (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)।" কিন্তু এ বর্ণনাটি খুবই গারীব। মোট কথা (صَلٰوةِ وُسْطٰى)-এর ভাবার্থ আসরের নামায হওয়া সম্বন্ধে বহু হাদীস এসেছে যেগুলোর মধ্যে কোনটি হাসান, কোনটি সহীহ এবং কোনটি দুর্বল। জামেউত্ তিরমিযী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতির মধ্যেও এ হাদীসগুলো রয়েছে। তাছাড়া এই নামাযের উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যারা এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে তাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন।

যেমন একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'যার আসরের নামায ছুটে গেল তার যেন পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।' অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'মেঘের দিনে তোমরা আসরের নামায সময়ের পূর্বভাগেই পড়ে নাও। জেনে রেখো যে, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দেয় তার আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায়'। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) গেফার গোত্রের 'হামিস' নামক উপত্যকায় আসরের নামায আদায় করেন। অতঃপর বলেন ঃ 'এই নামাযই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপরও পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা নষ্ট করে দিয়েছিল। জেনে রেখো যে, যে ব্যক্তি এই নামায প্রতিষ্ঠিত করে থাকে তাকে দ্বিগুণ পুণ্য দেয়া হয়। এরপরে কোন নামায নেই যে পর্যন্ত না তোমরা তারকা দেখতে পাও (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর আযাদকৃত গোলাম আবূ ইউনুস (রাঃ)-কে বলেন ঃ 'তুমি আমার জন্যে একটা করে কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ কর এবং যখন তুমি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (২ঃ ২৩৮) পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে জানাবে।' অতঃপর তাঁকে জানানো হলে তিনি আবু ইউনুসের (রাঃ) দ্বারা صَلٰوةِ وُسْطٰى-এর পরে وَالصَّلٰوةُ الْعَصْرِ লিখিয়ে নেন এবং বলেন ঃ 'এটা স্বয়ং আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছি (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।' অন্য এক বর্ণনায় وَهِيَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ শব্দটিও রয়েছে (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রাঃ) তাঁর কুরআন লেখক হযরত আমর বিন রাফে'র দ্বারা এই আয়াতটি এভাবে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। (মুআত্তা-ই-ইমাম মালিক)। এই হাদীসটিরও বহু ধারা রয়েছে এবং কয়েকটি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ)

বলেছিলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে এ শব্দগুলো শুনেছি।' হযরত নাফে' (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি এই কুরআন মাজীদ স্বচক্ষে দেখেছি, এই শব্দই وَاوْ -এর সঙ্গে ছিল।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত উবায়েদ বিন উমায়েরের (রাঃ) কিরআতও এরূপই। এই বর্ণনাগুলো সামনে রেখে কয়েকজন মনীষী বলেন যে, যেহেতু وَاوْ অক্ষরটি عَطْف-এর জন্যে এসে থাকে এবং مَعْطُوْف ও مَعْطُوْفٌ عَلَيْه-এর মধ্যে مُغَايَرَتْ অর্থাৎ বিরোধ হয়ে থাকে, সেহেতু বুঝা যাচ্ছে صَلٰوةُ الْوُسْطٰى এক জিনিস এবং صَلٰوةُ الْعَصْرِ অন্য জিনিস। কিন্তু এর উত্তর এই যে, যদি ওটাকে হাদীস হিসেবে স্বীকার করা হয় তবে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিই অধিকতর বিশুদ্ধ এবং তাতে স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। এখন বাকি থাকলো وَاوْ সম্বন্ধে কথা। তা হলে হতে পারে যে, এই وَاوْ টি وَاوْ عَاطِفَه নয়, বরং এটা وَاوْ زَائِدَه বা অতিরিক্ত وَاوْ হবে। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ-এর মধ্যকার وَاوْ টি অতিরিক্ত। অন্য জায়গায় রয়েছে-

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ *

(৬ঃ৭৫)-এর মধ্যকার وَاوْ টি অতিরিক্ত। কিংবা হয়তো এই وَاوْ টি عَطْف - صِفَت এর জন্যে এসেছে عَطْف ذَات -এর জন্যে নয়। যেমন ঃ

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (৩৩ঃ ৪০)-এর মধ্যে রয়েছে। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى * الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى * وَ الَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى * وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى * (৮৭ঃ ১-৪)

এসব স্থলে وَاوْ টি বিশেষণের সংযোগের জন্যে এসেছে مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه -কে পৃথক করণের জন্যে নয়। এ ধরনের আরও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কবিদের কবিতার মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নাহবীদের ইমাম সিবওয়াই বলেন যে, مَرَرْتُ بِاَخِيْكَ وَصَاحِبِكَ এটা বলা শুদ্ধ হবে। অথচ এখানে اَخْ ও صَاحِبْ একই ব্যক্তি। আর যদি এই শব্দগুলোকে কুরআনী শব্দ হিসেবে মেনে নেয়া হয় তবে তো এটা স্পষ্ট কথা যে, خَبَرِ وَاحِدْ দ্বারা কুরআন মাজীদের পঠন সাব্যস্ত হয় না, যে পর্যন্ত না تَوَاتُرْ বা ক্রমপরম্পরা দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়। এজন্যেই হযরত

উসমান (রাঃ) তাঁর কুরআনে এই কিরআত গ্রহণ করেননি। সপ্তকারীর পঠনেও এই শব্দগুলো নেই বা অন্য কোন বিশ্বস্ত কারীর পঠনেও নেই। তাছাড়া অন্য একটি হাদীস রয়েছে যার দ্বারা এই কিরআতের রহিত হয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস রয়েছে, হযরত বারা' বিন আজিব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْعَصْرِ অবতীর্ণ হয় এবং আমরা কিছু দিন ধরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এটা পড়তে থাকি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এটা রহিত করে দেন এবং حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অবতীর্ণ করেন। এর উপর ভিত্তি করে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত পঠন শব্দ হিসেবে রহিত হয়ে যাবে। আর যদি وَاوْ অক্ষরটিকে مُغَايِرَه রূপে স্বীকার করা হয় তবে শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই রহিত হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মাগরিবের নামায। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। কিন্তু এর সনদে সমালোচনা রয়েছে। অন্য আরও কয়েকজন মনীষীরও এই উক্তি রয়েছে। এর একটি কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, অন্যান্য নামায চার রাকআত বিশিষ্ট বা দুই রাকআত বিশিষ্ট। কিন্তু এই নামায (মাগরিব) তিন রাকআত বিশিষ্ট। সুতরাং এ দিক দিয়ে এটা মধ্যবর্তী নামায। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ফরয নামাযের মধ্যে এটা বেত্‌র নামায। তৃতীয় কারণ এই যে, এ নামাযের ফযীলতের বহু হাদীস এসেছে। কেউ কেউ এর ভাবার্থ এশার নামাযও বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে এক ওয়াক্ত নামায।

কিন্তু সেটা কোন্ ওয়াক্তের নামায তা আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না। এটা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। যেমন 'লাইলাতুল কাদর' সারা বছরের মধ্যে বা রমযান শরীফের পূর্ণ মাসের মধ্যে অথবা উক্ত মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। কিন্তু তা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কোন কোন মনীষী এটাও বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সমষ্টি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা হচ্ছে এশা এবং ফজরের নামায। কারো কারো মতে এটাই হচ্ছে জুমআর নামায। কেউ কেউ বলেন যে, এটা হচ্ছে ভয়ের নামায। আবার কারও মতে এটা হচ্ছে ঈদের নামায। কেউ কেউ এটাকে চাশ্‌তের নামায বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ 'আমরা এ সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করি এবং

কোন একটি মতই পোষণ করি না। কেননা, বিভিন্ন দলীল রয়েছে এবং কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ আমাদের জানা নেই। কোন একটি উক্তির উপর ইজমাও হয়নি এবং সাহাবীদের (রাঃ) যুগ হতে আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে মতানৈক্য চলে আসছে। যেমন হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, এ ব্যাপারে সাহাবীগণ (রাঃ) এরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন—অতঃপর তিনি অঙ্গুলির উপর অঙ্গুলি রেখে দেখিয়ে দেন।' কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, শেষের উক্তিগুলো সবই দুর্বল। মতানৈক্য রয়েছে শুধু ফজর ও আসর নিয়ে।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা আসরের নামায صَلٰوةِ وُسْطٰى হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। সমস্ত উক্তি ছেড়ে দিয়ে এই বিশ্বাস রাখাই উচিত যে, صَلٰوةِ وُسْطٰى হচ্ছে আসরের নামায। ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবূ হাতীম রাযী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ ফাযায়েল-ই-শাফিঈ (রঃ)-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলতেন ঃ

كُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ فَحَدِيْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلٰى وَلَا تُقَلِّدُوْنِيْ

অর্থাৎ আমার যে কোন কথার বিপরীত বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয় তখন নবী (সঃ)-এর হাদীসই উত্তম। খবরদার! তোমরা আমাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করো না। ইমাম শাফিঈর (রঃ) এই উক্তি ইমাম রাবী' (রঃ), ইমাম যা'ফারানী (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত মূসা আবুল ওয়ালিদ বিন জারূদ (রঃ) ইমাম শাফিঈ (রঃ) হতে নকল করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ وَقُلْتُ قَوْلًا فَاَنَا رَاجِعٌ عَنْ قَوْلِيْ وَقَائِلٌ بِذٰلِكَ -

অর্থাৎ 'আমার যে উক্তি হাদীসের উল্টো হয় তখন আমি আমার উক্তি হতে প্রত্যাবর্তন করি এবং স্পষ্টভাবে বলি যে, ওটাই আমার মাযহাব যা হাদীসে রয়েছে।' এটা ইমাম সাহেবের বিশ্বস্ততা ও নেতৃত্বে এবং মাননীয় ইমামদের প্রত্যেকেই তাঁরই মত একথাই বলেছেন যে, তাঁদের উক্তিকে যেন ধর্ম মনে করা না হয়। এজন্যেই কাযী মাওয়ারদী (রঃ) বলেন ঃ صَلٰوةِ وُسْطٰى-এর ব্যাপারে ইমাম শাফিঈরও (রঃ) এই মাযহাব মনে করা উচিত যে, ওটা আসরের নামায। যদিও তাঁর নতুন উক্তি এই যে, ওটা আসর নয়, তথাপি আমি তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর উক্তিকে বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত পাওয়ার কারণে ওটা পরিত্যাগ করলাম।

শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী আরও বহু মুহাদ্দিসও একথাই বলেছেন। শাফিঈ মাযহাবের কয়েকজন ফিকাহ শাস্ত্রবিদ বলেন যে, ইমাম শাফিঈর (রঃ) একটি মাত্র উক্তি যে, ওটা হচ্ছে ফজরের নামায। কিন্তু তাফসীরের মধ্যে এইসব কথা আলোচনা করা উচিত নয়। পৃথকভাবে আমি ওগুলো বর্ণনা করেছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– তোমরা বিনয় ও দারিদ্রের সাথে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। এর মধ্যে এটা অবশ্যই রয়েছে যে, নামাযের মধ্যে মানব সম্বন্ধীয় কোন কথা থাকবে না। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) সালামের উত্তর দেননি এবং নামায শেষে তাঁকে বলেন ঃ 'নামায হচ্ছে নিমগ্নতার কাজ।' হযরত মুআবিয়া বিন হাকাম (রাঃ) নামাযের অবস্থায় কথা বললে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন ঃ নামাযের মধ্যে মানবীয় কোন কথা বলা উচিত নয়। এতো হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার কাজ (সহীহ মুসলিম)।'

মুসনাদ-ই-আহমাদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে, হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মানুষ নামাযের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলোও বলে ফেলতো। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মানুষকে নামাযের মধ্যে নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এই হাদীসের মধ্যে একটা সমস্যা এই রয়েছে যে, নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলার নিষিদ্ধতার নির্দেশ আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরে ও মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 'আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর নামাযের অবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি নামাযের মধ্যেই উত্তর দিতেন। আবিসিনিয়া হতে ফিরে এসে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর নামাযের অবস্থাতেই সালাম দেই। কিন্তু তিনি উত্তর দেননি। এতে আমার দুঃখের সীমা ছিল না। নামায শেষে তিনি আমাকে বলেন ঃ 'হে আবদুল্লাহ! অন্য কোন কথা নেই। আমি নামাযে ছিলাম বলেই তোমার সালামের উত্তর দেইনি। আল্লাহ যে নির্দেশ দিতে চান তাই দিয়ে থাকেন। তিনি এটা নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলো না। অথচ এই আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

এখন হযরত যায়েদ বিন আরকামের (রাঃ) "মানুষ নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে তার ভাই-এর সাথে কথা বলতো"-এই কথার ভাবার্থ আলেমগণ

এই বলেন যে, এটা কথার শ্রেণী বিশেষ এবং নিষিদ্ধতা হিসেবে এই আয়াতকে দলীলরূপে গ্রহণ করাও হচ্ছে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি মাত্র। আবার কেউ কেউ বলেন যে, সম্ভবতঃ নামাযের মধ্যে দু'বার বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং দু'বার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই অধিকতর স্পষ্ট। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি যা হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন তাতে রয়েছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সালামের উত্তর না দেয়ায় আমার এই ভয় ছিল যে, সম্ভবতঃ আমার সম্বন্ধে কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায শেষে আমাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ অর্থাৎ "হে মুসলমান ব্যক্তি। তোমার উপর শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।' নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ দিতে চান তাই দিয়ে থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা নামাযে থাকবে তখন বিনয় প্রকাশ করবে ও নীরব থাকবে।' ইতিপূর্বে য়েহেতু নামাযের পুরোপুরি সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেহেতু এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেখানে পুরোপুরিভাবে নামাযের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যেমন, যুদ্ধের মাঠে যখন শত্রু সৈন্য সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে সেই সময়ের জন্যে নির্দেশ হচ্ছে– 'যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবেই তোমরা নামায আদায় কর। অর্থাৎ তোমরা সোয়ারীর উপরই থাক বা পদব্রজেই চল, কিবলার দিকে মুখ করতে পার আর নাই পার, তোমাদের সুবিধামত নামায আদায় কর'।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন। এমনকি হযরত নাফে' (রঃ) বলেনঃ 'আমি তো জানি যে, এটা মারফু' হাদীস।' সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'কঠিন ভয়ের সময় তোমরা সোয়ারীর উপর আরূঢ় থাকলেও ইঙ্গিতে নামায পড়ে নাও।' হযরত আবদুল্লাহ বিন আনাস (রাঃ)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) খালিদ বিন সুফইয়ানকে হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করেন তখন তিনি এভাবেই ইঙ্গিতে আসরের নামায আদায় করেছিলেন। (সুনান-ই-আবূ দাঊদ)।

সুতরাং মহান আল্লাহ এর দ্বারা স্বীয় বান্দাদের উপর কর্তব্য খুবই সহজ করে দিয়েছেন এবং তাদের বোঝা হালকা করেছেন। ভয়ের নামায এক রাকআত পড়ার কথাও এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর (সঃ) ভাষায় তোমাদের বাড়ীতে অবস্থানের সময় তোমাদের

উপর চার রাকআত নামায ফরয করেছেন এবং সফরের অবস্থায় দু'রাকআত ও ভয়ের অবস্থায় এক রাকআত নামায ফরয করেছেন (সহীহ মুসলিম)।' ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন যে, এটা অতিরিক্ত ভয়ের সময় প্রযোজ্য। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং আরও বহু মনীষী ভয়ের নামায এক রাকআত বলেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) সহীহ বুখারীর মধ্যে 'দূর্গ বিজয়ের সময় ও শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় নামায আদায় করা নামে একটি অধ্যায় রেখেছেন। ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, যদি বিজয় লাভ আসন্ন হয়ে যায় এবং নামায আদায় করার সাধ্য না হয় তবে প্রত্যেক লোক তার শক্তি অনুসারে ইশারায় নামায পড়ে নেবে। যদি এটুকু সময় পাওয়া না যায় তবে বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয়। আর যদি নিরাপত্তা লাভ হয় তবে দু'রাকআত পড়বে নচেৎ এক রাকআতই যথেষ্ট। কিন্তু শুধু তাকবীর পাঠ করা যথেষ্ট নয় বরং বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না নিরাপদ হয়। মাকহুলও (রঃ) এটাই বলেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেনঃ 'তাসতার দূর্গের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। সুবেহ সাদিকের সময় ভীষণ যুদ্ধ চলছিল। নামায আদায় করার সময়ই আমরা পাইনি। অনেক বেলা হলে পরে আমরা সেদিন ফজরের নামায আদায় করি। ঐ নামাযের বিনিময়ে যদি আমি দুনিয়া ও ওর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই পেয়ে যাই তবুও আমি সন্তুষ্ট নই। এটা সহীহ বুখারীর শব্দ। ইমাম বুখারী (রঃ) ঐ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধে সূর্য পূর্ণ অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসরের নামায পড়তে পারেননি।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সাহাবীগণকে (রাঃ) বানী কুরাইযার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন তাদেরকে বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বানী কুরাইযার মধ্যে ছাড়া আসরের নামায না পড়ে।' তখন আসরের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ তো সেখানেই নামায আদায় করেন এবং বলেন– 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি চলি যাতে তথায় পৌঁছে আসরের সময় হয়।' আবার কতকগুলো লোক নামায পড়েননি। অবশেষে সূর্য অস্তমিত হয়। বানী কুরাইযার নিকট গিয়ে তাঁরা আসরের নামায আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এ সংবাদ জানতে পেরেও এঁদেরকে বা ওঁদেরকে ধমকের সুরে কিছুই বলেননি। সুতরাং এর দ্বারাই ইমাম বুখারী (রঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামাযকে বিলম্ব করে পড়ার বৈধতার দলীল নিয়েছেন। কিন্তু জমহূর এর বিপরীত বলেছেন। তাঁরা বলেন যে, সূরা-ই-নিসার মধ্যে যে صَلٰوةِ خَوْف-এর নির্দেশ রয়েছে এবং যে নামায শরীয়ত সম্মত হওয়ার কথা এবং

যে নামাযের নিয়ম-কানুন হাদীসসমূহে এসেছে তা খন্দকের যুদ্ধের পরের ঘটনা। যেমন আবূ সাঈদ (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মাকহূল (রঃ) এবং ইমাম আওযায়ীর (রঃ) উত্তর এই যে, এটা পরে শরীয়ত সম্মত হওয়া এই বৈধতার উল্টো হতে পারে না যে, এটাও জায়েয এবং ওটাও নিয়ম। কেননা এরূপ অবস্থা খুবই বিরল। আর এরূপ অবস্থায় নামাযকে বিলম্বে পড়া জায়েয। যেহেতু স্বয়ং সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) হযরত ফারূকে আযমের যুগে 'তাসতার বিজয়ের সময় এর উপর আমল করেন এবং কেউ কোন অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন করেননি।

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে–'যখন তোমরা নিরাপত্তা লাভ কর তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পুরোপুরিভাবে পালন করতে অবহেলা করো না। যেমন আমি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছি এবং অজ্ঞতার পরে জ্ঞান ও বিবেক দিয়েছি, তেমনই তোমাদের উচিত যে, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপে শান্তভাবে আমাকে স্মরণ করবে।' যেমন তিনি ভয়ের নামাযের বর্ণনা দেয়ার পর বলেন– যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে তখন নামাযকে উত্তমরূপে আদায় করবে। নামাযকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয। صَلٰوةُ خَوْفٍ -এর পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-নিসার আয়াত وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ এর তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

**২৪০। এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু মুখে পতিত হয় ও পত্নীগণকে ছেড়ে যায় তারা যেন স্বীয় পত্নীগণকে বহিষ্কৃত না করে এক বছর পর্যন্ত তাদেরকে ভরণ-পোষণ প্রদান করার জন্যে অসিয়ত করে যায়,কিন্তু যদি তারা (স্বেচ্ছায়) বের হয়ে যায়, তবে নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে তারা যে ব্যবস্থা করে তজ্জন্যে তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।**

٢٤٠- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

٢٤١- وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

**২৪১। আর তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে বিহিতভাবে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ধর্মভীরুগণের কর্তব্য।**

٢٤٢- كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ ع

**২৪২। এভাবে আল্লাহ স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন- যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।**

অধিকাংশ মুফাস্সিরের উক্তি এই যে, এই আয়াতটি এর পূর্ববর্তী আয়াত (অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ইদ্দত বিশিষ্ট আয়াত) দ্বারা রহিত হয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-কে বলেন ঃ ‘এই আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে, সুতরাং আপনি এটাকে আর কুরআন মাজীদের মধ্যে লিখিয়ে নিচ্ছেন কেন?’ তিনি বলেন ঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! পূর্ববর্তী কুরআনে যেমন এটা বিদ্যমান রয়েছে তেমনই এখানেও থাকবে। আমি কোন হের ফের করতে পারি না।’ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘পূর্বে তো এই নির্দেশই ছিল–এক বছর ধরে ঐ বিধবা স্ত্রীদেরকে তাদের মৃত স্বামীদের সম্পদ হতে ভাত-কাপড় দিতে হবে এবং তাদেরকে ঐ বাড়ীতেই রাখতে হবে। অতঃপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত এটাকে রহিত করে এবং স্বামীর সন্তান থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রীর জন্যে এক অষ্টমাংশ, আর সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করা হয়। আর স্ত্রীর ইদ্দতকাল নির্ধারিত হয় চার মাস ও দশ দিন।’

অধিকাংশ সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি রহিত হয়েছে। সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, সূরা-ই-আহযাবের يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ (৩৩ঃ ৪৯) এই আয়াত দ্বারা সূরা-ই-বাকারার এই আয়াতটিকে রহিত করা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এক বছরের মধ্যে চার মাস দশ দিন তো হচ্ছে মূল ইদ্দতকাল এবং এটা অতিবাহিত করা স্ত্রীর জন্যে ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট সাত মাস ও বিশ দিন স্ত্রী তার মৃত স্বামীর বাড়ীতেও থাকতে পারে বা চলেও যেতে পারে। মীরাসের আয়াত এটাকেও মানসূখ করে দিয়েছে। সে যেখানে পারে সেখানে গিয়ে ইদ্দত পালন করবে। বাড়ীর খরচ বহন স্বামীর দায়িত্বে নেই। সুতরাং এসব উক্তি দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই আয়াত তো এক বছরের ইদ্দতকে ওয়াজিবই করেনি।

সুতরাং রহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এটা তো শুধুমাত্র স্বামীর অসিয়ত এবং সেটাকেও স্ত্রী ইচ্ছে করলে পুরো করবে আর না করলে না করবে। তার উপর কোন বাধ্য বাধকতা নেই। وَصِيَّةً শব্দের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তোমাদেরকে অসিয়ত করছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করছেন।'

وَصِيَّةً শব্দের পূর্বে فَلْتُوصُوا لَهُنَّ শব্দ উহ্য মেনে ওকে نَصَبٌ দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্ত্রীরা যদি পুরো এক বছর তাদের মৃত স্বামীদের বাড়ীতেই থাকে তবে তাদেরকে বের করে দেয়া হবে না। যদি তারা ইদ্দতকাল কাটিয়ে সেচ্ছায় চলে যায় তবে তাদেরকে বাধা দেয়া হবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াও (রঃ) এই উক্তিকেই পছন্দ করেন। আরও বহু লোক এটাকেই গ্রহণ করে থাকেন। আর অবশিষ্ট দল এটাকে 'মানসূখ' বলে থাকেন। এখন যদি ইদ্দতকালের পরবর্তী কাল 'মানসূখ' হওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য হয় তবে তো ভাল কথা, নচেৎ এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, স্ত্রীকে অবশ্যই মৃত স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দতকাল অতিবাহিত করতে হবে। তাঁদের দলীল হচ্ছে মুআত্তা-ই-মালিকের নিম্নের হাদীসটি–হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) ভগ্নী হযরত ফারী'আ বিনতে মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে এসে বলেন ঃ 'আমাদের ক্রীত দাসেরা পালিয়ে গিয়েছিল। আমার স্বামী তাদের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। 'কুদুম' নামক স্থানে তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলে। তাঁর কোন ঘর-বাড়ী নেই যেখানে আমি ইদ্দতকাল অতিবাহিত করি এবং কোন পানাহারের জিনিসও নেই। সুতরাং আপনার অনুমতি হলে আমি আমার পিত্রালয়ে চলে গিয়ে তথায় আমার ইদ্দতকাল কাটিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'অনুমতি দেয়া হলো।' আমি ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছি এবং এখনও কক্ষেই রয়েছি এমন সময় তিনি আমাকে ডেকে পাঠান বা নিজেই ডাক দেন এবং বলেনঃ 'তুমি কি বলছিলে?' আমি পুনরায় ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেনঃ 'তোমার ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বাড়ীতেই থাক।' সুতরাং আমি সেখানেই আমার ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করি।'

হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে আমাকে ডেকে পাঠান এবং এই মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ফায়সালাসহ আমার ঘটনাটি বর্ণনা করি। হযরত উসমান (রাঃ) এরই অনুসরণ করেন এবং এটাই

ফায়সালা দেন।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।' তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে 'মাতআ' দেয়া সম্বন্ধে জনগণ বলতো ঃ 'আমরা ইচ্ছে হলে দেবো, না হলে না দেবো।' তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতটিকে সামনে রেখেই কেউ কেউ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু দেয়া ওয়াজিব বলে থাকেন। আর কেউ কেউ ওটাকে শুধুমাত্র এইসব নারীর স্বার্থে নির্দিষ্ট মনে করেন যাদের বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐসব নারী যাদের সাথে সহবাস হয়নি এবং মোহরও নির্ধারিত হয়নি এমতাবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে। কিন্তু পূর্ব দলের উত্তর এই যে, সাধারণভাবে কোন নারীর বর্ণনা দেয়া ঐ অবস্থারই সাথে ঐ নির্দেশকে নির্দিষ্ট করে না। এটাই হচ্ছে প্রসিদ্ধ মাযহাব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—এভাবেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিদর্শনাবলী হালাল, হারাম, ফারায়েয, হুদুদ এবং আদেশ ও নিষেধ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন কোন কিছু গুপ্ত ও অস্পষ্ট না থাকে এবং যেন তা সবারই বোধগম্য হয়।

---

**২৪৩। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি— মৃত্যু বিভীষিকাকে এড়াবার জন্য যারা নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হয়েছিল? অথচ তারা ছিল বহু সহস্র; তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন—তোমরা মর; পুনরায় তিনি তাদেরকে জীবন দান করলেন; নিশ্চয় মানবগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।**

٢٤٣- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

**২৪৪। তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।**

٢٤٤- وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৫। কে সে–যে আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ -বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ্র বা স্বচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

٢٤٥- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই লোকগুলো সংখ্যায় চার হাজার ছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা ছিল আট হাজার। কেউ বলেন ন'হাজার, কেউ বলেন চল্লিশ হাজার এবং কেউ ত্রিশ হাজারের কিছু বেশী বলে থাকেন। এরা 'যাওয়ারদান' নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল যা ওয়াসিতের দিকে রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তারা 'আযরাআত নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল। তারা প্লেগের ভয়ে নিজেদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হলে আল্লাহর নির্দেশক্রমে সবাই মরে যায়। ঘটনাক্রমে একজন নবী সেখান দিয়ে গমন করেন। তাঁর প্রার্থনার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পুনর্জীবিত করেন। কেউ কেউ বলেন যে, তারা একটি জনশূন্য নির্মল বায়ুযুক্ত খোলা মাঠে অবস্থান করেছিল। অতঃপর তারা দু'জন ফেরেশ্তার চীৎকারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অস্থিগুলোও চুনে পরিণত হয়। সেই জায়গায় জনবসতি বসে যায়। একদা হিযকীল নামে বানী ইসরাঈলের একজন নবী সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাদের পুনর্জীবনের জন্যে প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন ঃ 'তুমি বল– 'হে গলিত অস্থিগুলো! আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও। অতঃপর প্রত্যেক শরীরের অস্থির কাঠামো দাঁড়িয়ে গেল। এরপর তাঁর উপর আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ 'তুমি বল– হে অস্থিগুলো! আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তোমরা গোশ্ত, শিরা ইত্যাদিও তোমাদের উপর মিলিয়ে নাও।' অতঃপর ঐ নবীর (আঃ) চোখের সামনে এটাও হয়ে গেল। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে আত্মাগুলোকে সম্বোধন করে বলেনঃ 'হে আত্মাসমূহ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে পূর্বের নিজ নিজ দেহের ভিতর প্রবেশ কর।' সঙ্গে সঙ্গে যেমন তারা এক সাথে সব মরে

গিয়েছিল তেমনই সবাই এক সাথে জীবিত হয়ে গেল এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাদের মুখে উচ্চারিত হলোঃ سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ অর্থাৎ 'আপনি পবিত্র। আপনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই।' কেয়ামতের দিন ঐ দেহের সঙ্গেই দ্বিতীয়বার আত্মার উত্থিত হওয়ার এটা দলীল।

অতঃপর বলা হচ্ছে, মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার বড় অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি মহাশক্তির বড় বড় নিদর্শনাবলী তাদেরকে প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এটা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রাণ রক্ষা ও আশ্রয় লাভের অন্য কোন উপায় নেই। ঐ লোকগুলো প্লেগের ভয়ে পলায়ন করছিল এবং ইহলৌকিক জীবনের প্রতি লোভী ছিল, তাই তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে যায় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, যখন উমার (রাঃ) সিরিয়ার দিকে গমন করেন এবং সারাবা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হযরত আবূ ওবাইদাহ বিন জাররাহ (রাঃ) প্রভৃতি সেনাপতিদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরা তাঁকে সংবাদ দেন যে, সিরিয়ায় আজকাল প্লেগ রোগ রয়েছে। এখন তাঁরাও তথায় যাবেন কি যাবেন না এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন এবং বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'যখন এমন জায়গায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তোমরা অবস্থান করছো তখন তোমরা তার ভয়ে পলায়ন করো না। আর যখন তোমরা কোন জায়গায় বসে তথাকার সংবাদ শুনতে পাও তখন তোমরা তথায় যেও না।' হযরত উমার ফারূক (রাঃ) একথা শুনে আল্লাহর প্রশংসা করতঃ তথা হতে ফিরে যান (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ 'এটা আল্লাহর শাস্তি যা পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। অতঃপর বলা হচ্ছেঃ 'ঐ লোকদের পলায়ন যেমন তাদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারলো না তদ্রূপ তোমাদেরও যুদ্ধ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বৃথা। মৃত্যু ও আহার্য দু'টোই ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নির্ধারিত আহার্য বাড়বেও না কমবেও না।, তদ্রূপ মৃত্যুও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও আসবে না বা পিছনেও সরে যাবে না।' অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'যারা আল্লাহর পথ হতে সরে পড়েছে এবং তাদের সঙ্গীদেরকেও বলছে এই যুদ্ধে শহীদগণও যদি আমাদের অনুসরণ করতো তবে তারাও নিহত হতো না। তাদেরকে বলে দাও– তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের নিজেদের জীবন হতে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও তো?

অন্য স্থানে রয়েছে ঃ তারা বলে—হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করেছেন কেন? কেন আমাদেরকে সামান্য কিছু দিনের জন্যে অবসর দিলেন না? তুমি বল—ইহলৌকিক জগতের পুঁজি সামান্য এবং যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্যে পরকালই উত্তম এবং তোমরা এতটুকুও অত্যাচারিত হবে না।' অন্যত্র রয়েছে ঃ 'তোমাদেরকে মৃত্যু পেয়ে যাবেই যদিও তোমরা উচ্চতম শিখরে অবস্থান কর।' এস্থলে ইসলামী সৈনিকদের উদ্যমশীল নেতা, বীর পুরুষদের অগ্রগামী, আল্লাহর তরবারী এবং ইসলামের আশ্রয়স্থল আবূ সুলাইমান হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) ঐ উক্তি উদ্ধৃত করা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হবে যা তিনি ঠিক মৃত্যুর সময় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'মৃত্যুকে ভয়কারী, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারী কাপুরুষের দল কোথায় রয়েছে? তারা দেখুক যে, আমার গ্রন্থীসমূহ আল্লাহর পথে আহত হয়েছে। দেহের কোন জায়গা এমন নেই যেখানে তীর, তরবারী, বর্শা ও বল্লমের আঘাত লাগেনি। কিন্তু দেখ যে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি।

অতঃপর বিশ্বপ্রভু তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে খরচ করার উৎসাহ দিচ্ছেন। এরূপ উৎসাহ তিনি স্থানে স্থানে দিয়েছেন। হাদীস-ই-নযুলেও রয়েছে ঃ 'কে এমন আছে যে, সেই আল্লাহকে ঋণ প্রদান করবে যিনি না দরিদ্র, না অত্যাচারী?' مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (২ঃ ২৪৫) এই আয়াতটি শুনে হযরত আবুদ দাহ্দাহ আনসারী (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 'আল্লাহ্ কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন?' তিনি বলেন 'হাঁ'। হযরত আবুদ দাহ্দাহ্ তখন বলেন ঃ 'আমাকে আপনার হাত খানা দিন।' অতঃপর তিনি তাঁর হাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত নিয়ে বলেন ঃ 'আমি আমার ছয়শো খেজুর বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগানটি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সম্মানিত প্রভুকে ঋণ প্রদান করলাম।' সেখান হতে সরাসরি তিনি বাগানে আগমন করেন এবং স্ত্রীকে ডাক দেন ঃ 'হে উম্মুদ্দাহ্দাহ্!' স্ত্রী উত্তরে বলেন ঃ আমি উপস্থিত রয়েছি।' তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'তুমি বেরিয়ে এসো। 'আমি এই বাগানটি আমার মহা সম্মানিত প্রভুকে ঋণ দিয়েছি (তাফসীর-ই-ইবনে আবি হাতীম)।' 'করয-ই-হাসানা'-এর ভাবার্থ আল্লাহ তা'আলার পথেও খরচ হবে, সন্তানদের জন্যেও খরচ হবে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতাও বর্ণনা করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহ তা দ্বিগুণ চারগুণ করে দেবেন'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ আল্লাহর পথে ব্যয়কারীর দৃষ্টান্ত ঐ শস্য বীজের ন্যায় যার সাতটি শীষ বের হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক শীষে একশটি করে দানা

থাকে এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন তার চেয়েও বেশী দিয়ে থাকেন। এই আয়াতের তাফসীর ইনশাআল্লাহ অতি সত্ত্বরই আসছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে হযরত আবূ উসমান নাহদী (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'আমি শুনেছি যে,আপনি বলেনঃ ' এক একটি পুণ্যের বিনিময়ে এক লক্ষ পুণ্য পাওয়া যায়।' (এটা কি সত্য)?' তিনি বলেনঃ 'এতে তুমি কি বিস্ময়বোধ করছো? আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট শুনেছিঃ 'একটি পুণ্যের বিনিময়ে দু'লক্ষ পূণ্য পাওয়া যায় (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।' কিন্তু এই হাদীসটি গরীব।

তাফসীর-ই-ইবনে আবি হাতীম গ্রন্থে রয়েছে, হযরত আবূ উসমান নাহদী বলেন ঃ 'হযরত আবূ হুরাইরার (রাঃ) খিদমতে আমার চেয়ে বেশী কেউ থাকতেন না। তিনি হজ্বে গমন করলে তাঁর পিছনে আমিও গমন করি। আমি বসরায় গিয়ে শুনতে পাই যে, জনগণ হযরত আবূ হুরাইরার (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করছেন। তাঁদেরকে আমি বলিঃ 'আল্লাহর শপথ! আমিই সবচেয়ে বেশী তাঁর সাহচর্যে থেকেছি। আমি কখনও তাঁর নিকট এই হাদীসটি শুনিনি।'

অতঃপর আমার ইচ্ছে হলো যে, স্বয়ং আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে আমি জিজ্ঞেস করবো। আমি তথা হতে এখানে চলে আসি। এসে জানতে পারি যে, তিনি হজ্বে চলে গেছেন। আমি শুধুমাত্র একটি হাদীসের জন্যে মক্কা চলে আসি। তথায় তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আমি তাঁকে বলিঃ 'জনাব! বসরাবাসী আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে এটা কিরূপ বর্ণনা দিচ্ছে?' তিনি বলেন ঃ 'এতে বিস্ময়ের কি আছে?' অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার এই কথাটিও পড়ঃ

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ۔

অর্থাৎ 'ইহলৌকিক জীবনের আসবাবপত্র পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য।' (৯ঃ ৩৮) আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছি যে, একটি পুণ্যের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা দু'লক্ষ পুণ্য দান করে থাকেন।'

জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যে এই বিষয়ের নিম্নের হাদীসটিও রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, তিনি এক,তাঁর কেউ অংশীদার নেই, তাঁর জন্যে সাম্রাজ্য ও তাঁর জন্যেই প্রশংসা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর

ক্ষমতাবান– এ দু'আটি পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্যে এক লাখ পুণ্য লিখেন এবং এক লাখ পাপ ক্ষমা করে দেন।' তাফসীর-ই-ইবনে আবি হাতীম গ্রন্থে রয়েছে مَثَلُ الَّذِيْنَ এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রার্থনা করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে আরও বেশী দান করুন।'

অতঃপর مَنْ ذَا الَّذِيْ এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখনও তিনি এই প্রার্থনাই করেন। তখন إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ 'নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণভাবে ও অপরিমিতভাবে দেয়া হবে' (৩৯ঃ১০) –এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত কা'ব বিন আহবার (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি বলেন ঃ 'আমি এক ব্যক্তির নিকট শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সূরা-ই- قُلْ هُوَ اللّٰهُ একবার পাঠ করে তার জন্যে বেহেশতে দশ লক্ষ অট্টালিকা তৈরি হয়, এটা কি সত্য?' তিনি বলেন ঃ 'এতে বিস্ময়বোধ করার কি আছে? বরং বিশ লক্ষ, ত্রিশ লক্ষ এবং আরও এত বেশী যে, ওগুলো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গণনা করতে পারে না।'

অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা যখন اَضْعَافًا كَثِيْرَةً অর্থাৎ 'বহু গুণ' বলেছেন তখন তা গণনা করা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে কি করে থাকতে পারে?' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'আহার্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহর পথে খরচ করাতে কার্পণ্য করো না। যাকে তিনি বেশী দিয়েছেন তার মধ্যেও যুক্তিসঙ্গতা রয়েছে এবং যাকে দেননি তার মধ্যেও দূরদর্শিতা রয়েছে। তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে।

---

২৪৬। তুমি কি মূসার পরে ইসরাঈল বংশীয় প্রধানগণের প্রতি লক্ষ্য করনি? নিজেদের এক নবীকে যখন তারা বলেছিল– আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও (যেন) আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি! সে বলেছিল– এটা কি সম্ভবপর নয় যে, যখন তোমাদের উপর

٢٤٦- اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ
بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى
اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا
مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ

عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۗ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ۗ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

**যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হয়ে যাবে তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলেছিল– আমরা যুদ্ধ করবো না এটা কিরূপে (সম্ভব)? অথচ নিজেদের আবাস হতে ও স্বজনদের নিকট হতে আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি। অনন্তর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হলো তখন তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সবাই পশ্চাৎপদ হয়ে পড়লো এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত আছেন।**

যে নবীর এখানে বর্ণনা রয়েছে তাঁর নাম হযরত কাতাদাহ (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে হযরত ইউশা' ইবনে নূন ইবনে আফরাইয়াম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব (আঃ)! কিন্তু এই উক্তি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, এটি হযরত মূসা (আঃ)-এর বহু পরে হযরত দাঊদ (আঃ)-এর যুগের ঘটনা। এটা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত রয়েছে। আর হযরত দাঊদ (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর মধ্যে একাত্তর বছরেরও বেশী ব্যবধান রয়েছে। হযরত সুদ্দী (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এই নবী হচ্ছেন হযরত শামাউন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তিনি হচ্ছেন হযরত শামবিল বিন বালী বিন আলকামা বিন তারখাম বিনিল ইয়াহাদ বাহরাম বিন আলকামা বিন মাজিব বিন উমারসা বিন ইযরিয়া বিন সুফইয়া' বিন আলকামা বিন আবি ইয়াসিফ বিন কারূন বিন ইয়াসহার বিন কাহিস বিন লাবী বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম খালীল (আঃ)।

ঘটনাটি এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে কিছুদিন পর্যন্ত বানী ইসরাঈল সত্যের উপরেই ছিল। অতঃপর তারা শিরক ও বিদ'আতের মধ্যে পতিত হয়। তথাপি তাদের মধ্যে ক্রমাগত নবী পাঠান হয়। কিন্তু যখন তাদের অন্যায় কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রুদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করে দেন। সুতরাং তাদের শত্রুরা তাদের বহু লোককে হত্যা করলো, বহু বন্দী করলো এবং তাদের বহু শহর দখল করে নিলো। পূর্বে

তাদের নিকট তাওরাত ও শান্তিতে পরিপূর্ণ তাবূত (সিন্দুক) বিদ্যমান ছিল যা হযরত মূসা (আঃ) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল। এর ফলে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতো। কিন্তু তাদের দুষ্টামি ও জঘন্য পাপের কারণে মহান আল্লাহর এই নিয়ামত তাদের হাত হতে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের বংশের মধ্যে নবুওয়াতও শেষ হয়ে যায়। যেলাভী নামক ব্যক্তির বংশধরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে নবুওয়াত চলে আসছিল তারা সবাই যুদ্ধসমূহে মারা যায়। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি গর্ভবতী স্ত্রী লোক বেঁচে থাকে। তার স্বামীও নিহত হয়েছিল। এখন বানী ইসরাঈলের দৃষ্টি ঐ স্ত্রী লোকটির উপর ছিল। তাদের আশা ছিল যে, আল্লাহ তাকে পুত্রসন্তান দান করবেন এবং তিনি নবী হবেন। দিন-রাত ঐ স্ত্রী লোকটিরও এই প্রার্থনাই ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন। ছেলেটির নাম শ্যামভীল বা শামউন রাখা হয়। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন।'

নবুওয়াতের বয়স হলে তাঁকে নবুওয়াত দেয়া হয়। যখন তিনি নবুওয়াতের দাওয়াত দেন তখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট প্রার্থনা জানায় যে, তাদের উপর যেন একজন বাদশাহ্ নিযুক্ত করা হয় তাহলে তারা তাঁর নেতৃত্বে জিহাদ করবে। বাদশাহ তো প্রকাশিত হয়েই পড়েছিলেন। কিন্তু উক্ত নবী (আঃ) তাঁর সন্দেহের কথা তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে না তো? তারা উত্তরে বলে যে, তাদের সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদিকে বন্দী করা হয়েছে তথাপি তারা কি এতই কাপুরুষ যে মৃত্যুর ভয়ে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে? তখন জিহাদ ফরয করে দেয়া হলো এবং তাদেরকে বাদশাহর সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করতে বলা হলো। এই নির্দেশ শ্রবণমাত্র অল্প কয়েকজন ব্যতীত সবাই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তাদের এই অভ্যাস নতুন ছিল না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এটা জানতেন।

---

২৪৭। এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল– নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্যে বাদশাহরূপে নির্বাচিত করেছেন; তারা বললো– আমাদের উপর তালূতের

٢٤٨- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنّٰى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ

عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

**রাজত্ব কিরূপে (সঙ্গত) হতে পারে? রাজত্বে তার অপেক্ষা আমাদেরই স্বত্ব অধিক, পক্ষান্তরে যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতাও তার নেই; তিনি বললেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাকেই মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও দৈহিক শক্তিতে তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন দানশীল, সর্বজ্ঞাতা।**

ভাবার্থ এই যে, যখন তারা তাদের নবীকে তাদের একজন বাদশাহ নিযুক্ত করতে বললো তখন নবী (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত তালূতকে তাদের সামনে বাদশাহরূপে পেশ করলেন। তিনি বাদশাহী বংশের ছিলেন না বরং একজন সৈনিক ছিলেন। ইয়াহূদার সন্তানেরা রাজ বংশের লোক এবং হযরত তালূত এদের মধ্যে ছিলেন না। তাই জনগণ প্রতিবাদ করে বললো যে, তালূত অপেক্ষা তারাই রাজত্বের দাবীদার বেশী। দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি দরিদ্র ব্যক্তি। তাঁর কোন ধন-মাল নেই। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ভিস্তী ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি চর্ম সংস্কারক ছিলেন। সুতরাং নবীর আদেশের সামনে তাদের এই প্রতিবাদ ছিল প্রথম বিরোধিতা। নবী (আঃ) উত্তর দিলেন ঃ 'এই নির্বাচন আমার পক্ষ হতে হয়নি যে, আমি পুনর্বিবেচনা করবো। বরং এটা তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। সুতরাং এই নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া এটাতো প্রকাশমান যে, তিনি তোমাদের মধ্যে একজন বড় আলেম, তাঁর দেহ সুঠাম ও সবল, তিনি একজন বীর পুরুষ এবং যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা রয়েছে।' এর দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হচ্ছে যে, বাদশাহর মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন।

এরপরে বলা হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন মহাবিজ্ঞ এবং সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকর্তা তিনিই। সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই

রাজত্ব প্রদান করে থাকেন। তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানময়। কার এই ক্ষমতা রয়েছে যে,তাঁর কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে? একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া সবারই ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি ব্যাপক দান ও অনুগ্রহের অধিকারী। তিনি যাকে চান নিজের নিয়ামত দ্বারা নির্দিষ্ট করে থাকেন, তিনি মহাজ্ঞানী। সুতরাং কে কোন্ জিনিসের যোগ্য এবং কোন্ জিনিসের অযোগ্য এটা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

**২৪৮। এবং তাদের নবী তাদের বলেছিল– তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সিন্দুক সমাগত হবে, যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে শান্তি এবং মূসা ও হারূনের অনুচরদের (পরিত্যক্ত) মঙ্গল বিশেষ, ফেরেশতাগণ ওটা বহন করে আনবে; তোমরা যদি বিশ্বাস স্থাপনকারী হও তবে ওর মধ্যে নিশ্চয় তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।**

٢٤٨- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ع ○

(٣٢ ع ٦ ١٦)

নবী (আঃ) তাদেরকে বলেন– 'তালূতের রাজত্বের প্রথম বরকতের নিদর্শন এই যে, শান্তিতে পরিপূর্ণ হারানো তাবূত তোমরা পেয়ে যাবে। যার ভিতরে রয়েছে পদমর্যাদা, সম্মান, মহিমা, স্নেহ, ও করুণা। তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শনাবলী যা তোমরা ভালভাবেই জান।' কেউ কেউ বলেন যে, 'সাকীনা' ছিল সোনার একটি বড় থালা যাতে নবীদের (আঃ) অন্তরসমূহ ধৌত করা হতো। ওটা হযরত মূসা (আঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনি তাওরাতের তক্তা রাখতেন। কেউ কেউ বলেন যে,মানুষের মুখের মত ওর মুখও ছিল, আত্মাও ছিল, বায়ুও ছিল, দু'টি মাথা ছিল, দু'টি পাখা ছিল এবং লেজও ছিল।

অহাব (রঃ) বলেন যে, ওটা মৃত বিড়ালের মস্তক ছিল। যখন ওটা তাবূতের মধ্যে কথা বলতো তখন জনগণের সাহায্য প্রাপ্তির বিশ্বাস হয়ে যেতো এবং যুদ্ধে তারা জয়লাভ করতো। এই উক্তিও রয়েছে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ

হতে একটা আত্মা ছিল। যখন বানী ইসরাঈলের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো কিংবা কোন খবর তারা জানতে না পারতো তখন সেটা তা বলে দিতো। 'হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-এর অনুচরদের অবশিষ্ট অংশ'-এর ভাবার্থ হচ্ছে কাঠ, তাওরাতের তক্তা, 'মান্ন' এবং তাদের কিছু কাপড় ও জুতো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ "ফেরেশ্তাগণ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়ে ঐ তাবূতকে উঠিয়ে জনগণের সামনে নিয়ে আনেন এবং হযরত তালূত বাদশাহর সামনে রেখে দেন। তাঁর নিকট তাবূতকে দেখে লোকদের নবীর (আঃ) নবুওয়াত ও তালূতের রাজত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস হয়। এটাও বলা হয়েছে যে, এটাকে গাভীর উপরে করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে, কাফিরেরা যখন ইয়াহূদীদের উপর জয়যুক্ত হয় তখন তারা 'সাকিনার সিন্দুককে তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং 'উরাইহা' নামক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের বড় প্রতিমাটির পায়ের নীচে রেখে দেয়। কাফিরেরা সকালে তাদের মূর্তি ঘরে গিয়ে দেখে যে, মূর্তিটি নীচে রয়েছে এবং সিন্দুকটি তার মাথার উপরে রয়েছে। তারা পুনরায় মূর্তিটিকে উপরে ও সিন্দুকটিকে নীচে রেখে দেয়। কিন্তু পরদিন সকালে গিয়ে আবার ঐ অবস্থাতে দেখতে পায়। পুনরায় তারা মূর্তিটিকে উপরে করে দেয়। কিন্তু আবার সকালে গিয়ে দেখে যে, প্রতিমা ভাঙ্গা অবস্থায় একদিকে পড়ে রয়েছে। তখন তারা বুঝতে পারে যে, এটা বিশ্ব প্রভুরই ইঙ্গিত। তখন তারা সিন্দুকটিকে তথা হতে নিয়ে গিয়ে অন্য একটি ছোট গ্রামে রেখে দেয়। এ গ্রামে এক মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

অবশেষে তথায় বন্দিনী বানী ইসরাঈলের একটি স্ত্রী লোক তাদেরকে বলেঃ 'তোমরা এই সিন্দুকটি বানী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছিয়ে দিলে এই মহামারী থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।' সুতরাং তারা তাবূতটি দু'টি গাভীর উপর উঠিয়ে দিয়ে বানী ইসরাঈলের শহরের দিকে পাঠিয়ে দেয়। শহরের নিকটবর্তী হয়ে গাভী দু'টি রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যায় এবং তাবূতটি ওখানেই পড়ে থাকে। অতঃপর বানী ইসরাঈল ওটা নিয়ে আসে।

কেউ কেউ বলেন যে, দু'টি যুবক ওটা পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। এও বলা হয়েছে যে, এটা প্যালেস্তাইনের গ্রামসমূহের একটি গ্রামে ছিল। গ্রামটির নাম ছিল 'আযদাওয়াহ্'। এরপর নবী (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ 'আমার নবুওয়াত ও তালূতের রাজত্বের এটাও একটি প্রমাণ যে, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর তবে ফেরেশতাগণ তাবূতটি পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবেন।

٢٤٩- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

২৪৯। অনন্তর যখন তালূত সৈন্যদলসহ বহির্গত হয়েছিল তখন সে বলেছিল, নিশ্চয় আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, অতঃপর ওটা হতে যে পান করবে সে কিন্তু আমার কেউ নয় এবং যে স্বীয় হস্ত দ্বারা অ লিপূর্ণ করে নেবে–তদ্ব্যতীত যে তা আস্বাদন করবে না সে নিশ্চয়ই আমার; কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প লোক ব্যতীত আর সবাই সেই নদীর পানি পান করলো, অতঃপর যখন সেও তার সঙ্গীয় বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ নদী অতিক্রম করে গেল তখন তারা বললো–জালূতের ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নেই; পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করতো যে তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, তারা বললো– আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে, বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ!

---

এখন ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, যখন ঐ লোকেরা তালূতকে বাদশাহ বলে মেনে নিলো তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন। সুদ্দীর (রঃ) উক্তি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। পথে তালূত তাদেরকে বললেনঃ 'আল্লাহ

তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন।' হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে এই নদীটি 'উরদুন' ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। ঐ নদীটির নাম ছিল 'নাহরুশ্ শারীআহ'। তালূত তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, কেউ যেন ঐ নদীর পানি পান না করে। যারা পান করবে তারা যেন আমার সাথে না যায়। এক আধ চুমুক যদি কেউ পান করে নেয় তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু তথায় পৌঁছে গিয়ে তারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। কাজেই তারা পেট পুরে পানি পান করে নেয়। কিন্তু অল্প কয়েকজন অত্যন্ত পাকা ঈমানদার লোক ছিলেন। তাঁরা এক চুমুক ব্যতীত পান করলেন না।

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুযায়ী ঐ এক চুমুকেই তাঁদের পিপাসা মিটে যায় এবং তাঁরা জিহাদেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যারা পূর্ণভাবে পান করেছিল তাদের পিপাসাও নিবৃত্ত হয়নি এবং তারা জিহাদের উপযুক্ত বলেও গণ্য হয়নি। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, আশি হাজারের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজারই পানি পান করেছিল এবং মাত্র চার হাজার লোক প্রকৃত অনুগতরূপে প্রমাণিত হয়েছিলেন। হযরত বারা' বিন আযিব (রাঃ) বলেন যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) প্রায়ই বলতেন ঃ 'বদরের যুদ্ধে আমাদের সংখ্যা ততজনই ছিল যতজন তালূতের অনুগত সৈন্যদের সংখ্যা ছিল। অর্থাৎ তিন শো তেরো জন।'

নদী পার হয়েই অবাধ্য লোকেরা প্রতারণা শুরু করে দিলো এবং অত্যন্ত কাপুরুষতার সাথে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে বসলো। শত্রু সৈন্যদের সংখ্যা বেশী শুনে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। সুতরাং তারা স্পষ্টভাবে বলে ফেললো ঃ 'আজ তো আমরা জালূতের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের মধ্যে অনুভব করতে পারছি না।' তাদের মধ্যে যাঁরা আলেম ছিলেন তাঁরা তাদেরকে বহু রকম করে বুঝিয়ে বললেন ঃ 'বিজয় লাভ সৈন্যদের আধিক্যের উপর নির্ভর করে না। ধৈর্যশীলদের উপর আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসে থাকে। বহুবার এরূপ ঘটেছে যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে। সুতরাং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। এই ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের সহায় হবেন।' কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মৃত অন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো না এবং তাদের ভীরুতা দূর হলো না।

٢٥٠- وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ؕ

২৫০। এবং যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো, বলতে লাগলো–হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে পূর্ণ সহিষ্ণুতা দান করুন, আর আমাদের চরণগুলো অটল রাখুন এবং কাফির জাতির উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন!

٢٥١- فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۟ قف وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৫১। তখন তারা আল্লাহর হুকুমে জালূতের সৈন্যদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে নিহত করে ফেললো। এবং আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দান করলেন, আর যদি আল্লাহ এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রদমিত না করতেন তবে নিশ্চয় পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হতো, কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহকারী।

٢٥٢- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

২৫২। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন– তোমার নিকট এগুলো সত্যরূপে পাঠ করছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্গত।

অর্থাৎ যেদিন মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র সেনাদলটি কাফিরদের কাপুরুষ সেনাদলকে দেখলেন তখন তাঁরা মহান আল্লাহর নিকট করজোড় প্রার্থনা জানিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধৈর্য ও অটলতার পাহাড় বানিয়ে দিন এবং যুদ্ধের সময় আমাদের পদগুলো অটল ও স্থির রাখুন! যুদ্ধের মাঠ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং শত্রুদের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।' তাঁদের এই বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন এবং তাঁদের প্রতি সাহায্য অবতীর্ণ করেন। ফলে এই ক্ষুদ্র দলটি কাফিরদের ঐ বিরাট দলটিকে তছ্নছ্ করে দেয় এবং হযরত দাঊদ (আঃ)-এর হাতে বিরোধী দলের নেতা জালূত মারা পড়ে। ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহে এটাও রয়েছে যে, হযরত তালূত হযরত দাঊদের (আঃ) সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, যদি তিনি জালূতকে হত্যা করতে পারেন তবে তিনি তাঁর সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন এবং তাঁকে তাঁর অর্ধেক সম্পত্তিও দেবেন, আর অর্ধেক রাজত্বেরও অধিকারী করবেন। অতঃপর হযরত দাঊদ (আঃ) জালূতের প্রতি একটি পাথর নিক্ষেপ করেন এবং তাতেই সে মারা যায়। হযরত তালূত তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। অবশেষে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে যান এবং বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হতে তাঁকে নবুওয়াতও দান করা হয় এবং হযরত শামভীল (আঃ)-এর পর তিনি নবী ও বাদশাহ দু'ই থাকেন। এখানে 'হিকমত'-এর ভাবার্থ নবুওয়াত। মহান আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে গুটিকয়েক নির্দিষ্ট বিদ্যাও শিক্ষা দেন।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—'যেমন আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে হযরত তালূতের মত সঠিক পরামর্শদাতা ও চিন্তাশীল বাদশাহ এবং হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মত মহাবীর সেনাপতি দান করে জালূত ও তার অধীনস্থদেরকে অপসারিত করেছেন, এভাবে যদি তিনি একদলকে অপর দল দ্বারা অপসারিত না করতেন তবে অবশ্যই মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

অর্থাৎ 'যদি এরূপভাবে আল্লাহ মানুষের একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে উপাসনাগৃহ এবং যে মসজিদসমূহে খুব বেশী করে আল্লাহর যিকির করা হয়, সবই ভেঙ্গে দেয়া হতো।' (২২ঃ ৪০) রাসূলুল্লাহ (সঃ)

বলেছেন, 'একজন সৎ ও ঈমানদারের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার আশে-পাশের শত শত পরিবার হতে বিপদসমূহ দূর করে থাকেন।

অতঃপর হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)। কিন্তু এই হাদীসটির সনদ দুর্বল। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের আর একটি দুর্বল হাদীসে রয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা একজন খাঁটি মুসলমানের সততার কারণে তার সন্তানদেরকে সন্তানদের সন্তানদেরকে, তার পরিবারকে এবং আশে পাশের অধিবাসীদেরকে উপযুক্ত করে তোলেন এবং তার বিদ্যমানতায় তারা সবাই আল্লাহর হিফাযতে থাকে। 'তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই' গ্রন্থের একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে তোমাদের মধ্যে সাত ব্যক্তি এমন থাকবে যাদের কারণে তোমাদের সাহায্য করা হবে, তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে এবং তোমাদেরকে আহার্য দান করা হবে।'

'তাফসীরে ইবনে মিরদুওয়াই' গ্রন্থের অপর একটি হাদীসে রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ত্রিশজন লোক এমন থাকবে, যাদের কারণে তোমাদেরকে আহার্য দান করা হবে, তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে।' এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেনঃ 'আমার ধারণায় হযরত হাসান বসরীও (রঃ) তাঁদের মধ্যে একজন।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'এটা আল্লাহ তা'আলার একটা নিয়ামত ও অনুগ্রহ যে, তিনি একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত করে থাকেন। তিনিই প্রকৃত হাকীম। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর দলীলসমূহ বান্দাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করতে রয়েছেন।

অতঃপর তিনি বলেন–'হে নবী (সঃ)! এই ঘটনাবলী এবং সমস্ত সত্য কথা আমি ওয়াহীর মাধ্যমে তোমাকে জানিয়েছি। তুমি আমার সত্য নবী। আমার এই কথাগুলো এবং স্বয়ং তোমার নবুওয়াতের সত্যতা সম্বন্ধেও ঐসব লোক পূর্ণভাবে অবগত রয়েছে, যাদের হাতে কিতাব রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় শপথ করে স্বীয় নবীর (সঃ) নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

۲۵۳- تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْشَاۤءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْشَاۤءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○ ع ۳۳ ع ۱

২৫৩। এই সকল রাসূল– আমি যাদের কারো উপর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কাউকে পদ মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন, আর মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করেছি এবং তাকে পবিত্রাত্মাযোগে সাহায্য করেছি, আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে নবীগণের পরবর্তী লোকেরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ সমাগত হওয়ার পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছিল ফলে তাদের কতক হলো মু'মিন আর কতক হলো কাফির। বস্তুতঃ আল্লাহ ইচ্ছে করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই সম্পন্ন করে থাকেন।

---

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, রাসূলগণের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

অর্থাৎ 'আমি কোন নবীকে কোন নবীর উপর মর্যাদা দান করেছি এবং দাউদকে (আঃ) 'যাবুর' প্রদান করেছি।' এখানেও ওরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন

যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথা বলারও মর্যাদা লাভ করেছেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং হযরত আদম (আঃ)।

সহীহ ইবনে হিব্বানের মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে যার মধ্যে মি'রাজের বর্ণনার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন্ আকাশে কোন্ নবীকে (আঃ) পেয়েছিলেন তারও বর্ণনা রয়েছে। নবীদের (আঃ) মর্যাদা কম-বেশী হওয়ার এটাও একটা দলীল।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন মুসলমান ও একজন ইয়াহূদীর মধ্যে কিছু বচসা হয়। ইয়াহূদী বলেঃ 'সেই আল্লাহর শপথ যিনি হযরত মূসাকে (আঃ) সারা জগতের উপর মর্যাদা দান করেছেন।' মুসলমানটি একথা সহ্য করতে না পেরে তাকে এক চড় মারেন এবং বলেনঃ 'ওরে খবীস! মুহাম্মদ (সঃ) হতেও তিনি শ্রেষ্ঠ?' ইয়াহূদী সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমানটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তিনি বলেনঃ 'তোমরা আমাকে নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। কিয়ামতের দিন সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম আমার জ্ঞান ফিরবে। আমি দেখবো যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর আরশের পায়া ধরে রয়েছেন। আমার জানা নেই যে, আমার পূর্বে তাঁরই জ্ঞান ফিরেছে না তিনি আসলে অজ্ঞানই হননি এবং তূর পাহাড়ের অজ্ঞানতার বিনিময়ে আজ আল্লাহ তাঁকে অজ্ঞানতা হতে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা আমাকে নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না।' এই হাদীসটি কুরআন শরীফের এই আয়াতটির বিপরীত বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দু'য়ের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা কিছু নেই।

সম্ভবতঃ নবীদের উপর তাঁর যে শ্রেষ্ঠত্ব এটা জানার পূর্বে তিনি এই নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এই উক্তিটি চিন্তাধীনে রয়েছে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, তিনি শুধু বিস্ময় প্রকাশ হিসেবেই একথা বলেছিলেন। তৃতীয় উত্তর এই যে, এরূপ ঝগড়ার সময় একজনকে অন্যজনের উপর মর্যাদা দেয়া হলে অন্যের মর্যাদা কমিয়ে দেয়া হয়, এজন্যেই তিনি এটা বলতে নিষেধ করেছিলেন। চতুর্থ উত্তর এই যে, তিনি যেন বলেছেনঃ 'তোমরা মর্যাদা প্রদান করো না অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজেদের খেয়াল খুশী ও গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে তোমরা তোমাদের নবীকে (সঃ) অন্যান্য নবীর (আঃ) উপর মর্যাদা প্রদান করো না।' পঞ্চম উত্তর

এই যে, তাঁর এই কথার ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের ফায়সালা তোমাদের অধিকারে নেই। বরং এ ফায়সালা হবে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। সহীহ মুসলিম শরীফের মধ্যেও হাদীসটি রয়েছে; কিন্তু তাতে পরের বাক্যটি নেই। তিনি যাঁকে মর্যাদা দান করবেন তোমাদেরকে তা মেনে নিতে হবে। তোমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে মেনে নেয়া ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এরপর আল্লাহ পাক বলেন– ঈসা (আঃ)-কে তিনি এমন স্পষ্ট দলীলসমূহ প্রদান করেছেন যেগুলো দ্বারা বানী ইসরাঈলের উপর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁর রিসালাত সম্পূর্ণরূপে সত্য। আর সাথে সাথে এটাও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) অন্যান্য বান্দাদের মত আল্লাহর একজন শক্তিহীন ও অসহায় বান্দা ছাড়া আর কিছুই নন। আর তিনি পবিত্রাত্মা অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, পরবর্তীদের মতবিরোধও তাঁর ইচ্ছারই নমুনা। তাঁর মাহাত্ম্য এই যে, তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই করে থাকেন।

| | |
|---|---|
| ২৫৪। হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা হতে সে কাল সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যাতে ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। | ٢٥٤- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ |

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সুপথে নিজেদের মাল খরচ করে, তাহলে আল্লাহর নিকট তার পুণ্য জমা থাকবে। অতঃপর বলেন যে, তারা যেন তাদের জীবদ্দশাতেই কিছু দান-খয়রাত করে। কেননা কিয়ামতের দিন না ক্রয়-বিক্রয় চলবে, না পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে জীবন রক্ষা করা যাবে না কারও বংশ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন কাজে আসবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّ لَا يَتَسَاۤءَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ 'যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সে দিন না তাদের মধ্যে বংশ পরিচয় থাকবে, না একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করবে।' (২৩ঃ ১০১) সেদিন সুপারিশকারীর সুপারিশ কোন কাজে আসবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, কাফিরেরাই অত্যাচারী। অর্থাৎ পূর্ণ অত্যাচারী তারাই যারা কুফরের অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। হযরত আতা' বিন দীনার (রঃ) বলেন, 'আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি কাফিরদেরকে অত্যাচারী বলেছেন কিন্তু অত্যাচারীদেরকে কাফির বলেননি।

২৫৫। আল্লাহ্! তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই,তিনি চিরজীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁরই; এমন কে আছে যে তদীয় অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সাক্ষাতের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন; তিনি যা ইচ্ছে করেন তদ্ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ ধারণা করতে পারে না; তাঁর আসন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত, মহীয়ান!

٢٥٥- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী। এটা অত্যন্ত মর্যাদা বিশিষ্ট আয়াত। হযরত উবাই বিন কা'বকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদা বিশিষ্ট আয়াত কোন্‌টি? তিনি উত্তরে বলেনঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) সবচেয়ে ভাল জানেন।' তিনি পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন। বারবার প্রশ্ন করায় তিনি বলেনঃ 'আয়াতুল কুরসী।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ 'হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তোমার জ্ঞানে বরকত দান করুন! যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ করে আমি বলছি যে, এর জিহবা হবে, ওষ্ঠ হবে এবং এটা প্রকৃত বাদশাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে ও আরশের পায়ায় লেগে থাকবে। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

হযরত উবাই বিন কা'ব বলেন, 'আমার একটি খেজুর পূর্ণ থলে ছিল। আমি লক্ষ্য করি যে, ওটা হতে প্রত্যহ খেজুর কমে যাচ্ছে। একদা রাত্রে আমি জেগে জেগে পাহারা দেই। আমি দেখি যে, যুবক ছেলের ন্যায় একটি জন্তু আসলো। আমি তাকে সালাম দিলাম। সে আমার সালামের উত্তর দিলো। আমি তাকে বললামঃ 'তুমি মানুষ না জ্বিন?' সে বলল 'আমি জ্বিন'। আমি তাকে বললামঃ 'তোমার হাতটা একটু বাড়াও তো।' সে হাত বাড়ালো। আমি তার হাতটি আমার হাতের মধ্যে নিলাম। হাতটি কুকুরের মত ছিলো ও তার উপর কুকুরের মত লোমও ছিল। আমি বললামঃ 'জ্বিনদের সৃষ্টি কি এভাবেই হয়।' সে বললোঃ 'সমস্ত জ্বিনের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।' আমি বললামঃ 'আচ্ছা, কিভাবে তুমি আমার জিনিস চুরি করতে সাহসী হলে?' সে বললোঃ 'আমি জানি যে, আপনি দান করতে ভালবাসেন। তাই আমি মনে করলাম যে, আমি কেন বঞ্চিত থাকি?' আমি বললাম, তোমাদের অনিষ্ট হতে কোন্ জিনিস রক্ষা করতে পারে?' সে বললোঃ 'আয়াতুল কুরসী।'

সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রাত্রির সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'খবীস তো এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্যই বলেছে। (আবূ ইয়ালা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুহাজিরদের নিকট গেলে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কুরআন কারীমের খুব বড় আয়াত কোন্‌টি?' তিনি এই আয়াতুল কুরসীটিই পাঠ করে শুনান। (তাবরানী) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি কি বিয়ে করেছো?' তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার নিকট মাল-ধন নেই বলে বিয়ে করিনি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ

তোমার কি قُلْ هُوَ اللّٰهُ মুখস্থ নেই?' তিনি বলেনঃ 'এটা তো মুখস্থ আছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'এটা তো কুরআন কারীমের এক চতুর্থাংশ হয়ে গেল।' قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ কি মুখস্থ নেই?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, ওটাও আছে।' তিনি বলেন 'কুরআন পাকের এক চতুর্থাংশ এটা হলো।' আবার জিজ্ঞেস করেন اِذَا زُلْزِلَتْ কি মুখস্থ আছে?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ।' তিনি বলেনঃ এক চতুর্থাংশ এটা হলো।' اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ মুখস্থ আছে কি?' তিনি বলেনঃ 'হুঁ।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'এটা এক চতুর্থাংশ।' 'আয়াতুল কুরসী' কি মুখস্থ আছে? তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, আছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ এক চতুর্থাংশ কুরআন এটা হলো। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখি যে,তিনি মসজিদে অবস্থান করছেন। আমিও বসে পড়ি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি কি নামায পড়েছো? আমি বলিঃ 'না।' তিনি বলেনঃ 'উঠ, নামায আদায় করে নাও।' আমি নামায আদায় করে আবার বসে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমাকে বলেনঃ 'হে আবূ যার! মানুষ শয়তান, জ্বিন শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।' আমি বলিঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মানুষ শয়তানও হয় নাকি?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নামায সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি বলেনঃ 'ওটার সবই ভাল। যার ইচ্ছে হবে কম অংশ নেবে এবং যার ইচ্ছে হবে বেশী অংশ নেবে।' আমি বলিঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আর রোযা?' তিনি বলেনঃ 'এটা এমন ফরয যা যথেষ্ট হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট অতিরিক্ত থাকে। আমি বলিঃ 'আর দান-খয়রাত?'তিনি বলেনঃ 'বহুগুণ বিনিময় আদায়কারী'। আমি বলিঃ 'সবচেয়ে উত্তম দান কোন্‌টি?' তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তির মাল অল্প রয়েছে তার সাহস করা কিংবা গোপনে অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করা।' আমি জিজ্ঞেস করিঃ 'সর্বপ্রথম নবী কে?' তিনি বলেনঃ 'হযরত আদম (আঃ)। আমি বলি, তিনি কি নবী ছিলেন? তিনি বলেনঃ 'তিনি নবী ছিলেন এবং আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন।' আমি জিজ্ঞেস করিঃ 'রাসূলগণের সংখ্যা কত?' তিনি বলেনঃ 'তিনশো এবং দশের কিছু উপর, বড় দল।' একটি বর্ণনায় তিনশো পনের জন শব্দ (সংখ্যা) রয়েছে। আমি বলিঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উপর সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বলেনঃ 'আয়াতুল কুরসী।' اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ মুসনাদ-ই- আহমাদ।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেনঃ 'আমার ধনাগার হতে জ্বিনেরা ধন চুরি করে নিয়ে যেতো। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এজন্যে অভিযোগ পেশ করি। তিনি বলেন, যখন তুমি তাকে দেখবে তখন بِسْمِ اللّٰهِ أَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ পাঠ করবে। যখন সে এলো তখন আমি এটা পাঠ করে তাকে ধরে ফেললাম। সে বললঃ আমি আর আসবো না। সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেনঃ 'তোমার বন্দী কি করেছিল? আমি বললাম, তাকে আমি ধরে ফেলেছিলাম। কিন্তু সে আর না আসার অঙ্গীকার করায় তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বলেন, সে আবার আসবে। আমি তাকে এভাবে দু'তিন বার ধরে ফেলে অঙ্গীকার নিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেই। আমি তা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি বারবারই বলেন, সে আবার আসবে। শেষবার আমি তাকে বলি এবার আমি তোমাকে ছাড়বো না। সে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি যে, কোন জ্বিন ও শয়তান আপনার কাছে আসতেই পারবে না। আমি বললাম আচ্ছা, বলে দাও। সে বললো, ওটা 'আয়াতুল কুরসী।' আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি বলেন, সে মিথ্যাবাদী হলেও এটা সে সত্যই বলেছে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে كِتَابُ الْوَكَالَةِ وكِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ এবং صِفَتُ اِبْلِيْس-এর বর্ণনায়ও এই হাদীসটি হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে রমযানের যাকাতের উপর প্রহরী নিযুক্ত করেন। আমার নিকট একজন আগমনকারী আসে এবং ঐ মাল হতে কিছু কিছু উঠিয়ে নিয়ে সে তার চাদরে জমা করতে থাকে। আমি তাকে ধরে ফেলে বলি– 'তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নিয়ে যাবো। সে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অত্যন্ত অভাবী।' আমি তখন তাকে ছেড়ে দেই। সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার রাত্রের বন্দী কি করেছিল? আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে তার ভীষণ অভাবের অভিযোগ করে। তার প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হয়। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথায় বুঝলাম যে, সে সত্যই আবার আসবে। আমি পাহারা দিতে

থাকলাম। সে এলো এবং খাদ্য উঠাতে থাকলো। আবার আমি তাকে ধরে ফেলে বললামঃ 'তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে আবার ঐ কথাই বললো, 'আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি।' তার প্রতি আমার দয়া হলো। সুতরাং তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! তোমার রাত্রের বন্দীটি কি করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে অভাবের অভিযোগ করায় আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে।' আবার আমি তৃতীয় রাত্রে পাহারা দেই। অতঃপর সে এসে খাদ্য উঠাতে থাকলো। আমি তাকে বললামঃ 'এটাই তৃতীয় বার এবং এবারই শেষ। তুমি বার বার বলছো যে, আর আসবে না; অথচ আবার আসছো। সুতরাং আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবো।' তখন সে বললোঃ 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কতকগুলো কথা শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার সাধন করবেন।' আমি বললামঃ ঐগুলো কি? সে বললোঃ 'যখন আপনি বিছানায় শয়ন করবেন তখন আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ শেষ পর্যন্ত পড়ে নেবেন। তবে আল্লাহ আপনার রক্ষক হবেন এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। তারা ভাল জিনিসের খুবই লোভী। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ সে চরম মিথ্যাবাদী হলেও এটা সে সত্যই বলেছে। হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! তিন রাত তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছো তা জান কি? আমি বললামঃ না। তিনি বললেনঃ সে শয়তান -(সহীহ বুখারী শরীফ)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐগুলো খেজুর ছিলো এবং ওগুলো সে মুষ্টি ভরে ভরে নিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ তুমি শয়তানকে ধরবার ইচ্ছে করলে যখন সে দরজা খুলবে তখন سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ مُحَمَّدٌ পাঠ করবে।' শয়তান ওজর পেশ করে বলেছিলঃ আমি একটি দরিদ্র জ্বিনের ছেলে-মেয়ের জন্যে এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। (তাফসীরে ইবনে মিরদুওয়াই) সুতরাং ঘটনাটি তিনজন সাহাবী (রাঃ) কর্তৃত বর্ণিত হলো। তাঁরা হচ্ছেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ), হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ একটি মানুষের সঙ্গে একটি জ্বিনের সাক্ষাৎ ঘটে। জ্বিনটা মানুষটাকে বলেঃ এসো আমরা দু'জন মল্লযুদ্ধ করি। যদি তুমি আমাকে নীচে ফেলে দিতে পার তবে আমি তোমাকে এমন

একটি আয়াত শিখিয়ে দেবো যে, যদি তুমি বাড়ী গিয়ে ঐ আয়াতটি পাঠ কর তবে শয়তান তোমার বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারবে না। মল্লযুদ্ধ হলো এবং ঐ লোকটি জ্বিনটিকে নীচে ফেলে দেন। অতঃপর তিনি জ্বিনটিকে বলেনঃ 'তুমি দুর্বল ও কাপুরুষ। তোমার হাত কুকুরের মত। জ্বিনেরা কি সবাই এরকমই হয়ে থাকে, না তুমি একাই এরকম? সে বলেঃ তাদের মধ্যে আমিই তো শক্তিশালী। পুনরায় কুস্তি হলে সেবারেও জ্বিন নীচে পড়ে যায়। তখন জ্বিনটি বলেঃ ঐ আয়তটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশের সময় এই আয়াতটি পাঠ করে থাকে তার বাড়ী হতে শয়তান গাদার মত চীৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়। ঐ লোকটি ছিলেন হযরত উমার (রাঃ)। (কিতাবুল গারীব)।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কুরআন কারীমের মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআন মাজীদের সমস্ত আয়াতের নেতা। যে বাড়ীতে ওটা পাঠ করা হয় তথা হতে শয়তান পালিয়ে যায়। ঐ আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। (মুসতাদরাক-ই-হাকিম) জামেউত তিরমিযী শরীফের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক সূরার কুঁজ ও উচ্চতা রয়েছে। কুরআন মাজীদের চূড়া হচ্ছে সূরা-ই-বাকারা এবং তার মধ্যকার আয়াতুল কুরসীটি সমস্ত আয়াতের নেতা। হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ কুরআন মাজীদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত কোনটি? হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ আমার খুব ভাল জানা আছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছি যে, ওটা হচ্ছে 'আয়াতুল কুরসী' (তাফসীর -ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এ দুটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ইসমে আযম রয়েছে। একটিতো হচ্ছে আয়াতুল কুরসী এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে الٓمّٓ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ (মুসনাদ-ই-আহমাদ)। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইসমে আযম তিনটি সূরাতে রয়েছে। এই নামের বরকতে যে প্রার্থনাই আল্লাহ তা'আলার নিকট করা হয় তা গৃহীত হয়ে থাকে। ঐ সূরা তিনটি হচ্ছে সুরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা-ই-ত্বা-হা (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)।

দামেস্কের খতিব হযরত হিশাম বিন আম্মার (রঃ) বলেন যে, সূরা বাকারার ইসমে আযমের আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াত তিনটি এবং সূরা ত্বা-হার وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّوْمِ এই আয়াতটি।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে থাকে তাকে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন জিনিস বেহেশতে যেতে বাধা দেয় না। (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। ইমাম নাসাঈও (রঃ) এই হাদীসটি স্বীয় পুস্তক আ'মালুল ইয়াওমু ওয়াল লাইল -এর মধ্যে এনেছেন। ইবনে হিব্বান (রঃ) ও এটাকে স্বীয় সহীহর -এর মধ্যে এনেছেন। এই হাদীসের সনদ সহীহ বুখারীর শর্তের উপর রয়েছে। কিন্তু আবুল ফারাহ বিন জাওলী এই হাদীসটিকে মাওযু' বলেছেন। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও এই হাদীসটি রয়েছে। কিন্তু এর ইসনাদও দুর্বল। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা বিন ইমরানের (আঃ) নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করেনঃ 'প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে নেবে। যে ব্যক্তি এটা করবে আমি তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর এবং যিকিরকারী জিহ্বা দান করবো এবং তাকে নবীদের পুণ্য ও সিদ্দীকদের আমল প্রদান করবো। এর উপর সদা স্থিরতা শুধুমাত্র নবীদের দ্বারা বা সিদ্দীকদের দ্বারা সম্ভবপর হয়ে থাকে কিংবা ঐ বান্দাদের দ্বারা সম্ভবপর হয়ে থাকে যাদের অন্তর আমি ঈমানের জন্যে পরীক্ষা করে নিয়েছি বা নিজের পথে তাদেরকে শহীদ করার ইচ্ছে করেছি।' কিন্তু এই হাদীসটি অত্যন্ত 'মুনকার' বা অস্বীকার্য।

জামেউত তিরমিযী শরীফে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা-হা-মীম আল মু'মিনকে إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসীকে সকালে পড়ে নেবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়ে নেবে সে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর হিফাযতে থাকবে।' কিন্তু এই হাদীসটি গারীব। এই আয়াতের ফযীলত সম্বন্ধীয় আরও বহু হাদীস রয়েছে। কিন্তু ওগুলোর সনদে দুর্বলতা রয়েছে বলে এবং সংক্ষেপ করাও আমাদের উদ্দেশ্য বলে আমরা এখানে ঐ হাদীসগুলো আর পেশ করলাম না।

এই পবিত্র আয়াতে পৃথক পৃথক অর্থ সম্বলিত দশটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের বর্ণনা রয়েছে যে, সৃষ্টজীবের তিনিই একমাত্র আল্লাহ। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে যে, তিনি চির জীবন্ত, তাঁর উপর কখনও মৃত্যু আসবে না। তিনি চির বিরাজমান। কাইউমুন শব্দটির দ্বিতীয় পঠন কাইয়্যামুনও রয়েছে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন লোকই কোন জিনিস প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ

অর্থাৎ 'তাঁর (ক্ষমতার) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটা নিদর্শন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তাঁরই হুকুমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' (৩০ঃ ২৫)

অতঃপর বলা হচ্ছে, না কোন ক্ষয়-ক্ষতি তাঁকে স্পর্শ করে, না কোনও সময় তিনি স্বীয় জীব হতে উদাসীন থাকেন। বরং প্রত্যেকের কাজের উপর তাঁর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। প্রত্যেকের অবস্থা তিনি দেখতে রয়েছেন। সৃষ্টজীবের কোন অণু-পরমাণুও তাঁর হিফাযত ও জ্ঞানের বাইরে নেই। তন্দ্রা ও নিদ্রা কখনও তাঁকে স্পর্শ করে না। সুতরাং তিনি ক্ষণিকের জন্যেও সৃষ্টজীব হতে উদাসীন থাকেন না।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে সাহাবীদেরকে (রাঃ) চারটি কথার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কখনও শয়ন করেন না আর পবিত্র সত্ত্বার জন্যে নিদ্রা আদৌ শোভনীয় নয়। তিনি দাঁড়ি-পাল্লার রক্ষক। যার জন্য চান ঝুঁকিয়ে দেন এবং যার জন্য চান উঁচু করে দেন। সারা দিনের কার্যাবলী রাত্রের পূর্বে এবং রাত্রির আমল দিনের পূর্বে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়। তাঁর সামনে রয়েছে আলো বা আগুনের পর্দা। সেই পর্দা সরে গেলে যতদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত সমস্ত জিনিস তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে রয়েছে, হযরত ইক্রামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা শয়ন করেন কি?' তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের উপর ওয়াহী পাঠান যে, তারা যেন হযরত মূসাকে (আঃ) উপর্যুপরি তিন রাত্রি জাগিয়ে রাখেন। তাঁরা তাই করেন। পরপর তিনটি রাত ধরে তাঁরা তাঁকে মোটেই ঘুমোতে দেননি। এরপরে তাঁর হাতে দু'টো বোতল দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, তিনি যেন ঐদু'টো আঁকড়ে ধরে রাখেন। তাঁকে আরও সতর্ক করে দেয়া হয়, যেন ওদু'টো পড়েও না যায় এবং ভেঙ্গেও না পড়ে। তিনি বোতল দু'টো ধরে রাখেন। কিন্তু দীর্ঘ জাগরণ ছিল বলে ক্ষণপরে তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং তারপরেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। ফলে বোতল দু'টি তাঁর অজ্ঞাতসারে নিদ্রাভিভূত অবস্থায় হাত থেকে খসে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এতদ্বারা তাকে বলা হলো যে, যখন একজন তন্দ্রাভিভূত ও ঘুমন্ত ব্যক্তি সামান্য দু'টো বোতল ধরে রাখতে পারলো না, তখন যদি আল্লাহ তা'আলার তন্দ্রা আসে বা তিনি নিদ্রা যান তবে আকাশ ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ কিরূপে

সম্ভব হবে? কিন্তু এটা বানী ইসরাঈলের রেওয়ায়াত। সুতরাং এটা মনেও তেমন ধরে না। কেননা, এটা অসম্ভব কথা যে, হযরত মূসার (আঃ) মত একজন মর্যাদাবান নবী এবং মহান আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ব্যক্তি আল্লাহর ঐ গুণ হতে অজ্ঞাত থাকবেন ও তাঁর সন্দেহ থাকবে যে, আল্লাহ শুধু জেগেই থাকেন না, নিদ্রাও যান। এর চেয়েও বেশী গারীব ঐ হাদীসটি যা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তা হল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ঘটনাটি মিম্বরের উপর বর্ণনা করেছেন। এটা অত্যন্ত গরীব হাদীস এবং স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, এটা নবীর কথা নয় বরং বানী ইসরাঈলের কথা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এইরূপ বর্ণিত আছে, 'বানী ইসরাঈল বা হযরত ইয়াকুবের বংশধরগণই হযরত মূসা (আঃ)-কে এই প্রশ্ন করেছিলো যে, তাঁর প্রভু ঘুমান কি না। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে দু'টি বোতল হাতে ধরে রাখতে বলেন। কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়ার কারণে বোতল দু'টো হঠাৎ করে তাঁর হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেনঃ 'হে মূসা! যদি আমি ঘুমাতাম তবে আকাশ ও পৃথিবী পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতো, যেমন বোতল দু'টো তোমার হাত থেকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর আয়াতুল কুরসী অবতীর্ণ করেন। এতে বলা হয় যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস তাঁরই দাসত্বে নিয়োজিত রয়েছে এবং সবাই তাঁরই সাম্রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমুদয় জিনিস 'রাহ্মানের' দাসত্বের কার্যে উপস্থিত রয়েছে। তাদের সকলকেই আল্লাহ এক এক করে গণনা করে রেখেছেন এবং ঘিরে রেখেছেন। সমস্ত সৃষ্টজীব একে একে তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। কেউ এমন নেই যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারও জন্য সুপারিশ করতে পারেন।' যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ 'আকাশসমূহে বহু ফেরেশতা রয়েছে; কিন্তু তাদের সুপারিশও কোন কাজে আসবে না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি হিসেবে যদি কারও জন্যে অনুমতি দেয়া হয় সেটা অন্য কথা। অন্য স্থানে রয়েছে ঃ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى অর্থাৎ 'তারা কারও জন্যে সুপারিশ করে না; কিন্তু তার জন্য করে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট (২১ঃ ২৮)।' এখানেও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহা-মর্যাদার কথা বর্ণিত হচ্ছে। তাঁর অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া কারও সাহস নেই যে, সে কারও সুপারিশের জন্যে মুখ খোলে। হাদীস শরীফে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আমি আল্লাহ তা'আলার আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ পাক যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এই অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর বলবেনঃ 'মস্তক উত্তোলন কর। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে, সুপারিশ কর, তা গৃহীত হবে।' তিনি বলেনঃ 'আমাকে সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হবে

এবং তাদেরকে আমি বেহেশতে নিয়ে যাব। সেই আল্লাহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে রয়েছে।' যেমন অন্য জায়গায় ফেরেশতাদের উক্তি নকল করা হয়েছেঃ 'আমরা তোমার প্রভুর নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারি না। আমাদের সামনে ও পিছনের সমস্ত জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে এবং তোমার প্রভু ভুল-ক্রটি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য মনীষী হতে নকল করা হয়েছে 'কুরসী' শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে দু'টি পা রাখার স্থান।'

একটি মারফু' হাদীসেও এটাই বর্ণিত আছে এবং এও রয়েছে যে, ওর পরিমাপ আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও মারূফু'রূপে এটাই বর্ণিত আছে বটে কিন্তু মারফু' হওয়া সাব্যস্ত নয়।

আবূ মালিক (রঃ) বলেন যে, কুরসী আরশের নীচে রয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে,আকাশ ও পৃথিবী কুরসীর মধ্যস্থলে রয়েছে এবং কুরসী আরশের সম্মুখে রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যদি ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং সবকে মিলিত করে এক করে দেয়া হয় তবে তা কুরসীর তুলনায় ঐরূপ যেরূপ জনশূন্য মরু প্রান্তরে একটি বৃত্ত।'

ইবনে জারীর (রঃ) হযরত উবাই (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত উবাই) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ সাতটি আকাশ কুরসীর মধ্যে এরূপই যেরূপ ঢালের মধ্যে সাতটি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)।'

হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আরশের কুরসী ঐরূপ যেরূপ জনশূন্য মরু প্রান্তরে একটি লোহার বৃত্ত।'

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরসী সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কুরসীর তুলনায় সাতটি আকাশ ও পৃথিবী ঐরূপ যেরূপ মরু প্রান্তরে একটি বৃত্ত। নিশ্চয় কুরসীর উপরে আরশের মর্যাদা ঐরূপ যেরূপ মরুভূমির মর্যাদা বৃত্তের উপরে।'

হযরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি স্ত্রী লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেঃ 'আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু যেরূপ (মাল বোঝাই করায়) নতুন গদি চড়চড় করে সেইরূপ কুরসী আল্লাহর

শ্রেষ্ঠত্বের ভারে চড়চড় করছে।' এই হাদীসটি বহু সনদে বহু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে বটে; কিন্তু কোন সনদে কোন বর্ণনাকারী অপ্রসিদ্ধ রয়েছে, কোনটি মুরসাল, কোনটি মাওকুফ, কোনটি খুবই গারীব, কোনটিতে কোন বর্ণনাকারী লুপ্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে 'গরীব' হচ্ছে হযরত যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি যা সুনান-ই-আবূ দাঊদের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং ঐ বর্ণনাগুলোও রয়েছে যেগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কুরসীকে ফায়সালার জন্যে রাখা হবে। প্রকাশ্য কথা এই যে, এই আয়াতে এটা বর্ণিত হয়নি।

ইসলামী দর্শন বেত্তাগণ বলেন যে, কুরসী হচ্ছে অষ্টম আকাশ যাকে فَلَكُ ثَوَابِتُ বলা হয়। তার উপর নবম আকাশ আর একটি রয়েছে যাকে فَلَكِ اَثِير এবং اَطْلَسُ বলা হয়। কিন্তু অন্যান্যগণ এটাকে খণ্ডন করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, কুরসীটাই হচ্ছে আরশ্। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, কুরসী ও আরশ এক জিনিস নয়; বরং কুরসী অপেক্ষা আরশ অনেক বড়। কেননা এর সমর্থনে বহু হাদীস এসেছে। আল্লামা ইবনে জারীর (রাঃ) তো এই ব্যাপারে হযরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটির উপরই ভরসা করে রয়েছে। কিন্তু আমার মতে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—এগুলোর সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না, বরং এগুলো সংরক্ষণ তাঁর নিকট অতীব সহজ। তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবগত রয়েছেন। সমুদয় বস্তুর উপর তিনি রক্ষকরূপে রয়েছেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর সামনে অতি তুচ্ছ। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং সবাই তাঁর নিকট অতি দরিদ্র। তিনি ঐশ্বর্যশালী এবং অতীব প্রশংসিত। তিনি যা চান তাই করে থাকেন। তাঁকে হুকুম দাতা কেউ নেই এবং তাঁর কার্যের হিসাব গ্রহণকারীও কেউ নেই। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ব্যাপক ক্ষমতাবান। প্রত্যেক জিনিসেরই মালিকানা তাঁর হাতে রয়েছে। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ 'তিনি সমুন্নত ও মহীয়ান।' এই আয়াতটিতে এবং এই প্রকারের আরও বহু আয়াতে ও সহীহ হাদীসসমূহে মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে যত কিছু এসেছে এগুলোর অবস্থা জানবার চেষ্টা না করে এবং অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা না করে বরং ঐগুলোর উপর বিশ্বাস রাখাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের পূর্ববর্তী মহা মনীষীগণ এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন।

٢٥٦- لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

**২৫৬। ধর্ম সম্বন্ধে বল প্রয়োগ নেই; নিশ্চয় ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে,;অতএব, যে ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়। এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।**

---

এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন–'কাউকে জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করো না। ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে এবং ওর দলিল প্রমাণাদি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং জোর জবরদস্তির কি প্রয়োজন? যাকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করবেন, যার বক্ষ খুলে দেবেন, যার অন্তর উজ্জ্বল হবে এবং যার চক্ষু দৃষ্টিমান হবে সে আপনা আপনিই ইসলামের প্রেমে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু যার অন্তর-চক্ষু অন্ধ এবং কর্ণ বধির সে এর থেকে দূরে থাকবে। অতঃপর যদি তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা হয়, তাতেই বা লাভ কি? তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'কাউকেও ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করো না।' এই আয়াতটির শান-ই-নুযুল এই যে, মদীনার মুশরিকরা স্ত্রী লোকদের সন্তানাদি না হলে তারা 'নযর' মানতোঃ 'যদি আমাদের ছেলে-মেয়ে হয় তবে আমরা তাদেরকে ইয়াহূদী করতঃ ইয়াহূদীদের নিকট সমর্পণ করে দেবো।' এইভাবে তাদের বহু সন্তান ইয়াহূদীদের নিকট ছিল। অতঃপর এই লোকগুলো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী রূপে গণ্য হয়। এদিকে ইয়াহূদীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বাঁধে। অবশেষে তাদের আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কৃত করার নির্দেশ দেন। সেই সময় মদীনার এই আনসার মুসলমানদের যেসব ছেলে ইয়াহূদীদের নিকট ছিল তাদেরকে নিজেদের আকর্ষণে মুসলমান করে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা ইয়াহূদীদের নিকট হতে তাদেরকে ফিরিয়ে চান। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদেরকে বলা হয়– 'তোমরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করো না।

অন্য একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, আনসারদের 'বানু সলিম বিন আউফ' গোত্রের মধ্যে 'হুসাইনী' (রাঃ) নামক একটি লোক ছিলেন। তাঁর দু'টি ছেলে খ্রীষ্টান ছিল। আর তিনি নিজে মুসলমান ছিলেন। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট আরয করেন যে, তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি তাঁর ছেলে দু'টিকে জোর করে মুসলমান করে নেবেন। কেননা তারা স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টান ধর্ম হতে ফিরে আসতে চায় না। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় এতটুকু বেশীও রয়েছে যে, খ্রীষ্টানদের এক যাত্রী দল ব্যবসার জন্য সিরিয়া হতে কিশমিশ নিয়ে এসেছিল। তাদের হাতে এই দুটি ছেলে খ্রীষ্টান হয়ে যায়। ঐ যাত্রী দল চলে যেতে আরম্ভ করলে এরাও তাদের সাথে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাদের পিতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করেন এবং বলেনঃ আপনি অনুমতি দিলে আমি এদেরকে কিছু শাস্তি দিয়ে জোর পূর্বক মুসলমান করে নেই। নতুবা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আপনাকে লোক পাঠাতে হবে। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত উমার (রাঃ)-এর আসবাক নামক ক্রীতদাসটি খ্রীষ্টান ছিল। তিনি তার নিকট ইসলাম পেশ করতেন; কিন্তু সে অস্বীকার করতো। তিনি তখন বলতেনঃ এটা তোমার ইচ্ছা। ইসলাম জোর-জবরদস্তি হতে বাধা দিয়ে থাকে। আলেমদের একটি বড় দলের ধারণা এই যে,এই আয়াতটি ঐ আহলে কিতাবের ব্যাপারে প্রযোজ্য যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের রহিতকরণ ও পরিবর্তনের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিজিয়া প্রদানে সম্মত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে, যুদ্ধের আয়াত এই আয়াতটিকে রহিত করেছে। এখন সমস্ত অমুসলমানকে এই পবিত্র ধর্মের প্রতি আহবান করা অবশ্য কর্তব্য। যদি কেউ এই ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করে এবং মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করতঃ জিজিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তবে অবশ্যই মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ অতিসত্বরই তোমাদেরকে ভীষণ শক্তিশালী এক সম্প্রদায়ের দিকে আহবান করা হবে, হয় তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'হে নবী (সঃ)! কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন কর।' অন্য জায়গায় রয়েছেঃ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের আশে-পাশের কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর তারা তোমাদের মধ্যে পাবে কঠোরতা এবং বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ খোদাভীরুদের সাথেই রয়েছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছেঃ তোমার প্রভু ঐ লোকদের উপর বিস্মিত হন যাদেরকে শৃংখলে আবদ্ধ করে বেহেশতের দিকে হেঁচড়িয়ে টেনে আনা হয়, অর্থাৎ ঐ সব কাফির, যাদেরকে বন্দী অবস্থায় শৃংখলে আবদ্ধ করে যুদ্ধের মাঠ হতে টেনে আনা হয়। অতঃপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং এর ফলে তাদের ভিতর ও বাহির ভাল হয়ে যায় ও বেহেশতের যোগ্য হয়। মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মুসলমান হয়ে যাও।' সে বলেঃ আমার মন চায় না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ মন না চাইলেও মুসলমান হও। এই হাদীসটি 'সুলাসী'। অর্থাৎ নবী (সঃ) পর্যন্ত এতে তিনজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা মনে করা উচিত হবে না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বাধ্য করেছিলেন। বরং তাঁর এই কথার ভাবার্থ হচ্ছেঃ তুমি কালেমা পড়ে নাও, এক দিন হয়তো এমনও আসবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর খুলে দিবেন এবং তুমি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তুমি হয়তো উত্তম নিয়ম ও খাঁটি আমলের তাওফিক লাভ করবে।

যে ব্যক্তি প্রতিমা, বাতিল উপাস্য ও শয়তানী কথা পরিত্যাগ করতঃ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হয় এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে সে সঠিক পথের উপর রয়েছে। হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলেন যে, جِبْت শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে যাদু এবং طَاغُوْت শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শয়তান। বীরত্ব ও ভীরুতা এই দু'টি হচ্ছে উষ্ট্রের দু'দিকের দু'টি সমান বোঝা যা মানুষের মধ্যে রয়েছে। একজন বীর পুরুষ একটি অপরিচিত লোকের সাহায্যার্থে জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। পক্ষান্তরে একজন কাপুরুষ আপন মায়ের জন্যেও সম্মুখে অগ্রসর হতে সাহসী হয় না। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা হচ্ছে তার ধর্ম। মানুষের সত্য বংশ হচ্ছে তার উত্তম চরিত্র, সে যে বংশেরই লোক হোক না কেন। হযরত উমারের (রাঃ) طَاغُوْت -এর অর্থ 'শয়তান' লওয়া যথার্থই হয়েছে। কেননা, সমস্ত মন্দ কার্যই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেগুলো অজ্ঞতা যুগের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন প্রতিমা পূজা, তাদের কাছে অভাব অভিযোগ পেশ করা এবং বিপদের সময় তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'তারা দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরলো।' অর্থাৎ ধর্মের সুউচ্চ ও শক্ত ভিত্তিকে গ্রহণ করলো যা কখনও ছিঁড়ে পড়বে না। عُـــرْوَة وُثْـقـــى শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঈমান, ইসলাম, আল্লাহর একত্ববাদ, কুরআন ও আল্লাহর পথের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে শত্রুতা

করা। এই কড়া তার বেহেশতে প্রবেশ লাভ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়বে না। অন্য স্থানে রয়েছেঃ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে (১৩ঃ ১১)।' মুসনাদ-ই-আহ্মাদের একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত কায়েস বিন উবাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন 'আমি মসজিদ-ই-নব্বীতে (সঃ) অবস্থান করছিলাম। এমন সময় তথায় এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। যাঁর মুখমণ্ডলে খোদাভীতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি হালকাভাবে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। জনগণ তাঁকে দেখে মন্তব্য করেনঃ এই লোকটি বেহেশ্তী। তিনি মসজিদ হতে বের হলে আমিও তাঁর পিছনে গমন করি। তাঁর সাথে আমার কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে বলিঃ 'আপনার আগমনকালে জনগণ আপনার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছিল। তিনি বলেনঃ সুবহানাল্লাহ! কারও এইরূপ কথা বলা উচিত নয় যা তার জানা নেই। তবে, হ্যাঁ, এইরূপ কথা তো অবশ্যই রয়েছে যে, আমি একবার স্বপ্নে দেখি, আমি যেন একটি সবুজ শ্যামল ফুল বাগানে রয়েছি। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে একটি লোহার স্তম্ভ রয়েছে যা ভূমি হতে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে। ওর চুড়ায় একটি কড়া রয়েছে। আমাকে ওর উপরে যেতে বলা হয়। আমি বলি যে, আমি তো উঠতে পারবো না। অতঃপর এক ব্যক্তি আমাকে ধরে থাকে এবং আমি অতি সহজেই উঠে যাই। তারপর আমি কড়াটিকে ধরে থাকি। লোকটি আমাকে বলেঃ খুব শক্ত করে ধরে থাক। কড়াটি আমি ধরে রয়েছি এই অবস্থাতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমি আমার এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করি। তিনি বলেনঃ 'ফুলের বাগানটি হচ্ছে ইসলাম, স্তম্ভটি ধর্মের স্তম্ভ এবং কড়াটি হচ্ছে عُرْوَةٌ وُثْقٰى তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই লোকটি হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)। এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের ঐ হাদীসটিতেই রয়েছে যে, তিনি সেই সময় বৃদ্ধ ছিলেন এবং লাঠির উপর ভর করে মসজিদে নব্বীতে (সঃ) এসেছিলেন এবং একটি স্তম্ভের পিছনে নামায পড়েছিলেন। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ বেহেশত আল্লাহর জিনিস। তিনি যাকে চান তাকেই তথায় নিয়ে যান। তিনি স্বপ্নের বর্ণনায় বলেছিলেনঃ এক ব্যক্তি আমাকে একটি লম্বা চওড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাঠে নিয়ে যান। তথায় আমি বাম দিকে চলতে থাকলে তিনি আমাকে বলেনঃ তুমি এইরূপ

নও। আমি তখন ডান দিকে চলতে থাকি। হঠাৎ সুউচ্চ পাহাড় আমার চোখে পড়ে। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে উপরে উঠিয়ে নেন এবং আমি চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাই। তথায় আমি একটি উঁচু লোহার স্তম্ভ দেখতে পাই। ওর আগায় একটি সোনার কড়া ছিল। আমাকে তিনি ঐ স্তম্ভের উপর চড়িয়ে দেন। আমি ঐ কড়াটি ধরে নেই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ খুব শক্ত করে ধরেছো তো?' আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি সজোরে ঐ স্তম্ভের উপর পায়ের আঘাত করতঃ বেরিয়ে যান এবং কড়াটি আমার হাতে থেকে যায়। এই স্বপ্নটি আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি বলেনঃ এটা খুব উত্তম স্বপ্ন। মাঠটি হচ্ছে পুনরুত্থানের মাঠ। বাম দিকের পথটি হচ্ছে দোযখের পথ। তুমি তথাকার লোক নও। ডান দিকের পথটি হচ্ছে বেহেশতের পথ। সুউচ্চ পর্বতটি হচ্ছে ইসলামের শহীদদের স্থান। কড়াটি হচ্ছে ইসলামের কড়া। মৃত্যু পর্যন্ত ওটাকে শক্ত করে ধরে থাকো। এর পরে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ আমার আশা তো এই যে, আল্লাহ আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবেন।

**২৫৭। আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে শয়তান তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই নরকাগ্নির অধিবাসী- ওর মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।**

٢٥٧- اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ ع

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে তিনি শান্তির পথ প্রদর্শন করবেন এবং সন্দেহ, কুফর ও শিরকের অন্ধকার হতে বের করে সত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। শয়তানেরা কাফিরদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, কুফর ও শিরককে সুন্দর ও সজ্জিত আকারে প্রদর্শন করতঃ ঈমান ও তাওহীদ হতে সরিয়ে রাখে এবং সত্যের আলো হতে সরিয়ে অসত্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এরাই

কাফির ও এরাই নরকের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। نُوْرٌ শব্দটিকে এক বচন এবং ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহু বচন আনার কারণ এই যে, হক, ঈমান ও সত্যের পথ একটিই। কিন্তু কুফর কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। কুফরের অনেক শাখা রয়েছে ঐগুলো সবই বাতিল ও অসত্য । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

অর্থাৎ 'আমার সঠিক পথ এটাই, সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর; অন্যান্য পথসমূহে চলো না, নতুবা তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে; এভাবেই তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা বাঁচতে পার (৬ঃ ১৫৩)।' আর এক জায়গায় রয়েছেঃ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ অর্থাৎ 'এবং তিনি অন্ধকারসমূহ ও আলো করেছেন।' এই প্রকারের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সত্যের একটিই পথ এবং বাতিলের বিভিন্ন পথ রয়েছে। হযরত আইয়ুব বিন খালিদ (রাঃ) বলেন যে,ইচ্ছা পোষণকারীদেরকে অথবা পরীক্ষাকৃতদেরকে উঠানো হবে। অতঃপর যার কামনা শুধুমাত্র ঈমানই হবে সে ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ চেহারা বিশিষ্ট হবে; আর যার কুফরের বাসনা হবে সে কৃষ্ণ ও কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট হবে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।

---

২৫৮। তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি–যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বলেছিল, আমার প্রভু তিনি যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন; সে বলেছিল আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি; ইবরাহীম বলেছিল নিশ্চয় আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন

٢٥٨- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ

الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

করেন, কিন্তু তুমি ওকে পশ্চিম দিক হতে আনয়ন কর; এতে সেই অবিশ্বাসকারী হতবুদ্ধি হয়েছিল; এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

এই বাদশা'হর নাম ছিল নমরূদ বিন কিনআন বিন কাউস বিন সাম বিন নূহ। তাঁর রাজধানী ছিল বাবেল। তাঁর বংশলতার মধ্যে কিছু মতভেদও রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধিপতি চারজন। তন্মধ্যে দু'জন মুসলমান ও দু'জন কাফির। মুসলমান দু'জন হচ্ছেন হযরত সুলাইমান বিন দাউদ (আঃ) ও হযরত যুলকারনাইন এবং কাফির দু'জন হচ্ছে নমরূদ ও বখতে নাসর। ঘোষণা হচ্ছে যে, হে নবী (সঃ)! তুমি স্বচক্ষে ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? এই লোকটি নিজেকে খোদা বলে দাবী করেছিল। যেমন তারপরে ফিরআউনও তার নিজস্ব লোকদের মধ্যে এই দাবী করেছিলঃ 'আমি ছাড়া তোমাদের যে অন্য কোন খোদা আছে তা আমার জানা নেই' তার রাজত্ব দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিল বলে তার মস্তিষ্কে ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করেছিল এবং তার স্বভাবের মধ্যে অবাধ্যতা, অহংকার এবং আত্মগরিমা ঢুকে পড়েছিল। কারও কারও মতে সে সুদীর্ঘ চারশো বছর ধরে শাসন কার্য চালিয়ে আসছিল। সে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহর অস্তিত্বের উপর প্রমাণ উপস্থিত করতে বললে তিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের আনয়ন এবং অস্তিত্ব হতে অস্তিত্বহীনতায় পরিণত করণ এই দলীল পেশ করেন। এটা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দলীল ছিল। প্রাণীসমূহের পূর্বে কিছুই না থাকা এবং পুনরায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া; এই প্রাণীসমূহের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্পষ্ট দলীল এবং তিনিই আল্লাহ। নমরূদ উত্তরে বলেঃ এটাতো আমিও করতে পারি। এই কথা বলে সে দু'জন লোককে ডেকে পাঠায় যাদের উপর মৃত্যু দন্ডাদেশ জারী করা হয়েছিল। অতঃপর সে একজনকে হত্যা করে এবং অপরজনকে ছেড়ে দেয়। এই উত্তর ও দাবী যে কত অবাস্তব ও বাজে ছিল তা বলাই বাহুল্য। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তো আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ এই বর্ণনা করেন যে, তিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর ধ্বংস করেন। আর নমরূদ তো ঐ লোক দু'টিকে সৃষ্টি করেনি এবং তাদের অথবা তার নিজের জীবন ও মৃত্যুর উপর তার কোন ক্ষমতাই নেই। কিন্তু শুধু অজ্ঞদেরকে প্ররোচিত করার জন্য এবং বাজিমাৎ

করার উদ্দেশ্যে সে যে ভুল করছে ও তর্কের মূলনীতির উল্টো কাজ করছে এটা জানা সত্ত্বেও একটা কথা বানিয়ে নেয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাকে বুঝে নেন এবং সেই নির্বোধের সামনে এমন প্রমাণ পেশ করেন যে, বাহ্যতঃ যেন সে ওর সাদৃশ্য মূলক কার্যে অকৃতকার্য হয়। তাই তাকে বলেনঃ তুমি যখন সৃষ্টি করা ও মৃত্যু দান করার ক্ষমতা রাখার দাবী করছো তখন সৃষ্ট বস্তুর উপরেও তোমার আধিপত্য থাকা উচিত। আমার প্রভু তো এই ক্ষমতা রাখেন যে, সূর্যকে তিনি পূর্ব গগনে উদিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে আমার প্রভুর আদেশ পালন করতঃ পূর্ব দিকেই উদিত হচ্ছে। এখন তুমি তাকে নির্দেশ দাও যে, সে যেন পশ্চিম গগনে উদিত হয়। এবার সে বাহ্যতঃ ও কোন ভাঙ্গাচুরা উত্তর দিতে পারলো না। বরং সে হতভম্ব হয়ে নিজের অপারগতা স্বীকার করতে বাধ্য হলো এবং আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ তার উপর পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হলো। কিন্তু সুপথ প্রাপ্তি তার ভাগ্যে ছিল না বলে সে সুপথে আসতে পারলো না। এইরূপ বদ-স্বভাবের লোককে আল্লাহ তা'আলা কোন প্রমাণ বুঝবার তাওফীক দেন না। ফলে তারা সত্যকে কখনও আলিঙ্গন করে না। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এই জগতেও তাদের কঠিন শাস্তি হয়ে থাকে। কোন কোন তর্কশাস্ত্রবিদ বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এখানে একটি স্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বরং প্রথম দলীলটি ছিল দ্বিতীয় দলীলের ভূমিকা স্বরূপ। এ দু'টোর দ্বারাই নমরূদের দাবীর অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যুদানই হচ্ছে প্রকৃত দলীল। ঐ অজ্ঞান ও নির্বোধ এই দাবী করেছিল বলেই এই প্রমাণ পেশ করাও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র জন্ম ও মৃত্যুদানের উপরই সক্ষম নন বরং দুনিয়ার বুকে যতগুলো সৃষ্ট বস্তু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। কাজেই নমরূদকেও বলা হচ্ছে যে, সেও যখন জন্ম ও মৃত্যু দানের দাবী করছে তখন সূর্যও তো একটি সৃষ্ট বস্তু, কাজেই সে তার নির্দেশমত কেন পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে উদিত হবে না? এই যুক্তির বলে হযরত ইবরাহীম (আঃ)খোলাখুলিভাবে নমরূদকে পরাস্ত করেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর করে দেন।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) অগ্নির মধ্য হতে বের হয়ে আসার পর নমরূদের সাথে তাঁর এই তর্ক হয়েছিল। এর পূর্বে ঐ অত্যাচারী রাজার সাথে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন সাক্ষাৎ হয়নি। হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) বলেন যে, সেই সময় দুর্ভিক্ষ পড়েছিল। জনগণ মনরূদের নিকট হতে শস্য নিতে আসতো। হযরত ইবরাহীম (আঃ)ও তার নিকট যান।

তথায় তার সাথে তাঁর এই তর্ক হয়। সেই পাপাচারী তাঁকে শস্য দেয়নি। তিনি শূন্য হস্তে ফিরে আসেন। বাড়ীর নিকটবর্তী হয়ে তিনি দু'টি বস্তায় বালু ভরে নেন যাতে বাড়ীর লোক মনে করে যে, তিনি কিছু নিয়ে এসেছেন। বাড়ীতে পৌঁছেই তিনি বস্তা দু'টি রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর পত্নী বিবি সারা বস্তা দু'টি খুলে দেখেন যে, ও দু'টো উত্তম খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি আহার্য প্রস্তুত করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জেগে উঠে দেখেন যে, খাদ্য প্রস্তুত রয়েছে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ খাদ্য দ্রব্য কোথা হতে এসেছে?' স্ত্রী উত্তরে বলেনঃ 'আপনি যে খাদ্যপূর্ণ বস্তা দু'টি এনেছিলেন তা হতেই এইগুলো বের করেছিলাম। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বুঝে নেন যে, এই বরকত লাভ আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়েছে এবং এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার করুণারই পরিচায়ক।

ঐ লম্পট রাজার কাছে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তার নিকট এসে তাকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে আহবান জানান। কিন্তু সে তা অস্বীকার করে। ফেরেশতা তাকে দ্বিতীয় বার আহবান করেন। কিন্তু এবারও সে প্রত্যাখ্যান করে। তৃতীয়বার তিনি তাকে আল্লাহর দিকে আহবান জানান। কিন্তু এবারেও সে অস্বীকৃতিই জানায়। এইভাবে বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ফেরেশতা তাকে বলেনঃ আচ্ছা তুমি তোমার সেনাবাহিনী ঠিক কর, আমিও আমার সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। নমরূদ এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে সূর্যোদয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। আর এদিকে আল্লাহ তা'আলা মশাসমূহের দরজা খুলে দেন। বড় বড় মশাগুলো এত অধিক সংখ্যায় আসে যে, সূর্যও জনগণের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। মহান আল্লাহর এই সেনাবাহিনী নমরূদের সেনাবাহিনীর উপর পতিত হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাদের রক্ত তো পান করেই এমনকি তাদের মাংস পর্যন্তও খেয়ে নেয়। এইভাবে নমরূদের সমস্ত সৈন্য সেখানেই ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ মশাগুলোরই একটি নমরূদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে এবং চারশো বছর পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক চাটতে থাকে। এমন কঠিন শাস্তির মধ্যে সে (পাপাত্মা নমরূদ) পড়ে থাকে যে, ওর চেয়ে মরণ হাজার গুণে উত্তম ছিল। সে (পাপী রাজা নমরূদ) প্রাচীরে ও পাথরে তার মস্তিষ্ক ঠুকে ঠুকে ফিরছিল এবং হাতুড়ি দ্বারা মাথায় মারিয়ে নিচ্ছিল। এইভাবে ঐ হতভাগ্য ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। আল্লাহর উপর আস্থাহীন পাপাত্মা বাবেল রাজা নমরূদের এইভাবেই জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

২৫৯। অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ- যে কোন জনপদ অতিক্রম করছিল এবং তা ছিল শূন্য- নিজ ভিত্তির উপর পতিত, সে বললো-এই নগরের মৃত্যুর পর আল্লাহ আবার তাকে জীবন দান করবেন কিরূপে? অনন্তর আল্লাহ তাকে একশো বছরের জন্যে মৃত্যু দান করলেন, তৎপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন, তিনি বললেন, এ অবস্থায় তুমি কতক্ষণ অতিবাহিত করেছো? সে বললো একদিন অথবা একদিনের কিয়দংশ অতিবাহিত করেছি; তিনি বললেন-বরং তুমি শত বর্ষ অতিবাহিত করেছো: অতএব তোমার খাদ্য পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর, ওটা বিকৃত হয়নি এবং তোমার গর্দভের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং যেহেতু আমি তোমাকে মানবের জন্যে নিদর্শন করতে চাই- আরও দর্শন কর অস্থিপুঞ্জের পানে, ওকে কিরূপে আমি সংযুক্ত করি; তৎপর ওকে মাংসাবৃত্ত করি। অনন্তর যখন ওটা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল তখন সে বললো-আমি জানি যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٥٩- اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ
وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ
قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهٗ ۭ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۭ قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۭ
قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ
فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ
اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا
ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۭ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

উপরে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) তর্কের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ওটার সাথে এর সংযোগ রয়েছে। এই অতিক্রমকারী হয় হযরত উযায়ের (আঃ) ছিলেন যেমন এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে, না হয় তিনি ছিলেন আরমিয়া বিন খালকিয়া এবং এটা হযরত খিয্র (আঃ)-এর নাম ছিল। কিংবা ঐ অতিক্রমকারী ছিলেন হযরত হিযকীল বিন বাওয়া (আঃ) অথবা তিনি বানী ইসরাঈলের মধ্যেকার এক ব্যক্তি ছিলেন। এই জনপদ ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। এই উক্তিটিরই প্রসিদ্ধি রয়েছে। রাজা বখতে নাসর যখন ঐ জনবসতি ধ্বংস করে এবং জনগণকে তরবারির নীচে নিক্ষেপ করে তখন ঐ জনবসতি একেবারে শশ্মানে পরিণত হয়। এরপর ঐ মহান ব্যক্তি সেখান দিয়ে গমন করেন। যখন তিনি দেখেন যে, জনপদটি একেবারে শশ্মান হয়ে গেছে, তথায় না আছে কোন বাড়ীঘর,না আছে কোন মানুষ! তথায় অবস্থানরত অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন যে, এমন জাঁকজমকপূর্ণ শহর যেভাবে ধ্বংস হয়েছে এটা কি আর কোন দিন জনবসতি পূর্ণ হতে পারে! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকেই মৃত্যু দান করেন। ইনি তো ঐ অবস্থাতেই থাকেন। আর এদিকে সত্তর বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনবসতিপূর্ণ হয়। পলাতক বানী ইসরাঈল আবার ফিরে আসে এবং নিমেষের মধ্যে শহর ভরপুর হয়ে যায়। পূর্বের সেই শোভা ও জাঁকজমক পুনরায় পরিলক্ষিত হয়। এবারে একশো বছর পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে পুনর্জীবিত করেন এবং সর্বপ্রথম চক্ষুর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করে যেন তিনি নিজের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন। অতঃপর যখন ফুঁ দিয়ে সারা দেহে আত্মা প্রবেশ করানো হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি কত দিন ধরে মরেছিলে?' উত্তরে তিনি বলেনঃ 'এখনও তো একদিন পুরোই হয়নি।' এটা বলার কারণ ছিল এই যে, সকাল বেলায় তাঁর আত্মা বের হয়েছিল এবং একশো বছর পর যখন তিনি জীবিত হন তখন ছিল সন্ধ্যা। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, ঐ দিনই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেনঃ তুমি পূর্ণ একশো বছর মৃত অবস্থায় ছিলে। এখন আমার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, পাথেয় হিসাবে যে খাদ্য তোমার নিকট ছিল তা একশো বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও ঐরূপই রয়েছে, পচেওনি এবং সামান্য বিকৃতও হয়নি। ঐ খাদ্য ছিল আঙ্গুর, ডুমুর এবং ফলের নির্যাস। ঐ নির্যাস নষ্ট হয়নি, ডুমুর টক হয়নি এবং আঙ্গুরও খারাপ হয়নি। বরং প্রত্যেক জিনিসই স্বীয় আসল অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলেনঃ 'তোমার গাধার যে গলিত অস্থি তোমার সামনে রয়েছে সে দিকে দৃষ্টিপাত কর।

তোমার চোখের সামনেই আমি তোমার গাধাকে জীবিত করছি। আমি স্বয়ং তোমাকে মানব জাতির জন্যে নিদর্শন করতে চাই, যেন কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। অতঃপর তিনি দেখতে দেখতেই অস্থিগুলো স্ব-স্ব জায়গায় সংযুক্ত হয়ে যায়। মুসতাদরাক-ই-হাকিমে রয়েছে যে, নবী (সঃ)-এর পঠন نُنْشِزُهَا 'ز' এর সঙ্গেই রয়েছে এবং ওটাকে نُنْشِرُهَا 'ر' এর সঙ্গেও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ 'আমি জীবিত করবো।' মুজাহিদের (রঃ) পঠনও এটাই। সুদ্দী (রঃ) প্রভৃতি বলেন যে, অস্থিগুলো ডানে বামে ছড়িয়ে ছিল এবং পচে যাওয়ার ফলে ওগুলোর শুভ্রতা চক্চক্ করছিল। বাতাসে ঐগুলো একত্রিত হয়ে যায়। পরে ওগুলো নিজ নিজ জায়গায় যুক্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণ কাঠামো রূপে দাঁড়িয়ে যায়।ওগুলোতে গোশ্ত মোটেই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ওগুলোর উপর গোশ্ত, শিরা ইত্যাদি পরিয়ে দেন। অতঃপর ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁর নাসারন্ধ্রে ফুঁ দেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তৎক্ষণাৎ গাধাটি জীবিত হয়ে উঠে এবং শব্দ করতে থাকে। হযরত উযায়ের (আঃ) দর্শন করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহর এই সব কারিগরী তাঁর চোখের সামনেই সংঘটিত হয়। এই সব কিছু দেখার পর তিনি বলেনঃ 'আমার তো এটা বিশ্বাস ছিলই যে, আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু আজ আমি তা স্বচক্ষে দর্শন করলাম। সুতরাং আমি আমার যুগের সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশী জ্ঞান ও বিশ্বাসের অধিকারী। কেউ কেউ আ'লামু শব্দকে ই'লামও পড়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তুমি জেনে রেখো যে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপরেই ক্ষমতাবান।'

---

**২৬০। এবং যখন ইবরাহীম বলেছিল—হে আমার প্রভু! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন; তিনি বললেন—তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বললো হাঁ, কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; তিনি বললেন—তা হলে চারটা পাখী গ্রহণ কর তারপর ওদেরকে**

٢٦٠- وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ أَرِنِيْ
كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ
لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً
مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ

اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ (২৬০)

**সম্মিলিত কর, অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর ওদের এক এক খণ্ড রেখে দাও; অতঃপর ওদেরকে আহবান কর, ওরা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে; এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।**

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশ্ন করার অনেক কারণ ছিল। প্রথম এই যে, যেহেতু তিনি এই দলীলই পাপাচারী নমরূদের সামনে পেশ করেছিলেন, তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, প্রগাঢ় বিশ্বাস তো রয়েছেই, কিন্তু যেন প্রগাঢ়তম বিশ্বাস জন্মে। অর্থাৎ যেন তিনি চাচ্ছিলেনঃ 'বিশ্বাস তো আছেই। কিন্তু দেখতেও চাই; সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরা সন্দেহ পোষণের বেশী হকদার। কেননা তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার প্রভু! কিরূপে আপনি মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন।' এই রকমই সহীহ মুসলিম শরীফেও হযরত ইয়াহইয়া বিন ওয়াহাব হতে বর্ণিত আছে। এর দ্বারা কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন মনে না করে যে, আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষণ সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কোন সন্দেহ ছিল। আল্লাহ তা'আলা যে বলেন, চারটি পাখী গ্রহণ কর, এই কথানুসারে হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে কি কি পাখি গ্রহণ করেছিলেন সেই ব্যাপারে মুফাসসিরদের কয়েকটি উক্তি রয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই যে, এর জ্ঞান আমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং তা না জানায় আমাদের কোন ক্ষতিও নেই। কেউ কেউ বলেন যে, ওগুলো ছিল কলঙ্গু, ময়ূর, মোরগ, ও কবুতর। আবার কউ কেউ বলেন যে, ওগুলো ছিল জলকুক্কুট, সীমুরগের (প্রবাদোক্তপাখী) বাচ্চা, মোরাগ এবং ময়ূর। কারও কারও মতে ওগুলো ছিল কবুতর, মোরগ, ময়ূর ও কাক। অতঃপর 'ঐগুলো কেটে খণ্ড খণ্ড কর' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ -এর অর্থ এটাই গ্রহণ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ -এর অর্থ হচ্ছে 'ঐগুলো তোমার নিকট সম্মিলিত কর।' অতঃপর যখন তিনি পাখীগুলো পেয়ে যান তখন ওগুলো জবাই করে খণ্ড খণ্ড করেন এবং ঐ চারটি পাখীর খণ্ডগুলো সব একত্রে মিলিয়ে দেন। এরপর ঐগুলো চারটি পাহাড়ের উপর বা সাতটি পাহাড়ের উপর রেখে দেন এবং ওগুলোর মাথা নিজের হাতে রাখেন। তারপর আল্লাহ

তা'আলার নির্দেশক্রমে ওদেরকে আহবান করেন। তিনি যেই পাখীর নাম ধরে ডাক দিতেন ওর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পালকগুলো এদিক ওদিক হতে উড়ে এসে পরস্পর মিলিত হয়ে যেতো। অনুরূপভাবে রক্ত রক্তের সাথে মিলে যেতো এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেই যেই পাহাড়ে ছিল সবই পরস্পর মিলে যেতো। অতঃপর ওটা পূর্ণ পাখী হয়ে তাঁর নিকট উড়ে আসতো। তিনি ওর উপর অন্য পাখীর মাথা লাগালে তা সংযুক্ত হতো না। কিন্তু ওর নিজের মাথা দিলে যুক্ত হয়ে যেতো। অবশেষে ঐ চারটি পাখী জীবিত হয়ে উড়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা বলে মৃতের জীবিত হওয়ার এই বিশ্বাস উৎপাদক দৃশ্য হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বচক্ষে দর্শন করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ হন না। তিনি যা চান কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তা সম্পন্ন হয়ে যায়। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অধিকারে রয়েছে। তিনি তাঁর সমুদয় কথা ও কাজে মহাবিজ্ঞানময়। অনুরূপভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে ও শরীয়তের নির্ধারণ ব্যাপারেও তিনি মহাবিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে 'তুমি কি বিশ্বাস কর না?' এই প্রশ্ন করা এবং হযরত ইবরাহীমের (আঃ) 'হ্যাঁ, বিশ্বাস তো করি, কিন্তু অন্তরকে পরিতৃপ্ত করতে চাই' এই উত্তর দেয়া, এই আয়াতটি অন্যান্য সমস্ত আয়াত অপেক্ষা বেশী আশা প্রদানকারী বলে আমার মনে হয়।" ভাবার্থ এই যে, কোন ঈমানদারের অন্তরে কোন সময় যদি কোন শয়তানী সংশয় ও সন্দেহ এসে যায় তবে এই জন্যে আল্লাহ তাকে ধরবেন না। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'সের (রাঃ) সাথে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) সাক্ষাৎ হলে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'কুরআন মাজীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী আশা উৎপাদনকারী আয়াত কোন্টি? হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেনঃ لَا تَقْنَطُوْا যুক্ত আয়াতটি। যাতে বলা হয়েছেঃ 'হে আমার পাপী বান্দারা! তোমরা নিরাশ হয়ো না, আমি তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবো।' তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'আমার মতে তো সবচেয়ে বেশী আশা উৎপাদনকারী আয়াত হচ্ছে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) 'হে আল্লাহ! তুমি কিরূপে মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে প্রদর্শন কর' এই উক্তি এবং আল্লাহর 'তুমি কি বিশ্বাস কর না?' এই প্রশ্ন ও তাঁর 'বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করতে চাই। উক্ত আয়াতটি (মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাক ও মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ইত্যাদি)

২৬১। যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা—যেমন একটি শস্য বীজ, তা হতে উৎপন্ন হলো সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হলো) শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছে করেন বর্ধিত করে দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, মহাজ্ঞানী।

٢٦١- مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ খরচ করে সে বড়ই বরকত ও পুণ্য লাভ করে থাকে। তাকে সাতগুণ প্রতিদান দেয়া হয়। তাই বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর পথে খরচ করে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালনে, জিহাদের জন্য ঘোড়া লালন-পালনে, অস্ত্র-শস্ত্র কেনায়, নিজে হজ্ব করার কাজে ও অপরকে হজ্ব করানো ইত্যাদি কাজে ধন-সম্পদ খরচ করে থাকে তাদের উপমা হচ্ছে যেমন একটি শস্য বীজ এবং প্রত্যেক বীজে উৎপন্ন হয়ে থাকে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হয় একশো শস্যদানা। কি মনোমুগ্ধকর উপমা!একের বিনিময়ে সাতশো পাবে' সরাসরি এই কথার চেয়ে উপরোক্ত কথা ও উপমার মধ্যে খুব বেশী সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং ঐদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎ কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন বপনকৃত বীজ জমিতে বাড়তে থাকে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন—যে ব্যক্তি নিজের উদ্বৃত্ত জিনিস আল্লাহর পথে প্রদান করে, সে সাতশো পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর ও পরিবারবর্গের উপর খরচ করে সে দশগুণ পুণ্য লাভ করে। যে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে যায় তারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যে পর্যন্ত না তা নষ্ট করা হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট, ব্যথা ও রোগে আক্রান্ত হয়, ঐগুলো তার পাপসমূহ ঝেড়ে ফেলে। এই হাদীসটি হযরত আবূ উবাইদা (রাঃ) সেই সময় বর্ণনা করেন যখন তিনি কঠিন রোগে ভুগছিলেন এবং লোকেরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী শিয়রে উপবিষ্টা ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'রাত কিরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেনঃ

'রাত্রি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে।' সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ছিল। এই কথা শোনা মাত্রই তিনি জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেনঃ 'আমার এ রাত্রি কঠিন অবস্থায় কাটেনি। কেননা, আমি এই কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছি।' মুসনাদ-ই-আহমাদের আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী দান করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'লোকটি কিয়ামতের দিন সাত কোটি লাগাম বিশিষ্ট উষ্ট্রী প্রাপ্ত হবে।'

মুসনাদ-ই-আহমাদের আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বানী আদমের একটি পুণ্যকে দশটি পুণ্যের সমান করে দিয়েছেন এবং ওটা বাড়তে বাড়তে সাতশো পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু রোযা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওটা বিশেষ করে আমারই জন্যে এবং আমি নিজেই ওর প্রতিদান প্রদান করবো। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশী রয়েছে। একটি খুশী ইফতারের সময় এবং আর একটি খুশী তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও বেশী পছন্দনীয়।' অন্য হাদীসে এইটুকু বেশী রয়েছে—রোযাদার শুধু আমার জন্যেই পানাহার ত্যাগ করে থাকে।' শেষে রয়েছে 'রোযা ঢাল স্বরূপ।' মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'নামায-রোযা ও আল্লাহ্র যিকির আল্লাহর পথে খরচ করার পুণ্য সাতশো গুণ বেড়ে যায়। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের (রঃ) হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি জিহাদে কিছু অর্থ সাহায্য করে, সে নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও তাকে একের পরিবর্তে সাতশো খরচ করার পুণ্য দেয়া হয়। আর যদি নিজেও জিহাদে অংশগ্রহণ করে তবে একটি দিরহাম খরচ করার বিনিময়ে এক লাখ খরচ করার পুণ্য দেয়া হয়।' অতঃপর তিনি وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ এই আয়াতটি পাঠ করেন। এই হাদীসটি গারীব। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ এই আয়াতের তাফসীরে লিখিত হয়েছে। ওর মধ্যে রয়েছে যে,একের বিনিময়ে দুই কোটি পুণ্য পাওয়া যায়। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর হাদীসে রয়েছে যে, যখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'আ করেন,-'হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে আরও কিছু প্রদান করুন।' তখন مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় এই প্রার্থনাই জানালে اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (৩৯ঃ ১০) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, আমলে যে পরিমাণ খাঁটিত্ব থাকবে সেই পরিমাণ পুণ্য বেশী হবে। আল্লাহ বিপুল দাতা ও সর্বজ্ঞাতা। তিনি জানেন যে, কে কি পরিমাণ পুণ্য লাভের হকদার এবং কে হকদার নয়।

٢٦٢- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৬২। যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তৎপর যা ব্যয় করে তজ্জন্য কৃপা প্রকাশও করে না, ক্লেশ দানও করে না, তাদের জন্যে তাদের প্রভুর নিকট পুরস্কার রয়েছে, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্ভাবনা গ্রস্তও হবে না।

٢٦٣- قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ○

২৬৩। যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ দান, সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহ মহা সম্পদশালী, সহিষ্ণু।

٢٦٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬৪। হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলো ব্যর্থ করে ফেলো না, সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্যে অথচ আল্লাহ তে ও পরকালে সে বিশ্বাস করে না; ফলতঃ তার উপমা যেমন এক বৃহৎ মসৃন প্রস্তর খণ্ড, যার উপর কতকটা মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় উপস্থিত হলো তাতে প্রবল বর্ষা, অনন্তর তা পরিষ্কৃত হয়ে গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবে না এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন 'যাঁরা দান-খয়রাত করে থাকেন; অতঃপর যাদেরকে দান করেন তাদের নিকট নিজেদের কৃপার কথা প্রকাশ করে না এবং তাদের নিকট হতে কিছু উপকারেরও আশা করে না। তারা তাদের কথা ও কাজ দ্বারা দান গ্রহীতাদেরকে কোন প্রকারের কষ্টও দেয় না। মহান আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদানের ওয়াদা করেছেন যে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুখ দিয়ে উত্তম কথা বের করা, কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্যে প্রার্থনা করা, দোষী ও অপরাধীদের ক্ষমা করে দেয়া ঐ দান-খয়রাত হতে উত্তম, যার পিছনে থাকে ক্লেশ ও কষ্ট প্রদান। ইবনে আবি হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'উত্তম কথা হতে ভাল দান আর কিছু নেই। তোমরা কি মহান আল্লাহর قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى অর্থাৎ 'যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ দান সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর' (২ঃ ২৬৩) এই ঘোষণা শুননি?' আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণ হতে অমুখাপেক্ষী এবং সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু। বান্দার পাপ দেখেও ক্ষমা করে থাকেন। সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে , রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না ও তাদেরকে পবিত্র করবেন না। বরং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর কৃপা প্রকাশ করে থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে পায়জামা বা লুঙ্গী পায়ের গোছার নীচে লটকিয়ে রাখে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে থাকে। সুনান-ই- ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ বাপ-মার অবাধ্য, সাদকা করে কৃপা প্রকাশকারী, মদ্যপায়ী এবং তকদীরকে অবিশ্বাসকারী বেহেশতে প্রবেশ লাভ করবে না। সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী। নাসাঈর অন্য হাদীসে রয়েছে যে,ঐ তিন ব্যক্তি (প্রাগুক্ত তিন ব্যক্তি) বেহেশতে প্রবেশ করবে না। এই জন্যেই এই আয়াতেও ইরশাদ হচ্ছেঃ অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খায়রাত নষ্ট করো না। এ অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট দেয়ার পাপ দানের পুণ্য অবশিষ্ট রাখে না। অতঃপর অনুগ্রহ প্রকাশকারী

ও কষ্ট প্রদানকারীর সাদকা নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপমা ঐ সাদকার সাথে দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে দেখাবার জন্যে দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষ তাকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করবে ও দেশে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য তার মোটেই থাকে না এবং সে পুণ্য লাভেরও আশা পোষণ করে না। এই জন্যেই এই বাক্যের পর বলেছেন যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস না থাকে তবে ঐ লোক-দেখানো দান, অনুগ্রহ প্রকাশ করার দান এবং কষ্ট দেয়ার দানের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, যার উপরে কিছু মাটিও জমে গেছে। অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত ধুয়ে গেছে এবং কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই দু' প্রকার ব্যক্তির দানের অবস্থাও তদ্রূপ। লোকে মনে করে যে, সে দানের পুণ্য অবশ্যই পেয়ে যাবে। যেভাবে এই পাথরের মাটি দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ মাটি দূর হয়ে গেছে, তেমনই এই ব্যক্তির অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও কষ্ট দেয়ার ফলে এবং ঐ ব্যক্তির রিয়াকারীর ফলে ঐ সব পুণ্য বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ্ পাকের নিকট পৌঁছে তারা কোন প্রতিদান পাবে না। আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

---

**২৬৫। এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও স্বীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা—যেমন উর্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি উদ্যান, তাতে প্রবল বৃষ্টিধারা পতিত হয়, ফলে সেই উদ্যান দ্বিগুণ খাদ্য শস্য দান করে; কিন্তু যদি তাতে বৃষ্টিপাত না হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট; এবং তোমরা যা করছো আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।**

٢٦٥- وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

---

এখানে মহান আল্লাহ ঐ মুমিনদের দানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যাঁরা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে থাকেন এবং উত্তম প্রতিদান লাভেরও তাঁদের পূর্ণ

বিশ্বাস থাকে। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি (আল্লাহর উপর) বিশ্বাস রেখে ও পুণ্য লাভের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।' رَبْوَةٌ বলা হয় উঁচু ভূমিকে যেখান দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। وَابِلٌ-এর অর্থ হচ্ছে প্রবল বৃষ্টিপাত। বাগানটি দ্বিগুণ ফল দান করে। অনান্য বাগানসমূহের তুলনায় এই বাগানটি এইরূপ যে, ওটা উর্বর ভূ-ভাগে অবস্থিত বলে বৃষ্টিপাত না হলেও শিশির দ্বারাই তাতে ফুল-ফল হয়ে থাকে। কোন বছরই ফল শূন্য হয় না। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের আমল কখনও পুণ্যহীন হয় না, তাদেরকে তাদের কার্যের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হয়। তবে ঐ প্রতিদানের ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে যা ঈমানদারের খাঁটিত্ব ও সৎকার্যের গুরুত্ব হিসেবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বান্দাদের কোন কাজ আল্লাহর নিকট গোপন নেই। বরং তিনি তাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত রয়েছেন।

---

২৬৬। তোমাদের কারও যদি এমন একটি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান থাকে যার তলদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত, তথায় সর্বপ্রকার ফলের সংস্থান তার রয়েছে, আর সে বার্ধক্যে উপনীত হলো, অথচ তার কতকগুলো দুর্বল (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) সন্তান-সন্তুতি আছে- এ অবস্থায় সেই বাগানে উপস্থিত হলো অগ্নিসহ এক ঘূর্ণিবাত্যা আর তা পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল; তোমরা কেউ এটা পছন্দ করবে কি? এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্যে নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা কর।

٢٦٦- أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

---

সহীহ্ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, আমীরুল মু'মেনীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ) একদা সাহাবীদেরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'এই আয়াতটি কি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তা আপনারা জানেন কি?' তাঁরা বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলাই

খুব ভাল জানেন।' তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেনঃ আপনারা জানেন কি-না স্পষ্টভাবে বলুন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হে আমীরুল মু'মেনীন! আমার অন্তরে একটি কথা রয়েছে। তিনি বলেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি বল এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে করো না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ একটি কার্যের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ কোন কার্য? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এক ধনী ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করতে রয়েছে। অতঃপর শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে, ফলে সে পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয় সৎকার্যাবলী নষ্ট করে দেয়। সুতরাং এই বর্ণনাটি এই আয়াতের পূর্ণ তাফসীর। এতে বর্ণিত হচ্ছে যে, একটি লোক প্রথমে ভাল কাজ করলো। তারপর তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং সে অসৎকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়লো। ফলে সে তার পূর্বের সৎকার্যাবলী ধ্বংস করে দিলো এবং শেষ অবস্থায় যখন পুণ্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে শূন্য হস্ত হয়ে গেল। যেমন একটি লোক একটি ফল বৃক্ষের বাগান তৈরী করলো। বছরের পর বছর ধরে সে বৃক্ষটি হতে ফল নামাতে থাকলো। কিন্তু যখন বার্ধক্যে উপনীত হলো তখন সে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়লো। এখন তার জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র একটি বাগান। ঘটনাক্রমে একদিন অগ্নিবাহী এক ঘূর্ণিবাত্যা তার বাগানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাগানটি ভস্মীভূত করে দিল। ঐ রকমই এই লোকটি, সে প্রথমে তো সৎ কার্যাবলীই সম্পাদন করেছিল; কিন্তু পরে দুষ্কার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার পরিণাম ভাল হলো না। অতঃপর যখন ঐ সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান প্রদানের সময় এলো তখন সে শূন্য হস্ত হয়ে গেল। কাফিরও যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করে তখন তথায় তার কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। যেমন ঐ বৃদ্ধ, সে যা কিছু করেছিল অগ্নিবাহী ঘূর্ণিবাত্যা তা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন পিছন হতেও কেউ তার কোন উপকার করতে পারবে না। যেমন ঐ বৃদ্ধের নাবালক সন্তানেরা তার কোন উপকার করতে পারেনি। মুসতাদরাক-ই- হাকিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের দোয়াটিও করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَىَّ عِنْدَ كِبَرِسِنِّىْ وَانْقِضَاءِ عُمْرِىْ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যের সময় ও আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার সময় আমাকে আপনার রুযী অধিক পরিমাণে দান করুন।' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহ তোমাদের সামনে এই নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা ও

গবেষণা কর ও তা হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ

অর্থাৎ 'এ দৃষ্টান্ত গুলো আমি মানবমণ্ডলীর জন্যে বর্ণনা করে থাকি এবং আলেমগণই এগুলো খুব ভাল বুঝে থাকে।'(২৯ঃ ৪৩)

২৬৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং আমি যা তোমাদের জন্যে ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, সেই পবিত্র বিষয় হতে খরচ কর এবং তা হতে এরূপ কলুষিত বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না-যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না; এবং তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।

٢٦٧- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

২৬৮। শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অসৎ বিষয়ের আদেশ করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অঙ্গীকার করেন ও আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।

٢٦٨- اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬৯। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় ফলতঃ সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে; বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেউই উপলব্ধি করতে পারে না।

٢٦٩ - يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ব্যবসার মাল, যা আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন এবং সোনা, রূপা, শস্য ইত্যাদি যা তাদেরকে ভূমি হতে বের করে দেয়া হয়েছে তা হতে উত্তম ও পছন্দনীয় জিনিস তাঁর পথে খরচ করে। তারা যেন পঁচা, গলা ও মন্দ জিনিস আল্লাহর পথে না দেয়। আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র, তিনি অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ 'এমন জিনিস তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ইচ্ছে করো না যা তোমাদের নিজেদেরকে দেয়া হলে তোমরাও তা গ্রহণ করতে সম্মত হতে না। সুতরাং তোমরা এই রকম জিনিস কিরূপে আল্লাহকে দিতে পারো? আর তিনি তা গ্রহণই বা করবেন কেন? তবে তোমরা যদি সম্পদ হাত ছাড়া হতে দেখে নিজের অধিকারের বিনিময়ে কোন পঁচা-গলা জিনিস বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে নাও তাহলে অন্য কথা। কিন্তু আল্লাহ পাক তো তোমাদের মত বাধ্য ও দুর্বল নন যে, তিনি এই সব জঘন্য জিনিস গ্রহণ করবেন? তিনি কোন অবস্থাতেই এই সব জিনিস গ্রহণ করেন না।' কিংবা ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তোমরা হালাল জিনিস ছেড়ে হারাম মাল হতে দান করো না। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রুজী তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন তদ্রূপ চরিত্রও তোমদের বেঁটে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া তাঁর বন্ধুদেরকেও দেন এবং শত্রুদেরকেও দেন। কিন্তু দ্বীন শুধু তাঁর বন্ধুদেরকেই দান করে থাকেন। যে দ্বীন লাভ করে, সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কোন বান্দা মুসলমান হতে পারে না যে পর্যন্ত না তার অন্তর ও তার জিহ্বা মুসলমান হয়। কোন বান্দা মুসলমান হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার প্রতিবেশী তার থেকে নির্ভয় হয়। জনগণের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ কষ্টের ভাবার্থ হচ্ছে প্রতারণা ও উৎপীড়ন। যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে মাল উপার্জন করে, আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন না এবং তার দান-খয়রাতও গ্রহণ করেন না। যা সে ছেড়ে যায় তার জন্যে তা দুযখে যাবার পাথেয় ও কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দের দ্বারা দূর করেন না বরং মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করেন! অপবিত্র জিনিস অপবিত্র জিনিস দ্বারা বিদূরিত হয় না। সুতরাং দু'টি উক্তি হলো—এক হলো মন্দ জিনিস এবং দ্বিতীয় হলো হারাম মাল।

হযরত বারা' বিন আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ খেজুরের মৌসুমে আনসারগণ নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী খেজুরের গুচ্ছ এনে মসজিদে নব্বীর (সঃ) দু'টি স্তম্ভের মধ্যে ঝুলানো রজ্জুতে ঝুলিয়ে দিতেন। ঐগুলো আসহাব-ই-সুফ্ফা ও দরিদ্র

মুহাজিরগণ ক্ষুধার সময় খেয়ে নিতেন। সাদকার প্রতি আগ্রহ কম ছিল এরূপ একটি লোক ওতে খারাপ খেজুরের একটি গুচ্ছ এনে ঝুলিয়ে দেয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাতে বলা হয়, 'যদি তোমাদেরকে এই রকমই জিনিস উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয় তবে তোমরা তা কখনও গ্রহণ করবে না। অবশ্য মনে না চাইলেও যদি লজ্জার খাতিরে তা গ্রহণ করে নাও সেটা অন্য কথা। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভাল ভাল খেজুর নিয়ে আসতেন। (ইবনে জারীর) ইবনে আবি হাতিমের (রঃ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মানুষ হালকা ধরনের খেজুর ও খারাপ ফল দানের জন্যে বের করতো। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই রকম জিনিস দান করতে নিষেধ করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাগফাল (রাঃ) বলেন যে, মুমিনের উপার্জন কখনও জঘন্য হতে পারে না। ভাবার্থ এই যে, তোমরা বাজে জিনিস দান করো না। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গো-সাপের (গুইসাপ) গোশ্ত আনা হলে তিনি নিজেও খেলেন না এবং কাউকে খেতে নিষেধও করলেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ 'কোন মিসকীনকে দেবো কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তোমরা নিজেরা যা খেতে চাও না তা অপরকে খেতে দিও না। হযরত বারা' (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন তোমাদের কারও উপর কোন দাবী থাকে এবং সে তোমাকে এমন জিনিস দেয় যা বাজে ও মূল্যহীন তবে তোমরা তা কখনও গ্রহণ করবে না, কিন্তু যখন তোমাদের হক নষ্ট হতে দেখবে তখন তোমরা চক্ষু বন্ধ করে তা নিয়ে নেবে।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, তোমরা কাউকে উত্তম মাল ধার দিয়েছো, কিন্তু পরিশোধ করার সময় সে নিকৃষ্ট মাল নিয়ে আসছে, এইরূপ অবস্থায় তোমরা কখনও ঐ মাল গ্রহণ করবে না। আর যদি গ্রহণ করও তবে মূল্য কমিয়ে দিয়ে তা গ্রহণ করবে। তাহলে যে জিনিস তোমরা নিজেদের হকের বিনিময়ে গ্রহণ কর না, তা তোমরা আল্লাহর হকের বিনিময়ে কেন দেবে? সুতরাং তোমরা উত্তম ও পছন্দনীয় মাল আল্লাহর পথে খরচ কর। এই অর্থই হচ্ছেঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এই আয়াতটির। অর্থাৎ 'তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পার না যে পর্যন্ত না তোমাদের পছন্দনীয় মাল হতে খরচ কর।' (৩ঃ ৯২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ যে তোমাদেরকে তাঁর পথে উত্তম ও পছন্দনীয় মাল খরচ করার নির্দেশ প্রদান করলেন, এই জন্যে তোমরা এই কথা বুঝে নিও না যে, আল্লাহ তোমাদের

মুখাপেক্ষী। না, না, তিনি তো সম্পূর্ণরূপে অভাব মুক্ত। তিনি কারও প্রত্যাশী নন। বরং তোমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর নির্দেশ শুধু এই জন্যেই যে, দরিদ্র লোকেরাও যেন দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ হতে বঞ্চিত না থাকে। যেমন অন্য জায়গায় কুরবানীর হুকুমের পরে বলেছেনঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট কুরবানীর গোশ্তও পৌঁছে না এবং রক্তও পৌঁছে না; কিন্তু তাঁর নিকট তোমাদের সংযমশীলতা পৌঁছে থাকে ( ২২ঃ ৩৭)।' তিনি বিপুল দাতা। তাঁর ধনভাণ্ডারে কোন কিছুর স্বল্পতা নেই। হালাল ও পবিত্র মাল হতে সাদকা বের করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও মহাদানের প্রতি লক্ষ্য কর। এর বহুগুণ বৃদ্ধি করে তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি দরিদ্রও নন, অত্যাচারীও নন। তিনি প্রশংসিত। সমস্ত কথায় ও কাজে তাঁরই প্রশংসা করা হয়। তিনি ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি সারা জগতের পালন কর্তা। তিনি ব্যতীত কেউ কারও পালন কর্তা নয়। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'বানী আদমের মনে শয়তান এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে এবং ফেরেশতা এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে। শয়তান দুষ্টামি ও সত্যকে অবিশ্বাস করার প্রতি উত্তেজিত করে এবং ফেরেশতা সৎকাজের প্রতি এবং সত্যকে স্বীকার করার প্রতি উৎসাহিত করে। যার মনে এই ধারণা আসবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং জেনে নেয় যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে। আর যার মনে ঐ ধারণা আসবে সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। শেষে اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (২ঃ ২৬৮) এই আয়াতটি তিনি পাঠ করেন। (তিরমিযী) এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করতে শয়তান বাধা দেয় এবং মনে কু-ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, এইভাবে খরচ করলে সে দরিদ্র হয়ে যাবে। এই কাজ হতে বিরত রাখার পর তাকে পাপের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে, অবৈধ কাজে এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণের কাজে উত্তেজিত করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা এর বিপরীত নির্দেশ দেন যে, সে যেন তাঁর পথে খরচ করা হতে বিরত না হয় এবং শয়তানের ধমকের উল্টো বলেন যে, ঐ দানের বিনিময়ে তিনি তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর সে যে তাকে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় দেখাচ্ছে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আল্লাহ তাকে তাঁর সীমাহীন

অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন। তাঁর চেয়ে অধিক দাতা, দয়ালু ও অনুগ্রহশীল আর কে হতে পারে? আর পরিণামের জ্ঞান তার অপেক্ষা বেশী কার থাকতে পারে। এখানে 'হিকমত' শব্দের অর্থ হচ্ছে কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ, যার দ্বারা রহিতকৃত ও রহিতকারী, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, পূর্বের ও পরের, হালাল ও হারামের এবং উপমার আয়াতসমূহের পূর্ণ পরিচয় লাভ হয়। ভাল-মন্দ পড়তে তো সবাই পারে কিন্তু ওর ব্যাখ্যা ও অনুধাবন হচ্ছে ঐ হিকমত, যা মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আর যাকে এই হিকমত দান করা হয় সে প্রকৃত ভাবার্থ জানতে পারে এবং কথার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। তার মুখে সঠিক ভাবার্থ উচ্চারিত হয়। সত্য জ্ঞান ও সঠিক অনুধাবন সে লাভ করে বলেই তার অন্তরে আল্লাহর ভয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মারফু' হাদীসেও রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হিকমতের মূল হচ্ছে আল্লাহর ভয়।' পৃথিবীতে এইরূপ বহু লোক রয়েছে যারা ইহলৌকিক বিদ্যায় বড়ই পারদর্শী। দুনিয়ার বিষয়সমূহে তারা পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা ধর্ম বিষয়ে একেবারেই অন্ধ। আবার পৃথিবীতে বহু লোক এমনও রয়েছেন যাঁরা ইহলৌকিক বিদ্যায় দুর্বল বটে, কিন্তু শরীয়তের বিদ্যায় তারা বড়ই পারদর্শী। সুতরাং এটাই ঐ হিকমত যা আল্লাহ তা'আলা এঁদেরকে দিয়েছেন এবং ওরদেরকে বঞ্চিত রেখেছেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এখানে হিকমতের ভাবার্থ হচ্ছে 'নবুওয়াত'। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, 'হিকমত' শব্দটির মধ্যে এই সবগুলোই মিলিত রয়েছে। আর নবুওয়াতও হচ্ছে ওর উঁচু ও বড় অংশ এবং এটা শুধু নবীদের (আঃ) জন্যেই নির্দিষ্ট রয়েছে। তাঁরা ছাড়া এটা কেউ লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা নবীদের অনুসারী তাঁদেরকেও আল্লাহ পাক হিকমতের অন্যান্য অংশ হতে বঞ্চিত রাখেননি। সত্য জ্ঞান ও সঠিক অনুধাবনরূপ সম্পদ তাঁদেরকেও দান করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছে, তার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে নবুওয়াত চড়ে বসে; কিন্তু তার নিকট ওয়াহী করা হয় না। কিন্তু অপরপক্ষে বলা হয়েছে যে, হাদীসটি দুর্বল। কেননা বর্ণিত আছে যে,এটা হযরত আবদুল্লাহ বিন আমরের (রাঃ) নিজস্ব উক্তি। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া কারও প্রতি হিংসা করা যায় না। এক ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মাল-ধন দিয়েছেন। অতঃপর তাকে ঐ মাল তাঁর পথে খরচ করার তওফীক প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান

করেছেন, অতঃপর সে সেই প্রজ্ঞা অনুযায়ী মীমাংসা করে এবং তা শিক্ষা দিয়ে থাকে। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে থাকে যারা জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী।' অর্থাৎ যারা আল্লাহর কালাম ও রাসূলের হাদীস পড়ে বুঝবার চেষ্টা করে, কথা মনে রাখে এবং ভাবার্থের প্রতি মনোযোগ দেয় তারাই ভাবার্থ উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং উপদেশ দ্বারা তারাই উপকৃত হয়।

٢٧٠- وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

২৭০। এবং যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন, অথবা যে কোন প্রতিজ্ঞা (নযর) তোমরা গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত হন; আর অত্যাচারীগণের কোনই সাহায্যকারী নেই।

٢٧١- اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৭১। যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট এবং যদি তোমরা তা গোপন কর ও দরিদ্রদেরকে প্রদান কর তবে ওটাও তোমাদের জন্যে উত্তম এবং এ দ্বারা তোমাদের অকল্যাণ বিদূরিত হবে; বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষ রূপে খবরদার।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি প্রত্যেকটি দান, প্রতিজ্ঞা (নযর) ও ভাল কাজের খবর রাখেন। তাঁর যেসব বান্দা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, স্বীয় সৎকার্যের পুণ্যের প্রতি আশা রাখে, তাঁর ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে, তাদেরকে তিনি উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। পক্ষান্তরে যারা তাঁর আদেশ ও নিষেধ অমান্য করবে, তাঁর সাথে অন্যদেরও উপাসনা করবে তারা অত্যাচারী। কিয়ামতের দিন তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে এবং সেই দিন এমন কেউ থাকবে না যে তাদেরকে ঐ শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারে বা কোন সাহায্য করতে পারে। তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

'প্রকাশ্যভাবে দান করাও ভাল এবং গোপনে দরিদ্র ও মিসকীনদেরকে দেয়াও উত্তম। কেননা, গোপন দানে রিয়াকারী বহু দূরে সরে থাকে। তবে যদি প্রকাশ্য দানের ব্যাপারে দাতার মহৎ কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটা অন্য কথা। যেমন তার উদ্দেশ্য এই যে, তার দেখাদেখি অন্যরাও দান করবে ইত্যাদি। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রকাশ্যদানকারী উচ্চ শব্দে কুরআন পাঠকের ন্যায় এবং গোপনে দানকারী ধীরে ধীরে কুরআন পাঠকের ন্যায়। কুরআন মাজীদের এই আয়াত দ্বারা গোপন দানের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হচ্ছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকারের লোককে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেই দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ। (২) সেই নব-যুবক যে তার যৌবন আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। (৩) ঐ দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই পরস্পর ভালবাসা রেখেছে, ঐ জন্যেই তারা একত্রিত থাকে এবং ঐ জন্যেই পৃথক হয় (৪) ঐ ব্যক্তি যাঁর অন্তর মসজিদ হতে বের হওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত মসজিদের সাথে সংলগ্ন থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে, অতঃপর তার নয়নযুগল হতে অশ্রুধারা নেমে আসে (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে একজন বংশ মর্যাদা ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী নারী (নির্লজ্জতার কাজে) আহবান করে, তখন সে বলে নিশ্চয় আমি সারা জগতের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। (৭) ঐ ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারে না।' মুসনাদ-ই-আহমাদে হাদীস রয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন পৃথিবী দুলতে আরম্ভ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পর্বত সৃষ্টি করে পৃথিবীর মধ্যে গেড়ে দেন। ফলে পৃথিবীর কম্পন থেমে যায়। আল্লাহ তা'আলা পর্বতরাজিকে এত শক্ত করে সৃষ্টি করেছেন দেখে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে পর্বত অপেক্ষা শক্ত আর কিছু আছে কি?' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হ্যাঁ লৌহ রয়েছে, ওর চেয়ে শক্ত হচ্ছে অগ্নি ওর চেয়ে শক্ত পানি, ওর চেয়ে শক্ত বাতাস। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহ! বাতাস অপেক্ষা শক্ত অন্য কিছু আছে কি? আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হ্যাঁ, সেই আদম সন্তান যে এমন গোপনে দান করে যে, তার দক্ষিণ হস্ত যা খরচ করে বাম হস্ত তা জানতে পারে না।' আয়াতুল কুরসীর তাফসীরে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, 'উত্তম দান

হচ্ছে ওটাই যা গোপনে কোন অভাবগ্রস্তকে দেয়া হয় এবং মালের স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে খরচ করা হয়।' অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন। (ইবনে আবি হাতিম)। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত করে।' হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত উমার ফারূক (রাঃ)-এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। হযরত উমার (রাঃ) তো তাঁর অর্ধেক মাল রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খিদমতে এনে হাজির করেন। আর হযরত আবূ বকর (রাঃ) বাড়ীতে যা ছিল সবই এনে উপস্থিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'পরিবারবর্গের জন্যে কিছু রেখে এসেছো কি?' হযরত উমার (রাঃ) উত্তর দেনঃ এতটিই ছেড়ে এসেছি।' হযরত আবূ বকরের (রাঃ) এটা প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল না এবং গোপনে সবকিছু তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকেও যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেন তখন বাধ্য হয়ে তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) অঙ্গীকারই যথেষ্ট।' একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেনঃ 'হে আবূ বকর (রাঃ)! যে কোন সৎকার্যের দিকে আমরা অগ্রসর হয়েছি, আপনাকে অগ্রেই দেখেছি।' এই আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ। দান ফরয হোক, নফল হোক, যাকাত হোক বা খয়রাত হোক, প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করা উত্তম। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নফল দান গোপনে দেয়ার ফযীলত সত্তরগুণ; কিন্তু ফরয দান অর্থাৎ যাকাত প্রকাশ্যে দেয়ার ফযীলত পঞ্চাশগুণ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'দানের বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ও অন্যায় দূর করে দেবেন, বিশেষ করে যখন গোপনে দান করা হবে। এর বিনিময়ে তোমরা বহু সুফল প্রাপ্ত হবে। এর দ্বারা তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং পাপসমূহ মোচন হয়ে যাবে। য়্যুকাফ্ফেরু শব্দকে য়্যুকাফ্ফের পড়া হয়েছে। এতে বাহ্যতঃ এটা শর্তের জওয়াবের স্থলে عَطْفٌ হবে, যা হচ্ছে فَنِعِمَّا هِيَ শব্দটি। যেমন فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ -এর মধ্যে اَكُنْ শব্দটি হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমাদের কোন পাপ ও পুণ্যের কাজ,দানশীলতা ও কার্পণ্য, গোপনীয় ও প্রকাশ্য, সৎ উদ্দেশ্য ও দুনিয়া অনুসন্ধান প্রভৃতি কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট অজানা নেই। সুতরাং তিনি পূর্ণভাবে প্রতিদান প্রদান করবেন।

২৭২। তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার উপর নেই, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তোমরা ধন-সম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ তা তোমাদের নিজেদের জন্যে; আর একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের চেষ্টায় ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) অর্থ ব্যয় করো না; এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণভাবে পুনঃ প্রাপ্ত হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২৭২- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭৩। যারা আল্লাহ্র পথে অবরুদ্ধ রয়েছে বলে ভূ-পৃষ্ঠে গমনাগমনে শক্তিহীন সেই সব দরিদ্রের জন্যে ব্যয় কর; (ভিক্ষা হতে) নিবৃত্ত থাকার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অবস্থাপন্ন বলে মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণের দ্বারা চিনতে পার, তারা লোকের নিকট ব্যাকুলভাবে যাঞ্চা করে না; এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ সে সমস্তের বিষয় আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত।

২৭৩- لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ؗ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○ ع

২৭৪। যারা রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের

২৭৪- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

| | |
|---|---|
| **ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।** | فَلَهُمْ اَجْـــرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ |

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলমান সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে আদান-প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। অতপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদেরকে তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে লেন-দেন করার অনুমতি দেয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ 'সাদকা শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে দেয়া হবে।' যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ভিক্ষুক যে কোন মাযহাবের হোক না কেন তোমরা তাদেরকে সাদকা প্রদান কর„(ইবনে আবি হাতিম)।

হযরত আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ (৬০ঃ ৮)এই আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন—'তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা নিজেদের উপকারের জন্যই করবে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ভাল কাজ করলো তা তার নিজের জন্যেই করলো।' এই ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ 'মুসলমানের প্রত্যেক খরচ আল্লাহ্র জন্যেই হয়ে থাকে, যদিও সে নিজেই খায় ও পান করে।' হযরত আতা' খোরাসানী (রঃ)-এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করবে তখন দান গ্রহীতা যে কেউ হোক না কেন এবং যে কোন কাজই করুক না কেন তুমি তার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে।' এই ভাবার্থটিও খুব উত্তম। মোটকথা এই যে, সৎ উদ্দেশ্যে দানকারীর প্রতিদান যে আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে তা সাব্যস্ত হয়ে গেল। এখন সেই দান কোন সৎ লোকের হাতেই যাক বা কোন মন্দ লোকের হাতেই যাক-এতে কিছু যায় আসে না। সে তার সৎ উদ্দেশ্যের কারণে প্রতিদান পেয়েই যাবে। যদিও সে দেখে শুনে ও বিচার-বিবেচনা করে দান করে থাকে অতঃপর ভুল হয়ে যায় তবে তার দানের পুণ্য নষ্ট হবে না। এই জন্যে আয়াতের শেষে প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'এক ব্যক্তি ইচ্ছা করে, আজ আমি রাত্রে দান করবো।' অতঃপর সে দান নিয়ে বের হয় এবং একটি ব্যভিচারিণী নারীর হাতে দিয়ে দেয়। সকালে জনগণের মধ্যে এই কথা নিয়ে সমালোচনা হতে থাকে যে, এক ব্যভিচারিণীকে সাদকা দেয়া হয়েছে। একথা শুনে লোকটি বলেঃ 'হে আল্লাহ! আপনার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যে,আমার দান ব্যভিচারিণীর হাতে পড়েছে।' আবার সে বলেঃ 'আজ রাত্রেও আমি অবশ্যই সাদকা প্রদান করবো। অতঃপর সে এক ধনী ব্যক্তির হাতে রেখে দেয়। আবার সকালে জনগণ আলোচনা করতে থাকে যে, রাত্রে এক ধনী লোককে দান করা হয়েছে। সে বলেঃ হে আল্লাহ! আপনার জন্যেই সমুদয় প্রশংসা যে, আমার দান একজন ধনী ব্যক্তির উপর পড়েছে।' আবার সে বলে, 'আজ রাত্রেও আমি অবশ্যই দান করবো।' অতঃপর সে এক চোরের হাতে রেখে দেয়। সকালে পুনরায় জনগণের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে যে, রাত্রে এক চোরকে সাদকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বলেঃ 'হে আল্লাহ! আপনার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যে, আমার দান ব্যভিচারিণী, ধনী ও চোরের হাতে পড়েছে।' অতঃপর সে স্বপ্নে দেখে যে; একজন ফেরেশতা এসে বলছেনঃ তোমার দানগুলো আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়েছে। সম্ভবতঃ দুশ্চরিত্রা নারীটি তোমার দান পেয়ে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, হয়তো ধনী লোকটি এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সেও দান করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, আর হতে পারে যে, মাল পেয়ে চোরটি চুরি করা ছেড়ে দেবে।'

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–সাদকা ঐ মুহাজিরদের প্রাপ্য যারা ইহলৌকিক সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বদেশ পরিত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নবীর (সঃ) খিদমতে উপস্থিত হয়েছে। তাদের জীবন যাপনের এমন কোন উপায় নেই যা তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং তারা সফরও করতে পারে না যে, চলে ফিরে নিজেদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পারে।' ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে সফর করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ 'যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।' আর এক জায়গায় রয়েছেঃ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ 'তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে।' তাঁদের অবস্থা যাদের জানা নেই তারা তাঁদের বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে এবং কথা-বার্তা শুনে তাঁদেরকে ধনী মনে করে। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে

বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়, কোথায়ও হয়তো একটি খেজুর পেয়ে গেল, কোথায়ও হয়তো দু'এক গ্রাস খাবার পেলো, আবার কোন জায়গায় হয়তো দু'একদিনের খাদ্য প্রাপ্ত হলো। বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার নিকট ঐ পরিমাণ কিছু নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে এবং সে তার অবস্থাও এমন করেনি যার ফলে মানুষ তার অভাব অনুভব করে তার উপর কিছু অনুগ্রহ করছে। আবার ভিক্ষা করার অভ্যাসও তার নেই।' কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাদের কাছে এদের অবস্থা গোপন থাকে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ অর্থাৎ 'তাদের (অভাবের) লক্ষণসমূহ তাদের মুখমণ্ডলের উপর রয়েছে।' (৪৮ঃ ২৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ অর্থাৎ 'তোমরা অবশ্যই তাদেরকে তাদের কথার ভঙ্গিতে চিনে নেবে।' (৪৭ঃ ৩০) সুনানের একটি হাদীসে রয়েছেঃ 'তোমরা মুমিনের বিচক্ষণতা হতে বেঁচে থাক, নিশ্চয় সে আল্লাহর ঐজ্জ্বল্যের দ্বারা দেখে থাকে।' অতঃপর তিনি إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ এই আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ 'নিশ্চয় অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।' (১৫ঃ ৭৫)

'তারা কাকুতি মিনতি করে কারও কাছে প্রার্থনা করে না' অর্থাৎ তারা যাচ্ঞার দ্বারা মানুষকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে না এবং তাদের কাছে সামান্য কিছু থাকা অবস্থায় তারা মানুষের কাছে হাত বাড়ায় না। প্রয়োজনের উপযোগী বস্তু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে না তাকেই পেশাগত ভিক্ষুক বলা হয়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যাকে দু'একটি খেজুর বা দু'এক গ্রাস আহার্য দেয়া হয়, বরং ভিক্ষুক ঐ ব্যক্তি যে অভাব থাকা সত্ত্বেও সংযমশীলতা রক্ষা করতঃ ভিক্ষা হতে দূরে থাকে।' অতঃপর তিনি لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (২ঃ ২৭৩) উক্ত আয়াতের অংশটি পাঠ করেন। এই হাদীসটি বহু হাদীস গ্রন্থে বহু সনদে বর্ণিত আছে। 'মুযাইনা' গোত্রের একটি লোককে তার মা বলেঃ 'অন্যান্য লোক যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে কিছু চেয়ে আনছে, তুমিও তাঁর নিকট গিয়ে কিছু চেয়ে আন।' লোকটি বলেঃ 'আমি গিয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। ভাষণে তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তি ভিক্ষা হতে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তাকে প্রকৃতপক্ষেই অমুখাপেক্ষী করবেন। যার কাছে পাঁচ আওকিয়া (এক আওকিয়া = চল্লিশ দিরহাম) মূল্যের জিনিস রয়েছে, অথচ সে ভিক্ষা করছে সে হচ্ছে ভিক্ষাকার্যে জড়িত ভিক্ষুক।' আমি মনে মনে চিন্তা

করি যে, আমার ইয়াকুতা নাম্নী উষ্ট্রীটির মূল্য পাঁচ আওকিয়া অপেক্ষা বেশী হবে। সুতরাং আমি কিছু না চেয়েই ফিরে আসি।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এটা ছিল হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) ঘটনা। তাতে রয়েছে যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এও বলেনঃ 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রত্যাশা করে না আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান এবং এক আওকিয়া থাকা সত্ত্বেও যে ভিক্ষা করে সে ভিক্ষার সঙ্গে জড়িত ভিক্ষুক।' চল্লিশ দিরহামে এক আওকিয়া হয় এবং চল্লিশ দিরহামে প্রায় দশ টাকা হয়। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তির নিকট এই পরিমাণ জিনিস রয়েছে যে, সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে, তথাপি সে ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন এই ভিক্ষা তার মুখে নাচতে থাকবে বা তার মুখ আহত করতে থাকবে জনগণ জিজ্ঞেস করেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কি পরিমাণ মাল থাকলে এই অবস্থা হবে? তিনি বলেনঃ পঞ্চাশটি দিরহাম বা তার সমমূল্যের সোনা। এই হাদীসটি দুর্বল। হারিস নামক একজন কুরাইশ সিরিয়ায় বাস করতেন। তিনি জানতে পারেন যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) অভাবগ্রস্ত রয়েছেন। সুতরাং তিনি তাঁর নিকট তিনশোটি স্বর্ন মুদ্রা পাঠিয়ে দেন। তখন তিনি দুঃখিত হয়ে বলেনঃ ঐ ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্ত আর কাউকে পেলেন না? আমি তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছিঃ 'যে ব্যক্তির কাছে চল্লিশটি দিরহাম থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষে করে সে হচ্ছে ভিক্ষাকার্যে জড়িত ভিক্ষুক।' আর আবূ যারের পরিবারের কাছে তো চল্লিশটি দিরহাম, চল্লিশটি ছাগল এবং দু'টি ক্রীতদাসও রয়েছে।' একটি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথাগুলো নিম্নরূপও রয়েছেঃ 'চল্লিশ দিরহাম রেখে ভিক্ষেকারী হচ্ছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনাকারী এবং সে হচ্ছে বালুকার ন্যায়।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের সমস্ত দান সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত রয়েছেন। যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে তখন তিনি তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। এরপর আল্লাহ পাক ঐ সব লোকের প্রশংসা করছেন যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করে থাকে। তাঁদেরকেও প্রতিদান দেয়া হবে এবং তারা যে কোন ভয় ও চিন্তা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। পরিবারের খরচ বহন করার কারণেও তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হাদীস রয়েছে, মক্কা বিজয়ের বছর এবং অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে,বিদায় হজ্বের বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে গিয়ে বলেনঃ 'তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে তিনি এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন, এমনকি

তুমি স্বয়ং তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াবে তারও প্রতিদান তোমাকে দেয়া হবে।' মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, মুসলমান পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজের ছেলে-মেয়ের জন্যে যা খরচ করে থাকে সেটাও সাদকা। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ 'এই আয়াতের শান-ই-নুযুল হচ্ছে মুসলমান মুজাহিদগণের ঐ খরচ যা তারা তাদের পরিবারের জন্য করে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) এটাই বলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন যে,হযরত আলীর (রাঃ) নিকট চারটি দিরহাম ছিল। ওর মধ্য হতে তিনি একটি রাত্রে ও একটি দিনে আল্লাহর পথে দান করেন। অর্থাৎ একটি প্রকাশ্যে ও একটি গোপনে দান করেন। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বর্ণনাটি দুর্বল। অন্য সনদেও এটা বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য লাভ করার উদ্দেশ্যে যারা রাত্রে ও দিবসে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে থাকে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।

২৭৫। যারা সুদ ভক্ষণ করে, তারা শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়ার অনুরূপ ব্যতীত দণ্ডায়মান হবে না; এর কারণ এই যে, তারা বলে—ব্যবসায় সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়—অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয়, ফলে সে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং যা অতীত হয়েছে; তার কৃতকর্ম আল্লাহর প্রতি নির্ভর; এবং যারা পুনঃ গ্রহণ করবে, তারাই হচ্ছে নরকের অধিবাসী, সেখানেই চিরকাল অবস্থান করবে।

٢٧٥- اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

এর পূর্বে ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা সৎ, দাতা, যাকাত প্রদানকারী, অভাবগ্রস্ত ও আত্মীয়-স্বজনের দেখা শুনাকারী এবং সদা-সর্বদা তাদের উপকার সাধনকারী। এখানে ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা দুনিয়া লোভী, অত্যাচারী এবং অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী। বলা হচ্ছে যে, এই সুদখোর লোকেরা তাদের কবর হতে পাগল ও অজ্ঞান লোকের মত হয়ে উঠবে। তারা দাঁড়াতেও পারবে না। مِنَ الْمَسِّ শব্দের পরে একটি পঠনে يَوْمَ الْقِيَامَةِ শব্দটিও রয়েছে। তাদেরকে বলা হবে–তোমরা অস্ত্র ধারণ কর এবং তোমাদের প্রভুর সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।' মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কতকগুলো লোককে দেখেন যে, তাদের পেট বড় বড় ঘরের মত। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ এই লোকগুলো কে?' বলা হয়ঃ এরা সুদখোর।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তাদের পেট সর্পে পরিপূর্ণ ছিল যা বাহির হতে দেখা যাচ্ছিল। সহীহ্ বুখারী শরীফের মধ্যে সুদীর্ঘ নিদ্রার হাদীসে হযরত সুমরা' বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন আমি লাল রং বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছি যার পানি রক্তের মত লাল ছিল, তখন আমি দেখি যে, কয়েকটি লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন ফেরেশতা বহু পাথর জমা করে বসে আছেন এবং তাদের মুখ ফেড়ে এক একটি পাথর ভরে দিচ্ছেন। তারপর সে পলায়ন করছে। অতঃপর পুনরায় এই রূপই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তারা সুদখোরের দল। তাদের এই শাস্তির কারণ এই যে, তারা বলতো সুদ ব্যবসায়ের মতই। তাদের এই প্রতিবাদ ছিল শরীয়তের উপর এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের উপর। তারা সুদকে ক্রয় বিক্রয়ের মত হালাল মনে করতো। এটা মনে রাখার বিষয় যে, তারা যে সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অনুমান করতো তা নয়। কেননা মুশরিকরা পূর্ব হতেই ক্রয়-বিক্রয়কেও শরীয়ত সম্মত বলতো না। এবং এই কারণেও যে, যদি তারা সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অনুমান করে একথা বলে থাকতো তবে সুদ বেচা–কেনার মত এই কথা বলতো। তাদের কথার ভাবার্থ ছিল–এ দু'টো জিনিস একই রকম। সুতরাং একটিকে হালাল বলা এবং অন্যটিকে হারাম বলার কারণ কি? তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ বৈধতা ও অবৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা কাফিরদেরই উক্তি। তাহলে সূক্ষ্মতার সাথে একটি উত্তরও হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটিকে হারাম করেছেন এবং অপরটিকে হালাল করেছেন এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ কিসের? 'সর্বজ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহর

নির্দেশের উপর প্রতিবাদ উত্তাপন করার তোমরা কে? তাঁর কার্যের বিচার বিশ্লেষণ করার কার অধিকার রয়েছে? সমস্ত কার্যের মূল তত্ত্ব তাঁরই জানা রয়েছে। তাঁর বান্দাদের জন্যে প্রকৃত উপকার কোন্ জিনিসে রয়েছে এবং প্রকৃত ক্ষতি কোন বস্তুতে রয়েছে সেটাতো তিনিই ভাল জানেন। তিনি উপকারী বস্তু হালাল করে থাকেন এবং ক্ষতিকর বস্তু হারাম করে থাকেন। মা তার দুগ্ধপায়ী শিশুর উপর ততো করুণাময়ী হতে পারে না যতটা করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর। তিনি যা হতে নিষেধ করেন তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং যা করতে আদেশ করেন তার মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে –'আল্লাহ তা'আলার উপদেশ শ্রবণের পর যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ হতে বিরত থাকে তার পূর্বের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ অর্থাৎ 'সে পূর্বে যা করেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন।' (৫ঃ ৯৫) রাসূলুল্লাহ (সঃ) যেমন মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেনঃ 'অজ্ঞতাপূর্ণ যুগের সমস্ত সুদ আমার পদদ্বয়ের নীচে ধ্বংস হয়ে গেল। সর্বপ্রথম সুদ যা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তা হচ্ছে হযরত আব্বাসের (রাঃ) সুদ।' সুতরাং অন্ধকার যুগে যেসব সুদ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত যায়েদ বিন আরকামের (রাঃ) উম্মে ওয়ালাদ (ক্রীতদাসীর সাথে মনিবের সহবাসের ফলে সন্তান জন্ম লাভ করলে তাকে 'উম্মে ওয়ালাদ' বলা হয়।) হযরত উম্মে বাহনা' (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ "হে উম্মুল মু'মেনীন! আপনি কি যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)-কে চিনেন?' তিনি বলেন ঃ হাঁ। "তখন হযরত উম্মে বাহনা' (রাঃ) বলেনঃ ঐ যায়েদ বিন আরকামের (রাঃ) নিকট আমি আট শো'তে একটি গোলাম বিক্রি করি এই শর্তে যে, আতা' আসলে সে টাকা পরিশোধ করবে। এরপর তার নগদ টাকার প্রয়োজন হয় এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সে ঐ গোলামটি বিক্রি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আমি ছ'শোতে ক্রয় করে নেই।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'তুমি এবং সে উভয়েই খারাপ করেছো। এটা সম্পূর্ণ রূপে শরীয়ত বিরোধী কাজ। যাও যায়েদ বিন আরকামকে (রাঃ) বল যে, যদি সে তাওবা' না করে তবে তার জিহাদের পুণ্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে, যে জিহাদ সে নবী (সঃ)–এর সাথে করেছে।'

আমি বলি ঃ'যে দু'শো আমি তার কাছে পাবো তা যদি ছেড়ে দেই এবং ছ'শো আদায় করে নেই তা হলে আমি আটশোই পেয়ে যাবো। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "এতে কোন দোষ নেই।" অতঃপর তিনি فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ (২ঃ ২৭৫) এই আয়াতটি পড়ে শুনিয়ে দেন। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি

হাতিম) এটা একটি প্রসিদ্ধ হাদীস এবং এইটি ঐ লোকদের দলীল যাঁরা 'আয়নার মাসআলাকে হারাম বলে থাকেন। এই সম্বন্ধে আরও হাদীস রয়েছে। সেগুলোর স্থান হচ্ছে 'কিতাবুল আহকাম।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'সুদের নিষিদ্ধতা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পরেও যদি সে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ না করে তবে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। চিরকাল সে নরকে অবস্থান করবে।' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি এখন সুদ পরিত্যাগ করলো না, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।( সুনান -ই-আবি দাউদ)' مُخَابَرَةٌ শব্দের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ভূমিতে শস্যের বীজ বপন করলো এবং চুক্তি করলো ভূমির এই অংশে যা উৎপন্ন হবে, তা আমার এবং অবশিষ্ট তোমার।' مُزَابَنَةٌ শব্দের অর্থ এই যে, একটি লোক অপর একটি লোককে বলেঃ "তোমার এই গাছে যা খেজুর রয়েছে তা আমার এবং এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এই পরিমাণ খেজুর প্রদান করবো।" مُحَاقَلَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলেঃ 'তোমার শস্য ক্ষেত্রে যে শস্য রয়েছে তা আমি ক্রয় করছি এবং ওর বিনিময়ে আমার নিকট হতে কিছু শস্য তোমাকে প্রদান করছি।' ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতিগুলোকে শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যেন সুদের মূল কর্তিত হয়। এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনায় আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন এক রকম এবং কেউ বলেছেন অন্য রকম। বাস্তব কথা এই যে, এটা একটা জটিল বিষয়। এমন কি হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তিনটি জিজ্ঞাস্য বিষয় পূর্ণভাবে আমার বোধগম্য হয়নি। বিষয় তিনটি হচ্ছেঃ দাদার উত্তরাধিকার, পিতা-পুত্রহীনের উত্তরাধিকার এবং সুদের অবস্থাগুলো। অর্থাৎ সুদের কতকগুলো অবস্থা যেগুলোর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যে কারণগুলো ঐ পর্যন্ত নিয়ে যায়। তাহলে এগুলো যখন হারাম তখন ঐগুলোও হারাম হবে। যেমন ঐ জিনিসও ওয়াজিব হয়ে যায় যা ছাড়া অন্য ওয়াজিব পূর্ণ হয় না। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলো জিনিস সন্দেহযুক্ত রয়েছে। এগুলো হতে দূরে অবস্থানকারীগণ নিজেদের ধর্ম ও সম্মান বাঁচিয়ে নিলো। ঐ সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে পতিত ব্যক্তিরাই হচ্ছে হারামের মধ্যে পতিত ব্যক্তি। যেমন কোন রাখাল কোন এক ব্যক্তির রক্ষিত চারণ ভূমির আশে পাশে তার পশুপাল চরিয়ে থাকে। সেখানে

এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ঐ পশুপাল ঐ ব্যক্তির চারণ ভূমিতে ঢুকে পড়বে।' সুনানের মধ্যে হাদীস রয়েছে; রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে জিনিস তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা ছেড়ে দাও এবং যা পবিত্র তা গ্রহণ কর। অন্য হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'পাপ ওটাই যা অন্তরে খটকা দেয়, মনে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং যা জনগণের মধ্যে জানাজানি হওয়াটা তুমি পছন্দ কর না।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ 'তোমার মনকে ফতওয়া জিজ্ঞেস কর, যদিও মানুষ অন্য ফতওয়া প্রদান করে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'সুদের নিষিদ্ধতা সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী) হযরত উমার (রাঃ) বলতেনঃ 'বড়ই আফসোস যে, আমি সুদের তাফসীর পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারিনি এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলেন। হে জনমণ্ডলী! তোমরা সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ কর এবং প্রত্যেকে ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর যার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে। (মুসনাদ-ই- আহমাদ)

হযরত উমার (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেনঃ 'সম্ভবতঃ আমি তোমাদেরকে এমন কতকগুলো জিনিস হতে বিরত রাখবো যা তোমাদের জন্য উপকারী এবং এমন কতকগুলো জিনিসের নির্দেশ প্রদান করবো যা তোমাদের যুক্তিসিদ্ধতার বিপরীত। জেনে রেখো যে কুরআন মাজীদের মধ্যে সর্বশেষ সুদের নিষিদ্ধতারআয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি আমাদের সামনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। তোমরা এমন প্রত্যেক জিনিস পরিত্যাগ করবে যা তোমাদেরকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে।' (ইবনে মাজাহ) একটি হাদীসে রয়েছে যে, সুদের তেহাত্তরটি পাপ রয়েছে। সবচেয়ে হালকা পাপ হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যভিচার করা। আর সবচেয়ে বড় সুদ হচ্ছে মুসলমানের মান হানি করা। (মুসতাদরাক-ই-হাকিম)। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এমন যুগ আসবে যে, মানুষ সুদ গ্রহণ করবে।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'সবাই কি সুদ গ্রহণ করবে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'যে গ্রহণ করবে না তার কাছেও তার ধূলি পৌঁছবে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এই ধূলি হতে বাঁচবার উদ্দেশ্যে ঐ কারণগুলোর পার্শ্বে যাওয়াও উচিত নয় যেগুলো হারামের দিকে নিয়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন সূরা-ই-বাকারার শেষ আয়াতটি সুদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে এসে তা পাঠ করেন এবং সুদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেন। কোন কোন ইমাম বলেন যে, ঐ রকমই মদ্যপান ও ওর যে কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ঐ কারণসমূহ যেগুলো হারামের দিকে নিয়ে যায় ঐ সবই তিনি হারাম

বলে ঘোষণা করেন। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইয়াহূদীদেরকে আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত করেছেন; কেননা যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয় তখন তারা কৌশল অবলম্বন করতঃ ঐগুলো গলিয়ে বিক্রি করে এবং মূল্য গ্রহণ করে।' মোট কথা প্রতারণা করে হারামকে হালাল করার চেষ্টা করাও হারাম এবং এই রূপ যে করে সে অভিশপ্ত। অনুরূপভাবে পূর্বে বর্ণিত হাদীসেও রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে পূর্বে বর্ণিত স্বামীর জন্য বৈধ করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তার উপর এবং ঐ স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর উপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে। حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ (২ঃ ২৩০) এর তাফসীর দ্রষ্টব্য। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্য দানকারী এবং লিখকদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে।' তাহলে এটা স্পষ্ট কথা যে, সুদ লেখক ও সুদের সাক্ষ্যদাতাদের অযথা আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ স্কন্ধে বহন করার কি প্রয়োজন? ভাবার্থ এই যে, শরীয়তের বন্ধনে এনে কৌশল অবলম্বন করতঃ ঐ সুদের লেখা-পড়া করে এই জন্য তারাও অভিশপ্ত। হযরত আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) এই কৌশল খণ্ডন করার ব্যাপারে اِبْطَالُ التَّحْلِيْلِ নামে একখানা পৃথক পুস্তক রচনা করেছেন। কিতাবটি এই বিষয়ে উত্তম কিতাবই বটে।

---

٢٧٦- يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

**২৭৬। সুদকে আল্লাহ ক্ষয় করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি কৃতঘ্ন পাপাচারীদেরকে ভালবাসেন না।**

٢٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

**২৭৭। নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে, নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের জন্যে আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।**

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি সুদকে সমূলে ধ্বংস করেন। অর্থাৎ হয় ওটাকেই সরাসরি নষ্ট করেন, না হয় ওর বরকত নষ্ট করে থাকেন। দুনিয়াতেও ওটা ধ্বংসের কারণ হয় এবং পরকালেও শাস্তির কারণ হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ

অর্থাৎ "অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয় যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্ময়াভিভূত করে।" (৫ঃ ১০০) অন্য স্থানে রয়েছেঃ

وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِىْ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ 'তিনি মলিনতাপূর্ণ জিনিসকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে নরকে নিক্ষেপ করবেন।' (৮ঃ ৩৭) অন্যত্র রয়েছেঃ 'তোমাদেরকে প্রদত্ত সুদ দ্বারা তোমরা যে তোমাদের মালকে বৃদ্ধি করতে চাচ্ছ তা আল্লাহর নিকট বাড়ে না।' এই জন্যেই হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, সুদ বেশী হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কমেই যায়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ) মসজিদ হতে বেরিয়ে শস্য ছড়ানো দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ 'এই শস্য কোথা হতে এসেছে?' জনগণ বলেনঃ 'বিক্রির জন্যে এসেছে।' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ এতে বরকত দান করুন।" জনগণ বলেনঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! এই শস্য উচ্চ মূল্যে বিক্রির জন্যে পূর্ব হতেই জমা করে রেখেছিলো।' তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'কে জমা করে রেখেছিল? জনগণ বলেনঃ 'একজন হচ্ছে হযরত উসমানের (রাঃ) ক্রীতদাস ফারূক এবং অপর জন হচ্ছে আপনার আযাদকৃত গোলাম।' তিনি উভয়কে ডাকিয়ে আনেন এবং বলেনঃ 'তোমরা কেন এরূপ করেছিলে?' তারা বলেঃ আমরা আমাদের মাল দ্বারা ক্রয় করি এবং যখন ইচ্ছে হয় বিক্রি করি।' তিনি বলেনঃ 'জেনে রেখো, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছিঃ 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে খাদ্য শস্য জমা করে রাখে, তাকে আল্লাহ দরিদ্র করে দেবেন অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করবেন।' এই কথা শুনে হযরত ফারূক (রাঃ) বলেনঃ 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করছি এবং আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই কাজ আর করবো না।' কিন্তু হযরত উমারের (রাঃ) আযাদকৃত ক্রীতাদাস পুনরায় একথাই বলেঃ 'আমি আমার মাল দিয়ে ক্রয় করছি এবং লাভ নিয়ে বিক্রি করছি, আবার ক্ষতি কি?

হযরত ইয়াহইয়া (রঃ) বলেনঃ 'আমি তাকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।' সুনান-ই-ইবনে মাজাহয় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে খাদ্য শস্য বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ তাকে দরিদ্র করবেন বা কুষ্ঠ রোগী করবেন।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি দানকে বৃদ্ধি করে থাকেন।' 'য়ুরবী' শব্দটি অন্য পঠনে য়্যুরাব্বীও রয়েছে। সহীহ্ বুখারী শরীফে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি তার উপার্জন দ্বারা একটি খেজুরও দান করে, আল্লাহ তা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন, অতঃপর তোমাদের বাছুর পালনের মত তিনি তা পালন করেন এবং ওর পুণ্য পর্বত সম করে দেন; আর তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একটি খেজুরের পুণ্য উহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে থাকে। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ এক গ্রাস খাবারে উহুদ পাহাড়ের সমান পুণ্য পাওয়া যায়। সুতরাং তোমরা দান-খয়রাত করতে থাকো। অতঃপর বলা হচ্ছেঃ 'আল্লাহ কৃতঘ্ন পাপাচারীদেরকে ভালবাসেন না।' ভাবার্থ এই যে, যারা দান-খয়রাত করে না, আল্লাহ তা'আলার বেশী দেয়ার প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে দুনিয়ার মাল জমা করতে থাকে, জঘন্য ও শরীয়ত পরিপন্থী উপায়ে উপার্জন করে এবং বাতিল ও অন্যায়ভাবে জনগণের মাল ভক্ষণ করে তারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু। এই কৃতঘ্ন ও পাপীদের প্রতি মহান আল্লাহর ভালবাসা নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ঐ বান্দাদের প্রশংসা করা হচ্ছে যারা তাদের প্রভুর নির্দেশাবলী যথাযোগ্য পালন করে থাকে, সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে, নামায সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত প্রদান করে, তারা কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে নিরাপদ থাকবে। তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। বরং পরম করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে সেই দিন বড় বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

---

**২৭৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন কর।**

٢٧٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৭৯। কিন্তু যদি না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধ সম্বন্ধে সাবধান হও! এবং যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে তোমাদের জন্যে তোমাদের মূলধন রয়েছে– এবং তোমরা অত্যাচার করবে না ও তোমরাও অত্যাচারিত হবে না

٢٧٩- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৮০। আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তবে স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা কর এবং যদি তোমরা বুঝে থাক তবে তোমাদের জন্যে দান করাই উত্তম।

٢٨٠- وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৮১। আর তোমরা সেই দিনের ভয় কর– যেদিন তোমরা আল্লাহর পানে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন যে যা অর্জন করেছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।

٢٨١- وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ ع

---

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে ভয় করে ও ঐ কার্যাবলী হতে বিরত থাকে যেসব কার্যে তিনি অসন্তুষ্ট। তাই তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সদা লক্ষ্য রাখ, প্রতিটি কাজে তাঁকে ভয় করে চল এবং মুসলমানদের উপর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, সাবধান! যদি তোমরা মুসলমান হও তবে তা নিও না! কেননা এখন তা হারাম হয়ে গেছে। সাকীফ গোত্রের বানূ আমর বিন উমায়ের ও বানূ মাখযুম গোত্রের বানূ মুগীরার সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অজ্ঞতার যুগে তাদের মধ্যে সুদের কারবার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর বানূ আমর বানূ মুগীরার নিকট সুদ চাইতে থাকে। তারা বলেঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমরা তা দিতে পারি না।

অবশেষে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। মক্কার প্রতিনিধি হযরত আত্তাব বিন উসায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই সম্বন্ধে পত্র লিখেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানু আমর তাওবা করতঃ তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জেনে নেয়া সত্ত্বেও ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন সুদখোরকে বলা হবে–'তোমরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।' তিনি বলেনঃ 'যে সময়ে যিনি ইমাম থাকবেন তাঁর জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যারা সুদ পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে তাওবা করাবেন। যদি তারা তাওবা না করে তবে তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন।' হযরত হাসান বসরী (রঃ) ও হযরত ইবনে সীরীনেরও (রঃ) এটাই উক্তি।

হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেনঃ 'দেখ', আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করার ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য বলেছেন! সাবধান! সুদ হতে ও সুদের ব্যবসা হতে দূরে থাকবে। হালাল জিনিস ও হালাল ব্যবসা বহু রয়েছে। না খেয়ে থাকবে তথাপি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হবে না।' পূর্বে বর্ণিত বর্ণনাটিও স্মরণ থাকতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) সুদযুক্ত লেন দেনের ব্যাপারে হযরত যায়েদ বিন আরকামের (রাঃ) সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ 'তার জিহাদ নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা, জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর শত্রুদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নাম; অথচ সুদখোর নিজেই আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।' কিন্তু এর ইসনাদ দুর্বল। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–যদি তাওবা কর তবে তোমার আসল মাল যার নিকট রয়েছে তুমি অবশ্যই আদায় করবে। বেশী নিয়ে তুমিও তার উপর অত্যাচার করবে না এবং সেও তোমাকে কম দিয়ে বা আসলেই না দিয়ে তোমার উপর অত্যাচার করবে না। বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "অজ্ঞতার যুগের সমস্ত সুদ আমি ধ্বংস করে দিলাম। মূল সম্পদ গ্রহণ কর। বেশী নিয়ে তোমরাও কারও উপর অত্যাচার করবে না এবং কেউই তোমাদের মাল আত্মসাৎ করে তোমাদের উপরও অত্যাচার করবে না। হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের (রাঃ) সমস্ত সুদ আমি ধ্বংস করে দিচ্ছি।" এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার প্রাপ্য থাকে এবং সে তা পরিশোধ করতে

অক্ষমতা প্রকাশ করে তবে তাকে কিছুদিন অবকাশ দাও যে, সে আরও কিছুদিন পর তোমাকে তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে। সাবধান! দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে সুদ বৃদ্ধি করতে থাকবে না। বরং ঐ সব দরিদ্রের ঋণ ক্ষমা করে দেয়াই মহোত্তম কাজ। তাবরানীর হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ কামনা করে সে যেন এই প্রকারের দরিদ্রদেরকে অবকাশ দেয় বা ঋণ সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেয়। মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র লোকের উপর স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা প্রকাশ করে এবং তাকে অবকাশ দিয়ে থাকে; অতঃপর যতদিন পর্যন্ত সে তাকে তার প্রাপ্য পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত সে প্রতি দিন সেই পরিমাণ দানের পুণ্য পেতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সে প্রতিদিন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের পুণ্য পেতে থাকবে।' এই কথা শুনে হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পূর্বে আপনি ঐ পরিমাণ দানের পুণ্য প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। আর এখন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ পুণ্য প্রাপ্তির কথা বললেন?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হাঁ, যে পর্যন্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত না হবে সেই পর্যন্ত ওর সমপরিমাণ দানের পুণ্য লাভ করবে,এবং যখন মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের পুণ্য লাভ করবে।' একটি লোকের উপর হযরত কাতাদাহর (রাঃ) ঋণ ছিল। তিনি ঐ ঋণ আদায়ের তাগাদায় তার বাড়ী যেতেন; কিন্তু সে লুকিয়ে যেতো এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতো না। একদা তিনি তার বাড়ী আসলে একটি ছেলে বেরিয়ে আসে। তিনি তাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সে বলেঃ 'হাঁ, তিনি বাড়ীতেই আছেন এবং খানা খাচ্ছেন।' তখন হযরত কাতাদাহ (রাঃ) তাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেনঃ 'আমি জানলাম যে, তুমি বাড়ীতেই আছ সুতরাং বাইরে এসো এবং উত্তর দাও। ঐ বেচারা বাইরে আসলে তিনি তাকে বলেনঃ 'লুকিয়ে থাকছো কেন?' লোকটি বলেঃ 'জনাব, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমি একজন দরিদ্র লোক। এখন আমার নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ নেই। তাই, লজ্জায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি না।' তিনি বলেনঃ 'শপথ কর। 'সে শপথ করলো । এ দেখে তিনি কান্নায় ফেটে পড়লেন এবং বললেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছিঃ 'যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।' (সহীহ মুসলিম)

হযরত আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন একটি লোককে আল্লাহ তা'আলার সামনে আনয়ন করা হবে। তাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেনঃ 'বল, তুমি আমার জন্যে কি পুণ্য করেছো?' সে বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আমি এমন একটি অণুপরিমাণও পুণ্যের কাজ করতে পারিনি যার প্রতিদান আমি আপনার নিকট যাচ্ঞা করতে পারি।' আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করবেন এবং সে এই উত্তরই দেবে। আল্লাহ পাক আবার জিজ্ঞেস করবেন। এবার লোকটি বলবেঃ হে আল্লাহ! একটি সামান্য কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে কিছু মালও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ব্যবসায়ী লোক ছিলাম। লোক আমার নিকট হতে ধার কর্জ নিয়ে যেতো। আমি যখন দেখতাম যে, এই লোকটি দরিদ্র এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে সে কর্জ পরিশোধ করতে পারলো না, তখন আমি তাকে আরও কিছুদিন অবকাশ দিতাম। ধনীদের উপর ও পীড়াপীড়ি করতাম না। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দিতাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ তাহলে আমি তোমার পথ সহজ করবো না কেন? আমি তো সর্বাপেক্ষা বেশী সহজকারী। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি বেহেশতে চলে যাও।"

'মুসতাদরাক-ই-হাকিম' গ্রন্থে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী যোদ্ধাকে সাহায্য করে বা দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে সাহায্য দেয় অথবা মুকাতাব গোলামকে (যে গোলামকে তার মনিব বলে দিয়েছেন, তুমি আমাকে এত টাকা দিলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে।) সাহায্য দান করে, তাকে আল্লাহ ঐ দিন ছায়া দান করবেন যেই দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। মুসনাদ-ই-আহমাদ' গ্রন্থে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার প্রার্থনা কবুল করা হোক এবং তার কষ্ট ও বিপদ দূর করা হোক সে যেন অস্বচ্ছল লোকদের উপর স্বচ্ছলতা আনয়ন করে।' হযরত আব্বাদ বিন ওয়ালিদ (রঃ) বলেনঃ 'আমি ও আমার পিতা বিদ্যানুসন্ধানে বের হই এবং আমরা বলি যে, আনসারদের নিকট হাদীস শিক্ষা করবো। সর্বপ্রথম হযরত আবুল ইয়াসারের (রাঃ) সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর সাথে তাঁর একটি গোলাম ছিল, যার হাতে একখানা খাতা ছিল। গোলামও মনিব একই পোষাক পরিহিত ছিলেন। আমার পিতা তাঁকে বলেনঃ'এই সময় আপনাকে দেখে রাগান্বিত বলে মনে হচ্ছে।' তিনি বলেনঃ হাঁ, অমুক ব্যক্তির উপর আমার কিছু ঋণ ছিল। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। ঋণ আদায়ের জন্যে আমি তার বাড়ীতে গমন করি। সালাম দিয়ে সে বাড়ীতে আছে কি-না জিজ্ঞেস করি। 'বাড়ীতে নেই' এই উত্তর আসে। ঘটনাক্রমে তার ছোট ছেলে বাইরে আসে। তাকে জিজ্ঞেস করিঃ 'তোমার আব্বা কোথায় রয়েছে?' সে বলেঃ 'আপনার শব্দ শুনে তিনি খাটের

নীচে লুকিয়ে গেছেন।' আমি আবার ডাক দেই এবং বলিঃ তুমি যে ভিতরে রয়েছো তা আমি জানতে পেরেছি। সুতরাং লুকিয়ে থেকো না বরং এসে উত্তর দাও।' সে আসে আমি বলিঃ 'লুকিয়ে ছিলে কেন?' সে বলেঃ 'আমার নিকট এখন অর্থ নেই। সুতরাং সাক্ষাৎ করলে হয় আমাকে মিথ্যা ওজর পেশ করতে হবে, না হয় মিথ্যা অঙ্গীকার করতে হবে। তাই আমি আপনার সামনে আসতে লজ্জাবোধ করছিলাম। আপনি আল্লাহর রাসূলের (সঃ) সাহাবী। সুতরাং আপনাকে মিথ্যা কথা কি করে বলি?' আমি বলিঃ 'তুমি আল্লাহর শপথ করে বলছো যে, তোমার নিকট অর্থ নেই?' সে বলে—হাঁ, আল্লাহর কসম! আমার নিকট কোন অর্থ নেই।' তিনবার আমি তাকে শপথ করিয়ে নেই, সে তিনবারই শপথ করে। আমি খাতা হতে তার নাম কাটিয়ে নেই এবং 'ঋণের অর্থ পরিশোধ' লিখে নেই। অতঃপর তাকে বলিঃ 'যাও, তোমার নাম হতে এই অংক কেটে দিলাম। এরপর যদি অর্থ পেয়ে যাও তবে আমার এই ঋণ পরিশোধ করে দেবে, নচেৎ তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। জেনে রেখো, আমার এই চক্ষু যুগল দেখেছে, আমার এই কর্ণদ্বয় শুনেছে এবং আমার অন্তঃকরণ বেশ মনে রেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন।'

মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে আগমন করেন। মাটির দিকে মুখ করে তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন নিঃস্বের পথ সহজ করবে বা তাকে ক্ষমা করে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নরকের প্রখরতা হতে রক্ষা করবেন। জেনে রেখো যে, বেহেশতের কাজ দুঃখজনক ও প্রবৃত্তির প্রতিকূল এবং নরকের কাজ সহজ ও প্রবৃত্তির অনুকূল। ঐ লোকেরাই পুণ্যবান যারা ফিতনা ও গণ্ডগোল হতে দূরে থাকে। মানুষ ক্রোধের যে চুমুক পান করে নেয় ঐ চুমুক আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। যারা এই রূপ করে তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলা ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেন।'

তাবরানীর হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ব্যক্তির উপর দয়া প্রদর্শন করতঃ স্বীয় ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার পাপের জন্যে ধরেন না, শেষ পর্যন্ত সে তাওবা করে। অতপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার লয় ও ক্ষয়, মালের ধ্বংসশীলতা, পরকালের আগমন, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন, আল্লাহ্ তা'আলাকে নিজেদের কাজের হিসাব প্রদান এবং সমস্ত কার্যের প্রতিদান প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ও তাঁর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন।

এও বর্ণিত আছে যে, কুরআন কারীমের এটাই সর্বশেষ আয়াত। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাত্র নয় দিন জীবিত ছিলেন এবং রবিউল আওয়াল মাসের ২রা তারিখ সোমবার দিন তিনি এই নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি বর্ণনায় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একত্রিশ দিন জীবিত থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেনঃ পূর্ববর্তী মনীষীদের উক্তি এই যে, এর পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) নয় দিন জীবিত ছিলেন। শনিবার হতে আরম্ভ হয় এবং তিনি সোমবারে ইন্তেকাল করেন। মোটকথা, কুরআন মাজীদের মধ্যে সর্বশেষ এই আয়াতটিই অবতীর্ণ হয়।

---

٢٨٢- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ

২৮২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, যখন তোমরা কোন নির্দিষ্টকালের জন্যে ধারের আদান-প্রদান করবে– তখন তা লিখে নাও; আর কোন একজন লেখক যেন ন্যায্য ভাবে তোমাদের মধ্যে (ঐ আদান-প্রদানের দলীল) লিখে দেয়, আর কোন লেখক যেন (দলীল) লিখে দিতে অস্বীকার না করে– আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তার লিখে দেয়া উচিত এবং যে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব সেও লিখিয়ে নেবে এবং তার উচিত যে, স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা ও ওর মধ্যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করা; অনন্তর যার উপর দায়িত্ব সে যদি নির্বোধ বা অযোগ্য অথবা লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তবে তার অভিভাবকেরা ন্যায় সঙ্গত ভাবে লিখিয়ে নেবে এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন

رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا
فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا
يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ
وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ
ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ
وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ وَاِنْ
تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করবে; কিন্তু যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী মনোনীত করবে, যদি নারীদ্বয়ের একজন ভুলে যায় তবে উভয়ের একজন অপর জনকে স্মরণ করিয়ে দেবে; এবং যখন আহ্বান করা হয় তখন সাক্ষীগণের অস্বীকার না করা উচিত, এবং ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিখে দিতে তোমরা অবহেলা করো না, এটা আল্লাহর নিকট অতি সঙ্গত এবং সাক্ষ্যের জন্যে এটাই দৃঢ়তা ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু যদি তোমরা কারবারে পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলে তোমাদের পক্ষে দোষ নেই; এবং পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করার সময় সাক্ষী রাখবে, এবং লেখককে ও সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়; আর যদি কর তবে তা নিশ্চয় তোমাদের পক্ষে অনাচার এবং আল্লাহকে ভয় কর ও আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

কুরআন কারীমের মধ্যে এই আয়াতটি সবচেয়ে বড় আয়াত। হযরত সাইদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) বলেনঃ "আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে আরশের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা নতুন আয়াত ঋণের এই আয়াতটিই। আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ হযরত আদমই (আঃ) অস্বীকারকারী। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পৃষ্ঠদেশে হাত বুলিয়ে দেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর যতগুলো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সবাই বেরিয়ে আসে। হযরত আদম (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে স্বচক্ষে দেখতে পান। একজনকে অত্যন্ত হৃষ্ট পুষ্ট ও ঔজ্জ্বল্যময় দেখে জিজ্ঞেস করেন- 'হে আল্লাহ! এর নাম কি?' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এটা তোমার সন্তান দাউদ (আঃ)'। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'তার বয়স কত?' আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ষাট বছর।' তিনি বলেনঃ 'তার বয়স আরও কিছুদিন বাড়িয়ে দিন!' আল্লাহ তা'আলা বলেন–না, তা হবে না। তবে তুমি যদি তোমার বয়সের মধ্য হতে তাকে কিছু দিতে চাও তবে দিতে পার। তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আমার বয়সের মধ্য হতে চল্লিশ বছর তাকে দেয়া হোক। সুতরাং তা দেয়া হয়। হযরত আদম (আঃ) এর প্রকৃত বয়স ছিল এক হাজার বছর। বয়সের এই আদান -প্রদান লিখে নেয়া হয় এবং ফেরেশতাদেরকে ওর উপর সাক্ষী রাখা হয়। হযরত আদমের (আঃ)-মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আমার বয়সের এখনও তো চল্লিশ বছর অবশিষ্ট রয়েছে?' আল্লাহ তা'আলা তখন বলেনঃ 'তুমি তোমার সন্তান দাউদ (আঃ)-কে চল্লিশ বছর দান করেছো।' হযরত আদম (আঃ) তা অস্বীকার করেন। তখন তাঁকে ঐ লিখা দেখানো হয় এবং ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর বয়স এক হাজার বছর পূর্ণ করেছিলেন। এবং হযরত দাউদ (আঃ) এর বয়স করেছিলেন একশো বছর। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) কিন্তু এই হাদীসটি অত্যন্ত গারীব। এর একজন বর্ণনাকারী আলী বিন যায়েদ বিন জাদআন হতে বর্ণিত হাদীসগুলো অগ্রাহ্য হয়ে থাকে। মুসতাদরাক-ই-হাকিমের মধ্যেও এই বর্ণনাটি রয়েছে।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন-আদান-প্রদান লিখে রাখে, তা হলে ঋণের পরিমাণ ও নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে কোন গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে না। এতে সাক্ষীরাও ভুল করবে না। এর দ্বারা ঋণের জন্যে একটি সময় নির্ধারিত করার বৈধতাও সাব্যস্ত হচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেনঃ 'সময় নির্ধারণ করে ঋণ আদান-প্রদানের অনুমতি এই আয়াত দ্বারা সুন্দরভাবে সাব্যস্ত হচ্ছে। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, মদীনাবাসীদের ঋণ অদান-প্রদান দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেন,—"তোমরা মাপ বা ওজন নির্ধারণ করবে, দর চুকিয়ে নেবে এবং সময়েরও ফায়সালা করে নেবে"। কুরআন কারীমে নির্দেশ হচ্ছে—'তোমরা লিখে রাখ।' আর হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমরা নিরক্ষর উম্মত, না আমরা লিখতে জানি, না হিসাব জানি।" এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এইভাবে যে, ধর্মীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়াবলী এবং শরীয়তের বিধানসমূহ লিখার মোটেই প্রয়োজন নেই। স্বয়ং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এগুলো অত্যন্ত সহজ করে দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে মুখস্থ রাখা মানুষের জন্যে প্রকৃতিগতভাবেই সহজ। কিন্তু ইহলৌকিক ছোট খাট আদান-প্রদান ও ধার-কর্জের বিষয়গুলো অবশ্যই লিখে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এটাও স্মরণ রাখবার বিষয় যে, এই নির্দেশ ফরযের জন্যে নয়। সুতরাং না লিখা ধর্মীয় কার্যে এবং লিখে রাখা সাংসারিক কার্যে প্রযোজ্য। কেউ কেউ এই লিখে রাখাকে ফরযও বলেছেন। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেছেন, যে ধার দেবে সে লিখে রাখবে এবং যে বিক্রি করবে সে সাক্ষী রাখবে। হযরত আবূ সুলাইমান মিরআশী (রঃ) বহুদিন হযরত কা'বের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি একদা তাঁর পার্শ্ববর্তী লোকদের বলেন—'ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে অথচ তার প্রার্থনা গ্রহণীয় হয় না, তোমরা তার পরিচয় জান কি?' তারা বলে—এটা কিরূপে? তিনি বলেন, এটা ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি একটা নির্ধারিত সময়ের জন্যে ধার দেয় কিন্তু সাক্ষীও রাখে না বা লিখেও রাখে না। অতঃপর নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে তাগাদা শুরু করে এবং ঋণী ব্যক্তি তা অস্বীকার করে। তখন এই লোকটি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে কিন্তু তার; প্রার্থনা গৃহীত হয় না। কেননা,সে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত করেছে। সুতরাং সে তাঁর অবাধ্য হয়েছে। হযরত আবূ সাঈদ (রঃ), শা'বী (রঃ), রাবী' বিন আনাস (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), ইবনে জুরাইজ (রঃ), ইবনে যায়েদ (রঃ) প্রমূখের উক্তি এই যে, এইভাবে লিখে পড়ে রাখার কাজটি প্রথমে অবশ্যকরণীয় কাজ ছিল। কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে যায়। পরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ

অর্থাৎ 'যদি তোমাদের একের অপরের প্রতি আস্থা থাকে তবে যার নিকট তার আমানত রাখা হবে তা যেন সে আদায় করে দেয় (২ঃ ২৮৩)।' ওর দলীল

হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি। এই ঘটনাটি পূর্ব যুগীয় উম্মতের হলেও তাদের শরীয়তই আমাদের শরীয়ত, যদি আমাদের শরীয়ত তা অস্বীকার না করে। যে ঘটনা আমরা এখন বর্ণনা করতে যাচ্ছি তাতে লিখা পড়া না হওয়া এবং সাক্ষী ঠিক না রাখাকে আইন রচয়িতা (সঃ) অস্বীকার করেননি। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বানী ইসরাঈলের একটি লোক অন্য একটি লোকের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার চায়। সে বলেঃ 'সাক্ষী আন।' সে বলেঃ 'আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।' সে বলেঃ 'জামানত আন।' সে বলে 'আল্লাহ পাকের জামানতই যথেষ্ট।' তখন ঋণ দাতা লোকটিকে বলেঃ 'তুমি সত্যই বলছো।' অতঃপর ঋণ আদায়ের সময় নির্ধারিত হয় এবং সে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা গুনে দেয়। এরপর ঋণ গ্রহীতা লোকটি সামুদ্রিক ভ্রমণে বের হয় এবং নিজের কাজ হতে অবকাশ লাভ করে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেলে সে সমুদ্রের তীরে আগমন করে। তার ইচ্ছে এই যে, কোন জাহাজ আসলে তাতে উঠে বাড়ী চলে আসবে এবং ঐ লোকটির ঋণ পরিশোধ করে দেবে। কিন্তু কোন জাহাজ পেলো না। এখন সে দেখলো যে, সে সময় মত পৌঁছতে পারবে না। তখন সে একখানা কাঠ নিয়ে খোদিত করলো এবং তাতে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা রেখে দিলো ও এক টুকরো কাগজও রাখলো। অতঃপর ওর মুখ বন্ধ করে দিলো এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলো, হে প্রভু! আপনি খুব ভাল জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার করেছি। সে আমার নিকট জামানত চাইলে আমি আপনাকেই জামিন দেই এবং তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সে সাক্ষী উপস্থিত করতে বললে আমি আপনাকেই সাক্ষী রাখি। সে তাতেও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এখন যখন সময় শেষ হতে চলেছে তখন আমি সদা নৌকা অনুসন্ধান করতে থাকি যে, নৌকা যোগে বাড়ী গিয়ে কর্জ পরিশোধ করবো। কিন্তু কোন নৌকা পাওয়া যায়নি। এখন আমি সেই অংক আপনাকেই সমর্পণ করছি এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করছি ও প্রার্থনা করছি যে,আপনি এই মুদ্রা তার নিকট পৌঁছিয়ে দিন।' অতঃপর সে ঐ কাঠটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং নিজে চলে আসে। কিন্তু তবুও সে নৌকার খোঁজেই থাকে যে, নৌকা পেলে চলে যাবে। এখানে তো এই হলো। আর ওখানে যে ব্যক্তি তাকে ঋণ দিয়েছিলো সে যখন দেখলো যে, সময় হয়ে গেছে এবং আজ তার যাওয়া উচিত। কাজেই সেও সমুদ্রের ধারে আসে যে ঐ ঋণ গ্রহীতা আসবে এবং তাকে তার ঋণ পরিশোধ করবে কিংবা কারও হাতে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল কোন নৌকা এলো না তখন সে ফিরে আসার মনস্থ

করলো। সমুদ্রের ধারে একটি কাঠ দেখে মনে করলো, বাড়ী তো খালি হাতেই যাচ্ছি কাঠটি নিয়ে যাই। একে ফেড়ে শুকিয়ে জ্বালানি কাঠ রূপে ব্যবহার করা যাবে। বাড়ী পৌঁছে কাঠটিকে ফাড়া মাত্রই ঝন ঝন করে বেজে উঠে স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে আসে। গণনা করে দেখে যে, পুরো এক হাজারই রয়েছে। তথায় কাগজ খণ্ডের উপর দৃষ্টি পড়ে। ওটা উঠিয়ে পড়ে নেয়। অতঃপর একদিন ঐ লোকটিই এসে এক হাজার দীনার পেশ করতঃ বলে–'আপনার প্রাপ্য মুদ্রা গ্রহণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন। আমি সদা অঙ্গীকার ভঙ্গ না করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নৌকা না পাওয়ার কারণে বিলম্ব করতে বাধ্য হয়েছি। আজ নৌকা পাওয়ায় মুদ্রা নিয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি।' তখন ঐ ঋণ দাতা লোকটি বলে 'আপনি আমার প্রাপ্য পাঠিয়েও দিয়েছিলেন কি? সে বলে, 'আমি তো বলেই দিয়েছি যে, আমি নৌকা পাইনি।' সে বলে, 'আপনি আপনার অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যান। আপনি মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করতঃ কাঠের মধ্যে ভরে যে মুদ্রা নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন তা আল্লাহ আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং আমি আমার পূর্ণ প্রাপ্য পেয়েছি।' এই হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ সঠিক। সহীহ বুখারীর মধ্যে সাত জায়গায় এই হাদীসটি এসেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, লেখক যেন ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে লিখে। লিখার ব্যাপারে যেন কোন দলের উপর অত্যাচার না করে, এদিকে ওদিকে কিছু কম বেশী না করে। বরং আদান-প্রদানকারী একমত হয়ে যা তাকে লিখতে বলবে ঠিক তাই যেন সে লিখে দেয়। যেমন তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি তাকে লিখা–পড়া শিখিয়েছেন, তেমনই যারা লিখা-পড়া জানে না সেও যেন তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতঃ তাদের আদান প্রদান ঠিকভাবে লিখে দেয়। হাদীস শরীফে এসেছেঃ কোন কার্যরত ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং কোন পতিত ব্যক্তির কাজ করে দেয়াও সাদকা। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে বিদ্যা জেনে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।'

হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত আতা' (রঃ) বলেনঃ "এই আয়াতের ধারা অনুসারে লিখে দেয়া লেখকের উপর ওয়াজিব।" লিখিয়ে নেয়ার দায়িত্ব যার উপর রয়েছে সে যেন হক ও সত্যের সঙ্গে লিখিয়ে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতঃ যেন বেশী-কম না করেও বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যদি এই লোকটি অবুঝ হয়, দুর্বল হয়, নাবালক হয়, জ্ঞান ঠিক না থাকে কিংবা

নির্বুদ্ধিতার কারণে লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয়, তবে তার অভিভাবক ও বড় মানুষ লিখিয়ে নেবে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, লিখার সাথে সাথে সাক্ষ্যও হতে হবে, যেন এই আদান-প্রদানের ব্যাপারটি খুবই শক্ত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা দু'জন পুরুষ লোককে সাক্ষী করবে। যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী হলেও চলবে। এই নির্দেশ ধন-সম্পদের ব্যাপারে এবং সম্পদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে রয়েছে। স্ত্রী লোকের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই দু'জন স্ত্রী লোককে একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হে স্ত্রী লোকেরা! তোমরা দান-খয়রাত কর এবং খুব বেশী আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি জাহান্নামে তোমাদেরই সংখ্যা বেশী দেখেছি।' একজন স্ত্রী লোক বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর কারণ কি?' তিনি বলেন, 'তোমরা খুব বেশী অভিশাপ দিয়ে থাক এবং তোমাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমাদের জ্ঞান ও দ্বীনের স্বল্পতা সত্ত্বেও পুরুষদের জ্ঞান হরণকারিণী তোমাদের অপেক্ষা বেশী আর কেউ নেই।' সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, 'দ্বীন ও জ্ঞানের স্বল্পতা কিরূপে?' তিনি উত্তরে বলেন, জ্ঞানের স্বল্পতা তো এর দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে যে, দু'জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের সমান আর দ্বীনের স্বল্পতা এই যে, তোমাদের ঋতুর অবস্থায় তোমরা নামায পড় না ও রোযা কাযা করে থাক।'

সাক্ষীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। ইমাম শাফিঈর (রঃ) মাযহাব এই যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে যেখানেই সাক্ষীদের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে শব্দে না থাকলেও ভাবার্থে ন্যায়পরায়ণতার শর্ত অবশ্যই রয়েছে। যারা ন্যায়পরায়ণ নয় তাদের সাক্ষ্য যাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন, এই আয়াতটিই তাদের দলীল। তাঁরা বলেন যে, সাক্ষীগণকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। দু'জন স্ত্রী লোক নির্ধারণ করারও দূরদর্শিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি একজন ভুলে যায় তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। ফাতুজাক্কিরা শব্দটি অন্য পঠনে ফাতুজাক্কিরুও রয়েছে। যাঁরা বলেন যে, একজন স্ত্রীর সাক্ষ্য অন্য স্ত্রীর সাক্ষ্যের সাথে মিলে যায় তখন তা পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের মতই হয়ে যায়, এটা তাঁদের মন গড়া কথা। প্রথম উক্তিটিই সঠিক। বলা হচ্ছে, সাক্ষীদেরকে ডাকা হলে তারা যেন অস্বীকার না করে অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা

হবে তোমরা এসো ও সাক্ষ্য প্রদান কর, তখন তারা যেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করে। যেমন লেখকদের ব্যাপারেও এটাই বলা হয়েছে। এখান থেকে এই উপকারও লাভ করা যাচ্ছে যে, সাক্ষী থাকা ফরযে কেফায়া। 'জমহূরের মাযহাব এটাই' এ কথাও বলা হয়েছে। এই অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে ডাক দেয়া হবে অর্থাৎ যখন তাদেরকে ঘটনা জিজ্ঞেস করা হবে তখন যেন তারা সাক্ষ্য দেয়ার কাজ হতে বিরত না থাকে। হযরত আবূ মুজাল্লায (রঃ), মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ বলেন যে, যখন সাক্ষী হওয়ার জন্য কাউকে ডাকা হবে তখন তার সাক্ষী হওয়ার বা না হওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সাক্ষী হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আহবান করা হলে অবশ্যই যেতে হবে। সহীহ মুসলিম ও সুনানের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'উত্তম সাক্ষী তারাই যারা সাক্ষ্য না চাইতেই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, 'জঘন্যতম সাক্ষী তারাই যাদের নিকট সাক্ষ্য না চাইতেই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে' এবং সেই হাদীসটি–যার মধ্যে রয়েছে যে, 'এমন লোক আসবে যাঁদের শপথ সাক্ষ্যের উপর ও সাক্ষ্য শপথের উপর অগ্রে অগ্রে থাকবে তাতে জানা যাচ্ছে যে, এইসব নিন্দে সূচক কথা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং উপরের ঐ প্রশংসামূলক কথা সত্য সাক্ষ্য প্রদানকারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এইভাবেই এই পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোর মধ্যে অনুরূপতা দান করা হবে। এই হাদীসসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন, 'সাক্ষ্য দিতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা উচিত নয়। এই দু'টোই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, বিষয় বড়ই হোক আর ছোটই হোক, সময়ের মেয়াদ ইত্যাদি লিখে নাও। আমার এই নির্দেশ ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী এবং সাক্ষ্যের সঠিকতা সাব্যস্তকারী।' কেননা,নিজের লিখা দেখে বিস্মৃত কথাও স্মরণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে লিখা না থাকলে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়ে থাকে। লিখা থাকলে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কেননা, মতানৈক্যের সময় লিখা দেখে নিঃসন্দেহে মীমাংসা করা যেতে পারে।

এরপর বলা হচ্ছে যে, 'যদি নগদ ক্রয়-বিক্রয় হয় তবে বিবাদের কোন সম্ভাবনা নেই বলে না লিখলেও কোন দোষ নেই। এখন রইলো সাক্ষ্য। এই

ব্যাপারে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) বলেন যে, ধার হোক আর নগদই হোক সর্বাবস্থাতেই সাক্ষী রাখতে হবে। অন্যান্য মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ এই কথা বলে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশও উঠিয়ে নিয়েছেন। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, জমহূরের মতে এই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্যে নয়, বরং এর মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে বলে মুস্তাহাব হিসেবে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি যার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়-বিক্রয় করেছেন কিন্তু সাক্ষী রাখেননি। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন বেদুঈনের নিকট হতে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। বেদুঈন মূল্য নেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর বাড়ীর দিকে আসে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুব দ্রুত চলছিলেন এবং বেদুঈনটি ধীরে ধীরে চলছিল। ঘোড়াটি যে বিক্রি হয়ে গেছে এ সংবাদ জনগণ জানতো না বলে তারা ঐ ঘোড়ার দাম করতে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ঘোড়াটি যে দামে বিক্রি করেছিল তার চেয়ে বেশী দাম লেগে যায়। বেদুঈন নিয়্যত পরিবর্তন করতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ডাক দিয়ে বলে—'জনাব, আপনি হয় ঘোড়াটি ক্রয় করুন, না হয় আমি অন্যের হাতে বিক্রি করে দেই।' একথা শুনে নবী (সঃ) থেমে যান এবং বলেন—'তুমি তো ঘোড়াটি আমার হাতে বিক্রি করেই ফেলেছো; সুতরাং এখন আবার কি বলছো?' বেদুঈনটি তখন বলে, 'আল্লাহর শপথ! আমি বিক্রি করিনি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমার ও আমার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে গেছে।' এখন এদিক ওদিক থেকে লোক একথা ওকথা বলতে থাকে। ঐ নির্বোধ তখন বলে, আমি আপনার নিকট বিক্রি করেছি তার সাক্ষী আনয়ন করুন। মুসলমানগণ তাকে বারবার বলে, ওরে হতভাগা! তিনি তো আল্লাহর রাসূল, তাঁর মুখ দিয়ে তো সত্য কথাই বের হয়। কিন্তু তার এই একই কথা—সাক্ষ্য আনয়ন করুন। এমন সময় হযরত খুযাইমা (রাঃ) এসে পড়েন এবং বেদুঈনের কথা শুনে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ঘোড়াটি বিক্রি করেছো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেন, তুমি কি করে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তিনি বলেন, আপনার সত্যবাদিতার উপর ভিত্তি করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আজ খুযাইমার (রাঃ) সাক্ষ্য দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু মঙ্গল ওর মধ্যেই রয়েছে যে, ব্যবসা বাণিজ্যেরও সাক্ষী রাখতে হবে। কেননা, তাফসীরে ইবনে মিরদুওয়াই ও মুসতাদরাক-ই-হাকিমের মধ্যে রয়েছে,

তিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে; কিন্তু তাদের প্রার্থনা কবুল হয় না। প্রথম ঐ ব্যক্তি যার ঘরে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী রয়েছে অথচ সে তাকে পরিত্যাগ করে না। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে পিতৃহীনকে তার মাল তার প্রাপ্ত বয়সের পূর্বেই সমর্পণ করে। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে কাউকে মাল ধার দেয় কিন্তু সাক্ষী রাখে না। ইমাম হাকিম (রঃ) হাদীসটিকে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের শর্তের উপর সহীহ্ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) হাদীসটিকে তাঁদের কিতাবে আনেননি। তার কারণ এই যে, হযরত শু'বার (রঃ) শিষ্য এই বর্ণনাটিকে হযরত আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) উপর মাওকুফ বলে থাকেন। অর্থাৎ সনদ নবী (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছেনি।

এর পর বলা হচ্ছে যে, যা লিখিয়ে নিচ্ছে লেখক যেন তার বিপরীত কথা না লিখে। অনুরূপভাবে সাক্ষীরও উচিত যে, সে যেন মূল ঘটনার উল্টো সাক্ষ্য না দেয় বা যেন সাক্ষ্য প্রদানে কার্পণ্য না করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ মনীষীর এটাই উক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই দু'জনকে কষ্ট দেয়া হবে না' এর ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, যেমন কেউ তাদেরকে ডাকতে গেল। সেই সময় তারা তাদের কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এই লোকটি তাদেরকে বলে ঐ কাজ দু'টো সম্পাদন করা তোমাদের উপর ফরয। সুতরাং নিজেদের ক্ষতি করে তথায় তোমাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে।' এ কথা তাদেরকে বলার অধিকার তার নেই। অন্যান্য বহু মনীষী হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–'আমি যা করতে নিষেধ করি তা করা এবং যা করতে বলি তা হতে বিরত থাকা চরম অন্যায়। এর শাস্তি তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তোমরা প্রতিটি কাজে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করতঃ তাঁকে ভয় করে চল, তাঁর আদেশ পালন কর এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকো।' যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا-

অর্থাৎ 'হে ইমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চল তবে তিনি তোমাদেরকে দলীল প্রদান করবেন।' (৮ঃ ২৯) অন্য স্থানে রয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস রেখো, তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ করুণা দান করবেন এবং তোমাদেরকে এমন

নূর দান করবেন যার ঔজ্জ্বল্যে তোমরা চলতে থাকবে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন 'কার্যসমূহের পরিণাম এবং গূঢ় রহস্য সম্পর্কে, ঐগুলোর মঙ্গল ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই; তাঁর জ্ঞান সারা জগৎকে ঘিরে রয়েছে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই প্রকৃত জ্ঞান তাঁর রয়েছে।

**২৮৩। এবং যদি তোমরা প্রবাসে থাক ও লেখক না পাও, তবে দখলী বন্ধকঃ অনন্তর কেউ যদি কাউকে বিশ্বাস করে তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার পক্ষে গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা উচিত এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা ও সাক্ষ্য গোপন না করা উচিত; এবং যে কেউ তা গোপন করবে, নিশ্চয় তার মন পাপাচারী; বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাতা।**

٢٨٣- وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ع

অর্থাৎ বিদেশে যদি ধারের আদান-প্রদান হয় এবং কোন লেখক পাওয়া না যায় অথবা কলম, কালি, কাগজ ইত্যাদি না থাকে তবে বন্ধক রাখো এবং যে জিনিস বন্ধক রাখবে তা ঋণ দাতার অধিকারে দিয়ে দাও। مَّقْبُوضَةٌ শব্দ দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, বন্ধক যে পর্যন্ত অধিকারে না আসবে সেই পর্যন্ত তা অপরিহার্য হবে না। এটাই ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও জমহূরের মাযহাব। অন্য দল এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করেছে তার হাতেই বন্ধকের জিনিস রাখা জরুরী। ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং অন্য একটি দল হতে এটাই নকল করা হয়েছে। অন্য একটি দলের উক্তি এই যে, শরীয়তে শুধুমাত্র সফরের জন্যেই বন্ধকের বিধান রয়েছে। যেমন হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি মনীষীর উক্তি। কিন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে,যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁর লৌহ বর্মটি

আবুশ শাহাম নামক একজন ইয়াহূদীর নিকট তিন 'ওয়াসাক' যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল, যে যব তিনি স্বীয় পরিবারের খাবারের জন্যে গ্রহণ করেছিলেন । এইসব জিজ্ঞাস্য বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জায়গা তাফসীর নয়। বরং তার জন্যে বড় বড় আহ্কামের কিতাব রয়েছে। এর পরবর্তী বাক্য فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ দ্বারা পূর্বের নির্দেশ রহিত হয়েছে। শা'বী (রঃ) বলেন যে, যখন না দেয়ার ভয় থাকবে না তখন লিখে না রাখলে বা সাক্ষী না রাখলে কোন দোষ নেই।

যার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হবে তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'হাতের উপরে রয়েছে যা তুমি গ্রহণ করেছো যে পর্যন্ত না তুমি আদায় কর।' আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সাক্ষ্য গোপন করো না, বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তা প্রকাশ করা হতে বিরত হয়ো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাক্ষ্যকে গোপন করা বড় পাপ (কবিরা গুনাহ)। এখানেও বলা হচ্ছে যে, সাক্ষ্য গোপনকারীর মন পাপাচারী। অন্যস্থানে রয়েছেঃ

وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ -

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করি না, এবং যদি আমরা এরূপ করি তবে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। (৫ঃ ১০৬) অন্যত্র রয়েছেঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে আল্লাহর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতার এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূলে হয়; যদি সে ধনী হয় বা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তাদের অপেক্ষা উত্তম, অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও বা এড়িয়ে চল তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত রয়েছেন।' এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, সাক্ষ্য গোপনকারীর অন্তর পাপাচারী এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক জ্ঞাতা।'

---

**২৮৪। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর; এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তার**

٢٨٤- لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ

بِهِ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন, অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি। ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয় বিষয়সমূহের হিসাব গ্রহণকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ 'বল তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা তোমরা গোপনই রাখ বা প্রকাশ কর,আল্লাহ তা জানেন।' (৩ঃ ২৯) অন্য স্থানে রয়েছে, 'তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ খুব ভাল জানেন।' এই অর্থ সম্বলিত আরও বহু আয়াত রয়েছে। এখানে ওর সাথে এটাও বলেছেন যে,তিনি তার হিসাব গ্রহণ করবেন। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে সাহাবীদের (রাঃ) উপর এটা খুব কঠিন বোধ হয় যে, ছোট বড় সমস্ত জিনিসের আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তাঁরা কম্পিত হন। তাই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে জানুর ভরে বসে পড়েন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে নামায, রোযা, জিহাদ এবং দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা আমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে; কিন্তু এখন যে আয়াত অবতীর্ণ হলো তা পালন করার শক্তি আমাদের নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা কি ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের মত বলতে চাও যে, আমরা শুনলাম ও মানলাম না? তোমাদের বলা উচিত, আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আল্লাহ, আমরা আপনার দান কামনা করছি। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে তো আপনার নিকটই ফিরে যেতে হবে।' অতঃপর সাহাবীগণ (রাঃ) একথা মেনে নেন এবং তাঁদের মুখে নবীর (সঃ) শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো উচ্চারিত হতে থাকে। তখন اٰمَنَ الرَّسُوْلُ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কষ্ট দূর করে দেন এবং لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ অবতীর্ণ করেন। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ মুসলিমের মধ্যেও এই হাদীসটি রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এই কষ্ট উঠিয়ে দিয়ে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন এবং যখন মুসলমানেরা বলে, 'হে আল্লাহ!

আমাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে আমাদেরকে ধরবেন না।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন نَعَمْ অর্থাৎ হ্যাঁ, 'আমি এটাই করবো।' মুসলমানগণ বলেঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর ঐ বোঝা চাপাবেন না যে বোঝা আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে ছিলেন।' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এটা কবুল করা হলো।' অতঃপর মুসলমানেরা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।' এটাও মঞ্জুর হয়। অতঃপর তারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দিন, আমাদের উপর দয়া করুন এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।' এটাও আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। এই হাদীসটি আরও বহু পন্থায় বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন,আমি হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট ঘটনা বর্ণনা করি যে, إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ এই আয়াতটি পাঠ করে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) খুবই ক্রন্দন করেছেন। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবীদের (রাঃ) এই অবস্থাই হয়েছিল, তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা এই কথাও বলেছিলেন, 'অন্তরের মালিক তো আমরা নই। সুতরাং অন্তরের ধারণার জন্যেও যদি আমাদেরকে ধরা হয় তবে তো খুব কঠিন হয়ে পড়বে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেন, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا বল।' সাহাবীগণ এই কথাই বলেন। অতপর পরবর্তী আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতগুলো দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কার্যাবলীর জন্যে ধরা হবে বটে; কিন্তু মনের ধারণা ও সংশয়ের জন্যে ধরা হবে না।' অন্য ধারাতে এই বর্ণনাটি ইবনে মারজানা (রঃ) হতেও এইভাবে বর্ণিত আছে। তাতে এও রয়েছে, কুরআন ফায়সালা করে দিয়েছে যে, তোমাদেরকে তোমাদের সৎ ও অসৎ কার্যের উপর ধরা হবে, তা মুখের দ্বারাই হোক, বা অন্য অঙ্গের দ্বারাই হোক কিন্তু মনের সংশয় ক্ষমা করে দেয়া হলো। আরও বহু সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রঃ) দ্বারা এর রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মনের ধারণা ও সংশয় ক্ষমা করেছেন। তারা যা বলবে বা করবে তার উপরেই তাদেরকে ধরা হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে,

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, 'যখন আমার বান্দা খারাপ কাজের ইচ্ছে পোষণ করে তখন তা লিখো না, যে পর্যন্ত না সে করে বসে। যদি করেই ফেলে তবে একটি পাপ লিখ। আর যখন সে সৎকাজের ইচ্ছে করে তখন শুধু ইচ্ছার জন্যেই একটি পুণ্য লিখো এবং যখন করে ফেলবে তখন একের বিনিময়ে দশটি পুণ্য লিখে নাও। (সহীহ মুসলিম) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একটি পুণ্যের বিনিময়ে সাতশোটি পুণ্য লিখা হয়। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, 'বান্দা যখন খারাপ কাজের ইচ্ছে করে তখন ফেরেশতা মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করে, হে আল্লাহ! আপনার অমুক বান্দা অসৎ কাজ করতে চায়।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বিরত থাক, যে পর্যন্ত না সে তা করে বসে সেই পর্যন্ত তা আমলনামায় লিখো না। যদি করে ফেলে তবে একটি লিখবে। আর যদি ছেড়ে দেয় তবে একটি পুণ্য লিখবে। কেননা, সে আমাকে ভয় করে ছেড়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে খাঁটি ও পাকা মুসলমান হয়ে যায় তার এক একটি ভাল কাজের পুণ্য দশ হতে সাতশো পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং মন্দ কাজ বৃদ্ধি পায় না।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কখনো পূণ্য সাতশো অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি করা হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ধ্বংস প্রাপ্ত ঐ ব্যক্তি যে এত দয়া ও করুণা সত্ত্বেও ধ্বংস হয়ে থাকে।' একদা সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মাঝে মাঝে আমাদের অন্তরে এমন সংশয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, তা মুখে বর্ণনা করাও আমাদের উপর কঠিন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনে বলেন, এইরূপ পাচ্ছ না-কি?' তাঁরা বলেন, জ্বি হাঁ। তিনি বলেন, এটাই স্পষ্ট ঈমান। (সহীহ মুসলিম ইত্যাদি)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেএটাও বর্ণিত আছে তিনি বলেন, এই আয়াতটি মানসূখ হয়নি। বরং ভাবার্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত সৃষ্টজীবকে আল্লাহ তা'আলা একত্রিত করবেন তখন বলবেন, আমি তোমাদের মনের এমন গোপন কথা বলে দিচ্ছি যা আমার ফেরেশতারাও জানে না।' মু'মিনদেরকে ঐ কথাগুলো বলে দিয়ে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু মুনাফিক ও সন্দেহ পোষণকারীদেরকে তাদের মনের অবিশ্বাসের কথা বলে দিয়ে পাকড়াও করবেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

অর্থাৎ 'কিন্তু তিনি তোমাদেরকে তোমাদের অন্তরের উপার্জনের জন্যে পাকড়াও করবেন।' (২ঃ ২২৫) অর্থাৎ অন্তরের সন্দেহ ও কপটতার জন্যে আল্লাহ তা'আলা ধরবেন। হযরত হাসান বসরীও (রঃ) এটাকে মানসূখ বলেন না। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এই উক্তিকেই পছন্দ করেন এবং বলেন, হিসাব এক জিনিস এবং শাস্তি অন্য জিনিস। হিসাব গ্রহণের জন্যে শাস্তি জরুরী নয়। হিসাব গ্রহণের পর ক্ষমারও সম্ভাবনা রয়েছে এবং শাস্তির সম্ভবনাও রয়েছে।' হযরত সাফওয়ান বিন মুহাররাম (রঃ) বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারের (রাঃ) সঙ্গে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলাম। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'কানা ঘুষা সম্বন্ধে আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে কি শুনেছেন?' তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারকে নিজের পার্শ্বে ডেকে নেবেন, এমন কি স্বীয় বাহু তার উপরে রাখবেন। অতঃপর তাকে বললেন, তুমি কি অমুক অমুক পাপ করেছো?' সে বলবে, হে আল্লাহ! হাঁ,আমি করেছি।' দু'বার বলবে। যখন খুব পাপের কথা স্বীকার করবে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জেনে রেখো দুনিয়ায় আমি তোমার দোষগুলো গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিলাম।' অতঃপর তার পুণ্যের পুস্তিকা তাকে ডান হাতে দিবেন। তবে অবশ্যই কাফির ও মুনাফিকদেরকে জনমণ্ডলীর সামনে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করা হবে এবং তাদের পাপগুলো প্রকাশ করে দেয়া হবে। অতঃপর বলা হবে, 'এই লোকগুলো তারাই যারা তাদের প্রভুর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। ঐ অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।' একবার হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত আয়েশাকে (রাঃ) এই আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন লোক আমাকে এই আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেনি। তুমি আজ জিজ্ঞেস করলে। তাহলে জেনে রেখো যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে–বান্দার উপর ইহলৌকিক কষ্ট। যেমন, তাদের জ্বর-জ্বালা ইত্যাদি হয়ে থাকে, এমনকি মনে কর একটি লোক তার জামার একটি পকেটে কিছু টাকা রেখেছে এবং তার ধারণা হয়েছে যে, টাকা অন্য পকেটে রয়েছে। কিন্তু ঐ পকেটে হাত ভরে দেখে টাকা নেই। তখন সে মনে ব্যাথা পেয়েছে, অতঃপর অন্য পকেটে হাত ভরে দেখে যে, টাকা রয়েছে। এই জন্যেও তার পাপ মোচন হয়ে থাকে। এমনকি সে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত পাপ হতে এমনভাবে বেরিয়ে যায় যেমন খাঁটি লাল সোনা বেরিয়ে থাকে। (তিরমিযী ইত্যাদি) এই হাদীসটি গরীব।

٢٨٥- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ○

২৮৫। রাসূল তদীয় প্রতিপালক হতে তৎপ্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মুমিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহ্‌কে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর গ্রন্থ সমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে; এবং আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না, তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও স্বীকার করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে চরম প্রত্যাবর্তন

٢٨٦- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ
اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ
عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

২৮৬। কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না; কারণ সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্যে এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদের ভ্রম অথবা ত্রুটি হয় তজ্জন্যে আমাদেরকে ধৃত করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেন না; হে আমাদের প্রভু, যা আমাদের শক্তির অতীত ঐরূপ ভার বহনে

| | |
|---|---|
| আমাদেরকে বাধ্য করবেন না, এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের দয়া করুন; আপনিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। | بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۞ |

এই আয়াত দু'টির ফযীলতের বহু হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আয়াত দু'টি রাত্রে পাঠ করবে তার জন্যে এ দু'টোই যথেষ্ট। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সূরা-ই-বাকারার শেষের আয়াত দু'টি আমাকে আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে দেয়া হয়েছে। আমার পূর্বে কোন নবীকে এ দু'টো দেয়া হয়নি।' সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি সপ্তম আকাশে অবস্থিত সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন,যে জিনিস আকাশের দিকে উঠে যায় তা এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে থাকে ও এখান হতেই নিয়ে নেয়া হয় এবং যে জিনিস উপর থেকে নেমে আসে ওটাও এখান পর্যন্তই পৌঁছে থাকে। অতঃপর এখান হতেই নিয়ে নেয়া হয়। ঐ স্থানটিকে সোনার ফড়িং ঢেকে রেখেছিল। তথায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনটি জিনিস দেয়া হয়−(১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায। (২) সুরা-ই-বাকারার শেষ আয়াতগুলো এবং (৩) একত্ববাদীদের সমস্ত পাপের ক্ষমা। মুসনাদ -ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উকবা বিন আমির (রাঃ)-কে বলেনঃ সূরা-ই-বাকারার এই আয়াত দু'টি পাঠ করতে থাকবে। আমাকে এ দু'টো আরশের নীচের ধনভাণ্ডার হতে দেয়া হয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই গ্রন্থেই রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাদেরকে লোকদের উপর তিনটি ফযীলত দেয়া হয়েছে। সূরা-ই-বাকারার শেষের আয়াতগুলো আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে দেয়া হয়েছে। এ দু'টো আমার পূর্বে আর কাউকেও দেয়া হয়নি। এবং আমার পরেও আর কাউকেও দেয়া হবে না।' ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ 'আমার জানা নেই যে, ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান রয়েছে এরূপ লোকদের মধ্যে কেউ আয়াতুল কুরসী এবং সুরা-ই-বাকারার শেষ আয়াত দু'টি না পড়েই শুয়ে যায়। এটা এমন একটি ধনভাণ্ডার যা তোমাদের নবী (সঃ)-কে আরশের নীচের

ধনভাণ্ডার হতে দেয়া হয়েছে।' জামে তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছিলেন। যার মধ্যে দু'টি আয়াত অবতীর্ণ করে সূরা-ই-বাকারা শেষ করেন। যেই বাড়ীতে তিন রাত্রি পর্যন্ত এই আয়াত দু'টি পাঠ করা হবে শয়তান সেই বাড়ীর নিকটেও যেতে পারবে না। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এই হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। কিন্তু হাকীম স্বীয় গ্রন্থ মুসতাদরাকের মধ্যে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সূরা-ই-বাকারার শেষ আয়াতগুলো এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করতেন তখন তিনি হেসে উঠে বলতেনঃ 'এই দু'টো রহমানের (আল্লাহর) আরশের নীচের ধন ভাণ্ডার।' যখন তিনি مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَبِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى অর্থাৎ মানুষ যা চেষ্টা করেছে তাই তার জন্যে রয়েছে وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى অর্থাৎ নিশ্চয় তার চেষ্টার ফল তাকে সত্বরই দেখানো হবে এবং ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى অর্থাৎ অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। (৫৩ঃ ৩৯-৪১) এই আয়াতগুলো পাঠ করতেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী' আয়াতটি বেরিয়ে যেতো এবং তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আমাকে সূরা-ই-ফাতিহা এবং সূরা-ই-বাকারার শেষ আয়াত দু'টি আরশের নিম্নদেশ হতে দেয়া হয়েছে এবং মুফাস্সাল সূরাগুলো অতিরিক্ত।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পার্শ্বে বসেছিলাম এবং হযরত জিবরাঈলও (আঃ) তাঁর নিকট ছিলেন। এমন সময় আকাশ হতে এক ভয়াবহ শব্দ আসে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে চক্ষু উত্তোলন করেন এবং বলেনঃ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেল যা আজ পর্যন্ত কোন দিন খুলেনি।' তথা হতে এক ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং নবী (সঃ)কে বলেনঃ আপনি সন্তোষ প্রকাশ করুন! আপনাকে ঐ দু'টি নূর দেয়া হচ্ছে যা আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে সূরা-ই-ফাতিহা ও সূরা-ই-বাকারার শেষ আয়াত দু'টি। এগুলোর প্রত্যেকটি অক্ষরের উপর আপনাকে নূর দেয়া হবে। (সহীহ মুসলিম) সুতরাং এই দশটি হাদীসে এই বরকতপূর্ণ আয়াতগুলোর ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণিত হলো। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, রাসূল অর্থাৎ হযরত

মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর উপর তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর তিনি ঈমান এনেছেন।' এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তিনি ঈমান আনয়নের পূর্ণ হকদার।' অন্যান্য মুমিনগণও ঈমান এনেছে। তারা মেনে নিয়েছে যে, আল্লাহ এক। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য নেই এবং তিনি ছাড়া কেউ পালনকর্তাও নেই। এই মুমিনরা সমস্ত নবীকেই (আঃ) স্বীকার করে। তারা সমস্ত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, ঐ আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে যেগুলো নবীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা নবীদের (আঃ) মধ্যে কোন পার্থক্য আনয়ন করে না। অর্থাৎ কাউকে মানবে এবং কাউকে মানবে না তা নয়। বরং সকলকেই সত্য বলে স্বীকার করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, তাঁরা সবাই সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মানুষকে ন্যায়ের দিকে আহবান করতেন। তবে কোন কোন আহকাম প্রত্যেক নবীর যুগে পরিবর্তিত হতো বটে, এমনকি শেষ পর্যন্ত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শরীয়ত সকল শরীয়তকে রহিতকারী হয়ে যায়। নবী (সঃ) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূল। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর শরীয়ত বাকী থাকবে এবং একটি দল তাঁর অনুসরণও করতে থাকবে। তারা স্বীকারও করে আমরা আল্লাহর কালাম শুনলাম এবং তাঁর নির্দেশাবলী আমরা অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিলাম।' তারা বললো—'হে আমাদের প্রভু! আপনারই নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আপনারই নিকট আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।' হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন—হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখানে আপনার ও আপনার অনুসারী উম্মতের প্রশংসা করা হচ্ছে। এই সুযোগে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন তা গৃহীত হবে এবং তাঁর নিকট যাচ্ঞা করুন যে,তিনি যেন সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট না দেন।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সামর্থের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না।' এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ।

সাহাবীগণের (রাঃ) মনে যে খটকা এসেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা মনের ধারণার জন্যেও যে হিসাব নিবেন তা তাঁদের কাছে যে খুব কঠিন ঠেকেছিল, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তা নিরসন করেন। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ

তা'আলা হিসাব গ্রহণ করবেন বটে, কিন্তু সাধ্যের অতিরিক্ত কার্যের জন্যে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন না। কেননা, মনে হঠাৎ কোন ধারণা এসে যাওয়া এটা রোধ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। বরং হাদীসে তো এটাও এসেছে যে, এরূপ ধারণাকে খারাপ মনে করাও ঈমানের পরিচায়ক।

নিজ নিজ কর্মের ফল সকলকেই ভোগ করতে হবে। ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে প্রার্থনা শিখিয়ে দিচ্ছেন এবং তা কবুল করারও তিনি অঙ্গীকার করছেন। বান্দা প্রার্থনা করছেঃ হে আমাদের প্রভু! যদি আমাদের ভ্রম অথবা ত্রুটি হয় তজ্জন্যে আমাদেরকে ধরবেন না। অর্থাৎ যদি ভুল বশতঃ কোন নির্দেশ পালনে আমরা ব্যর্থ হয়ে থাকি বা কোন মন্দ কাজ করে থাকি অথবা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে আমাদেরকে তজ্জন্যে পাকড়াও না করে দয়া করে ক্ষমা করুন। 'ইতিপূর্বে সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি এটা কবুল করেছি এবং আমি এটাই করেছি।' অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে এবং জোরপূর্বক যে কাজ করিয়ে নেয়া হয় তজ্জন্যেও ক্ষমা রয়েছে। (ইবনে মাজাহ)।'

'হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রূপ গুরুভার অর্পণ করবেন না।' আল্লাহ তা'আলা তাদের এই প্রার্থনাও কবুল করেন। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি শান্তিপূর্ণ ও সহজ ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।' 'হে আমাদের প্রভু! যা আমাদের শক্তির অতীত এরূপ কার্যভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেন না।' হযরত মাকহুল (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মনের সংকল্প এবং প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ। এই প্রার্থনার উত্তরেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মঞ্জুরী ঘোষিত হয়। 'আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন।' অর্থাৎ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন, অমাদের পাপসমূহ মার্জনা করুন, আমাদের অসৎকার্যাবলী গোপন রাখুন এবং আমাদের উপর সদয় হউন যেন পুনরায় আমাদের দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টির কোন কাজ সাধিত না হয়। এ জন্যে মনীষীদের উক্তি রয়েছে যে, পাপীদের জন্যে তিনটি

জিনিসের প্রয়োজন। (১) আল্লাহর ক্ষমা যেন সে শাস্তি হতে মুক্তি পেতে পারে। (২) গোপনীয়তা রক্ষা, যেন সে অপমান ও লাঞ্ছনা হতে রক্ষা পায়। (৩) পবিত্রতা লাভ, যেন সে দ্বিতীয় বার পাপ কার্যে লিপ্ত না হয়। এর উপরও আল্লাহ তা'আলার মঞ্জুরী ঘোষিত হয়। 'আপনিই আমাদের সাহায্যকারী, আপনার উপরেই আমাদের ভরসা, আপনার নিকটই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনিই আমাদের আশ্রয়স্থল। আপনার সাহায্য ছাড়া না আমরা অন্য কারও সাহায্য পেতে পারি, না কোন মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে পারি। আপনি আমাদেরকে ঐ লোকদের উপর সাহায্য করুন যারা আপনার মনোনীত ধর্মের বিরোধী, যারা আপনার একত্বে বিশ্বাসী নয়, যারা আপনার রাসূলের (সঃ) রিসালাতকে অস্বীকার করে, যারা আপনার ইবাদতে অন্যদেরকে অংশীদার করে; হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন।' আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরেও বলেনঃ হাঁ, আমি এটাও করলাম।' হযরত মু'আজ (রাঃ) এই আয়াতটি শেষ করে আমীন বলতেন। (ইবনে জারীর)

**সূরা-ই-বাকারার তাফসীর সমাপ্ত**

# تفسير ابن كثير

## تأليف

الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله

## الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن
الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية
جامعة راجشاهى، بنغلاديش